॥ সূচীপত্র ॥



॥ সম্পাদক : হুমায়ুন কবির ॥

আতাউর রহমান কর্তৃক শ্রীগৌরাঙ্গ প্রেস প্রাইভেট লিঃ, ৫ চিন্তামণি দাস লেন, কলিকাতা ৯ হইতে মুদ্রিত ও ৫৪ গণেশচন্দ্র এভিনিউ, কলিকাতা ১৩ হইতে প্রকাশিত।

ত্রৈমাসিক পত্রিকা   **চতুরঙ্গ**   শ্রাবণ-আশ্বিন ১৩৬৮

॥ সূচীপত্র ॥



॥ সম্পাদক : হুমায়ুন কবির ॥

---

আতাউর রহমান কর্তৃক শ্রীগৌরাঙ্গ প্রেস প্রাইভেট লিঃ, ৫ চিন্তামণি দাস লেন, কলিকাতা ৯ হইতে মুদ্রিত ও ৫৪ গণেশচন্দ্র এভিনিউ, কলিকাতা ১৩ হইতে প্রকাশিত।

ত্রৈমাসিক পত্রিকা

মাঘ-চৈত্র ১৩৬৮

॥ সূচীপত্র ॥



॥ সম্পাদক : হুমায়ুন কবির ॥

আতাউর রহমান কর্তৃক শ্রীসরস্বতী প্রেস লিমিটেড, ৩২ আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র রোড, কলিকাতা ৯ হইতে মুদ্রিত ও ৫৪ গণেশচন্দ্র এভিনিউ, কলিকাতা ১৩ হইতে প্রকাশিত।

ত্রয়োবিংশতিতম বর্ষ প্রথম সংখ্যা

বৈশাখ-আষাঢ় ১৩৬৮

# সোভিয়েট দেশে তিন সপ্তাহ

**হুমায়ুন কবির**

কলেকটীভ ফার্ম বা সমবেতভাবে চাষের ব্যবস্থা সোভিয়েট রাষ্ট্র-ব্যবস্থার অন্যতম প্রধান অংগ বললে অত্যুক্তি হবে না। লেনিনের আমলেও রাষ্ট্র এবং সমাজ বিপ্লবে কৃষকের স্থান নিয়ে মতভেদ ছিল, সন্দেহ ছিল। সাম্যবাদী মতবাদ শিল্পপ্রতিষ্ঠানের শ্রমিককে প্রগতিশীল ও বিপ্লবপন্থী এবং কৃষককে সংরক্ষণশীল ও বিপ্লব-পরিপন্থী মনে করত। লেনিন সে কথা পুরোপুরি মানেননি, কৃষককেও সেদিনকার রাজনৈতিক সংগ্রাম ও বিপ্লবে ব্যবহার করেছেন বলেই তাঁর কর্মপন্থা সফল হয়েছিল। লেনিন-পরবর্তী যুগে স্টালিন এবং অন্যান্য রক্ষণশীল সাম্যবাদী নেতার মতকে অগ্রাহ্য করে মাওৎ সে তুং কৃষককে বিপ্লবের বাহন হিসাবে ব্যবহার করেছেন, কিন্তু সাম্যবাদী দৃষ্টিভঙ্গীতে যাঁরা ষোল আনা বিশ্বাস করেন, তাঁদের সকলেরই চেষ্টা পুরাতন কৃষিব্যবস্থার পরিবর্তন করে কৃষিকেও বর্তমান যুগের বিরাট শিল্প ও উদ্যোগে রূপান্তরিত করতে হবে।

কৃষির শিল্পীকরণ হিসাবেই হয়তো সোভিয়েট রাষ্ট্রে কলখজ বা কলেকটীভ ফার্মের সুরু হয়েছিল, কিন্তু রাষ্ট্রনেতারা অল্পদিনের মধ্যেই দেখলেন যে এ পরিবর্তনের ফলে বিপুল শক্তিশালী নতুন এক অস্ত্র রাষ্ট্রের হাতে এসেছে। সোভিয়েট-পূর্ব যুগেই রুষদেশে শিল্পবিপ্লব সুরু হয়েছিল। প্রথম মহাযুদ্ধের প্রাক্কালে রুষ সাম্রাজ্য পৃথিবীর অন্যতম প্রধান শক্তি। বিপ্লবের পরে অন্তর্দ্বন্দ্বে কিছুদিনের জন্য সোভিয়েট রাষ্ট্রের প্রগতি ব্যাহত হয়। কিন্তু ১৯২৮-২৯ সালে সোভিয়েট রুষে যখন পঞ্চশালা পরিকল্পনা সুরু হয়, তখন তার ফলে সমস্ত দেশে জনসাধারণের ধন উৎপাদনের শক্তি আবার দ্রুতবেগে বাড়তে সুরু করল। সে বৃদ্ধির অন্তত একটি অংশ জনসাধারণের জীবনমান উন্নয়নের জন্য ব্যবহৃত হবে এ আশা শুধু স্বাভাবিক নয়, প্রায় অনিবার্য। সোভিয়েট রাষ্ট্র-নেতারা নানা কারণে স্থির করেছিলেন যে তা হবে না, বর্তমানকে বঞ্চিত করে ভবিষ্যত গড়বার কাজে নতুন সম্পদের সমস্তটাই ব্যবহৃত হবে। সোভিয়েট রাষ্ট্র গণতান্ত্রিক নয়, সেখানে যে রাষ্ট্র-সংগঠন, তাতে জনসাধারণের মতামত পুরোপুরিভাবে প্রকাশ করা আজো কঠিন, স্টালিনের যুগে একেবারে অসম্ভব ছিল। কিন্তু তা সত্ত্বেও জনসাধারণের ইচ্ছা-অনিচ্ছাকে একেবারে

অগ্রাহ্য করাও কোন কালে কোন রাষ্ট্রের পক্ষেই সম্ভব নয়। বস্তুত স্টালিনের আমলে যখন প্রথম পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনা অনুসারে কাজ শুরু হয়, তখন কৃষক সমাজের অনেকে প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে তাতে বাধা দিয়েছে। চাষী বহুক্ষেত্রে চাষ করেনি, ফসল নষ্ট করে দিয়েছে, গরু বাছুর মেরে কেটে খেয়ে ফেলেছে। ফলে সে সময় নগরবাসী শ্রমিকের খাদ্যসংস্থান রাষ্ট্রের পক্ষে এক সমস্যা হয়ে দাঁড়ায়। রাষ্ট্র বিরুদ্ধবাদী চাষীদের কঠিন শাস্তি দিয়েছে, লক্ষ লক্ষ চাষী সর্বস্বান্ত হয়েছে, প্রাণ হারিয়েছে, কিন্তু কেবল শাস্তি দিয়ে সমস্যার সমাধান হয় না, তাই সেই শিল্পীকরণের যুগে শহরের কারখানার শ্রমিক যাতে প্রয়োজনীয় খাদ্য পায়, তার ব্যবস্থা করা অপরিহার্য হয়ে পড়েছিল। কলেকটীভ ফার্ম বা কলখজ সেই সমস্যা সমাধানের অন্যতম উপায় হিসাবেও সেদিন ব্যবহৃত হয়েছিল।

কলখজের পাশাপাশি বহু কো-অপারেটিভ বা স্বেচ্ছাসমবায় ফার্ম-ও গড়ে উঠেছে। বস্তুত, মনে হল যে বর্তমানে কলখজের চেয়ে কো-অপারেটিভ ফার্মের প্রসারই তাড়াতাড়ি হচ্ছে। কলখজের যে সমস্ত সুযোগ সুবিধা, কো-অপারেটিভেও তা পুরোপুরি মেলে, সঙ্গে সঙ্গে কো-অপারেটিভ ফার্মে স্বাধীনতার খানিকটা অবকাশ আছে বলে কৃষক সমাজ তাকে ততটা অপছন্দ করে না। তবে কলখজই হোক অথবা সমবায় ফার্ম হোক, এ সমস্ত প্রচেষ্টার মূলে রয়েছে কৃষির শিল্পীকরণ। বহুদিন থেকে মানুষ দেখেছে, যে শিল্প এবং উদ্যোগের ক্ষেত্রে পুরাকালের ছোট ছোট পরিবার-নির্ভর গৃহশিল্প ভেঙে যেদিন কারখানার প্রবর্তন হল, সেদিন এক পক্ষে শিল্পের আয়তন ও উৎপাদন বেড়ে গেল, অন্য পক্ষে যন্ত্রের অধিক ব্যবহারের ফলে শিল্পের গতিবেগ ও বর্ধনশক্তি বহুগুণ প্রসারিত হল। ইয়োরোপের শিল্পবিপ্লব বা ইণ্ডাস্ট্রিয়াল রেভোলিউশনের এই হল গোড়ার কথা। শিল্পবিপ্লবের সঙ্গে সঙ্গে বিজ্ঞানের প্রসারের সম্ভাবনা দেখা দিল, সমাজের সংগঠন বদলাতে শুরু করল, পুরাতন বিচ্ছিন্ন গৃহনির্ভর গ্রাম্যসভ্যতার বদলে শিল্পনির্ভর এক নতুন বিশ্বব্যাপী নাগরিক সভ্যতার পত্তন হল।

কৃষির ক্ষেত্রেও যন্ত্রের ব্যবহারের কথা বহু মনীষী বহুদিন থেকে ভেবেছেন। ভারতবর্ষে রবীন্দ্রনাথ বর্তমান শতকের গোড়ায় বলেছিলেন যে ভারতবর্ষের ছোট ছোট ভাঙাচোরা জোতজমিকে একত্র করে আমরা যদি যন্ত্রের সাহায্যে চাষের ব্যবস্থা না করি, তবে কোনদিনই এদেশের দারিদ্র্য ঘুচবে না। অবশ্য তিনি সঙ্গে সঙ্গে একথাও বলেছিলেন যে কৃষির এ প্রসারণের ফলে ব্যক্তিসম্পত্তি লোপের কোন প্রয়োজন নেই। স্বেচ্ছায় যদি চাষীরা সমবেতভাবে চাষের ব্যবস্থা করে, তবে তাতে সমাজের সম্পদ বাড়বে, সঙ্গে সঙ্গে ব্যক্তির সম্পদও বাড়বে। যন্ত্র চাষের অর্থ কেবলমাত্র যন্ত্রের ব্যবহার নয়, বর্তমান বিজ্ঞানের সাহায্যে জমির উৎপাদন বহুগুণে বৃদ্ধিই তার লক্ষ্য। পূর্বে একশজন লোক যে পরিমাণ কাপড় সারা বৎসরে বুনতে পারত, আজকাল একজন লোক যন্ত্রের সাহায্যে এক সপ্তাহে তা বুনতে পারে। কৃষির ক্ষেত্রেও আজ তাই চেষ্টা যে সকলের সমবেত চেষ্টায় যন্ত্রের সাহায্যে এমন কৃষিব্যবস্থার প্রবর্তন করতে হবে যে একজন লোকের পরিশ্রমে যেন দশজন লোকের সারা বৎসরের খোরাকের ব্যবস্থা হয়। পশ্চিম ইয়োরোপের অনেক দেশ অথবা আমেরিকার যুক্তরাষ্ট্রে তা হয়েছেও। সেখানে শতকরা দশ পনেরোজন লোক যে খাদ্যশস্য ও অন্যান্য ফসল উৎপাদন করে, তাতে দেশের সমস্ত লোক পর্যাপ্তভাবে খেয়ে পরেও বিদেশে রপ্তানীর জন্য অনেকখানি উদ্বৃত্ত থাকে।

কলখজ ও কো-অপারেটিভ ফার্মের দ্বারা সোভিয়েট রাষ্ট্রেও সেই উদ্দেশ্য সফল

করতে চায়, কিন্তু এখনো পুরোপুরি সফল হয়নি। বস্তুত, স্টালিন-যুগের রাষ্ট্র-নেতাদের ভুলভ্রান্তির জন্য বরং প্রথম প্রথম সোভিয়েট নাগরিকের জীবনযাত্রার মান অনেকখানি নেমে গিয়েছিল। প্রথম মহাযুদ্ধের আগে রুষ দেশের জনসাধারণ যে পরিমাণ খোরাক পোষাক পেয়েছে, স্টালিনের আমলে তা পায়নি। স্টালিনের মৃত্যুর পরেই এ বিষয়ে সোভিয়েট কৃষি ও শিল্পব্যবস্থা অনেকখানি মনোযোগ দিয়েছে, এবং গত পাচ বৎসরে উল্লেখযোগ্য উন্নতিও করেছে। তবু আজো সোভিয়েট রাষ্ট্রে কৃষি সমস্যার পুরোপুরি সমাধান হয়নি, আজো বহু প্রয়োজনীয় জিনিস হয় মেলে না, নয় দুর্মূল্য। কাপড় জামা জুতোর কথা ছেড়ে দিলেও জনসাধারণের তরীতরকারী ফলের চাহিদাও আজো সোভিয়েট রাষ্ট্র পুরোপুরি মেটাতে পারে না।

সোভিয়েট দেশে সফরের সময় উজবেকীস্তানে আমি দুটি কলেকটীভ ফার্ম দেখেছিলাম। একটি তাসকন্দের কাছে, অন্যটি সমরকন্দে। তাসকন্দের ফার্মটির নাম কার্ল মার্কস কলখজ, ১৯৩০ সালে তার প্রতিষ্ঠা হয়। সে সময় গোলাম মহম্মদ আবদুল্লা তার সভাপতি ছিলেন। ১৯৫৯ সালে আমি যখন সেখানে যাই, তখনো তিনি সভাপতি। শুনলাম যে এভাবে প্রায় ত্রিশ বৎসর ধরে একটানা সভাপতিত্ব সারা সোভিয়েট রাষ্ট্রে বোধ হয় আর কেউ করেননি।

কার্ল মার্কস কলখজের আয়তন প্রায় ত্রিশ বর্গমাইল হবে, দৈর্ঘ্য দশ মাইল, প্রস্থ তিন মাইল। কলখজে সাড়ে পাঁচশো পরিবারের বাস—জনসংখ্যা প্রায় তিন হাজার। সাবালক নরনারীদের মধ্যে ১০৫০ জন কলখজের সদস্য, বাকী ৩০০ শহরে কাজ করে। সদস্যদের প্রায় সকলেরই নিজস্ব বাড়ি রয়েছে, যাদের নেই, অন্যান্য সদস্যেরা তাদের বাড়ি তৈরীতে সাহায্য করে, কলখজ থেকেও ঋণ দেওয়া হয়। অধিকাংশ বাড়িতেই দুটি শোবার ঘর, রান্নাঘর বসবার ঘর আলাদা। টেবিল চেয়ার বা অন্য কোন আসবাবপত্র নেই বললেই চলে। ভারতবর্ষের মতন উজবেকিস্তানেও অধিকাংশ লোক মাদুর বা তোষক বিছিয়ে মাটিতে শোয়, জমিতে বসে খায়।

কার্ল মার্কস কলখজে ব্যাপকভাবে আঙুরের এবং শাক সব্জী তরীতরকারীর চাষ। বিজ্ঞানসম্মতভাবে পশুপালনের ব্যবস্থাও রয়েছে এবং দুধ মাখন পনিরও প্রচুর পরিমাণে উৎপাদিত হয়। পূর্বেই বলেছি যে আজো সোভিয়েট রাষ্ট্রে এ সমস্ত জিনিষের অভাব, কাজেই কলখজের সমস্ত উৎপাদনই অনায়াসে বিক্রী হয়ে যায়। পূর্বে কলখজ বা কো-অপারেটিভ ফার্মের সদস্যদের অভিযোগ ছিল যে বাধ্যতামূলকভাবে শহর বা কারখানায় খোরাক জোগাতে হত, ফলে তারা ফসলের উপযুক্ত দাম অনেক সময়ে পেত না। মিণ্টার ক্রুশ্চভ আজকাল তাদের বিক্রয়ের স্বাধীনতা দিয়েছেন বলে প্রায় সর্বত্র চাষীর উপার্জন অনেক বেড়ে গেছে। গ্রামাঞ্চলে মিণ্টার ক্রুশ্চভের জনপ্রিয়তার প্রধান কারণও তাই। সদস্যেরা কাজের হিসাবে বেতন পায়। কে কতঘণ্টা কাজ করল তার হিসাব না করে কে কতখানি উৎপাদন করল সেই ভিত্তিতেই মজুরী বাঁটা হয়। কলখজের কমিটি স্থির করে যে একদিনে সুস্থ ও সক্ষম একজন কর্মীর আট ঘণ্টা মেহনতে এতখানি ফল পাওয়া উচিত এবং তার জন্য মজুরী এত রুবল হলে ঠিক হয়। সেই সময়ের মধ্যে যদি কারু উৎপাদন বেশী হয়, সেই অনুসারে তার রুজিও বেড়ে যায়। কলখজের সভাপতি বললেন যে তাঁরা স্থির করেছেন যে উপরে লিখিত মান অনুসারে পুরোদিনের কাজের জন্য বিশ রুবল দেওয়া হবে, এবং সে হিসাব অনুসারে তিনি নিজে গত বৎসর দুই হাজার কর্মদিবসের ভিত্তিতে চল্লিশ

হাজার রুবল উপার্জন করেছেন। তিনি আরো বললেন যে সকলের মজুরী দিয়েও গত বৎসর কলখজটি এক কোটি রুবল মুনাফা করেছে।

প্রথম যখন কলখজগুলি সুরু হয়, তখন ব্যক্তি-সম্পত্তি লোপ করবার চেষ্টাও হয়েছিল। তার ফলে কৃষির উৎপাদন এককালে খুবই কমে যায়। ১৯৩০ সাল থেকে দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের প্রাক্কাল পর্যন্ত সোভিয়েট রাষ্ট্রে যে বার বার বিক্ষোভের কথা শোনা যায়, লক্ষ লক্ষ চাষীর ঘরবাড়ি উৎখাত হয়েছিল, বার বার বহু নাগরিকের নানাভাবে শাস্তি হয়েছে, বহু ক্ষেত্রে মৃত্যুদণ্ডও হয়েছে, কৃষি ব্যবস্থার রূপান্তর তার অন্যতম কারণ। সে সময়ের নিদারুণ দুঃখকষ্টের মধ্যেও কিন্তু জনসাধারণ ব্যাপকভাবে বিদ্রোহ করেনি। রাষ্ট্রশক্তি কেবলমাত্র দণ্ডবিধান দিয়ে মানুষকে শান্ত রাখতে পারত না, বর্তমানের দুঃখের মধ্যেও জনসাধারণ ভবিষ্যতে শ্রীবৃদ্ধি ও গৌরবের স্বপ্ন দেখেছে বলেই তারা এত দুঃখ কষ্ট এ-ভাবে সহ্য করেছে। সোভিয়েট শিক্ষাব্যবস্থাও এবিষয়ে রাষ্ট্রকে সাহায্য করেছে। আশৈশব নাগরিক শিখেছে যে রাষ্ট্র ও সমাজের নিরাপত্তা এবং গৌরবের জন্য দুঃখ স্বীকার এমনকি জীবনদানও নাগরিকের কর্তব্য। তারপরে যখন নাৎসি জার্মানী সোভিয়েট রাষ্ট্রকে আক্রমণ করল তখন স্বজাতি ও স্বদেশপ্রেমের প্রেরণায় সোভিয়েট নাগরিক অলৌকিক ধৈর্য ও সাহসের পরিচয় দিয়েছে।

যুদ্ধের প্রাক্কালে স্টালিনও বুঝেছিলেন যে কেবলমাত্র শক্তির দ্বারা শাসন করা যায় না। তাই রাষ্ট্র-ব্যবস্থারও খানিকটা বদল সুরু হয়। কলখজে সেই সময়ে ব্যক্তি সম্পত্তির স্বীকৃতি দেখা দেয়, এবং ভবিষ্যতে কলখজের বদলে সমবায় চাষের দিকে বেশী জোর দেওয়া হয়। বর্তমানে কলখজের প্রায় সমস্ত সদস্যেরই খানিকটা নিজস্ব জমি এবং নিজের গরু বাছুর রয়েছে। জমির পরিমাণ খুব বেশী নয়, বোধ হয় প্রতি পরিবারের ভাগে আন্দাজ ১৫০০ বর্গ গজ জমি হবে। শুনেছি যে বর্তমানে সোভিয়েট রাষ্ট্রে সমস্ত জমির শতকরা ৯৫ ভাগ কলখজ বা সমবায় চাষে ব্যবহৃত, মাত্র শতকরা পাঁচভাগ জমি বিভিন্নভাবে চাষীর ব্যক্তিগত সম্পত্তি, কিন্তু তবু ব্যক্তিগত চাষের জমিতেই সোভিয়েট রাষ্ট্রের সমস্ত ফসলের প্রায় এক তৃতীয়াংশ উৎপন্ন হয়। কলখজের কর্তারাও স্বীকার করলেন যে চাষীদের নিজস্ব জমিতে যে ফসল হয়, তাদের বাড়ির গরু ছাগল যে পরিমাণ দুধ দেয়, তা সাধারণত কলখজের উৎপাদনের হারের চেয়ে অনেক বেশী।

যুগোশ্লাভিয়া বা বুলগেরিয়ায় এ কথার স্বীকৃতি আরো বেশী স্পষ্ট। যুগোশ্লাভিয়া সাম্যবাদী দেশ, মার্শাল টিটো এবং তাঁর সহকর্মীরা দাবী করেন যে সোভিয়েট রাষ্ট্রে তবু সাম্যবাদের ব্যতিক্রম ঘটেছে, কিন্তু যুগোশ্লাভিয়া মার্কসবাদকে আরো বেশী বিজ্ঞানসম্মতভাবে অনুসরণ করে। তা সত্ত্বেও যুগোশ্লাভিয়ায় চাষের জমির অধিকাংশ চাষীদের ব্যক্তিগত সম্পত্তি, কিন্তু চাষের ব্যবস্থা সকলের সম্মতিক্রমে সমবায় পদ্ধতিতেই হয়। বুলগেরিয়ায় সম্প্রতি গিয়েছিলাম, সেখানে দেখেছি যে কলখজের চেয়ে সমবায় চাষের প্রতি ঝোঁক ঢের বেশী, এবং একথাও অনস্বীকার্য যে কৃষির ক্ষেত্রে যুগোশ্লাভিয়া এবং বুলগেরিয়া উভয় দেশই সোভিয়েট রাষ্ট্রের তুলনায় অনেক বেশী অগ্রসর। শুনলাম যে বুলগেরিয়ায় সম্প্রতি এক নতুন বিকাশ দেখা দিচ্ছে। এতদিন পর্যন্ত সমবায় চাষের ব্যবস্থায় চাষী শ্রমিক হিসাবে মজুরী উপার্জন করত এবং সমবায় ক্ষেত্রের আংশিক মালিক হিসাবে জমির খাজনাও পেতো, কিন্তু শুনলাম যে দুয়েক বছর থেকে কোন কোন সমবায় সমিতির সদস্যেরা স্বেচ্ছায় স্থির করেছেন যে তাঁরা মালিকানার ভিত্তিতে

খাজনা নেবেন না, কেবল মজুরী হিসাবে যা পাবেন তাই দিয়ে সংসার চালাবেন। খাজনার অংশ সমিতির তহবিলে জমা হয়ে সকলের সমবেত সম্পদ দিন দিন বাড়াবে।

মানুষ বিপদ-আপদের কথা ভেবেই সম্পত্তি অর্জন করে। ভাবে যদি এমনদিন আসে যে নিজের পরিশ্রমে আর জীবিকানির্বাহ করতে পারবে না, তখন অন্তত সম্পত্তি ভাঙিয়ে দিন চলবে। কাজেই সমাজ-ব্যবস্থা যদি সকলের ভরণ পোষণের ভার নেয়, মানুষের মনে এ আশ্বাস গড়ে উঠে যে রোগে দুর্দিনে বা বৃদ্ধ বয়সে জীবিকার সম্বন্ধে কোন সন্দেহের কারণ নেই, তবে সম্পত্তি সঞ্চয়ের আগ্রহও স্বভাবতই কমে আসবে। যা দুর্লভ বা যার প্রাপ্তি সম্বন্ধে অনিশ্চয়তা, তাই মানুষ সঞ্চয় করতে চায়। যা সহজলভ্য এবং নিশ্চিত, তা সংগ্রহ বা সঞ্চয়ের আগ্রহ কোনদিন কারুরই হয় না। বর্তমান পৃথিবীতে বিজ্ঞানের কল্যাণে সমস্ত মানুষের জন্য সুস্থ স্বচ্ছন্দ এবং সচ্ছল জীবিকার ব্যবস্থা মানুষের করায়ত্ত। কাজেই সম্পত্তিবোধ এবং সঞ্চয়স্পৃহা যদি ধীরে ধীরে ক্ষীণ হয়ে আসে তো আশ্চর্যের কারণ নেই।

পূর্বেই বলেছি যে সোভিয়েট রাষ্ট্রে কলখজগুলি কেবলমাত্র শস্য উৎপাদনের সংগঠন নয়, তাদের মাধ্যমে সমাজজীবনের রূপান্তরের চেষ্টাও সমান স্পষ্ট। কার্ল মার্কস কলখজে কিণ্ডেরগার্টেন তো রয়েছেই, তাছাড়া তিনটি স্কুল এবং ক্লাব লাইব্রেরীর ব্যবস্থাও রয়েছে। একজন সদস্য ভারতীয় ফিল্ম দেখে ভারতীয় সঙ্গীত শিখেছিলেন, ক্লাবের সবাই মিলে আমাদের একটি ভারতীয় রাগিণী বাজিয়ে শোনালেন। কিণ্ডেরগার্টেন থেকে সুরু করে থিয়েটার লাইব্রেরী ক্লাবের মধ্য দিয়ে কলখজগুলি সদস্যদের জীবনের সমস্ত প্রয়োজন মেটাতে চেষ্টা করে, সঙ্গে সঙ্গে পারিবারিক জীবনের বন্ধনকে খানিকটা শিথিল করে কলখজের সামষ্টিক জীবনকে উজ্জ্বলতর করে তোলে।

কলখজগুলির পরিচালনার জন্য যে বোর্ড, তার সদস্যসংখ্যা সাধারণত এগারো। কলখজের সমস্ত মেম্বর মিলে দুবছরের জন্য বোর্ডের সদস্য নির্বাচন করেন, সভাপতিও সমস্ত কলখজের দ্বারা নির্বাচিত হন। হিসাব নিকাশের জন্য অর্থকরী সমিতি রয়েছে, তার সদস্য সংখ্যা পাঁচ। একই ব্যক্তি একই সঙ্গে বোর্ড ও অর্থকরী সমিতির সদস্য হতে পারেন না। বস্তুত বোর্ড এবং সমিতি পরস্পরের কাজের তুলনামূলক হিসাব রাখে। বোর্ড এবং সমিতির মধ্যে যদি কোন বিষয়ে মতভেদ হয়, তবে কলখজের সমস্ত সদস্যের সভা ডাকা হয় এবং সে সভার সিদ্ধান্তই চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত।

প্রায় সমস্ত কলখজেই এই ধরনের সাধারণ ব্যবস্থা। তবে স্থানীয় পার্থক্যেরও দৃষ্টান্ত মেলে। তাসকন্দের কলখজে 'কর্মদিবস'-এর বেতন কুড়ি রুবল কিন্তু সমরকন্দে পনেরো। আমি যখন তাসকন্দে গিয়েছিলাম, তখন এক রুবলের বদলে আমাদের আট আনা মিলত, কিন্তু জিনিসপত্রের হিসাবে রুবলের ক্রয়শক্তি তখন বড়জোর তিন চার আনা ছিল। তাই বলা চলে যে একদিনের মেহনতে তাসকন্দের চাষী আন্দাজ চার পাঁচ টাকা রোজগার করত, সমরকন্দে তিন চার টাকা। টাকার হিসাবে এ উপার্জন খুব বেশী নয়, কিন্তু কলখজের যে সমস্ত সুযোগ সুবিধা, আমাদের দেশে ব্যক্তিগতভাবে চাষীর পক্ষে তা পাওয়া দুষ্কর।

কলখজ অথবা কো-অপারেটিভের প্রথম যুগে যেভাবে জোরজার চলত, তাতে কৃষক বহু-ক্ষেত্রে বিক্ষুব্ধ হয়েছে, কখনো কখনো বিদ্রোহও করেছে। তবু কলখজের প্রভাবে যে সোভিয়েট রাষ্ট্রে এসিয়া অঞ্চলে সাধারণ কৃষকের অবস্থার উন্নতি হয়েছে, সে বিষয়ে সন্দেহ নেই। সোভিয়েট রাষ্ট্রের অন্য কোথাও আমি কলখজ দেখিনি, কাজেই ইয়োরোপীয় অঞ্চলে কলখজ কতখানি সার্থক হয়েছে বলতে পারি না। উজবেকিস্তানে যা দেখেছি তাতে আমার এই

ধারণাই হয়েছে যে ত্রিশ বৎসর আগে চাষীর কি মনোভাব ছিল জানি না কিন্তু বর্তমানে উজবেক চাষী কলখজকে আন্তরিকভাবেই গ্রহণ করেছে এবং কলখজের কল্যাণে কৃষকের জীবনের মান অনেকভাবে উন্নত হয়েছে। মিস্টার ক্রুশ্চভের আমলে পূর্বের অনেকগুলি অসুবিধা দূর হয়ে গেছে বলে বর্তমানে চাষীও কলখজকে আরো আগ্রহে গ্রহণ করতে সুরু করেছে। ডেনমার্ক, বুলগেরিয়া এবং যুগোস্লাভিয়ার অভিজ্ঞতার সংগে সোভিয়েট রাষ্ট্রের অভিজ্ঞতার তুলনা করে ভারতবর্ষে যদি আমরা স্বেচ্ছামূলকভাবে কো-অপারেটিভ ফার্মের প্রবর্তন করতে পারি, তবে ভারতবর্ষের কৃষিতে যে বিস্ময়কর প্রগতি দেখা দেবে, একথা নিঃসন্দেহ।
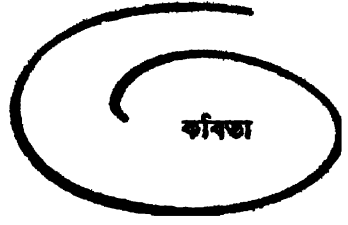
# নাগর

**অরুণকুমার সরকার**

যার আসে, সহজেই আসে। আমার কেবল
কান পেতে অপেক্ষায় থাকা। যদি আসে
খিলখিল হাসিতে, রঙ্গে। নাচি তাই। কিংবা যন্ত্রণার
গোঙানিতে। মাথা ঠুকি। যদি আসে স্মৃতির বন্যায়
এলোচুল অন্ধকারে। ভাবি। যদি আমারই দেহের
কবোষ্ণউত্তাপে আসে ম্লান জ্যোৎস্নায় নিশি-পাওয়া
উৎসুক বিহঙ্গ অঙ্গ। পেতে রাখি বাসশয্যা। আমার কেবল
অপেক্ষা, অপেক্ষা শুধু, অপেক্ষায় থাকা। যদি আসে।

আসে না। গাছের ছায়া দেয়ালে ক্রমশ
গাঢ়তম হয়, কাঁপে। তারাগুলি স্পষ্ট, স্পষ্টতর।
দরজা জানলা খুলে তবু অপেক্ষায় থাকি যদি আসে।
আসে না হরবোলা ধ্বনি, বহুরূপী শব্দের মিছিল।
আমার ব্যাকুল দৃষ্টি দূর থেকে দূরে হেঁটে যায়।
দ্যাখে সবই মৌন, মূক, স্তব্ধ, নির্বিকার। সে আসে না।

# পোষ্টার

**অরুণ ভট্টাচার্য**

পুরনো প্রাচীরপত্রে নানা রঙ-এ উজ্জ্বল নক্সায়
সাম্প্রতিক ইতিহাস রুদ্ধগতি।

দুরন্ত গরমে,

কলকাতার রাস্তাঘাটে নোংরা জল, বাতাবী লেবুর
শুক্‌নো খোসা, ছিন্নপত্র, রৌদ্র, ঘাম, ধোঁয়ায় নরকে
মিলেমিশে একাকার। কয়েকটা কুকুর এককোণে
মুখ থুবড়ে পড়ে আছে। অর্থাৎ, নিরবলম্ব দিন
স্বপ্নসৌধ ভাঙ্গাগড়া, পোষ্টারের রঙিন বিলাস
সনাতন ইতিহাসে প্রাগুক্তির সমর্থন মেলে।

মানুষের লোভ ঈর্ষা, রাজনীতি, দ্বন্দ্ব ও বিষাদ,
অসুস্থতা, পাপ পুণ্য প্রাত্যহিক ঘটনাসংস্থান;
অথচ এক টুক্‌রো ঘরে চন্দ্রোদয়ে নির্মল যামিনী
সুখে দুঃখে সমভাবে ঐশ্বর্য বিলাবে চিরদিন।

দেওয়ালের চারিপাশে কাঁটাতার, রজনীগন্ধার
অপরূপ সহবাসে যৌবনের দিনগুলি যায়॥

# কাঁদার অপেক্ষা রাখে না

আবুল হোসেন

বাঁধের বেড়া ভেঙে চমকে যায় ট্রেন
অথবা বা সে অদৃশ্য শূন্যে পাড়ি দেয়া জেট প্লেন
দেখতে দেখতে গাঁয়ের খোলা মাঠ ছেড়ে
নিয়ে গেল চিলের মত ছোঁ মেরে
মসজিদ থেকে বুড়ো ইমামকে
স্কুলের ডেসকো, মাদ্রাসার চাল
ইয়াসিনের মা-মরা ছেলে মেয়ে, বকরীর ছাল
প্রেসিডেন্টের জরু গরু তামাম মালপত্তর
আমসত্ত্বর হাঁড়ি, লবণের গুদাম।

যার বাড়ি আছে যার নেই
আত্মীয় স্বজন লোক লস্কর নিয়ে যে নাচে ধেই ধেই
আর যার শূন্য ঘর
টাকার কুমীর আর ন্যাংটো নটবর
লেঠেল জোয়ান আর তালপাতার সেপাই
কেউ পেলনা রেহাই।

অন্ধকারে দেশলাই খুঁজি
আচমকা মাড়াই বুঝি
ভিজে ঠাণ্ডা চুল
কখনো কানের দুল
শাড়ীটা, লুঙ্গিটা
মুখ থুবড়ে পড়ে আছে সারা ভিটা
হাত ঠেকে তেলানো সাম্পানে
দুমড়ানো ছাদের টিন গাছের গুঁড়ি
শুয়ে আছে বালি মুড়ি দিয়ে চরে
ফিরবে কে আর ঘরে?
ডাক ছেড়ে কাঁদবো?
বুকে তাবিজ বাঁধবো?
পাঁচ পয়সার সিন্নি দেবো মসজিদে?
ফকির খাওয়াব তিন বেলা
হুজুরের পা-বন্দী চেলা।

# ক্লান্তি থেকে

## মণীন্দ্র রায়

তখন রাত্রিকে আমি শোয়ালাম আমার পাশেই।
তখন স্বপ্নের গায়ে হাত রেখে অনুচ্চারে বলি :
এই বুক, এই মুখ, জঙ্ঘা-উরু রয়েছে তো সেই,
অন্ধ-হস্তিদর্শনের মতো তবু কেন সে সকলি।

মনের ওপিঠে মন, তারো নিচে কিম্মাকার ছায়া।
শত আলো-অন্ধকার সে জগতে ত্রিকোণ জ্যামিতি।
গগনেন্দ্র ঠাকুরের ছবি যেন তার তীক্ষ্ম মায়া।
কোন সূত্রে গাঁথো বলো সে বিচ্ছিন্ন পাতালের স্মৃতি?

ক্লান্ত, ক্লান্ত। বেজে যায় প্রহরের জগঝম্পগুলি।
হাসি-অশ্রু-উত্তেজনা স্নায়ুশিরা করে বিস্ফারিত।
এর স্পর্শ, ওর নাম, অর্ধ সুর, বর্ণহারা তুলি—
তীর্থের ভিখারী, আহা, সব পুণ্য করে-যে ধিকৃত!

তখন রাত্রিকে আমি পান করি প্রতি রোমকূপে;
তখন পুতুল আর প্রতিমাকে মিশাই কাদায়।
উন্মাদের এ সংসারে মহামূল্য সব ভগ্নস্তূপে
সানন্দে লেহন করি কামনার আদিম জিহ্বায়।

রোপিত, রোপিত আমি, উর্ধ্বমূল অধোশাখ-তরু!
শূন্যতার আলিঙ্গনে খোলে নগ্ন জ্যোতির নির্ঝর।
বাজায় বিচ্ছিন্ন মনে হৃৎস্পন্দের একাগ্র ডমরু।
আবার সৃষ্টির কেন্দ্রে জন্ম আমি, অক্লান্ত ঈশ্বর॥

# সাহিত্য ও বিজ্ঞান

অমলেন্দু বসু

'এ যুগের চাঁদ হ'ল কাস্তে'। মানে, রাজনীতির হাওয়া লেগেছে চাঁদের গায়ে। তাতে কাব্যের কোনো প্রচণ্ড লোকসান হয়নি বরং কাব্যপ্রতীকের ভাণ্ডারে দুয়েকটি নতুন সম্পদ জমেছে। পক্ষান্তরে বিজ্ঞানের হাওয়া লেগে কাব্যের কিছু বিপদ ঘটেছে বৈকি! স্মরণ করুন রবর্ট ব্রাউনিং 'ওঅন্ ওঅর্ড মোর্' কবিতার শেষে স্ত্রীর উদ্দেশে কী ভাবে প্রেম নিবেদন করেছিলেন—

You—yourself my moon of poets!
Ah, but that's the world's side, there's the wonder,
Thus they see you, praise you, think they know you!
There, in turn I stand with them and praise you.

* * *

But the best is when I glide from out them,
Cross a step or two of dubious twilight,
Come out on the other side, the novel
Silent silver hights and darks undreamed of,
Where I hush and bless myself with silence.

আধুনিক কবির পক্ষে এমন আশ্চর্য ছত্র রচনা করা আর সম্ভব নয় কেননা সাম্প্রতিক বিজ্ঞান-প্রত্যয়ে তাঁর কাব্যপ্রত্যয় আহত হয়েছে। এই অতুলনীয় ছত্র কয়টির রূপকল্প শুরু হয়েছে এইভাবে : কবিপ্রিয়া যশস্বিনী কবি, অন্য কবিরা যেন নক্ষত্র মাত্র, তাঁদের মাঝখানে কবিপ্রিয়া যেন চাঁদ। এ কথা বলার পরে ব্রাউনিংয়ের কল্পনা আরো এগিয়ে গেল। চাঁদের সঙ্গে যশস্বিনী কবির একটি চমৎকার সাযুজ্য পাওয়া গেল। সবাই জানেন চাঁদের মাত্র একটি গোলার্ধ পৃথিবীর লোকের দর্শনসাধ্য, অন্য গোলার্ধ আমরা দেখতে পাই না। যশস্বিনী কবির ব্যক্তিত্বেরও যেন তেমনি দুটি অংশ। তাঁর যশোমণ্ডিত কবিস্বরূপ যেন তাঁর ব্যক্তিত্বের আমদরবার, চাঁদের সর্বজনদৃষ্ট দিক। কবির অন্য সব গুণগ্রাহীর মতো ব্রাউনিংও চাঁদের এইদিক দেখে মুগ্ধ, এলিজাবেথ ব্যারেটের অন্তরঙ্গ প্রেমময়ী ব্যক্তিত্ব, কেবল তাঁর প্রেমিক ব্রাউনিংয়ের জনই, সে-ব্যক্তিত্বের খাস দরবারে শুধু ব্রাউনিংয়েরই আসন।

আজকের দিনে ব্রাউনিং কি এমন ছত্র লিখতে প্যরতেন? না কি বুদ্ধদেব বসুই ব্রাউনিংয়ের অপ্রচ্ছন্ন অনুকরণে এমন ছত্র আবারও লিখবেন?—

এ কি চাঁদেরই বিপরীত মুখ, গ্যালিলিওর অজ্ঞাত,
রবীন্দ্রনাথেরও অজ্ঞাত?

('নতুন পাতা')

চাঁদের মুখফেরানো দিক তো আর মানুষের অজ্ঞাত নয়! রুষ বৈজ্ঞানিকগণ কি সেই অ-দেখা দিকের ফটোচিত্র তৈরি করেন নি? ক্রমশঃ এমন তো হবে যখন সে-অদেখা দিক অ-দেখা যদিও থাকে, অজ্ঞাত নিশ্চয় থাকবে না, আর অজ্ঞাত না থাকলে, অনবলোকিত নিভৃতের নিবিড়

অন্তরঙ্গতা যদি তার হারিয়ে যায়, তা'হলে ব্রাউনিংয়ের চিত্রকল্পটির যাথার্থ্য সাঙ্গ হবে না কি?

কাব্যপ্রত্যয়ের উপরে আধুনিক বিজ্ঞানের বিপ্লবী, প্রায় বিধ্বংসী অভিসংঘাত যে কতটা গুরুতর তা' বুঝতে পেরেছিলেন বলেই কীট্‌স্ বলেছিলেন—

Do not all charms fly
At the mere touch of cold philosophy?
There was an awful rainbow once in heaven:
We know her woof, her texture; she is given
In the dull catalogue of common things.
Philosophy with clip an Angel's wings,
Conquer all mysteries by rule and line,
Empty the haunted air, and gnomed mine—
Unweare a rainbow.

(*Lamia* II, 229-37)

এ-ছত্রগুলির তর্জমা করা আমার সাধ্য নয় কিন্তু এখানে মূল বক্তব্য যে বৈজ্ঞানিক বিশ্লেষণ ও বিচারের ফলে আকাশ ও পাতাল থেকে অন্তর্হিত হয়েছে যক্ষ, রক্ষ, কিন্নরগণ, জগতের যাবতীয় জ্ঞানাতীত রহস্য স্তূপীকৃত হয়েছে মামুলি ঘটনার নিরাবেগ তালিকায়, হারিয়ে গেছে আকাশের মহান ইন্দ্রধনু, জীবনের মোহময় রূপ উবে গেছে বিজ্ঞানের শীতল ছোঁওয়া লেগে। (কীট্‌স্ এখানে ফিলসফি বলতে বুঝেছেন বিজ্ঞান। এককালে ফিলসফি ছিল দু'রকমের, natural philosophy অর্থাৎ আজ যাকে আমরা natural sciences বলি, সেই পদার্থবিদ্যা, প্রাকৃতিক ঘটনাবলীর অধ্যয়ন বিচার ও চিন্তন। আর ছিল moral philosophy অর্থাৎ যাকে আজকাল আমরা বলি philosophy, দর্শনশাস্ত্র। বিজ্ঞান অর্থে philosophy কথাটির প্রয়োগ বহু পুরাতন। বাঙলায় যাকে বলি স্পর্শমণি, পরশপাথর, ইংরেজিতে তাকে বলা হ'ত Philosopher's Stone, দার্শনিকেরা ব্যবহার করতেন বলে নয়, বরং বৈজ্ঞানিকেরা সে-পাথর নিয়ে কাজ করতেন সেজন্য, অবশ্য বৈজ্ঞানিক বলতে তখনকার দিনে যাদেরকে বোঝাতো। কীট্‌স্ philosophy বলতে বিজ্ঞান বুঝেছিলেন তার আরো প্রমাণ পাই যখন পড়ি যে কীট্‌স্ ও চার্ল্‌স্ ল্যাম্ একদা সাব্যস্ত করেছিলেন যে Newton had destroyed all the poetry of the rainbow by reducing it to the prismatic colours, অর্থাৎ ইন্দ্রধনুর বর্ণালী মৌলিক বর্ণে বিশ্লেষিত করে নিউটন্ তার কাব্যগুণ নষ্ট করেছেন। এ ছাড়া, কীট্‌সের বন্ধু ও এককালীন গুরু লী হাণ্ট্ এই ছত্র কয়টি সম্বন্ধে যে মন্তব্য করেছিলেন তা থেকেও প্রমাণ হয় যে ফিলসফি বলতে কীট্‌স্ বুঝেছিলেন বিজ্ঞান।)

কীট্‌স্ দেখতে পেয়েছিলেন বিজ্ঞানে ও শিল্পে বৈপরীত্য। শিল্প charming, ইন্দ্রজালবিস্তারী, মোহময় তা'র রূপ, তাতে চিত্তে আবেগ জন্মে। অপরপক্ষে, বিজ্ঞানের তুহিনশীতল স্পর্শে কাব্যের ও শিল্পের মোহন রূপ অন্তর্হিত হয়। কীট্‌সের তুলনায় অনেক নিরেশ কবি ছিলেন ক্যাম্‌বেল, তিনিও 'রেইন্ বো' অর্থাৎ ইন্দ্রধনু শীর্ষক কবিতায় অনুরূপ কথা বলেছেন—

Triumphal arch that fills the sky
When storms prepare to part,

I ask not proud Philosophy
To teach me what thou art.
* * *
When science from Creation's face
Enchantment's veil withdraws,
What lovely visions yield their place
To cold material laws!

আসন্ন ঝটিকার পথে নির্মিত হয়েছে ইন্দ্রধনুর বিজয়-তোরণ, তার স্তুতি গেয়েছেন কবি আর সেই সঙ্গে ক্ষোভ প্রকাশ করেছেন যে বিজ্ঞানের জড়জাগতিক কানুনের ফলে কত অপরূপ দৃশ্য আজ হারিয়ে গেছে, সঙ্কুচিত হয়েছে জাদুর আবরণ। বিজ্ঞান ও শিল্প-কল্পনার বৈষম্য সম্বন্ধে বোধ হয় সবচেয়ে বেশি সচেতন ছিলেন ওয়র্ডস্বোয়র্থ। এক প্রবন্ধের পাদটীকায় তিনি বলছেন যে খাঁটি বিপরীত হচ্ছে Poetry and Matter of Fact and Science, অর্থাৎ কাব্য একদিকে, অন্যদিকে প্রত্যক্ষের ও বিজ্ঞানের তথ্য। তাঁর "প্রিলিয়ুড" নামক বিখ্যাত আত্মজৈবনিক কাব্যগ্রন্থের একাদশ সর্গে বলছেন—

There comes a time when Reason, not the grand
And simple Reason, but that humbler power
Which carries on its no inglorious work
By logic and minute analysis
Is of all Idols that which pleases most
The growing mind.

এই ধরনের তারতম্যই করেছিলেন পরবর্তী যুগের কবি টেনিসন্—

Who loves not knowledge? Who shall rail
Against her beauty? May she mix
With men and prosper! Who shall fix
Her pillars? Let her work prevail.
* * * *
Let her know her place;
She is the second, not the first.
A higher hand must make her mild,
If all be not in vain; and guide
Her footsteps, moving side by side
With wisdom, like the younger child:
For she is earthly of the mind,
But wisdom heavenly of the soul.
(*In Memoriam*, CXIV)

দুই কবি-ই তারতম্য করেছেন দু'রকম অন্তঃশক্তিতে, একটি মহৎ ও অমিতপ্রভব, অপরটি সীমান্বিত ক্ষুদ্রবিচারী। ওয়র্ডস্বোয়র্থ বলছেন 'রীজ্‌ন্' বা চিৎশক্তির একটা দিক আছে সেটি মানুষের সর্বশ্রেষ্ঠ অন্তঃশক্তি, সে-শক্তি আসলে সৃষ্টিশীল প্রতিভা, মানুষের পক্ষে তা' এক

দেবোপম সম্পদ। কিন্তু ‘রীজ্‌ন্‌’ বলতে অন্য রকম চিৎশক্তিও বোঝা যায়, সেটি মানুষের বিচার বিশ্লেষণের ক্ষমতা, বিজ্ঞানে ও ন্যায়শাস্ত্রে পারদর্শিতা। এই দ্বিতীয়োক্ত শক্তিকে ওয়র্ডস্বোয়র্থ তুচ্ছ করছেন না কিন্তু বিনা দ্বিধায় বলছেন যে সৃজনীপ্রতিভার তুলনায় এ হীনশক্তি। টেনিসন্‌ যে উঁচু শক্তি ‘উইস্‌ডম্‌’ (প্রজ্ঞা) ও হীন শক্তি ‘ন্‌লেজ্‌’ (জ্ঞান, বোধ হয় বিজ্ঞান বলাই ভালো) এ-দুয়ের মধ্যে তারতম্য করেছেন তার ভেতরে খানিকটা অপার্থিব ঐশ্বরিক শক্তি, ধর্মীয় অন্তর্দৃষ্টি ও জাগতিক ব্যাপারে জ্ঞান, এ-দুয়ের তারতম্য নিহিত বটে, কিন্তু এই অপার্থিব অন্তর্দৃষ্টিও বস্তুত সৃষ্টিশীল প্রতিভাশালী শৈল্পিক কল্পনার নিকট-গোত্র। অর্থাৎ, কীট্‌স্‌, ল্যাম্‌, ক্যাম্‌বেল্‌, ওয়র্ডস্বোয়র্থের মতো টেনিসন্‌ও অনুভব করেছিলেন যে বৈজ্ঞানিক চিন্তাপদ্ধতির সঙ্গে কাব্যের সমন্বয়ী কল্পনার কোথাও একটা সংঘর্ষ বিদ্যমান।

অথচ বিজ্ঞানে ও কাব্যে এমন কোনো বৈপরীত্যের ধারণা চিরকালই কিছু ছিল না। বিজ্ঞান বলতে যদি বুঝি পদার্থজগতের তথ্যনিষ্ঠ বিশ্লেষণপন্থী সম্যক জ্ঞান, তা'হলে তেমন জ্ঞান নিয়ে মানুষ ব্যাপৃত থেকেছে অতি পুরাতন কাল থেকেই আর যদিও কোনো কোনো জড়-জাগতিক জ্ঞান হয়তো গোড়ায় গোড়ায় মানুষের অভ্যস্ত ধারণা ও অভ্যস্ত অনুভূতিগুলিকে পীড়া দিয়েও থাকে, তবুও অচিরেই এইসব নূতন জ্ঞান ও ধারণা অনতিআয়াসে মিশে গেছে শিল্পীর সমন্বয়ী প্রতিভার সঙ্গে। এমন কোনো উল্লেখযোগ্য প্রমাণ নেই যে প্রাক্‌-আধুনিক ইতিহাসে কবিচিত্ত ক্লিষ্ট হয়েছে বৈজ্ঞানিক তথ্য ও ধারণার নিষ্পেষণে। বিজ্ঞান যা পদার্থ-জগতের জ্ঞান প্রাচীন কবির কল্পনাশক্তিকে খর্ব করেনি কখনো, যদিও হয়তো অনেক সময়ই সে-শক্তিকে উদ্দীপিতও করেনি। ইওরোপীয় সাহিত্যে লুক্রেশিয়স্‌ ও দান্তের কাব্যে তৎকালীন বৈজ্ঞানিক চিন্তা স্বচ্ছন্দে স্থান পেয়েছে, কাব্যে ও বিজ্ঞানে কোনো সংঘাত হয়নি। ইংরেজ কবি চসর্‌ ও মিল্‌টন্‌ সমসাময়িক কোনো কোনো বৈজ্ঞানিক চিন্তার সঙ্গে সুপরিচিত ছিলেন, কোনো কোনো চিন্তায় তাঁদের কবিকল্পনা উৎসাহ পেয়েছিল। (স্মরণ করুন “প্যারাডাইস্‌ লস্‌ট্‌” মহাকাব্যে গ্যালিলিওর টেলিস্‌কোপ্‌ নিয়ে কী সুন্দর উপমা প্রস্তুত করেছেন মিল্‌টন্‌!) ভারতীয় কাব্যের প্রাচীনতম যুগেও সাযুজ্য ছিল কাব্যে ও বিজ্ঞানে, তৎকালীন বিজ্ঞানে। ঐতরেয়োপনিষদে (যথা, ১।১।১, ২।১।২, ২।১।৩) ও প্রশ্নোপনিষদে (৩।৬, ৩।৭) জন্ম ব্যাপারের ও মানবদেহে নাড়ীসমূহের যে-বর্ণনা দেওয়া হয়েছে, তৎকালীন জ্ঞানের ভিত্তিতে সে সব সূক্তগুলি কাব্যগুণমণ্ডিত। মহাভারত তো সে যুগের যাবতীয় দার্শনিক সামাজিক বৈজ্ঞানিক ধারণার অগাধ ভাণ্ডার বিশেষ। কাব্যের সঙ্গে বিজ্ঞানের বিরোধিতা অবশ্যম্ভাবী নয়, কীট্‌সের প্রশ্নসত্ত্বেও। বিরোধিতার সপক্ষে কোনো যুক্তি নেই। বিজ্ঞান মানে জগৎ সম্বন্ধে জ্ঞানলাভের কতকগুলি বিশেষ পদ্ধতি ও পরীক্ষণ ও নিরীক্ষণের কতকগুলি উপায়। আধুনিককালে এ সব পদ্ধতি ও উপায় সংখ্যায় বেড়েছে, তাদের কার্য-প্রণালীও জটিল থেকে জটিলতর হচ্ছে, কিন্তু সুপ্রাচীন কালেও বৈজ্ঞানিক কাজকর্ম মানুষের অজ্ঞাত ছিল না। বাঙলার প্রাচীন কাব্যে—খনা ও ডাকের বচনে, কাহ্নপাদের চর্যাশ্লোকে—তৎকালীন বৈজ্ঞানিক ধারণার (যত স্থূল ও অযথার্থ হোক না কেন সে সব ধারণা) কাব্যীভূত প্রকাশ হয়েছে বৈ কি! এহেন কাব্যীভূত প্রকাশ যে সম্ভব হয়েছে, বাঙলা কাব্যে অথবা অন্যান্য বহু

কাব্যে, তার কারণ স্বচ্ছ। সেকালে জ্ঞানের জাতিভেদ ছিল না। এটি বৈজ্ঞানিক ওটি অবৈজ্ঞানিক, এটি ন্যাচ্‌রল্‌ ওটি সুপরন্যাচরল্‌, কোনো জ্ঞানের গ্রাহ্যতা ও প্রামাণ্যতা বেশি অন্য জ্ঞানের কম, এমন কোনো তারতম্য কেউ মানতেন না। তা'ছাড়া যদিচ এক চিন্তায় ও অপর চিন্তায় প্রচণ্ড প্রভেদ হতে পারত যেমন প্রশ্ন উঠতে পারত জগৎকারণের পরম সত্য কী সে-বিষয়ে (অর্থাৎ সাংখ্যদর্শনে, বৈশেষিক দর্শনে বা অন্যান্য দর্শনে আলাদা আলাদা সিদ্ধান্তের যে-অবতারণা) তবুও জ্ঞানার্জনের পন্থা সকলেরই ছিল এক ধরনের ও মানবিক চৈতন্য সর্ব দর্শনেই তুল্যমূল্য। সাংখ্যবাদী বা বৈদান্তিক কেউ-ই যার যার চিন্তার ফলে নিজ নিজ সাংসারিক আবেগ ও অনুভূতিগুলি থেকে ভ্রষ্ট হননি। অর্থাৎ সবারই জীবনাদর্শে ও জীবন-পদ্ধতিতে সঙ্গতি ছিল, তাঁদের চিন্তায় ও কর্মে, মনীষায় ও অনুভূতিতে ছিল সাযুজ্য। সুতরাং কাব্যে বা শিল্পে যে-মানস রূপায়িত হয়েছে সে-মানস একটি সুডৌল, সর্বাঙ্গসুষম, সংতুলিত, integrated ও homogeneous মানস, আধুনিককালের শতধাবিচ্ছিন্ন সংক্ষুব্ধ সংগ্রামবিক্ষত শিল্পমানস নয়। এমন কথা বলছি না যে সেকালের শিল্পীমানস অবশ্যই একালের শিল্পীমানসের তুলনায় মহত্তর ছিল। (এ হেন সামান্যোক্তি নিতান্ত স্থূল-চিত্ত একদেশদর্শিতার পরিচায়ক, সুতরাং সম্বিবেকী সমালোচকের পক্ষে সর্বতোভাবে অগ্রাহ্য।) আমার প্রতিপাদ্য যে সাহিত্যের ইতিহাসে বহুযুগ যাবত বৈজ্ঞানিক প্রত্যয়ে ও শিল্পায়নী কল্পনায় কোনো বৈপরীত্য বা সংঘাত বিদ্যমান ছিল না। যিনি বিজ্ঞানচর্চা করতেন শিল্পের পথ তাঁর কাছেও সুগম ছিল, যিনি ছিলেন শিল্পী তিনি বৈজ্ঞানিক ধারণার সঙ্গে নিজ শিল্পভাবনার কোনো দ্বন্দ্বে বিক্ষুব্ধ হননি। সেকালের সৃজনী মানস ছিল balanced, সংতুলিত। রোমক নাট্যকার টেরেন্স্‌ বলেছিলেন : সমগ্র মানবতাই কাব্যের এলাকায় পড়ে; যে-বিষয় মানুষ সংক্রান্ত তা' কখনো কাব্যের জগতে ভিন্‌দেশী হ'তে পারে না। বিজ্ঞানে মানবিক জীবনের একটি অংশ প্রোজ্জ্বল, অতএব বিজ্ঞানে ও কাব্যে কোনো ভয়াবহ বিপরীত-ধর্মিতা সম্ভব নয় আর সাহিত্যের দীর্ঘ ইতিহাসে তেমন কোনো বৈষম্য প্রকাশিত হয়নি। সে-বৈষম্য আধুনিক সাহিত্যেরই বিকার।

কাব্যভাবনার সঙ্গে বিজ্ঞানের বৈষম্য শুরু কবে থেকে? এ-বৈষম্য ইওরোপীয় সাহিত্যে দেখা দেয় সতেরো শতকে, উনিশ শতকে তা'র মর্মন্তুদ রূপ প্রতিভাত কিন্তু তবুও তখন অবধি কাব্যে ও বিজ্ঞানে কোনো অলঙ্ঘ্য বিচ্ছেদ দেখা দেয়নি, আর আজ বিশ শতকে সে-বৈষম্যের ফলে যে-অবস্থা দাঁড়িয়েছে তা'তে হয়তো অনতিদূর ভবিষ্যতে এ-দু'য়ের গতিপথ একেবারেই ভিন্ন হ'য়ে পড়বে। আশঙ্কা হয় সে-ভিন্নতা কাব্যের পক্ষেই মারাত্মক হবে।

বিজ্ঞানের আধুনিক সংজ্ঞায় কয়েকটি লক্ষণের প্রতি আমাদের দৃষ্টি নিয়ত আকৃষ্ট হ'য়ে থাকে। বিজ্ঞানের লক্ষ্য সত্য, তথ্য নির্ভর সত্য, পরীক্ষাসাধ্য সত্য, কোনো বিশেষজনের বা বিশেষ দেশকালের সত্য নয়, য়ুনিভার্সল্‌ বা সার্বিক সত্য, এমন কোনো মতবাদ বা তত্ত্ব নয় যা শুধু পরম্পরাপরবশ। বাপ-দাদা বলে এসেছেন বা করে এসেছেন সেজন্যই কোনো বস্তু সত্য, অথবা গুরু থেকে শিষ্যে শিষ্য থেকে প্রশিষ্যে চলে এসেছে ব'লেই কোনো মতবাদ অভ্রান্ত, অথবা স্বর্গত মেঘনাদ সাহা যে-মনোবৃত্তির প্রতি ঠাট্টা ক'রেছিলেন 'সমস্তই ব্যাদে

আছে' তেমন মনোবৃত্তিতে কোনো অপৌরুষেয় গ্রন্থের আপ্তবাক্যকেই ধ্রুব ব'লে মানা, সে-পন্থা বিজ্ঞানের নয়। বিজ্ঞানের 'সিল্‌সিলাহ্‌' অথবা পরম্পরা ভুল থেকে কম ভুলে, অজ্ঞাত ও অসাধ্য থেকে কম অসাধ্যে ও কম অজ্ঞাতে পৌঁছবার এবং অবশেষে নিঃসংশয় প্রমাণ ও পরীক্ষাসাধ্য সত্যে পৌঁছবার ক্লেশময় দুরূহ নিরলস প্রয়াস। বৈজ্ঞানিক সত্য স্বকীয় অভিজ্ঞতা সাপেক্ষ। বৈজ্ঞানিক প্রমাণ কোনো গূঢ় অনিকেত ব্যাপার নয়, রুদ্ধদ্বার গৃহে গুগ্‌গুল ধূপের ধোঁয়ায় আধিদৈবিক মায়ায় ও প্রেরণায় সে-সত্য উদ্‌ভাসিত হয় না, সে-সত্য গণিতের তর্কে ধরা পড়ে, ল্যাবরেটরির পরীক্ষা-যন্ত্রে তার সিদ্ধি। বিজ্ঞানের এ-রীতি প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল সতেরো শতকের ইওরোপে—টাইকো ব্রাহে, কোপার্নিকাস্‌, কেপ্‌লার, রবর্ট বয়ল্‌, গ্যালিলেও, নিউটনের ইওরোপে। এতকাল সত্য ও মিথ্যা ছিল দার্শনিক তত্ত্বে নিহিত, এখন থেকে সত্য মানে হ'ল বৈজ্ঞানিক সত্য, অন্য সব কিছু কপোলকল্পনা। বেকন্‌ বললেন, সবার উপরে dry light of reason, যুক্তির অনার্দ্র আলোক, সে-আলোক নৈর্ব্যক্তিক, সে-আলোকে ব্যক্তিবিশেষের সেণ্টিমেণ্ট বা আবেগের স্যাঁতসেঁতে রামধনু খেলে না। এই সত্যনিষ্ঠ, পরীক্ষাপ্রমাণতথ্যনিষ্ঠ, নির্মম তন্ময় জ্ঞানসাধনায় নিযুক্ত হ'লেন সতেরো শতক থেকে শত সহস্র বিজ্ঞানকর্মী আর এই আবেগ-অনার্দ্র নূতন দৃষ্টিভঙ্গীর ফলে মানুষের চিন্তাধারা যে কী পরিমাণে বদলে গেল তা'র একটি সুন্দর উদাহরণ পাই অধ্যাপক বেস্‌ল্‌ উইলির গ্রন্থের ("দি সেভেন্‌টিন্‌থ্‌ সেঞ্চুরী ব্যাক্‌গ্রাউণ্ড") প্রথম পরিচ্ছেদে যেখানে motion বা গতি সম্পর্কে মধ্যযুগীয় সন্ত টমাস্‌ অ্যাকোয়ানাস্‌ এবং সতেরো শতকী গ্যালিলেওর প্রত্যয়ের প্রভেদ বর্ণিত হয়েছে। সতেরো শতকের পূর্বে বিজ্ঞানকর্মীর যে একটা বিশিষ্ট দৃষ্টিভঙ্গী ছিল, স্বতন্ত্র জ্ঞান লক্ষ্য ছিল, এমন বলা যায় না কিন্তু এখন থেকে বিজ্ঞানকর্মী নিজ কর্মের উদ্দেশ্য ও মূল্য সম্বন্ধে পুরোমাত্রায় অবহিত হলেন, আর যেহেতু সত্যানুসন্ধিৎসাই তাঁর কাম্য সেজন্য বিজ্ঞানবহির্ভূত অন্য সব জ্ঞানপন্থাকেই তিনি মনে করলেন কপোলকল্পনা। এ যুগে ফ্রান্‌সিস্‌ অস্‌বর্ণ নামক জনৈক ইংরেজ ভদ্রলোক তাঁর ছেলেকে উপদেশ দিয়ে চিঠি লিখেছিলেন (১৬৫৬ খৃষ্টাব্দে) যে ছেলে যেন গণিত ও বটানি ভালোমতো অধ্যয়ন করেন কেন না বিশ্ববিদ্যালয়ের অন্যান্য প্রচলিত বিদ্যাগুলি 'but Lumber and Formes' অর্থাৎ গুদোমঠাসা মাল আর বাঁধিগৎ মাত্র। যাকে আজকাল বলা হয় empirical truth, পরীক্ষানির্ভর ইন্দ্রিয়গোচর সত্য, সে-সত্যের সপক্ষে তুচ্ছ হ'ল অতীন্দ্রিয় সত্যের উপলব্ধি, আর তা'র ফলে যেমন বিজ্ঞানের কল্যাণে টেক্‌নলজি দ্রুত বেড়ে উঠতে লাগল, দ্রব্যোৎপাদনপদ্ধতি হ'তে থাকল দক্ষ থেকে দক্ষতর, তেমনি জীবনযাত্রার মান উন্নত হ'তে থাকল আর অসংখ্য বিষয়ে মানুষের ঘর গেরস্থালী হ'য়ে উঠল স্বচ্ছন্দ নিরাপদ। সাধারণ মানুষেরও চিন্তার কাঠামো খানিকটা বদলালো। আমরা কথায় কথায় দোহাই দিতে লাগলাম scientific point of view-এর, scientific outlook-এর, বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গীর। আপ্তবাক্যে অবস্থা শিথিল হ'তে হ'তে কবে যেন একেবারেই উবে গেল, ভক্তিমার্গের বদলে যুক্তিবাদ প্রবল হ'ল জীবনে।

এই যে অতীন্দ্রিয় জ্ঞান খারিজ করে' ইন্দ্রিয়গম্য তথ্যপ্রতিষ্ঠ বিজ্ঞানকে মহত্তর মূল্য দেওয়া গেল তার পরিণাম হ'ল গভীর ও দূরপ্রসারী। এই পরিবর্তনে সবচেয়ে বেশি ঘায়েল হ'ল মানব-সভ্যতার দু'টি প্রধান অঙ্গ—ধর্ম ও কাব্য। কাব্য ও ধর্ম দুইয়েরই মূলে ভিত্তি 'ইন্‌ট্যুশন্‌'-এ স্বজ্ঞায়, যুক্তির অতীত বোধিতে। ধর্মের ও কাব্যের সিদ্ধি যুক্তিতে আবদ্ধ নয়, যুক্তির সীমানার বাইরে উজ্জ্বল কল্পনা ও অনুভূতির তুরীয় শক্তিতে এরা সার্থক।

অন্তিম বিচারে এদের প্রতীতি অলৌকিক, অন্তত লোকাতীত। সতেরো শতকে যখন ফরাসী দার্শনিক দেকার্তে বিজ্ঞানের ভিত্তিতে নূতন দর্শন প্রস্তুত করলেন তখন দৃঢ়ভাবে বললেন যে একমাত্র তাকেই সত্য বলা যাবে যা' গাণিতিক তর্কশৃঙ্খলায় পরিচ্ছন্নভাবে চিন্তা করা যায়। বেসল্ উইলি লিখছেন : After Descartes, poets were inevitably writing with the sense that their constructions were *not true* and this feeling robbed their work of essential seriousness (দেকার্তের পর থেকে কবিদের লেখায় এই অনতিক্রম্য ধারণা প্রকাশ পেতে থাকলো যে তাঁদের রচনা সত্য নয়, অনৃতভাষণ মাত্র, আর এ-ধারণার ফলে তাঁদের রচনার গাম্ভীর্য নষ্ট হ'য়ে গেল।) সমসাময়িক ইংরেজ দার্শনিক লক্ বললেন যে কাব্য থেকে আমরা পাই কেবল pleasant pictures and agreeable visions (মনোহর চিত্র আর নয়নতৃপ্তিদায়ক ছায়াদৃশ্য) অথচ এসব চিত্র আসলে সত্যে ও যুক্তিতে প্রতিষ্ঠিত নয় অতএব অলীক, আষাঢ়ে গল্প মাত্র। কবিতা খুব সারবান পদার্থ কিছু নয়, ক্ষণিকের খেলনা, আমোদ-প্রমোদের সামগ্রী। যুক্তিবাদী দার্শনিকদের এবম্বিধ বিচারের বোধহয় চরম উক্তি মিলবে উনিশ শতকের গোড়ায় লেখা বিখ্যাত ইউটিলিটেরিয়ান (উপযোগবাদী) দার্শনিক জেরেমি বেন্থামের "র‍্যাশনাল্ অব্ রিওঅর্ড" গ্রন্থে—

> It is not proper to regard the arts and sciences of amusement as destitute of utility ; on the contrary ; there is nothing the utility of which is more incontestable. To what shall the character of utility be ascribed, if not to that which is a source of pleasure? All that can be alleged in diminution of their utility is, that it is limited to the excitement of pleasure: they cannot disperse the clouds of grief or of misfortune. They are useless to those who are not pleased with them: they are useful only to those who take pleasure in them.
>
> Prejudice apart, the game of push-pin is of equal value with the arts and sciences of music and poetry. If the game of push-pin furnish more pleasure, it is more valuable than either............Indeed, between poetry and truth there is a natural opposition: false morals, fictitious nature. The poet always stands in need of something false......Truth, exactitude of every kind, is fatal to poetry.

(এমন মনে করা সঙ্গত হবে না যে আমোদদায়ক শিল্পগুলি নিতান্তই উপযোগ-রহিত। বরঞ্চ অন্য কোনো ব্যাপারেই এমন নিঃসংশয় উপযোগ পাওয়া যায় না। যে বস্তু প্রমোদের উৎস তাকেই যদি উপযোগসম্পন্ন মনে না করি তা'হলে করব কাকে? যদি বলতে হয় যে এদের [ শিল্পগুলির ] উপযোগ কিছু ক্ষুণ্ণ তা'হলে এইটুকু শুধু বলতে পারি যে-উপযোগ কেবল প্রমোদ-উত্তেজনাতেই সীমাবদ্ধ; শিল্প দ্বারা দুঃখের বা দুর্ভাগ্যের কালো মেঘ অপসরণ করা যায় না। যাঁরা

শিল্পে খুশি না হন তাঁদের পক্ষে শিল্প নির্মূল্য, যাঁরা শিল্পে খুশি হন তাঁদের পক্ষে এর উপযোগিতা সক্রিয়।

কোনো জাতক্রোধে দোষী না হ'য়েও বলা যেতে পারে যে সংগীত ও কাব্যকলা এবং পুশ্পিন্ নামক খেলা সমমূল্য। যদি পুশ্পিন্ খেলায় বেশি প্রমোদ লাভ হয় তা'হলে সে-খেলা সংগীত ও কাব্যের চেয়ে অধিক মূল্যবান। বস্তুত কাব্যে ও সত্যে এক স্বাভাবিক বিদ্বেষ বর্তমান। কাব্যের নীতি মিথ্যা, প্রকৃতি অলীক। কবির পক্ষে সব সময়ই মিথ্যার প্রয়োজন। সত্য বা কোনো-রকম যথার্থ কাব্যের পক্ষে মারাত্মক।)

বেন্থামের কথা বড়ই রূঢ়, কবিতা লক্ষ্মী যদি শিউরে ওঠেন আশ্চর্য হবার কিছু নেই। কিন্তু কবিতার লাঞ্ছনা ইতিপূর্বেও কয়েকবার ঘটেছে। প্লেটোর আদর্শ রাজ্যে কবিদের প্রবেশ নিষিদ্ধ হয়েছিল, তার কারণ নিতান্তই দার্শনিক বটে কিন্তু স্মরণ রাখতে হবে যে প্লেটোর যুক্তিতেও কাব্যের কারবার অলীক বস্তু ও অনৃতভাষণ নিয়েই। কয়েক শতাব্দী পরে সেণ্ট্ অগস্টিন্ কাব্যবিরোধী হয়েছিলেন নিছক নৈতিকতার যুক্তিতে। কিন্তু লক্ থেকে বেন্থাম অবধি যে কাব্যতত্ত্ব প্রচারিত হ'ল, বলা যে হ'ল কাব্যের কোনো বিশেষ মূল্য নেই কাব্য একটা হাল্কা ব্যসন মাত্র, এমন গুরুতর আঘাত কাব্যলক্ষ্মী কখনো পাননি, আর সে-আঘাত থেকে যে আদৌ আরোগ্যলাভ করেছেন এমন কোনো লক্ষণ আমি অন্তত দেখতে পাচ্ছি না। এ-প্রবন্ধের দ্বিতীয় অনুচ্ছেদে আমি মন্তব্য পেশ করেছি যে সতেরো শতকের পূর্বে শিল্পভাবনায় ও বৈজ্ঞানিক চিন্তায় কোনো আবশ্যিক বিরোধ ছিল না। লেওনার্দো দা ভিঞ্চি অ্যানটমি জানতেন, নারীদেহের অপরূপ সুষমাও জানতেন। বিরোধ শুরু হয় সতেরো শতকে আর তার পর থেকে শিল্পভাবনায় ও বৈজ্ঞানিক চিন্তায় যে ক্রমবর্ধমান ব্যবধান সৃষ্টি হতে লাগল তাকেই (ফরাসী লেখক রেমি দ্য গুর্মঁ'র একটি ব্যক্ভঙ্গী প্রয়োগ করে) টি এস্ এলিয়ট বললেন dissociation of sensibility, সংবেদনার ব্যবচ্ছেদ। এলিয়ট বলছেন যে সতেরো শতকের কবিদের (পশ্চিম ইওরোপীয় বিশেষত ইংরেজ কবিদের) এমন এক অন্তঃশক্তি ছিল যার ফলে তাঁরা সর্বজাতীয় অভিজ্ঞতা পরিপাক করে ফেলতে পারতেন, তাঁদের বুদ্ধিতে ও অনুভূতিতে কোনো বিরোধ থাকত না, সুতরাং তাঁদের শিল্পক্রিয়ার সঙ্গে তাঁদের বৈজ্ঞানিক অনুসন্ধিৎসার কোনো ব্যবচ্ছেদ ঘটত না। শিল্প সৃষ্টিকারী সর্বভুক সেই অগ্নি বৈশ্বানরের শক্তি সতেরো শতক থেকে অদৃশ্য হ'য়ে গেল, আজ ইওরোপে দান্তে ও শেক্স্পীয়রের মতো শিল্পী পাওয়া যায় না যাঁর সৃজনীপ্রতিভায় সে-বৈশ্বানর শক্তি বিদ্যমান।

৪

কাব্যের এই প্রচণ্ড সংকট সম্বন্ধে অবহিত ছিলেন কীট্স্ ওয়ার্ড্স্বোয়র্থ টেনিসন্ প্রমুখ উনিশ শতকী কবিগণ। শুধু অবহিত ছিলেন না, এ-সংকটের সমাধানে সচেষ্ট ছিলেন। বস্তুত উনিশ শতকী ইওরোপীয় কাব্যতত্ত্বের মস্ত বড়ো ধারায় দেখতে পাই কাব্যের গৌরব পুনঃপ্রতিষ্ঠার প্রয়াস। পুনঃপ্রতিষ্ঠা হ'ল কী ভাবে? কাব্যবিরোধীদের প্রধান অভিযোগ ছিল যে কাব্যের কারবার মিথ্যা নিয়ে, সত্য মানে তথ্যের ও যুক্তির সত্য, তা'ছাড়া অন্য কোনো সত্য নেই। উনিশ শতকী কাব্যতাত্ত্বিক বললেন, তা' নয়, তথ্যের ও যুক্তির

সত্য তো ক্ষণিকের সত্য আংশিক সত্য স্থানকালপাত্র সাপেক্ষ সত্য। তার চেয়ে মহত্তর সত্য নিরবধিকালে নিঃসীম কল্পরাজ্যে বিচরণ করে, পরাজগতের সেই চির-অম্লান সত্য নিয়েই কবির কারবার। কাব্যের সত্যে ও তথ্যের সত্যে প্রভেদ বিশাল।

কিন্তু পরাজগতের সত্য কবির সাধ্যায়ত্ত হয় কী ভাবে? গোড়ায় এ নিয়ে কিছু অপরিচ্ছন্ন চিন্তা দেখা দিয়েছিল কিন্তু ক্রমে কাব্যতাত্ত্বিক মাত্রেই মানতে লাগলেন যে কবির শিল্পীর একটা বিশেষ অসামান্য অন্তঃশক্তি আছে, সে-অন্তঃশক্তি মামুলি যুক্তির চেয়ে অনেক অনেক গভীরতর মহত্তর উজ্জ্বলতর শক্তি, সে-অন্তঃশক্তিকে বলা হবে কল্পনাশক্তি, ইম্যাজিনেশন্, যাকে গ্রীকরা বলতেন ফ্যান্টাসিয়া আর সংস্কৃত দার্শনিক বলতেন প্রতিভা। ওয়র্ডস্বোয়র্থ-কোল্‌রিজ্-রস্‌কিন এই কল্পনাশক্তির বর্ণনা করলেন। শেলিং-স্পেগেল্-নোভালিস্-কাণ্ট বিশ্বাস করলেন যে সাধারণ যুক্তিবাদের তুলনায় এই প্রতিভাবাদ অনেক বেশি গ্রাহ্য। কবি প্রতিভায় যে লোকের প্রত্যয় কত বেশি ফিরে আসতে লাগল তার চমৎকার দৃষ্টান্ত মেলে জন্ স্টুয়ার্ট মিল্-এর উক্তিতে। মিল্ ছিলেন বেন্থামের আত্মিক উত্তরাধিকারী অথচ তিনিই তাঁর বিখ্যাত আত্মজীবনীতে স্বীকার করেছেন যে কাব্য সম্বন্ধে বেন্থামী সিদ্ধান্ত গ্রাহ্য নয়। বেন্থামবাদ বা উপযোগবাদে মনে করা হয়েছে যে মানুষ কেবল যুক্তিপরায়ণ, মানুষ যে আবেগ ও অনুভূতির জটিল পিণ্ড সে কথা মানা হয়নি আর এই অস্বীকরণের ফলে বেন্থামবাদে মস্ত ত্রুটি থেকে গেছে—এই কথা বললেন মিল্। মিল্ আরো বললেন যুক্তি যেমন সত্যের মার্গ, স্বজ্ঞা বা কল্পনাও তেমনি সত্যপন্থী। কাব্যে এই স্বজ্ঞান কল্পনার প্রকাশ, অতএব কাব্যকে অবহেলা করলে সুখমজুস সত্যে পৌঁছনো যায় না।

ইতিপূর্বেই ইংরেজ রোমান্টিক কবিরা শিল্পকল্পনায় পেয়েছিলেন পরম সত্যের সন্ধান। এখন কাণ্ট ও মিল্-এর মতো লব্ধপ্রতিষ্ঠ তার্কিকদের সিদ্ধান্তের ফলে শিল্প-কল্পনার হৃতগৌরব পুনঃপ্রতিষ্ঠিত হ'ল।

শিল্পকল্পনার গৌরব পুনরুজ্জীবিত হ'ল বটে কিন্তু মূল সমস্যার সমাধান হ'ল কি? কাব্যের ও বিজ্ঞানের, সত্তার ও জ্ঞানের, কল্পনার ও বুদ্ধির যে-বিচ্ছেদ ও বিরোধ জন্মাচ্ছিল, অখণ্ড সত্যের যে-দ্বৈততা শুরু হয়েছিল, যে-ব্যবচ্ছিন্ন সংবেদনায় সতেরো শতক থেকে কবিগণ পীড়িত হচ্ছিলেন, সে-বিচ্ছেদ বিরোধ দ্বৈততার কোনো সুরাহা তো হ'ল না! সতেরো শতকী কবির বুদ্ধিগম্য প্রত্যয়ে ও সহজ অনুভূতিতে কোনো অন্তর্দ্বন্দ্বের বেদনা ছিল না, সতেরো শতকের পর থেকে আজ অবধি ক্রমেই এই অন্তর্দ্বন্দ্বের বিমথিত বেদনায় বিশ্বের শিল্পীচিত্ত শতধা থেকে সহস্রধা, ক্রমেই অধিক থেকে অধিকতর ব্যাকুল এবং বিকল। কবি এবং কাব্যতাত্ত্বিক বলছেন স্বজ্ঞাপ্রোজ্জ্বল কল্পনায় যে-সত্য উদ্‌ভাসিত হয় সে-সত্যই একমেবাদ্বিতীয়ম্ সত্য, তথ্যের সত্য ধ্রুব নয় অতএব সত্যও নয়। কিন্তু একথা মানবেন না কোনো বৈজ্ঞানিক। বিজ্ঞানের সত্য প্রত্যক্ষ প্রমাণ পরীক্ষা নিরীক্ষার সত্য, তথ্যপরায়ণ যুক্তি ও বিচারের সত্য। আধুনিক বৈজ্ঞানিক অবশ্য আঠারো শতকী ও উনিশ শতকী বৈজ্ঞানিকের মতো জড়বাদী নন, তাঁর জগৎ আর সম্পূর্ণ নির্দিষ্ট কার্যকারণ শৃঙ্খলাবদ্ধ জগৎ নয়, হাইসেনবার্গের প্রিন্‌সিপ্‌ল্ অব্ ইন্‌ডিটারমিনেসি'র পরে বিজ্ঞান চিন্তায়ও এক আশ্চর্য ঔদার্যের আবির্ভাব হয়েছে কিন্তু বিজ্ঞানের তথ্য-প্রিয়তা যুক্তিনির্ভরতা তো কিছুমাত্র কমেনি, কমবার কোনো লক্ষণ নেই কারণও নেই। আর এই বিজ্ঞানই দিনের পর দিন সর্ববিজয়ী আলেকজাণ্ডারের মতো নিজ সাম্রাজ্য বাড়িয়ে

চলেছে। আমাদের জ্ঞান বাড়ছে প্রতিদিন, সাংসারিক ও সামাজিক সুখস্বাচ্ছন্দ্য ক্রমেই বাড়ছে, প্রাক্‌বৈজ্ঞানিক যুগের অজস্র বিপদ অসুবিধা থেকে আজ আমরা মুক্ত, পূর্বকালীন অলীক সংস্কার ও প্রত্যয়গুলি ধ্বসে' পড়ছে একে একে, আজকের জগৎ প্রায় বিজ্ঞানময়। অপরপক্ষে কাব্যের ক্ষেত্র ক্রমেই সঙ্কুচিত হচ্ছে, কীট্‌স্‌-এর আশঙ্কা যেন কার্যকরী হয়েছে। যে-পৌরাণিক ও আধিদৈবিক প্রত্যয়ে অজস্র প্রাচীন কাব্য প্রতিষ্ঠিত সে সব প্রত্যয় আজকের দিনে গ্রাহ্য নয়, কোনো আধুনিক কবি আর "ডিভিনা কম্‌মেডিয়া" ও "প্যারাডাইস্‌ লস্ট" লিখতে পারেন না, ওবেরণ-টিটানিয়া-ক্যালিবান্‌-এরিয়েল্‌ আজ অন্তর্হিত। যদি কোনো আধুনিক কবি নেহাৎই পৌরাণিক কাহিনীর আশ্রয় নেন তা'হলে সে-কাহিনীকে প্রতীক-রূপে ব্যবহার করতে হয় যাতে কিনা প্রতীকিত অর্থ চল্‌তি দুনিয়ার প্রত্যয়ের সঙ্গে মানানসই হয়। অর্থাৎ পৌরাণিক কাহিনীটি উপলক্ষ মাত্র, তার মৌল মূল্য নেই। তাছাড়া কাহিনীর প্রাচীন প্রত্যয় ও তার আধুনিক প্রতীকিত প্রত্যয়ের বিভেদে একথাও প্রমাণ হয় যে যে বস্তু কবির কল্পনাকে উদ্দীপিত করেছে সে বস্তুতে তার বুদ্ধির সায় নেই, অর্থাৎ এলিয়ট-কথিত ডিসোসিয়েশ্‌ন্‌ অব্‌ সেন্‌সিবিলিটি, সংবেদনার ব্যবচ্ছেদ প্রবল হয়েছে। আধুনিক কবি যখন কাব্যরচনা করেন তিনি যেন উটপাখির মতো চারিদিককার বুদ্ধিগ্রাহ্য বিশাল জগৎ থেকে মুখ ফিরিয়ে অস্থির বালুকার ক্ষুদ্র কন্দরে মাথা গুঁজে এক কল্পনারাজ্য রচনা করেন। কাব্য যেন এক পলায়ন পন্থা। এই পলায়না-পন্থার দৃষ্টান্ত হিসেবে আমেরিকান কবি হার্ট ক্রেইন্‌-এর একটি উক্তি উদ্ধৃত করব।

> The familiar contention that science is inimical to poetry is no more tenable than the kindred notion that theology has been proverbially hostile—with the *Commedia* of Dante to prove the contrary. That 'truth' which science pursues is radically different from the metaphorical, extra-logical 'truth' of the poet. When Blake wrote that "a tear is an intellectual thing, And a sigh is the sword of an Angel King"—he was not in any logical conflict with the principles of the Newtonian Universe.
>
> (সচরাচর তর্ক ওঠে যে বিজ্ঞান কাব্যের শত্রু, এ-তর্ক তেমনি অগ্রাহ্য যেমন সংশ্লিষ্ট ধারণা যে ধর্মতত্ত্বও কাব্যের শত্রু; দান্তের "কম্‌মেডিয়া"তে উল্টো কথাই প্রমাণ হয়। বিজ্ঞান যে-সত্যের অভিসারী সে-সত্য কবির রূপকাশ্রিত, ন্যায়শাস্ত্রের অগম্য সত্য থেকে সম্পূর্ণত পৃথক। ব্লেইক যখন লিখেছিলেন "অশ্রুবিন্দু মনোভব বস্তু আর দেবদূতরাজের তরবারি হ'ল দীর্ঘশ্বাস", তখন তিনি এমন কোনো কথা বলেননি যা নিউটনীয় ব্রহ্মাণ্ডের বিধিনিয়মের বিরোধী।)

হার্ট ক্রেইনের এ-উক্তির ঠুন্‌কো চালাকি ধরতে বেশি বেগ পেতে হয় না। প্রথম কথা, কেউ একথা বলেনি যে দান্তের জীবৎকালে ধর্মতত্ত্বে ও কাব্যে সে-বৈরিতার উদ্ভব হয়েছিল যা' ইদানীং হয়েছে। দ্বিতীয়ত, ব্লেইকের রূপক নিউটনীয় ব্রহ্মাণ্ডের বিরোধী নয় বটে কিন্তু আসলে সে-ব্রহ্মাণ্ডে এসব রূপকের স্থানই নেই, এহেন রূপক নিয়ে কারবারই চলে না। তৃতীয়ত (এবং সব চেয়ে বড়ো কথা), হার্ট ক্রেইন বলছেন (অন্য

অধিকাংশ কবিও এমন কথা বলছেন) যে কাব্যের সত্য ও বিজ্ঞানের সত্য প্রভিন্ন। এ কথাতেই আধুনিক কাব্য দর্শনের মৌল দুর্বলতা।

সত্য দুই রকমের, বিজ্ঞানের সত্য ও শিল্পের সত্য, আর শিল্পের সত্যই মহত্তর সত্য এহেন বিশ্বাসের প্রচারে কাব্যের মহতী ক্ষতি হয়েছে। কবি ও কাব্যতাত্ত্বিক কাব্যকে প্রত্যক্ষ পৃথিবীর অতীতে কোনো অলক্ষ্য অবাস্তব (সুতরাং অলীক) জগতে নিয়ে যাচ্ছেন। কাব্যের সঙ্গে জীবনের সম্পর্ক শিথিল হচ্ছে, পরিণাম কাব্যের পক্ষে শান্তিপ্রদ নয়। কিছুকাল পূর্বে 'কাব্যপ্রত্যয়'-নামা এক প্রবন্ধে আমি লিখেছিলাম যে কাব্যের প্রত্যয় ও ব্যবহারিক প্রত্যয় মিলে' মিশে' অভিন্ন হ'তে পারে আবার বিভিন্নও হ'তে পারে, বস্তুত অধুনা প্রায়ই তেমন হ'য়েও থাকে। কিন্তু সে কথার মানে নয় যে যে বস্তু কাব্যে সত্য, ব্যবহারিক জীবনে তা' সত্য নয়। আমি লিখেছিলাম লৌকিক প্রত্যয় ও কল্পলোকের প্রত্যয় স্বতন্ত্র বস্তু। প্রাক্ কাব্য বিষয় ও কাব্যোত্তর বিষয়, এ-দুইয়ে ততই প্রভেদ যতটা ফুলের বীজে ও ফুলটিতে। আসলে এ হচ্ছে শুদ্ধীকরণের উন্নয়নের প্রভেদ। যেন কাঁচা মাল ও তৈরি মালের প্রভেদ। কিন্তু শুদ্ধীকৃত কাব্যবস্তু (আমি সৎ কাব্যের কথাই বলছি) মিথ্যা হ'তে পারে না, প্রাক্শোধন কাব্যবস্তুও তেমনি মিথ্যা হ'তে পারে না। বস্তুত সমগ্র কাব্য প্রক্রিয়ায় মিথ্যার স্থান নেই। সে-যুক্তিতেই উক্ত প্রবন্ধের শেষ দিকে আমি আরো লিখেছিলেন, কাব্য সৎ হ'তে হ'লে কবিকেও হ'তে হবে সৎ, কবির শুদ্ধ প্রত্যয়ে ও ব্যবহারিক প্রত্যয়ে থাকবে না কোনো দুস্তর ব্যবধান।

হার্ট ক্রেইন্ যা' বলেছেন, যেমনধারা কথা অনেক উনিশ ও বিশ শতকী কবি বলেছেন ইংল্যাণ্ডে, ফ্রান্সে ও অন্যত্র (পণ্ডিতম্মন্য তালিকা প্রস্তুত করা এ-প্রবন্ধের উদ্দেশ্য নয়), সেই রোমাণ্টিক চিন্তাধারায় দুস্তর ব্যবধান, কাব্যেরই পক্ষে পরম হানিকর ব্যবধান, গড়ে' উঠেছে কবির শুদ্ধ প্রত্যয়ে ও ব্যবহারিক প্রত্যয়ে। হানিকর কেননা মানব সমাজের পক্ষে মনে করা সম্ভব নয় যে বিজ্ঞান মিথ্যা, বৈজ্ঞানিক ক্রিয়াকলাপ ভূয়া চাতুরী, অথচ পুঞ্জীভূত সত্য একমাত্র কবিকল্পনায়। যদি কোনো কালে বেছে নেওয়ার সমস্যা আসে তা'হলে মানবসমাজ বেছে নেবে বিজ্ঞানকেই।

সাহিত্য ও বিজ্ঞানের সম্পর্ক আসলে সাহিত্যিকের চিত্তে বিজ্ঞানের প্রভাব। ইওরোপে এ-প্রভাব দেখা দিয়েছিল মর্মন্তুদ তীক্ষ্ণতায় উনিশ শতকে, বাঙলা সাহিত্যে সে-শতকে একমাত্র বঙ্কিমচন্দ্রের বহুস্পর্শী শক্তিধর প্রতিভায় ছাড়া অন্য কোনো লেখকের চিত্তে এ-বিষয়ে কোনো চেতনা ছিল বলে' মনে হয় না। বঙ্কিমচন্দ্র কোঁৎ পড়েছিলেন, বিজ্ঞানের পটভূমিতে যে-নূতন দর্শন গড়বার চেষ্টা হচ্ছিল ইওরোপে তা'র সঙ্গে পরিচিত ছিলেন, তাঁর "কৃষ্ণচরিত্র" "ধর্মতত্ত্ব" ও "শ্রীমদ্ভগবদগীতা" প্রভৃতি আলোচনায় সে-দর্শনগ্রাহী যৌক্তিকতার প্রমাণ। মাইকেল ছিলেন এ বিষয়ে অনবহিত। বঙ্কিমচন্দ্র ইওরোপে যাননি, মাইকেল গিয়েছিলেন বটে কিন্তু বঙ্কিমচন্দ্র সমসাময়িক ইওরোপ জানতেন, মাইকেলের ইওরোপ, পেত্রার্ক ও ফ্রাঁসোয়া ভিল'র ইওরোপ, আরও পূর্বেকার ভর্জিলের ইওরোপ। যে-মিল্টনের কাব্য তিনি অধ্যয়ন করেছিলেন এমন কি সে-মিল্টনেরও যে-শৈল্পিক সমস্যা তীব্র ছিল (বেস্ল্ উইলি যা'কে বলেছেন, The Heroic Poem in a Scientific Age)

সে বিষয়ে মাইকেল অবহিত ছিলেন না। তাঁর সমস্যা ছিল 'হেরোয়িক পোয়েম্'-এর সমস্যা, 'সায়েন্টিফিক্ এইজ্'-এর নয়।

কোনো বিস্ময়ের বিষয় নয় যে রবীন্দ্রনাথ বিজ্ঞানের অভিসংঘাত সম্বন্ধে চিন্তা ক'রেছিলেন। সে-চিন্তার কিছু নিদর্শন "সাহিত্যের পথে" নামক রচনা সংগ্রহে। তিনি বলেছেন, 'বিজ্ঞান বাছাই করে না, যা কিছু আছে তাকে আছে বলেই মেনে নেয়, ব্যক্তিগত অভিরুচির মূল্যে তাকে যাচাই করে না, ব্যক্তিগত অনুরাগের আগ্রহে তাকে সাজিয়ে তোলে না।' তিনি বললেন যে আধুনিক কাব্যের কাজ 'মনোহারিতা নয় মনোজয়িতা, তার লক্ষণ লালিত্য নয় যাথার্থ্য।' আরও বললেন যে, 'কাব্যে বিষয়ীর আত্মতা ছিল ঊনিশ শতাব্দীতে, বিশ শতাব্দীতে বিষয়ের আত্মতা।' এসব উক্তিতে প্রমাণ হয় যে যন্ত্রপ্রধান ব্যবহারিক জীবন ও তথ্যনিষ্ঠ বিজ্ঞানচিন্তা আধুনিক কাব্যকে কীভাবে প্রভাবিত করেছে সে-বিষয়ে রবীন্দ্রনাথ পুরোপুরি সচেতন ছিলেন। বস্তুত তাঁর শেষ দিককার লেখায় যে বিষয়াত্মতা প্রবল তা' কী পরিমাণে এই বিজ্ঞানচেতনা থেকে উৎসারিত সে কথার আলোচনা হওয়া দরকার। কিন্তু প্রবীণ রবীন্দ্রনাথের বিজ্ঞানচেতনা যত গভীর যত যথার্থ হোক না কেন, সে-চেতনা তাঁর সমগ্র জীবন দর্শনকে কখনো বিভ্রান্ত করে নি, বিজ্ঞানের তত্ত্বে তিনি এমন কিছু পাননি যার দরুণ তাঁর জীবনবোধ সংক্ষুব্ধ হয়ে উঠতে পারত। ব্রাহ্ম সমাজের মুক্ত সংস্কার আবহাওয়ায় মানুষ হয়ে, মহর্ষির গম্ভীর ও উদার ঔপনিষদিক শিক্ষায় পরিপুষ্ট হয়ে', ঊনিশ শতকী ইওরোপের লিব্র্যাল হিউম্যানিজম্ আপন ঐতিহ্যের সঙ্গে একাত্ম করে' রবীন্দ্রনাথ এমন এক দার্শনিক ভারসাম্যে পৌঁছেছিলেন যেখানে আধুনিক বিজ্ঞানের যন্ত্রপ্রচণ্ড বহুসংস্কারধ্বংসী তত্ত্বগুলি কোনো উদ্বেগের সৃষ্টি করতে পারল না। বস্তুত রবীন্দ্রনাথের জীবনে ও কাব্যে ইওরোপসুলভ ব্যবচ্ছিন্ন সংবেদনার আভাস নেই। তাঁর মণীষায় ও আবেগে, প্রত্যয়ে ও কর্মে সে-অসঙ্গতি ও বৈরিতা নেই যা' বহু আধুনিক ইওরোপীয় কবির রচনায় প্রকট এমন কি তাঁর কোনো বঙ্গীয় উত্তরসূরীতেও পরিস্ফুট। রবীন্দ্রনাথের জীবন ও কাব্য সমভাবেই নিটোল সর্বাঙ্গসুষম। আধুনিক বিজ্ঞানের অথবা বিজ্ঞানদ্বারা প্রভাবিত আধুনিক কাব্যের কোনো ত্রুটি তিনি দেখতে পাননি তেমন নয়। বাঙলা কাব্য সম্বন্ধে তিনি লিখলেন, 'যে দেশে অন্তরে-বাহিরে বুদ্ধিতে-ব্যবহারে বিজ্ঞান কোনোখানেই প্রবেশাধিকার পায়নি, সে দেশের সাহিত্যে ধার করা সকল নির্লজ্জতাকে কার দোহাই দিয়ে চাপা দেবে?' ক্রুদ্ধ উক্তি, কিন্তু যেকালে এ-উক্তি লিপিবদ্ধ হয়েছিল তখন নিতান্ত অযথার্থ ছিল না। যাঁরা ত্রিশ পঁয়ত্রিশ বৎসর পূর্বেকার বাঙালী সাহিত্য জীবনে ভাগীদার ছিলেন তাঁরা জানেন যে বিজ্ঞান চিন্তা সে-কালে বঙ্গীয় মনীষায় প্রবেশ করেনি, ততটুকুও করেনি যতখানি বিজ্ঞানী মনোভাব রবীন্দ্রনাথ স্বয়ং পেয়েছিলেন জগদীশচন্দ্রের সাহচর্যে। দু'চারজন বাঙালী বৈজ্ঞানিকের কথা বলছি না, প্রবীণ বাঙালী সাহিত্যিকের পক্ষে তখনকার দিনে বিজ্ঞান দূরশ্রুত বাঁশরীধ্বনি মাত্র। কিন্তু রবীন্দ্রনাথের উপরোক্ত কশাঘাতের যাথার্থ্য স্বল্পক্ষণস্থায়ী কেননা তাঁর এই উক্তির সময়েই এক তরুণতর কবিগোষ্ঠী সাহিত্যের আসরে প্রবেশ করছিলেন (আজ তাঁরা লব্ধ-প্রতিষ্ঠ প্রবীণ, কেউ কেউ ইতিমধ্যেই ইহধাম ত্যাগও করেছেন)। তরুণতর কবিদের মধ্যে সুধীন্দ্রনাথ, জীবনানন্দ ও বিষ্ণু দে সবচেয়ে বেশি বিজ্ঞান সচেতন বলে আমার মনে হয়। এ'রা যাঁর যাঁর কাব্যধারণার সঙ্গে বিজ্ঞান চিন্তার সাযুজ্য ঘটাবার চেষ্টা করেছিলেন, অন্য কোনো কবি তেমনটি করেননি বলে' আমার অনুমান। কোনো আধুনিক কাব্যোৎসাহী

হয়তো এ-বিষয় অধ্যয়ন করে' দেখবেন, অধ্যয়নের যোগ্য বিষয়।

একটা ভাসা ভাসা অর্থে বিজ্ঞান চেতনা কোনো কোনো কবির মধ্যে পাওয়া যায়।

মনে রেখো ইলেকট্রনের তামাশা!
কিন্তু কেনই বা মনে রাখবো?
আকাশে থাকুক জটিল দেশ-কাল-জড়ানো জ্যামিতি,
সৃষ্টিময় অনন্ত অঙ্কের কাটাকাটি।

তবু একদিন থাকবে না যুদ্ধ
বন্ধ্যা পৃথিবীর উত্তাপ
—নাইটারে গ্লিসারিনে গন্ধকে লোহায়—
নিভে যাবে সন্তানের স্বপ্নে।

নপুংসক বর্তমান ক্রুদ্ধ রাসায়নিকের মতো
রক্তময় অতীতের বীজাণু মিশায় অবিরত।

বাঙালী কবি বিজ্ঞানচেতনায় উদ্দীপিত নন ব'লে আমি উদ্বিগ্ন হচ্ছি না কেন না এহেন উদ্দীপনার অভাব ইওরোপীয় কাব্যেও লক্ষ্য করা যায়। এককালে যখন আমি ভিক্টরীয় যুগের ইংরেজি কাব্য অধ্যয়নে নিরত ছিলাম তখন সমসাময়িক বিজ্ঞানের দ্রুতবেগপ্রগতি লক্ষ্য করে' প্রথমে মনে করলাম যে তা'হলে এ-বিজ্ঞানের প্রতিচ্ছায়া নিশ্চয় কাব্যেও মিলবে। বাস্তবিক কাব্যপাঠে প্রতিপন্ন হ'ল আমার সে-অনুমান অযথার্থ। ১৮৩০ থেকে ১৮৫০ খৃীষ্টাব্দ পর্যন্তকার ইংরেজি কাব্যে আমি মাত্র গুটি কুড়ি ছত্রস্তবক পেয়েছিলাম যাতে আদৌ বিজ্ঞানের কোনোরকম প্রতিচ্ছায়া পাওয়া যায়। এজন্য তিন শ'র অধিক কাব্যগ্রন্থ আমাকে ঘাঁটতে হয়েছিল—খ্যাতনামা আবার নিতান্তই কালজীর্ণ বিস্মৃত গ্রন্থ। এই ছত্রস্তবকগুলি ছাড়া অবশ্য টেনিসন্ ও ব্রাউনিংয়ের কিছু কাব্য, 'প্যারাসেল্সাস্', 'দি টু ভয়সেস্', 'দি প্রিন্সেস্', 'ইন্ মেমরিয়ম্'। গবেষণার নগণ্য পরিণতি! কিন্তু আসলকথা এ থেকে এই প্রমাণ হয় যে ফ্যারাডে ডারুইনের যুগেও ইংরেজ কবিচিত্তে বিজ্ঞান-চেতনা ছিল না। বাঙালী কবিচিত্তে আজও সে-চেতনা এসেছে কিনা আমার সন্দেহ। যখন বাঙালী কবি বলেন,

হে বিধাতা,
অতিক্রান্ত শতাব্দীর পৈতৃক বিধাতা,
দাও মোরে ফিরে দাও অগ্রজের অটল বিশ্বাস

তখন তাঁর প্রত্যয়তৃষ্ণা মূলত ধর্মীয় ও সামাজিক বিশ্বাসের জন্যই আকুল কিন্তু কেন যে বিগত কালের বিশ্বাস অটল ছিল আর সে-বিশ্বাস আজ অন্তর্হিত, এ-অন্তর্ধানের মূল কারণ যে বিজ্ঞানের প্রচণ্ড অভিসংঘাত এমন ধারণা পাওয়া যায় না সুধীন্দ্রনাথের কাব্যে, অন্তত সাক্ষাৎভাবে পাওয়া যায় না। কবির আবেগের উপলক্ষ 'অতীতের অলীক, আত্মীয় ভগবান', যুগযুগবাহিত ঈশ্বরকল্পনা। এ হেন ঈশ্বরসংশয় অথবা নিরীশ্বরপ্রত্যয় সাহিত্যের ও চিন্তার ইতিহাসে আদৌ নূতন নয়, বস্তুত যেদিন থেকে ঈশ্বরের আবির্ভাব সেদিন থেকে যাত্রা শুরু নিরীশ্বরেরও। অতএব যদিও সুধীন্দ্রনাথের ঈশ্বর সংশয় বিংশ শতাব্দীর বিজ্ঞান চিন্তার সাক্ষাৎ পরিণাম হতেও পারে যেমন হয়েছিল ম্যাথিউ আর্ণল্ডের

ছত্রে ('We are between two worlds, The one lost and the other powerless to be born,' আমরা আছি দুই জগতের মাঝখানে, একটি গেছে হারিয়ে, আরেকটির শক্তিই নেই জন্মাবার) তবুও কাব্যের ঈশ্বরসংশয় অথবা ঈশ্বরপ্রত্যয় কামনা গতানুগতিক দার্শনিক প্রত্যয়েচ্ছারই অংশ মাত্র। এমন ইচ্ছা ষোলো শতকে বা ষষ্ঠ শতকে বা প্রাক্‌খ্রীষ্টীয় যুগেও প্রকাশিত হ'তে বাধা ছিল না, প্রকাশিত হ'য়েছিল।

এমন কথা বলার কোনো প্রলাপী অভিপ্রায় আমার নেই যে কবিদের বিজ্ঞান সচেতন হতেই হবে। কবির বিশ্ববীক্ষায় কোন্ উপকরণটি হবে সৃজনস্রাবী সে কথা বলার ধৃষ্টতা থাকবে কোন্ সমালোচকের? আমার বক্তব্য শুধু এইটুকু যে সে-বিশ্ববীক্ষা যদি বিপর্যস্ত-প্রত্যয়ক্লিষ্ট হয়, তার অনুভূতিসঞ্চারক্ষমতাও হবে ক্ষীণ, তার শিল্পসিদ্ধি হবে অসম্পূর্ণ। আধুনিক ইওরোপীয় কাব্যের মস্ত অংশেই (বিশেষত আঠারো শতকোত্তর কাব্যে) এই অসম্পূর্ণ শিল্পসাধনা ও সিদ্ধির মোহর আঁকা। কবিগণ একদিকে ভেবেছেন যে পরম সত্য কাব্যেই নিহিত বিজ্ঞানে নয়, বিজ্ঞানের সত্য ক্ষণস্থায়ী। এমন ভাবনার ফলে জড়-জগতের এলাকায় বিজ্ঞানের যে ক্রমেই বেড়ে-উঠতে-থাকা মহতী বিজয়যাত্রা তা' থেকে আলাদা হ'য়ে পড়ল শিল্পীচিত্ত, কাব্যের জড়জাগতিক আবেষ্টনী ক্রমেই সঙ্কুচিত হ'তে লাগল, শিল্পের বিষয়বস্তু বহির্জগৎ থেকে সরে' এসে আশ্রয় নিল শিল্পীর আত্মকেন্দ্রিক চিন্তাধারায় ও মানসিকতায় আর এই পিছু-হঠে-যাওয়া, ক্রমেই কোণ-ঠেসা সঙ্কীর্ণ থেকে সঙ্কীর্ণতর ক্ষেত্রে শিল্পের অঙ্গচালনাকে সমালোচকগণ মস্ত মস্ত নাম দিয়ে' ('সম্বিৎ প্রবাহ', 'মনস্তাত্ত্বিক শিল্প', 'অ্যাব্‌স্ট্রাক্ট্ শিল্প' প্রভৃতি) পরিতৃপ্ত হলেন। এই সঙ্গে আরেকটি ব্যাপারও ঘটল। কবিরা শিল্পদর্শনে অগ্রাহ্য করলেন বিজ্ঞানকে কিন্তু ব্যবহারিক ও সামাজিক জীবনে বিজ্ঞান সম্ভূত সুখস্বাচ্ছন্দ্যের সদ্ব্যবহারে কিছুমাত্র উদাসীন রইলেন না। এইভাবে টেক্‌নলজি স্বীকার হওয়ার ফলে প্রাচীন উপকথা, বীর্যগাথা, লোকপ্রত্যয়গুলি অবহেলিত হ'তে লাগল, কাব্যের বিষয়বস্তুর এলাকা এভাবেও সঙ্কীর্ণ হ'ল। কবিরা যতই বাইরের জগৎ ছেড়ে মনোজগতে প্রবেশ করতে লাগলেন, অব্‌জেক্‌টিভ্ শিল্প ছেড়ে সব্‌জেক্‌টিভ্ শিল্পের আশ্রয় নিলেন, ততই বাড়ল কাব্যের দুর্বোধ্যতা, অস্পষ্টতা। ডক্টর জন্‌সনের "রাসেলাস্" নামক গ্রন্থে ইম্‌লাক বলছেন যে কবির কর্তব্য বিশেষ গুণের বিচার নয় সাধারণ গুণের বিচার। এই সারবান্ ক্লাসিকপন্থী উপদেশ আধুনিক কবি (তথা শিল্পী) ভুলে গেছেন, তাঁর ধ্যেয় ভূমা নয়, ক্ষুদ্র আয়তন মাত্র। কবিরা নিজ নিজ সংবেদনার সঙ্কীর্ণ আয়তনের চারিদিকে দেয়াল তুলছেন, উঁচু থেকে আরো উঁচু হচ্ছে সে-দেয়াল। অথবা বলা যায়, কবিরা বাইরের জগৎ ছেড়ে নিজ নিজ চিত্তেই সুড়ঙ্গ খুঁড়ছেন। এই অপরিসীম আত্মকেন্দ্রিকতার ফলে অনেক কবির বাক্‌প্রতিমায় এবং সংবেদনাপ্রবাহে সে-অসুস্থ বিকারস্তিমিত মানসিকতা যা' দস্তয়ভ্‌স্কির "নোট্‌স্ ফ্রম দি আণ্ডারগ্রাউণ্ড" অথবা কাফ্‌কার কাহিনীগুলিতে প্রকট। আর এ-কারণে আজকের সমাজ থেকে কাব্যের সর্বজনগ্রাহ্যতা লোপ পেয়ে গেছে। কাব্য বা কবির নামে আমরা গদ্‌গদ বচন কিন্তু বেশ দূরে দাঁড়িয়ে। যদিও বা কিছু কাব্য কিছু উপন্যাস পড়ি, তা'র মধ্যে আবার উঁচুকপালে, মাঝকপালে, নিচুকপালে প্রভৃতি শ্রেণীবিভাগ মেনে চলি।

এই ক্লেশকর ক্লান্তিকর অবস্থা থেকে, কাব্যশক্তির ক্রমক্ষীণতা থেকে মুক্তি পেতে হ'লে কবিকে বুঝতে হবে যে বিজ্ঞানের সত্যে ও শিল্পের সত্যে কোনো বৈরিতা সম্ভব নয়, প্রাক্-রেনেশাঁস যুগে ছিল না, এখনো থাকা স্বাভাবিক নয়। কীভাবে এই আপাতবৈরিতা অপসৃত

হবে সে কথা হয়তো কবি শুরুতে বলতে পারবেন না কেননা দ্রুতধাবমান যুগান্তকারী বৈজ্ঞানিক চিন্তা, বিজ্ঞানসম্ভূত প্রত্যক্ষ সুখস্বাচ্ছন্দ্য, আর সাধারণ মানুষের নীতিবোধ ও অনুভূতি কী ভাবে পরস্পরে মানানসই হবে, মিলে' মিশে' এক হবে সে-সমন্বয়সাধনের দায়িত্ব মূলতঃ দার্শনিকের। হয়তো বর্ট্রাণ্ড রসেল্ ও হোয়াইটহেড্-এর প্রয়াসেও বিজ্ঞান ও শিল্পী সাযুজ্যলাভ করেনি, হয়তো করবে আগামী দার্শনিকের চিন্তায়। মানুষের নীতিবোধ ও অনুভূতির সুসঙ্গতিসাধন বৈজ্ঞানিক আবিষ্কারের সঙ্গে, সে-কাজও কবির নয় সমাজবিদের। কিন্তু কবি অন্তত এই প্রত্যয়সম্পন্ন হবেন যে জীবনের বিচিত্র বিশাল এলাকায়, আপাতবিরোধের গভীরে ঐক্য বিদ্যমান, বিজ্ঞানে ও শিল্পে, কল্পনায় ও কর্মে, জ্ঞানে ও স্বজ্ঞায়, নীতিতে ও অনুভূতিতে একই জীবন-মহাদেবের নৃত্য। যাকে বিরোধ মনে করা যায়, সে আসলে অহুর্মান ও অহুর-মাজ্দার নিরন্তর সংগ্রামশীল লীলাছন্দ। কবির জগৎ অখণ্ড জগৎ।

# নদ ও কড়ি

**সীমন্তনারায়ণ চট্টোপাধ্যায়**

যেখানে বাজারের সদর পথ ঘেঁসাঘেঁসি দোকানগুলোর মাঝখান দিয়ে পেরিয়ে এসে একটু পরিসর হয়ে, ডাইনে ঘুরে, তারপর হঠাৎ ঢালু হয়ে গড়িয়ে গেছে ঘাটের দিকে, সেই মোড় নেওয়ার ঠিক মুখেতে মুকুন্দ কাঁসারির ঝালাই মেরামতির দোকান ঘর। রাস্তার দুধারে বাড়ীগুলো দেখে মনে হয় একটা টানা দেয়াল থেকে ভাগ ভাগ করে আলাদা করা। চুনকাম করা দেয়ালে বড় বড় আলকাৎরার পোঁচ টেনে লেখা নম্বর জানায় শুধু পৃথক ঠিকানাগুলো। তারই খুব সংকীর্ণ একটা ভাগে উঁচু ভিতের উপর ছোট একখানা দোকান ঘর, টানা দেয়ালের গায় টোল খাওয়া গর্তের মত মাত্র। তিনভাঁজ করা সেকেলে আলকাৎরা মাখানো কবাটের মাথায় টুকরো টিনের সাইনবোর্ড দোকানের পরিচয় ঘোষণা করে। কিন্তু অনেক বছরের ধুলো রোদ বৃষ্টি লেগে লেগে লেখাগুলোর কোন চিহ্নই আর সেখানে নেই। তার প্রয়োজনও অনুভূত হয়নি বহুকাল।

প্রত্যহ অগণিত মানুষ ঘাটে স্নান সেরে কেউ ঘটি গঙ্গাজল হাতে, কেউ বাজারের থলি হাতে কেউ বা নাতিপুতি কাঁখে কোলে নিয়ে ভিজে কাপড়ে জল ঝরাতে ঝরাতে ফেরার সময় দেখে মুকুন্দ তার ছোট চুলীর মাথায় গুঁড়ো কয়লা চাপিয়ে হাপর ঠেলে হাওয়া দিচ্ছে একমনে। তার সাদা চুলভর্তি মাথা দু হাঁটুর মাঝখানে ঝুঁকে পড়েছে, কপালের প্রান্তে ঘন সাদা কাশফুলের মত ভুরুজোড়া কুঁচকে নিবিষ্ট মনে তাকিয়ে রয়েছে চুলীর আগুনের দিকে। পাশে জড়ো করে রাখা পুরনো ঘড়া ঘটি বাটি থালা গেলাস,—আরও কতশত আকারের বাসনপত্র। অন্যপাশে ঝালাই করার সাজ সরঞ্জাম,—রাং, তামা পিতলের কুচি, হাতুড়ি কাঁচি ছুরী বাটালি, নানা জিনিস। ভিতরে অন্ধকার কোণে একটা তালা দেওয়া মাঝারি জারুল কাঠের বাক্স। পাশে গুটিয়ে রাখা ময়লা বিছানা মাদুর, ছোট তোলা উনুন, একটা মাটির হাঁড়ি—এই সর্বস্ব। দেয়ালে ঝোলানো মাকড়সার জালে ঢাকা কবেকার একখানা ক্যালেণ্ডার, তার বিবর্ণ ছবি ধুলোয় চাপা পড়ে থাকে।

শ্রীধাম নগরে মানুষ বিস্তর। তাছাড়া তীর্থযাত্রীর ভীড় বারোমাস। আর উৎসবে-মহোৎসবে ভীড়টা ফেঁপে আসে পূর্ণিমার জোয়ারের মত। অন্য সময় থিতিয়ে থাকে। অনতিদূরে ঘাট থেকে আসে ফেরী নৌকোর মাঝিদের যাত্রী ডাকাডাকি, স্নানার্থিদের কথা-বার্তার স্বর, মাল বোঝাই গরুর গাড়ী পার করার হট্টগোল। গা-ঝরানো জল ফেলে ফেলে পথটার মাটি সবসময় চকচক করে। পুজোর ফুল পড়ে থাকে দু একটা। আর কানে অনর্গল কল থেকে জল পড়ার মত ঢোকে অসমাপ্ত কথার টুকরো, হাসি গল্প বকুনি ওজর ভর্ৎসনা কান্না অভিমান। কিন্তু মুকুন্দ মাথা তোলে না সাধারণতঃ। অনেক বছর শব্দের এই সংমিশ্রিত প্রগল্‌ভ সুরের সঙ্গে তার কান বাঁধা হয়ে আছে। সে শোনে কিন্তু কান পাতে না কোনদিন।

রকমারী লোক রকমারী ফরমাইশ নিয়ে আসে মুকুন্দের দোকানে। কেউ ঘটি ঘড়া থালা নিয়ে আসে মেরামত করাতে, কেউ আবার টিনের বা এ্যালুমিনিয়ামের জিনিস আনে। মুকুন্দ কোনটা রাখে কোনটা বা ফেরৎ দেয়। কখনো কাজ থেকে সে মুখ তুলতে চায় না,

কখনো গল্প করে সারাবেলা।

আবার ছোট বয়সী-বয়সিনীদের ডাকাডাকিতে কোন সময় মুকুন্দ অতিষ্ঠ হয়ে হঠাৎ অস্বাভাবিক ক্ষিপ্রতায় লাফিয়ে দাঁড়িয়ে ওঠে, তারপর চোখ পাকিয়ে বলে, —র— তদের আজ দেখাইমু, আইজ আর একটারেও ছাড়ুম না!—চারিদিকে জলতরঙ্গের মত হাসির খিলখিল শব্দ বেজে ওঠে। মুকুন্দও যোগ দেয় সে হাসিতে, ফোকলা মাড়ি দুটো বেরিয়ে দুচোখের গালের চামড়া অসংখ্য কোঁচকানো রেখায় বিভক্ত হয়ে গিয়ে সমস্ত মুখমণ্ডলে উচ্ছ্বসিত হয়ে ওঠে একটা ছেলেমী যেটার জন্যে তারা অপেক্ষা করে ছিল।

একদিন তেমনি কানে অবিরত এসে ঢোকে,—মুকুন্দদা—অ মুকুন্দদা, একবার চাওনা, একবার তাকাও না—। মুকুন্দ মুখ তুলে চেয়েছিল। দোকানের উঁচু মেঝের কানায় থুতনি রেখে একাগ্র দৃষ্টিতে তাকিয়েছিল একটি কিশোরী। দুটো ছোট ছোট মুঠিতে ধরা হাতের বালা ঝনকাঠের উপরে পড়ে থাকে। মুকুন্দর ঘন ধপধপে সাদা ভ্রূ জোড়ার নীচে দৃষ্টি একমনে কিছুক্ষণ দেখতে লাগল বালা দুটোর দিকে চেয়ে চেয়ে, তার চোখদুটো একটু একটু করে নেমে এসে দাঁড়াল বালাজোড়ার অধিকারিণীর মুখের উপরে।

—ওগুলা আনিস্ ক্যান? আমি কি স্যাক্‌রা যে কামিনীদের অলঙ্কার ম্যারামত করুম!

—আহা হা, মুকুন্দদা যেন জিনিস আর চেনে না, এটা কি সোনার যে স্যাকরার দোরে যাব—

—সোনার লয়?—মুকুন্দর চোখদুটোয় ঝিকিয়ে উঠল হঠাৎ একটা দুষ্টমীভরা হাসি,—আহা অমন সোনার হাতটায় তা হইলে কি পিতল থইর‍্যা রাখছ! দ্যাও দেখি—

কারুকার্য করা বালা দুটো হাতে করে মুকুন্দ ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে দেখতে লাগল। দু হাঁটুর ফাঁকে মাথাটা ঝুঁকতে ঝুঁকতে নেমে আসে হাতটার একবারে সন্নিকটে, সাদা উঁচু উঁচু ভ্রূর আড়ালে চোখ দুটো ঢাকা পড়ে যায়। সস্তার পিতলের বালা কিন্তু কারুকার্য স্যাকরাদের হাতের মতই পরিপাটি। হয়ত সোনার জল দিয়ে উজ্জ্বল করা ছিল কিনবার সময়, কিন্তু এখন ময়লা পড়ে হলদেটে হয়ে আছে। দুটো বালারই জোড় খুলে গিয়েছিল। মুকুন্দ হাপর দুবার ওঠা নামা করিয়ে তাতালটা ঠেলে দিল আগুনের মধ্যে। তারপর বালাজোড়া নামিয়ে রাখল মেঝেতে।

—কত পয়সা নেবা?—আলতায় রাঙানো একটা নখের মাথা দিয়ে নাক খুঁটতে খুঁটতে ভুরু কুঁচকে জিজ্ঞাসা করল কিশোরী।

মুকুন্দ হাপরের উপর থেকে হাত নামিয়ে আস্তে আস্তে মুখ তুলে তাকাল। তার দ্বিসপ্ততি বর্ষের প্রাচীন রেখা টানাটানা গম্ভীর মুখের মধ্যে কেবল চোখ দুটোর কোলে যেন ভাদ্রের রোদ-ছায়া খেলা করে বেড়ায়। অদ্ভুত যৌবনভরা চপলতা চিকমিক করে ওঠে সুচের মত তীক্ষ্ম চোখের মণিদুটোয়।

—ইটার জন্য পির্‌থক্ মুজুরী লাগবে।

কিশোরী মুকুন্দর কথার ধাঁচ বুঝতে পারল না। কিন্তু ওর চোখের দুরভিসন্ধি ভরা আলো দেখে বুঝতে পারে মুকুন্দ মনে মনে কি একটা অপ্রস্তুত করা কথা ফাঁদছে যার সঙ্গে মেরামতির মজুরির কোনো সম্বন্ধ হয়ত নেই।

ভুরু কুঁচকে থরথর করে ধমকে উঠল সে,—কি লাগবে না লাগবে বল তাড়াতাড়ি। তোমার দোরে আমি বেলা পোয়াতে এসেছি নাকি? দেরী হয়ে যাচ্ছে কিন্তু।

—এই লাও কথাটাগ! দুই দণ্ড বুড়ার সাথে কথা কইবার তর সয় না, হা—দোরে বুঝি তর ময়ূরপংখী চইড়্যা রাজপুত্তুর আইসে?

—যাও!—দাও আমার বালাজোড় ফেরৎ! কেবল কেবল ভারী কথা শিখেছ!—কিশোরী রুষ্ট হয়ে চোখ জামের মত পাকিয়ে তাকাল।

—ক্যাবল ক্যাবল সোন্দর সোন্দর কথা বলবার জানে খালি বুড়াটা—!

মুকুন্দ আগুন থেকে তাতাল তুলে নিয়ে বোলাল দুবার নামিয়ে রেখে দেওয়া হাতের কাজটায়। তারপর আবার সেটা নামিয়ে রেখে একটা বালা তুলে নিয়ে জোড়ের মুখ পরিষ্কার করতে করতে বলল,—বলি শুন্ কথাটা হরিমনি, তর দিদি তর বিয়ার উয্যুগ্ করে না ক্যান্ এ্যাদ্দিনেও? তর এমন রূপ—য্যান্ টগরের বাড়ন্ত কুড়ি থেইক্যা একটি একটি কইর‍্যা পাপ খুইল্যা আসত্যাছে, আর তা দেইখ্যা মানুষের মন বুঝি ক্যামন ক্যামন করত্যাছে! দিদিরে ক, পাত্তর যদি না মেলে ত বুড়ারে ধরলে পর রাজী হব কি হব না!

—ধ্যেৎ!—কিশোরী এতক্ষণ নিবিড় কৌতূহলের সঙ্গে লক্ষ্য করছিল মুকুন্দর হাত বালাটায় কেমন অদ্ভুত দক্ষতার সঙ্গে সূক্ষ্ম কাজ বাঁচিয়ে বিন্দু বিন্দু গলান দস্তা ছুঁইয়ে ঝেলে দিচ্ছিল খুলে যাওয়া জোড়ের মুখটা। তার কানদুটো মুকুন্দর কথাবার্তায় যে খুব আপত্তি করে তার লক্ষণ প্রকাশ পাচ্ছিল না। কিন্তু পাত্র হিসাবে মুকুন্দর অভিলাষ শুনে ফোঁস করে উঠল নেউলের মত।

—খবরদার! খারাপ খারাপ কথা বলবা না বলে দিচ্চি!—একটু থেমে চোখে কুপিত কটাক্ষ হেনে—যা তার নবমীর সুডোল কচি বাঙ্গালী মুখখানিতে অদ্ভুত কৌতুকপ্রদ ভাব এনে দেয়—বলল,—আহা বুড়ো মানষের সখ ত কম নয়!

মুকুন্দ দুচোখ বড় বড় করে খুলে মণিদুটো পাশে ঘুরিয়ে বলল—তর মত রূপসীরে দেইখ্যা থির থাকে কার মনডা ক দেখি? কইস্ যদি, তর পিত্তলের বালাজোড়ায় এমন সোনার জল লাগায়ে দিমু—যে হাতডায় পরলে দেখাইব এক্কারে রানীর মত!

কিশোরীর চোখদুটো ক্রমেই বিস্ফারিত হয়ে উঠছিল। মুকুন্দ যেটুকু বলে তার সহস্রগুণ সে দেখে মনের চোখে ফুটতে—ময়লা নিষ্প্রভ বালা দুটো সত্যিই যদি সোনায় মুড়ে দেয়, সইতে না পেরে সে বলে উঠল সাগ্রহে—হ্যাঁ মুকুন্দদাদা, সোনার জল দিতে কত পয়সা নাগবে?

মুকুন্দ বালাটায় একটা শেষ কেরামতি করে নামিয়ে রেখে চোখ তুলে তাকাল। চোখ দুটো সত্যি সত্যি তার বিধুর দেখাচ্ছিল।—ওই যে কইলাম তরে, তর দিদিরে ক যাইয়্যা—

—যাঃ!—কিশোরীর স্বপ্ন ভেঙ্গে যায়। কিন্তু আশাটা মনে মনে নিয়ে ফিরে গেল বালাদুটো মুকুন্দর কাছে রেখে দিয়ে, পরের দিন চাই বলে।

একটা পুরোনো কালচে রং নেওয়া মান্ধাতার কালের ঘটি হাতে তুলে নিয়ে তলায় ছিদ্র আবিষ্কার করার জন্যে ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে দেখছিল মুকুন্দ। চোখ দুটো প্রায় শতাব্দীর সিকি কম বছর এমনি পুরোনো বাসনের ফাটাচটা ছিদ্র ভাঙ্গা তোবড়ানো খুঁজে খুঁজে চেয়েছে। চোখ দুটো বাইরের কাজ করে। কিন্তু মনের ভিতর আরও কি ঘুরে বেড়ায় চোখের জিনিসগুলো পেরিয়ে কি সব অনামী দৃশ্যতে। কিম্বা নাম যে সবের হারিয়েছে, কিন্তু ছবিগুলো স্পষ্ট হয়ে থেকেছে। দু হাত ঠুং ঠুং করে পিতলের তামার চৌকো গোল পাত কেটে ছিদ্রের মুখে বসিয়ে ঝালাই করে যায় সকাল থেকে সন্ধ্যা। চোখের রেখা

কাঁপে না, সূক্ষ্ম থেকে সূক্ষ্মতর ফাটলের দাগটুকু যতক্ষণ না অদৃশ্য হয়। মুকুন্দ কিশোর বয়সে বাপের কাছ থেকে শিখেছিল কারিগরী। বাপ থালা বাসন গড়াত একটা গঞ্জের বাজারে। পুরোনো চালচিত্তিরের মত ছবিটা যেন দেখা যায় স্থির হয়ে আছে। ধুলো পড়ে একটু ম্লান কোথাও। রাস্তার একপাশে সার বাঁধা গঞ্জের ব্যাপারীদের দোকান। অন্যধারে পাড় নেমেছে দোতলা সমান নীচে। দোকানে বসে চোখে পড়ত বড় বড় নৌকোর মাস্তুলে আঁটা নিশানা হাওয়ায় উড়তে উড়তে মন্থর বেগে এসে থামত দোকানের সামনে। লাল নীল সাদা হলদে কত রঙের পতাকা। আর পাড়ে গিয়ে দাঁড়ালে দেখা যেত যেখানে অনেক দূরে গাঙের বাঁক বিরাট প্রশস্ত হয়ে ঘুরেছে, ততদূর পাড় ধরে ক্রমে ক্ষুদ্র থেকে ক্ষুদ্রতর হয়ে আসা সার বাঁধা অসংখ্য বড় বড় মহাজনী বজরা আর গাঙনার নৌকো, পানসি ডিঙি জেলে নৌকো। ছইয়ের পর ছই, খুঁটি পোঁতা জলে, যেন কালো কালো এক দঙ্গল জলচর জীব একসঙ্গে ভেসে উঠেছে চরে। আর নদীর বিরাট বুক এক প্রকাণ্ড হীরের উপত্যকার মত ঝক ঝক করে সূর্যকিরণ লেগে। পাল তুলে ভেসে যাওয়া একটা নৌকো দেখতে দেখতে ছোট হয়ে আসে দূরে। বিকেলের পড়ন্ত সোনায় মুড়ে যায়, তারপর আঁধারে ডুব দেয়। টিমটিমে আলো জ্বলে অনেক দূর থেকে। যেন শিশুর মত পিছনে চেয়ে থাকে, বিশাল নদীর মাতৃবক্ষে ভেসে চলে যেতে যেতে।

সারাদিন ঠুন্ ঠুন্‌ঠুন্। আর হাপরের একটানা শ্বাস ফেলা। মুকুন্দর বাবা অমনি দুহাঁটু ফাঁক করে হাপরে হাত রেখে এক দৃষ্টে চেয়ে দেখত মেরামতি বাসন সারতে সারতে। তারপর মন্বন্তর আসে দেশে। বরাবর সমস্ত ছবিগুলো মুকুন্দর মনে এসে একাকার হয় এই ছবিতে। তখন তার বয়স পূর্ণ হয়েছে। কিন্তু একা মন্বন্তর নয়, তার সঙ্গে এসেছিল দুর্যোগ। দেশ ছেড়ে মুকুন্দকে বেরোতে হল ভাগ্যের দিশা খুঁজতে। মাথায় একটা কাঠের বাক্সে উনুন, ছোট হাপর, তামা পিতলের কুচি, আর ঝালাইয়ের সাজ-সরঞ্জামগুলো ভরে—ঘটি বাটি সারাবে—! তামা পিতলের হাঁড়ি হাতা খুন্তি গেলাস বাটি —সা-রা-বে—! কালহীন সুর হেঁকে হেঁকে অচেনা সহর বাজারের মধ্য দিয়ে অনেক পথ ঘুরে যেতে হয়েছিল। অনেক রাস্তার ধারে যখন ক্লান্ত হয়ে পড়ত শরীরটা, বাক্স নামিয়ে তার উপর মাথা রেখে ঘুমিয়ে পড়ত। কোথা থেকে কোথায় চলেছিল তা মনে আসেনি, পাঁচজনের সঙ্গে সঙ্গে এক অঞ্চল থেকে অন্য অঞ্চলে ঘুরতে ঘুরতে গিয়েছে। পায়ের ছাপ বছরের ধুলোয় পড়ে মিলিয়ে গেছে।

একদিন ধূলিম্লান ভ্রূ জোড়ার নীচে থেকে চাইতে চাইতে মুকুন্দ এসে ঢুকলো শ্রীধাম নগরে। একেবারে পশ্চিমে। তার মন বলল এখানেই থাক। অনেক বন্ধন, ঘরদোর স্ত্রী পুত্রাদি মন্বন্তরের ঢেউয়ে যেন কোন এক নির্বাক অন্ধকার তুলি টেনে মুছে নিয়ে গিয়েছিল। ছিল তবু কাঠের বাক্সটা, ঝালাই মেরামতির অস্তরগুলো, ছোট ছোট তামা পিতলের কুচি আর ট্যাঁকে গণ্ডা আষ্টেক নগদ পয়সা। এখানেই ঘুরে ঘুরে তার পথটা ছোট গণ্ডীটুকুতে এসে যেন কুণ্ডলী হয়ে ঘুমিয়ে পড়ল।

ঘাটের কাছাকাছি রাস্তা ধরে মানুষ যাতায়াত করে বারোমাস। মুকুন্দর দোকানে কাজ আনে অনেকে। সকাল থেকে রাত অবধি মেঝেয় বসে কাজ করে চলে, হাত দুটো আর দুচোখ নিজেদের তন্ময়তায় মগ্ন হয়ে থাকে। এখানে একটা খুঁটিতে বেঁধেছে ভেলাখান। তবু বুকের মধ্যে কি যেন অসমাপ্ত থাকে। মুকুন্দ কাঁসারী কত সীমানা মুছে যেতে দেখেছে তার পদচিহ্নের পিছনে, কিন্তু নদীর সেই বিপুল দাগটা মোছে না, জেগে থাকে

বুকে, বয়ে চলে মানুষের চোখের অবিরল চাউনিতে। কখনো তার আভাষ স্পষ্ট মনে হয়। ছোট হাতুড়ি ঠোকা বন্ধ করে সে মুখ তুলে তাকিয়ে দেখে। জোড়া জোড়া চোখ খনকাঠের সীমানার উপরে জেগে থেকে আস্তে আস্তে পেরিয়ে যায়। যেমন নদীর জল বয়ে যায়। এগিয়ে আসে, একবার ছোট একটা ঢেউয়ের ভাব তুলে আবার ভেসে যায়, চিরকালের মত। নতুন মুখগুলো আসে অনেক দেশ থেকে। আরও পশ্চিম থেকে, মাথায় হলুদ রঙের পেঁচানো পাগড়ি, লাঠি হাতে, গলায় কাঠের মালা, কানে মাকড়ি, পায়ে শুঁড় তোলা নাগরা জুতো। মেয়েদের গা ভর্তি রুপোর গহনা, একহাত রঙীন ঘোমটা টানা। পুরোনোগুলো থেকে যায়। রোজ গঙ্গার ঘাটে চান সেরে ফেরে সামনে দিয়ে। মুকুন্দর উঁচু পটেয় ঠেস দিয়ে কেউ গল্প করে। মুকুন্দর কথা শুনতে ভালবাসে অনেকে। চিবুকের উপরে বাঁ হাতের আঙ্গুল বোলাতে বোলাতে মুকুন্দ তাকায়। কথা বললে ওর উপর নীচের মাড়ির শূন্য উন্মুক্ত স্থানটা মেলে থাকে। দাঁতগুলো বেশীর ভাগ পড়ে গিয়েছিল। কিন্তু মুকুন্দ কোনোদিন স্বীকার করে না যে সেগুলো স্বাভাবিক নিয়মে পড়ে গেছে, বয়সের সঙ্গে সঙ্গে খোয়া গেছে একটির পর একটি,—ভগবানের দেওয়া দাঁত থাইক্‌তে বাঁধাতে যামু ক্যান্‌—? সে জিজ্ঞাসু দৃষ্টি তুলে ধরে কেউ প্রসঙ্গটা তুললে। মুকুন্দর সকল উক্তি শেষে পৌঁছয় সেই মন্বন্তরের কথায়। সব সময় তা একটা প্রলয়কালীন ঘটনার মত ওর বর্ণনায় ফুটে ওঠে,—মানুষ হাজারে হাজারে দ্যাশ ছাইড়্যা বাইরাল। একডাও দানা কারও ঘরে নাই। মহাজনের গুদাম খালি। তারপর দুর্যোগ আইল—নদী ফাঁইপা উঠল অজগরের মত—সে তোমরা বুঝবার পারবা না—আর ঝড়। সে কি তুফান বইতে লাগল! ক দিন ক রাত ধইর্যা দ্যাশডার বুকের উপর দিয়া ভাসায়া লয়্যা গেল চারিধার—বড় বড় মহাজনী নৌকাগুলারে আছাড় মাইর্যা খান খান কইর্যা ফ্যালাইল—

কোনদিন স্পষ্টভাবে বলে না মুকুন্দ কোন বিশেষ ঘটনায় তার দাঁতগুলো অমনভাবে পড়ে গিয়েছিল। কিন্তু ওর বর্ণনাতে এমন প্রাণবন্ত রূপ ফুটে উঠত যে শ্রোতাদের চোখে সত্য সত্য ধরা দিত একটা দুর্যোগ, ভয়াবহতা যার সীমাহীন। মুকুন্দ নিজেও ভুলে যেত। কারণ তার জীবনে একটা প্রলম্বিত সত্যের আকারে চিরকাল মেলা রয়েছে কোনো বিপুল দুর্ঘটনা। যেটা তার সমস্ত জীবনের মাঝখানে স্থায়ীভাবে বসবাস করছে। বাইরে তার প্রত্যক্ষ রূপ কখনো প্রলয়ঙ্কর হয়ে ওঠে। বর্ণনা করতে গিয়ে সে নিজেও মুগ্ধ না হয়ে পারে না। সেই প্রলয়ের ছবিটায় সে যেন খুঁজে পেত একটা অন্তঃক্ষরিত রহস্য, তার অমোঘ শক্তির সর্বব্যাপকতাই সে বারেবারে উল্লেখ করতে চাইত।

দাঁতগুলো পড়ে যাওয়া, দেহের চামড়া একটু একটু করে কুঁচকে ওঠা, এককালের কর্মঠ পেশীগুলো হঠাৎ শিথিল হয়ে আসা, চুলগুলো দেখতে দেখতে ধপধপে সাদা হয়ে ওঠা,—এসব কিছুর মধ্যে, স্তব্ধ আর অপ্রতিহতভাবে সেই একই দুর্ঘটনার ইঙ্গিতে ফুটে ওঠে যা থেকে সে কোনোদিন পরিপূর্ণভাবে মুক্ত করতে পারেনি নিজেকে। এক দুর্নিবার অপরোক্ষ শক্তির ইন্দ্রজালে তা তার কোষে কোষে অনুপ্রবিষ্ট হয়, হরণ করে নেয় সামর্থ্যকে। মুকুন্দ ডান হাতের বহু বছরের কাজ করা কড়াপড়া আঙ্গুলগুলো মেলে হাতটা উল্টে চেয়ে চেয়ে দেখে। তারপর একটা আঙ্গুল দিয়ে থুত্‌নির উপরে ঘসে ঘসে ভিতরের দন্তহীন মাড়িটাকে অনুভব করে। আঙ্গুলের শুকনো বাকলের মত রুক্ষ চামড়ায় থুত্‌নির উপরে শিথিল ভিজে ভিজে মাংসের ছোঁওয়া একটা ক্লেদাক্ত বোধকে জাগিয়ে তোলে। সে আঙ্গুলে নামিয়ে নেয়। কাটা কুমড়ো পচে উঠলে যেমন আঙ্গুল গলে যায়

তেমনি শরীরটা ত্যালতেলে হয়ে উঠেছে জায়গায় জায়গায়। একটা দারুণ নিরাশা অন্ধকারের মত চোখে ঘিরে আসে। আবার চোখ দুটো হাঁতড়ে ফিরে চলে। মন্বন্তরের অনেক আগে টিনের একখানা চালা ঘরের ছবি ভেসে ওঠে চোখে। সামনে পথ, গঞ্জের হাটে ব্যাপারীরা হাঁকডাক করে মাল মোট তোলে নামায়, খাড়া পাড়ের গায় সারবাঁধা মানুষগুলো এ ওর মাথায় তুলে দেয় বস্তা। বড় বড় সওদাগরী নৌকোর খোলে ভর্তি হয় ধানচাল আরও কত সামগ্রী। সেখান থেকে দূরে সবুজ ঘাসে ঢাকা মাটির কোল ছুঁয়ে যায় নদীর ঢেউগুলো। বাসনার মত কি উদ্দিপ্ত হয়ে ওঠে তার মর্মে। স্মৃতিকে যদি বওয়ানো যেত, চিরযৌবনা স্রোতবতী ধমনীতে তরুণ অনুরাগ ভরা স্পন্দনকে পুনঃ জাগিয়ে তুলত; শিথিল স্নায়ু শিরার ভাঁজে পেশীগুলোর ফাঁকে ফাঁকে ঢেলে দিতে পারত তার রস, অনন্তযৌবনা নদীর ভাব দিয়ে বাসনায় জরিয়ে দিতে পারত দেহের বৃন্তমূল, ইন্দ্রিয় ইচ্ছা সবকিছু। কথা বলতে গিয়ে মুকুন্দ নিজের রসিকতায় হো হো করে হেসে ওঠে, হাসির আওয়াজে এমন একটা সাহসী ঝংকার ফোটে যা জরা আর বার্ধক্যকে মনে করায় একটা ছদ্মবেশ, একটা প্রগাঢ় ছলনা।

মুকুন্দ স্পষ্ট বুঝতে পারে না কি ঘটে তার দ্বিসপ্ততি-বর্ষের প্রাচীন কাঠামোর ভিতরে। কখনো মনে হয় ব্যারামে ধরেছে। দ্রুত দেহটার তল থেকে মাটি সরিয়ে নিয়ে যাচ্ছে। অথচ স্পষ্টভাবে তা ধরাও যায় না। গোপন থেকে রোগটা একটু একটু করে অধিকার করতে থাকে দেহের রাজ্যে। কলুঙগীতে একটা ধুলো পড়া কালীর পটের পিছনে রাখা থাকে একটা আরশি। সেটা পেড়ে নিয়ে মাঝে মাঝে সে তেড়ি কাটত, পাকা চুলগুলো উপড়ে ফেলত। কিন্তু একবার দেখল সারা মুখে সেই অনির্দেশ্য ব্যাধি এত দ্রুত জিতে নিচ্ছে যে সে এ'টে উঠতে পারছে না। একদিন সে চমকে উঠল নিজের চোখের মণির দিকে তাকিয়ে। একেবারে ঝাপসা দেখালো, চারিপাশে একটা প্রভাহীন ঘোলাটে আস্তরণে ঢেকে গেছে। মনে হল কালকেও যেন দেখেছিল চোখ দুটোকে চকচক করতে, এক রাতে ম্লান করে দিয়েছে তার দীপ্তি। নাকি সে চোখে দেখছে কম। কিম্বা আরশিটার কাচে দোষ হয়েছে। কিছুদূরে একটা দোকানের ঝকঝকে বড় আয়নায় প্রতিফলিত হতে দেখে সে নিজের আকৃতিকে একদিন যখন ফিরছিল বাজার থেকে। সে তাকাতে লাগল নিজের চোখে। পিছনে কে রসিকতা করে বলে উঠেছিল,—বলি ও মুকুন্দখুড়ো, অত রূপের দিকে নজর দিলে খোয়া যাবে শেষটায়।...

—মুকুন্দদাদা পিসীর ঘড়াটা মেরামত করা হল নাকি?—গলার স্বর কানে পৌঁছতে মুখ তুলে তাকাল মুকুন্দ রাস্তার দিকে। চোখ দুটো হঠাৎ একরাশ অন্ধকার ঠেলে উঠে সহসা খুঁজে পায় না স্বরের অধিকারিণীকে।

—কে বিন্দা—ঘড়াটা কখন লয়্যা গেছে কালীদিদি, কাল বৈকালেই আসছিল না—

—ওমা তাই নাকি!—তা আমায় বলেও নি সে কথা। দেখ'ত মিছিমিছি বিরক্ত করতে এলাম।

—আহা বিরক্ত কয় কেডা—দরকার না থাইকলে বুঝি আসতে নাই একবারও—?

রাস্তায় দাঁড়িয়ে থেকে দোকানের মেঝের একটা হাত রেখে ঝুঁকে তাকিয়েছিল বৃন্দা। মুকুন্দ কথা বলতে বলতে হঠাৎ চুপ করে একদৃষ্টে চেয়ে দেখতে লাগল। চোখ দুটো কোনো একটা উপলব্ধি করবার চেষ্টা করে কিন্তু স্পষ্টতা পায় না। তার মুখের রেখাগুলোয়

আস্তে আস্তে একটা পরিবর্তন ফুটে ওঠে, উজ্জ্বল হয়ে ওঠে মুখটা। বৃন্দা বিশ বাইশ বছরের বিধবা যুবতী। সাদা থান পরা ঢালাই করা ঘড়ার মত মাজা পেটা গড়ন। ঘাট থেকে স্নান সেরে সদ্য উঠে এসেছিল, কপালে নাকে শ্বেত চন্দনের রসকলি চিহ্ন আঁকা, ভিজে চুল থেকে জলের ফোটা গড়িয়ে এসে শিশিরের মত ফুটে উঠেছিল মুখের কোমল পাতায়। মুকুন্দর মুগ্ধ অস্পষ্ট চাউনিতে মনে হয় সে মুখ সদ্য ফোটা কুন্দের মত। আর্দ্র বস্ত্রের ঘনিষ্ঠতায় অটুট যৌবন রেখার পুঞ্জিত লীলাভঙ্গী ফুটে উঠেছিল স্তবকে স্তবকে।

—ওটা কি হাতে করে বসে আছ মুকুন্দদা—

—এডা?—মুকুন্দ মুখ নামিয়ে তাকাল হাতে করা জানসটার দিকে। একটা অপ্রস্তুত সলজ্জভাবের কৈশোর নবীনতা ছড়িয়ে পড়ে তার মুখে।—এডা পিত্তলের কঙ্কন একডা, দিয়া গেসিল ওই হরিমণি বইলা ছুঁড়িটা,—কয় তুমি তামা পিতল ঝালাই কর। এডা পিতলের কিনা, সাইরা দ্যাও—!

—ও তাই বুঝি—তুমি বুঝি গয়নাও মেরামত কর মুকুন্দদা—? অধরোষ্ঠ দাঁতের ফাঁকে চেপে ধরে কটাক্ষ হেনে তাকাল বৃন্দা। তার সে দৃষ্টির স্ফুলিঙ্গে মুকুন্দর বার্ধক্য জীর্ণ শরীরের তলায় কি যেন গ্রীষ্মকালে শুকনো ঘাসের প্রান্তরে লাগা অগ্নিরেখায় জ্বলে উঠল। কিন্তু কিছু বলতে পারে না, বলে—

—পিতলের এডা।

—আমায় কেমন মানাবে পরলে মুকুন্দদা?—নিঃসঙ্কোচে একটা নিরাভরণ হাত বাড়িয়ে ধরল বৃন্দা। মুকুন্দর দুচোখ এগিয়ে আসে পূজারীর মত। তারপর একটু ঝুঁকে পড়ে একখানা বালা নিয়ে বাঁহাতে সে বৃন্দার প্রসারিত হাতের আঙ্গুলগুলো ধরতে গেল। মুহূর্তে হাতটা সাপের জিভের মত টেনে নিয়ে খিল খিল করে হেসে উঠল বৃন্দা—

—আমি না বিধবা—গয়না পরতে আছে নাকি!

মুকুন্দর অস্পষ্ট দৃষ্টি যেন দেখতে লাগল একরাশ উল্লসিত মুক্তার নির্ঝরকে। কোমল চন্দন লেপা কপালে একটা ফটিকের মত জলবিন্দু কাঁপছিল—তারপর গড়িয়ে পড়ল ঘনকৃষ্ণ চোখের পল্লবে। চোখের একটা পাতা নেমে এসে হাসির ধারা হঠাৎ থেমে গেল।

—বিধবা মানুষের গয়না গায় পরতে নেই যে মুকুন্দদা।

মুকুন্দ বুঝতে পারল না কথার মানে পুরোপুরি বৃন্দার চোখের দিকে চেয়ে থেকে। কৃষ্ণ মেঘপুঞ্জের অনেক আড়াল দিয়ে বিদ্যুতের আনাগোনার মত বৃন্দার চোখ দুটোয় কখনো আনন্দ-বিষাদ কখনো দুরধিগম্য মর্মের ইসারা কাঁপছিল প্রজাপতি ডানায়। মুকুন্দর অভ্যন্তরে যেন বন্ধ ঘরের পর ঘর পেরিয়ে পদশব্দ এগিয়ে চলে। কিন্তু কখনই তা নিকটতম হয় না।

সে বালাটা নামিয়ে রেখে বলল,—তরে বিধবা করল কেডা—সেই বিধাতারে একবার জিগাই এমন সোনার মনিবন্ধ গড়তে গেলা ক্যান যদি অলঙ্কার পরণে বাদ সাধবার মন আছিল?

বৃন্দার মুখে একটা ছায়া এসে পড়ল। মুকুন্দর মনে হয় বৃন্দার চোখ দুটো প্রতিমার চোখের মত চেয়ে থাকে, চঞ্চলতাবিহীন ভাবে।

—কতদিন সোয়ামী গ্যাছে?—প্রশ্ন করে মুকুন্দ।

—সে অনেক বছর,—অন্যমনস্ক ভাব কাটিয়ে জবাব দিল বৃন্দা,—আট ন' বছর হতে চলল।—

—কি হইছিল?

—কি এক ব্যামোয় ধরেছিল ডাক্তার ধরতে পারল না। সাতদিন জ্বরে বেহুঁস হয়ে থেকে শেষরাতে মারা গিয়েছিল। আমি তখন বারো বছরের মেয়ে।—

বৃন্দার মুখ থেকে বিষণ্ণতার ভাব সম্পূর্ণ অপসারিত হয়ে যায়। চোখ দুটোয় চপলতা ফুটে ওঠে। আবার আগের মত কৌতুকমেশা চটুল গলায় বলল,

—মুকুন্দদাদা তীর্থে এসে এতকাল রইলে, ঘরসংসার কোথায় রেখে এসেছো—কোনদিন ত বল না?

মুকুন্দ হঠাৎ বড় বড় চোখ করে চাইল,—শোন্ মাইয়্যাডার কথা! সংসার আবার রাইখ্যা আসব কোনখানে? তোমাগো সাথে সংসার পাতুম বইলাই না শ্রীধামে আসছি!

—না গো না!—তীক্ষ্ন সুরে বেজে ওঠা গলায় বাধা দিয়ে বলল বৃন্দা—জিগ্যেস করছিলাম তোমার দেশে পরিবার ছিল যে, সে পরিবার কোথায় রেখে এসেছো?

—রাধারাণীর পায়!—কেমন একধরনের অদ্ভুত মধুর হেসে তাকাল মুকুন্দ,—তারা রাধারাণীর সংসারে আছে।

বৃন্দা কথাটার অর্থ আঁচ করতে না পেরে ভুরু কুঁচকে চাইল। মুকুন্দর মনের প্রান্তে সেই দুর্ঘটনা দূরে ভাঙ্গা বাড়ীর মত জেগে ওঠে। তার দৃষ্টিশক্তি প্রতিমুহূর্তেই ক্ষীণ হয়ে আসে। মাঝে মাঝে মনে হয় চোখ ফেরাতে পারে না সে এক জল থেকে যার বুকে তিমির দ্রবীভূত। তার সমস্ত ইচ্ছাকে ফিরিয়ে এনে জড়ো করবার চেষ্টা করল সে বৃন্দার চন্দ্রকলার মত মুখচ্ছবিতে।

বৃন্দার হাসি তাকে উদ্ধার করল,—তুমি কেমনধারা সংসারী মুকুন্দদা! দিয়ে ফেলে আবার নতুন করে চাইতে আছে নাকি?

মুকুন্দর চোখ মুখ উদ্ভাসিত হয়ে উঠল—ক্যান লমুনা! পুরানডারে দিয়া দিয়া বুঝি আর নূতন কইর‍্যা মাগ্‌তে নাই? পুরান যা তাই ত নূতন কইর‍্যা ফির‍্যা আসে বার বার—

নিশিদিন মনের পিছনে একতারার মত একটা সুর বাজে। যে নদী অনন্ত যৌবন-প্রবাহে বয়ে চলে তার ফল্গুধারা শিরার মধ্যে চঞ্চল হয়ে আসে। বৃন্দার মুখে যেন অব্যক্ত কথা ফুটে থাকে, হাসির পিছনে মরীচিকার মত থেকে থেকে আবার হারিয়ে যায়। তবু মুকুন্দ চোখ সরাতে পারে না।

—ওমা, তা সখ তোমার ত খুব মুকুন্দদা—!

বৃন্দা কৌতুক ভরা দৃষ্টি নিক্ষেপ করল। সাদা ভ্রূর নীচে থেকে মুকুন্দর চোখ দুটো পাথরের মত ঝকমক করছিল। মুখের রেখায় ভরে উঠেছিল একটা যৌবনস্মৃতি, অনুরাগের হাসি প্রাচীন শীর্ণ ঠোঁট দুটোর নিরনুভূতিতে কোমলতা এঁকে দিয়েছিল।

পথ দিয়ে অবিশ্রান্ত লোক চলে। খেয়া ধরতে ছোটে কতক লোক। স্নান সেরে ঘাট থেকে ফিরে আসে আরও অনেকে। পায়ের শব্দ কথাবার্তার গুঞ্জন, কাছের আওয়াজ আর দূরের আওয়াজে মুখরিত প্রতিদিনকার দিনমান অব্যাহত বয়ে চলে। রাস্তায় দাঁড়িয়ে একটা কনুই দোকানের মেঝেয় ভর করে রেখে মাথাটা আলতো ভাবে হেলিয়ে ধরে থাকে বৃন্দা হাতের তালুতে। কপালে শুকিয়ে যাওয়া চন্দনের ছাপগুলো আবার ভিজে উঠেছিল ঘামে। গায়ের ভিজে একহারা থানটা গায়েই শুকিয়ে এসেছিল। একজন মালাকার চুপড়িতে কলাপাতা চাপা দেওয়া সদ্য তোলা ফুল নিয়ে যাচ্ছিল।—চাঁপা গন্ধরাজ টগর

দোপাটি গাঁদার মালা কয়েক গোছা। ঝুড়িটা হাতে নাচাতে নাচাতে হনহন করে সে গেল গিরিধারী জীউর মঠের গলিতে মালা বেচতে। যাত্রীরা মালা কিনে দেয় বিগ্রহে। বৃন্দার হঠাৎ ইচ্ছা করল একটা মালা চেয়ে হাত ধরে থাকতে। কিম্বা আপন গলায় পরতে। কেন এমন ইচ্ছা এল মনে সে জানে না। হয়ত ফুলগুলোর গা ছোঁওয়া বাতাসে একটা কিসের স্মৃতি নিয়ে আসে যা কোনদিন জীবনে ইতিপূর্বে ঘটেনি।

মুকুন্দর মুখের দিকে চেয়ে সে দেখতে পায় তার অসম্ভব জরাভার দেহটা। হাঁটুর মাঝখানে মাথা ঝুঁকিয়ে কাজ করছিল মুকুন্দ। পিঠটা বেঁকে দুমড়ে গিয়েছিল, বিশীর্ণ কণ্ঠার হাড়ের দুপাশে থলির মত ঝুলে থাকে গলার লোল চামড়া।

—বৃন্দা, তর মুখের দিকে চাইয়া থাইক্যা আমার ক্যামন মনডা হয় জানস্? ঠিক রাধারাণীরে য্যান আমি দ্যাখতে পাই সমুখে।

বৃন্দা চমকে উঠল। কানে ঢোকে কী প্রগাঢ় স্বর। সামনের কালহীন বয়সী বার্ধক্যের মূর্তি যেন বস্তুত্ব হারিয়ে মিশে যায় আশেপাশে বিক্ষিপ্ত দ্রব্যগুলোর মধ্যে। পুরোনো টোল খাওয়া কলঙ্ক ধরা প্রভাহারানো ঘটি ঘড়া থালা গেলাস। রাস্তায় উজিয়ে আসা মুখের পর মুখ চোখের কানা দিয়ে ভেসে যায়। বৃন্দা মাত্র একটা স্বরের উপস্থিতি টের পায়। সুপ্ত কোন এক গুহায় বিনাঘাতে প্রতিধ্বনি উঠে ফিরে আসে। আর সব কিছু ছিটিয়ে থাকে আলো অন্ধকারে ভাগাভাগি হয়ে। কতকগুলো স্বপ্নের ছাঁচের মত। কিন্তু স্বরটা তার বুকে খঞ্জনীর মত বাজতে থাকে মৃদু রিন্ রিন্ ঝঙ্কারে। কোথা থেকে প্রবাহিত হয় এই ধ্বনি। তার মর্মগুহায় অব্যক্ত ধ্বনিদের বন্ধন মোচন করে সুগভীর স্বপনে ভরিয়ে দেয় তার কখনও সাড়া-না-জাগা অনাদিকালের যুবতীহৃদয়কে। ঘাটের পথ ধরে চলা মানুষদের চোখ লক্ষ্য করে না মুকুন্দ আর বৃন্দাকে। বা অনুভব করতে পারে না বৃন্দার মনের কোন ভাব বিদেহী হয়ে জড়িয়ে যায় মুকুন্দর কণ্ঠনিঃসৃত সেই আওয়াজে।

—আসি তা'লে মুকুন্দদা, ওমা বেলা কত বেড়ে উঠল বল দিকি! পিসী গালি পাড়বে। আমি বলব মুকুন্দ দাদা আমায় আসতে দেয় নি।

মুখ ফিরিয়ে নিতে নিতে বৃন্দার চোখের কষ্টি কালো মণি দুটো টলে পড়ল চোখের সীমাকোণে, ঠোঁটে এক ঝলক হাসি কিসের একটা স্মৃতির পুনরাবৃত্তি করে। মুকুন্দর মনে হয় সে যেন দেখতে পায় একটা দরজা ধীরে ধীরে বন্ধ হয়ে যেতে।

—আবার আসিস্ বিন্দে, বলল সে। বৃন্দা একবার ফিরে দেখল। দুচোখে কি স্বতঃস্ফূর্ত হয়ে ফুটে উঠল, কিন্তু ততদূর মুকুন্দর ক্ষীণদৃষ্টি দেখতে পেল না।

কালী বোষ্টুমী পা ছড়িয়ে কোলে একটা কুলোয় করা চাট্টি খুদ বাছছিল আর হেঁট মাথায় বিড় বিড় করে বকে যাচ্ছিলো। ছোট করে ছাঁটা কাঁচা পাকা চুল ঢাকা মাথাটা থেকে থেকে ঝুঁকে নেমে আসছিল কুলোর উপর। কালী তখন মুখ তুলে তাকায় ছোট উঠোনটা পেরিয়ে খিল খোলা দরজার দিকে। চোখ দুটো তার সর্বদা পুরো খুলে থাকে, যেন কোন একটা অসহ্য আবেগে সে দুটো কোটর থেকে বেরিয়ে এসে আর স্বাভাবিক স্থানে ফিরে আসতে সক্ষম হয় নি। একটা অস্বাভাবিক অভিব্যক্তিতে ঠিকরে চেয়ে থেকেছে তারপর থেকে। বাইরে থেকে দেখায় তা দুটো খোপ থেকে বেরিয়ে আসা ভাঁটার মত, লাল ছড় টানা টানা ঘোলা ঘোলা। চোখ জোড়া মনে হয় জ্যোতিহীন, কিন্তু অল্প খয়েরী

মণি দুটোর দিকে সোজা তাকালে সে ধারণা মুছে যায়। মণি দুটো এক অসহ্য তীব্রতায় সব সময় জ্বলে। সেই জ্বলায় কোন মায়া মোহ অনুরাগ আসক্তি আনন্দ দুঃখের ভাবান্দোলিত বৈচিত্র্য নেই। তা সব সময় রুক্ষ গ্রীষ্মের আকাশের মত নিস্পন্দ প্রদাহে মেলে আছে, ছাঁচে ঢালা তীব্র স্নায়বিক অভিব্যক্তিতে। যদি কোন মনের আবেগ সেখানে দেখা দেয় তা হল একটা ঢালাও বিদ্বেষের। সেই সদা বিস্ফারিত চোখজোড়ার উপর থেকে উঠেছে অত্যন্ত বড় মসৃণ কালো কপাল। সরু রগের নীচে দুটো ভারী ভারী গাল ঝুলে পড়েছে ঢিবি থুতনীর দুপাশে। পুরু উপর ঠোঁটে একটা প্রকাণ্ড ডুমো আঁচিল, স্থূল চ্যাপ্টা নাক মুখ ভোঁতা কুকুরের মত ঝুঁকে থেকে থেকে এক এক সময় হঠাৎ স্ফুরিত হয়ে ওঠে। নাকের উপরিভাগ ভ্রূ-সংযোগের কাছটায় একেবারে বসে গেছে, সেখানে কার্লাসিটের মত দাগ চক চক করে। সামান্য উত্তেজনা পেলেই ভুরুদুটো কুঁকড়ে উঠে জুড়ে যায়, আরক্ত দুচোখ ঘেঁসাঘেঁসি এসে ধক ধক করে ওঠে।

কিন্তু খুদ বাছবার সময় কালীর মুখটা বড় বেশী নামানো থাকে। কেবল চোখে পড়ছিল পিঠের কুঁজটা গোল হয়ে উঁচু হয়ে থাকতে।

খুদ থেকে কাঁকর বাছছিল কালী। যত কাঁকর তত খুদ। গেরস্ত বাড়ীগুলোয় হরেকেষ্ট বোল দিয়ে গিয়ে খিড়কিতে দাঁড়ালে দেয় মুঠি ভর। পলস্তরা হীন দেয়ালে একটা কাঠের গোঁজ থেকে ঝোলান ভিক্ষের ঝুলিটা কালীর। গায় একই পেরেকে ঝোলান নাম জপের থলি। আর একটা গাবকাঠের লাঠি। আজকাল লাঠি বিনা চলতে কষ্ট হয় কালীর, কোমরে পিঠে বাতে ধরেছে। শিরদাঁড়া তাই সোজা করতে পারে না, সামনে একটু ঝুঁকে চলতে হয় ফালা বঁটির মত। আটচল্লিশ বছর এই সহরের পথে পথে ভিক্ষে করে ফিরেছে কালী বোষ্টুমী। কড়ি কাঠে ঝুলে থাকে পেঁচানো দড়ির শিকায় ধুলোপড়া বহু প্রাচীন একটা খালি হাঁড়ি। বড় বড় মাকড়সা দেয়ালের গা থেকে চেয়ে থাকে। পুরোনো কাপড়ে সেলাইয়ের ফোঁড় দিয়ে ভিক্ষের ঝুলি তৈরী করত কালী। পাড়ে কৃষ্ণের শতনাম তুলত। বংশীধারী কেষ্ট রাধিকের একবার একটা যুগল মূর্তি সূচ দিয়ে তুলেছিল গায়। আবার যেখানটা ছিঁড়ে যেত সেখানে তাঁতিদের রঙের সুতো দিয়ে বাহার করে মেরামত করত। এক একটা ঝোলা চলেছে বিশ বছর। একবার একটা ঝোলা সে দিয়েছিল ব্রজগোসাঁইতলার কিরণ বোষ্টুমীকে।—বাবা, ভিক্ষে দাও গো—হরে কেষ্ট।—কালী খঞ্জনী বাজিয়ে কীর্তন গেয়ে ভিক্ষে করবার চেষ্টা করেছিল। কৃষ্ণের শতেক পদ তার জানা ছিল। কিন্তু গলায় এমন একটা রুক্ষ অকরুণ সুর তার ছিল ছোট থেকেই যে পদাবলীর আবেগ কিছুতেই ফুটত না, গাইলেই মনে হত খ্যার খ্যার করে ঝগড়া করছে। এমনিতেই দেশসুদ্ধ লোক তাকে পাড়া কুঁদুলী বলে জানে। কেউ ঘাঁটায় না। কালী বোষ্টুমী ভাল কথা বললে গলার কর্কশতাহেতু শোনায় যেন গালি। কাঁদলে মনে হয় দুষছে প্রাণ খুলে। গান গাইলে তা শোনাত আর্তনাদের মত। তাই সে অনেক বছর ধরে শুধুমাত্র একটি শব্দ আবৃত্তি করে। কি জানি হয়ত বছরের পর বছর হৃদয়ের ধারায় সিঞ্চিত হয়ে হয়ে গলাটা মাত্র ঐ ডাকটার সময়ই একটু দ্রব হয়ে যায়, যখন কালী দরজার ঝনকাঠে একটা হাত রেখে ডাক দেয়,—হরে কেষ্ট!

খুদগুলোর মধ্যে একটি একটি করে কাঁকর বেছে তুলতে তুলতে কালী বকে যাচ্ছিল আপন খেয়ালে,—মর্ আবাগের বেটা বিটিরা, তোদের স্বামী পুত্তুর দিয়েছে হরি—দুচারটে আস্ত চালও চোখের কোল গলে পড়ে না তোদের কুলো ঝাড়তে গিয়ে! অন্ধ হয়ে

খাবি তোরা—সাগর শ্নকিয়ে যাবে তোদের দিশ্টিতে নইলে অভাগীকে কেবল চালঝাড়া খ্নদগ্নলো দিয়ে এলি জীবন ভোর,—আর ও ম্নখপোড়া দেবতা—তুমিও দেখতে পাওনা—অভাগীর চোখের দিশ্টিটে অবধি হরে নিলে গো—ব্নড়ো মান্নষ কাঁকর দেখে কি করে বল দিকিন!

থেকে থেকে ম্নখ তুলে আবার তাকায়। ছোট উঠোনের এক পাশে তুলসী মঞ্চের ছায়া পড়েছিল গোবর নিকোনো মাটিতে। পাঁচিলে বসে একটা কাক এক চোখ ঘ্নরিয়ে লক্ষ্য করছিল তাকে। হঠাৎ কালীর অন্তরে একটা রোষ ক্ষ্নব্ধ হয়ে উপচে উঠল।—আর সে হারামজাদীর দেখা নেই! মর্ ঘাটে গেছে ত গেছেই!—এসে ভিক্ষেয় বের্নতে হবে—এধারে বেলা উঠলো যে শেয়রে, কোন গেরস্ত ভিক্ষে দেবে দ্নকুর বেলা? ঝাঁটা মারব হারামজাদীকে—ম্নখ থেঁৎলে দোব দ্নপা দিয়ে মাড়িয়ে! ব্নড়ো মান্নষকে দগ্ধে খেলো

কাকটার দিকে রোষ কষায়িত দ্নষ্টি মেলে তারস্বরে চেঁচাতে লাগল কালী বোষ্টন্মী। যেন ছদ্মবেশে কোন মান্নষ এসেছে তার অভিযোগগ্নলো শ্ননতে। যতই চেঁচাতে থাকে ততই তার ভিতরে প্নঞ্জিত বিদ্বেষ ঘ্নণা আহত বেদনা অভিযোগ আর অভিমানের উৎসম্নখ খ্নলে যায়।—শোনো—ও তোমরা পাড়ার নোকেরা—কি করে জ্বালা দেয় হারামজাদী—ব্নড়ো মান্নষকে ভাগা দিয়ে বিলোয় আর পোড়ার ম্নখো দেবতা তাকায় না একবারও। দেখো, সে—বারো ভাতারী ছ্নঁড়ি ভাতার কুড়িয়ে বেড়ায় রেতে দিনে—আর পিসী—ভিক্ষে করে খ্নদ কুড়িয়ে রেঁধে গেলায় হারামজাদীকে—গলাটা শেষ সপ্তকে উঠে হঠাৎ খরখর করে ভেঙেগ পড়ল এমনভাবে যা অপেক্ষাকৃত মানবীয় গলায় শোনাত হয়ত কান্নার মত, কিন্তু কালী বোষ্টন্মীর বিভৎস ঠোঁট দ্নটোর ফাঁক দিয়ে যে আওয়াজ বেরোয় তা কোনো বিকলাঙ্গ পশ্নর ডাকের মত তীক্ষ্ন!—

—কি পিসী অত সোরগোল করছ ক্যানে—? দরজা ঠেলে ম্নখে সকাল বেলার সেই হাসির অপভ্রংশ লেগে থাকা প্রফ্নল্লতা নিয়ে এসে ঢ্নকলো ব্নন্দা। মাথা ঝাঁকি দিয়ে চুলগ্নলো পিঠে ফেলে এগিয়ে গেল সে পাতকুয়োর ধারে। সকালে তুলে রেখে যাওয়া এক-ঘটি জল পায়ে ঢেলে উঠে এসে প্রথমে গঙ্গাজলের ঘটিটা নামিয়ে রাখল বারান্দার কোণে। তারপর কাঁধ থেকে গামছাটা রশিতে মেলে দিয়ে আঁচলের খ্নটে বাঁধা মোড়োকের গিঁট নিবিষ্ট মনে ধীরে ধীরে খ্নলতে লাগল। একটা ছেঁড়া পদ্মপাতায় মোড়া ছিল দ্নটো বাতাসা, এককুচো নারকেল, দ্নটো কাঠমল্লিকে আর দোপাটি ফ্নল। কালী বোষ্টন্মী এতক্ষণ স্তব্ধ হয়ে ম্নখ উঁচু করে থেকে একদ্নষ্টে লক্ষ্য করছিল ব্নন্দার প্রত্যেক গতিবিধি। ভ্রূ দ্নটো স্থির হয়ে গভীর ভাবে উপলব্ধি করার তন্ময়তায় ভরে থাকে। ব্নন্দা মোড়োকটা হাতে করে ম্নখ তুলে চোখে চোখ ফেলতেই হঠাৎ ক্ষিপ্ত জন্তুর মত কালী বোষ্টন্মীর সমস্ত শরীরটা কুঁকড়ে উঠল—ও হারামজাদী ভাতার খাগী লা—বেলা মাথায় করে কোন চুলো থেকে আমার ছেরাদ্দি করতে এসেছিস লা—

—পেসাদ, পিসী এই পেসাদ নাও। নিয়ে এন্ন পাটবাড়ী থেকে ফিরতি পথে—।

কালী আবার চুপ করে গিয়ে অবোধ্যতার দ্নষ্টি তুলে দেখতে লাগল। ব্নন্দা কাছে এসে মোড়কটা নামিয়ে রাখল কালীর সামনে। কালীর চোখ দ্নটো মোড়োকটার গা ছ্নঁয়ে ছ্নঁয়ে নেমে আসে মাটিতে। তার সমস্ত মনোযোগ তীব্রভাবে জড়ো হয়ে থাকে সেই একটি লক্ষ্যস্থলের উপরে। আঁচলের খ্নট তুলে চোখের কোণায় এতক্ষণ ধরে জমে ওঠা অর্ধেক

শ্বকিয়ে যাওয়া বড় একটা জলের ফোটাকে মুছে ফেলে দিয়ে মোটা মোটা আঙ্গুল দিয়ে ফুলগুলো সরিয়ে ফেলে একটা বাতাসা তুলে টপ করে মুখে ফেলে দিল। মিষ্টি রস লালায় মিশে মুখের গহ্বরে ছড়িয়ে পড়তে মুখের কৃশ চামড়ার ভাঁজগুলো মোলায়েম হয়ে এল, মুখটায় একটা মধুর স্বাদ উপভোগের পরিতৃপ্তির ছবি ফুটে ওঠে। আরেকটা বাতাসা তুলে নামিয়ে রেখে সে নারকেলের কুচিটা মুখে ফেলে কষের মাড়িতে আস্তে আস্তে চিবোতে লাগল। বৃন্দা কলসী থেকে ঘটিতে জল গড়িয়ে কালীর সামনে হেঁট হয়ে ঘটিটা নামিয়ে রাখতে যাচ্ছিল। কিন্তু হেঁট হতে গিয়ে আঁচলটা অমনি মাটিতে খসে পড়ে কোমর অবধি তার দেহের সারা উপরিভাগ অনাবৃত হয়ে রইল। কালী নারকেলের কুচি চিবোনো বন্ধ করে হাঁ করে চেয়ে দেখতে লাগল বৃন্দার কোন জায়গায় সামান্যও টোল না খাওয়া নিখুঁত দেহ গঠনের দিকে।—কি গড়ন ছুঁড়ির! মরি—সাক্ষাৎ পিতিমের মত যেন মাজা কোমর বুক ছুঁড়ির। কি খায় যে এত আহ্লাদে ভরা ননীর গতর পেয়েছে? ভিক্ষে করা খুদের অন্ন আর খুঁটে আনা শাক সেদ্ধ? ছুঁড়ি নিশ্চয়ই কোথায় লুকিয়ে চুরিয়ে ফলার খেয়ে বেড়ায়! কিন্তু কে দেবে এই চামারদের দেশে বিনে পয়সায়?

কিন্তু বৃন্দার শুদ্ধ হোমের নৈবেদ্যের মত দেহে কোন পঙ্কই গায় ধরে না, পদ্মের মত টলটল করে সরু কটিমূলের বৃন্ত থেকে। কিন্তু এ গতর, এ নদীতরঙ্গে ভরা যৌবন কি শুধু থান কাপড়ে বেঁধে রাখার? আর নিরন্ন দিন গোণার? ভাবল কালী।

—চল পিসী গো, ভিক্ষে সেরে আসি। জলের ঘটি আলগোছা তুলে ঢকঢক করে খেয়ে নামিয়ে রাখল কালী।—হরিহে—মধুসূদন!—সমস্ত দেহ কাতরিয়ে নাম স্মরণ করে উঠে দাঁড়াল সে মেঝে থেকে। পুরোনো ভিক্ষার ঝুলিটা কাঁধে গলিয়ে লাঠি হাতে করে আস্তে আস্তে রাস্তায় বেরিয়ে এল। বৃন্দাও ঝুলি কাঁধে বেরিয়ে এসে শেকল তুলে দিল দরজায়। কালী বোষ্টুমী আর বৃন্দা দুটো বিভিন্ন পথে যায়। অত্যন্ত মন্থর গতিতে কিছুক্ষণ হেঁটে একটা দরজার সামনে এসে কালী অনেক যুগের অভ্যস্ত গলায় ডাক দিল—হরে কেষ্ট! দুটি ভিক্ষে দাও গো কে আছ বাড়ীতে।

মুকুন্দ হঠাৎ টের পেল তার মধ্যে কি যেন ঘটছে। কি তা সহজে বোঝা যায় না। মনে হয় একেবারে নতুন এই ঘটনা, কিন্তু পুরোপুরি অচেনা বোধ হয় না। লক্ষণগুলো তাকে বিহ্বল করে। ভাবটার গোড়া মনে হয় দেহে, কিন্তু আরেকপ্রান্ত পথ করে নেয় মনে,—নাকি মনের তীর ছেড়ে ডুব দেয় কোন সব অপরিজ্ঞাত স্তরে যা কখনও মনে হয় স্মৃতির, কখনও বা হৃদয়; আবার মাঝে মাঝে মনে হয় তা সর্বদিক মুছে ফেলতে ফেলতে এগিয়ে আসা মরণের মত। মুকুন্দ শেষেরটায় এসে থমকে ভাবতে লাগল। সে যখন শিশু তখন থেকে মরণের একটা বাইরের চেহারা সে দেখে এসেছে। তার বুড়ো দাদার যখন মৃত্যু ঘটল। তারপরে যৌবনে বাবার মরণের কালে। শরীরটা হঠাৎ যেন ঘুমিয়ে পড়ল। সেই দুর্দিনের দিনগুলোয় সে দেখেছিল তার বউয়ের কোলে একটা নবজাত শিশুর চোখে তেমনি ঘুম লেগে। কিন্তু ভিতরে, চোখের ঘুমের নীচে তা কেমন দেখতে? কী তা যার নাম শুনে অন্য কি শিউরে ওঠে, কিছুতেই মেনে নেয় না জীবনের সঙ্গে তার নিকট মিত্রতা। আপনার জানায় একেবারে নিছক জানতে পারা যায় কি করে? কোনোদিন মুকুন্দ মরণের এই যে গোপন অব্যক্ত একটা অনিবার্য পরিচয় আছে তা অনুভব করেনি। সে বাইরের আকারে আলোয় পরিশোভিত সীমা মুছে গিয়ে অন্য সীমাবিহীনতাকে ভাবতে পারে নি যাও এই

আধারেই শাশ্বত। কতকগুলো মনগড়া উপায় ভেবেছিল মরণের চেহারা, ভেবেছে এমন চরিত্র দিয়ে যে তার দেহ মন প্রাণ আর তার চেয়েও গভীরতর অনুভব—কল্পনামাত্রই মরণের যে কোনো ধারণাকে সরিয়ে ফেলেছে অস্পৃশ্য কিছুর মত। তার সন্দেহ হয়, এখন যা ঘটছে তার দেহমনের অন্তঃস্থলে অব্যক্ত থেকে, তাই কি মরণ?—

কিন্তু মুকুন্দর মনে হয় তা জাগরণের মত। এ জাগরণেরও সীমা নেই। শরীরটার পর্দায় পর্দায় যখন তা এসে ধাক্কা দেয় তখন হয়ত মরণেরই সেই নিহিত গোপন সত্যটার মত আসে তা। তার জরায় জীর্ণ দেহকে অসংখ্য নখাঘাতে ভিতর থেকে ছিঁড়ে কুটি কুটি করে ফেলতে চায়। কিন্তু তার উদ্বেগ হয় না। বাঁচাবার একটুও ইচ্ছা করে না দেহের পচা ঘুনধরা কাঠামোটাকে। যে উদ্দাম লবণাক্ত স্বাদ আছড়ে আসে তার অবশ বেলাভূমিতে—সে প্রাণপণে আহত হতে চায় তাতে। সে যেন ছেড়ে দিতে পারে তার অস্তিত্বের ভঙ্গুর ভেলাটা—রসের ঢেউয়ে অল্প অল্প করে গলে ক্ষয়ে যেতে অনুভব করে অসাড় চেতনারাশি।

প্রতিদিনের মুকুন্দ কাঁসরীর হাত দুটো চির অভ্যস্ত যন্ত্রের মত নিপুণভাবে ঝালাই করে চলে। কখনও মুখ তুলে তাকায় রাস্তার দিকে। কে যেন অনাগত আসে মানুষ-গুলোর মুখের ছায়ার ফাঁক দিয়ে কোথা থেকে। চুল্লীটায় দুমুঠো ঝুরো কয়লা চাপিয়ে সে হাপর ঠেলতে লাগল। অসংখ্য ছিদ্র দিয়ে লাল অগ্নিময় ফোটাগুলো বড় হয়ে উঠতে লাগল। এক এক করে ফোটাগুলো জুড়ে যায়, তারপর হঠাৎ একটা শিখা সবেগে নেচে উঠল। মুকুন্দ আবিষ্টের মত দেখতে লাগল। হাপরটা ক্রমাগত ঠেলে চলে, আগুন গন্‌গন্‌ করে ওঠে। হাতটার জানা আছে কখন থামতে হয়, একাদিক্রমে পঞ্চাশাধিক বছরের অভ্যাসে। কিন্তু কেঁপে কেঁপে ওঠা সেই স্বচ্ছ দোপাটি রঙের শিখার দিকে মুগ্ধ হয়ে থাকে অবাক চোখদুটো তার। ঘন পাকা ভ্রূর নীচে থেকে চেয়ে চেয়ে আবিষ্কার করছিল কিছু, যার সঙ্গে তার মধ্যে নিবিড় সেই কিসের সূচনার একটা অবোধ্য মিল রয়েছে। তাই কি মৃত্যুর মত? এই ভস্মহুতাশনের প্রলয় দীপ্তির মত অশেষ তরঙ্গে এসে পড়ছে তার ভিতর। তেমনিই যেন জেগে উঠছে কিসের নর্তনশীল পদবিক্ষেপের ছন্দাঘাতে। আবার কি যেন বলছে এই সঙ্গে পুড়ে শান্ত ছাই হয়ে যাচ্ছে সব কিছু। সে চোখ ফেরাতে পারল না। বিনা প্রয়োজনে দু মুঠো কয়লা পুড়ে পুড়ে নিভে যেতে দেখল। তারপর হাত গুটিয়ে ডুবে যায় তন্ময়তায়। মনে হয় তাও মরণ হতে পারে। কিন্তু দুচোখ ভরে মনে আসে বৃন্দার মুখখানা। আজ যেখানে ঠেস দিয়ে দাঁড়িয়ে তার সঙ্গে বলছিল কি সব কথা। তা মনে নেই। মনটাও ঘুমিয়ে পড়েছে। দেহ স্তিমিত প্রদীপের মত সাড়াহীন মুছে গেছে এক অব্যক্ত প্রতীতির অন্ধকারে। বৃন্দার সেই শুক্তির বুকে জ্যোৎস্না পড়া হাসি—আর দুচোখে অমাঘোর মেঘের আড়ালে বিদ্যুতের ইসারা তাকে জাগিয়ে রেখে গেছে মৃত্যুর মত, মুছে যাওয়ার মত—একটা পারাপারহীন স্মৃতিরেখা সমুদ্গত হওয়ার মত।

শণের গোছার মত চুলগুলোয় আঙুল বোলাতে বোলাতে মুকুন্দ ভাবতে লাগল সেই কবেকার দুর্দৈবের ঘটনাটা যার ধাক্কায় সে ভাসতে ভাসতে এইখানে এসে ঠেকেছিল, মনে হয় যেন কাল। আর যে দীর্ঘ বছরগুলো পেরিয়ে গেছে তারা মাত্র কয়েকটা সাদা পাতা যাতে কোনো লেখাই পড়েনি। সে শোনে তার গলাটায় হঠাৎ তরুণ স্বর উচ্ছ্বসিত ফুটতে,—বিন্দা, বিন্দা! তরে লয়্যা যামু এখান থেইক্যা। এ দুকানডারে বেইচ্যা যামু কইলকাতা। সেখানে হাটবাজার ভারী। নয়ত আরও দূর বিদেশে।—বিন্দারে, সুখে থাকুম আমরা দুজনায়।

বুঝতে পারে না কখন দিনান্তের আলো ম্লান হয়ে সন্ধ্যা নামল। গৌরাঙ্গের মন্দিরে

কাঁসর ঘণ্টার আওয়াজ হয়। খেয়া ঘাটে নৌকায় বাতি জেবলে কালো নিথর ছবিগ্লো ভেসে থাকে ছাই বর্ণের আঁধারে। তারাগ্লো জবলে ওঠে।

রাস্তায় রাস্তায় বাতি জবালিয়ে দিয়ে যায় সহরের ভিতর। দোকানে দোকানে গ্যাস-বাতির তীক্ষ্ম সাদা আলোয় মায়াময় দেখায় সড়কগ্লো। বৃন্দা একটা ক্ষুদ্র প্রদীপে শিশি থেকে কয়েক ফোটা তেল ঢাললো। তারপর দেশলাই জেবলে ধরিয়ে প্রদীপটা নামিয়ে রাখল তুলসী মঞ্চের গোড়াতে। প্রণাম করতে করতে সে দেখে ছায়াগ্লো জমে রয়েছে চারিপাশে। কেবল প্রদীপের সলতেটার মাথায় অকম্প দেখায় হলদে আলোর শিখা। তুলসীর কাঠি কাঠি ডালগ্লো কেমন অদ্ভুত। বলে নাকি উনিই নারায়ণ। তাই গাছ হয়েও কি ভাব রয়েছে, প্রদীপের ক্ষীণ আলোয় দেখায় স্বপ্নের মত। প্রণাম করে সে উঠে এসে দাঁড়াল ঘরের বাইরে। ভিতরে কালী বোষ্টুমী সুর করে পাঁচালী আউড়িয়ে যাচ্ছিল।

কর্কশ গলার আওয়াজ থেকে থেকে থেমে আসে, পদ ভুল হয়ে যায়। আবার হোঁচট খেয়ে সজাগ হওয়ার মত সে আউড়িয়ে চলে জোরে জোরে। মাঝে মাঝে পাঁচালীর ফাঁকে দু-চারটে অসংলগ্ন কথাও ঢুকে যায়। বৃন্দা অন্য ঘরটায় ঢুকে ঝোলান বাঁশ থেকে একটা ধোওয়া থান পেড়ে নিয়ে পরনের কাপড় ছেড়ে রেখে দিল এককোণে। তারপর ভ্রু অবধি ঘোমটা টেনে আঁচল জড়িয়ে নিল গলায়। পা টিপে টিপে সে এগিয়ে গিয়ে উঁকি দিল অন্যঘরে। সে ঘরে কুপি জবলছিল। কালী বোষ্টুমী দুলে দুলে আবৃত্তি করছিল। নেমে গিয়ে দরজা সন্তর্পণে খুলে বৃন্দা রাস্তায় বেরিয়ে এল, তারপর ঘোমটা আর একটু টেনে দিয়ে এগিয়ে গেল একদিকে।

একটু পরেই দরজায় শিকল নাড়ার আওয়াজ হল। কালী বোষ্টুমীর পদ আওড়ানো থেমে গেল। দ্বিতীয়বার আওয়াজ কানে পেঁছতেই কালী চেঁচিয়ে উঠল,—অ বিন্দে, দোরটা খুলে দে বাছা, মধুবাবু এয়েচে—।

কিন্তু বাইরে থেকে গলা শোনা গেল,—দোর খোলাই যে দেখছি দিদি, বিন্দে বুঝি বাড়ী নেই?

—বাড়ী নেই? বলি ও বিন্দে,—কাপড়ের প্রান্তটা হাতে করে উঠতে উঠতে চেঁচিয়ে ডাকল কালী,—এসো দাদা ভেতরে তুমি। গেল কোথা ছুঁড়ি? দেয়াল ধরে দুপা এগিয়ে দরজার কাছে এসে সে চাইল উঠোনের দিকে। তুলসীতলায় প্রদীপের মৃদু আলোর ফোটাটায় চোখ গিয়ে থেমে রইল। দরজা ঠেলে ভিতরে এসে দাঁড়াল মধু গাঙ্গুলী।

—এঃ—বাড়ী—হ্যাঃ—বেরিয়েছে বুঝি হ্যা হ্যা,—মধু গাঙ্গুলীর প্রাণখোলা হাসির মধ্যে একটা নৈরাশ্য বেজে উঠল।—তা একটু সাঁঝের ঝোঁকে বাজারে ঘুরতে মেয়েছেলেরা ত চাইবেই। ভদ্দর আর অভদ্দর—তা আমি আজ আসব জানত বুঝি, হ্যা হ্যা হ্যা—

—ঝেঁটিয়ে মুখ ভাঙ্গব হারামজাদীর—বাড়ী ফিরুক—হ্যা আমার নাম কালী বোষ্টুমী দেশ সুদ্ধু নোক নাম শুনলে ডরায় আর সেই আমার কথা গেরাহ্যি নেই—থেঁতো করব বিটিরে।—আক্রোশ সপ্তমে উঠল ঠেলে কালীর গলায়।

—আহা হা দিদি রাগ কোরোনা—এই লাও তোমার জন্যে খাবার এনেছি। ভাবলাম দিদির দাঁতগুলো নেই—তাই নরম খাবার ছাড়া ত খেতে কষ্ট হবে। গলায় প্রগাঢ় সহানুভূতি আর আন্তরিকতার সঙ্গে হৃষ্টপুষ্ট ভালমানুষী ভরা হাস্যোদ্ভাসিত মুখে মধু গাঙ্গুলী চাঙ্গারীতে বাঁধা ময়রার দোকান থেকে সদ্য আনা খাবার বাড়িয়ে ধরল কালী বোষ্টুমীর মুখের নীচে। রাগে পুরো খুলে যাওয়া করমচার মত চোখ দুটো ঠেলে বেরিয়ে আসছিল

কালীর। পুরু ঠোঁট থরথর করে কাঁপতে থাকে,—দরজার আবছায়ায় তার বিপুল আকার-বর্জিত মূর্তিটা বীভৎস দেখায়। কিন্তু চাঙ্গারীর ভিতর থেকে একটা অত্যন্ত মোলায়েম উপাদেয় গন্ধ নাকে পৌঁছতেই কালীর ভিতরে ক্ষুধার জীবগুলো একসঙ্গে জেগে উঠল। সে গালি বন্ধ করে লোলুপ দৃষ্টিতে তাকাতে লাগল।

—আহা দাদা—বেঁচে থাকো,—অভাগীকে কেউ দেখেনা গো, মায় দেবতাও কানা হয়ে গেছে, আর ওই নেমোখারাম ছুঁড়িটে,—বলতে বলতে ভিতরে অবরুদ্ধ তীব্র আবেগের বাঁধ ভেঙ্গে যায়, হাউ হাউ করে কেঁদে উঠল কালী বোষ্টুমী,—আমাকে পেট ভরে দুটো খুদ সেদ্ধও দেয় নি আজ কদিন। ওগো কেউ কি দেখনা অধম্মের বিটির অত্যেচার—!

কাঁদতে কাঁদতে একবার চাঙ্গারীটার একধার থেকে শালপাতা উঁচু করে কালী বোষ্টুমী চেয়ে দেখল। তারপর হঠাৎ চুপ করে গিয়ে একটা সুদীর্ঘ ঘ্রাণ টেনে নিয়ে নিঃশ্বাস ফেলতে ফেলতে অবার বকতে শুরু করল।

মধু গাঙ্গুলী এদিক ওদিক নিরাশ চোখে তাকিয়ে আবার কালীর প্রতি মনোযোগ দিয়ে বলল প্রফুল্ল গলায়—তুমি আগে খাও দিদি। আমার সামনে খাও—আমি চেয়ে দেখি—! হাসতে হাসতে চকচকে পাম্প সু দরজার বাইরে খুলে রেখে ভিতরে এসে মেঝেয় বসে পড়ে একটা সিগারেট ধরাল।

কালী বোষ্টুমীর সুদীর্ঘ আর রুক্ষ সমবেদনাহৃত জীবনেতিহাসে মধু গাঙ্গুলী একটা দৈবসম্পাতের মত এসে পড়েছে। এই প্রথম সে শোনে গলার আওয়াজে যে তরল মাধুর্য গড়িয়ে এসে তার হৃদয়ে ফোটা ফোটা পড়ে জুড়িয়ে দেয়। তার কর্কশতায় কড়া পড়ে থাকা হৃদয়ের আবরণ অমনি মুহূর্তে গলে গেল। যেমন স্বতঃস্ফূর্ততায় সে গালি পেড়ে ঝগড়া করে তেমনি সমান আবেগে ইচ্ছে করে তার কৃতজ্ঞতা জানাতে। যথাসর্বস্ব দিয়ে ফেলতে। কিন্তু তখনই মনে হল তার দেবার মত কিছুই নেই। কথা বলতে বলতে তার গলা থেকে আশ্চর্য সব স্নেহের কথা বেরিয়ে আসে।

—না গো বাবু, ছুঁড়িকে হাতে গড়ে পিটে মানুষ করেছি। বিয়ে দিনু কিন্তু পোড়া কপালী দুবছরেই বিধবা হল।—সেই থেকে ওর মনডা কেমন উদাসতরো, নিজের খেয়ালেই থাকে—

—হ্যা হ্যা—নিঃশব্দে চুপ করে থেকে হাসতে লাগল মধু।—তা বললে কি আর চলে দিদি, হাজার হোক মেয়েমানুষের দেখবার কেউ না থাকলে সে যেন হলো বেওয়ারিশ আমবাগান। যে পারে সেই পাড়ে।—এ্যা—বোলো বিন্দেরে—মেয়েছেলে, এই জীবনে কত সখই না আছে, আর তোমার এই বুড়ো হাড় কটা কি কোনোদিন শান্তি পাবে না? বলে একটিপ নস্যি নিয়ে মধু গাঙ্গুলী বিদায় নিল।

মধু চলে যাওয়ার পর ঘরে এসে কালী বাকি ছানার জিলিপী ক'টা খেতে লাগল। অমৃতের তার বুঝি এত ভাল না। সমস্ত দেহটা যেন টের পায় সুখাদ্যের স্বাদ। দুচোখ তৃপ্তিতে এলিয়ে থাকে। সবকটা ফুরিয়ে গেলে কালী বোষ্টুমী আঙ্গুল দিয়ে চাঙ্গারীর তলার শালপাতা হাতড়াতে লাগল। ঘরময় শালপাতা ছিটিয়ে পড়ে। একটু জলতেষ্টা পায়। পেতলের ঘটিতে গড়ানো জল একঢোক গিলতেই মুখ থেকে মিষ্টিগুলোর স্বাদ নিমেষে চলে গেল। সে যেন একটু নিরাশ হয়েই চেয়ে রইল চারিদিকে ছিটানো শালপাতাগুলোর দিকে। তারপর ঘটি নামিয়ে রেখে কালী পা ছড়িয়ে বসে ফ্যাল ফ্যাল

করে শূন্যে চেয়ে দেখতে লাগল। ধোঁওয়ান কুপির কাঁপা আলোয় তার মুখের গভীর অদ্ভুত রেখাগুলো প্রাচীন তান্ত্রিক শিলামূর্তিতে পরিণত হয়ে নিশ্চল হয়ে থাকে। একটু পরে সে বিড় বিড় করতে থাকে,—অসংলগ্ন উক্তিগুলো জোড়া দেওয়া যায় না কিন্তু একটা বিশৃঙ্খল রূপ নেয়,—দেবতা দেয় না—মানুষে দেয়। মানুষে দেয় না—আমাকে দিবিনে কেন—আমি কি অপরাধ করেছি—কালী বোষ্টুমী কার সব্বনাশ করেছে? না, ওদের চোখে সয় না—আমার রূপ নেই যোবন গেছে, থাকলে দিতিস্ চোক্‌খেকোর ব্যাটারা—কখ্‌খনো না—সব ঢালতিস গে দেবতার পায় নয় মাগীর ভব্‌ভে! আমার বেলা কেউ না! আ—আমি যেন বেনাজলে ভেসে এসেছি। তিনকুড়ি বচ্ছর তোদের পথে খুঁটোর মত গজিয়ে আছি। তোদের আহ্লাদ কেবল মিছে কথায়—কেবল মিছে কথা—মিছে মিছে মিছে—থুথু!—হরে-কেষ্ট হরেরাম রামরাম—

কালী বোষ্টুমী দুলে দুলে উচ্চৈঃস্বরে নাম জপ করতে লাগল। তারপর চুপ করে কি চিন্তা করে আবার বলতে শুরু করল রুক্ষ অনার্দ্র গলায়,—মধুর মত ছেলে হয় না—যেমন নাম তেমনি রূপ—তেমনি মুখে মিষ্টি কথা, আহা কি ভাল জিলিবীগুলো এনেছিল গো। আবার আনবে বলে গেছে—বলেছে দিদি তুমি আমার সামনে খাবে, দেখলে আমার প্রাণ ঠাণ্ডা হয়। ও কালীরে ঠিক চিনেচে—ও আদৎ জহুরী—নকলে কি মন ওঠে? বলেচে রোজ আসবে—ছুঁড়িটেরে মনে নেগেচে, বলে ছুঁড়ি ওর দাসী হলে গা ভর্তি খাঁটি গয়না গড়িয়ে দেবে—বলে কেন দুক্‌খু করলে দিদি—অমন ভাইঝি থাকতে তোমার ভাবনা—এই ঘরে পালঙ্ক দোব বসবার জলচৌকি দোব আয়না দেয়া আলমারী দোব। বলেচে আমার জন্যে খিপ্‌তুরে পানের ডাবা আর পিকদানী নিয়ে আসবে—ছুঁড়ির পোড়াকপাল আলো হয়ে যাবে—বলে অমন ডাগর ডোগর শরীল কি থান ঢেকে খুদ সেদ্ধ গিলে মাটি হতে দিতে আছে। আমি বলি,—ও ছুঁড়ি তুই গাঙ্গুলীর কথা শোন—তা'লে সকল দুক্‌খি ঘুচে যাবে—

নিকষ কালি রাতের তলায় হেঁটে ফিরে আসছিল বৃন্দা। পথে আসতে আসতে বুড়ো বলরাম ঠাকুরের মাটির চোখ দুটোর দিকে চেয়ে চেয়ে তার মনে হয়েছিল জগতের সব চোখই বুঝি অমনি স্পন্দহীন। কেবল তার বুকের তলায় হৃৎপিণ্ডের চোখ দুটো ছাড়া। কেন থেকে থেকে নির্মম আশায় প্রাণ চেয়ে থাকে। জনহীন হয়ে থাকা সরু গলিটার দুধারে নীরব সাক্ষী দেয়ালগুলোর মত কেন হয় না। জীর্ণ হয় তবু এত নির্বাক। পা দুটো আনমনে পড়ছিল, কি এক হাল্কাভাব ছিল তাদের বিক্ষেপে। যেন এক মুক্ত পথের বার্তা পা দুটোর কাছে আগেই এসেছিল কিন্তু মন এতদিন জানেনি। দরজায় এসে সে কান পাতল। কালী বোষ্টুমী বিকৃত গলায় কি বলছিল বোঝা যায় না—কিন্তু বৃন্দা শুনল,—ছুঁড়ির পোড়াকপাল আলো হয়ে যাবে।—

একটা নিরপেক্ষ শ্বাস ফেলে সে দরজার শিকলে হাত দিল। কি ভেবে আবার হাত নামিয়ে ঠেলতেই কবাট খুলে গেল। উঠোনে এসে বৃন্দা তাকাল। তুলসী মঞ্চে প্রদীপ নিভে গিয়েছিল। সিঁড়ি থেকে একটা বেড়াল তাকে দেখে লাফিয়ে নেমে এসে পায় গা ঘষতে লাগল। বেড়ালটাকে কোলে তুলে নিয়ে সে উঁকি দিল কুপি জ্বালা ঘরে। চারিদিকে ছড়ানো শালপাতা আর শূন্য চাঙ্গারীর মাঝখানে বসে কালী বোষ্টুমী বিড় বিড় করছিল। চোখ দুটো আদিম অর্থবিহীন তন্ময়তায় বিভোর হয়ে থাকে। বৃন্দা অভ্যস্ত গলায় ডাকল,—ও পিসী, কে তোমায় আবার পেসাদ এনে দিল গো এই রেতে?

—মুকুন্দদা, বলি হাত দুটোকে কি জিরেন দিতে নেই একটি বারও?

মুকুন্দ হাতের কাছ থেকে চোখ তুলে এনে রাখল বৃন্দার মুখে। তেমনি চন্দনের তিলক কাটা, সদ্য ধোওয়া উজ্জ্বল দেখায় মুখখানি। যেন নিত্য এক একটি নতুন পদ্ম ফোটে—ভাবে মুকুন্দ। কিন্তু অনেক দূরে, আলোর স্ফটিক জলে টলটল করে।

—বিন্দা, আমার মন কইতেছিল আইজ ভোর রাতে যে তরে দ্যাখতে পামু।—

—তোমার বুঝি মন কেমন করছিল!—

মুকুন্দর নামানো চোখ দেখতে পেল না বৃন্দার দু চোখে হাসির লাস্য। কিন্তু গলার আওয়াজে যে নিবিড় রস চুঁইয়ে এল তা তার শিরায় শিরায় মাদকতার ঢেউ বয়ে নিয়ে আসে। বলল মুকুন্দ,—তুই চইল্যা গেলে পর আমার দিনমণি অস্ত যায়। তরে দেইখ্যা আবার ওঠেন তিনি।

বৃন্দা খিলখিল করে হেসে উঠল। পথের চলতি মানুষ দু চারজন থমকে ফিরে তাকাল। কিন্তু প্রবীণ মুকুন্দ আর বৃন্দার দিকে চেয়ে তাদের মনের ভাবটা সন্দেহ করল না।

—তোমার দিনমণি বুঝি আমি আঁচলে গেরো দিয়ে রেখেছি?—কটাক্ষ করে জানতে চাইল বৃন্দা।

—মনডারে দিয়া। সে এমন গেরো যে খুইলবার পারা যায় না।

—তুমি কি করবে মুকুন্দদাদা, যদি তোমার দিনমণি না ছাড়া পান, যদি আর না জাগেন?

মুকুন্দর মনের অবতলে সেই গভীর কালো ছায়াটা প্রত্যক্ষ এসে পড়ে। বৃন্দার উচ্ছল হাসিঠাট্টার প্রবাহ সেই গভীর অতলান্ধকারের বুকেই বুঝি খেলে বেড়ায়। মুখটা ফ্যাকাশে দেখায়। ভুরু উঁচিয়ে গভীর অনুসন্ধানী দৃষ্টি মেলে চাইল মুকুন্দ বৃন্দার মুখের দিকে। কিন্তু বৃন্দার ঢলঢলে মুখখানিতে চেয়ে মুহূর্তে মুছে যায় বুকের সেই শীতার্ত ভাব, একটা অনুরাগের তপ্ত শিহরণ কাঁপিয়ে দেয় বুকের জীর্ণ খাঁচাটা, উদ্বেল হয়ে ওঠে হৃৎপিণ্ডের আঘাত। যদি মুছে যায় কোন দৈবে সব কিছু। সে ঝাঁপ দিতে পারে বৃন্দার পদ্মের মত মুখের প্রতিচ্ছবি যে গভীর হৃদয়নীরে ভাসে, সেখানে। কি একটা কথা মনে পড়ায় সে হঠাৎ জিজ্ঞাসা করল,

—কালীদিদি আর আসেনা এ পথ দিয়া?

বৃন্দার মুখে একটা ছায়া পড়ে। সে জবাব দিল—না, আজ কদিন ধরে বাতটা বেড়েছে বড্ড, ঘরেই বসে থাকে,—আর,—বলে অন্যমনস্ক হয়ে থেমে রইল।

—আর কি?

বৃন্দার দুচোখ আত্মমগ্ন হয়ে ছিল। অনেক গভীরে কি কতকগুলো সুখদুঃখ বেদনা আকাঙ্ক্ষার ছায়া খেলে বেড়ায় কিন্তু উপরে রোদের আলোয় দেখায় স্ফটিকের মত স্বচ্ছ কালো। হঠাৎ বৃন্দা জিজ্ঞাসা করল—মুকুন্দদা, তুমি অনেক দেশ ঘুরেছ না?

—হুঁ, অনেক দ্যাশ দেখসি—

—আর তোমার দেখতে ইচ্ছে করে না?

একটা দুষ্টুমী ভরা হাসিতে কুঁচকে ওঠে মুকুন্দর চোখের কোল। বলে,—আমার সাথী হবি? তরে সাথে লয়্যা আবার পথে পথে কত দ্যাশ দেইখ্যা বেড়াই দুইজনে!

গলার স্বরটা যেন আচমকা প্রবল হয়ে উঠল শেষের ভাগে, হঠাৎ একটা প্রবল ঐকান্তিকতা প্রকাশ পেল যা কানে ঢুকতে বৃন্দা অবাক হয়ে চাইল তার মুখের দিকে।

একটু গম্ভীর হয়ে জিজ্ঞাসা করল—আমায় সঙ্গে নিয়ে যেতে পারবে?—

—একারে আন্তরডার ভিত্রে কইর‍্যা! তরে মিছা কইতেছি না রে বিন্দে—, বলতে বলতে মুকুন্দর গলা খাদে নেমে এসে প্রায় ফিসফিসিয়ে বলে,—তর সোহাগের মুখখানা আমি ভুলতে পারি না এক নিমেষ—তুই আমার মরমডেরে কিন্যা লইছস্ রে বিন্দে—তর রূপে আমার হির্দয় মইজ্ছে।

কথাগুলো বলতে গিয়ে অপ্রতিরোধ্য আবেগের ঢেউ এসে আছড়ে পড়ে,—তার সমস্ত শরীর জীর্ণ ভেলার মত খানখান হয়ে পড়তে চায়। কিন্তু বৃন্দার নিষ্পলক দৃষ্টি স্থির হয়ে থাকে মুকুন্দর চোখ দুটোয়। একটা কালহীন আলো সেখানে জ্বলছে আর সবই নিভে গেছে। দিন আর রাতের আলো, অন্ধকারের আবর্তিত হয়ে আসা আর অন্ধকারের বিদারণ, সকল সত্যাসত্যের বোধ, সকল প্রকৃত অপ্রকৃতের চেতনা। বৃন্দা কচি খুকীর মত খুশীতে ডগমগ হয়ে বলে,—তোমার সঙ্গে থান কাপড় পরে ঘর ছাড়লে লোকে কি বলবে—?

—কইবে রাধারাণীর বর মরসে!

কিশোরী মেয়ের মত আবার হেসে উঠল বৃন্দা। মুকুন্দও জোরে প্রাণখোলা হাসি হেসে উঠল। কিন্তু সামলাতে পারে না। হাসতে গিয়ে হঠাৎ বিষম লাগে। একটা প্রবল কাশির সঙ্গে অনুভব করল তীক্ষ্ম বেদনা বুকের গোড়ায়—খানিকটা থুতু থু করে ফেলতে গিয়ে দেখল তার সঙ্গে চাক বেঁধে খানিকটা রক্ত। দারুণ কাশির বেগ কমে আসতে আসতে অন্ধকার হয়ে যায় চোখের চারিদিক, মনে হয় পৃথিবী যেন তলিয়ে গেছে। কোন এক অসীম শূন্যতায়, সেখানে শব্দ স্পর্শ ঘ্রাণ কোন কিছু পেঁাছয় না। সেখানে বৃন্দার টলটলে মুখখানার ছবিও মুদিত হয়ে যায় অন্ধকারে। মুকুন্দর অন্তরে আবার সেই বোধটা ফিরে আসে যা আজ কদিন থেকে সে টের পাচ্ছিল। যা একই সঙ্গে মনে হয়েছিল অমৃতের মত আর মৃত্যুর মত।

সে তাকিয়ে দেখতে পেল বৃন্দার মুখচ্ছবি কেমন বেদনায় ম্লান পাণ্ডুর হয়ে গেছে।

—ও কিসু না রে—! পুরাতন একটা ব্যাধি। গলায় প্রবল সাহসের ভাব ফোটাতে চেয়ে বলল মুকুন্দ।

বৃন্দা কিছু বলল না। কেবল একদৃষ্টে চেয়ে দেখতে লাগল মুকুন্দর ঝুঁকে পড়া শীর্ণ বিবর্ণ মুখের দিকে। দেখতে দেখতে আলো নিভে আসছিল সেখানে। চোখের পাতা দুটো খুলে গোল হয়ে যায়—ঘোলাটে বিস্ফারিত দুচোখ যেন কি উপলব্ধি করে অন্যমনস্ক হয়ে ফিরে তাকায় রাস্তার জনপ্রবাহে। একটা ভেঙ্গে পড়া বাড়ীর পরিত্যক্ততা জানায় সে বাড়ীর চেহারা। মনে হয় না কিছুক্ষণ আগে সেখানে অদ্ভুত এক হৃদয়ের অঙ্কুর ফুটে উঠছিল পর পর। এক এক করে ফুটে উঠতে লাগল মুকুন্দর অশেষ বার্ধক্যের চিহ্নগুলো, সাদা ধপধপে চুল, সাদা ভুরু, দন্তহীন মুখের গহ্বর, হাতের চামড়ার নীচে শিথিল উঁচু শিরাগুলো। বৃন্দা কি এই অশেষ জরার সঙ্গে হৃদয়ের ধমনিত প্রণয়কে মিলতে দেখেছিল? এই গ্রন্থি খুলে আসা জীবনের গোধূলি মুছে নামা দেহের লুপ্ত রেখা ধরেই অভিসারে বেরোতে চেয়েছিল? কিন্তু তার কানে যেন এখনও লেগে আছে সেই প্রগাঢ় স্বরের অনুনাদ, সৃষ্টির শিকড়াভ্যন্তরে নিবিড় রসের চেতনার মত যা পরিপ্লুত করতে চেয়েছিল তার সমস্তকে। হয়ত ক্ষণমুহূর্তের জন্য সেই প্রত্যয় কাজ করেছিল। তবু তাকে ভ্রম বলে সে ফিরিয়ে দিতে পারে না। নিস্তব্ধ বনে বাতাসের স্মৃতির মত

কোথায় তা জেগে—চোখের দেখা এই ছবি কিছুতেই মনে হয় না পুরোপুরি সত্য। হয়ত এ একটা প্রতীক, এক অপ্রত্যক্ষ জন্মলাভের আনন্দকে গোপন করার।

—শরীলডা ভাল যাইতেছে না আইজ কদিন। হাসপাতালে যাব মন করলাম পরশু—

বৃন্দার নিশ্চল মনের মধ্যে একটা প্রবল উৎকণ্ঠার মত কি যেন প্রকাশ পায়,—জ্বর-জারি হল নাকি মুকুন্দদা—ব্যামোয় পড়লে বড় কষ্ট পাবে গো—

মাথা হাঁটুর মধ্যে গুঁজে স্থির হয়ে ছিল মুকুন্দ। তখনও ধড়াস ধড়াস করছিল বুকের মধ্যে। সমস্ত দেহ বেদনায় ছেয়ে গেছে। প্রত্যেক কোষে কোষে তা ব্যাপ্ত হয়। এই একটু আগেই যে দেহের প্রান্তর বয়ে অপূর্ব সুখানুভূতি ভরে উঠেছিল। সে নির্বাক থেকে আত্মসমর্পণ করে এই স্মৃতিহীন অন্ধ বেদনার কাছে। সেদিকে চেয়ে বৃন্দার বুক থেকে একটা নিঃশ্বাস বেরিয়ে এল।

—শুয়ে পড় মুকুন্দদা। জোর দিয়ে বলল আবার সে।

মুকুন্দ মুখ তুলে তাকাল,—ও কিছু না রে—অমন আইজ বিশ বৎসর হইতেছে,—মুখে চোখে উজ্জ্বলতা ফোটাবার প্রাণপণ চেষ্টা করে বলল,—তরে দ্যাখলেই সাইর‍্যা যাব আপনিরে বিন্দে! তুই হলি আমার সর্বশূলেহরা বিশল্যকরণী—

—এখন শুয়ে থাকগে। আর কাজ করে দরকার নেই। ওই দেখ তোমার উনুনও নিভে গেছে! কি করে ঝালাই করবা এখন?—শুয়ে থাক—বৈকেলে আসব খন আর বুড়োশিবের চন্নামেত আনব।—চোখে একটা বেদনা সংগোপন করে বৃন্দা ফিরে গেল।

কালী বোষ্টুমীর গজরানো আর দিনে রাতে থামে না। বলে যায় আপন মনে,—অধম্মের বিটির চোখে চামড়া আছে? হাতে করে অনাথ মানুষ করলেম, খাওয়ালেম দাওয়ালেম বে দিলেম। কি করে পেরেছিনু? এই গতর খুইয়ে বাড়ি বাড়ি ভিক্ষে করে, ঘাস ঠুকে কাঠ কুড়িয়ে, ক্ষেত ভেঙেগ শাক খুঁটে আর তাই বেচে। কপাল দোষে বিধবা হলি। তবু অঙেগর জলুষ মরেনি ত তোর একরত্তিও। ও গা-গতর নিয়ে কি করবি? ধরে রাখলে পেট চলবে? বলে,—আমি রাধারাণীর দাসী! এ দেহ কেষ্টর সেবায় দিনু। মরে যাই! কেষ্টর মাগীতে অরুচি হয়েচে লা! নইলে চোক্‌খেকো এমনি দুক্‌খি দেয়? আর দুমুঠো অন্নও কেউ দেবে না। দেখিস্‌! কেউ না। রাস্তায় ঘুরে জীবনটাই গেল বৃথে। বেরেম্‌ভাণ্ডে কেবল পেটের আগুন জ্বলছে—মরলেও বুঝি জুড়োয় না!—

কিন্তু বৃন্দা এতদিনে সত্যই বিচলিত হয়ে উঠল। নিরন্ন থাকার কৃচ্ছ্রতা তার জীবনে সে জানত স্বাভাবিক মতেই। তা এনে দিয়েছিল একটা উদাসী মন, যা তার একান্ত মনো-বিগ্রহে অর্পণ করার। হাসি গল্প ভিক্ষা আর বিগ্রহের সেবা—এর মধ্যে কোন বিষম ছন্দ দেখেনি একদিনও। কিন্তু মধু গাঙ্গুলীর আসা যাওয়া তাকে বিচলিত করে তুলল। এই যেন প্রথম সজাগ হয়ে উঠে সে টের পেল একটা যুক্তিহীন মর্যাদাহীন নিরর্থক অন্যায় প্রবল অনিয়মের মত তার সামান্য অস্তিত্বটুকুও মুছে ফেলে দিতে এগিয়ে আসছে। কেন হঠাৎ এ আক্রমণ? সে কোন উত্তর খুঁজে পায়না। এমন কি তাকে দুর্ভাগ্য বলেও সে দুষতে পারে না। এ যেন একটা অন্য অন্ধকার নিমজ্জিত পঙ্কিল জগতের নিয়মানুবর্তিত অন্ধ কতকগুলো জীব—তারা তাদের দৃষ্টিহীনতার অবধারিত নিয়মে খুব স্বাভাবিকভাবেই নষ্ট করে দেয় যা কিছু আকাঙ্ক্ষার আর সুন্দর। যা কিছু স্থির আর অলঙ্ঘনীয় বলে মনে হয় তাই যেন ভেঙেগ ফেলার, মুছে দেওয়ার অপেক্ষায় থাকে। বৃন্দা এই সর্বপ্রথম

অনুভব করে তার নিদারুণ অসহায়তার গভীরতাকে। সে সম্পূর্ণ অরক্ষিতা। সহরের প্রত্যেক দেয়ালের ঘন আড়াল ফুঁড়ে যেন মধু গাঙ্গুলীর জোড়া জোড়া চোখ চেয়ে দেখে। একটা গলিত লালসা পুঁজের মত গড়ায় তার দুচোখ বেয়ে। পুরু পুরু ঠোঁটের ফাঁকে সোনা বাঁধানো দাঁতে লেপটে থাকে ইঙ্গিতপূর্ণ হাসি। তার ভারি গালে টোল খাওয়া অকথ্য ছবি আর সবচেয়ে ভয়ঙ্কর তার অস্বাভাবিক লম্বা দুটো হৃষ্টপুষ্ট হাত যা মনে হয় দুটো চক্ষুহীন জন্তুর মত সব সময়ে এক পাশবিক আলিঙ্গনের কথা ভাবছে। বাইরের দরজায় তার প্রতিকৃতি ফুটে উঠতে দেখলে বৃন্দা ধরাপড়া জন্তুর মত শিউরে ঠকঠক করে কাঁপতে আরম্ভ করে। কখনও একটা পশুর মত আর্তনাদ গলায় ঠেলে আসতে চায় কিন্তু শুকিয়ে যাওয়া স্বরতন্ত্রীতে ঠেকে স্বর ফুটতে পারে না। প্রাণপণে সে তার চির অভ্যস্ত হরিণাম স্মরণ করে—কোনো পরিত্রাণের কথা ভেবে নয়, মাত্র তা তার সব ভাবনা চিন্তার অতীত এক অবলম্বন বলেই। কালী বোষ্টমীর ভিতরেও যেন একটা ঘুমন্ত সাপকে ফণা তুলে জেগে উঠতে বৃন্দা দেখে। মনে হয় একটা পাতলা কাচের ব্যবধান কোন রকমে আড়াল করে রাখে তাকে এই দুটো দুর্নিবার আক্রমণোদ্যত হিংস্রতা থেকে। কিন্তু এরা দুজন তার কাছ থেকে কি কেড়ে নিতে চায়, এমন ভয়াবহ বন্যতায়? ও তার সম্পূর্ণ অন্ধকার রহস্যের দিকে চাইতে পারে না। কতকগুলো নগ্ন স্যাঁৎসেতে হাত হাতড়ে হাতড়ে ধরতে চায় যেন তার দেহটাকে। বিকট আতঙ্কে ভরে ওঠে তার মন। তার দিকে শিকারী শ্বাপদের দ্বিধাহীন দৃষ্টি তুলে ওরা খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে দেখে কি একটা যা সে নিজে অনুভব করতে পারে না। আর তাই বলেই অমানুষিক ভয় হয়। ওর মধ্যে নির্ভুলভাবে নিহিত থাকতে ওরা দেখে কিছু যা উপড়ে নিতে চায়। কিন্তু বৃন্দা যে জানে তা অন্যভাবে। যা দেবালয়ের মত নীরব আর অচঞ্চল, হোমাগ্নির মত দেদীপ্যমান, ও সেখানে নীরবতা পায়—অপাবৃত হয় যা কিছু সত্য তার গূঢ় জগতে। কেন হঠাৎ তা মুছে যেতে চাইছে,—তার সৌম্যের জগৎ, আপন সমাহিত সমর্পণের জগৎ। কেন হঠাৎ অনির্দেশ্য থেকে একটা কুষ্ঠের গলিত হাত এগিয়ে এসে তার নীরব শঙ্খশুভ্র বক্ষোদেশকে খাবলিয়ে ধরতে চাইছে? সে কোন জবাব পায় না, অসহ্য গুমোটের মত পরিব্যাপ্ত হয়ে থাকে সারা মনে, শ্বাস রুদ্ধ হয়ে আসে।

মধু গাঙ্গুলী আজকাল প্রত্যহ আসে। প্রতিদিন সে যেন ইঞ্চি ইঞ্চি করে এগোয়, জায়গা দখল করে। প্রতিদিন অমানুষিক মনোযোগের সঙ্গে হিসাব করে তার প্রত্যেকটা সুযোগ। সমস্ত দিক থেকে বৃন্দাকে ঘেরবার চেষ্টা করে। চাঙ্গারীতে করে টাটকা শিঙ্গাড়া আর চপ নিয়ে আসে। মাটির হাঁড়িতে করে মালপোয়া রাজভোগ চমচম নিয়ে আসে। গাঢ় অনুযোগ করে বৃন্দা কেন খায় না। হাঁড়ি হাতে করে বৃন্দাকে এঘর থেকে ওঘরে অনুসরণ করে। তাদের ময়লা উলিঝুলি ন্যাকড়া ঢাকা সামান্য বিছানার উপরে জুতো সুদ্ধু পা নিয়ে গিয়ে ওঠে।—

কালী বোষ্টমীর মুখে আর ষাট বছরের ভিক্ষের ভাত রোচেনা। বৃন্দা যখন মাড়ে ভাতে একথালা আর বড়জোর একটা শুকনো বেগুন সিদ্ধ নামিয়ে রাখে সামনে, জ্বলে ওঠে চীৎকার করতে থাকে কালী বোষ্টমী,—ও পিণ্ডি কার জন্যে এনেছিস্—ও মানষে খায়—গরুর অছেদ্দা হবে মুখে করলে—ফেলে দে ফেলে দে ফেলে দে—আ মর্ হারামজাদী—একদিন পেট ভরে খেতে দিলো নি—এখন ওই অপদেবতার ছেরাদ্ধ গেলাবি—

বিকেলে গৃহপোষ্যা গাভীর মত কালী বোষ্টমী বারে বারে তাকায় দরজার দিকে—

ওই বুঝি মধু এল—ওরে দ্যাখ্ ও বিন্দে—অ হতভাগী কানের মাথা খেয়েচিস নাকি,—মধুর আসার সময় হল অমনি ছুঁড়ি সটকেছে,—ও হারামজাদী, তোর মুখে নুড়ো জেবলে দোব। শিক তাতিয়ে দগেধ দোব তোর রূপের চেকনাই—হারামজাদী গতর বেচবি নে ত কি আমি বেচব আমার বুড়ো হাড় কখান? ক্ষিপ্ত হয়ে চেঁচাতে শুরু করল কালী বোষ্টুমী।

মধু গাঙ্গুলী বাইরে থেকে গলার আওয়াজে টের পায় যে আজও পাখী পালিয়েছে। কিন্তু সে দমে না। হাসিতে দাঁত খুলে ঢোকে কালীর ঘরে। বলল,—কোরা বক্না দিদি—দোড়োদোড়ি করবেই একটু পের্থমে!—মনে মনে ভাবল নিশ্চয়ই হিসেবে কোথাও ভুলচুক হয়েছিল। পায়ের উপরে পা তুলে আসন পিঁড়ি হয়ে বসে সে নিবিষ্ট মনে সিগারেট টানে, কালীর ক্ষুধার স্বপ্নগুলো একটু খুঁচিয়ে দেখে।

কখনও হাল ছেড়ে দিয়ে কালী বোষ্টুমী অনুযোগের পথ ধরে। বৃন্দার দিকে একটা বেতো হাত তুলে নেড়ে নেড়ে বোঝাবার চেষ্টা করে—বিন্দে, মাণিক লক্ষ্মী রাধারাণী মা আমার—কথা শোন্—তোরে অনাথ বুকে ধরে মানুষ করলেম, খাওয়ালেম পরালেম—এখন বুড়ী পিসীর কথা ফেলিস নি। যা তুই আজ সাঁজে গাঙ্গুলী বাবুটির সেবা কর।—কেন, দোষ কি—তোর মা করেছে পিসী করেছে—অসতী হবি কোন মহাপাতকী বলে—জীবন ভোর দুঃখ জ্বালা কোন অভিশাপে বুকে ধরেছিস্—যা তুই একটিবার—দুঃখ ঘুচবে—গাঙ্গুলীর দাসী হবি পেটভরে খেতে পাবি জীবনভোর—কত বড় লোক,—হাতে হীরের আঙ্গুটি ঝলমল করে দেখিস্ নি? তোর গা ভর্তি গয়না দেবে—পালঙ্ক দেবে শোবার—ওই ননীর অঙ্গ কী ধুলোয় লোটবার?

সেদিন বিকেলে আকাশ রেশমী সুতোর মত চকচক করছিল। একটা ঘরে ফেরা চিল উড়তে উড়তে ডানা কাৎ করে একবার ঝুঁকে চেয়ে দেখে হিজিবিজি রেখায় ক্ষতবিক্ষত সহরটাকে। সেই মুক্ত নিঃশব্দ আকাশের ঊর্ধ্বসীমায় মৃত্তিকাবর্তী কলরোল পৌঁছয় না। নিঃশব্দ সোনার ঢেউগুলো এগিয়ে এসে পড়ে তার দুচোখে। তারপর নিভে যায়।

বৃন্দার মুখ মর্মরের স্তব্ধ রেখায় বাঁধা। যেন সে কিছু দেখে না, কিছু খোঁজে না। কিন্তু সে জানত সন্ধ্যার মত এত নিরাশ্রয় ভাব কোনদিন আসে নি। মুকুন্দ দোকানের দরজা টেনে দিয়ে মুড়ি দিয়ে শুয়ে ছিল। বৃন্দা সিঁড়ির ক ধাপ উঠে কবাট আলগা করে দেখল ভিতরে অন্ধকার। প্রথমে ভাবল কোণ থেকে দেশলাই খুঁজে এনে বাতি জ্বালবে। তারপর কি ভেবে সে খোঁজাখুঁজি করল না। মুকুন্দর মূর্তিটা পড়ে ছিল টানটান হয়ে মুড়ি দেওয়া। হয়ত মৃতের চেহারার অনুরূপ। কিন্তু বৃন্দার মনে হয় না তা। সে জানে কি করে তা সঞ্জীবিত করতে হয়। তা তার পাথরের বুকের শীতল নগ্নতার নীচে গোপন। তা শান্ত, প্রফুল্ল, রাতের গায় হেলে থাকা সৌরভের মত। তার একটি স্পর্শে প্রাণ পায় অগ্নিশিখা। সে জ্বালাবে, অন্তরের চৌলিবন্ধন পরাবে। কালকে মণ্ডিত করবে অনন্তে। সে তার শুচিশুদ্ধ প্রণয় অমৃতবিন্দুতে ঢালবে জরার ছদ্মাধারে।

কাঁথার নীচে যেখানটা মনে হচ্ছিল তার মাথা তার পাশে হাঁটুগেড়ে বসে মুখ নামিয়ে এনে বৃন্দা ডাকল,—মুকুন্দদাদা!—

—কে!—মুখের ঢাকা টেনে সরিয়ে ফেলে চাইল মুকুন্দ।

—আমি বিন্দা!—একটা হাত মুকুন্দর শুভ্র তুষার চুলগুলোর উপরে বুলিয়ে আস্তে আস্তে সমান করে দিতে দিতে জবাব দিল বৃন্দা।

—বিন্দা, তুমি, আইলা এখন,—মুকুন্দ বৃন্দার অন্ধকারে প্রস্ফুটিত মুখচ্ছবির দিকে চেয়ে বলল,—এখন সাঁজ পাইয়াই বুঝি রাত আইছে—

—মুকুন্দদা, ওঠ। এখন রাতই বটে। চল, তুমি যে বলেছিলে আমায় সঙ্গে করে আবার যেতে পার অনেক জায়গায়। চল তোমার সঙ্গে আমাকে নিয়ে। আমি যেতে এসেছি।

মুকুন্দ সম্পূর্ণটা বুঝতে পারছিল না। ঘরটার নিষ্প্রদীপ আবছায়ায় উঁকি দিয়ে ঢুকছিল বাইরে আকাশের জ্যোৎস্না। মনে হয় দুটো জগতে সে একই সময় আছে। একটা অন্ধকারের আচ্ছাদনে আচ্ছাদিত, যা বিষের মত অবশ করে রেখেছে; আরেকটা স্বপ্নের, বা স্বপ্নের মধ্যে নতুন জন্মলাভের, নতুন জাগরণের। আর সেই উজর আলোয় ঝাপসা স্মৃতির মত দেখাচ্ছিল বৃন্দার মুখ।

—ওঠ মুকুন্দদা। সে তার ডান করতলে তুলে নিল কাগজের মত খসখসে একটা শুকনো হাত। মুকুন্দ ধীরে ধীরে ওঠে। হঠাৎ অত্যন্ত হাল্কা মনে হল আপনার দেহের অনুভূতি, প্রাণ, সব কিছু। সে যেন ফিরে চলেছে বহুদূরে। নদীর দেশে। পাড় থেকে জেগে ওঠে মাস্তুলের অরণ্য। ধূসরিল নদীর বুক।

তারা দুজনে জড়ো করে গুছিয়ে ভর্তি করে মুকুন্দর কাঠের বাক্সটা। ঝালাই মেরামতির কতশত সাজ সরঞ্জাম। একটা ঝুড়িতে বাকি সব কিছু ভরে মাথায় করল বৃন্দা। মুকুন্দ এগিয়ে এসে দরজার কবাট খুলে তাকাল বাইরে।

গঙ্গাতীরে আজ রাতে কিসের উৎসব। দলে দলে মানুষ চলেছে। খোল আর খঞ্জনীর আওয়াজ কানে আসছিল। একটানা ছন্দে পড়ছিল অসংখ্য মানুষের পা। জ্যোৎস্নায় ধুয়ে যাচ্ছিল নগরের পথঘাট। জ্যোৎস্নায় নিবিড় হয়ে ছিল অন্ধকারের খাঁজগুলো। পরাগের মত তা বিছিয়ে পড়ে বৃন্দার চোখের পাতায়। ভীড় করা মানুষের প্রবাহটা মনে হয় অনন্ত।

বৃন্দা ঝুড়ি মাথায় করে রাস্তায় নেমে দাঁড়াল। তারপর কাঠের বাক্সটা একহাতে কাঁধে ধরে মুকুন্দ নামল আস্তে আস্তে। পা দুটো সামান্য কেঁপে যায়। তার মনে পড়ল অনেক পুরোনো কথা। একবার চলমান জনস্রোতের একটু তফাতে তারা মুহূর্ত কয়েক থেমে চেয়ে রইল। তারপর পিছনে বৃন্দাকে নিয়ে মুকুন্দ এগিয়ে চলল ভীড়ের মধ্য দিয়ে। তার পায়ে ছিল অনেক দূরের পথের স্বপ্ন।

# বৃদ্ধি, সঞ্চয়, বিনিয়োগ

## অশোক মিত্র

একটি ভক্তিবাদী উক্তি দিয়ে আলোচনার অবতারণা করছি : গত দশ বছরে ধান্যে-শিল্পে-পুষ্পে আমরা যতটুকু এগিয়েছি, স্খলন-পতন না-ঘটলে তার চেয়ে বহুগুণ দ্রুত আর্থিক বৃদ্ধি হয়তো আমাদের পক্ষে সম্ভব ছিল, সেদিক দিয়ে বিচার করলে প্রথম দুই পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনা নিয়ে উচ্ছ্বসিত হবার কিছু নেই। কিন্তু যা অবিশ্বাস্যরকম বৃদ্ধি পেয়েছে তা পরিকল্পনার তত্ত্ব ও তথ্য সম্বন্ধে জনসাধারণের জ্ঞান এবং জ্ঞানার্জনের ইচ্ছা। আর্থিক বৃদ্ধির সংজ্ঞা, পরিমাপ ও বিন্যাস নিয়ে যে ধরনের পরিশীলিত আলাপ ইদানীং আশে-পাশে হ'তে শুনি, দশবছর আগে তা অভাবনীয় ছিল। আলোচনা-চিন্তা-বিশ্লেষণের এই উন্নত মান থেকেই মাঝে-মাঝে আশা হয়, আপাতত আমরা তেমন দ্রুতসঞ্চারী যদিও নই, খুব ক্ষতি হয়নি তাতে : উন্নতির পিপাসা যেখানে এত তীব্র, ভুলভ্রান্তির পাহাড় পেরিয়ে শিগ্গিরই সেখানে উজ্জ্বল প্রগতির প্রবাহমানতা দেখা দেবে।

ধনবিজ্ঞানের অন্যতম প্রধান সূত্রই হলো এবংবিধ আশাপোষণ : যা আশা করা যায়, স্রেফ আশা করার ফলেই অনেক ক্ষেত্রে তা সম্ভবপর হয়। লোকে যদি বলাবলি করতে থাকে এটা ঘটবে, আবহাওয়ার সুর অন্যরকম হয়ে যায় তাতে, উৎসাহ-উদ্দীপনার সঞ্চার হয় চারিদিকে, এবং এ-উৎসাহ থেকেই এমন কার্যপরম্পরা সৃষ্টি হয় যে যা হ'লে ভালো হতো মনে হয় সেটাই ঘটে যায়। সুতরাং দেশের দ্রুততর আর্থিক প্রগতির জন্য আশা-পোষণ আমাদের কর্তব্য। তবে 'আমরা চমৎকার উন্নতি করছি, খুবই ভালো করছি, যারা বলছে আমরা তেমন এগোচ্ছি না তারা বিশ্বনিন্দুক' এসব মন্ত্র না-আউড়ে যদি আর্থিক বৃদ্ধির মূল তত্ত্ব সম্বন্ধে সবাইকে সজাগ করার চেষ্টা চলে, তাহলেই মহত্তম মঙ্গল। বিশ্লেষণ থেকেই বিবেচনা আসে, এবং বিবেচনা পরিপক্ক হ'লে কাজকর্মেও স্বতই দক্ষতা বাড়ে। সুতরাং অর্থনৈতিক প্রগতির প্রধান সূত্রগুলি নিয়ে সতর্ক বিশ্লেষণের প্রয়োজন আছে। বর্তমান প্রবন্ধে কিছু-কিছু বিষয় নিয়ে আলোচনা উত্থাপন করা হচ্ছে।

সব কথার গোড়ার কথা বিনিয়োগ, এবং বিনিয়োগের হার। সঞ্চয়, এবং সেই সঞ্চয়ের বিনিয়োগ : উৎপাদনের সঙ্গে এদের কার্যকারণ সম্বন্ধ। জাতির যা সামগ্রিক উৎপাদন, বর্তমান মুহূর্তে তা পুরোপুরি উপভোগ না করে কিছু-কিছু যদি সঞ্চয় করা যায়, সেই সঞ্চয়ের সাহায্যে যন্ত্রপাতি-কলকারখানার ব্যবস্থা একদিকে যেমন সম্ভব, অন্যদিকে তেমনি কৃষিব্যবস্থার উন্নতি, যানবাহনের বিস্তার, বিদ্যুৎসরবরাহের পত্তন, ঘরবাড়ি-দালানকোঠার প্রসারও সম্ভব। ইত্যাকার নানা আয়োজনের ফলে জাতির উৎপাদনক্ষমতা বেড়ে চলে। যত বেশি সঞ্চয়, তত বেশি বিনিয়োগ, অতএব তত বেশি উৎপাদন। সঞ্চয়-ও-বিনিয়োগের হারের সঙ্গে আর্থিক বৃদ্ধির নিবিড়তম যোগ।

অপেক্ষাকৃত সম্পন্ন দেশের পক্ষে অবশ্য একটু ঢিলে দিলে ক্ষতি নেই : বিনিয়োগের হার ধীর হয়ে এলে জাতীয় আয়ের বৃদ্ধির হার অবশ্যই কমে আসবে, কিন্তু সমূৎপন্ন সর্বনাশের সূচনা নেই তাতে, একবছর দু'বছর বৃদ্ধির হার সামান্য নেমে এলেও জীবন-যাত্রার সমৃদ্ধ মানের খুব হানি হবে না তাতে। অন্য দিকে গরিব দেশের পক্ষে উচ্চহারের

বিনিয়োগ ছাড়া উন্নতির অন্য পন্থা নেই। বিনিয়োগ না-বাড়ালে উৎপাদনশক্তি বাড়বে না, জাতীয় আয়ের বৃদ্ধির হার এগোবে না, যে-তিমিরে আছি সে-তিমিরেই থেকে যাবো। ঢিলে দেওয়া মানেই পিছিয়ে-পড়ে-থাকা। যদি তা না চাই, সঞ্চয় বাড়াতে হবে।

এখানে তাই একটা হেঁয়ালির মধ্যে পড়তে হয় : যে-দেশ যত গরিব তার সঞ্চয়-ও-বিনিয়োগের হার তুলনায় তত বেশি হওয়া প্রয়োজন। অথচ, অন্য পক্ষে, দরিদ্র দেশের জনসাধারণের সঞ্চয়ের সামর্থ্য কম, অধিকাংশ লোক কোনোক্রমে খেয়ে-পরে আছে, তাদের সঞ্চয়ের মাত্রা বাড়াতে বলা পরিহাসের মতো ঠেকতে পারে। এই দ্বন্দ্বের দু'রকম মীমাংসা হ'তে পারে : এক, অনেক দরিদ্র দেশেই ধনবণ্টনের প্রচণ্ড অসাম্য; অপেক্ষাকৃত বিত্তশালী এক শ্রেণী, যাঁরা হয়তো দেশের পুরো জনসংখ্যার মাত্র পাঁচ শতকরা, জাতীয় আয়ের পুরো এক-তৃতীয়াংশ কিংবা তারো বেশি উপভোগ করছেন। জাতির সামগ্রিক সঞ্চয়ের হার বাড়াতে হ'লে অতএব এই ধনীশ্রেণীর উপর বেশি মাত্রায় কর বসাতে হবে। সামর্থ্যের মাত্রা অনুযায়ী এমন-এক করব্যবস্থা প্রবর্তন করা হয়তো সম্ভব যার ফলে দেখা যাবে দরিদ্রতর শ্রেণীদের উপর চাপ তুলনায় কম পড়েছে, বড়োলোকদের উপর বেশি পড়েছে, এবং হয়ে গড়ে এমন দাঁড়িয়েছে যে জাতীয় সঞ্চয়ের হার আগের তুলনায় বেড়ে গিয়েছে। বিকল্প যে-মীমাংসা অনেক ক্ষেত্রে প্রয়োগ করা হয়েছে তা সঞ্চয়ের মাত্রা স্থির রেখে বিদেশ থেকে পুঁজি এনে বিনিয়োগ বাড়ানো, অর্থাৎ কিনা অপরের সাহায্যে নিজেদের উৎপাদন শক্তির প্রসার করা। এর ভালো-মন্দ দুটো দিকই আছে : সুবিধে এই যে নিজেদের অতিরিক্ত কষ্ট করতে হয় না, অন্যের উদ্বৃত্ত অর্থে চটপট জাতীয় উন্নতির ব্যবস্থা করা যায়। অসুবিধের দিক হলো যেখানে সঞ্চয়ের জন্য ত্যাগস্বীকার করতে হচ্ছে না, হাত বাড়ালেই বিনিয়োগের সামগ্রী পাওয়া যাচ্ছে, সেখানে দ্রুত উন্নতির জন্য প্রয়োজনানুগ মানসিক প্রস্তুতি হয় না, কাজ চলে অনেক সময়েই ধীরগতিতে : সস্তায়-পাওয়া টাকার অপচয়ের আশঙ্কা অনেকটাই বেশি। তাছাড়া বিদেশে হাত পেতে টাকা নিলে তার রাজনৈতিক কতগুলি কুফল তো আছেই।

আজকের পৃথিবীতে বিভিন্ন দেশে নানা ধরনের আর্থিক ব্যবস্থা : কোনো-কোনো দেশে খাঁটি সমাজতন্ত্র, অনেক দেশে পাঁচমিশেলি ধনতন্ত্র, এমনকি কয়েকটি দেশে সনাতন মালিকানা ব্যবস্থা। যেসব দেশে সমাজতান্ত্রিক ব্যবস্থার প্রবর্তন হয়েছে, তাদের জাতীয় উন্নতির হার অন্যান্য দেশগুলির তুলনায় অনেকগুণ বেশি। এটাও এক-হিসেবে খুব ধাঁধা-লাগানো ব্যাপার। প্রথম বিচারে মনে হবে যেখানে ধনতন্ত্র প্রবল, সেখানেই সঞ্চয়-ও-বিনিয়োগের মাত্রা বেশি হওয়া উচিত। ধনতন্ত্রবাদের গোড়ার কথাই হলো লাভ এবং লাভের হার, এবং লাভ বেশি হওয়া মানেই তো সঞ্চয় বেশি হওয়া। তাহলে এটা কী করে সম্ভব যে বিনিয়োগের প্রতিযোগিতায় ধনতন্ত্র সমাজতন্ত্রের কাছে হেরে যাচ্ছে?

কারণ সোজা। প্রথমত, সমাজতান্ত্রিক সব-ক'টি দেশে রাষ্ট্রক্ষমতা অসম্ভব রকম কেন্দ্রীকৃত। তাছাড়া, কেন্দ্রে যাঁরা দায়িত্ব নিয়ে আছেন, বিনিয়োগের হার বাড়ানো তাঁদের প্রায় প্রধানতম কর্তব্য। ধনতান্ত্রিক ব্যবস্থায় সঞ্চয় ও বিনিয়োগের কাজটা খুব এলো-মেলোভাবে হয়ে থাকে, ব্যক্তির উৎসাহ ও উদ্যোগের উপর তার গতিপ্রকৃতি, সুতরাং মাঝে-মাঝে ক্লান্তির ঢল নামলে বিনিয়োগেও ভাঁটা আসে। এই অনিশ্চয়তা থেকে সমাজতন্ত্র মুক্তি লাভ করেছে। যাঁরা হাল ধরে আছেন বিনিয়োগ, ও সেই সঙ্গে জাতীয় আয়ের হার, বাড়ানোর জন্য তাঁরা তন্গতমন। এমনও হওয়া সম্ভব বিনিয়োগের মাত্রা কমে এলে তাঁদের

কাজই চলে যাবে, সুতরাং শ্লথগতি হবার উপায় নেই। তাছাড়া, যেহেতু রাষ্ট্রবিপ্লব ঘটবার ফলেই এই সব-কটি দেশে সমাজতন্ত্রের প্রবর্তন হয়েছে, সম্পত্তিব্যবস্থার সম্পূর্ণ উৎখাতও সম্ভব হয়েছে সেই সঙ্গে, সম্পত্তি থেকে আয়ও তাই নিশ্চিহ্ন। শ্রমিকশ্রেণীর জীবিকার উদ্বৃত্ত যে-সম্পদ আগে ধনীশ্রেণীর ব্যসনে ব্যাপৃত হতো, তার পুরোটাই এখন বিনিয়োগের জন্য ব্যবহার করা সম্ভব।

অবশ্য এটা মানতেই হয় শুরুতে এই উদ্বৃত্তের পরিমাণ খুব বেশি নয়। জীবনযাত্রার মান যথেষ্ট সংকুচিত করে এনে সম্পূর্ণ উদ্বৃত্ত বৃদ্ধির যজ্ঞে নিবেদন করলেও এমন হয়তো হবে যে বিনিয়োগের হার এরূপ যে কিছু-কিছু শিল্পের সূচনা সম্ভব, কিন্তু খুব বেশি নয়। হয়তো শিল্পের বৃদ্ধির হার বেড়ে গিয়েও জনসংখ্যাবৃদ্ধির হারকে ধরতে পারছে না, অতএব কৃষিকর্মে নিয়োজিত লোকের সংখ্যা ক্রমশ আরো একটু বাড়ছে। যারা কালকারখানায় ঢুকতে পারছে না তারাই গ্রামে পড়ে থাকছে, কিন্তু নামে-কৃষিরত লোকের পরিমাণ বৃদ্ধি পেলেও তাতে কাজে কৃষির উৎপাদন বাড়ছে না। যদি এমনও হয় যে বিনিয়োগের ফলে শিল্পে নতুন-নিয়োজিত লোকের সংখ্যা জনসংখ্যা বৃদ্ধির সঙ্গে তাল রেখে চলতে পারছে, তাহলেও প্রধান সমস্যা থেকেই যাচ্ছে, কারণ কৃষি এবং কুটিরশিল্পে ভিড়-করে-থাকা লোকদের উৎপাদনক্ষমতার দ্রুত উন্নতি না-ঘটলে জাতীয় আয়ের হার তেমন বৃদ্ধি পাবে না।

দ্রুত আর্থিক উন্নতি চাইলে বিনিয়োগের পরিমাপ বাড়াতে হবে, অর্থাৎ কিনা জাতীয় উদ্বৃত্ত বাড়াতে হবে। সমাজতান্ত্রিক ব্যবস্থায় উদ্বৃত্তবৃদ্ধি অনেকগুণ সহজতর। আর্থিক বৃদ্ধির সঙ্গে-সঙ্গে গড়পড়তি উৎপাদনও বেড়ে চলে : বাড়তি উৎপাদনের সামান্য এক-অংশ বাড়তি উপভোগের জন্য বরাদ্দ করে বাকিটা বিনিয়োগের হার বাড়ানোর কাজে লাগানো তাই সম্ভব। এভাবে ক্রমশ বিনিয়োগের মাত্রা বাড়িয়ে নিয়ে আর্থিক প্রগতির হার তীব্রতর করে তোলা সমাজতান্ত্রিক ব্যবস্থায় হামেশাই হচ্ছে। অবশ্য মাঝে-মাঝে গোলমাল যে দেখা দেয় না তা নয়। যদি উপভোগের মান অদৌ বাড়তে দেওয়া না হয়, জনসাধারণের মধ্যে অসন্তোষ দেখা দিতে পারে : পূর্ব ইওরোপের গেলো পনেরো বছরের ইতিহাসে এরকম অসন্তোষ বেশ-কয়েকবারই মাথা তুলেছে। তবে একটু সাবধানে এবং বিবেচনার সঙ্গে এগোলে সম্ভোগ-ও-নিবৃত্তির দ্বন্দ্বের সুষ্ঠু একটা মীমাংসা করা কঠিন হওয়া উচিত নয়। বিনিয়োগ বাড়ার সঙ্গে লাভের মাত্রা বেড়ে যায়, এবং যেহেতু লাভের সম্পূর্ণটাই রাষ্ট্রব্যবস্থার হাতে, তার এদিক-ওদিক হওয়ার আশঙ্কা থাকে না। লাভের কতটা পরিমাণ পুনরায় বিনিয়োগে খাটানো হবে কর্তৃপক্ষ সচ্ছন্দে তার স্পষ্ট নির্দেশ দিতে পারেন, এবং সে-নির্দেশ কার্যকরী হতে অন্য কোনো বাধা অনুপস্থিত।

ধনতান্ত্রিক ব্যবস্থায়ও অবশ্য উচ্চমানের বিনিয়োগের ফলে উচ্চমানের লাভ সম্ভব হয়ে থাকে, কিন্তু মুশকিল হলো এই উঁচু লাভের বেশ-একটা অংশ উপভোগে ব্যয় হয়ে যায়। লাভ বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে ধনীশ্রেণীর ব্যসনের পরিমাণ ঈষৎ বাড়ে। শিল্পপতিদের উপভোগের মাত্রা বাড়লে সেই সঙ্গে শ্রমিকশ্রেণীর পারিশ্রমিকও বাড়িয়ে দিতে হয়। সব-মিলিয়ে এমন দাঁড়ায় যে লাভের পরিমাণ যে-হারে বৃদ্ধি পাচ্ছে, তার বড়ো জোর অর্ধেক কিংবা তারো কম বিনিয়োগে ব্যবহৃত হ'তে পারে। বিনিয়োগের মান পিছিয়ে থাকে, অতএব ধনতান্ত্রিক দেশগুলির প্রগতির হার কিছুতেই সমাজতান্ত্রিক দেশগুলির বৃদ্ধির হারকে ছুঁতে পারে না।

ইতিহাসের লীলাই এমন বিচিত্র। সনাতন মালিকানা ব্যবস্থার সঙ্গে তুলনা করলে মানতেই হয় ধনতান্ত্রিক ব্যবস্থায় বিনিয়োগের সুযোগসুবিধে হাজারগুণ বেশি, কিন্তু সমাজতান্ত্রিক ব্যবস্থায় বিনিয়োগের প্রণালী আরো অনেক সুষ্ঠু, অনেক দ্রুততর। প্রগতির জন্য প্রয়োজনীয়তম ব্যাপার হলো বিনিয়োগ, সুতরাং অনুন্নত যে-সমস্ত দেশে সমাজতান্ত্রিক ব্যবস্থার প্রবর্তন হয়েছে, তাদেরই সাফল্যের সম্ভাবনা বেশি। উদ্বৃত্তের বিশ্লেষণ থেকেই তত্ত্বটি ধরা পড়ে, খুব শাদামাঠা হলেও খুব অর্থঘন এই তত্ত্ব।

অবশ্য আমাদের উপরের সিদ্ধান্ত অনেকগুলি নতুন প্রশ্ন এনে জড়ো করে। যদি দ্রুত প্রগতির জন্য সমাজতান্ত্রিক অর্থব্যবস্থার উৎকর্ষ সর্বস্বীকৃত হয়ে পড়ে, তাহ'লে আগামী দু'-তিনদশকের মধ্যে এমনটা হয়তো হবে যে অধিকাংশ দরিদ্র দেশেই কোনো-না-কোনো ধরনের সমাজতান্ত্রিক সংস্থা প্রতিষ্ঠিত হবে। সোভিয়েট ইউনিয়ন, চীন, ইওরোপ, সেই সঙ্গে যদি এশিয়া, আফ্রিকা ও দক্ষিণ আমেরিকার অনেকগুলি দেশেও সমাজতন্ত্রের প্রতিষ্ঠা হয়, পশ্চিমের অত্যুন্নত রাষ্ট্রগুলির কী হাল হবে তাহ'লে? এ-বিষয়ে ভেবে দেখার প্রয়োজন আছে।

আর্থিক বৃদ্ধির হার খুবই আপেক্ষিক ব্যাপার। এক-হিশেবে পৃথিবীর সব দেশকেই অনুন্নত বলা চলে, কারণ সর্বত্রই দ্রুততর আর্থিক বৃদ্ধি হওয়া সম্ভব। এমনকি মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে পর্যন্ত সমৃদ্ধির হার দ্রুততর করা চলে; জীবনযাত্রার মান মার্কিনদেশে বাড়ছে সেটা ঠিক, কিন্তু এই বৃদ্ধির পরিমাপ সম্ভাব্যতম হারের অনেকটাই কম।

উন্নত ও অনুন্নত রাষ্ট্রের মধ্যে এদিক থেকে যদি পার্থক্য টানতে হয় তাহ'লে বলতে হয় প্রভেদটা ইচ্ছার, দৃষ্টিভঙ্গির : যেসব দেশে প্রগতির হার বাড়ানোর প্রয়োজন আছে বলে সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে, অতএব উপভোগের তুলনায় বিনিয়োগের হার বাড়ানো প্রয়োজন এমন বিবেচনা করা হয়েছে, সেসব দেশ অনুন্নত। যেসব দেশে এরকম তাগিদ নেই, এবং বিনিয়োগের উপস্থিত হার পর্যাপ্ত বলে ধরা হয়ে থাকে, তারাই উন্নত। যে-সমস্ত দেশকে বর্তমানে উন্নত বলা হয়, তাদেরও অবশ্য অতীতে কোনো-একটা-সময়ে পীড়নের মধ্য দিয়ে আসতে হয়েছে, উপভোগের পরিমাণ নিয়ন্ত্রণ করে বিনিয়োগের হার বাড়াতে হয়েছে, উন্নতি সম্ভব হয়েছে সেজন্যই। এখন যেহেতু তারা সচ্ছল, বিনিয়োগের হার আর বাড়ানোর প্রয়োজন নেই : জাতীয় আয়ের শতকরা বারো থেকে পনেরো পর্যন্ত বিনিয়োগে ব্যবহৃত হচ্ছে, এই হার অটুট রাখলেই যথেষ্ট। অন্যদিকে অনুন্নত দেশগুলিতে বিনিয়োগের হার অধিকাংশ ক্ষেত্রে জাতীয় আয়ের শতকরা পাঁচ থেকে দশের মধ্যে, সুতরাং তাদের আপাতত বেশ-কিছু কৃচ্ছ্রতার মধ্য দিয়ে যেতে হবে।

উন্নত দেশগুলিতে যে-সংকট দেখা দিতে পারে তা কৃচ্ছ্রতার সংকট নয়, পর্যাপ্তির সংকট। এই প্রসঙ্গে কিছুদিন আগে *New Yorker*-পত্রিকায় একটি ব্যঙ্গচিত্র বেরিয়েছিল, তাতে দুই মার্কিন শিল্পপতির মধ্যে কথোপকথন হচ্ছে : 'You don't like tailfins, I don't like tailfins, but what will happen to the American economy if nobody likes tailfins?" এই আর্ত ভাষণের মধ্য দিয়ে সংকটের স্বরূপ চমৎকার ফুটে বেরিয়েছে।

সমস্যা কোথায়? পশ্চিমের শিল্পান্বিত দেশগুলিতে, বিশেষ করে আমেরিকায়, জীবনযাত্রার মান বেড়ে-বেড়ে এমন অবস্থায় পৌঁছেছে-যে লোকের নতুন তৈজস কেনবার ইচ্ছায় অবসাদ নেমেছে। উৎপাদনক্ষমতা তুঙ্গ শীর্ষে উঠেছে, ফলে বছরে বিভিন্ন ধরনের যত

জিনিশপত্র উৎপন্ন হচ্ছে, আনুপাতিকভাবে লোকের কেনার উৎসাহ তত বাড়ছে না। একমাত্র খাদ্যদ্রব্যই প্রতিবছর নির্দিষ্ট পরিমাণে নিশ্চিন্তমনে উৎপন্ন করা চলে, কারণ ন্যূনতম পরিমাণ খাবার লোকেদের বাঁচতে হ'লে দরকার হবেই। কিন্তু খাদ্যগ্রহণের একটা ঊর্ধ্বতম সীমাও আছে, লোকের আয় যতই বাড়ুক, আনুপাতিক হিশেবে খাদ্যের পরিমাণ বাড়ে না, এক-জায়গায় থামতে হবে। তাই জাতীয় আয় যতই বাড়ে, সামগ্রিক উৎপাদনে খাদ্যদ্রব্য উৎপাদনের, এবং সামগ্রিক উপভোগে আহার্যের, অনুপাত ক্রমেই কমে আসে। অন্যপক্ষে উৎপাদনে খাদ্য-ব্যতিরেক অন্যান্য জিনিশের অনুপাত জাতির আর্থিক বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে বৃদ্ধি পেতে থাকে। মুস্কিল হলো এসমস্ত জিনিশই খুব চট করে ক্ষয়ে যাওয়ার মতো নয়, এমনকি জামাকাপড় পর্যন্ত প্রতিবছর সমস্ত-কিছু নতুন করে তৈরি করতে হয় না। গাড়ি, বাড়ি, রাস্তাঘাট, কলকারখানা, ঘরের টেবিল, আকাশের উড়োজাহাজ ইত্যাদির আয়ু তো আরো অনেক বেশি।

সংকট অতএব এখানে : মার্কিন দেশে যত পরিমাণ সুস্থ-সমর্থ লোক, তারা সপ্তাহে পাঁচদিন করে কাজ করলে বাৎসরিক উৎপাদন যতটা হয়, বৎসরে নতুন চাহিদার পরিমাণ তার থেকে কম হলেই মুস্কিল। চাহিদা কম হ'লে নতুন তৈরি তৈজস বিক্রি হবে না, দোকানে-গুদোমে বোঝাই হ'তে থাকবে, ফলে পরের বছর উৎপাদনের পরিমাণ আরো কমিয়ে আনতে হবে, সুতরাং, কিছু লোককে ছাঁটাই করতে হবে. তাতে সামগ্রিক আয় সংকুচিত হবে, সুতরাং জিনিশপত্রের চাহিদা আরো-একটু কমবে, আরো লোক ছাঁটাই হবে, উৎপাদন আরো নেমে যাবে, এমন ভাবে চক্রাবর্ত হারে জাতির আর্থিক অবনতি হ'তে-হ'তে একদিন পুরো ব্যবস্থাটাই ভেঙে পড়বে।

খুব সংক্ষেপে সংকটের সম্ভাব্য রূপ বর্ণনা করা হলো। অবশ্য পশ্চিমের সব-ক'টি দেশেই একসঙ্গে-যে এধরনের সংকট দেখা দিতে পারে তা আদৌ নয় : মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের তুলনায় পশ্চিম ইওরোপের দেশগুলির জীবনযাত্রার মান এখনো অনেক পিছিয়ে আছে, চাহিদায় মন্দা আসতে তাই এখনো বহুদিন বাকি। মার্কিন দেশেও সমাজের সবশ্রেণীর সমপরিমাণ আর্থিক সাচ্ছন্দ্য নেই, তবে সংকটের লক্ষণগুলি কয়েক বছর ধ'রে প্রকট হয়ে দেখা দিচ্ছে। লোকের জিনিশ কেনবার ইচ্ছায় যাতে ভাঁটা না-আসে, সেজন্য প্রতিবছর পুরোনো তৈজসে একটু-আধটু অদলবদল ক'রে নতুন উৎপাদন বাজারে ছাড়া হচ্ছে। একটি পরিবারে দুটো-তিনটে ক'রে গাড়ি না-থাকলে গাড়ির ব্যবসায় সংকট দেখা দেবে, আবার প্রতি দু'তিন বছরে গাড়ি না-পাল্টালেও সংকটের আশঙ্কা। কিন্তু লোকাচরণ পরীক্ষা ক'রে মনে হয় জনসাধারণ ক্লান্ত হয়ে উঠেছে, ঘন-ঘন গাড়ি বদলানোতে তেমন যেন আর রুচি নেই। এরকম রুচিবিকার খুব বেশি পরিমাণে, বহুবিধ শিল্পের ক্ষেত্রে হ'তে থাকলেই আর্থিক সর্বনাশ। বছর-বছর তাই গাড়ির চেহারা আকার ইত্যাদি ঈষৎ ওলট-পালট করা হচ্ছে, রেডিওগ্রামের শব্দসম্ভার নিয়ে অহরহ নতুন নিরীক্ষা হচ্ছে, লোককে ইচ্ছা-বাসনা-কামনার নতুন-নতুন মহলে বন্দী করার ফাঁদ পাতা হচ্ছে। আরো যা আপ্রাণ চেষ্টা করা হচ্ছে তা সর্বপ্রকার পণ্যের অবক্ষয়ের মাত্রা বাড়ানোর। মাত্র-কয়েক বছরের পুরোনো ঝকঝকে নতুন রাস্তা বা সাঁকো ভেঙে ফেলে ফের নতুন উদ্যমে নির্মাণের কাজ চলছে, দশ-বছর আগে তৈরি বাড়ি আগাগোড়া সংস্কার করা হচ্ছে। যে-জিনিশ—হোক তা রান্নার বাসন, হোক তা মেঝের গালিচা—আরো বেশ-কয়েক বছর চমৎকার ব্যবহার করা চলতো, তা বাতিল ক'রে দিয়ে নতুন-একপ্রস্থ জিনিশের ব্যবস্থা হচ্ছে। এভাবে তৈজসপত্র পাল্টানোর কোনো

ব্যবহারিক কারণ নেই, একমাত্র সামাজিক অনুশাসনেই এই আপাত-অপচয় সম্ভব হচ্ছে। অবক্ষয়ের পরিমাপ না-বাড়ালে আর্থিক সংকট রোধ করা হয়তো সম্ভব হবে না, অতএব অপচয়েরই আশ্রয় নিতে হবে, অন্যথা মার্কিন সমাজের উপায় কী?

শিল্পোন্নত দেশের প্রধান মাথাব্যথা, তাহ'লে দেখা যাচ্ছে, বিনিয়োগের হার বাড়ানো নিয়ে নয়, হার যাতে না কমে তা-ই হচ্ছে মূল সম্পাদ্য। মার্ক্স থেকে শুরু করে রোজা লুক্সেমবর্গ, লেনিন প্রভৃতি অনেকেই অবশ্য ধনতন্ত্রের অবশ্যম্ভাবী সর্বনাশ নিয়ে তত্ত্ব বিস্তার করে গেছেন। হালে বা ঘটছে অনেক ক্ষেত্রে তা মনীষীদের প্রাগুক্তির সঙ্গে মিলে যাচ্ছে, যদিও সবক্ষেত্রে নয়। মার্ক্সবাদীদের বক্তব্যের প্রধান সূত্র ধনতন্ত্রে সংকট অপ্রতিরোধ্য কারণ এই সমাজব্যবস্থায় উৎপাদনক্ষমতার প্রসারের সঙ্গে শ্রমিক উপার্জনের হারবৃদ্ধির কোনো অংগাংগী সম্বন্ধ নেই। যদি দুটো হার সমান্তরাল গতিতে বাড়তে পেতো মুস্কিল আসান হতো; কিন্তু মার্ক্সীয় মনীষীদের বিচারে এধরনের সমান্তরালতা ধনতন্ত্রের প্রকৃতিবিরুদ্ধ।

উপরোক্ত দুটো হারের মধ্যে পরম্পরা না-থাকলে কী ঘটবে তার তিনটি ব্যাখ্যা তত্ত্বে পাওয়া যায়। প্রথমটি হচ্ছে হ্রস্ব উপভোগ তত্ত্ব। ধনতন্ত্রে উৎপাদনশক্তি ক্রমাগত বাড়ছে, সুতরাং তৈজসের চাহিদা না-বাড়লে মুস্কিল। কিন্তু শিল্পপতিরা এতই অবোধ যে শ্রমিক-শ্রেণীর পারিশ্রমিকের হার সামান্য পরিমাণও বাড়াতে তাঁরা অনিচ্ছুক। যেহেতু দেশের অধিকাংশ লোকই শ্রমজীবী, তাদের উপার্জন না-বাড়লে জিনিশ কেনবার চাহিদাও বাড়ে না। সুতরাং অতিরিক্ত উৎপাদনের সংকটে ধনতন্ত্র স্বব্দিত হতে বাধ্য।

অন্য-এক ব্যাখ্যায় উৎপাদানাধিক্যের প্রসঙ্গে না-গিয়ে লাভের হারের উপর জোর দেওয়া হয়ে থাকে। শিল্পপতিদের প্রধান লক্ষ্য হলো লাভের হার, তাঁদের মতে যেখানে লাভ নেই, সেখানে বিনিয়োগও অর্থহীন। কিন্তু মার্ক্সবাদীরা হিশেব করে দেখিয়েছেন ক্রমাগত বিনিময়ের ফলে পুঁজি যে-পরিমাণ বাড়ে জাতীয় আয় সেই হারে বাড়ে না, অতএব লাভের হার কমতে থাকে। এই হার যেদিন শূন্যের অঙ্কে গিয়ে দাঁড়াবে, সেদিনই ধনতন্ত্রের কথাটি ফুরোবে।

সর্বশেষ ব্যাখ্যায় ধনতন্ত্রের সমাপ্তি রক্তাক্ত বিপ্লবে। উৎপাদন বৃদ্ধির ফলে বিনিয়োগ বাড়ে, কিন্তু শ্রমিকশ্রেণীর পারিশ্রমিকের হার এক-জায়গায় দাঁড়িয়ে থাকে। লোকনিয়োগ বৃদ্ধি পায়, ক্রমে বেকার সমস্যার নিরসন হয়। এমন অবস্থায় শ্রমিকশ্রেণী সংঘবদ্ধ হয়ে পারিশ্রমিক বৃদ্ধির উদ্দেশ্যে আন্দোলন শুরু করে। পারিশ্রমিকের হার খানিকটা অবশ্য বাড়ে, কিন্তু প্রায় সঙ্গে-সঙ্গে ধনপতিরা শিল্প-কৌশলের উন্নতিসাধন করে লোকনিয়োগ সংকুচিত করে আনেন, ফলে শ্রমিকশ্রেণীর সামগ্রিক অবস্থা একই রকম থেকে যায়। এভাবে কিছু দিন চলবার পরে অহিংস আন্দোলনে অশ্রদ্ধ হয়ে শ্রমিকশ্রেণী বিদ্রোহী হয়ে উঠবে, ধনতন্ত্রের কাঠামো ভেঙ্গে চুরমার করে দেবে, এরকম আভাস মার্ক্সীয় বিচারে সোচ্চারিত।

এই তিন ব্যাখ্যাতেই উজ্জ্বল আলোকপাত আছে, তবে পশ্চিমের দেশগুলিতে ধন-তন্ত্রের বিবর্তন একটু অন্যরকম হয়েছে। শ্রমিকশ্রেণীর পারিশ্রমিকের হার ঠিক এক-জায়গায় দাঁড়িয়ে থাকেনি, যে-গতিতে উৎপাদনক্ষমতা বেড়েছে তার সঙ্গে তাল মিলিয়ে এগিয়েছে। এটা সম্ভব হয়েছে অবশ্য শ্রমিক-আন্দোলনের জন্যই। কিছুটা চতুরালির সঙ্গে এমনও আজকাল বলা হয়ে থাকে : পশ্চিম ইওরোপে এবং মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে মার্ক্সের ভবিষ্যদ্বাণী বিফল হবার জন্য মার্ক্স নিজেই দায়ী। মার্ক্সপন্থী রচনা

ও ভাবধারা থেকে প্রেরণা সঞ্চয় করে উনবিংশ শতকে শ্রমিক-আন্দোলনে দানা বাঁধে, ক্রমশ তা এতই শক্তিশালী হয়ে উঠেছে যে শ্রমিকদের আপেক্ষিক অবস্থার অবনতি ধনতান্ত্রিক দেশগুলিতেও আপাতত অসম্ভব। অর্থনৈতিক কাঠামো এসব দেশে এখন যা রূপ নিয়েছে, শ্রীমতী জোন রবিনসনের ভাষায় তা a world of monopolies, সম্প্রতি অধ্যাপক গলব্রেথ এই ব্যাপারটাকেই concept of countervailing power হিশেবে দেখেছেন : একদিকে শিল্পপতিদের জোট, অন্যদিকে শ্রমিকদের সংস্থা, মাঝখানে রাষ্ট্র-ব্যবস্থা, দেশের উৎপাদন কীভাবে কোন্ অনুপাতে বিতারিত হবে তা এই তিন দানবের পারস্পরিক বোঝা-পড়ায় স্থির হচ্ছে। শ্রমিকরা আজকাল তাই ধনতান্ত্রিক সমাজেও সুপ্রতিষ্ঠিত।

মার্ক্সীয় তত্ত্বে ধনতন্ত্রের যে ক্রমবিলোপ কল্পনা করা হয়েছে, পশ্চিমের দেশগুলিতে সেরকম হয়তো হবে না। তবে সংকটের সম্ভাবনা এখনো যথেষ্ট, এবং উৎপাদনাধিক্য থেকেই ভয়। মার্কিন দেশে যা হচ্ছে, লোকের নতুন তৈজস আহরণে অবসাদ, তা অন্যান্য ধনতান্ত্রিক সমাজেও সংক্রামিত হতে বাধ্য। এই সর্বনাশ ঠিক এক-বছর দু-বছরে হবে না, আস্তে-আস্তে নিস্পৃহতর আপাতবিষ ধনতন্ত্রের স্নায়ুকে নির্জীব করে আনবে। তাই মার্ক্স যা বলে-ছিলেন তা-ই হয়তো ঘটবে, যদিও ঠিক যেভাবে ঘটবে বলে উনি ভেবেছিলেন প্রকৃত প্রণালী তার থেকে সামান্য স্বতন্ত্র হবে।

অবশ্য যে-সংক্রান্তি আজ অবশ্যম্ভাবী বলে মনে হয়, অনেক সময় কর্মচক্রে তার গতি অন্যরকম হয়ে যায়। সুতরাং আগামী পঞ্চাশ বছরের মধ্যে ধনতন্ত্র সম্পূর্ণ উচ্ছেদ পাবে এরকম প্রকট উক্তিতে পরিপূর্ণ আস্থা না-রাখাই ভালো। কারণ, ধনতন্ত্রের পক্ষেও, হয়তো এখানো সময় আছে, এখনো উপায় আছে। এমনকি মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রেও সমাজ-সংস্কারের সাহায্যে সামগ্রিক চাহিদা বৃদ্ধি করা সম্ভব, তাহলেই ক্রান্তিকাল আরো কিছুদিনের জন্য স্থগিত থাকতে পারে। মার্কিন জনসংখ্যার এক-দশমাংশের উপর নিগ্রো, এবং অধিকাংশেরই হতদীর্ণ অবস্থা। নিগ্রো সম্প্রদায়ের আর্থিক উন্নতির জন্য একনিষ্ঠ আয়োজন করলে পরিণামে সমগ্র মার্কিন জাতিরই ভবিষ্যতে শুভ : সমাজের অপেক্ষাকৃত দরিদ্র স্তরের উপার্জন বেড়ে গেলে জিনিসপত্রের চাহিদা বাড়বে। চাহিদা যত বাড়বে, সংকট থেকে মুক্তির সম্ভাবনা তত বেশি।

আর যা উপায় আছে তা বিলিয়ে দেওয়া। অর্থনৈতিক কাঠামো অটুট রাখতে হলে উৎপাদনের পরিমাণ অব্যাহত হওয়া চাই। যে-পরিমাণ সামগ্রী উৎপন্ন হচ্ছে, নিজেরা তা যদি পুরোপুরি ব্যবহার করতে না চাই বা না পারি তাহলে সর্বনাশ এড়াবার চমৎকার পন্থা প্রতি-বেশীকে ডেকে হাতে-ধরে দিয়ে দেওয়া একটু আগে এমন মন্তব্য করা হয়েছে যে যেহেতু সমাজতান্ত্রিক ব্যবস্থায় বিনিয়োগের হার ক্ষিপ্রতর, অনুন্নত দেশগুলির আর্থিক প্রগতির সম্ভাবনা সমাজতন্ত্রেই তাই সবচেয়ে বেশি। এরকম প্রলোভনে পড়লে অনেক দেশই হয়তো আগে-পরে সমাজতান্ত্রিক হয়ে যেতে পারে। কিন্তু এখানেও কোন অলঙ্ঘ্য প্রাকৃতিক নিয়ম নেই। পাশ্চাত্ত্য দেশগুলি, নিজেদের অস্তিত্বরক্ষার উদ্দেশ্যেই, যদি যন্ত্রপাতি এবং উন্নতি-সহায়ক অন্যান্য জিনিশপত্র নিয়মিত গরিব দেশগুলিতে পাঠাতে শুরু করে, তাহলে আমাদের স্বকীয় সঞ্চয়ের হার কম রাখলেও চলে। যদি দ্রুত উন্নতির জন্য জাতীয় উপার্জনের শতকরা পনেরো ভাগ বিনিয়োগে লাগাবার দরকার মনে হয় তাহলে আমরা নিজেরা শতকরা দশ-ভাগের মতো সঞ্চয় করতে পারি, শতকরা বাকি পাঁচ ভাগ বাইরে থেকে আসতে পারে। তাতে আমাদের যেমন সুবিধে, পশ্চিমের দেশগুলিরও তার চেয়ে কিছু অংশে কম নয়, কারণ

তাদের মরণ-বাঁচনও উৎপন্ন তৈজসের সুষ্ঠু বিতরণের উপর নির্ভর করছে।

অতএব ধনতন্ত্রের নাভিশ্বাস এখনো হয়তো ঠেকানো যায়, কিন্তু তার জন্য প্রয়োজন বিবেচনা, ঔদার্য, ভবিষ্যৎদৃষ্টি। একঢিলে দুই পাখি মারা যাচ্ছে, আত্মবিলোপের আশঙ্কা রোধ করা হচ্ছে, অন্য দিকে দরিদ্র দেশগুলিকে বিনিয়োগে সহায়তা করে সমাজতন্ত্রের প্রলোভন থেকে তাদের সরিয়ে আনা যাচ্ছে : পাশ্চাত্ত্য জাতিসমূহে এই প্রতীতি ছড়াতে আরো অনেক সময় নেবে। তাছাড়া, সব গরিব দেশই যে পশ্চিম থেকে বিনিয়োগপণ্য হাত পেতে নিতে সম্মত হবে তা নয় : আত্মসম্মানের ব্যাপার আছে, বিদেশী মূলধন থেকে অনেক সময় রাষ্ট্রনীতির ক্ষেত্রে বিদেশী প্রভাব ছড়িয়ে পড়তে চায়, সেদিকটাও ভেবে দেখবার আছে।

বৃদ্ধি, সঞ্চয় ও বিনিয়োগের প্রক্রিয়া এবং গতি-প্রকৃতির উপর তাই পৃথিবীর রাজনৈতিক ভবিষ্যৎ অনেকটাই নির্ভর করছে। এমন না-হলেই আশ্চর্য হতে হতো : কারণ কে কেমন-ভাবে খেয়ে-প'রে আছে বা থাকতে পারে তা-ই পৃথিবীর প্রধান সমস্যা। আদিম মানুষের সময়ে যা ছিল, এখনো তাই : সমস্যাটি ইতিমধ্যে জটিলতর হয়েছে এইটুকু যা তফাৎ।

# রীতিমতো গল্প

## অমিয়ভূষণ মজুমদার

গজেন্দ্র পুততুন্ড আমাকে এই গল্পটা বলেছিলো।

গজেন্দ্রর চেহারাটা মনে হ'লেই আমার হাসি পায়। কালো, যাচ্ছেতাই রকমের মোটা। মোটা পেটের উপরে যখন সে ক্রশবেল্ট আঁটে তখন সে বেল্ট কখনও যথাস্থানে থাকে না। হাসতেও পারে লোকটা, আর হাসির পরেই বেল্টটা খুলে ঠিক ক'রে পরতে হয় তাকে, কারণ যদিবা তার আগে বেল্টটা কোন রকমে ভুঁড়ির উপরে ছিলো হাসির দমকে সেখানে যে কাঁপন লেগেছিলো তাতে বেল্টটা ভুঁড়ির নিচে নেমে গিয়েছে।

কিন্তু পরিচিতদের মধ্যে যে দু'চারজনকে আমি ভালোবাসি সে তাদের মধ্যে একজন। প্রায় সাত আট বছর পরে সেদিন সন্ধ্যায় বঙ্কিম চাটুয্যে স্ট্রীটে হঠাৎ তার সঙ্গে দেখা হ'য়ে গেলো। দেখলাম তার চুল পেকেছে, গালের মাংস অনেকটা ঝ'রে গিয়েছে কিন্তু দেহের মাঝামাঝি জায়গায় তেমনি বাড়বাড়ন্ত। আর হাসি? সেটা একটুও বদলায় নি। বিস্ময় লাগলো লোকটা এই হাসি নিয়ে পুলিশের চাকরি করে কি ক'রে।

গজেন্দ্র বললো,—চলো, মোহিত, একটু খাওয়াদাওয়া করা যাক। এই ব'লে সে ফাঁদলের মধ্যে দিয়ে গ'লে যাবার ভঙ্গিতে বেল্টটাকে তুলে ভুঁড়ির উপরে স্থাপন করলো।

বললাম,—খাওয়া দাওয়া, মানে চা?

—তা আবার কবে থেকে হ'লো। তবে তোমরা লিখিয়ে পড়িয়ে মানুষ।

এর পরে কি ক'রে তার সঙ্গে একটি নাম করা হোটেলে গিয়ে পৌঁছালাম, কি ক'রে সে ডিনারের অর্ডার দিলো, এসবই যেন পূর্বপরিকল্পিত ব্যাপার।

ডিনারের কিছু দেরি হবে জানতে পারলাম। কি একটা কল বিগড়েছে রান্নাঘরে। আমরা লাউঞ্জে গিয়ে বসেছিলাম। সেখানে ব'সে আমরা যখন গল্প করছি তখন হঠাৎ একটা কুকুর সেখানে দেখা দিলো। জিভ লক্‌লক্, কান লট্‌পট্। হাল্কা হলুদে ছাই-রঙের ছোপ দেয়া লোমশ একটা প্রকাণ্ডতা। ঘরে ঢুকে এদিক ওদিক চেয়ে আমাদের দিকে এগিয়ে এলো। আমি কুকুর ভালোবাসি না। আমার গা শিরশির করে উঠলো। কিন্তু গজেন্দ্র যেন তার সঙ্গে আলাপ করবে। কিন্তু কুকুরটার মালিক বোধহয় রাস্তায় ছিল। সেটা এদিকওদিক ছোঁক ছোঁক ক'রে বেরিয়ে গেলো। আর যাবার সময়ে দরজার কাছে পা তুলে—

গজেন্দ্র (তার চোখ দুটি চক্ চক্ করলো) বললো, পেডিগ্রি ডগ্।

—কিন্তু ভদ্রতা জ্ঞান দেখলে তো?

—পেডিগ্রি ম্যান তো বলি নি।

এই থেকে ক্রমে ক্রমে গজেন্দ্র পুততুণ্ডের গল্পটা সুরু হ'লো। যান্ত্রিক গোলযোগে যখন ডিনার একঘণ্টা পিছিয়ে গিয়েছে, এবং যখন পুততুণ্ড তার পুলিশ সুলভ ভঙ্গিতে সন্দেহ প্রকাশ করছে এই গোলযোগের পিছনে সাবোটাজ থাকতে পারে, আমি যখন আলাপটাকে বাঁচিয়ে রাখার জন্য এই কাল্পনিক সাবোটাজের পিছনে যন্ত্রের প্রতি মানুষের অন্তর্নিহিত বিদ্বেষ কিনা এই গবেষণা করছি তখন গজেন্দ্র এই গল্পটা বলেছিলো। অবশ্য

সে বারবার, প্রথমে, শেষে গল্প চলার মাঝে মাঝেও স্মরণ করিয়ে দিয়েছিলো এটা নেহাৎ গল্পই, কিছুমাত্র সত্য নেই এতে, নায়ক নায়িকা সবই কাল্পনিক।*

গজেন্দ্র তখন ক-থানার অফিসার ইন চার্জ। মহকুমা বা জেলার সদর নয়। চারিদিকে চা বাগান। চা বাগান থেকে তাদের নিজস্ব রাস্তাগুলি বেরিয়ে যেখানে ন্যাশানাল হাইওয়েতে মিশেছে তার কিছুদূরেই থানা। থানার চৌহদ্দির মধ্যে চা বাগান ছাড়া আর যা আছে তা রিজার্ভ ফরেস্ট। সুতরাং বাসিন্দা বলতে চা বাগানের কুলি, কর্মচারী, ম্যানেজার, ফরেস্ট-বিভাগের কর্মচারী, দুচারজন কণ্ট্রাক্টর এবং তাদের খালাসি কিছু দোকানদার, ফরেস্টবিভাগ থেকে চাষ আবাদ করতে যাদের বসিয়েছে তেমন কিছু গরীব গৃহস্থ জঙ্গলে জঙ্গলে। আর সব রকমের সমাজেই কর্মহীন নোঙরহীন কিছু লোক থাকে—তাদের কয়েকটি। কিন্তু ইদানীং কিছু রকমফের হয়েছে। থানার এক্তিয়ারের মধ্যেই চা বাগানগুলো থেকে কিছুদূরে একটা কয়লার খনি আবিষ্কার হয়েছে। তাকে কেন্দ্র করে একটা নতুন ধরনের কিছু হবে তা বোঝা যায়। বিরাট আকারের ক্রেন ইত্যাদি আসতে আরম্ভ করেছে। একটা শ্রদ্ধা-সংযুক্ত বিস্ময় আকাশের গায়ে।

কিন্তু যেহেতু চা বাগানই এখানে সভ্যতার প্রতীক, থানার ঘরবাড়ি চা বাগানের ঘর-বাড়ির কায়দাতেই তৈরি। থানার ইন চার্জ, আর তার অধস্তন সাব ইনস্‌পেক্টর এবং অ্যাসিষ্ট্যাণ্টদের জন্য কাঠের তৈরি বাংলো। কেবল থানার অফিসঘরটা লাল ইটের দেয়াল তোলা। সম্ভবত মাঝে মাঝে কয়েদখানা হিসাবে ব্যবহার করতে হয় ব'লেই কিছুটা দৃঢ়।

পৃথিবীর যেখানে যেখানে মানুষ বাস করে সে সব জায়গাতেই কিছু সুবিধা এবং কিছু কিছু অসুবিধা আছে। এখানেও ছিলো। অসুবিধা বলতে সিনেমা নেই, স্কুল, কলেজ নেই। সুবিধা বলতে থানার কাছেই একটা হাসপাতাল আছে—দু তিনটে চা বাগান মিলে যা চালায়। হয়তো সংস্কৃতির কোন কেন্দ্র ছিলো না, কিন্তু ভদ্রশ্রেণীর লোক খুব বেশি না থাকায় যে কজন ছিলো সকলেই পরস্পরের পরিচিত ছিলো। থানাতেও আড্ডা বসাতে পারতো। থানার টেবলে তাসখেলার রেওয়াজ ছিলো না এমন নয়।

থানার কাজের চাপও খুব বেশি ছিলো না। অপরাধ যা ঘটতো তা প্রায়ই মামুলী ধরনের। দুচারটে চুরি, দুচারটে ছিনতাই, মদ খেয়ে মাথা ফাটানোর ব্যাপার। দুএক ক্ষেত্রে ছোরাও মারা হয়, কিন্তু এ সবেরই একটা বিশিষ্ট ধারা আছে। অপরাধী ধরার জন্য খুব একটা পরিশ্রমও করতে হয় না।

ভাগ্যই মানুষকে চালনা করে তার কর্মক্ষেত্রে, শুধু চাকরি পাওয়ার ব্যাপারে নয়। গজেন্দ্রের বিশ্বাস এটা তার ভাগ্যই যে তাকে অন্য অনেকের চাইতে বেশি খাটতে হয়। কিন্তু ভাগ্যটা তার অবিমিশ্রভাবে খারাপ নয়। তদন্তে গেলে খাওয়াদাওয়াটা তার ভালোই হয়। কখনও কখনও বিলেতি মদের একটা বোতলও কোন কোন পার্টি তার সম্মুখে স্থাপন করে।

কাজেই সে থানায় আসবার এক মাসেই মধ্যেও যখন একটা খুন হ'য়ে গেলো। থানার খাতাপত্র থেকে সে জানলো গত চার বছরে একটা মাত্র খুন হয়েছে, আর সে আসতে না আসতে একটা ঘটে গেলো। তার অজান্তেই একটা ক্লান্তির দীর্ঘনিশ্বাস পড়লো, কিন্তু সে বিব্রত বোধ করলো না। তার অধস্তন সাব-ইনস্‌পেক্টর যোগেশ কুজুরকে তদন্তের ভার

* গল্পের ফুটনোট হয় না। গল্প মিথ্যা ছাড়া আর কিছু নয়। তা হ'লেও এখানে বলা ভালো এ গল্পের সব কিছুই কাল্পনিক।

দিয়ে সে নিশ্চিন্ত হ'লো। কারণ কুঞ্জরের ভাগ্য গজেন্দ্রর ভাগ্যর চাইতে সদয় ছিলো। সে সদরে ব'সেই দুএকবার শুনেছে ক্রাইম-ডিটেক্‌শ্যনে তার একটা পটুতা আছে। কিন্তু সমশ্রেণীর অফিসারদের মধ্যে এই দক্ষতাকে সৌভাগ্যের নিদর্শন ব'লে মানা হয়। সদরে ডি.এস.পি একবার কুঞ্জর সম্বন্ধে বলেছিলো—লাকিডগ্‌। আর এটা কুঞ্জর শুনেছিলো। সেজন্য কেউ তাকে লাকিডগ্‌ বললে সে সন্তুষ্ট হয়। সে নিজেও বিশ্বাস করে সে অনেক ব্যাপারেই সৌভাগ্যের সাহায্য পেয়েছে।

শুধু ক্রাইম-ডিটেক্‌শ্যন কেন অন্যান্য ব্যাপারেও তার সৌভাগ্য আছে। তার মেম-বউএর কথাই ধরো। তার গাউন পরা হাল্কা চেহারার ট্যাঁশ বউকে দেখে, সত্যি কথা বলতে কি, অনেকেরই ঈর্ষা হতো। কুঞ্জরের গায়ের রংও ফর্সা ছিলো। তার উপাধি যাই সূচনা করুক তার পিতৃকুলে অথবা মাতৃকুলে কোন রকমে পাহাড়ি রক্তের একটা ছোঁয়াচ ছিলো। কিন্তু তার বউএর রক্তে যে দুচার পুরুষ আগেকার হ'লেও চা বাগানের সাহেবদের রক্ত মিশেছিলো এ বিষয়ে সন্দেহ নেই। একটা বিষয় এ থেকে বেশ পরিষ্কার হয় এ থেকে যোশেপ এ অঞ্চলেরই অধিবাসী।

এই থানা না হ'ক, পাশের জেলার এমনি কোন চা বাগান অঞ্চল। এ অঞ্চলগুলো নৃতত্ত্বের আলোচনার দিক দিয়ে আকর্ষণীয়। সব সময়ে না হ'লেও মাঝে মাঝে নেপালি, ইউরোপীয়, মুণ্ডা ও মদেশীয়া রক্তের মিশ্রণ চলেছে এখানে। সংস্কৃতি ও ধর্মের নানা পরিবর্তন হচ্ছে। কুঞ্জরের মেমবউ সম্বন্ধে অবশ্য দুটো কথা শোনা যায়—প্রথমত মিশ্রিত রক্ত হ'লেও তার মিশ্রণের উপাদানগুলি কুঞ্জরের মিশ্রণের উপাদানের চাইতে দামি ছিলো। আর কুঞ্জর পাহাড়ি শহরের মিশনারী কলেজে সিনিয়ার কেমব্রিজ পাশ হ'লেও, দারোগার মতো সরকারী চাকুরে হওয়া সত্ত্বেও, এবং তার মেমবউ নিরক্ষরা হওয়া সত্ত্বেও, তার পক্ষে ওই মেমবউ পাওয়া ভাগ্যের ব্যাপারই। অবশ্য একথা জানতে কারো বাকি ছিলো না ব্যাপারটা সেকেণ্ডহ্যাণ্ড—মেমবউএর আগের স্বামী তাকে ডাইভোর্স করেছিলো ব'লেই।

সে যাই হ'ক কুঞ্জরের ভাগ্য এই খুনের ব্যাপারেও তাকে সাহায্য করার জন্য প্রস্তুত হয়েছিলো। খুনী ধরা পড়লো। খুন যে বস্তিতে হয়েছিলো সেটা একটা চা বাগানের এলাকা। রাতারাতি বারো মাইল পথ ফরেস্টের মধ্য দিয়ে চ'লে খুনী তার বোনের বাড়িতে গিয়েছিলো। কুঞ্জর লাশ চালান ক'রে দিয়েছিলো মোষের গাড়িতে কনস্টেবলদের খবরদারিতে। নিজে স্কুটারে ক'রে আসছিলো। হঠাৎ তার মনে হ'লো অকুস্থলে যে খবর পেয়েছে সে সেটাকে যাচাই ক'রে দেখলে মন্দ হয় না। সত্যি কারো বোনের বাড়ি আছে নাকি তুংসুং বস্তিতে। বিশেষ ক'রে বস্তিটাকে যখন একটু ঘুরে গেলে থানায় ফেরার পথেই ছুঁয়ে যাওয়া যায়। সেখানে হরকামায়ার বাড়ি খুঁজে পাওয়া গেলো, আর হরকা-মায়ার বাড়িতে তার ভাইকেও যে নাকি হত স্ত্রীলোকটির স্বামী। স্বামী মহাশয়ের অবস্থাও তখন ভালো নয়। সেও বিশেষ রকমে আহত, পুরু ক'রে ন্যাকড়া পোড়ানো ছাই দিয়ে রক্ত বন্ধ করা হয়েছে মাত্র।

কুঞ্জর তাকে জিজ্ঞাসা করলো,—কি ক'রে সে এমন আঘাত পেলো?

তখন সে বললো আঘাত সে নিজেই করেছে নিজের শরীরে।

—কেন, তা করতে গেল কেন? আহা, খুব জখম হয়েছে তো! তখন সে স্বীকার করলো জনানাকে খুন ক'রে সে নিজেও মরতে চেয়েছিলো।

সুতরাং আর একটি মোষের গাড়ি ক'রে আহত স্বামীকে চালান ক'রে দিলো কুঞ্জর,

থানা ঘুরে হাসপাতালে।

ঘটনাটা প্রেমঘটিত। গজেন্দ্র হাসপাতালে লাশ দেখতে গিয়েছিলো। পঁচিশ ছাব্বিশ বছরের একটি নেপালি স্ত্রীলোক। স্বজাতীয় বাইরের রক্ত মিশ্রণের ফলে গায়ের রং কালো। নাকচোখেমুখে পাহাড়িভাবের সঙ্গে ওঁরাওদের আকৃতি বৈশিষ্ট্য দেখা যায়। কানের ভারি পিতলের গহনাই তাকে নেপালি সংস্কৃতির অন্তর্ভুক্ত ব'লে প্রমাণ দিচ্ছে। কিন্তু গজেন্দ্র এই স্ত্রীলোকটির প্রেমের ব্যাপারে খুন হওয়ার কোন কারণই দেখতে পেলো না। চ্যাপ্টা বুক, শীর্ণ উরু, নিতম্বহীনা এই স্ত্রীলোকটি কি একই সঙ্গে দুটি পুরুষকে উন্মত্ত করতে পেরেছিলো। একটা মাত্র বৈশিষ্ট্য খুঁজে পাওয়া যায়, যদি সেরকম মেজাজ থাকে, তা এই মৃত স্ত্রীলোকটির দৈর্ঘ্য। এ রকম দীর্ঘ দেহ নেপালিদের হয় না। অভিনবত্ব তা আকৃতির এমন কি পোশাকেরও অনেক ধীরস্থির মানুষের মতিভ্রম ঘটায়—তা তুমি এ গল্পেই দেখতে পাবে।

কিন্তু তার মৃত্যুটা মিথ্যা নয়, বিভৎসও বটে। ধারালো অস্ত্র দিয়ে বুকের গোড়া থেকে তলপেট পর্যন্ত যেন দুফালা ক'রে কেটে ফেলা হয়েছে।

নাকে রুমাল দিয়ে বেরিয়ে এসে যখন সে হাসপাতালের ডাক্তারের সঙ্গে গল্প করছে, হাসপাতালের হাতায় স্কুটারের শব্দ শোনা গেলো। তারপর কুজুরকে দেখা গেলো।

—কি খবর, কুজুর?

—খুনী আসছে?

—খুনী? সে কি?

মোষের গাড়িতে খুনীকে রওনা ক'রে দেয়ার কথা বললো কুজুর। গজেন্দ্র বিস্মিত হ'য়ে বললো,—খুনী বলছো, অথচ মোষের গাড়িতে তাকে রেখে চ'লে এসেছো? কি মুস্কিল!

কুজুর বললো,—তার এখন আর পালিয়ে যাওয়ার উপায় নেই। তা ছাড়া গাড়ির ধুরোর সঙ্গে তাকে এমন ক'রে বেঁধেছে গাড়োয়ান যে উঠে বসার ক্ষমতাও তার নেই।

গজেন্দ্র বললো,—খুনী যদি না পালায় তা হ'লে তোমাকে লাকি বলবো। আর পালালে কি হবে বুঝতেই পারছো। অবিশ্যি, তোমার লাক।

মোষের গাড়িতে আসতে এত রক্তক্ষরণ হয়েছিলো যে খুনীকে বাঁচানোর আশাই ছেড়ে দিলো ডাক্তার। কিন্তু কি অদ্ভুত জীবনীশক্তি। কয়েকটা সেলাই দিয়ে ব্যাণ্ডেজ বাঁধার পর গোটা দুতিন ইনজেকশন দিতেই লোকটির নাড়ি যেন স্বাভাবিক হ'লে এলো।

বিকেলের দিকে হাসপাতালে যাদের পাহারায় রাখা হয়েছিলো তাদের একজন কনস্টেবল থানায় এলো রান্নার যোগাড় করতে। তার মুখে শোনা গেলো ডাক্তার বলেছে, কাল নাগাদ জবানবন্দী নেয়ার ব্যবস্থা করা যেতে পারে।

[গজেন্দ্র পুতুতুণ্ড বেশ মনোযোগ দিয়ে তার গল্প ব'লে যাচ্ছিলো। বললাম, —কিন্তু এর মধ্যে, গজেন্দ্র, তোমার কুকুর নেই কিন্তু।

গজেন্দ্র হাসলো। বললো, নেই মানে। তুমি কি আমাকে সাহিত্যিক পেয়েছো যে কুজুরকে লাকি ডগ্ ব'লে কুকুরের কাজ সেরে নেব?]

পরদিন সকালে থানায় ব'সে গজেন্দ্র কুজুরের রিপোর্ট পড়ছে। ডাক্তার বলেছে, আর একটু সুস্থ হ'লেই জবানবন্দী নেয়া যেতে পারে, কারণ জখমী খুনীর ক্রাইসিস কেটে যাচ্ছে। বেশ ভালো লাগছিলো গজেন্দ্রর। সকালের রোদটা বেশ খট্‌খটে রকমের নাতিশীতোষ্ণ।

তা ছাড়া প্রাতরাশটা আজ বেশ ভালো হয়েছে। সকালেই ডিমের ডেভিল সহযোগে লুচি পুরুষের মনকে নিশ্চয়ই পৃথিবীর সকলকে ভাই ব'লে ডাকবার উপযুক্ত ক'রে দেয়। পরদায় হাওয়া লেগে দুলছে। তাতে থানার পিছন দিকে কোআটার্সগুলিও চোখে পড়ছে। আরে! তাইতো! এটাতো এতদিনেও নজরে পড়েনি। ও কোয়াটারটাই বোধ হয় কুজুরের। একটা খাড়া করা বাঁশে দড়ির ফাঁস পরিয়ে সে দড়িটাকে অন্য একটা খাড়া করা বাঁশের মাথার উপর দিয়ে গলিয়ে দড়ির মাথাটা মাটিতে একটা খোঁটায় বেঁধে দিলো একটি মহিলা। ওই বোধ হয় কুজুরের মেমবউ। কাঁধ থেকে অনাবৃত বাহু দুটি চক্‌চকে রোদে লালচে দেখাচ্ছে। একবার যেন মুখটার একপাশও। বাদামি রংএর চুলগুলি ঝুঁটি ক'রে বাঁধা। কুজুর হয়তো ঘুমাচ্ছে। কুজুরের ভাগ্যকে প্রশংসা না ক'রে পারা যায় না। গাউনের নিচে সুন্দর পা দুখানা। গজেন্দ্রর মনে হ'লো অনেকদিন সে বউকে আদর করেনি। এখন গিয়ে একটু করলে হয়।

কিন্তু রিপোর্টে ব্যাপারটা কুজুর এমন ক'রে সাজিয়েছে যে ভাগ্যের চাইতে দক্ষতাই প্রাধান্য পেয়েছে। হ্যাঁ তার তীক্ষ্ণ বুদ্ধি এবং দক্ষতা। এটা একটা দুর্বলতাই বোধ হয় মানুষের যে সৌভাগ্যকে পেলে সে তাকে অস্বীকার ক'রে নিজের তীক্ষ্ণ বুদ্ধি প্রভৃতিকেই প্রশংসা করে। আর এ জন্যেই বোধ হয় বেশির ভাগ ক্ষেত্রে সৌভাগ্যও মুখ ফিরিয়ে থাকে।

রিপোর্ট পড়তে পড়তে গজেন্দ্র আর একটা কিছুকেও আশা করছিলো। খুনের খবর পাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে সে রেডিওতে সদরকে জানিয়েছে। তার একটা উত্তর সে আশা করছিলো। হয়তো খবর আসবে সার্কেল ইনস্‌পেক্টর বা দুনম্বর ডি.এস.পি আসবেন। পাশের ঘরে বেতারযন্ত্র গোঁ গোঁ ক'রে উঠছে। কথা চলছে। এ.এস.আই সুধীর মুখোটি ঢুকলো গজেন্দ্রর ঘরে হন্তদন্ত হয়ে। খবর, স্যার। এক নম্বর ডি.এস.পি আসছেন, এস.ডি.পি.ও আসছেন, সার্কেল ইনসপেক্টর আসছেন, আর মিস্ ক্যাথলীন।

গজেন্দ্রর রক্তপ্রবাহে সকালের রোদ যে অলস আমেজের বুদ্‌বুদ্ রচনা করেছিলো এক মুহূর্তের বন্যায় যেন তা সব ভেঙে গেলো, ভেসে গেলো। সময়ের দিক দিয়ে বারো ঘণ্টাও নেই আর। বারো ঘণ্টায় একটা ওলোটপালোট হ'য়ে যাবে। উঠে হাঁক দিলো গজেন্দ্র। সাজো সাজো রব প'ড়ে গেলো সেই হাঁক থেকেই। থানার টেবল চেয়ার, দেয়াল মেঝে, লন, রাস্তা, বুট, বোতাম, বেল্টের চামড়া মেজে ঘষে, ঝেড়ে পুঁছে, ধুয়ে পাখলে সব কিছু ঝক্‌-ঝকে ক'রে ফেলতে হবে। গজেন্দ্র হুকুম দিলে। বেলা চারটেতে কনস্টেবল এবং এস.আই.-দের পুরো পোশাকে ফল্ ইন করতে হবে। কিন্তু এই তার শেষ কাজ নয়, সবে সুরু। সে কুজুরের স্কুটারে ক'রে ফরেস্ট অফিসে গেলো। তাদের সঙ্গে কথা বলা দরকার, এখনই দরকার। কারণ এ অঞ্চলে একটিমাত্র ডাকবাংলোই আছে—আর সে ডাকবাংলো ফরেস্ট ডিপার্টমেন্টের।

এদিকে সময়টা সাঁ সাঁ ক'রে এগিয়ে আসছে। বেলা চারটের ফল্ ইন পর্বে খুশী হ'লো গজেন্দ্র। তা সত্ত্বেও মনে হ'লো তার আর একবার ডাকবাংলোটা ঘুরে দেখে আসা উচিত। চারখানা কামরা পাওয়া গেছে। নেয়ারের খাট পাতা, নেটের মশারি। ঝক্‌ঝকে টেবিল চেয়ার। টেবিলে ফুলদানিতে ফুল। একেবারে উত্তরের ঘরে থাকবেন ডি.এস.পি তার পাশের ঘরে এস.ডি.পি.ও, তার পরেরটিতে মিস্ ক্যাথলীন, এবং সবশেষের ঘরে ইনস্‌পেক্টর। রসুই ঘরে একটা পাঁঠা, এক ঝাঁকা মুরগী, ঝুড়িভরা ডিম, বালতিভরা দুধ। খুশী হ'লো গজেন্দ্র। কিন্তু পায়ে পায়ে সে ফিরে এলো মিস্ ক্যাথলীনের জন্য যে ঘরখানা রাখা হয়েছে সেখানাতেই। সে অনুভব করলো জীবনের অনেক অভিজ্ঞতা থাকা

সত্ত্বেও সে জানে না মিস্ ক্যাথলীনের মতো যারা তাদের ঘর কি ক'রে গোছাতে হয়। টেবিলটা চেয়ারটা সে অকারণে টানলো। বিছানার ধবধবে চাদরটা একবার টেনে আর একটু ঠিক ক'রে দিলো। ঘরে ঢুকবার দরজায় ভালো একটা পর্দা ঝুলছে। পর্দার ঠিক নিচেই প্রকাণ্ড পাপোষ। এমন পাপোষ এর আগে দেখেনি সে। এত বড়, এমন সুন্দর। আর সে জানেও না মিস্ ক্যাথলীনের মতো যারা তাদের ঘরে পাপোষটা ঠিক কোথায় থাকে —পর্দার ভিতরদিকে, না বাইরে, না খাটের পাশে।

ঘণ্টা চারেক বাকি আর। গজেন্দ্র থানায় ফিরে গেলো। কি করবে তা সে খুঁজেও পাচ্ছে না। কিন্তু কিছু না করেই বা এমন উদ্বেগ নিয়ে মানুষ কি ক'রে থাকবে? অগত্যা গজেন্দ্র নাপিত ডাকিয়ে আনলো। নিজের কোয়াটারের বারান্দায় ব'সে নাপিতকে দিয়ে চুলে আর একবার কাঁচি বুলিয়ে নিলো। হ্যাঁ, এবার যেন আরও স্মার্ট দেখাচ্ছে।

এমন সুন্দর ব্যবস্থা হ'য়ে যাবে অথচ গজেন্দ্রকে দুশ্চিন্তা করতে হবে না? এমন সৌভাগ্য! পাশের ঘরে বেতারযন্ত্র আবার বেজে উঠলো। খবর দেয়া নেয়া হচ্ছে। কিছুক্ষণের মধ্যে মুখোটি এসে খবর দিলো, যে ব্যবস্থাই হ'ক, মিস্ ক্যাথলীনের পাশের ঘরেই তার অভিভাবককে থাকতে দিতে হবে।

—সে কি? তা হ'লে ইনস্পেক্টরবাবু থাকবেন কোথায়? মুখোটির পক্ষে এ সমস্যার সমাধান করা সম্ভব নয়।—কেন, ক্যাথলীন আর তার অভিভাবক কি এক ঘরে থাকতে পারে না? গজেন্দ্র প্রায় আর্তস্বরে জিজ্ঞাসা করলো।

মুখোটি বললো,—তা হয় না ওরা বলছেন। তাতে নাকি ক্যাথলীনের ঘুম হয় না।

—এখন? এই মুহূর্তে আর একখানা ঘর কি আমি ডাকবাংলোয় গড়াবো। গজেন্দ্র খেঁকিয়ে উঠলো। এসে তো শুনবেন খুনী ধরা পড়েছে। তার জন্যে—

কিন্তু রাগারাগিতে সমস্যাটা দূর হচ্ছে না। এ. এস. আই দত্তগুপ্ত বরং সাহায্যে এগোলো।—আমাদের এদিকে রাখলে হয় না, স্যার।

—কোথায়? থানার টেবিল জোরা দিয়ে শোয়াবে? মলো যা।

—তা নয়, স্যার, আপনার কিম্বা কুজুর সাহেবের বাসায়।

—তালেই হয়েছে। আমার বাসা। আস্ত একটা মশারি দিতে পারবো কিনা সন্দেহ। আর দেয়ালে রং পড়ে না কতদিন, তা জানো।

—কিন্তু কুজুর সাহেবের বাসাটা বেশ সাজানো গোছানো। মেমবউ এ বিষয়ে—

গজেন্দ্র ভাবলো। এই সময়ে কুজুর এসে দাঁড়ালো। বয়স তার কম। ছিপছিপে স্মার্ট চেহারা। কড়া ইস্ত্রি করা খাকিতে যেমন তাকে দেখাচ্ছে তেমন আর কোনদিনই দেখায়নি।

—গজেন্দ্র বললো,—আচ্ছা, কুজুর—

—বললেন কিছু?

—একটা সমস্যায় পড়া গেছে। ইনস্পেক্টর বাবুকে কোথায় রাখি? তোমার বাসাতে কি ব্যবস্থা হয়?

—আমার বাসায়, ইনস্পেক্টর? কুজুর ভাবলো। আপনার বাসায়?

—বড্ড ময়লা, বড্ড ময়লা। আমি থাকি বলেই কি ইনস্পেক্টর থাকতে পারে? তোমার বাসায়।

কুজুর বললো,—আচ্ছা. তা হ'লে।

গজেন্দ্র আবার হাঁক দিলো। কয়েকজন কনস্টেবল সঙ্গে কুঞ্জর গেলো তার বাসায়, অতিথির যথাযোগ্য ব্যবস্থা করতে।

কুঞ্জর যখন ওদিককার ব্যবস্থা ক'রে ফিরে এলো গজেন্দ্র কিন্তু ততক্ষণে আর একটি সমস্যা ভেবে রেখেছে।

—আচ্ছা, কুঞ্জর।

—বলুন।

—আমাদের দুজনেরই এখন থানায় ব'সে থাকা ভালো দেখাবে? মানে যেন আমাদের হাতে কোন কাজই নেই।

—কাজের অভাব কি?

—সেটাইতো দেখাতে হয়। কোন একটা তদন্ত নিয়ে তুমি কিম্বা আমি বেরিয়ে যাই। ওরা আসার কিছু পরে ফিরলেই হ'লো।

কুঞ্জর কিছু ভাবলো, তার পরে বললো,—তা হ'লে আমিই যাই। হবে না কিছু তবু তিনঝোরা বাগানের চুরির তদন্তটা সেরে আসি।

—তাই যাও না হয়।

কুঞ্জর স্কুটারের শব্দ তুলে চ'লে গেলো।

এটা গজেন্দ্রর মনের একটা জটিল প্রক্রিয়া। কুঞ্জরের মতো স্মার্ট এবং দুর্লভ-সৌভাগ্যবানকে কে নিজের পাশে রাখে কোন পরম মুহূর্তে? সে থাকলে কি তারই উপরে প্রথম দৃষ্টিটা পড়বে না? কিন্তু প্রথম দৃষ্টির চাইতে এমন মূল্যবান আর কি? কাজেই কুঞ্জরকে সরিয়ে দেয়া।

> [ গজেন্দ্র নিজের মনের প্রক্রিয়াটাকেও গোপন রাখলো না, কিন্তু তার গল্পটা কি রকম দাঁড়াচ্ছে? কুকুর দিয়ে সুরু হয়েছিলো, খুন এসে পড়লো, তারপরে এলো মেমবউ, এখন তাকে পাশ কাটিয়ে ক্যাথলীন! এর পরে কি ক্যাথলীনকেই সে খুনের কারণ হিসাবে দাঁড় করাবে? ক্যাথলীন অ্যাংলো ইণ্ডিয়ান একটি মহিলা হলেও পুলিশ অফিসারদের সঙ্গে খুনের তদন্তে সে ঘুরে বেড়ায়, এটা যে শিশুর কল্পনার পক্ষেও বাড়াবাড়ি তা কি গজেন্দ্র বোঝে না? ]

জিপ এসে থামলো। আর জিপের ঠিক আগে আগে অজয়ের স্কুটার। ঠিক যেন ভি. আই. পি-দের মোটরের আগে স্কাউটদের মোটর বাইক।

তখন ঠিক রাত আটটা। থানার ডেলাইটগুলো জ্ব'লে দিনের আলো ক'রে ফেলেছে। থানার কনস্টেবলরা গার্ড অব অনার দেয়ার ভঙ্গিতে দাঁড়িয়েছিলো। জিপ থামতেই আর্মস প্রেজেণ্ট করলো তারা। ঝক্ ঝক্ করছে তাদের সদ্য ইস্ত্রি করা উর্দি, বোতাম, বেল্ট, বুট থেকে আলো ঠিকরে পড়ছে।

জিপ থেকে নামলেন ডি. এস. পি, তারপর ক্যাথলীন আর তার এক সঙ্গী, তারপর অর্ডারলিরা। অন্য জিপ থেকে এস. ডি. পি. ও এবং ইনস্‌পেক্টর। আর তারপর জিপকে পথ দেখিয়ে আনবার জন্য খেয়াঘাটে যে কনস্টেবলটিকে পাঠানো হয়েছিল সে আর তার সঙ্গে একজন ভদ্র চেহারার ব্যক্তি।

অভ্যাগতরা যখন থানার ঘরে ঢুকছে, দুএক পা পিছনে গজেন্দ্র কুঞ্জরের পাশে পাশে চলার সুযোগ ক'রে নিয়ে জিজ্ঞাসা করলো,—লোভ সামলাতে পারলে না বুঝি?

—কিসের লোভ?

—কি বলি, মিস্ ক্যাথলীনকে দেখবার?

কথাটা নিচু গলায় রসিকতার মতো বলা হ'লেও যথেষ্ট ঝাঁজালো।

কুজুরের মুখে ধরা পড়লো ঝাঁজের ধাক্কা। কিন্তু সে বললো,—চোর ধ'রে আনলাম যে। তিনঝোরা বাগানের নয়। অনেকদিন আগেকার বাকডোরা বাগানের চায়ের দোকানের ক্যাশ ভেঙে পালিয়েছিলো।

সাধে কি লাকি ডগ্ বলে তাকে! অভ্যাগতদের সামনেই হাজতের দরজা খুলে কুজুর ভদ্রচেহারার সেই ব্যক্তিটিকে তার মধ্যে পুরে দিলো। চোর হ'লেই যথেষ্ট ছিলো। এ তার চাইতেও বেশি। এবস্কণ্ডার। এটা কি ডি.এস.পি-রা নোট করবেন না।

কিন্তু তখন কি এদিকে লক্ষ্য করার সময় ছিলো। ডি.এস.পি বসেছেন, এস.ডি.পি.ও বসলেন। ক্যাথলীন? সেই লঘুদেহা তন্বঙ্গী বিদেশিনী? গজেন্দ্রর অনেকদিন মনে থাকবে এই প্রথম মিনিট কয়েকটিকে। ঘরময় ঘুরে বেড়াচ্ছে ক্যাথলীন। এদিক ওদিক যাচ্ছে, এটা দেখছে, ওটা পরখ করছে। এই চঞ্চলতা, যাকে অন্য কেউ কেউ চটুলতা ব'লে থাকে, ক্যাথলীনের চরিত্রের একটা বৈশিষ্ট্য। কিন্তু কি করবে গজেন্দ্র? কুজুর অবশ্য পিছিয়ে দাঁড়িয়েছে। গজেন্দ্র এই সময়ে তার উপস্থিতি চায় না এটা বুঝতে পেরেই। গজেন্দ্র ভাবলো, সে কি ক্যাথলীনকে কিছু বলবে? নাকি তার পক্ষে তা বলা অসমীচীন হবে? আর কথা যদি বলতেই হয় তবে তা কি ইংরেজি কিম্বা বাংলায় হবে?

কিন্তু অতিথিই অনেক সময়ে আমাদের দুশ্চিন্তার লাঘব ক'রে দেয়। মিস্ ক্যাথলীন আসন গ্রহণ করলেন। এদিক ওদিক ঘুরে বেড়াতে বেড়াতে হঠাৎ যেন এই নতুন পরিবেশও তার কাছে পুরনো মনে হ'লো। এটাও ক্যাথলীনের একটা চরিত্রগত বৈশিষ্ট্য। কিছুটা সিনিক সে। এ রকম জীবনের ফলই তাই। অনেক অভিজ্ঞতার ফলে যে ঔদাস্য আসতে পারে তেমন কিছুই যেন। উত্তেজক কিছু ছাড়া এখন কিছুই তাকে উৎসুক করতে পারে না।

হাজতের সামনেই সে ব'সে পড়লো। আর তখন তার ছোট্ট সুন্দর জিভটার অগ্রভাগ খানিকটা প্রকাশিত হ'লো। নীলাভ চোখ দুটিতে যেন অলস বিরক্তির ছায়া। গলার রুপোলি কলারটায় আলো প'ড়ে চক্ চক্ করলো। কান দুটো একটু নড়লো।

[ বললাম,—বা, গজেন্দ্র, বা। ক্যাথলীন তা হ'লে?

—হ্যাঁ, সে আমাদের মেয়ে কুকুর যে শুঁকে শুঁকে খুনী ধরে।

সিগারেট ধরিয়ে গজেন্দ্র আবার সুরু করলো। ]

অনেকটা পথ জিপে এসেছেন কাজেই ওঁদের বিশ্রামের প্রয়োজন ছিলো। তাছাড়া গজেন্দ্রর ব্যবস্থা অনুসারে ডিনারও নটায় তৈরি। যেটুকু থাকবার থেকে ডি.এস.পি-রা বিদায় নিলেন ডাকবাংলোয় যাওয়ার জন্যে। লেখাপড়ার কাজ যা দরকার কাল সকালে হবে, আর আসল কাজও। গজেন্দ্র এবং কুজুর ডাকবাংলোয় গিয়েছিলো। তারা কিছু কিছু খুঁটিনাটিও জেনে এসেছে। ক্যাথলীন যখন তার কাজ করবে তখন কি বাইরের লোককে সরিয়ে দিতে হবে? এটা একটা সমস্যাই। যেখানে খুন হয়েছে সেই অনেক দূরেব চা বাগান থেকে পথ শুঁকে শুঁকে এগোবে ক্যাথলীন তখন তো একটি পথই, একটি নির্দিষ্ট পথেই সে চলবে না। তার গতি হবে ভাগ্যের মতো অনির্ধারিত। সেই অনির্দিষ্ট পথে কি ক'রে পাহারা বসানো যাবে। ডি.এস.পি বলেছেন ক্যাথলীন কি ক'রে অপরাধী খুঁজে বার করে

এ লোকে যত দেখে ততই ভালো। কাল দুপুর নাগাদ যদি ক্যাথলীন এই প্রথম কাজটা শেষ করতে পারে, কিছু কিছু খেলাও দেখাবে আর তখন তো ঢ্যাঁরা পিটিয়ে না হ'ক, মুখে মুখেও লোক ডাকতে হবে খেলা দেখার জন্যে।

গজেন্দ্র এবং কুজুর যখন থানায় ফিরলো রাত এগারোটা বাজে। গজেন্দ্রকে তখন খুব উৎফুল্লই দেখাচ্ছে। তা থেকে বোঝা যায় অফিসারদের সঙ্গে আলাপটা বেশ ভালোই হয়েছে। তার আয়োজন সার্থক হয়েছে।

থানায় তখন ডেলাইটগুলো জ্বলছে। কিন্তু গজেন্দ্র একটু অবাক হ'লো সব কটি কনস্টেবল, সব কটি এ.এস.আই তখনও কাজ করছে যেন। অবশ্য ভেবে দেখতে গেলে দোষ দেয়া যায় না। তাদেরও কি উত্তেজনার কারণ নেই?

গজেন্দ্র হাসিমুখে বললো,—আজ কি সকলেরই ডিউটি নাকি?

ওরা লজ্জিত হ'লো।

এ.এস.আই মুখোটি বললো,—এই যাই, স্যার, আপনি ফিরলেই যাবো ভাবছিলাম।

এ.এস.আই গোবিন্দ বাড়ুয্যে বললো,—আসল কথাটা বললেই হয়, বাপু. খুনী ধরার ব্যাপারটা সম্বন্ধে কিছু শুনতে চাও।

এ.এস.আই সুভগ সিং বললো,—অন্যাই কি? আচ্ছা স্যার, আমরা তো দেখতে পাবো?

—নিশ্চয়, নিশ্চয়।

মুখোটি বললো,—দেখো, বলেছিলাম।

বোঝা যায় সাহেবরা যখন ডাকবাংলোয় ডিনার নিয়ে ব্যস্ত এবং গজেন্দ্র এবং কুজুর তার তদারকে, এরা তখন থানার ঘরে গভীর একটা আলোচনা করেছে। সেটা স্বাভাবিকও। খুনের জায়গায় কিইবা আছে। লাস কাটা ঘরে লাস প'ড়ে আছে। আর কোন ঘরে খুন হয়েছিলো তা জানা আছে। এ থেকেই কে খুন করেছিলো তাকে খুঁজে বার করে দেবে ক্যাথলীন। আর তা দেবে সব বুদ্ধির অগম্য উপায়ে।

মুখোটি বললো,—আচ্ছা, স্যার, ওর গলার যে কলার সেটা কি প্লাটিনামের?

বাঁড়ুয্যে বললো,—এ তোমার বাড়াবাড়ি। রুপো কি এমন কম হ'লো।

গজেন্দ্র এদের চাইতে বেশি জানার ভান করলো কিন্তু কি উত্তর দেবে খুঁজে পেলো না। পদমর্যাদা অনুসারে দুজনকেই নিরস্ত ক'রে বলতে হয়—প্লাটিনামও নয়, রুপোও নয়।

সুভগ সিং বললো,—ওর বাবা নাকি ইংরেজ?

—তাইতো শুনলাম।

—আর মা ফরাসী?

—তাই হবে।

—আচ্ছা? সুভগ সিং চেখে চেখে সংবাদটাকে অনুভব করলো।

গোবিন্দ বাঁড়ুয্যে বললো,—আচ্ছা, স্যার, ওকি সাহেবদের সঙ্গে একই টেবলে খেলো?

মুখোটি বললো, বাঁড়ুয্যের যে কথা, ওকি অফিসার?

—তা তুমি অস্বীকার করবে কি করে? সাড়ে চারশ' মাইনা পায় জানো?

—তাই পায় নাকি, স্যার?

—তাই তো শুনলাম। গজেন্দ্র বললো।

বেশ লাগছে পরিস্থিতিটা। তার থানায় এমন একটা ব্যাপার ঘটবে তা সে ইতিপূর্বে আশা করেনি। যতক্ষণ ওরা থাকবে ততক্ষণ তো বটে, তার পরেও বেশ কিছুদিন তার থানা সম্বন্ধে লোকে শ্রদ্ধার সঙ্গে কথা বলবে, আর থানার কর্তা হিসাবে তার সম্বন্ধেও। একটা সিগারেট ধরালো গজেন্দ্র আয়েস করে। আর তার বসা দেখে তার অধস্তন এ. এস. আই এবং কনস্টেবলরা চারিদিক থেকে তাকে ঘিরে দাঁড়ালো।

এ. এস. আই মুখোটি বললো,—খুনীতো আমাদের কুজুর সাহেবই ধরেছেন। তবে কাকে ধরবে তাই ভাবছি।

গজেন্দ্র বললো,—সেই যদি খুনী হয় তবে তাকেই ধরবে।

—বারো তেরো মাইল গন্ধ শুঁকে এসে হাসপাতালে!

—তোমার কি মনে হয়?

—তাই সম্ভব।

একজন কনস্টেবল বললো, সাড়ে চারশ' মাইনা? ইনস্‌পেক্টরের চেয়ে বেশি?

—কাজটাও দেখো।

—তা'হলে পেন্সানও পাবে?

গজেন্দ্র নিজে এ বিষয়ে ঠিক কিছু জানে না। কাজেই ব্যাপারটাকে ধোঁয়াটে ক'রে দেয়ার জন্য সে পাল্টা জিজ্ঞাসা করলো,—তোমার কি মনে হয়?

—তাই হবে, স্যার।

গোবিন্দ বাঁড়ুয্যে বললো,—টেবলে খাবার রেখে চেয়ারে ব'সে খেয়ে ও সত্যি আরাম পায় কিনা তাই ভাবছি।

—কেন পাবে না? সুভগ সিং বললো। তার দেবদ্বিজে পরলোকে গভীর ভক্তি। ওকি যা তা ব্যাপার ভাবেন। আগের জন্মে খুব বড় জ্ঞানী কেউ ছিলো।

একজন কনস্টেবল বললো, চারশ' টাকা? কি করে টাকা দিয়ে। ছেলে মেয়ে তো নেই। একটা দীর্ঘনিশ্বাস পড়লো তার।

মুখোটি বললো,—আমি ঠিক ধরতে পারছি না একটা ব্যাপার। মনে করুন যদি ও হাসপাতালের আসামীকে না ধরে তবে কি আমরা বুঝবো কুজুর সাহেব যাকে ধরেছেন সে আসামী নয়?

আলোচনায় বাধা পড়লো ইনস্‌পেক্টর আসাতে। ডিনার শেষে গল্পগুজব শেষ করে শুতে এসেছে সে। তাকে দেখে আর একবার স্যালুট করলো সবাই। তারপর সে কুজুরের সঙ্গে তার বাসার দিকে চ'লে গেলো। আর তখন কনস্টেবলরা আর এক দফা আলোচনা করলো।

—কুজুর সাহেব কিন্তু খুব মনমরা হ'য়ে আছে।

—বোধ হয় ভাবছে যদি ঠিক আসামী না ধ'রে থাকে।

—কিন্তু একটা মজার ব্যাপার দেখো। চারশ' টাকা যদি মাইনা পায় তা'হলে তো ও ইনস্‌পেক্টরই হ'লো। সেলুট করতে হবে নাকি?

পরদিন সকালে যা হ'লো তাকে তুলনা দিতে হ'লে বিলেতি ফকস্‌হাণ্টের কথা বলতে হবে। বললো গজেন্দ্র। এখন সে দেশে সে খেলা আছে কিনা জানি না, তোমরা সাহিত্যিকরা বলতে পারো। ঘোড়ায় চ'ড়ে বিশেষ ভদ্রলোকরা (খানদানি ভদ্রলোক ছাড়া কার বা তেমন

পোশাক বা ঘোড়া থাকে, কাদের মহিলারাই বা অমন সাদা গ্লাবস পরে) শিয়ালকে তাড়া করেন। খানাখন্দ মাঠ বেড়া টপকিয়ে ডিঙিয়ে উঠে প'ড়ে ছুটে সেই খেলা চ'লে। একটা শিয়ালের পিছনে পঁচিশজন ভদ্রলোক। গজেন্দ্রদের ব্যাপারটাও তেমনি হলো। একটা কুকুর ছুটে চলেছে আর তার পিছনে তারা ছুটছে, কেউ জিপে, কেউ স্কুটারে, কারো পনি, বেশির ভাগ পায়ে হেঁটে। বনবাদাড় ডিঙিয়ে টপ্‌কে কুকুর চলছে তো তারা চলছে, সে থামছে তো তারাও থামছে। শোঁক শোঁক ক'রে মাটি শুঁকছে, কান লট্‌পট্‌ করছে, জিভ লক্‌লক করছে। একটা চাপা উত্তেজনায় যেন সে অস্থির হ'য়ে উঠেছে। আর তার সে উত্তেজনা তাদের দেহমনেও সঞ্চারিত। যে ঘরে খুন হয়েছিলো সেখান থেকে বেরিয়ে রিজার্ভ ফরেস্টের মধ্যে কয়েক পাক এলোমেলো ঘুরে ক্যাথলীন ন্যাশনাল হাইওয়ে ধ'রে ছুটে চললো। তার সঙ্গে গজেন্দ্ররাও। শুধু পুলিশের লোকরা নয়। ফরেস্টের লোকেরা। কাছাকাছি চা বাগানের দুচারজনও। ছুট্‌ছুট্‌। সুভগ সিংএর পা মচকে গেলো এক খানায় পড়ে, বনের মধ্যে গাছের ডালে মাথা ঠুকে গেলো ইনস্‌পেক্টরের—বাপ্‌ ব'লে সে ব'সে পড়লো কিন্তু ছোটা বন্ধ হ'লো না। সকাল থেকে সুরু হয়েছিলো দুপুর দুটোয় ক্যাথলীন তুংসুংএ হরকামায়ার বাড়িতে পেঁাছে এঘর ওঘর ঘুরঘুর ক'রে বেড়াতে লাগলো। ডি.সি.পি হাসিমুখে বললো সমবেত সকলকে, দেখলেন'ত! বারো মাইল পথ কি করে এসে পেঁাছালো।

হাসিমুখে সিগারেট ধরালেন তিনি। রুমাল বার ক'রে কপালের ঘাম মুছতেও ভুলে গেলেন।

প্রস্তাবটা দিতে হ'লো গজেন্দ্রকেই।

সাহসভরে এগিয়ে গিয়ে সে এস.ডি.পি.ও-কে বললো। তিনি ডি.এস.পি-কে-বললেন। আয়োজনটা গজেন্দ্ররই। এস.ডি.পি.ও-র নিজের আসনের নিচ থেকে বেরুলো স্যাণ্ডউইচ-এর চ্যাঙারী এবং কফির ফ্ল্যাস্ক। ডি.এস.পি; এস.ডি.পি.ও চা বাগানের সাহেবরা তার সদ্ব্যবহারে লাগলেন। কিন্তু গজেন্দ্র প্রত্যক্ষদর্শী। তার আয়োজনে খুঁত থাকে না কুজুরের স্কুটারের পিছনের বাধা কম্বলের পুঁটলি খুলতে বেরুলো চা, চিনি, এক কৌটো দুধ। চায়ের কাপ গ্লাস।

এই বিশ্রামের পরেই আবার যাত্রা। কিন্তু ঠিক আগের মতো নয়। ডি.এস পি কফি পানের পর বললেন,—এখন ক্যাথলীন বিশ্রাম করতে পারে। আপনারা যারা এখানে এসেছেন তাঁরা দয়া করে সন্ধ্যায় হসপিট্যালে যাবেন। সেখানে আপনারা অন্য একটি দৃশ্য দেখতে পাবেন।

এর পরে এক জিপে উঠলেন ডি.এস.পি, এবং পদস্থ যাঁরা। ক্যাথলীন অবশ্যই। সে এস.ডি.পি.ওর পাশের সিটেই উঠে বসেছে।

গজেন্দ্র কুজুরের পিছনে উঠে বসলো। সুভগ সিং প্রভৃতি চললো সাইকেলে। অন্যেরা হেঁটে।

ডি.এস.পি যা বলেছিলেন ঠিক তাই হ'লো। আশ্চর্য আর কাকে বলে? চোখে না-দেখলে প্রত্যয় হয় না। হসপিট্যালে লোকে লোকারণ্য। এত লোক যে কি ক'রে খবর পেলো ভাবতে অবাক লাগে। এটা বোধ হয় মানুষের একটা মৌলগুণ সে সত্যকারের ভালো কিছু স্বার্থপরের মতো আত্মসাৎ করে না। প্রত্যেক মানুষই অন্য অনেক মানুষকে খবর দিয়েছে ক্যাথলীনের। তখন আকাশে ক'নে দেখা আলো; ক্যাথলীনকে ছেড়ে দেয়া

হ'লো হস্‌পিট্যালের কাছে একটা জামগাছতলায়। কিছুক্ষণ যে সেন উদ্‌ভ্রান্তের মতো আকাশ শুঁকলো কিন্তু তা এক মুহূর্তেই। তারপর সে হস্‌পিটালের হাতায় ঢুকে পড়লো। একটু বিমর্ষতা, একটু যেন স্তব্ধতা, তারপর দৌড়ে ছুটে গেলো। শিকল ধ'রে তার সঙ্গীও তার সঙ্গে। একেবারে লাশকাটা ঘরের বন্ধ দরজার উপরে গিয়ে হুমরি খেয়ে পড়লো। তারপর আবার একটু দ্বিধা। এর পরে সে দৌড়ে গিয়ে ঢুকলো হস্‌পিট্যালের ঘরে। এঘরে ওঘরে কাউকে যেন খুঁজে ফিরছে। হস্‌পিটালের দুতিনটে সিট খালি ছিলো সেখানে কনস্টেবলরা রোগী সেজে শুয়েছে। সেদিকে দৃক্‌পাতও করলো না। এ দরজা দিয়ে ও দরজা দিয়ে, হস্‌পিট্যালের দরজাগুলো নতুন আগন্তুকের কাছে গোলক ধাঁধা বিশেষ, বেরিয়ে ঢুকে অবশেষে সে সেই ঘরে গিয়ে ঢুক্‌লো যেখানে আসামী। এক মুহূর্ত দ্বিধা তারপরই নিচু একটা ক্রোধের শব্দ ক'রে সে শয্যাশায়ী আসামীর হাত কামড়ে ধরলো। ভাগ্যে আসামীর হাতে আগে থেকেই হলদে মোটা কাপড়ের একটা পটি বাঁধা ছিলো।

দর্শকদের থামাতে বেগ পেতে হয়েছিলো। হস্‌পিট্যালে গোলমাল করা বারণ একথা ব'লে হাঁকডাক গোলমাল ক'রে বেড়াতে হলো গজেন্দ্রকে।

থানার দিকে ফিরে চললো দলটি। ফুটবল বিজয়ী ক্লান্ত কিন্তু আনন্দউচ্ছল একটি দল যেন।

বাকি খেলা কাল হবে। আংটি খুঁজে দেবে ক্যাথলীন, রুমাল চোরকে পাকড়াও করবে। দলের মুখে এই কথাই। কি আশ্চর্য! একি কেউ ভেবেছে। তাজ্জব! কেয়াবাৎ অদ্ভুত।

সকলেই গল্প করছে। একজন কনস্টেবল বললো,—কুঞ্জর সাহেব তা'লে ঠিক আসামীই পাকড়েছেন।

—বেশক্‌।

—দেখো, কুঞ্জর সাহেবও কম যায় না! ধরেছিলো তো।

—ভাগ্যবান লোক যে।

—কিন্তু ভাগ্য তো প্রতিবারেই সাহায্য করবে না।

—তা ঠিকই বলেছ। এর বেলায় ভাগ্য টাগ্য কিছু নয়? কুঞ্জর প্রশ্ন করলো।

—আচ্ছা গলার কলারে কিছু লেখা দেখলে না? একজন কনস্টেবল চাপা গলায় বললো।

—আমারতো মনে হ'লো ইনস্‌পেক্টর কথাটাই লেখা আছে।

—তাহলেই বা দোষ কি? কোন ইনস্‌পেক্টর এমন পারে বলো।

থানার ঘরে ওরা সবাই বসলো। ডি.এস.পি, এস.ডি.পি.ও, ইনস্‌পেক্টর। ক্যাথলীনের আজ আর দ্বিধা নেই। সেও একটা চেয়ারের উপরে লাফ দিয়ে উঠে বসলো। ডি.এস. পি হেসে সিগারেট ধরালো।

মানুষের মনের অবস্থা সামান্য একটা কথাতেই প্রকাশ পেতে পারে। এস.ডি.পি-ও একটা পরিতোষের নিশ্বাস ছেড়ে বললেন,—আহা, গজেন্দ্র, একটু চা হয়?

[বললাম,—গজেন্দ্র, চা তোমরা খাও, কিন্তু তোমাদের কারো মনেই প্রশ্ন ছিলো না?

—কেন থাকবে। যদি তুমি একটা গল্প লেখার মেশিন পাও তুমি কি প্রশ্ন করবে, না কলের হাতল ঘুরাবে? তদন্ত, তদন্ত, তদন্ত, সারা জীবনই আমাদের

তদন্ত আর তার মধ্যে বেশির ভাগই ব্যর্থ। এই একটা সুযোগ পাওয়া গিয়েছে।

বললাম,—বলো। ]

হাঁকডাক করে মুহূর্তে চায়ের ব্যবস্থা ক'রে ফেললো গজেন্দ্র। চা খেতে খেতে ডি.এস.পি. বললেন, আমরা তো চা খাচ্ছি, কিন্তু ক্যাথলীন।

—ওকি চাও খায় নাকি?

এস.ডি.পি-ও সোৎসাহে বললেন,—মদ খেলেও মানায়। কিন্তু ক্যাথলীনের মদ কিম্বা চা কোনটার দরকার ছিলো না। সে হঠাৎ টপ্ ক'রে চেয়ার থেকে নামলো। তারপর দরজার দিকে চললো।

তার সঙ্গী বললো,—বোধ হয় বিশ্রাম করতে চায়।

ডি.এস.পি বললো,—আন্প্রেডিক্টেবল্

এস.ডি পি.ও বললে,—কিছুটা হয়তো দাম্ভিকাও

ইনস্পেক্টর বললো,—আশ্চর্য কি!

ক্যাথলীন সত্যি সত্যি চ'লে গেলো। অনুমান সে যখন বারান্দা পার হচ্ছে তখন হঠাৎ পাহারারত কনস্টেবল চিৎকার ক'রে উঠলো—আইজ রাইট—অ্যাজ ইউ আর। খট্ খট্ করে জুতোয় জুতো লাগানোর শব্দ হ'লো, রাইফেল নামানো ওঠানোর শব্দ হ'লো।

এস.ডি.পি.ও বললেন,—কি হ'লো?

—স্যালুট করলো পাহারাদার?

—তা ঠিকই করেছে। ডি.এস.পি বললেন,—চা খেয়ে ওঁরা গেলেন।

গজেন্দ্র বললো,—কুজুর, এক হাত তাস খেললে কেমন হয়?

—তাস?

—ভালো লাগছে না? বেশ দিনটা আজকে।

—তাস? একটু চা খাই বরং।

—খাও, খাও। ওরে দেখ না কেটলিতে আর চা আছে নাকি?

একজন কনস্টেবল প্রশস্ত কেটলিটা নিঙড়ে কয়েক কাপ চা পেলো। এগিয়ে দিলো গজেন্দ্র ও কুজুরের সামনে। এ.এস.আই রাও হাত বাড়িয়ে নিলো চা। গজেন্দ্র আর একবার তার থানার জন্যে গর্ব অনুভব করলো। ইতস্তত চেয়ে দেখলো সে। কুজুর মন দিয়ে চা খাচ্ছে। চায়ের কাপেই তার মন। এ.এস.আই-রা দাঁড়িয়ে আছে তাকে ঘিরে। তার কিছু দূরে কনস্টেবলরা।

—তোমরা কি আজও রাত জাগবে নাকি? হাসি মুখে বললো গজেন্দ্র।

—না, না এই যাই।

—তা হ'লোই বা, স্যার, একটু রাত। একদিনই তো।

—কুজুর, তোমার কি খুব ঘুম পাচ্ছে? ক্লান্ত দেখাচ্ছে তোমাকে। অভিভাবক-সুলভ গলায় বললো গজেন্দ্র।

কুজুর নিশব্দে চা খেতে লাগলো।

সুভগ সিং বললো,—আচ্ছা, স্যার, পাহারাদার সেলুট ক'রে ভালোই করেছে কি বলেন?

গোবিন্দ বাঁড়ুয্যে বললো,—পুলিশের চাকরি ক'রে চারশ' টাকা মাইনে পায় তো। তা'হলে ইনস্পেক্টরের র‍্যাঙ্কই হয়।

সুধীর মুখোটি বললো,—ডি.এস.পি তো বললেন ঠিকই করেছে স্যালুট ক'রে।

কুঞ্জর বললো,—কিন্তু কুকুর তো।

—তা হ'ক। গজেন্দ্র বললো, সে সব কথা যাক, আমি ভাবছি তোমার মতো লাকি আর কে?

—লাকি?

—বা নয়তো কি বলো। তুমি যে ঠিক আসামী ধরেছ তাতো প্রমাণই হ'লো।

—কুকুরটাও তো লাকি।

—না, স্যার, ওকে ঠিক লাকি বলা যায় না। ওর ক্ষমতাই ঐরকম। সুধীর মুখোটি হাসতে হাসতে বললো।

—তা হবে। কুজুর বললো। কি ভাবলো সে।

গজেন্দ্র বললো,—ভাগ্যবান, সব দিকেই তোমার ভাগ্য কুজুর।

এ কথা বলার সময়ে গজেন্দ্রর মনে কুজুরের মেমবউএর কথাও ভেসে উঠেছিলো।

কুজুর বললো,—আসামীর হাতে কিন্তু একটা হলুদ কাপড়ের পট্টি বাঁধা ছিলো। ঘরের সবাই প্রায় সমস্বরে বললো,—তাতে কি?

—আর কারো হাতে কিন্তু তা বাঁধা ছিলো না।

এ.এস.আই সুধীর বললো,—সে তো যাতে আসামীর গায়ে দাঁত বসিয়ে না দেয় সেজন্যে। কুজুর ভাবতে লাগলো।

গজেন্দ্র মনে করলো এটা তার হিংসা হ'তে পারে। একটু একটু হিংসা তারও তো হচ্ছে।

পরের দিন সকালে ওদের চ'লে যাওয়ার আগে আংটি চুরি রুমাল লুকনো এসব খেলা হবে। এটা থানার হাতাতেই হয়েছিলো। তার মূলে গজেন্দ্রর একটা ব্যক্তিগত ব্যাপার ছিলো। ক্যাথলীন কাল খুনী সনাক্ত করার পর যখন গজেন্দ্র বাড়িতে ফিরলো তখন তার ছেলে দুটি যুযুধমান অবস্থায়। ব্যাপারটা ক্যাথলীনকে নিয়েই। বড় ছেলে বলেছে, ক্যাথলীন টেবিল চেয়ারে ব'সে খানা খায়। ছোটছেলে তা মানতে রাজি নয়। ছোটছেলে বলেছ ক্যাথলীন টিপসই দিয়ে মাইনে নেয় বাবার চাইতেও অনেক বেশি। বড়ছেলে বলেছে—বাবার চাইতে বেশি মাইনে পেতে পারে তাই বলে আঙুল যার নেই সে টিপসই দেবে তা মানা যায় না। কিন্তু এসব কারণ নয়। গজেন্দ্রর পত্নী বলেছিলো, তোমাদের কুকুরটি বেশ দেখতে। দেখেছ নাকি? হ্যাঁ। বড়ছেলে বললো—বলো তো কিরকম দেখতে? কেন বাদামি রং। ল্যাজটা ঝাঁকরা। ছাই দেখেছ ওটাতো থানার নেড়িটা। রাত্রিতে পত্নী অভিমান করলেন। অভিমানের মূল বক্তব্য জীবনে সব কিছু থেকেই তিনি বঞ্চিত। একটা এরোপ্লেনে পর্যন্ত চড়েন নি। কি দেখেছেন, কি শুনেছেন? কাজেই গজেন্দ্রকে ব্যবস্থা করতে হ'লো থানার হাতাতেই যাতে খেলাটা হয়।

খেলা সুরু হ'লো। তার আগে ডি.এস.পি একটা ছোটখাটো বক্তৃতা দিলেন। তার সারমর্ম এই রকম : মানুষ অনেক কিছু করতে পারে বটে কিন্তু যন্ত্র সেই অনেক কিছু করাকে সহজ করেছে, নিশ্চিত করেছে। ঘড়ি সময় দেয়, এরোপ্লেন আকাশে ওড়ে এগুলো ভেল্কি নয়। ক্যাথলীন চোর ধরে খুনী ধরে তাও ভেল্কি নয়। বিজ্ঞানবিদ্‌রা বলেন ইত্যাদি। এখানেই মানুষের উপরে যন্ত্রের শ্রেষ্ঠত্ব এবং ক্যাথলীনের মতো প্রাণীদেরও।

তার পর খেলা সুরু হ'লো। তিনঝোরা চা বাগানের মেমসাহেব নিজের আংটি খুলে দিলেন, কিন্তু কে তা চুরি করবে। কারোই যেন সাহস হয় না। অবশেষে যে এগিয়ে এলো সে কুজুর। আংটিটা গোপনে তার হাতে দেয়া হ'লো। সে যখন গজেন্দ্রর পিছন দিয়ে চ'লে যাচ্ছে তখন গজেন্দ্র ফিস্‌ফিস্ ক'রে বললো,—দেখো বাপু কঠিন কিছু করো না।

—কেন, পারবে না মনে হচ্ছে? কুজুর হাসলো—ফ্যাকাসে মুখে।

—ঠিক তা নয়। তবে—

গজেন্দ্রর মনের অবস্থা ভাই পরীক্ষা দিচ্ছে এমন একজন দাদার মতো। কুজুর কত কিই করলো অনেক মিনিট ধ'রে ভিড়ের মধ্যে গ'লে, এদিকে ওদিকে চ'লে, এক পথে দুবার তিনবার ঘুরে, পায়ে পায়ে গোলক ধাঁধা রচনা করে অবশেষে সে কনস্টেবলদের মধ্যে গিয়ে দাঁড়িয়ে রইল। তারপর ক্যাথলীনকে ছাড়া হ'লো। মেমসাহেবের হাতটাকে কয়েক-বার শুঁকলো সে তারপর ভিড়ের মধ্যে ঢুকে পড়লো। কুজুরের লুকোতে বেশ কিছুক্ষণ লেগেছিলো, ক্যাথলীনের দুমিনিটও লাগলো না। দ্বিতীয় খেলা সুরু হ'লো যখন দর্শকদের আনন্দ কোলাহল তখনও মিলিয়ে যায় নি। ডি. এস. পি বললেন, এবার আমার পকেট থেকে কেউ রুমালটাকে সরিয়ে নিয়ে দুশ'গজের মধ্যে কোথাও থাকুন। তাই তো, এ খেলাটা কি করে হবে? ডি. এস. পি-র পকেট থেকে রুমাল সরাবে কে? কেউ আর এগোয় না। অবশেষে ডি. এস. পি বললেন, তা'হলে আপনারা কেউ আসুন, আমার পিছনে দাঁড়ান, রুমালটা আমি বার ক'রে দিচ্ছি। কিন্তু পকেটে হাত দিয়ে দেখা গেলো রুমালটা সত্যি নেই। কি আশ্চর্য, কে নিলো? ডাকবাংলোয় রেখে এসেছেন? তখন ক্যাথলীনের সঙ্গী বললো, ক্যাথলীনই বলুক। ডি. এস. পি-র পকেট শুঁকিয়ে ক্যাথলীনকে ছেড়ে দেয়া হ'লো। এদিক ওদিক ঘুরতে লাগলো সে। একটু যেন দিশেহারা ভাব। গজেন্দ্রর বুকের ভিতরটায় ধক্ ক'রে উঠলো, তা হ'লে এবার কি ক্যাথলীন পারবে না? কিন্তু ক্যাথলীন তো মানুষ নয়। যন্ত্রের মতোই নির্ভুল। থানার হাতা পার হয়ে, থানার ঘরের মধ্যে ঘরে, থানার বাড়িকে কয়েক পাক ঘুরে সে সোজা থানার কর্মচারীদের কোআর্টার্সের দিকে দৌড়লো। সে কি কোথায় যায়? এবার আর পারবে না। দেখা যাক না কি হয়। জনতা স্তব্ধ হয়ে প্রতীক্ষা করতে লাগলো। কিন্তু কয়েক মিনিট মাত্র। ক্যাথলীন কুজুরকে নিয়ে এলো তার কোয়ার্টার থেকে। ইতিমধ্যে কুজুর তার পোশাক বদলেছে। সাদা ট্রাউজার আর হাওয়াই সার্ট পরেছে তা সত্ত্বেও তার মুখের চেহারাটা দস্তুর মতো অপরাধীর। ডি. এস. পি বললেন সমবেত জনতাকে—আর কিছু প্রমাণ চান আপনারা? জনতা নিরুত্তর। গজেন্দ্র বললো,—দেখো, কুজুর, তুমি কিন্তু আর এগিয়ো না। ভালো দেখায় না।

—কেন, বারবার তিনবার। কুজুর বললো।

—তুমি কি এখনও বিশ্বাস করো না?

কুজুর বললো,—আপনি এত ভয় পাচ্ছেন কেন?

গজেন্দ্র অবাক হ'লো। কুজুরের কপালে বিন্দু বিন্দু ঘাম ফুটেছে। চোখ দুটি চক্‌চক্ করছে।

গজেন্দ্র বললো,—শত হ'লেও কুকুরটা তো আমাদের ডিপার্টমেন্টেরই। ফেটিগ ব'লে তো কিছু আছে।

ডি.এস.পি-ও বললেন,—কি কুজুর আবার নাকি?

আর একবার খেলা হ'লো। এবারও ফাউণ্টেনপেনটা গাছতলা থেকে এনে দিলে ক্যাথলীন।

খেলা শেষ হয়েছে কিন্তু জনতার ভিড় ভাঙছে না। ডি.এস.পি সিগার ধরালেন। পুলিশ অফিসাররা কাছাকাছি দাঁড়িয়েছে। নিজেদের মধ্যে কথা বলছেন। খুশী মনে যেমন কথাবার্তা হ'য়ে থাকে।

ডি.এস.পি হাসিমুখে বললেন,—কুজুরও আজ অনেক বুদ্ধি দেখিয়েছে।

এস.ডি.পি.ও বললেন,—কিন্তু হারলো তো।

প্রকৃতপক্ষে কুজুর যেন ক্যাথলীনের সঙ্গে বুদ্ধির পরীক্ষাই দিয়েছে। থানার ঘরে এসে বসলেন ওঁরা।

এর পরে ডি.এস.পি থানার কনস্টেবলদের সঙ্গে দুএকটা ক'রে কথা বলতে লাগলেন। তারা সকলেই স্যালুট ক'রে এসে দাঁড়াতে লাগলো। তারপর ডি.এস.পি-রা গেলেন গজেন্দ্রর কামরায় খুনের তদন্ত রিপোর্টটা আলোচনা করার জন্যে।

একটা রেজিস্টার নিতে গজেন্দ্র এসেছিলো এই ঘরে। সকলের অলক্ষ্যে একবার চারিদিকে চেয়ে দেখলো। বলা যায় না, হঠাৎ যদি কোন খুঁত কারো চোখে পড়ে। এটা চাকরিও তো বটে। সে দেখলো দত্তগুপ্ত এবং কুজুর গল্প করছে মুখোমুখী বসে।

—কি ব্যাপার?

দত্তগুপ্ত বললো,—কুজুর সাহেব বলছেন, ক্যাথলীনের সঙ্গী যে তাকে শিকল ঝাঁকিয়ে ইঙ্গিত করে নি তার প্রমাণ কি।

—হাউ অ্যাবসার্ড, কি যে বলো কুজুর। কিন্তু তোমার পরনে এখনও সিভিল ড্রেস।

কুজুরেরও খেয়াল হ'লো। সে পোশাক বদলাতে গেলো।

থানার দরজার সামনে তখনও ভিড়। কারণ ক্যাথলীন একটা চেয়ারে উঠে বসেছে। তার গায়ের পশমগুলো চক্‌চক্ করছে ঘামে। জিভ ঝুলিয়ে সে অল্প অল্প হাঁপাচ্ছে।

[ গজেন্দ্র বললো,—আচ্ছা, মোহিত, তোমরা সাহিত্য করো। মনস্তত্বের কথা নিশ্চয়ই জানো। বলতে পারো কুকুর যা করলো তা সম্ভব হ'লো কি করে?

—কি করলো তা বলো আগে।

—নতুন ইস্ত্রি করা পোশাক পরে কুজুর থানায় ফিরলো। তার পোশাক পরাটার বৈশিষ্ট্যই এই সব সময়ে তা সদ্য ইস্ত্রি করা। বোধ হয় তার মেমবউএর হাতের কাজ। যাক সে কথা। পোশাক প'রে হাসতে হাসতে সে যখন থানার ঘরে ঢুকছে তখন সে ঘরে তার উপরওয়ালা কেউ ছিলো না। ক্যাথলীন অবশ্য ছিলো চেয়ারের উপরে। দরজার বাইরে দাঁড়িয়ে একটা জনতা তাকে দেখছে। তাদের দিকে চেয়ে সে তখনও জিভ লক্‌লক্ ক'রে হাঁপাচ্ছে। দরজা পেরিয়ে ঘরে পা দিয়েই জুতো ঠুকে স্যালুট করলো কুজুর।

—কাকে, ক্যাথলীনকে? কনস্টেবলদের মতো সেও কি ক্যাথলীনকে উপরওয়ালা মনে করেছিলো।

গজেন্দ্র বললো,—এটা, অবশ্য, এমন হ'তে পারে যে তার বিবেক শান্ত হচ্ছিলো না এমন কিছু না ক'রে?

—কেন, কেন?

—সকালের খেলার সময়ে সে ক্যাথলীনকে জব্দ করার জন্য কম চেষ্টা করে নি।

—এটা কন্‌ডিসানড্‌ রিফ্লেকস্‌ও হ'তে পারে। পোশাকের ইঙ্গিত সঙ্গে যার যোগাযোগ আছে। কিন্তু গল্পটা বলো।]

গজেন্দ্ররা এই ডামাডোলে ভুলেই গিয়েছিলো হাজতে একজনকে ধ'রে রাখা হয়েছে। এবার সে মুহূর্তের জন্য দৃষ্টি আকর্ষণ করলো। সে যেন চাপা গলায় কাশলো। দৃষ্টি আকর্ষণ করলো বলা বোধ হয় ঠিক নয়। কাল রাত্রিতেও যখন গল্প হচ্ছিলো তখন হাজতী আসামীও শিকের দরজার কাছে এসে দাঁড়িয়ে গল্প শুনছিলো। এ.এস.আই সুধীর মুখোটি তার খাবার ব্যবস্থাও করেছিলো। কাশির শব্দ শুনে কুজুর ফিরে দাঁড়ালো। মনে হ'লো সে যেন কিছু বলবে। কিন্তু কিছু না ব'লে বরং ভাবতে লাগলো সে মুখ নিচু করে।

ডি.এস.পি ও এস.ডি.পি.ও তদন্তের রিপোর্ট পড়া শেষ করে উঠলেন। তাঁরা লাঞ্চে যাবেন ডাকবাংলোয়। লাঞ্চ শেষ হ'লেই জিপ রওনা হবে। ইনস্‌পেক্টর থাকবেন বাকি তদন্ত পরিচালনার জন্য। ক্যাথলীনকে তারা থানা থেকে তুলে নিয়ে যাবেন। ততক্ষণে যত লোকে পারে দেখে নিক।

ওঁরা বেরিয়ে যেতে গজেন্দ্র থানার ঘরে এলো। কুজুর একটা চেয়ারে ব'সে বাজে কাগজ ছিঁড়ছে কুটিকুটি করে।

গজেন্দ্রর মন ভালো ছিলো। ওঁরা আসবার সময়ে সে কুজুরকে দূরে রাখতে চেয়েছিলো। এখন তা প্রয়োজন বোধ করলো না। বললো, খাওয়া দাওয়া ক'রে নাও কুজুর। ওদের সঙ্গেই নদীর ঘাট পর্যন্ত যাও তুমি। আর হাজতী আসামীর চালান লিখে দিচ্ছি ওকেও রওনা ক'রে দাও।

এই ব'লে গজেন্দ্র নিজের কামরায় ঢুকে হাজতী আসামীর চালান লিখতে বসলো। চব্বিশ ঘণ্টার বেশি আটকানো হয়েছে। সেটা ঢাকতে হবে।

কিন্তু দুএক মিনিটের মধ্যেই তাকে অবাক হ'য়ে লেখা ছেড়ে উঠতে হ'লো। কে যেন কাকে মারছে, প্রচণ্ডভাবে মারছে। কাঁদছে কেউ।

থানার ঘরে ঢুকে গজেন্দ্র স্তম্ভিত হ'য়ে দাঁড়িয়ে পড়লো। হাজতের দরজা খুলে ঢুকেছে কুজুর, আর নির্দয়ভাবে মারছে আসামীকে একটা বেল্ট দিয়ে।

—আহা করো কি, করো কি, ব'লে গজেন্দ্র এগিয়ে গেলো। মারছো কেন মিছামিছি। কুজুর আরও কয়েকটা চড় মারলো আসামীর গালে। হুহু ক'রে কেঁদে উঠলো সে।

গজেন্দ্র কুজুরকে প্রায় ঠেলে বার ক'রে দিয়ে হাজতের দরজা বন্ধ ক'রে দিলো। গম্ভীর গলায় বললো, খেয়ে নাওগে। সাহেবদের সঙ্গে যেতে হবে তোমাকে।

কুজুর মুখ তুলে তাকালো। অবাক লাগলো গজেন্দ্রর—এ যেন অন্য কোন কুজুর।

এখানে গজেন্দ্রর গল্প বাধা পেলো। ওদের যান্ত্রিক গোলোযোগ পার হ'তে পেরেছে। ডিনার দেয়া হচ্ছে খবর এলো।

বললাম,—বেশ কথা, কিন্তু কুজুর হঠাৎ আসামীটাকে মারলো কেন?

গজেন্দ্র বললো, এ নিয়ে তদন্ত হয়েছিলো। সুধীর মুখোটি বলেছিলো—কুজুর যখন ক্যাথলীনকে স্যালুট করে তখন আসামী হেসেছিলো। আসলে সেটা তার কাশি নয়।

—আর কুজুর তাকে বিদ্রূপ মনে করেছিলো!

ডিনারের টেবিলে যাওয়ার জন্য উঠলাম।

যেতে যেতে গজেন্দ্র বললো,—অসম্ভব নয়। কুজুর তখন অদ্ভুত ব্যবহারই করেছিলো। সাহেবরা যাওয়ার জন্য প্রস্তুত হয়ে এলেন কিন্তু কুজুর নেই। তাঁরা দুএক মিনিট অপেক্ষা করলেন তবুও তার দেখা নেই। অবশেষে তারই স্কুটারে ক'রে সুধীর মুখোটি গেলো খেয়া ঘাট পর্যন্ত ওঁদের এগিয়ে দিতে।

—তার বাসায় খোঁজ করা হ'লো না কেন?

—কি যে বলো, মোহিত? সে কি বাসায় ছিলো। সেদিন তার পরের দিনও তাকে পাওয়া গেলো না। ওদিকে ঘাড়ের উপরে ইনস্‌পেক্টর ব'সে। অথচ ডিউটি থেকে ছুটিও নেয়নি। ডেজার্টার ব'লে প্রসিডিংস করার কথাই ভাবছে ইনস্‌পেক্টর।

—কেমন একটু লাগছে না? চেয়ার টেনে বসতে বসতে বললাম।

—তা লাগার কথাই। কুজুরের রক্তে, সে খৃষ্টান হওয়া সত্ত্বেও, এমন কিছু ছিলো যা আমাদের থেকে পৃথক। একটা কুকুর কিম্বা একটা যন্ত্র মানুষের চাইতে বড় হ'তে পারে এ মেনে নিতে হ'লে যথেষ্ট সভ্য হওয়া দরকার। বোধহয় কেন, নিশ্চয়ই ওর মধ্যে আদিবাসী রক্ত ছিলো।

সুপ নাড়তে নাড়তে গজেন্দ্র বললো, কিন্তু কুজুরের জন্য তুমি দুঃখ ক'রো না। তাকে পাওয়া গিয়েছিলো। কিম্বা তৃতীয় দিনে সে নিজেই ফিরে এসেছিলো তখন ভোর রাত হবে, এই বলে সেদিনের পাহারাদার। উস্কো খুস্কো চুল, ময়লা পোশাক। কিন্তু লাল চোখ দুটিতে অনিদ্রার ক্লান্তি থাকলেও তা শান্ত।

—প্রসিডিংস হ'লো তো।

গজেন্দ্র হাসলো। চিকেন ফ্রাইটা বেশ করে কিন্তু। সেসব কিছুই হয়নি। চোখ দিয়ে সে ইঙ্গিত করলো। বললো,—ইনস্‌পেক্টরই তো ছিলেন সেখানে। কুজুরের বাসায় ছিলেন। তার খোঁজও করছিলেন। দ্বিতীয় দিনে কুজুরের মেমবউকে স্কুটারের পিছনে বসিয়ে জঙ্গলে জঙ্গলে খুঁজে বেড়ালেন কুজুরকে। কুজুরের মেমবউএর গায়ে বেশ দেখাচ্ছিলো সবুজ রঙের নিচু গলার জামাটা। তখন গরম কাল তো। কুজুর যে সকালে ফিরে এলো সেদিন ইনস্‌পেক্টর থানায় এলেন প্রায় আটটা নটায়। প্রাতরাশ হয়েছে তার ইতিমধ্যে। খুব পরিতৃপ্ত দেখাচ্ছিলো তাকে।

—তার পরিতৃপ্তিটা কি সন্দেহজনক ছিলো?

—গভীর বলতে পারো। অত গভীর হওয়া সেই পরিস্থিতিতে স্বাভাবিক নয়। আর এমন সদয়ও কেউ কোনদিন এই ইনস্‌পেক্টরকে দেখেনি। কুজুর চাকরি করবে কিনা জিজ্ঞাসা করলেন হাসতে হাসতে। কুজুর বললো—করবে সে।

বললাম,—মানে—

গজেন্দ্রর মুখ তখন ঝলসানো মুর্গীতে ঠাসা কাজেই সে কি বললো স্পষ্ট বোঝা গেলো না। মনে হ'লো সে বলছে—চাকরি, টাকা, সমাজে স্থিতি এসব মিলে গোটা সামাজিক জীবনই একটা যান্ত্রিক ব্যবস্থা। বিদ্রোহ করার চেয়ে মেনে নেয়া ভালো। কিন্তু ঠিক একথাই বললো কিনা সে তা হলপ্ ক'রে বলা যায় না।

# আধুনিক সাহিত্য

আধুনিক সাহিত্যের মধ্যে শিশু-সাহিত্যের যে আসন ও গুরুত্ব নির্ধারিত ও স্বীকৃত হয়েছে, তার সম্বন্ধে দ্বিমত নেই। অন্যান্য দেশের সাহিত্যের মতই বাংলা সাহিত্যেও শিশুদের জন্য রচনার ঐতিহ্য বেশ প্রাচীন। 'শিশু' বলতে বয়সের কোন্ সীমা, আর শিশু-সাহিত্য বলতে কি জাতীয় রচনা বোঝায়,—এই সব প্রসঙ্গ তর্ক-সাপেক্ষ। তার মধ্যে তত্ত্বকথা, নীতি-উপদেশ বা হিত-বচন থাকা উচিত বা অনুচিত কিনা, এককথায় তার উদ্দেশ্য ও রচনাভঙ্গী নিয়ে যথেষ্ট আলোচনা হয়েছে এবং এখনও তার নূতনতর অবকাশ আছে। কিন্তু একটি বিষয়ে সকলেই একমত। সেটা হচ্ছে, শিশু-সাহিত্যের প্রাণবস্তু হল তার আবেদন, কৌতূহল জাগানোর ক্ষমতা, ভাষার সাবলীল স্বচ্ছতা, বোধগম্যতা এবং সব চেয়ে বড় কথা—তার চিত্তজয় করার শক্তি বা মনোহারিত্ব।

বাংলা দেশে শিশু-সাহিত্যের যে প্রসার লক্ষ্য করা যাচ্ছে এবং তার সমাজ-সম্মত প্রয়োজনীয়তা অঙ্গীকার করে নেওয়া হয়েছে, তা অবশ্যই আনন্দের কথা। ব্যাপারটা দু দশ বছরে ঘটেনি, লেগেছে একশো বছরের ওপর। ১৮১৮ খৃষ্টাব্দে শ্রীরামপুর ব্যাপ্‌টিস্ট মিশন থেকে মার্শম্যান সাহেব "দিগ্দর্শন" নামে কিশোর-পাঠ্য যে মাসিক পত্রিকা প্রকাশ করেন, তাকে বাংলায় শিশু-সাহিত্যের আদিপুরুষ বলা চলে। এতে ইতিহাস ও বিজ্ঞানে প্রাথমিক শিক্ষা দেওয়ার প্রচেষ্টা ছিল। "দিগ্দর্শনের" অনুজ হল "পশ্বাবলী"—১৮২২ সালে প্রকাশিত জীবজন্তুর বিবরণ নিয়ে লেখা আর এক শিশুপাঠ্য পত্রিকা। নানা শিক্ষণীয় বিষয় নিয়ে নীতিবাক্য আর উপদেশের মাধ্যমে যে বস্তুর উদ্ভব, তারই আনন্দময় রূপান্তর ও পরিণতি লক্ষ্য করি ১৯১৩ এবং ১৯২০ সালে প্রকাশিত "সন্দেশ" ও "মৌচাকে"। এই শতাব্দী-কালের মধ্যে শিশুদের উপযোগী সাহিত্য নিয়ে বহু তর্ক আলোচনা, পরীক্ষা-নিরীক্ষা হয়েছে যার ফলে শিশু-সাহিত্যের বর্তমান বিবর্তন সম্ভব হয়েছে। এবং সেই বিবর্তন-প্রক্রিয়ায় একাধিক সাহিত্য-রথী সহৃদয় বিবেচনা-শক্তি দিয়ে সহযোগিতা করেছেন।

আজ যে মন ও দৃষ্টি নিয়ে ছেলেমেয়েরা বই পড়ে ও আনন্দ পায়, আর যে মন আর দৃষ্টি নিয়ে বয়স্ক ব্যক্তিরা সেসব বই সমাদরে উপভোগ করেন কিংবা তীব্র সমালোচনা করেন, তার জন্য কয়েকজন বিশিষ্ট লেখক পথিকৃৎ হিসেবে প্রাপ্য মর্যাদা অবশ্যই দাবি করতে পারেন। ঐতিহাসিক কারণেই বিদ্যাসাগরের নাম সর্বাগ্রে উল্লেখযোগ্য, যাঁর কৃপায় শিশুদের বর্ণপরিচয় ঘটেছে, গোপাল-রাখাল-ভুবনদের কথা সহজ ও সুখপাঠ্য গল্প হিসেবে মনের মধ্যে গেঁথে গিয়েছে আর কথামালার জীবজন্তুদের সঙ্গে হৃদয়বিনিময় হয়েছে। এর পরবর্তী যুগে শিশু-সাহিত্যে রবীন্দ্রনাথের দান, বিজ্ঞানসম্মত পন্থায় ভাষাশিক্ষার সঙ্গে সুচিন্তিত পরিকল্পনায় আনন্দ-রস পরিবেশন সম্পর্কে এত কথা বলা যায় যার জন্য স্বতন্ত্র পুঁথির প্রয়োজন। তারপর যোগীন্দ্রনাথ সরকার, দক্ষিণারঞ্জন মিত্র মজুমদার, উপেন্দ্রকিশোর রায়চৌধুরী, অবনীন্দ্রনাথ আর সর্বশেষে সুকুমার রায়—এই পাঁচজন লেখক এমন জিনিস দিয়েছেন যার জন্য বাংলার পাঠক-পাঠিকা চিরদিন ঋণী হয়ে থাকবে।

শিশু-সাহিত্য সাহিত্যেরই একটা অংগ এবং নিতান্ত অপ্রধান অংগ নয়। ঘুঁটে-কুড়নী বা সিণ্ড্রেলার গল্পের রকম-ফের সব দেশেই পাওয়া যাবে। কিন্তু তাই বলে শিশু-সাহিত্য দুঃস্থ অনাত্মীয়ের সামিল নয়। বিশ্ব-সাহিত্য নিয়ে যাঁরা নাড়াচাড়া করেন, তাঁরা নিশ্চয়ই জানেন যে, মহৎ সাহিত্য যে দেশে রচিত হয়েছে, সেখানে শিশু-সাহিত্যও যথেষ্ট সমৃদ্ধ। সংস্কৃতির সংগে জীবনের যে ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক সাহিত্যে প্রতিফলিত হয়, সেই জীবনের অর্থাৎ সমাজ-জীবনের একটা বড় অংশ হল শিশুদের জীবন, শিক্ষা ও আনন্দ। একটা অনুকম্পা-মিশ্রিত কৌতুকজড়িত ঈষৎ মুরুব্বিয়ানা সুরে যদি সেই শিশু-সাহিত্য রচিত হয়—যেমন আমাদের দেশে কোনও কোনও বইয়ে দেখতে পাই, তাহলে বলতে হবে এতে শিশুদের প্রতি সুবিচার করা হয় না। তাদের মধ্যে প্রকৃতিদত্ত অনেক জিনিস অবহেলা করে, তাদের নগণ্য জীব মনে করে রীতিমত অবমাননা করা হয়। এর ফলে যে ধরনের সাহিত্য রচিত হয়, তা কিছুটা অবাস্তব। তাচ্ছিল্যের দাক্ষিণ্য। আধো-আধো কৃত্রিম আদুরে কথা হলেই তা শিশু-সাহিত্যের ভাষা হয় না।

আসল কথা এই যে কাঠামোটা যেমন দরকারী, তার মধ্যে প্রাণপ্রতিষ্ঠা আরও দরকারী। এবং সে কাজটি সহজ নয়। কত যত্নে নিষ্ঠায় বিবেচনায় শিশুদের জন্য বই লিখতে হয়, তা পড়ে ভেবে ঠিক করতে হয়। শিশুদের জগৎ খানিকটা খাপছাড়া বলেই তাদের মন আচরণ সব খাপছাড়া—এমন মনে করবার কোনও ন্যায্য কারণ নেই। বড়দের জগৎ থেকে বিচ্ছিন্ন, এবং পুরোপুরি নিঃসম্পৃক্ত একটা জগতে শিশুরা বাস করেনা। আকারে-প্রকারে মিনিয়েচ্যর বলেই, তাদের সবটুকু মন খণ্ডিত ও সংক্ষিপ্ত নয়। তাদের হৃদয়েও বড় ভাবের ঢেউ জাগে, মন দোলা খায় কল্পনার আবেগে—যে কল্পনা সব সময়ে অসংলগ্ন নয়। এমন কি কিছু পরিমাণে অসংলগ্ন হলেও, সে কল্পনার প্রসার ও সঞ্চার আমাদের বয়স্কের কাছেও বিস্ময়কর। শিশুদের চিন্তায় ধারণায় এক ধরনের লজিক আছে। সেই লজিক যিনি শিশুদের মন নিয়ে বুঝেছেন এবং ফোটাতে শিখেছেন, তিনিই প্রকৃত লেখক। ক্যারল এবং ডিকেন্‌স্‌, স্টীভ্‌ন্‌সন এবং ডী লা মেয়রের বিশেষ ধরনের রচনাগুলির কথা ভেবে দেখলেই কথাটার সত্যতা প্রমাণিত হবে। করুণা করে নীচে নেমে এসে পিঠ চাপড়ানোর যেমন দরকার নেই, হাওয়াই জাহাজে অকালপক্ক কিশোরদের তেমনি কোনও পার্বত দ্বীপের গভীর জংগলে গুপ্তধনের গোয়েন্দাগিরি করবারও প্রয়োজন নেই। অবাস্তব এড্‌ভেঞ্চার যেমন অর্থহীন, ক্রমাগত ছানাবড়া খাওয়ানোও তেমনি অস্বাস্থ্যকর।

শিশু ও কিশোরদের মন নিয়ে যতটা তাত্ত্বিক বিশ্লেষণ আমরা করে থাকি এবং পরিসংখ্যান রচনা করেছি, শিক্ষা-সংক্রান্ত ব্যাপারে যে সব অ্যাপ্‌টিচ্যুড টেস্ট, অবজেকটিভ টেস্ট প্রচলন করেছি, সেই অনুপাতে কিন্তু বই লিখিনি। অর্থাৎ সেই অনুপাতে শিশু-সাহিত্য কৌলীন্য অর্জন করেনি। শিশুদের শিক্ষা আর তাদের উপযোগী সাহিত্য নিয়ে পরিকল্পনা ও সৃষ্টি, থিওরি ও প্র্যাকটিসে, রবীন্দ্রনাথ ছাড়া আর কেউ দুই পদার্থের সমন্বয় করেছেন বলে জানা নেই আমাদের দেশে। শিশু ও কিশোরদের সুখদুঃখটা কোথায়, কি ধরনের; অবকাশ-আনন্দ-বর্জিত শুষ্ক শৃংখলার চাপে তাদের মানসিক প্রসার কিভাবে সঙ্কুচিত ও ক্ষুন্ন হয়, তা তিনি নিজের অভিজ্ঞতায় জেনেছিলেন। ফলে ছেলেদের জন্য লেখা তাঁর সব রচনা নিখুঁত শিশু-সাহিত্য না হোক, তাঁর ভাষা তাঁর ছন্দ তাঁর কথার ছবি কল্পনাপ্রবণ ছোটদের মনকে চিরকালই দোলাবে। বয়স পার হলে, প্রৌঢ়ত্বে এসে পৌঁছুলে, বয়স্ক মন আরও দুলবে।

রবীন্দ্রনাথ যে মন ও দৃষ্টি নিয়ে শিশুদের কথা বুঝতে চাইলেন ও প্রকাশ করতে ব্যগ্র হলেন, সেটা তাঁর অভিজ্ঞতার সঞ্চয়। তাঁর শিশুকালের পূর্ববর্তী যুগে অর্থাৎ উনিশ শতকের প্রথম ভাগে শিশুপাঠ্য বই ছিল অনুবাদ-প্রধান ও নীতি-মূলক। স্কুল বুক সোসাইটির আমল থেকে বিদ্যাসাগরের আমল পর্যন্ত যে সব গ্রন্থ ও পত্রিকা প্রকাশিত হয়েছে, তার ধারাবাহিক সুন্দর ইতিবৃত্ত পাওয়া যাবে খগেন্দ্র মিত্রের বইয়ে। বাংলা সাহিত্যের তত্ত্বসন্ধানী পাঠকের কাছে এ বইখানি বিশেষ মূল্যবান্, কারণ অনেক যত্ন নিয়ে তথ্য সংগ্রহ করা হয়েছে এবং ঐতিহাসিক পদ্ধতিতে সে সব তথ্য বিন্যস্ত হয়েছে। বিংশ শতাব্দীর দ্বিতীয় দশক থেকে বর্তমান কাল পর্যন্ত শিশু-সাহিত্যের কারুকর্ম ও বিষয়-বস্তুর একটি সম্পূর্ণ আলোচনা এখনও অলিখিত রয়েছে। পারতেন প্রেমেন্দ্র মিত্র, যাঁর চোখ-কান মগজ ও প্রাণ সবচেয়ে উপযুক্ত এই কাজের জন্য। যাই হোক, উনিশ শতকে স্কুল বুক সোসাইটি ও শ্রীরামপুরের মিশনরীদের কাছে আমরা ঋণী। তাঁরা শিশু-সাহিত্য নিয়ে ব্যবসা করেননি। ইংরেজী শিক্ষার প্রথম প্রচলনের যুগে পাশ্চাত্য শিক্ষানীতি অনুসরণ করে তাঁরা যে সব বই প্রকাশ ও প্রচার করেন, তাদের মূল্য যাচাই করতে গেলে সে কালের সামাজিক ও ঐতিহাসিক পরিবেশ মনে রাখা উচিত। "নীতিকথায়" 'দুই কুকুড়া' কিংবা 'কয়েক নেকড়িয়া বাঘ' প্রভৃতি গল্পের যে ভাষা ও ভঙ্গী, তা আজকের দিনে ছেলেমেয়েরা পড়ে হেসেই খুন হবে, যেমন—

'দুই কুকুড়া কোন দ্রব্যের নিমিত্ত যুদ্ধ করিলে একটা জয়ী হইল আর একটা অন্য স্থানে পলাইয়া গেল। পরে যে জিনিয়াছিল সে এক বড় উচ্চ পালার উপরে বসিয়া আহ্লাদে পাখা ঝটকাইতে ও ডাকিতে ও অহঙ্কার করিতে লাগিল। ইতোমধ্যে এক কুকুর তাহাকে দেখিয়া ছোঁ মারিয়া লইল।

ইহার তাৎপর্য এই। আপন পরাক্রমের অহঙ্কার করিলে শীঘ্র লজ্জা পায়।' লজ্জা যে-ই পাক্, 'জিনিবার' আহ্লাদটা খুবই ন্যায্য!

কিংবা

'কয়েক নেকড়িয়া বাঘ এক গর্ত্তে গোচর্ম্ম দেখিয়া তাহা খাইতে মনস্থ করিল; কিন্তু ঐ গর্ত্ত জলে পূর্ণ ছিল।'

এ পর্যন্ত কোনও অসুবিধে নেই। কিন্তু তারপর যে ভাষা, তা যাদুঘরের কৌতুক-সামগ্রী, যথা—

'তাহাতে তাহারা ঐক্য হইয়া এই পরামর্শ করিল, আইস আমরা আগে সমস্ত জল পান করিয়া গর্ত্ত শুষ্ক করি, পরে চর্ম্ম লইয়া খাইব। ইহা স্থির করিয়া তাহারা উদর পূর্ণ হওন পর্য্যন্ত জল খাইল; কিন্তু অধিক জল পান করাতে সকলে পেট ফাটিয়া মরিয়া গেল, সুতরাং চামড়া খাইতে পারিল না।'

গল্পটির নৈতিক তাৎপর্য যাই হোক—এর ভাষা সংস্কৃতবহুল নয়। এতে যতি-চিহ্ন আছে, পড়ে মানে বুঝতে কোনও কষ্ট নেই। কিছু মজা আছে, আর আছে ঐ অকাট্য যুক্তি— 'পেট ফাটিয়া' মরিলে 'চামড়া খাইতে' জায়গার অভাব হয়!

যাই হোক, "বালকবন্ধু" পত্রিকাতেই বোধ হয় সত্যিকারের শিশু-সাহিত্যের জন্ম হয়। ঠিক আশী বছর আগে এটি পাক্ষিক থেকে মাসিকে পরিণত হয়ে বেশ কিছুকাল জীবিত ছিল। প্রকাশিত রচনাগুলির ভাষাও সেকালের পক্ষে অনেকটাই আধুনিক ছিল। ছবি থাকত, হাস্যকৌতুকের অভাব ছিল না আর বাংলাও ছিল সহজ এবং পরিচ্ছন্ন। অন্ততঃ

"অবোধ-বন্ধু"র চেয়ে "বালকবন্ধু"র আবেদন ও বৈশিষ্ট্য লক্ষ্য করবার মতো, যদিও "জীবন-স্মৃতি"তে দেখি ঐ পত্রিকায় কৃষ্ণকমল ভট্টাচার্য-কৃত পল-ভাজিনিয়ার তর্জমা পড়ে বালক রবীন্দ্রনাথ প্রচুর মনের খোরাক পেতেন। কিন্তু সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য প্রচেষ্টা হল "সখা" (পরে "সখা ও সাথী")। প্রমদাচরণ সেনের সম্পাদনায় প্রথম লেখা ছোটদের উপন্যাস এবং নানা বৈচিত্র্য নিয়ে এই পত্রিকাটি শুধুই ছোটদের চিত্তজয় করেনি, পরবর্তী কালের জন্য একটি আদর্শও রেখে যায়। কিশোর উপেন্দ্রকিশোর এ কাগজে লিখতেন এবং বোধহয়, "সন্দেশ" বার করবার সময় "সখা"র স্মৃতি তাঁর মনে যথেষ্ট উজ্জ্বল ছিল।

এর পর পনের কুড়ি বছরের মধ্যে শিশু-সাহিত্যের মান ক্রমশই উন্নত হয়ে ওঠে। ছাপায় ছবিতে ও রচনায়, উপন্যাস গল্প নিবন্ধ প্রভৃতি বিবিধ বৈচিত্র্য-সজ্জায় শিশু-সাহিত্য তার স্বকীয় চরিত্র ও উৎকর্ষ অর্জন করে। জ্ঞানদানন্দিনী দেবীর সম্পাদনায় ১৮৮৫ সালে বেরুল "বালক", যে কাগজে ছড়া কবিতা গল্প হাস্যকৌতুক, রবীন্দ্রনাথের হেঁয়ালী-নাটক এবং "রাজর্ষি" উপন্যাস আত্মপ্রকাশ করে। তারপর এল "সাথী" ১৮৯৩ সালে ভুবনমোহন রায়ের সম্পাদনায়। এ কাগজে ছোটদের লেখা প্রকাশ করা হত এবং শিশু-সাহিত্যের দিক্‌পাল যোগীন্দ্রনাথ সরকার ও উপেন্দ্রকিশোর লেখা দিতেন। উপেন্দ্রকিশোরের একটি সরস সচিত্র নাটিকা (বেচারাম ও কেনারাম) বেরিয়েছিল সপ্তম সংখ্যায়, এটি "সন্দেশের" নূতনতম পর্যায়ে অনায়াসে পুনর্মুদ্রণ করা যায়। এক বছর পরে "সাথী" যুক্ত হল "সখা"র সঙ্গে। তার পরই বেরুল "মুকুল" ১৮৯৫ সালে। এই পত্রিকায় লেখেননি এমন বিখ্যাত মনীষী লেখক কেউ নেই। শিবনাথ শাস্ত্রী মহাশয়ের উদ্যমে ও সম্পাদনায় "মুকুল" যে নাম ও স্মৃতি রেখে গেছে, তাতে কাগজখানিকে ল্যাণ্ডমার্ক বলে গণ্য করা চলে। উল্লেখযোগ্য খবরের মধ্যে বলতে হয়, *সুকুমার রায় আট বছর বয়সে 'নদী' নামে একটি কবিতা লেখেন "মুকুলে"। 'মুকুল' নামটি সত্যিই সার্থক ছিল এবং শিবনাথ শাস্ত্রী মহাশয় যে লিখেছিলেন—'মুকুল আসিয়াছে, পশ্চাতে ফুল ও ফল আসিতেছে। এই জন্যই মুকুল দেখিলেই সকলের আনন্দ; মুকুল দেখিলেই বোঝা যায়, এ বৎসর ফলটা কেমন হইবে...', তা নিতান্ত সত্য, শুধু প্রস্তাবনা বা প্রচার নয়। ফলটা যে ভালই হয়েছিল, তার শ্রেষ্ঠ প্রমাণ আঠার বছরের মধ্যেই পাওয়া গেল। প্রথমে "তোষিণী", তার পর "শিশু" এবং "সন্দেশ"। "সন্দেশ"ই নিঃসন্দেহে শ্রেষ্ঠ ফুল ও ফল। সুগন্ধে রসে ও স্বাদে শুধু ফুল ও ফল নয়, তার চেয়ে কিছু বেশি অর্থাৎ একাধারে ক্ষুধা ও খাদ্য—রুচিকর ও পুষ্টিকর। "সন্দেশে"র প্রথম পর্যায়—যথাক্রমে উপেন্দ্রকিশোর, সুকুমার রায় ও সুবিনয় রায়ের সম্পাদনায়—ছিল এক বিস্ময়কর পর্ব, অন্ততঃ আমাদের সমকালীন পাঠকদের কাছে। তারপর "মৌচাক" থেকে সুরু করে "রংমশাল", কত কাগজ ভালো মন্দ এল গেল। শুধু "মৌচাক" টিঁকে আছে। কিন্তু "সন্দেশে" প্রকাশিত লেখাগুলির বিষয়বস্তুর দিক থেকে সম্পূর্ণ নতুনত্ব না থাকলেও, এর ছাপা ছবি অর্থাৎ অঙ্গসজ্জা আর রায়চৌধুরী পরিবারের বিচিত্র রচনা আমাদের কাছে যথেষ্ট বিপ্লবী ঘটনা বলেই মনে হত। এবং এখনও পর্যন্ত সেই ধারণাই বলবৎ আছে।

বস্তুতঃ "সন্দেশে"র সঙ্গে আমাদের বয়সী পাঠকের যে চিত্ত-সংযোগ ঘটেছিল, তার রেশ আজও মোছেনি। কথাটার মধ্যে নসটালজিয়ার আভাস থাকলেও শুধু স্মৃতিবিলাস নয়। এত বিভিন্ন ধরনের লেখা ও ছবি, এত মজা ও শিক্ষার বস্তু, এতগুলি শক্তিশালী লেখক-সমাবেশ একসঙ্গে আর কোথাও পাইনি। "সন্দেশে"র সম্পাদক পঞ্চাশ পেরিয়ে যে

দৃষ্টিভঙ্গী ও উদ্যম নিয়ে কাজে নেমেছিলেন, তা অত্যাধুনিক কালেও তার আধুনিকত্ব হারায়নি। আমার মনে হয়, ১৯১২ থেকে ১৯২৫-২৬ সাল হ'ল শিশু-সাহিত্যের সুবর্ণ যুগ, যদি "সখা" ও "মুকুল"কে নব-জাগরণের অঙ্কুর বলে গণ্য করি। আমাদের শৈশবে ও বাল্যকালে পত্রিকা ও গ্রন্থ হাতের আঙুলে গোনা যেত। কিন্তু যেগুলি পেয়েছিলাম, তা যত্ন করে রাখার মতো সামগ্রী। ঠাকুমার ঝুলি, চারু ও হারু, টুনটুনির বই, গল্পের বই, আরও গল্প, হিন্দুস্থানী উপকথা। লেখকদের মধ্যে একদিকে দক্ষিণারঞ্জন মিত্র-মজুমদার, যোগীন্দ্রনাথ সরকার, শিবরতন মিত্র, কালিদাস রায়, হরিপ্রসন্ন দাশগুপ্ত অপর দিকে শান্তা ও সীতা দেবী এবং রায়-পরিবার।

বর্তমানে শিশু-সাহিত্যের ভাব ভাষা ও বিষয় নিয়ে অনেক আলোচনা হয়, পরীক্ষাও হয়। বই অগুনতি, ভালো মন্দ মাঝারি। ছড়া কবিতা রূপকথা উপকথা গল্প উপন্যাস ইতিহাস বিজ্ঞান প্রবন্ধ নিবন্ধ, কোনোটারই অভাব নেই। সক্ষম অক্ষম রচনায় অনুবাদে শিশু-সাহিত্য প্লাবিত। চোর-ডাকাত গোয়েন্দা-গুপ্তধন পাহাড়-জঙ্গল রোমাঞ্চ-রহস্যে আকাশ বাতাস ধূমাচ্ছন্ন। মনে হয়, শিশু ও কিশোররা কেন, আমরাই এত অপরিকল্পিত উদাসীন প্রাচুর্য-সৃষ্টিতে বিভ্রান্ত। ভূতের গল্প, অবিশ্বাস্য কাহিনী, ফ্যানটাসি ছোটদের হাতে দেওয়া যায় কিনা, এমন কি প্রচার-সাহিত্য কি ভাবে পরিবেশন করা চলতে পারে অথবা পারে না, তা নিয়েও তর্কের অন্ত নেই। শুনে হাঁপিয়ে উঠি আর ভাবি—মজন্তালী সরকারের কথা, সাত চোর আর পালোয়ানের কথা, রঘু ও বিশে ডাকাতের কথা, বেতাল পঞ্চবিংশতি ক্ষীরের পুতুল আর ভূতপতরীর কথা, দ্রিঘাংচু পাগলা দাশু আর হ য ব র ল! মনে পড়ে 'খোকার দপ্তরে'র সেই কবিতাটা—

হলধর তর্কতীর্থ বলে দর্পভরে,—
আমি ভিন্ন সব মূর্খ পৃথিবী ভিতরে।
বর্ণে বর্ণে কত অর্থ আমার কথায়,
দীর্ঘ টিকি অনর্থক ধরি নি মাথায়!

এখন মাথাটা সত্য না টিকিটা বেশি সত্য, তা নিয়ে মারামারি চলুক। ইতিমধ্যে কথার ও বর্ণের যা অর্থ, তা নিরর্থক হতে চলল।

এখন সব সাহিত্যিকই 'শিশু-সাহিত্যিক' হয়ে উঠেছেন বা উঠছেন। তাতে লাভ ছাড়া লোকসান নেই। তবে মান আর রুচিটা যেন বজায় থাকে, যার সার্থক পরিচয় পেয়েছিলাম সন্দেশের পৃষ্ঠায়। ১৯১৩ খৃষ্টাব্দের গ্রীষ্মের ছুটিতে একদা দাদা ধূর্জটিপ্রসাদ একখণ্ড কাগজ এনে দিয়েছিলেন—নামটা ছিল যথেষ্ট চিত্তাকর্ষক—"সন্দেশ" এবং ভিতরটা আরও বেশি মনোহর। ঐ কাগজখানির মাধ্যমে রায়-পরিবারের লেখক-গোষ্ঠীর যে প্রতিভা বিকশিত হয়, তা সবাই জানেন। উপেন্দ্রকিশোর, সুকুমার, সুবিনয়, সুবিমল রায়, সুখলতা, পুণ্যলতা, কুলদারঞ্জন, সকলেই লিখেছেন এবং নিজ নিজ ক্ষেত্রে অপূর্ব নৈপুণ্য দেখিয়েছেন। শুধু সারদারঞ্জন রায় মহাশয় কিছু লিখেছিলেন কিনা মনে পড়ে না। তিনি পরিবারের জ্যেষ্ঠ; কলেজী কর্তৃত্ব, সটীক শকুন্তলা ও রঘুবংশ, দাড়ি ও ক্রিকেট ব্যাট নিয়েই তাঁর দিন কেটেছে। নইলে সবাই লিখেছেন। প্রমদারঞ্জনের বন-জঙ্গল ও শিকারের কথা এই সেদিনও লোভনীয় লেগেছে। সত্যজিৎ রায়ের শিল্প-প্রতিভা তো সুপরিচিত আর লীলা মজুমদার? সুকুমার রায়ের পর ফ্যান্সি ও ফ্যান্টাসি রচনায় তিনি নিজের তৈরি পথ রচনা করে নিয়েছেন, আশ্চর্য ক্ষমতায়। কৌতুক ও ভাইট্যালিটিতে ভরপুর তাঁর লেখা। তদুপরি

তাঁর নিজস্ব ভাষা ও ভঙ্গী—খাঁটি টমবয়!

এ সব মিলিয়েই শিশু-সাহিত্য গড়ে উঠেছে। আরও উঠবে, যদি বই আর কাগজের প্রাকৃত সোঁদা গন্ধটা উড়িয়ে দিয়ে ব্যবসায়ী গন্ধটা বর্ণচোরার মতন আসর জাঁকিয়ে না বসে। শিশুদের নিজস্ব সৌরভই হল শিশু-সাহিত্যের বৈশিষ্ট্য ও সম্পদ। মিষ্টি-মিষ্টি চটকদার সিনথেটিক এসেন্স দু চার দিন বাজার গরম করে, কিন্তু থাকে না। সংগতি আর অসংগতির মধ্যে, সেন্স ও ননসেন্সের মধ্যে যে অদৃশ্য উজ্জ্বল সম্পর্ক-সূত্র আছে, সেই সূত্রটি ধরে যিনি বিনা বিজ্ঞাপনে, অনাড়ম্বর সুমিষ্ট পন্থায় আনাগোনা করতে পারেন, তাঁর হাতেই শিশু-সাহিত্যের চাবিকাঠি।*

বিমলাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়

সন্দেশ ॥ মাসিক পত্রিকা—সম্পাদক : সত্যজিৎ রায় ও সুভাষ মুখোপাধ্যায়

# সমালোচনা

Anabasis. *By* St.-John Perse. Translated *by* T. S. Eliot. Faber and Faber. London. 15*s*.

গত বছর স্যাঁ-ঝন প্যার্সের নোবেল পুরস্কারপ্রাপ্তিতে ফরাসী আকাদেমীর সদস্য এক সাহিত্য-সমালোচক কিছু ক্ষোভ প্রকাশ করেন। ফরাসী হিসেবে গর্ব ও আনন্দ যে তাঁর হয়নি তা নয়, এমন কি কবি সম্বন্ধে প্রশংসার কথাও তিনি বলেন, কিন্তু তা সত্ত্বেও ক্ষুব্ধ মনোভাবটা চাপা থাকেনি। ক্ষোভের কারণ, প্যার্সের কাব্য কার্তেজীয় ধারার বিরোধী। যুক্তি-বাদকে যিনি জাহান্নামে দিয়েছেন তাঁর আন্তর্জাতিক সম্মানলাভে সমালোচক বিচলিত না বোধ ক'রে পারেননি। অবশ্য কার্তেজীয় ধারার জন্যে এ খেদ যতই আন্তরিক হোক, সময়ের হিসেবে একে তামাদি ব'লেই ধ'রে নিতে হয়। বিগত ও বর্তমান শতকের ফ্রান্সে বিভিন্ন কাব্য-আন্দোলনের উৎসারের পর এবং কীর্তিমান ফরাসী কবিদের বিচিত্র কাব্য-সৃষ্টির পর এরকম খেদের আর অবকাশ আছে কি? দেকার্তের মতবাদের প্রভাবে যে চিন্তার শৃঙ্খলা, ধারণার সুনির্দিষ্টতা এবং প্রকাশের পরিচ্ছন্নতা ফরাসী সাহিত্যের কুল-লক্ষণ হ'য়ে দাঁড়িয়েছিল তার বিরুদ্ধে বিদ্রোহ আজকের নয়। 'স্য কি নে পা ক্ল্যার নে পা ফ্রাঁসে' (যা প্রাঞ্জল নয় তা ফরাসী নয়), এই অষ্টাদশ শতকী উক্তির মহিমা অনেক কাল আগেই ভূলুণ্ঠিত হয়েছে। তাকে এখন স্মরণ ক'রে ফরাসী মনকে একটি বিশেষ লক্ষণে চিহ্নিত করার চেষ্টা আর যাই হোক বাস্তব নয়।

উক্ত সমালোচকের ক্ষোভটা তাঁর নিজস্ব প্রতিক্রিয়া, কিন্তু স্যাঁ-ঝন প্যার্সের কাব্যধর্ম সম্বন্ধে তাঁর মন্তব্য যথার্থ। প্যার্সের বিচরণ যুক্তিবাদের পথে নয়। এ বিষয়ে তাঁর নিজের ঘোষণাই প্রবল ও দ্বিধাহীন। কবিতায় তিনি এক জায়গায় বলেছেন : "যুক্তিবাদী মানুষ যে-দৃষ্টি আঁকড়ে ছিল সে-দৃষ্টি ঘুলিয়ে যাক। যুক্তিতর্ক, তোমাকে আমি বিদায় দিলাম।......আমাদের মধ্যে কবির কাজ বাণীকে পরিষ্কার করা। তার কাছে উত্তর আসে হৃদয়ের আলোকোদ্ভাসে।" যে-কবি হৃদয়ের আলোয় বিশ্বাসী, যুক্তির পারম্পর্যে নয়, স্বভাবতই তাঁর কবিতা বুদ্ধিগ্রাহ্যতার ধার ধারে না। অর্থাৎ প্রচলিত বোধ্যতা তার নেই। প্যার্সের অন্যতম প্রধান গ্রন্থ *Anabase* তার নিদর্শন।

নাম থেকে Xenophon-এর বিখ্যাত গ্রন্থের সঙ্গে এর সম্পর্ক মনে আসে। কিন্তু সিরুসের অভিযানে গ্রীকদের অংশগ্রহণ এবং ইউফ্রাতিস পারের অঞ্চল থেকে গ্রীক উপকূল পর্যন্ত পশ্চাদপসরণের যে চমকপ্রদ বৃত্তান্ত Xenophon লিপিবদ্ধ করেছেন তা এই গদ্য-কাব্যের বিষয়বস্তু নয়। প্রকৃতপক্ষে কোনো বিশেষ কাহিনীই এতে নেই। কাহিনীর মতো যেটুকু আছে তার কোনো নির্দিষ্টতা নেই। ফলে এ কাব্য অনুধাবনে কাহিনী নিয়ে ব্যাপৃত হওয়া চলে না। লুসিয়্যাঁ ফাব্‌র্‌ গ্রন্থের দশটি অংশের প্রত্যেকটিকে বিশ্লেষণ ক'রে যে-সারমর্ম দিয়েছেন তার প্রযোজ্যতা সঙ্কীর্ণ। সব কিছুকে তার সঙ্গে মেলানো যায় না।

আসলে প্যার্সের কাব্যের প্রকৃতিই সরলীকরণের অন্তরায়। কোনো ঘটনাবিবরণ অথবা মনোবিবরণ তার বিষয় নয়। তা এক জাগতিক অবলোকন এবং সমন্বয়-অন্বেষার কাব্য, যার নাম কখনো হতে পারে Anabase, কখনো Exil, কখনো Amers, কখনো অন্য কিছু। এই অবলোকনে প্রতিভাত হয় সমস্ত স্থানকাল, সমস্ত মানুষ এবং সমন্বয়-ভাবনার অন্তর্গত হয় প্রাণী ও বস্তুপুঞ্জ। কবির কল্পনা ও মনন প্রতি মুহূর্তে বাস্তবকে রূপান্তরিত করে। কল্পনা, বাস্তব ও মনন, এই তিনের অবিচ্ছিন্ন মেলামেশায় প্যার্সের কাব্যের সমগ্রতা গড়া। তারা পরস্পর-অনুপ্রবিষ্ট। প্রতি পদে বাইরের জগৎ এবং অন্তরের জগতের পরস্পর-প্রতিফলন। স্বভাবতই এ কাব্যের বাক্যবিন্যাস বিশ্লেষণসাপেক্ষ নয় এবং অর্থও বিশ্লেষণনির্ভর নয়। আরম্ভ থেকে শেষ পর্যন্ত যেন এক কণ্ঠপ্রবাহ। থেমে থেমে বিভিন্ন শব্দ ও বাক্যের মানে করতে গেলে খেই হারিয়ে যায়, কিন্তু তার একটানা স্রোতে ভেসে পড়লে আমরা এক নতুন চেতনার কূলে উত্তীর্ণ হই। হয়তো কবি-কথিত হৃদয়ের আলোক সম্পাতেই এমন ঘটে। এ কাব্যের পদ্ধতি-প্রকরণও এই চারিত্র্য অনুযায়ী। একের পর এক চিত্রকল্প, ক্রমাগত বস্তুর নাম, বহু বিচিত্র অভিধার ব্যঞ্জনা ঘটনার ইঙ্গিত এবং শব্দের ধ্বনি। কিন্তু শূন্য বাগ্‌বৈদগ্ধ নয়। সমস্তর উপর ভর দিয়ে দাঁড়ায় এক বিশাল মূর্তি : মানুষের মূর্তি। তার কর্ম, তার স্বপ্ন, তার ভাগ্য সেখানে ধ্বনিত। তার অস্তিত্বে ও আকাঙ্ক্ষার উজ্জীবনে গ্রথিত প্রকৃতির প্রবল অভিব্যক্তি : সমুদ্র, মরুপ্রান্তর, বিপুল হাওয়া, বৃষ্টিধারা, তুষারবর্ষণ। বস্তুপুঞ্জের পৃথিবীতে, কর্মের পৃথিবীতে মানুষের নতুন প্রতিষ্ঠার সন্ধানে প্যার্সের কবি-দৃষ্টি একাগ্র। এ সন্ধানের মূলসূত্র তিনি আত্মগতভাবে তাঁর শেষ গ্রন্থ *Chronique*-এ উল্লেখ করেছেন। নিজের প্রাচীন বয়সকে (Grand âge) সম্বোধন ক'রে বলেছেন মানুষের হৃদয়ের পরিমাপ নিতে। কিন্তু যৌবনের কম্পিত প্রশ্নে এই একই কথার উচ্চারণ আমরা *Anabase*-এ শুনি : Tant de douceur au coeur de l'homme, se peut-il qu'elle faille à trouver sa mesure? (এত মাধুর্য মানুষের হৃদয়ে, তা কি তার পরিমাপ খুঁজে পাবে না?)।

*Anabase*-এ যে চলার ছবি আমরা দেখি তা দশ হাজার গ্রীকের অথবা বিশেষ কোনো লোকদলের নয়, সাধারণভাবে মানুষের। গ্রন্থের বিষয়কে কাহিনীর মতো ক'রে ভাবলে মোটামুটি এই রকম ভাবা যায় : কোনো বিজয়ী মধ্য এশিয়া পর্যন্ত অভিযান করলেন, তাঁর যাত্রাপথে প্রতিপক্ষকে পরাজিত করলেন, শহর স্থাপন করলেন, প্রচলিত প্রথা উল্টেপাল্টে দিলেন এবং কর্মাবসানে সন্তোষ ও বিষাদের মধ্যে শুনতে লাগলেন সমুদ্রযাত্রার আহ্বান। কিন্তু এ কাহিনী কোনো বিশেষ কাল ও ঘটনার চিত্রণে আবদ্ধ নয়, এবং এশিয়ার প্রান্তরভূমি যেন মনে হয় পৃথিবীর পটভূমিতে বিস্তৃত। কোনো সীমাবদ্ধতাই এ কাহিনীর নেই। সমস্তটা নিছক বাইরের ঘটনা নয়, কারণ ভাবনা তাতে আদ্যন্ত অন্তর্লীন। কবির নিজের জীবনও এর সঙ্গে যুক্ত। সরকারী দৌত্যবিভাগে চাকরী উপলক্ষে তাঁর মধ্য এশিয়া ভ্রমণের অভিজ্ঞতার পর *Anabase*-এর রচনা। মনে হয়, গ্রন্থের উল্লিখিত প্রান্তর যেন ব্যক্তি হিসেবে তাঁরই চিত্ত ও অনুভবের প্রান্তর যেখানে ব্যক্তির নিজের সত্তা মুক্তিলাভ করে, তার কালকে ছাড়িয়ে অন্যান্য কালকে খুঁজে পায়। কবির এই একান্ত চেতনা সর্বদা মানুষের পৃথিবীর চলমানতায় স্পন্দিত। এ চলমানতার কথা তাঁরই আশ্চর্য ভাষায় শুনি :

Et la terre en ses graines/ailées, comme un poète en ses propos, voyage . . . .

শেষ পর্বে আবার শুনি :

par dessus les actions des/hommes sur la terre, beaucoup/ de signes en voyage, beaucoup/de graines en voyage, et sous/ l'azyme du beau temps, dans un/grand souffle de la terre, toute/ la plume des moissons! . . . .

কিন্তু এ শ্রেণীর কাব্য জনপ্রিয়তার হাটে বিকোয় না এবং কার্তেজীয় ধারায় বিন্যস্ত নয় ব'লে 'ঐতিহ্য'-প্রেমিক সমালোচকরা তার প্রতি বাম। ইংরেজ কবি এলিয়টের কৃতিত্ব এই যে তিনি এ কাব্যের উৎকর্ষ প্রথম দর্শনেই হৃদয়ঙ্গম করেছিলেন এবং ইংরিজী পাঠকের কাছে তাকে উপস্থিত করেছিলেন। *Anabase* তিনি অনুবাদ করেন ৩১ বছর আগে। তখন প্যার্সের প্রতিষ্ঠা নগণ্য, এমনকি ফ্রান্সেও তিনি বিশেষ পরিচিত ন'ন। তার ১৯ বছর বাদে অনুবাদের দ্বিতীয় সংস্করণ বেরোয়। তৃতীয় অর্থাৎ আলোচ্য সংস্করণটি ফেবার এণ্ড ফেবার কর্তৃক প্রকাশিত হয় ১৯৫৯ সালে। তখনও প্যার্স নোবেল পুরস্কার পাননি। সুতরাং ধরে নেওয়া যায়, এ প্রকাশনার পেছনে প্রেরণাটা ব্যবসাবুদ্ধির নয়, সাহিত্যবোধের।

ফরাসী ভাষাভিজ্ঞ কবি এলিয়টের অনুবাদ যে সব দিক থেকে নির্ভরযোগ্য হবে তা ধ'রে নেওয়া যায়। তবু তিনি ঝুঁকি নেননি। প্যার্সের বাক্যগঠন, বাক্যের অন্তরালবর্তী ছন্দ এবং শব্দব্যবহার সম্পূর্ণ তাঁর নিজস্ব, অন্য ভাষায় তার যথাযথ প্রকাশ অসম্ভব। এলিয়ট সেই জন্যে মূলকে অনুবাদের পাশে পাশে রেখেছেন অর্থাৎ মূলের প্রতি পাঠকের দৃষ্টি আকৃষ্ট রেখেছেন। অনুবাদ তিনি যথাসম্ভব মূলানুগ করতে চেয়েছেন। প্রথম সংস্করণে খানিকটা স্বাধীনতা নিয়েছিলেন। দ্বিতীয় সংস্করণে তা সম্বরণ করেন এবং তৃতীয় সংস্করণে স্বয়ং কবির অদলবদল মেনে নিয়ে অনুবাদ আরও আক্ষরিক করেছেন। তবু কোনো কোনো জায়গায় অনুবাদ সম্বন্ধে মনে কিছু প্রশ্ন জাগে। সসঙ্কোচে সেটা বলি। সঙ্কোচের কারণ, প্যার্স নিজে অনুবাদ দেখে দিয়েছেন। কোনো অনুবাদকে যখন মূল লেখক অনুমোদন করেন তখন তা একটা প্রামাণ্যতা পায়। যেন, যা হয়েছে সেটাই ঠিক। তবুও কয়েকটা বিষয়ের উল্লেখ করা কর্তব্য মনে করি।

যে কোনো কবির রচনায় শব্দ প্রয়োগের ভঙ্গী এবং ধ্বনির একটা অনন্য ভূমিকা আছে, প্যার্সের রচনায় তো বিশেষ ক'রে। অনুবাদে কোথাও কোথাও তা অবহেলিত মনে হল। প্রথম অংশে routes nocturnes এবং routes splendides দু'রকমভাবে ভেঙে অনুবাদ করা হয়েছে। প্রথম ক্ষেত্রে routes কথাটাই অনুবাদে রাখা হয়নি। শব্দটিকে বজায় রেখে দুটি বিশেষণ বা বিশেষণাত্মক বাক্যাংশ ব্যবহার করা কি সম্ভব ছিল না? দুটি পৃথক বিশেষণ দিয়ে একই শব্দের পুনরাবৃত্তির নিশ্চয়ই একটা মূল্য আছে। এ রকম পুনরাবৃত্তি অন্যত্রও বজায় রাখা হয়নি। যেমন, ষষ্ঠ অংশে se vêtaient d'un souffle, ces tissus এবং apaiseront d'un souffle, ces tissus। অনুবাদে দ্বিতীয়টি আক্ষরিক, কিন্তু প্রথমটি নয়। কেন? সপ্তম অংশে Levez un peuple de miroirs অনুবাদে Levy a wilderness of mirrors হওয়ার কারণ বুঝিনি, যখন ওরই অব্যবহিত পরের বাক্যাংশ প্রস্তরের উল্লেখে Levez শব্দটি একাধিকবার Raise-এ

রূপান্তরিত করা হয়েছে। এবং কেন wilderness? কেন multitude জাতীয় কোনো শব্দ নয়? নবম অংশে félicité শব্দটি এক স্তবকে felicity এবং অন্য স্তবকে bounty ব'লে অনূদিত, অথচ পুনরাবৃত্তি দিয়ে ভাবমণ্ডল রচনা মূলে স্পষ্ট। দু' এক জায়গায় অনুবাদের যাথার্থ্যও প্রশ্নাতীত নয়। যেমন, প্রথম অংশে আছে : et, portant au delà les semences du temps, l'éclat d'un siècle . . . . এর অনুবাদে পাই : and there beyond the seeds of time, the splendour of an age . . . ., কিন্তু ফরাসী থেকে মনে হয় প্রথম ভাগটির মানে অন্যরকম।

যাই হোক, এসব সামান্য প্রশ্ন। কারণ কবিতার অনুবাদকর্ম সহজ সরল ব্যাপার নয়। অনুবাদক মূল কবিতাকে যেভাবে উপলব্ধি করেন, প্রধানত তার দ্বারাই রূপান্তর নির্ণীত হয়। সুতরাং যে কোনো অনুবাদের ক্ষেত্রে মূল কবিতার পাঠকের পক্ষে সর্বত্র সায় না দিতে পারা খুবই সম্ভব। কারণ সেও তার মতো ক'রে কবিতাকে উপলব্ধি করে। *Anabase*-এর বেলায় ইংরিজী পাঠকদের এইটাই সৌভাগ্য যে, টি. এস. এলিয়ট তার অনুবাদে হাত দেন। ফলে মূলের বৈশিষ্ট্য বহুলাংশে অক্ষুণ্ণ থাকতে পেরেছে।

এ গ্রন্থে এলিয়ট নিজের মুখবন্ধ ছাড়া অন্য ভাষা থেকেও কিছু আলোচনা সন্নিবিষ্ট করেছেন। জার্মানীর হফমানস্টাল, ইতালীর উনগারেত্তি এবং ফ্রান্সের ভালেরি লারবো ও ল্যুসিয়াঁ ফাব্‌র্‌ *Anabase* সম্বন্ধে যে ভূমিকা বা পরিচয় লেখেন তার অনুবাদ। এই সব প্রখ্যাত কবি এবং লেখকের রচনা প'ড়ে প্যার্সের কাব্য সম্বন্ধে পাঠকদের কৌতূহল নিশ্চয়ই বাড়বে।

অরুণ মিত্র

**বিদ্রোহী ডিরোজিও**—বিনয় ঘোষ। বাক্‌ সাহিত্য। মূল্য পাঁচ টাকা।

জন্ম : ১৮০৯ খৃষ্টাব্দ। ধর্মতলা অ্যাকাডেমী : ১৮১৫-২৩ খৃষ্টাব্দ। হিন্দুকলেজে নিয়োগ : ১৮২৬ খৃষ্টাব্দ। হিন্দুকলেজ থেকে বহিষ্কার : ১৮৩১ খৃষ্টাব্দ। মৃত্যু : ১৮৩১ খৃষ্টাব্দ (পূর্ববর্তী ঘটনার আট মাস পরে)।

হেনরি লুই ভিভিয়ান ডিরোজিওর জীবনপঞ্জী সংক্ষেপে রচনা করা সম্ভব হলেও তাঁর জীবন ছিল কর্মবহুল। সাংবাদিক, শিক্ষক, সমাজসংস্কারক এবং কবি এই চতুর্বিধরূপে তাঁর বাইশ বছরের জীবনে তিনি বিখ্যাত হতে পেরেছিলেন। বিশেষত হিন্দুকলেজ (অধুনা প্রেসিডেন্সি কলেজ) থেকে তাঁর বহিষ্কার উপলক্ষ্য ক'রে সেই সময় বাংলাদেশে বহু বাদানুবাদ এবং সামাজিক কোলাহলের সূত্রপাত হয়। ডিরোজিওর অনেক বাঙালি শিষ্য ছিলেন, দুঃখের বিষয় তাঁর জীবনসম্পর্কে তথ্যপূর্ণ এবং নির্ভরযোগ্য কোনো রচনা তাঁরা রেখে যান নি। এমনকি ডিরোজিওর স্মৃতিরক্ষার ব্যাপারে তাঁরা এমনই নিরুদ্যম ছিলেন যে ১৮৩২ সালে যে স্মৃতিসভায় ডিরোজিওর বন্ধু এবং শিষ্যরা তাঁর স্মৃতিরক্ষা-কল্পে নশো টাকা চাঁদা তোলেন সেটি কে বা কারা তছরূপ করে ফেলেন। ফলে পার্ক স্ট্রীট সমাধিক্ষেত্রে ডিরোজিওর সমাধিস্থানটি আজও অচিহ্নিত অবস্থায় পড়ে আছে।

অতএব ডিরোজিওর মৃত্যুর একশো তিরিশ বছর পরে যে জীবনীকার তাঁর জীবনী-

রচনায় হাত দেবেন তাঁর কাজ কঠিন। ১৮৮৪ সালে ইংরিজিতে প্রকাশিত Thomas Edwards-এর একটি জীবনী এবং বিভিন্ন পত্রিকায় বিক্ষিপ্ত কয়েকটি রচনা ছাড়া তাঁর জীবনীর উপাদান বেশি নেই। হিন্দুকলেজ থেকে ডিরোজিও বিতাড়ণের বিশদ বিবরণ পাওয়া গেলেও তিনি সেখানে ঠিক কী বিষয় পড়াতেন, দর্শন ছাড়া অন্য বিষয়ের কীরূপ আলোচনা করতেন তার কোনো ধারণা পাওয়া কঠিন। ১৮২৬ সালে হিন্দুকলেজে নিয়োগের পরবর্তী পাঁচ বছর ডিরোজিওর জনপ্রিয়তার আভাস অনেক জায়গায় পাওয়া গেলেও সে সব উল্লেখ থেকে ডিরোজিওর শিক্ষাপদ্ধতি সম্পর্কে একটা ধারণা হওয়া সম্ভব, কিন্তু তাঁর শিক্ষার বিষয়বস্তু সম্পর্কে অজ্ঞতা থেকেই যায়।

শ্রীযুক্ত বিনয় ঘোষের জীবনীতে হিন্দুকলেজে শিক্ষকতা এবং হিন্দুকলেজ থেকে বহিষ্কারকেই ডিরোজিওর জীবনের সর্বপ্রধান ঘটনা হিশেবে দেখানো হয়েছে। মনে হয় সেই ঘটনার স্বরূপ বিচার অপ্রাসঙ্গিক হবে না। এবং এই বিচারে হিন্দুকলেজে ডিরোজিওর শিক্ষাপ্রণালীর পর্যালোচনা যতটা প্রাসঙ্গিক, তাঁর শিক্ষার বিষয়বস্তু এবং সেই শিক্ষার প্রত্যক্ষ ফল ততটাই বিবেচনার যোগ্য। দুঃখের বিষয় শ্রীযুক্ত ঘোষের গ্রন্থে পরের দুটি বিষয়ে আলোচনা হয় অপূর্ণাঙ্গ, নয়তো পক্ষপাতদুষ্ট।

১৮২৬ সালে এখনকার মতো বিদ্যার বিভাগ ঘটেনি; একই শিক্ষক একাধিক বিষয়ে অধ্যাপনা করতেন। যেমন ডিরোজিও দর্শন ইতিহাস সাহিত্য ত্রিবিধ বিদ্যায় পারদর্শী ছিলেন। কিন্তু বিদ্যালয়ের উপযুক্ত শিক্ষা এবং সমাজসংস্কারের প্রত্যক্ষ প্রেরণাদানের মধ্যে কোনো একটা পার্থক্য সম্ভবত আছে। চিন্তাসংস্কারক শিক্ষক এবং সমাজনেতা উভয়েই হতে পারেন, কিন্তু তাঁদের পদ্ধতি ভিন্ন, এবং তার ফলও, অন্তত প্রত্যক্ষ ফল, ভিন্ন। এই পার্থক্য সম্পর্কে প্রত্যেক শিক্ষকের অবহিত হওয়া কর্তব্য, বিশেষত তাঁর ছাত্ররা যদি সদ্যোযুবা হন। (ডিরোজিওর প্রিয় ছাত্র কৃষ্ণমোহন বন্দ্যোপাধ্যায়ের বয়স, ১৮৩১ সালে, ডিরোজিওর হিন্দুকলেজ ত্যাগের অব্যবহিত পরে, ১৮ বছর; দক্ষিণাচরণ মুখোপাধ্যায়ের বয়স ১৭ বছর।) ডিরোজিও ক্লাশঘরে কী পড়াতেন তার আভাস আমরা পাই, কিন্তু তাঁর পাঠ্যক্রম, বক্তৃতামালার বিষয়বস্তু এবং ইতিহাস ও সাহিত্যসম্পর্কে তাঁর বক্তব্যের কোনো খবর পাওয়া যায় না। এক্ষেত্রে তাঁর শিক্ষার ফল ছাত্রদের ওপর কী ফলেছিল সেটা বিচার করা দরকার।

নব্যযুবকদের স্বাধীন চিন্তাশক্তির চর্চা এবং উৎকর্ষতা নিশ্চয়ই ডিরোজিওর শিক্ষার প্রধান সুফল। কিন্তু চিন্তাশক্তির উন্মেষে সাহায্য করার সময় গুরুর কর্তব্য সংযমের শিক্ষা ছাত্রদের দেয়া, বিশেষত যখন শিক্ষক ও শিষ্য সমাজের প্রচলিত সংস্কারাদি পর্যালোচনা করতে উদ্যত। বিদ্রোহের চিন্তা তরুণদের কাছে আকর্ষণীয়, এবং সেই জন্যই গুরুর কর্তব্য সমাজের বিবর্তনে প্রথা এবং পরিবর্তনের সম্পর্ক সুষ্ঠুভাবে ছাত্রদের বুঝিয়ে বলা। মনে হয় ডিরোজিওর শিক্ষাপদ্ধতিতে এবং ইংরিজি রচনায় এই সংযম এবং সুচিন্তার অভাব ছিল। ডিরোজিওর সুযোগ্য ছাত্র কৃষ্ণমোহন বন্দ্যোপাধ্যায়ের বন্ধুবর্গ যে কাজ করেছিলেন তাকে ডিরোজিওর শিক্ষার প্রত্যক্ষ ফল না বললেও তার দায়িত্ব থেকে ডিরোজিওকে মুক্তি দেয়া যায় না। আমি শ্রীযুক্ত ঘোষের বই থেকে ঘটনাটি উদ্ধৃত করছি :

> কৃষ্ণমোহনের পৈতৃক বাড়ি ছিল মধ্যকলকাতায় গুরুপ্রসাদ চৌধুরী লেনে। তাঁর বাড়ির উত্তরে ভৈরবচন্দ্র ও শম্ভুচন্দ্র চক্রবর্তী নামে দু'জন নিষ্ঠাবান ব্রাহ্মণ বাস করতেন। ২৩ আগস্ট ১৮৩১। কৃষ্ণমোহন কোন কাজে সেদিন বাইরে

বেরিয়েছিলেন। তাঁর অনুপস্থিতিকালে বন্ধুবান্ধবরা দল বেঁধে তাঁর বাড়িতে এসে বৈঠকখানায় বসে হিন্দুদের গোঁড়ামি ও কুসংস্কারের বিরুদ্ধে গরম গরম কথাবার্তা বলতে বলতে খুব উত্তেজিত ও উল্লসিত হয়ে ওঠেন। সেই উত্তেজনার বশে মেছুয়াবাজারের এক মুসলমানের দোকান থেকে রুটি ও গোমাংস নিয়ে এসে বাড়িতেই ভক্ষণ করতে আরম্ভ করেন। ব্যাপারটা তাতেই শেষ হয় না। ভক্ষণান্তে গোমাংসের হাড়গুলি উল্লাসধ্বনি দিতে দিতে পাশের চক্রবর্তীদের বাড়ির ভিতরে নিক্ষেপ করা হয়। গো-হাড় গো-হাড় ধ্বনি শুনে চক্রবর্তীরা হন্তদন্ত হয়ে বেরিয়ে আসেন এবং ছেলেদের কীর্তি দেখে স্বভাবতই ক্ষিপ্ত হয়ে ওঠেন। বালখিল্যদের এই ঔদ্ধত্য তাঁদের অসহ্য মনে হয়। ব্রাহ্মণপ্রধান পাড়ায় দারুণ উত্তেজনার সৃষ্টি হয়। ক্রোধোন্মত্ত প্রতিবেশীরা কৃষ্ণমোহনের বন্ধুদের প্রহার করতে উদ্যত হন। অজস্র ধারায় অশ্রাব্য কটুবাক্য ও অভিসম্পাত তরুণদের উপর বর্ষিত হতে থাকে। প্রহারের ভয়ে তাঁরা বাড়ি ছেড়ে দৌড় দেন।

শ্রীযুক্ত ঘোষ ডিরোজিওর রচনার কিছু কিছু নমুনা উদ্ধৃত করেছেন। একথা বলতে পারলে আমি খুশি হতুম যে এইসব রচনায় শিক্ষকসুলভ বিচক্ষণতা এবং স্থৈর্যের পরিচয় আছে। হিন্দুকলেজের অধ্যক্ষরা ছাত্রদের সভাসমিতিতে যোগদান করা নিষেধ করে যে আদেশ জারি করেছিলেন তার প্রতিবাদে *India Gazette* যে সম্পাদকীয় প্রবন্ধ প্রকাশ করেন অনেকে মনে করেন (শ্রীযুক্ত ঘোষও করেন) তার রচয়িতা ডিরোজিও। সেই রচনার কিছু অংশ :

> We regret much to see the names of such men as David Hare and Rassomoy Dutt attached to a document which presents an example of presumptuous, tyrannical and absurd intermeddling with the right of private judgment on political and religious questions. The interference is presumptuous for the Managers as Managers have no right to right whatever to dictate to the students of the Institution, how they shall dispose of their time outside College. It is tyrannical for although they have not the right, they have the power, if they will bear the consequences to inflict their serious displeasure on the disobedient. It is absurd and ridiculous, for if the students knew their rights and had the spirit to claim them, the Managers would not venture to enforce their own order, and it would fall to the ground an abortion of intolerance.

এই সঙ্গে ডিরোজিওর ছাত্র কৃষ্ণমোহন বন্দ্যোপাধ্যায়ের ইংরিজি রচনা তুলনা করলে শিক্ষক ও শিষ্যের এক বিষয়ে মিল সহজেই চোখে পড়বে :

> The rage of persecution is still vehement. The bigots are up with their thunders of fulmination. The heat of the

*Gurum Shabha** is violent, and they know not what they are doing. Ex-communication is the cry of the fanatic. We hope perseverence will be the liberal's answer. The *Gurum Shabha* is high; let it ascend to the boiling point. The orthodox are in a rage; let them burst forth into a flame. Let the liberal's voice be like that of the Roman, a Roman knows not only to act but to suffer. Blown be the trumpet of excommunication from house to house. Be same hundreds cast out of society; they will form a party, an object devoutly to be wished by us.

—*The Enquirer, July 1831*

বস্তুত শ্রীযুক্ত ঘোষের রচিত "বিদ্রোহী ডিরোজিও" পড়ে যে কথাটা আমার বহুবার মনে হয়েছে তা হল এই যে হিন্দুকলেজের এই শিক্ষকটির চরিত্রে সংযমের বিশেষ অভাব ছিল। যিনি খবরের কাগজের আপিশ থেকে ক্লাসঘরে যান এবং ক্লাসঘর থেকে সেই আপিশে ফেরেন তাঁর পক্ষে ক্লাসঘরে কতটা মিতভাষণ এবং নিরপেক্ষ দৃষ্টির পরিচয় দেয়া সম্ভব জানি না। তবে মনে হয় সংবাদপত্রের সহসম্পাদক এবং শিক্ষক একই ব্যক্তি হলে তিনি শিক্ষকতা এবং সমাজসংস্কারের প্রেরণাদানের পার্থক্য সম্পর্কে বিশেষ অবহিত হবেন না। কথাটা একটু নিষ্ঠুর শোনাবে, কিন্তু আজ যদি ডিরোজিওর ১৮২৬-৩০ সালের বক্তৃতামালার ফল কলেজের ছাত্রদের মধ্যে অনুরূপ প্রভাব বিস্তার করত তাহলে হিন্দু অহিন্দু যে কোনো কলেজ থেকেই তাঁর পদচ্যুতি ঘটত।

বিনয়বাবুর বইটি পড়ে মনে হয় তাঁর আলোচ্য চরিত্রের ভাবোচ্ছ্বাস এবং অসংযম তাঁকে কিছুটা সংক্রামিত করেছে, এবং তিনিও তাঁর আদর্শপুরুষের মতো শিক্ষক এবং চিন্তানায়কের যথাযথ কর্তব্য সম্পর্কে অবহিত নন। তাঁর রচনা পড়ে মনে হতে পারে যে সমাজ এবং ঘটনাপ্রবাহ দুষ্টনিয়তির মতো এই প্রতিভাবান যুবকটিকে তাড়না করেছে, এবং তার জন্য পরবর্তীকালের সমাজের কাছে তাঁর প্রাপ্য অবিসংবাদিত পূজা। স্বাধীন চিন্তা এবং প্রচলিত সংস্কারের ইতিহাসে ডিরোজিওর একটি বিশিষ্ট ভূমিকা ছিল, কিন্তু আমার মনে হয় সেই ভূমিকায় ডিরোজিওর হিন্দুকলেজ থেকে বহিষ্কার ক্ষুদ্র একটি অনুচ্ছেদমাত্র। লোকশিক্ষা এবং চিন্তাসংস্কারের অনেকগুলি পথ আছে, কোনো সাংবাদিক যদি সংবাদপত্র ছাড়া অন্যান্য পথগুলিও ব্যবহার করতে চান তাহলে সেগুলি থেকে তিনি বিতাড়িত হতে পারেন। ব্যক্তিগতভাবে সেটা দুঃখের হতে পারে, কিন্তু অবিচার তাতে কিছু আছে বলে মনে হয় না।

এই প্রসঙ্গে শ্রীযুক্ত ঘোষের জীবনী রচনায় এবং শিক্ষা সম্পর্কে মনোভঙ্গী সম্পর্কে কিছু বলা দরকার। "বিদ্রোহী ডিরোজিও"-র উৎসর্গপত্রে পরমশ্রদ্ধাস্পদ শ্রীযুক্ত পঞ্চানন চক্রবর্তী মহাশয়ের (শ্রীযুক্ত ঘোষের শিক্ষক) নামের ওপরে, আশা করি তাঁকে উদ্দেশ্য করে নয়, আনাতোল ফ্রাঁসের যে রচনাটি তিনি নিক্ষেপ করেছেন সেটি মারাত্মক :

Let our teaching be full of ideas. Hitherto it has been stuffed

* গুড়ুম সভা

only with facts.

শিক্ষকরা যদি তথ্য বাদ দিয়ে শুধু ধারণাই প্রচার করতে পারতেন তাহলে তাঁদের কাজ খুব সুখের হত সন্দেহ নেই, এবং ধারণা বা মতবাদ প্রচারের গরিমায় শুধুমাত্র পেট ভাতায় এই কাজ করতে কিছু উৎসাহী ব্যক্তি সানন্দে রাজি হতেন। দুর্ভাগ্যবশত শিক্ষকতায় এতটা 'গ্ল্যামার' অধিকাংশ শিক্ষকই খুঁজে পাবেন না। ডিরোজিওর ছাত্রদের মতো এখনকার কলেজের ছাত্ররাও প্রায়যুবা অথবা সদ্যোযুবা। তথ্যের ভিত্তি পরিশ্রমসহকারে সুদৃঢ় না করে মতবাদ নিয়ে আলোচনা করার ফল তাদের ওপর মারাত্মক হতে পারে। স্বয়ং ডিরোজিও-ও মুখে তথ্যপ্রধান শিক্ষার প্রয়োজনীয়তা অস্বীকার করেননি। উইলসন সাহেবের প্রশ্নের উত্তরে ডিরোজিও স্পষ্ট জানিয়েছেন যে দর্শন অধ্যাপনাকালে ছাত্রদের তিনি উভয়পক্ষের যুক্তি স্পষ্ট করে বুঝিয়ে বলেছেন, মতপ্রচারের চেষ্টা করেননি। প্রকৃতপক্ষে ফ্রাঁসের উক্তিটি শিক্ষাসম্পর্কে রোমান্টিক ধারণার পরিচায়ক। অশিক্ষকরা প্রায়ই শিক্ষাপদ্ধতি-সম্পর্কে শিক্ষকদের জ্ঞানদান করতে ভালোবাসেন; সেরকম জ্ঞানের একটি ইস্কুল খুললে তার দরজায় ফ্রাঁসের উক্তিটি লিখে রাখা যেতে পারে; একটি শিক্ষকের জীবনীর উৎসর্গপত্রে, অন্য এক শিক্ষকের নামের ওপরে এধরনের উক্তি হাস্যকর।

বস্তুত শিক্ষার প্রণালী এবং শিক্ষকের কর্তব্য সম্পর্কে এরকম ধারণা বিনয়বাবুর জীবনীরচনাকে এতদূর প্রভাবিত করেছে যে আলোচ্য গ্রন্থটিতে শিক্ষকের জীবনকে রঙ্গ-মঞ্চের নাটকের সঙ্গে তিনি পুনঃ পুনঃ তুলনা করেছেন। তাঁর কয়েকটি পরিচ্ছেদের নাম সংগ্রাম, ঝড়, উল্কাপাত; জীবননাট্যের অকস্মাৎ যবনিকা, ঘটনাচক্রের সবচেয়ে বড় ট্র্যাজিক নায়ক, একাংকজীবননাট্যের শেষদৃশ্যের পর্দা ইত্যাদি কথা হামেশাই পাঠককে মনে করিয়ে দেয় যে লেখকের ঘোষিত উদ্দেশ্য জীবনীরচনা হলেও, অবৈধপ্রণয় নাটকের সঙ্গে।

হয়ত এইজন্যই ভাষাব্যবহারে লেখক একাধিকক্ষেত্রে আবেগপ্রবণতার পরিচয় দিয়েছেন। "বিদ্রোহী ডিরোজিও" সম্পর্কে আমি এখনো স্থির করে উঠতে পারিনি যে বইটি কিশোরদের উপযোগী করে লেখা না বয়স্কপাঠ্য। আশা করি কিশোরদের জন্য নয়, কেননা বাংলারচনার যেসব নিদর্শন তারা এতে পাবে তা তাদের পক্ষে বিশেষ শুভ হবে বলে মনে হয় না :

> ১. আজকের বিশশতকের বহুমুখী অগ্রগামী সমাজে প্রবীণ-নবীনের নীতিবিরোধের ফলে উনিশ-শতকী প্রচণ্ড আবর্ত সৃষ্টি হওয়া বোধ হয় আর সম্ভব নয়। কারণ সতত-সচল সমাজের বুকে আজকে জেগেছে ঝঞ্ঝামদমত্ত বলাকার অস্থিরতা, অনবরুদ্ধ বেগের আবেগ। তার পথচলার মন্ত্র হয়েছে 'হেথা নয়, অন্য কোথা, অন্য কোনখানে'। স্থাবর-জঙ্গমের বৈপরীত্য নব-বিজ্ঞানের যুগে আজ দ্রুতবিলীয়মান। (পৃষ্ঠা ২)
>
> ২. ধর্মতলার স্কুলে ডিরোজিও যখন যুক্তিবাদী গুরু ড্রামণ্ডের কাছ থেকে নব্য যুগাদর্শে দীক্ষাগ্রহণ করছিলেন নিয়মিত শিক্ষার সঙ্গে, বাইরে তখন রামমোহনের সঙ্গে প্রাচীন পণ্ডিতদের শাস্ত্রীয় শস্ত্রের ঝন্ঝনানি শোনা যাচ্ছিল। (পৃষ্ঠা ৩৩)
>
> ৩. টাকার জ্বলন্ত চুল্লীতে যদিও তখন সামন্তযুগীয় জাতিকুলগত মর্যাদার মানদণ্ড ক্রমেই ভস্মীভূত হয়ে যাচ্ছিল, তা হলেও প্রাচীন প্রথার প্রতাপ সহজে যাবার নয় বলে নতুন নগরে তা লোপ পায়নি। (পৃষ্ঠা ৩৭)

৪. পাণ্ডিত্যের ভারের চেয়ে ডিরোজিওর প্রতিভার দীপ্তি ছিল বেশি, তাই বিদ্যা যেটুকু তাঁর ছিল তা প্রতিভার মন্ত্রস্পর্শে জ্বলে উঠত চকমকির মতন। ছাত্ররা যারা তাঁর সান্নিধ্যে আসত তারা কেবল বিদ্যার হিমশীতল পাথুরে চাপ সহ্য করত না, প্রতিভা-স্ফুলিঙ্গের উত্তাপও অনুভব করত। (পৃষ্ঠা ৪৬)

৫. তরুণদের বিরুদ্ধে প্রবীণদের চক্রান্তে মনে হয় যেন তরুণ গুরুর আত্মাভিমানের বারুদস্তূপে অগ্নিসংযোগ করা হয়েছে, তাই সংবাদপত্রের সম্পাদকীয় প্রবন্ধটি হয়েছে কোনো গোপন বিপ্লবীচক্রের উত্তপ্ত ইশ্‌তেহার। (পৃষ্ঠা ৬৬)

৬. দৈত্যাকার মিথ্যার তাণ্ডবনৃত্যের দাপটে একজন তরুণশিক্ষকের জীবন ছিন্নভিন্ন হয়ে গেল। ইতিহাসের পাতায় শুধু এইটুকুই কি লেখা থাকবে? (পৃষ্ঠা ৮৫)

ডিরোজিওর কবিপ্রতিভা সম্পর্কে বিনয়বাবু তাঁর জীবনীতে বিশদ আলোচনা করেছেন; সামাজিক পরিবেশ, কর্মজীবন, ঝড়, উল্কাপাত—শুধু এই পরিচ্ছেদগুলিতেই যে ডিরোজিওর কবিতার উল্লেখ এবং আলোচনা আছে তা নয়, পরিশিষ্ট ১-এ ডিরোজিওর চোদ্দ বছর বয়সে লেখা একটি কবিতা এবং *Calcutta Gazette* পত্রিকায় প্রকাশিত ডিরোজিওর কবিতাবলীর একটি বিস্তারিত সমালোচনাও তুলে দেয়া হয়েছে। অবশ্য ডিরোজিওর কবিতাবলী সম্পর্কে বিনয়বাবু বলেছেন :

> কাব্যিক মাধুর্য ও উৎকৃষ্টতার দিক দিয়ে বিচার করলে উচ্চাঙ্গের কবিতা এগুলিকে নিশ্চয় বলা যায় না। ডিরোজিওর অধিকাংশ কবিতাতেই যৌবন-সুলভ ক্ষিপ্রতা ও অস্থিরতা প্রকাশ পেয়েছে। জীবনের অভিজ্ঞতার মূলধনও তাঁর এত অল্প ছিল যে প্রধানত শিক্ষালব্ধ ভাবধারা থেকেই তাঁকে কাব্যের প্রেরণা ও উপাদান দুইই সংগ্রহ করতে হয়েছে। অভিজ্ঞতা ও অনুভূতির একাত্মতার ফলে কবিতায় যে অনবদ্য লাবণ্য ফুটে ওঠে, তা তাঁর কবিতায় বিশেষ ফুটে ওঠেনি। (পৃষ্ঠা ১২৭)

তাহলে এই প্রশ্ন করা কি অসঙ্গত হবে যে বিনয়বাবুর রচনায় ডিরোজিওর কবি-প্রতিভার আলোচনা ও ব্যাখ্যা এত বেশিবার করা হয়েছে কেন? কবিতাগুলি ইংরিজিতে উদ্ধৃত করে সর্বদা তিনি বাংলা অনুবাদ দিয়ে দিয়েছেন। প্রায়শই কিছু কিছু ব্যাখ্যা করেছেন। না হয় মেনেই নেয়া গেল বাইশ বছর আট মাস বয়সে মৃত এক যুবকের পক্ষে এই কাব্যপ্রতিভার নিদর্শন প্রশংসনীয়। কিন্তু পরিশিষ্ট ১-এ সব কবিতাগুলি তুলে দিলে পাঠকের প্রতি কিছু বিবেচনা দেখানো হত না? হয়তো তার ফলে বিদ্যালয়ের কবিতা-সংকলনে ডিরোজিওর একটি দুটি কবিতা অন্তর্ভুক্ত করার সুবিধে হত, অথবা বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ মনোমোহন ঘোষের কবিতাবলীর জায়গায় ইংরিজি অনার্সে ডিরোজিওর কবিতা পাঠ্য করতে অনুপ্রাণিত হতেন।

**নিরুপম চট্টোপাধ্যায়**

কলকাতা—শ্রীপান্থ। ত্রিবেণী প্রকাশনী প্রাইভেট লিমিটেড। কলিকাতা। মূল্য সাত টাকা।

শ্রীপান্থের অষ্টাদশ শতকের কলকাতার উপর রচনাগুলো যখন দৈনিক ও সাময়িক পত্রে প্রকাশিত হ'তে থাকে, তখনই পাঠকমহলে যথেষ্ট আগ্রহ সৃষ্টি ক'রেছিলো। তারপর পুরোনো কলকাতার উপর তাঁর প্রথম বই প্রকাশিত হয় "আজব-নগরী" এবং ইতিহাসভিত্তিক সংবাদধর্মী রচনায় তিনি প্রতিষ্ঠা লাভ করেন।

"কলকাতা" তাঁর অধুনাতম সংযোজন। ভূমিকায় লেখক লিখেছেন, 'আমি ঐতিহাসিক নই, সমাজ-বিজ্ঞানীও নই, বরং বলতে পারি—সাংবাদিক। ফলে, এই বই-এর তথ্যগুলো ইতিহাসের হ'লেও একটা বিশেষ দৃষ্টিকোণ থেকে তা আহৃত।'

এ কথা অনস্বীকার্য যে, লেখকের একটি বিশেষ দৃষ্টিকোণ আছে। সে দৃষ্টি তীক্ষ্ণ কিন্তু সহৃদয়। অষ্টাদশ ও উনবিংশ শতকের বিভিন্ন অনেক ঘটনাকে প্রমাণ ভঙ্গীতে তিনি পরিবেশন করেছেন, যাতে পাঠক বিংশ শতকের কলকাতাতেও তার রূপান্তরিত প্রতিচ্ছবি দেখতে পায়। 'বেকার জিন্দাবাদ' প্রবন্ধে ইঙ্গবেকারদের কথা বিবৃত করতে গিয়ে তিনি বর্তমান বেকারদের উল্লেখ ক'রে বলেন, 'ভেবে দেখুন বেকার বাদ দিলে কলকাতার মানে দাঁড়ায়—ডালহৌসির খানকয়েক কেরানীশালা আর বড়বাজারের গুটিকয় গুদাম। এ শহর হাড্ডিসার হ'য়ে যায়। ইঙ্গ-বঙ্গ-কলিঙ্গের কর্মহীন ছেলেগুলিই জন্ম থেকে এ শহরের মাংস মজ্জা। তারাই কলকাতার রঙ, কলকাতার জীবন। রোয়াকে রোয়াকে পাতাবাহার সেজে তারাই এ শহরকে সাজায়, গল্প কবিতা লিখে তারাই মজায় এ শহরকে।.........
......তারা আছে বলেই বাঁদর নাচে ভীড় হয়, গণতন্ত্রের ভোট হয়, বিপ্লবের মিছিল হয়। কলকাতার বারোয়ারী তাদেরই দান, জলসা সাহিত্যসভা তাদেরই কৃতিত্ব।'

উপরোক্ত মন্তব্য শুধু ঐতিহাসিক বা সাংবাদিক নয়, সাহিত্যিক সহৃদয় দৃষ্টি-ভঙ্গীরও পরিচয়। 'কালিঘাটের বিয়ে' প্রবন্ধটি তো এ জাতীয় সাহিত্যধর্মীতার একটি চমৎকার নিদর্শন। প্রত্যেকটি প্রবন্ধের সমাপ্তি লক্ষ্যণীয়। ঠিক যেন ছোট গল্পের আঙ্গিকে শেষ করা। তীক্ষ্ণ ও ইঙ্গিতপূর্ণ। বইখানার গোড়ার প্রবন্ধটি থেকেই পাঠকের মনে এমনই আগ্রহ ও কৌতূহলের সৃষ্টি হয় যা একটি সার্থক উপন্যাসের সমতুল্য বললেও অত্যুক্তি হবে মনে করি না। সোডা ও বরফের আবির্ভাবের পেছনে এমন যে মজাদার ইতিহাস রয়েছে, শ্রীপান্থই তা আমাদের সামনে তুলে ধরলেন।

অবশ্যি একটা প্রশ্ন উঠতে পারে যে, পুরোনো দিনের কথার এমনিতেই একটা স্বাভাবিক আকর্ষণ আছে। কিন্তু শ্রীপান্থ নিছক তারই উপর ভর ক'রে দাঁড়াননি। ইতিহাস ভিত্তিক সংবাদ এখানে রসাল হয়েছে সাহিত্যিক মননশীলতায়। প্রায় প্রতিটি প্রবন্ধই উপাদেয় এবং তথ্যবাহী। পাঠান্তে মনে হয় পুরোনো কলকাতাকে অনেকখানিই যেন জানা চেনা এবং বোঝা হ'য়ে গেছে।

ত্রুটির উল্লেখ ক'রতে গেলে প্রথমেই বলতে হয় বহু প্রবন্ধেই লেখকের যত্নের অভাব পরিস্ফুট। যেন রচনার পেছনে ক্ষিপ্রতার একটা চাপ বর্তমান। ছোটখাটো ত্রুটির মধ্যে 'সংক্ষেপে আমার স্ত্রীর কাহিনী' প্রবন্ধে 'প্রশ্নমালার' নীচে প্রশ্ন রয়েছে মাত্র একটি। এ ছাড়া যেখানে তিনি কলকাতা কোন্ কোন্ মনীষী বা মহাপুরুষদের দ্বারা মহিমান্বিত তার উল্লেখ করেছেন, সেখানে রবীন্দ্রনাথের নাম অনুপস্থিত। বোঝা যায় এটা অসাবধানতা,

নইলে অমার্জনীয় হ'তো। এ জাতীয় অসাবধানতাপ্রসূত ভুল এবং সামগ্রিক যত্ন সম্পর্কে লেখককে অবহিত হ'তে অনুরোধ জানাচ্ছি।

**জ্যোতির্ময় রায়**

**কাঞ্চনরঙ্গ**—শম্ভু মিত্র ও অমিত মৈত্র। গ্রন্থপীঠ। কলিকাতা। মূল্য আড়াই টাকা।

শম্ভু মিত্র ও অমিত মৈত্র লিখিত "কাঞ্চনরঙ্গে"র কাহিনীটা পুরোনো—এদেশে এবং ওদেশে একাধিক নাটক, গল্প, চিত্রনাট্যে একই ধরনের কাহিনীর পরিচয় পাওয়া যেতে পারে। দুর্দশাগ্রস্ত অপমানিত লাঞ্ছিত নায়ক, আকস্মিক লটারি বা উইল-যোগে অর্থপ্রাপ্তি, কাঞ্চন-তৌলে মানুষের মূল্য পরিবর্তন। এমন কি লটারির ভুল নম্বর-ঘটিত প্রহসনও অভিনীত হতে শুনেছি বিবিসি থেকে। তবু "কাঞ্চনরঙ্গ" ভাল লাগল। বাংলা থিয়েটারে প্রহসন অভিনয় প্রায় উঠেই গিয়েছিল, যদিও উনিশ শতকের শ্রেষ্ঠ নাটকগুলি সবই প্রহসন। আজকাল কোনো কোনো অপেশাদার দলের চেষ্টায় প্রহসন পুনরুজ্জীবিত হওয়ার পথে। কিন্তু নূতন প্রহসন লেখা হচ্ছে না বললেই চলে। তাই নাটকটা ভাল লাগল।

একজন উদীয়মান নাট্যকারের সঙ্গে সেদিন আলাপ হচ্ছিল। তিনি কতকগুলি হৃদয়-বিদারক অশ্রু-উদ্রেককারী ট্র্যাজেডির রচয়িতা। তিনি বললেন, প্রহসন বাঙালির ভাল লাগে না, লাগতে পারে না।

বললাম, কেন?

তিনি বললেন, বাঙালির জীবন বিধ্বস্ত, প্রতি পদক্ষেপেই ট্র্যাজেডি, বাগজোলায় গুলিবর্ষণ, কাছাড়ে দাংগা। এমতাবস্থায় হেসে সময় নষ্ট করা কি উচিত?

ঔচিত্যের প্রশ্নটা অবান্তর। কথা হচ্ছিল বাঙালি হাসতে চায় কিনা। হাসা উচিত কিনা, এটা স্বতন্ত্র প্রশ্ন। কিন্তু নাট্যকার তখন উদ্দীপ্ত; বললেন, "কাঞ্চনরঙ্গ" ছ্যাবলামি। অশ্লীল।

কারণ?

কারণ কর্তা প্রথম অংকে পায়খানায় যাচ্ছেন তাড়াতাড়ি। এবং সেই ন্যক্কারজনক দৃশ্য দেখে নাট্যকার নাকি ভিরমি খেয়েছিলেন।

এটাই হয়েছে বিপদ। উনিশ শতকের বাঙালি লেখকরা আদর্শ ধরেছিলেন রেনেসাঁসের লেখকদের—শেক্‌স্‌পিয়ারকে। শেক্‌স্‌পিয়ারের কাছে অপাংক্তেয় বা অশ্লীল ব'লে কিছুই ছিল না। আর এ যুগের বাঙালিরা মডেল ধরেছেন ভিক্টোরিয়ান শ্লীলতাবাদীদের, যাঁদের নায়করা চাপা ইজের আর আঁটসাঁট কোর্তা প'রে সুসজ্জিত বৈঠকখানা আলোকিত ক'রে মাদাম লীভেন্-এর কীর্তিকলাপ আলোচনা করতেন। বার্নার্ড শ'র এলাইজা 'নট্ ব্লাডি লাইক্‌লি' উচ্চারণ ক'রে ফেলেছিল ব'লে যাঁরা শিউরে উঠেছিলেন তাঁদেরই উত্তরসূরী নয়া বাংলার উদীয়মানরা। এঁদের দৃষ্টিও তাই বৈঠকখানাতেই আবদ্ধ। তার বাইরের কিছু কথা বা আচরণ দেখেই এঁরা সন্ত্রস্ত হয়ে ওঠেন। শম্ভু মিত্র, অমিত মৈত্রকেও এ ধরনের সমালোচনা শুনতে হবে এ আর আশ্চর্য কি?

"কাঞ্চনরঙ্গে" বর্ণিত পরিবারকে যে কোনো মধ্যবিত্ত পরিবারের প্রতীক বস্তুত ধরে

নিতে একটুও বাধবে না। আমাদের মা-বাবা-ভাইরাই এর নায়ক, প্রতিনায়ক। বিশেষ ক'রে ঐ কর্তাটিকে আমার বাবা ব'লে ভুল করার এত অবকাশ থাকে যে বুঝতে পারি কেন ঐ উদীয়মান ট্র্যাজেডি-লেখক সইতে পারছেন না ব্যাপারটা। গায়ে লাগছে। নিরুত্তাপ চিত্তে অন্যের দুর্দশা সম্বন্ধে হাসির নাটক পড়া হয়ে উঠছে না। নিজেই জড়িয়ে পড়ছি নাটকে। পাঁচুকে আমরাই তো পায়ের তলায় দলেছি কতবার, আর তরলাকে করেছি অপমান। সমর-সীমা-অমররাও তো আমাদেরই ঘরের লোক। সমবেত চেতনায় যে পাপের স্মৃতি থাকে তাকেই জাগিয়ে তুলছেন নাট্যকারদ্বয়। সোনা দিয়ে মানুষ মেপেছি আমরা, আমাদের সমাজ হয়ে উঠেছে চেস্টারটনের ওগিল্‌ভি পরিবারের সমষ্টি। সেই যে,

As green sap to the simmer trees
Is red gold to the Ogilvies.

আমাদের—ওগিল্‌ভি-দের—পাপের নির্ঘণ্ট, কাঞ্চনরঙ্গ। তাই গায়ে লাগে।

সূত্রধার ও নটীর উপাখ্যানটি চমৎকার হয়েছে।

উৎপল দত্ত

**রূপ হোল অভিশাপ**—বিভূতিভূষণ মুখোপাধ্যায়। বেঙ্গল পাবলিশার্স। কলিকাতা-১২। মূল্য সাত টাকা।

বাংলা সাহিত্যে দুই উপন্যাসিক দুই বিভূতিভূষণ। "পথের পাঁচালী"র বিভূতিভূষণ বাংলার পল্লীপ্রকৃতি ও পল্লীজীবনের যে চিত্র এঁকেছেন তার বুঝি তুলনা নেই। আর "বরযাত্রী"র বিভূতিভূষণ বাংলা রস-সাহিত্যকে উচ্চ সাহিত্যের মর্যাদায় উন্নীত করেছেন। নির্মল হাস্যরসের সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম সূত্র আবিষ্কারে এই বিভূতিভূষণের তুলনা মেলা ভার। তাঁর "রাণুর প্রথম ভাগ", "রাণুর দ্বিতীয় ভাগ" "রাণুর কথামালা" গণশা, ঘোৎনা, পুটুরাণী এক একটি অবিস্মরণীয় চরিত্র। তাঁর ছোট গল্পগুলি হীরকখণ্ডের মত নির্মল ও দ্যুতিময়। আবার বিশুদ্ধ হাস্যরসাশ্রিত উপন্যাস "কাঞ্চন মূল্যে" তাঁর আর এক সৃষ্টি। পল্লীবাংলার বিগত দিনের কাহিনী এতে যেমন ভাবে বিধৃত হয়েছে তা আর কোথাও পাওয়া যায় না। বস্তুত সমাজের তথাকথিত নিম্নশ্রেণীর লোকেদের মধ্যে তিনি তার গল্পের নায়ক-নায়িকার সন্ধান পেয়েছেন। "কাঞ্চনমূল্যের" বৃদ্ধ স্বরূপ মণ্ডল তাঁর যে দরদী দৃষ্টিতে ধরা পড়েছে, সেই দৃষ্টিতেই অগুণতি চরিত্রের মুখোমুখি হই তাঁর "দুয়ার থেকে অদূরে" "কুশীপ্রাঙ্গনের চিঠি" প্রভৃতি গ্রন্থে। স্বল্পসময়ের জন্য তারা আসে কিন্তু তাদের জীবনের সারল্যে, গভীরতায় ও তীক্ষ্ণতায় আমাদের শ্রদ্ধা অধিকার করে।

"রূপ হোল অভিশাপ" উপন্যাসখানির প্রধান চরিত্রগুলিও তথাকথিত নিম্নশ্রেণীর মানুষ। শোভা রায়বাবুদের বাড়ি যে সৌরভী ঝি কাজ করত তার কন্যা কিন্তু অপরূপ সুন্দরী। তাকে নিয়েই, অর্থাৎ তার অপূর্ব সৌন্দর্য নিয়েই যে সব সমস্যা সৃষ্টি হয়েছে—এই গল্প। এই কাহিনীর অনেকটা অংশ জুড়ে আছে বসন্ত-ঝি। এমন চক্রান্তকারী কুৎসিত নারীচরিত্র অতি অল্পই দেখা যায়। বিষকুম্ভ পয়োমুখ এই বসন্ত ঝি-র চরিত্র লেখক অতি নির্মমভাবে ধীরে ধীরে ফুটিয়ে তুলেছেন। সেই তুলনায় অমৃতঠাকুরাণী

যথেষ্ট স্পষ্ট হয়ে ওঠেন নি।

বর্তমান বাংলার প্রবীণ সাহিত্যিকদের মধ্যে বিভূতিভূষণ মুখোপাধ্যায় অন্যতম এবং স্বভাবতই তিনি প্রাচীনপন্থী। চটকদার কথার ফুলঝুরি ছড়ানো অন্তঃসারশূন্য বাহ্যাড়ম্বর তাঁর রচনায় নেই। তিনি চিন্তায় শুচি, বচনে শুচি এবং চিরায়ত আদর্শে বিশ্বাসী। তাঁর রচনা তাই আধুনিক হলেও ক্লাসিক পন্থাতির, তিনি নিজেও প্রাচীন সমাজব্যবস্থায় শ্রদ্ধাবান। তাই বহু বিপর্যয়ের মধ্যেও তিনি সত্যকে ধ্রুবতারা করে এগিয়ে গিয়েছেন। বর্তমান উপন্যাসের নায়িকা চরিত্রটি তাই চরম ট্রাজেডির মধ্যে পরিণতি খুঁজে পেয়েছে। আধুনিক দৃষ্টিতে এই পরিণতি হয়ত সহজে মেনে নিতে চাইবে না; তারা নায়িকার উদ্ধারের অনেক রকম পথ বাৎলাবে, নায়ককেও বৃথা নিখোঁজ হতে দেবে না—বিশেষ করে নায়ক হাবুল ও তার বন্ধু সতু উভয়েই যখন বসন্ত-ঝি'র কারসাজি বুঝতে পেরেছিল তখন দৃঢ়ভাবে এ অবস্থার বিরোধিতা করতে এগিয়ে আসতে পারত। কিন্তু তা সম্ভব হয়নি। হলে গল্প অন্য খাতে বইত, রূপ অভিশাপ না হয়ে আশীর্বাদ হয়ে উঠতে পারত।

বঙ্কিমচন্দ্র-রবীন্দ্রনাথ-শরৎচন্দ্রের ঐতিহ্যসমৃদ্ধ বাংলা উপন্যাসের ক্ষেত্রে বর্তমানে নানা পরীক্ষা-নিরীক্ষা চলছে। বাংলা সাহিত্যের ভৌগোলিক সীমা বিস্তৃত হয়েছে, বিষয়-বৈচিত্র্যও নিত্যসম্প্রসার্যমান, প্রকাশ শৈলির প্রাখর্যও শানিত হয়েছে, কিন্তু সেই পরিমাণে অনুভবের গভীরতা বাড়েনি। দেশ-বিদেশের চিন্তায় পুষ্ট, বিশেষ করে রাজনৈতিক মতবাদ প্রচারের উদ্দেশ্যেও অনেক উপন্যাস লিখিত হয়। কিন্তু ব্যক্তিগত জীবনের সমস্যা, সুখ ও দুঃখও তো উপেক্ষনীয় নয়, বরং তার মধ্যেই মানুষ আপনার অন্তরের চিরন্তন প্রশ্নসমূহের উত্তর খুঁজে বেড়ায়। তাই যখন আমাদের সমাজে অন্ন, বস্ত্র, শিক্ষা ও ধনবণ্টনের সমতার সমস্যা নিয়ে অনেক প্রশ্নের ঝড় বইছে তার মধ্যেও একটি সুন্দরী অসহায় মেয়ের দুর্ভাগ্যের দিকে দরদের দৃষ্টি দিতে প্রবীণ লেখকের মন উৎসুক হয়েছে এবং প্রবীণ বলেই তিনি সে কাহিনী রসোত্তীর্ণ করে তুলতে সক্ষম হয়েছেন। অল্প অভিজ্ঞের হাতে এ কাহিনী নিরয়গামী হওয়ার আশঙ্কা ছিল, কিন্তু বিভূতিভূষণ উপন্যাসের একেবারে শেষের কয়েকটি কথায় কাহিনীটিকে ঊর্ধ্বগামী করে দিয়েছেন। ঘটনার এমনভাবে মোড় ঘুরতে অনেক গল্পেই দেখা যায় কিন্তু ভাবের এই ঊর্ধ্বগতি লেখকের রুচির শুচিতা এবং চিরায়ত আদর্শের প্রতি নিষ্ঠাই প্রমাণ করে।

সন্তোষকুমার দে

ত্রয়োবিংশতিতম বর্ষ দ্বিতীয় সংখ্যা শ্রাবণ-আশ্বিন ১৩৬৮

# সোভিয়েট দেশে তিন সপ্তাহ

## হুমায়ুন কবির

সোভিয়েট জীবনের বিভিন্ন দিকের খানিকটা আলোচনা পূর্বে করেছি, কিন্তু তার বিচিত্র প্রকাশের পূর্ণ বিবরণ দেওয়ার জন্য যে সময় ও অধ্যয়নের প্রয়োজন, তার সুযোগ পাইনি। প্রথম বার মস্কোতে প্রায় পাঁচ সপ্তাহ ছিলাম, কিন্তু তার চার সপ্তাহ কেটেছিল হাসপাতালে। দ্বিতীয় বার তিন সপ্তাহে অনেকখানি ঘুরেছিলাম, কিন্তু তিন সপ্তাহে এত বিপুল দেশের বিচিত্র নরনারীর সম্যক পরিচয় কি করে মিলবে? তবু মস্কো লেনিনগ্রাডের আবহাওয়ার পার্থক্য, কিয়েভে উক্রেনবাসীর দিলখোলা আলোচনা এবং তাসকন্দে মধ্য এসিয়ার চিরপ্রসিদ্ধ আতিথেয়তা সঞ্চরমান পথিকের দৃষ্টিতেও ধরা পড়ে। তৃতীয় বার মোটে চারদিন ছিলাম। সমস্ত সময় মস্কোতেই কেটেছে। কিন্তু তার মধ্যেই মস্কোর বাহ্যিক রূপান্তর ও মানসিক পরিবর্তন আরো স্পষ্ট ভাবে দেখেছি।

১৯৫৬ সালে সোভিয়েট রাষ্ট্রে যে পরিবর্তন সুরু হয়, প্রথমবার তার বিশেষ কোন বাহ্যিক প্রকাশ দেখিনি। কিন্তু ১৯৫৯ সালে যখন দ্বিতীয় বার গেলাম, তখন দেশের আবহাওয়া বদলে গেছে। দোকান বাজারে নানাধরণের জিনিষপত্র বাড়তে সুরু করেছে, পথে লোক-চলাচল আগের তুলনায় বেশী। পথচারী স্ত্রী পুরুষের পোষাকে কথায় ব্যবহারে পূর্বের তুলনায় অনেক বেশী বৈচিত্র্য এবং স্বাধীনতা সহজেই দৃষ্টি আকর্ষণ করেছিল। বিপ্লবের প্রথম যুগে সোভিয়েট নাগরিক জীবনকে উপভোগ করবার কথা ভাবেনি, হয়তো ভাবতে পারেনি। ১৯৫৬ সালে সেই পূর্বের কঠোর কৃচ্ছ্রসাধনার ছবিই দেখেছি কিন্তু ১৯৫৯ সালে তিন বৎসরের মধ্যে দেশের বাইরের চেহারা ও জনসাধারণের মনোভাবে অনেক পরিবর্তন এসেছে মনে হ'ল। ১৯৫৯ সালে যে হাওয়া বইতে সুরু করেছিল, এবারে ১৯৬১ সালে যখন মস্কো গিয়েছিলাম তখন তার প্রভাব আরো গভীর এবং সুদূরপ্রসারী দেখলাম। পূর্বে সোভিয়েট রাষ্ট্র বা মার্কসবাদের কোন সমালোচনা করলে আলোচনা স্তব্ধ হয়ে যেতো দেখেছি, এবার দেখলাম যে রুশ নাগরিক নিজেদের মধ্যে রাষ্ট্রব্যবস্থা এবং জীবনদর্শনের আলোচনা করছে।

সোভিয়েট রাষ্ট্রের বিষয় কিছু বলতে বা লিখতে গেলে প্রথমেই মনে রাখা উচিত যে রক্তাক্ত বিপ্লবের মধ্য দিয়েই সোভিয়েট রাষ্ট্র ও সমাজ ব্যবস্থা বদলিয়েছে, মানুষের জীবন

দৃষ্টি ও প্রকাশভঙ্গি বদলিয়েছে। সেই রক্তাক্ত বিপ্লবের যুগে লক্ষ লক্ষ নরনারী নিদারুণ দুঃখ ভোগ করেছে, প্রাণ দিয়েছে ও নিয়েছে। অন্তর্যুদ্ধ ও গৃহবিবাদের ফলে জাতির ও সমাজের জীবন বিধ্বস্ত হয়েছে, পারিবারিক সম্বন্ধ শিথিল হয়ে গিয়েছে, ঘরবাড়ী ক্ষেত কারখানা সম্পত্তি ধ্বংস ও জাতির অর্থসম্পদ বিনষ্ট হয়েছে। গৃহশত্রু ও বহিশত্রুর আক্রমণ ব্যর্থ করে শিশুরাষ্ট্রকে বাঁচিয়ে রাখাই ছিল সেদিন রাষ্ট্রনেতাদের একমাত্র লক্ষ্য। তাই জাতির সমস্ত উদ্যম ও শক্তি আত্মরক্ষার জন্য ব্যবহৃত হয়েছে। যুদ্ধ-সংক্রান্ত সমস্ত ব্যাপারে সোভিয়েট রাষ্ট্রের বিস্ময়কর প্রগতির মূলে আত্মরক্ষার এই তীব্র প্রেরণা।

আত্মরক্ষার তাগিদে কিন্তু জীবনের অন্যান্য অনেক দিকে ক্ষতি হয়েছে। আভ্যন্তরীণ শত্রুর হাত থেকে বাঁচবার জন্য যে পুলিশী-ব্যবস্থা, তাতে ব্যক্তির ব্যক্তি-স্বাতন্ত্র্য আঘাত পেয়েছে, মানুষের সঙ্গে মানুষের সম্বন্ধ বহুভাবে ব্যাহত হয়েছে। বহিশত্রুর আক্রমণ প্রতিরোধ করবার জন্য নিতান্ত প্রয়োজনীয় বহু সেবা ও স্বাচ্ছন্দ্য বর্জন করতে হয়েছে, রাষ্ট্রের জীবনে সামরিক শৃঙ্খলার বন্ধন কঠিন হয়ে দেখা দিয়েছে। হিংসা দ্বন্দ্বের পথে সামাজিক পরিবর্তনকে আহ্বান করার ফলে দেশের ভিতরে এবং বাইরে এমন হিংস্র ও আক্রমণাত্মক মনোভাবের সৃষ্টি হয়েছিল যে প্রায় চল্লিশ বৎসর শত্রুমিত্রনির্বিশেষে সবাইকেই তার জন্য নিদারুণ দুঃখভোগ করতে হয়েছে। লেনিনের মৃত্যুর অব্যবহিত পর থেকে স্টালিনের মৃত্যু পর্যন্ত এই যে চল্লিশ বৎসর সোভিয়েট জনসাধারণ অগ্নিপরীক্ষার মধ্য দিয়ে এসেছে, পৃথিবীর ইতিহাসে খুব কম জাতিই সে রকম পরীক্ষার সম্মুখীন হয়ে তাতে জয়লাভ করেছে।

সোভিয়েট রাষ্ট্রে জনসাধারণের খোরাক-পোষাকের আজো পুরোপুরি ব্যবস্থা হয়নি। শুধু যে সমস্ত জিনিষ দুর্মূল্য তা নয়, যে সব জিনিষ পাওয়া যায়, স্বাস্থ্যের বিচারে গ্রহণ-যোগ্য হলেও রুচির বিচারে তাদের স্থান অতি সাধারণ। পাঁচ বছর আগে দেখেছি যে রুশ নাগরিকের ঘরবাড়ী পোষাক অতিশয় মামুলী, জনসাধারণের অনেকের ভাগ্যেই যে খোরাক জোটে, তাতে বৈচিত্র্যের একান্ত অভাব। খাস মস্কোর বড় বড় হোটেলে রুষ খাদ্যদ্রব্যের বিশেষ কদর নাই। তুর্কী বা উক্রেনী বা তাজিক খাদ্যদ্রব্যেরই সমাদর বেশী। ইয়োরোপের প্রায় প্রত্যেক দেশেই নিজস্ব রন্ধনপ্রণালীর পরিচয় মেলে। সোভিয়েট রাষ্ট্রের রুষ অঞ্চলে তা নেই কেন বোঝাতে গিয়ে একজন সম্মানিত রুষ নাগরিক বললেন যে ১৯৩০-৩৭ সাল তাঁদের যে কি দুর্দশায় কেটেছে, ভুক্তভোগী ভিন্ন অন্য কেউ তার কল্পনাও করতে পারবে না। তিনি বললেন যে তাঁর নিজের বাড়ীতে অনেক সময়ে ঘাস পাতা সেদ্ধ করে ছেলেমেয়েদের ক্ষুধা নিবারণ করেছেন। প্রথম যুগের পঞ্চশালা পরিকল্পনার জন্য মূলধন যোগাতে রাষ্ট্রের সমস্ত সম্পদ ব্যয় হয়েছে। জীবনের সুখ-স্বাচ্ছন্দ্যের দিকে দৃষ্টি দেবার সুযোগ মেলেনি। ১৯৩৭ সালের পরে যখন অবস্থার একটু উন্নতির সম্ভাবনা দেখা দিল, তখন ঘনিয়ে এল মহাযুদ্ধের কালো ছায়া। হিটলারের আক্রমণে রুষে যে ধ্বংসলীলা, পৃথিবীর ইতিহাসে তার নজীর মিলবে না। পূর্বের দশ বৎসর মানবজীবনের অন্য সমস্ত দাবী ভুলে গিয়ে কেবল আত্মরক্ষার সাধনা একাগ্রভাবে না করলে বোধ হয় সোভিয়েট রাষ্ট্র নাজী জার্মানীর প্রচণ্ড আক্রমণ রোধ করতে পারত না।

বিপ্লবের পথে সামাজিক পরিবর্তন আনতে চেয়েছিল বলেই সোভিয়েট নাগরিককে এত দুর্ভোগ সহ্য করতে হয়েছে। বিপ্লবের ভয়ে অন্য দেশ সোভিয়েট রাষ্ট্রকে সাহায্য করতে এগিয়ে আসে নি। শুধু তাই নয় বিশ্ব-বিপ্লবের আহ্বানে অন্যান্য রাষ্ট্র আতঙ্কিত হয়ে সোভিয়েট রাষ্ট্রকে শত্রু মনে করেছে। ফলে সোভিয়েট রাষ্ট্র বহিরাক্রমণ

থেকে রক্ষা পাওয়ার জন্য অস্ত্রসজ্জা করতে বাধ্য হয়েছে। শ্রেণীসংগ্রামের দরুন দেশের অভ্যন্তরেও বিবাদ ও সংঘাত দেখা দিয়াছে। ফলে সোভিয়েট রাষ্ট্র প্রথম ত্রিশ-চল্লিশ বৎসর কেবল আত্মরক্ষারই সাধনা করেছে, দেশ গঠনের দিকে তেমন মনোযোগ দিতে পারে নি।

ভারতবর্ষেও কখনো কখনো বিপ্লব ও সংস্কারের তুলনামূলক আলোচনা শোনা যায়। বিপ্লববিলাসী কেউ কেউ বলে থাকেন যে সংস্কারের পথ বর্জনীয়, রক্ত-বিপ্লবের মধ্য দিয়াই দেশ সিদ্ধিলাভ করতে পারে। তাঁরা ভুলে যান যে সংস্কারের পথে চলেছে বলেই ইংরেজ সংখ্যায় অল্প হয়েও পৃথিবীতে বহুকাল আধিপত্য করেছে। বিপ্লবের পথে অন্তর্দ্বন্দ্ব ও আভ্যন্তরীণ সম্পদ হানি তো রয়েছেই, কিন্তু তার চেয়ে বেশী ক্ষতি হয় যে তার ফলে অন্তর্শত্রু ও বহির্শত্রুর আক্রমণ রোধ করতেই জাতির উদ্যম ও শক্তির বহুল অপব্যয় হয়। ব্যক্তির জীবনে সংঘাতের চেয়ে সহযোগের পথ বাঞ্ছনীয়—জাতির জীবনেও তার ব্যতিক্রম হয় না। বিপ্লবের পথে চললে প্রতিবিপ্লবের আশঙ্কা তো রয়েছেই, তা ছাড়াও সংঘাত সংঘর্ষে সৃষ্টিকারী শক্তির অপব্যয় অনিবার্য। অন্য সমস্ত বিচার ছেড়ে দিলেও সংঘর্ষের পথে বহুজনের জীবনে যে দুঃখ বেদনা গ্লানি, তাও সমাজের পক্ষে কম লোকসান নয়। বিপ্লব ও সংস্কারের তুলনা *Science, Democracy and Islam* গ্রন্থে আমি বিস্তারিত ভাবেই করেছি এখানে তার পুনরুক্তি করতে চাই না। শুধু এই কথা বললেই চলবে যে পূর্বকালে যদিও বা বিপ্লবের স্বপক্ষে কথা বলা চলত, বর্তমান যুগের পৃথিবীতে সে সব কথা একেবারে অচল। বিজ্ঞানের প্রগতির ফলে মানুষ যে সমস্ত ভয়াবহ অস্ত্র আবিষ্কার করেছে, সেই অস্ত্র-কণ্টকিত পৃথিবীতে বিপ্লবের পথে চললে মানবজাতির মৃত্যু অনিবার্য। রুষ রাষ্ট্রনেতা ক্রুশ্চভ সে কথা উপলব্ধি করেছেন বলেই আজ তিনি স্টালিনের পথ বর্জন করে লেনিনের মতবাদেরও সংশোধন দাবী করেছেন।

অন্তর্দ্বন্দ্ব ও বহির্দ্বন্দ্বের সমস্ত সংঘাত জয় করে সোভিয়েট রাষ্ট্র জীবনের বিভিন্ন ক্ষেত্রে যে বিস্ময়কর প্রগতি দেখিয়েছে, ব্যাপকভাবে জনশিক্ষার ফলেই তা সম্ভব হয়েছে। ইসলামের অভ্যুদয়ের প্রথম যুগে হজরৎ মহম্মদ সার্বজনীন শিক্ষার প্রতি যে জোর দিয়েছিলেন, তার তুলনা পৃথিবীর ইতিহাসে মেলে না। রুষ বিপ্লবের পরে রুষ রাষ্ট্রনেতারাও ঠিক সেই ভাবেই সার্বজনীন শিক্ষার প্রবর্তন করতে চেষ্টা করেছেন, এবং তাঁদের সে চেষ্টা বহুলাংশে সফল হয়েছে বলেই আজ সোভিয়েট রাষ্ট্র বিজ্ঞানে শিল্পে শিক্ষায় পৃথিবীতে অগ্রণী। শিক্ষার ক্ষেত্রে সোভিয়েট রাষ্ট্র জাতি ধর্ম বর্ণের প্রভেদ করেনি, উন্নত অনুন্নতের মধ্যে পার্থক্য রাখে নি। সমগ্র রাষ্ট্রের সমস্ত নাগরিকের জন্য নিজের ভাষায় শিক্ষার ব্যবস্থা করে সকলের সামনেই উন্নতির পথ খুলে দিয়েছে। প্রায় সমস্ত সমাজেই শতকরা চার-পাঁচ জন শিশু মেধাবী, কিন্তু বহু সমাজে দারিদ্র্য বা অন্য সামাজিক কারণে তাদের মধ্যে বড় জোর দুয়েকজন শিক্ষা ও উৎকর্ষের সুযোগ পায়। সোভিয়েট-পূর্ব রুষ দেশে সমাজের শতকরা একজনেরও এ সুযোগ মিলত কিনা সন্দেহ। আজ সকলের জন্যই শিক্ষার ব্যবস্থা রয়েছে বলে এই নিদারুণ সামাজিক অপচয় বন্ধ হয়ে গিয়েছে, ফলে সোভিয়েট রাষ্ট্রে পূর্বের তুলনায় বৈজ্ঞানিক সাহিত্যিক শিল্পীর সংখ্যা বহুগুণ বেড়ে গিয়েছে।

এ প্রসঙ্গে আর একটি কথাও স্মরণ রাখা প্রয়োজন। সোভিয়েট বিপ্লবের পরে প্রায় দুই দশক ধরে অন্তর্দ্বন্দ্ব থামেনি, কিন্তু হিটলারের আক্রমণের ফলে দেশরক্ষার আহ্বানে সোভিয়েট নাগরিক যে ভাবে সাড়া দিয়েছিল, তাতে অন্তর্দ্বন্দ্ব বহুল পরিমাণে দূর হয়ে যায়। সঙ্গে

সঙ্গে নবজাতকের সংখ্যা বেড়ে চলল, বয়স্কদের মনে প্রাক-বিপ্লবদিনের স্মৃতি মলিন হয়ে আসতে লাগল। কিশোর যারা যৌবনে পা দিল, তাদের সমগ্র জীবন বিপ্লব-পরবর্তী সোভিয়েট রাষ্ট্রে কেটেছে বলে তাদের মনে অন্তর্দ্বন্দ্ব বা সন্দেহের সম্ভাবনা রইল না। আরেক ভাবেও সোভিয়েট নাগরিকের জীবন সহজ হয়ে আসল। লেনিন-ট্রট্স্কী-স্টালিন যুগের যারা মানুষ, সেদিনকার দ্বন্দ্ব-সংঘাত তাদের মনকে যে ভাবে দোলা দিয়েছে, বর্তমান যুগের সোভিয়েট নাগরিককে তা দেয় না, দিতে পারে না। মস্কোতে একজন বিচক্ষণ সোভিয়েট রাষ্ট্রনেতার সঙ্গে আলোচনায় এই কথাই স্পষ্ট হয়ে ধরা দিল যে মিষ্টার ক্রুশ্চভ যে ভাবে তাঁর প্রতিদ্বন্দ্বীদের রাজনীতিক্ষেত্রে পরাজিত করেই তুষ্ট হয়েছেন, তাঁদের দৈহিক মানসিক বা আর্থিক কোন ক্ষতির চেষ্টাও করেননি, স্টালিনের পক্ষে তা কল্পনা করাও অসম্ভব ছিল। ক্রুশ্চভ-পরবর্তী যুগে যাঁরা সোভিয়েট রাষ্ট্রনেতার স্থান অধিকার করবেন, তাঁদের পক্ষে স্টালিনের কার্যকলাপ সমর্থন তো দূরের কথা, বোঝা-ই হয়তো কঠিন হবে।

শিক্ষার ক্ষেত্রে সোভিয়েট রাষ্ট্রনেতারা যে দূরদর্শিতার পরিচয় দিয়েছেন, তার আর একটি দৃষ্টান্ত উল্লেখ করতে চাই। বর্তমান যুগ যে বিশেষ ভাবে বিজ্ঞানের যুগ, সে কথা সোভিয়েট শিক্ষা পদ্ধতি যে ভাবে স্বীকার করেছে, অন্যদেশে বোধ হয় তা হয়নি। পূর্বেই উল্লেখ করেছি যে নয় বৎসর বয়সেই সোভিয়েট ছাত্র বিজ্ঞান শিখতে সুরু করে, চৌদ্দ বৎসর বয়স পর্যন্ত ছয় বৎসর বিজ্ঞান প্রত্যেকেই পড়ে। চৌদ্দর পরে যারা মাধ্যমিক শিক্ষালাভ করে, তারা আরো তিন বৎসর বাধ্যতামূলক ভাবে বিজ্ঞান চর্চা করে। ফলে সোভিয়েট রাষ্ট্রের সমস্ত নাগরিকের প্রায় এক-তৃতীয়াংশ বিজ্ঞানে পারদর্শী, এবং বিজ্ঞানের এই ব্যাপক প্রসারের ফলেই রসায়ণ পদার্থবিদ্যা জীববিদ্যায় সোভিয়েট রাষ্ট্র বিস্ময়কর প্রগতি দেখিয়েছে।

বিজ্ঞানকে শিক্ষার অন্যতম প্রধান অঙ্গ করায় কেবল যে বৈজ্ঞানিক তথ্য ও সূত্রের জ্ঞান বেড়েছে, তা নয় সঙ্গে সঙ্গে সমাজে বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গীও ব্যাপ্ত হয়ে পড়েছে। বর্তমানে সোভিয়েট রাষ্ট্রে যে রাষ্ট্রনীতি, সমাজনীতি, সাহিত্যকলা নিয়ে আলোচনা সুরু হয়েছে, দশ বৎসর পূর্বে স্টালিনের আমলে তা কল্পনার অতীত ছিল। স্টালিনের মৃত্যুতে এক যুগের অবসান এবং অন্য যুগের সুরু, কিন্তু বিগত ত্রিশ-চল্লিশ বৎসরে সোভিয়েট রাষ্ট্রে শিক্ষা ব্যাপক ভাবে ছড়িয়ে না পড়লে বর্তমানের এ বিকাশ সম্ভব হ'ত না। এখনো নানা বিষয়ে জিজ্ঞাসা ও প্রশ্ন পুরোপুরি দানা বাঁধেনি, কিন্তু যে ভাবে নানা প্রশ্ন উদ্বেলিত হয়ে উঠছে, তাতে দশ বৎসরের মধ্যে সোভিয়েট রাষ্ট্রে নতুন রেনেসাঁস দেখা দেবে আশা করা যায়। সোভিয়েটের একজন রাষ্ট্রনেতাকে জিজ্ঞাসা করেছিলাম যে জিজ্ঞাসা ও প্রশ্ন বিজ্ঞানের ভিত্তি, সমস্ত দেশে ব্যাপক বিজ্ঞান শিক্ষার ফলে তাই একদিন সোভিয়েট রাষ্ট্রের পূর্বসিদ্ধান্ত মার্কসবাদ নিয়েই জনসাধারণের মধ্যে সন্দেহ জাগা অসম্ভব নয়। উত্তরে তিনি বললেন যে ভবিষ্যতের সোভিয়েট নাগরিককে বর্তমান যুগের উপযোগী করে তোলাই শিক্ষার লক্ষ্য, তার ফলে যদি একদিন মার্কসবাদের কোন সিদ্ধান্তের পুনর্বিচার প্রয়োজন হয়, তাহলে তার জন্যও প্রস্তুত হতে হবে।

মিষ্টার ক্রুশ্চভের নেতৃত্ব সোভিয়েট নাগরিক যে এত আগ্রহের সঙ্গে স্বীকার করেছে তার কারণ যে তিনি আশাবাদী। সোভিয়েট রাষ্ট্র নেতাদের মধ্যে তিনিই প্রথম সবলকণ্ঠে ঘোষণা করেছেন যে দ্বন্দ্বসংঘর্ষ ভিন্নও সমাজব্যবস্থার রূপ বদলাতে পারবে। যুদ্ধক্ষেত্রে সংঘাতের বদলে আমেরিকার যুক্তরাষ্ট্রকে তিনি জনসাধারণের জন্য সুখস্বাচ্ছন্দ্যের প্রতিদ্বন্দ্বিতায় আহ্বান করেছেন। সামরিক শক্তির দ্বারা নয়, প্রতিদিনের

ব্যবহার্য জিনিষের প্রাচুর্যে সোভিয়েট রাষ্ট্র একদিন ধনতন্ত্রবাদী দেশগুলিকে পরাজিত করবে, সমগ্র সোভিয়েট রাষ্ট্রের সামনে এই আদর্শ স্থাপন করে মিষ্টার ক্রুশ্চভ দুইভাবে দেশবাসীর চিত্ত জয় করেছেন। সোভিয়েট নাগরিক যুদ্ধের দুঃখবেদনা মর্মে মর্মে উপলব্ধি করেছে, তাই যুদ্ধের নামে তার মনে আতঙ্ক আসে। যুদ্ধের সম্ভাবনাকে যতদিন সোভিয়েট রাষ্ট্র-দর্শনের অপরিহার্য অঙ্গ মনে করা হয়েছে, ততদিন সোভিয়েট নাগরিক জীবনের নানাক্ষেত্রে উন্নতির লক্ষণ দেখেও আশ্বস্ত হতে পারেনি। তার মনে সর্বদাই আশঙ্কা ছিল যে বিজ্ঞানে শিল্পে উদ্যোগে এত উৎকর্ষ সত্ত্বেও দেশ আনবিক যুদ্ধের আঘাতে মুহূর্তে ধ্বংস হয়ে যাবে। একদিকে শস্ত্র-শক্তি বাড়িয়ে এবং অন্য পক্ষে যুদ্ধ বর্জনের সম্ভাবনার উপর জোর দিয়ে মিষ্টার ক্রুশ্চভ সোভিয়েট নাগরিকের নিত্যসঙ্গী আসন্ন মৃত্যুর আকঙ্ক দূর করেছেন। সঙ্গে সঙ্গে খাদ্য-বস্ত্র-বাসস্থান-শিক্ষা-আমোদপ্রমোদে কুড়ি বৎসরের মধ্যে সোভিয়েট রাষ্ট্র আমেরিকাকেও ছাড়িয়ে যাবে এই আশার ছবি সোভিয়েট নাগরিকের সামনে উপস্থিত করে তার প্রাণে নতুন উৎসাহ ও উদ্দীপনার সঞ্চার করেছেন।

সমরবিজ্ঞান ও অস্ত্রশস্ত্র উৎপাদনে সোভিয়েট রাষ্ট্র স্টালিনের আমলেই পৃথিবীর শ্রেষ্ঠতম শক্তিগুলির সমকক্ষ হয়ে উঠেছিল। সোভিয়েট রাষ্ট্রীয় জীবনে বোধ হয় এই ক্ষেত্রেই স্টালিনের দান স্মরণীয় হয়ে থাকবে। সমর সম্ভারের উৎকর্ষ সাধনের জন্য স্টালিন কিন্তু যে দাম দিয়েছিলেন, সোভিয়েট নাগরিক কোনদিনই তা সর্বান্তঃকরণে স্বীকার করে নি। ১৯৩০ থেকে ১৯৩৭ পর্যন্ত আভ্যন্তরীণ মতভেদ ও সংঘর্ষে তা বারবার প্রকাশ পেয়েছে, কিন্তু স্টালিন কঠোর ভাবে সমস্ত অসন্তোষ ও বিক্ষোভ দমন করেছেন, যুক্তিযুক্ত সমালোচনাকেও স্বীকার করেন নি। ফলে সোভিয়েট রাষ্ট্রনেতাদের পুরোপুরি একটা গোষ্ঠী হয় বিদ্রোহ অথবা আত্মঅবলুপ্তির মধ্যে নষ্ট হতে বসেছিল, কিন্তু হিটলারের অবিমৃষ্যকারিতার ফলে আভ্যন্তরীণ দ্বন্দ্ব শেষ হয়ে জাতির সমস্ত উদ্যম ও উৎসাহ বহিশত্রুকে পরাজিত করতে উন্মুখ হয়ে উঠল বলে সোভিয়েট রাষ্ট্রে নূতন নেতৃত্বের সম্ভাবনা দেখা দিল। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের প্রথম কয়েকমাসেই পুরাতন নেতৃত্বের দুর্বলতা প্রকাশ হয়ে পড়ল, তখন রাষ্ট্র-রক্ষার জন্য যে নতুন নেতৃবৃন্দ এগিয়ে এলেন, স্টালিনের মৃত্যুর পরে রাষ্ট্রশক্তি তাঁদের হাতে স্বভাবতঃই এসে পড়ল।

যুদ্ধের সময়ে স্টালিনের আমলেই রাষ্ট্রের দৃষ্টিভঙ্গীর যে পরিবর্তন সুরু হয়, তার ফলে স্বদেশ ও স্বজাতিপ্রীতির এক নতুন মূল্যায়ন হ'ল। রুষ বিপ্লবের প্রাথমিক যুগে প্রাক-বিপ্লব যুগের প্রায় সব কিছুই অস্বীকার করবার প্রয়াস দেখা দিয়েছিল, কিন্তু যুদ্ধের প্রয়োজনে পুরাতনের পুনপ্রতিষ্ঠা সুরু হ'ল। যে পিটরের নাম এককালে বিপ্লবী রুষ শুনতেও চায়নি, পেট্রোগ্রাডের নাম বদলে লেনিনগ্রাড হয়েছে, পরবর্তী কালে সেই পিটরকেই জাতির শ্রেষ্ঠতম নেতাদের সামিল করা হ'ল। শুধু রাজনীতি বা ইতিহাস বলে নয়, জ্ঞান-বিজ্ঞানের ক্ষেত্রেও স্বজাতিপ্রীতির দাবীতে বহু বিস্মৃতপ্রায় মনীষী অথবা অপ্রচলিত জ্ঞানের পুনরুজ্জীবনের সজ্ঞান প্রচেষ্টা সুরু হ'ল। আজকাল বিজ্ঞানের প্রায় প্রত্যেক ক্ষেত্রেই গুরুত্বপূর্ণ আবিষ্কারের কৃতিত্ব রুষ পূর্বসূরীর সাধনার ফল বলে দাবী করা হয়। তাতে একপক্ষে বর্তমান যুগের সোভিয়েট নাগরিকের জাতীয়তাবোধ ও জাতীয় গর্ব বাড়ে, অন্যপক্ষে সোভিয়েটপূর্ব রুষ জীবনের বিভিন্ন অঞ্চলে সন্ধান ও গবেষণার প্রেরণা যোগায়।

চিকিৎসাশাস্ত্রের একটা উদাহরণ দিলেই একথা স্পষ্ট ভাবে বোঝা যায়। রুষ চিকিৎসা-বিজ্ঞান একদিকে নিত্যনূতন আবিষ্কারে পৃথিবীর জ্ঞানভাণ্ডার সমৃদ্ধ করেছে, বহু দুরারোগ্য

ব্যাধির আঁধি খ্ঁজে পেয়েছে, অন্যদিকে জনসাধারণের মধ্যে প্রচলিত লোকচিকিৎসাকে সর্বান্তঃকরণে গ্রহণ করে তার উৎকর্ষ সাধনের চেষ্টা করছে। বিভিন্ন ধরনের ঝরনার জলের বিভিন্ন গ্ণ, বিভিন্ন রোগে তারা উপকারী—এ বিশ্বাস পৃথিবীর প্রায় সবদেশেই জনসাধারণের মধ্যে দেখা যায়। বিশেষ ধরনের তৈলমর্দন বা স্নানের ফলে বিভিন্ন রোগ নিরাময় হয়, এ চিকিৎসা প্রণালী ভারতবর্ষের কেরালা অঞ্চলে আজো প্রচলিত, কিন্তু বর্তমান য্গের বিজ্ঞান সম্মত চিকিৎসা প্রণালীর সঙ্গে তাদের সমন্বয় সাধনের চেষ্টা ভারতবর্ষে একেবারেই হয়নি, ইয়োরোপের বিভিন্ন দেশেও তেমন বিধিবদ্ধভাবে হয়নি। সোভিয়েট রাষ্ট্রের আধ্নিকতম চিকিৎসায়ও কিন্তু প্রচলিত লোকচিকিৎসাকে স্থান দেওয়া হয়েছে। মস্কোর যে হাসপাতালে আমি ১৯৫৬ সালে ছিলাম, সেখানে যেমন একদিকে ন্তনতম ঔষধের ইনজেকশন দেওয়া হ'ত, তেমনি অন্যদিকে লোকচিকিৎসার পরীক্ষিত মসলা দিয়ে স্নানের ব্যবস্থাও করা হ'ত। কৃষ্ণসাগর তীরে সোচী অঞ্চলের বিখ্যাত স্নান ও জলপানের চিকিৎসা আজ সোভিয়েট রাষ্ট্রের বাইরেও প্রতিষ্ঠা লাভ করেছে।

সার্বজনীন শিক্ষাকে কেন্দ্র করে বর্তমান য্গের সোভিয়েট সমাজ গড়ে উঠেছে বলে জীবনের প্রতিটি ক্ষেত্রে আজ বিজ্ঞানের প্রয়োগ দিন দিন ব্যাপক হয়ে উঠছে। সমস্ত প্রচেষ্টার মধ্যে কৃষির ক্ষেত্রেই সোভিয়েট রাষ্ট্রের সাফল্য তুলনায় কম। আজ পর্যন্ত সোভিয়েট নাগরিক পর্যাপ্ত পরিমাণে দ্ধ ডিম মাংস মাখন বা ফল পায় না। আজো মস্কোর বাজারে সময় সময় ফল বা মাছমাংসের কঠোর অনটন দেখা দেয়। মিষ্টার ক্রুশ্চভ তাই আজ দ্'তিন বৎসর ধরে কৃষির প্রতি জোর দিয়েছেন বেশী, বিজ্ঞানের নতুন নতুন প্রয়োগে সোভিয়েট জীবনের এই অসাফল্য দ্র করতে বদ্ধপরিকর হয়েছেন। ফলে নতুন ধরনের শস্য নিয়ে পরীক্ষা হচ্ছে, বরফে চাপা পড়লেও তা মরবে না, অনাবৃষ্টি সহ্য করেই তা মান্ষের খোরাক জোগাবে। সঙ্গে সঙ্গে চেষ্টা হচ্ছে যে আগে যে সমস্ত অঞ্চলে কোনদিন চাষ হয়নি, লোকে ভেবেছে সে সমস্ত জমিতে ফসল ফলানো অসম্ভব, সে সব অঞ্চলেও ন্তন প্রাতন নানা ধরনের শস্য উৎপাদনের চেষ্টা দিনদিন বাড়ছে। বিজ্ঞানের শক্তি প্রয়োগে কয়েক বৎসরের মধ্যেই যে সোভিয়েট রাষ্ট্র খাদ্যসমস্যার সমাধান করতে পারবে, আজ সে বিষয়ে বোধ হয় সন্দেহের অবকাশ নেই।

শিল্প ও উদ্যোগের ক্ষেত্রে সোভিয়েট রাষ্ট্রে বিজ্ঞানের প্রয়োগ আরো বেশী ব্যাপক। ঊনবিংশ শতকের মাঝামাঝি জার্মানীতে বিজ্ঞানের প্রয়োগে শিল্প-উদ্যোগের যে অভূতপ্র্ব বিকাশ দেখা দিয়েছিল, বর্তমান শতকের মাঝামাঝি সোভিয়েট রাষ্ট্রে তার প্নরাবৃত্তির সম্ভাবনা দেখা দিয়েছে। স্টালিন য্গের সমরকেন্দ্রিক মনোভাব বর্তমানে অনেকখানি কেটেছে, কিন্তু এখনো সম্প্র্ণ ল্প্ত হয় নি বলে আজো য্দ্ধসম্পর্কিত ক্ষেত্রেই সোভিয়েট শিল্প-উদ্যোগের শ্রেষ্ঠতম বিকাশ। কিন্তু মান্ষের নিত্যব্যবহার্য দ্রব্যসামগ্রীর যোগানে কুড়ি বৎসরের মধ্যেই আমেরিকার চেয়ে শ্রেষ্ঠ হতে হবে বলে মিষ্টার ক্রুশ্চভ যে ঘোষণা করেছেন, তার ফলে সমস্ত রকমের শিল্প-উদ্যোগের ক্ষেত্রে এক নবজাগরণের সাড়া পড়ে গিয়েছে। খাদ্যদ্রব্য ছাড়াও পোষাক ও ঘরবাড়ীর অভাব সোভিয়েট রাষ্ট্রে ছিল, কিন্তু বিগত পাঁচ বৎসর যে ভাবে ঘরবাড়ী তৈরী হচ্ছে, স্বদেশের উৎপাদন বাড়িয়ে ও বিদেশ হতে আমদানী করে সমস্ত প্রয়োজনীয় জিনিষের দাবী মেটাবার চেষ্টা দেখা যায়, তাতে আর পাঁচ-দশ বৎসরের মধ্যেই সোভিয়েট নাগরিকের দ্ঃখ কৃচ্ছ্রতার দিন অবসান হবে এ ভরসা তাদের প্রায় সকলের মনেই এসেছে।

কোন জাতির জীবনে যখন জোয়ার আসে, তখন সর্বদিকেই শ্রীবৃদ্ধি ও উৎকর্ষের পরিচয় মেলে। বৌদ্ধ যুগে ভারতবর্ষ কেবল আধ্যাত্মিক সাধনার ক্ষেত্র বলে নয়, রাজসিক শক্তি ও বাণিজ্যিক ঐশ্বর্যের ক্ষেত্রেও পৃথিবীতে বরণীয় হয়ে উঠেছিল। গ্রীক সভ্যতার গৌরবের দিনে গ্রীক প্রতিভা সবদিকেই উৎসারিত হয়েছে, ইসলামের প্রথম যুগে আরব দেশ, এলিজাবেথের যুগে ইংলণ্ড অথবা গ্যেটে শিলারের যুগে জার্মানী সাধনার সকল ক্ষেত্রেই প্রতিষ্ঠা লাভ করেছে। মনে হয় যে সোভিয়েট রাষ্ট্রনেতাদের প্রথম যুগের বহু ভুলভ্রান্তি সত্ত্বেও ব্যাপক শিক্ষার দ্বারা তাঁরা জাতির প্রত্যেক স্তরে সমস্ত মানুষের মধ্যে যে নতুন প্রাণ সঞ্চার করতে চেয়েছিলেন, চল্লিশ বৎসর পরে নতুন শিক্ষায় উদ্বুদ্ধ জাতি আজ তা মর্মে মর্মে অনুভব করছে। বিজ্ঞানের সাধনায় সোভিয়েট রাষ্ট্র আজ বহিঃশত্রুর আক্রমণ-ভয়কে জয় করেছে, আজ বরং আশঙ্কা যে নবশক্তিদৃপ্ত সোভিয়েট রাষ্ট্র অপরকে অবহেলা করার ফলে হয়তো পৃথিবীতে নতুন সংকট দেখা দিতে পারে। কিন্তু আশার কথা এই যে শিক্ষার প্রসারের ফলে সমাজের সকল স্তরেই আজ বিবেচনা করবার মতন লোকের সংখ্যা বেড়ে গিয়েছে। স্টালিনের আমলে যে একনায়কত্ব সম্ভব ছিল, আজ আর তা সম্ভব নয়। শুধু তাই নয়, যে নতুন নেতৃত্ব অনিবার্য ভাবে দেশের শাসনভার ক্রমশ অধিকার করছে, তাদের মধ্যে অধিকাংশই বিপ্লব-পরবর্তী যুগের গোষ্ঠী। তাই পূর্বকালের আশঙ্কা সন্দেহ বা বিদ্বেষ তাদের মনে ততটা সক্রিয় নয়, বৈজ্ঞানিক যুগের দৃষ্টিভঙ্গী দিয়ে তারা নতুন পৃথিবীর সমস্যা সমাধানের সাধনায় উদগ্রীব।

সোভিয়েট জনসাধারণ শান্তিকামী, অন্য দেশের প্রতি বন্ধুত্ব মনোভাবশালী—এবিষয়ে সন্দেহের কোন অবকাশ নেই। দুয়েক সপ্তাহের জন্যও যাঁরা সোভিয়েট রাষ্ট্রে গিয়েছেন, তাঁরাও শান্তির জন্য জনসাধারণের আকুল স্পৃহা উপলব্ধি করেছেন। রাষ্ট্রনৈতিক দৃষ্টি-ভঙ্গীর পার্থক্য, অর্থনৈতিক আদর্শের বৈষম্য ও অনেক ক্ষেত্রে রুষ জীবনদর্শনের অস্বীকৃতি সত্ত্বেও সোভিয়েট রাষ্ট্রে ভারতবর্ষের জন্য যে সম্প্রীতি, পণ্ডিত নেহরুর প্রতি যে গভীর শ্রদ্ধা, সোভিয়েট জনসাধারণের শান্তিকামনার কথা মনে না রাখলে তা বোঝা যায় না। পণ্ডিত নেহরু সোভিয়েট রাষ্ট্রে যে সম্বর্ধনা পেয়েছিলেন, কোন সোভিয়েট রাষ্ট্রনেতার ভাগ্যে তা জোটেনি। মিষ্টার ক্রুশ্চভের ভারতবর্ষে আগমনের পরেই যে সোভিয়েট নীতি বদলাতে সুরু করেছিল, এটাও আকস্মিক নয়। প্রাক-স্বাধীন ভারতবর্ষে সমস্যার অন্ত ছিল না। ১৯১৭ সালে রুষ সাম্রাজ্যের যে অবস্থা, তার তুলনায় ১৯৪৭ সালের ভারতবর্ষ প্রায় প্রত্যেক ক্ষেত্রেই পশ্চাৎপদ, কিন্তু স্বাধীনতালাভের সাত-আট বৎসরের মধ্যে ভারতবর্ষ যতখানি সিদ্ধিলাভ করেছিল, সোভিয়েট রাষ্ট্র স্থাপনের পর কুড়ি বৎসরেও তা সম্ভব হয়নি, সে কথা মিষ্টার ক্রুশ্চভের মতন তীক্ষ্ণধী নেতার দৃষ্টি এড়ায়নি। তিনি আরো লক্ষ্য করেছিলেন যে আভ্যন্তরীণ শ্রেণীসংগ্রাম ও বহিঃশত্রুতা বর্জন করে সকলের সঙ্গে মিত্রতার পথে ভারতবর্ষ চলতে চেয়েছে বলে এদেশে অন্তর্দ্বন্দ্ব বহির্দ্বন্দ্বের তেমন কোন পরিচয় নেই এবং পৃথিবীর প্রায় প্রত্যেক দেশই ভারতবর্ষকে মিত্র হিসাবে গ্রহণ করেছে, ভারতবর্ষের পুনর্গঠনের কাজে ধনবল জনবল দিয়ে সাহায্য করতে চেয়েছে। মিষ্টার ক্রুশ্চভ আরো দেখেছেন যে এদেশের রাজা মহারাজা জমিদার তালুকদারের কায়েমী স্বার্থ লোপ পেয়েছে, কিন্তু তারা বিদ্রোহ না করে মনেপ্রাণে ভারতবর্ষের সেবায় আত্মনিয়োগ করেছে। ভারতবর্ষ থেকে ফেরবার কিছুকাল পরেই মিষ্টার ক্রুশ্চভ ঘোষণা করেন যে যুদ্ধ অপরিহার্য নয়, শান্তির পথে গণ-তান্ত্রিক উপায়ে বিভিন্ন দেশ সমাজবাদী সমাজ প্রতিষ্ঠা করতে পারে, এবং সে সমাজের

রূপও বিভিন্ন দেশের ইতিহাস ও ঐতিহ্যের বিচারে বিভিন্ন হতে বাধ্য।

আজ সমস্ত পৃথিবীর মানুষ চায় যে যুদ্ধের আশঙ্কা চিরদিনের জন্য লুপ্ত হয়ে যাক। বিজ্ঞান আজ মানুষের হাতে যে শক্তি এনে দিয়েছে, সে শক্তির সদ্ব্যবহারে মানুষের সমস্ত অভাব অভিযোগ দূর হয়ে ধরাতলে স্বর্গসম সমাজ প্রতিষ্ঠা আজ মানুষের করায়ত্ত। শক্তি অন্ধ; তাই সেই শক্তির যদি অপব্যবহার হয়, তবে মানবসমাজের ধ্বংস কেউ ঠেকাতে পারবে না। চল্লিশ বৎসরের শিক্ষাসাধনায় আজ সোভিয়েট রাষ্ট্র পৃথিবীর অন্যতম শ্রেষ্ঠ শক্তি। সেই শিক্ষাসাধনার বিকাশে সোভিয়েট নাগরিক যদি আজ সমগ্র বিশ্বসমাজের প্রতি তার যে কর্তব্য, সভ্যতা ও সংস্কৃতি সংরক্ষণ ও সম্প্রসারণে তার যে দায়িত্ব, তা পরিপূর্ণভাবে পালন করে, তবে পৃথিবীর ইতিহাসে সোভিয়েট রাষ্ট্র ও নাগরিকের দান চিরদিন স্বর্ণাক্ষরে লেখা থাকবে।
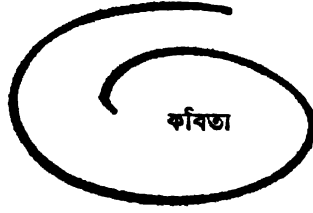
# কিন্নর

**প্রেমেন্দ্র মিত্র**

নদীতে বাঁধানো ঘাট, সে তোমার, আমার, তাদের,
যারা শুধু ধাপে বসে বড় জোর শোভা দেখতে পারে
পূর্ণিমার খ্যাতি রাখতে। নইলে শুধু নৌকোয় বেসাতি
আকণ্ঠ বোঝাই করে ওপারের হাট বুঝে ছাড়ে।

আঘাটায় যায় না সেও। কিন্তু তার পায়ের তলায়
শান-বাঁধানো পইঠাগুলো দুলে ওঠে তরঙ্গে ইচ্ছার,
যেন কি ঠিকানা খুঁজতে যা কখনো পৌঁছোন জানে না।
তার কাছে সব নদী অচিরার সোহাগ সোচ্চার।

সময় শাসিত হোক, ধেনু ধান্যে পূর্ণ হোক ধরা
প্রাণের বিক্রম নিত্য দিগ্বিজয় ছড়াক উল্লাসে।
সে শুধু না নির্বাসিত হয়, যার উঞ্ছতৃপ্ত মন
খোঁজে না আয়ুর উহ্য, ভ্রান্তিকেই সেধে ভালবাসে।

সে কোথাও দেয় না ডুব, নদীতে কি জীবনে, সৃষ্টিতে।
চায় না কিছুরই মানে, শুধু বোঝে মুহূর্ত-মর্মর,
ব্যাখ্যা নয় ব্যঞ্জনাই। প্রপঞ্চে সে স্বেচ্ছা প্রবঞ্চিত,
অবান্তর ক্ষণিকের নিরাসক্ত কামুক কিন্নর।

# চেনা পাথর

**বিষ্ণু দে**

এ পাথরে,
এ জলেও, শুনেছি সেকালে পার্বনে উৎসবে
পুণ্য হত, বিশ্বাসী মানুষ দেখা পেত জাহ্নবীর,
পশ্চিমে যেমন সব পথে রোম মেলে।
শুনেছি এ জলে অন্তিমেও গঙ্গাযাত্রা সাঙ্গ হত
গঙ্গামায়ী হরহর বোমবোম রবে।

অন্তত এটুকু স্থির :
বহুকাল ধরেই নিয়ত এই নদী আমার ঐতিহ্য পরম আত্মীয়,
আত্মীয় এ রৌদ্রেজলে মসৃণ অথচ কঠিন পাথর।
ঢালু পাড়, তিতিরের ঝোপঝাড়, বালি আর পাথরে পাথর,
আর শাল পিয়াল পলাশ পিয়াশাল গম্‌হার শিমুল,
আর পাতার মর্মর আর ফুল আর পাখী, গাছে জলে—
এ নদী চোখের প্রিয়, কাণের প্রাণের
আনন্দ, আরাম, শান্তি।

শৌখীন? তা বটে,
শহরের পলাতক হৃদয়বিলাস— যাতে কটা দিন সভ্যতার ভুলভ্রান্তি—
ক্রমেই যা তীব্র হয়, প্রায় অগোচরে সাপ কিংবা ইঁদুরের মতো,
জীবনসংকটে
যেমনটা হয় অন্নবস্ত্র সবেতেই মূল্যবৃদ্ধি দিনে দিনে—
যাতে কটা দিন সভ্যতার গৃধ্নুতার পাপ
শস্তার টিকিট কিনে
আমাদেরও অংশীদারী অনুতাপ আরামে জানাই
নিসর্গের রূপসঙ্গে, প্রকৃতির মানবিক গুণে।

আমার আত্মীয় এই সজল পাথর,
আজ ডোবে ঘুমের কল্লোলে, কাল জাগে নির্নিমেষে,
গড়ন ধরণ এর চাহনি মেজাজ দেখে শুনে ক্লান্তি নেই,
কখনও নিকষকালো কঠিন কর্কশ পরাজয়হীন,
কখনও ধূসর সহঅবস্থানে কিংবা সহিষ্ণু আবেগে রৌদ্রে থরথর
পিঙ্গল জটার মতো,
অথবা কখনও জ্বলে মধ্যাহ্নের হিলিঅমে হীরকফলনে

তৃতীয় নয়নে যেন দক্ষের যজ্ঞের দিন—এই পার্বতীর দেশে
সাধারণ মানুষের স্মৃতির তো ক্ষান্তি নেই।
শুনেছি, সেকালে ইনিই ছিলেন এ সুব্বার পুণ্যতোয়া খরস্রোত,
বালিতে পাথরে তারপরে
সাত আট পুরুষে নাকি বছরে বছরে
জল কমে, চর পড়ে, কাদা বাড়ে, পাহাড় পর্বত নুয়ে পড়ে ক্ষ'য়ে ক্ষ'য়ে
—যেমনটা অন্নবস্ত্রে টান পড়ে যত চক্রে মূল্য বাড়ে—
গ্রামে তাই কিচ্ছা করে সন্ধ্যায় নির্ভয়ে :
এ নাকি দেশের পাঁচশালা খেসারৎ!

আমার একান্ত প্রিয় এই নদী, ঢালুপাড়, রঙের বাহার, ধ্বনি,
বালি, জল, বনানী, প্রান্তর, সখ্যে বাঁধা পাথর পাহাড়।
আমি দেখি এই চেনা সাতনরী পাথরের গায়ে
বিম্বিত আমারই মন প্রাণ সকালে দুপুরে বিকালে সন্ধ্যায় সারাদিন।
আর স্তব্ধ গ্রাম্য রাত্রে শুনি ক্ষেতের আড়ালে, নক্ষত্রপ্রহরী
সর্বকালে পরাজয়হীন জলস্রোতে পাথরের গান॥

# যেতে যেতে

হরপ্রসাদ মিত্র

কিছু পথ পেরিয়েছি ঘুমোতে ঘুমোতে,
জেগে দেখি হাসিখুশি রোদের চুমোতে—
গাছেরা উঠেছে সেজে সবুজ পাতায়,
শাদা মেঘ জমে আছে নীলের হাতায়,
পাহাড়ের পায়ে পায়ে কয়েকটি গ্রাম
জীবনেও জানবো না কী তাদের নাম!

এদিকে বিষাদ জমে, বিবাদ ঘনায়।
কেবলি ভাঙছে ঘুম জগৎদোলায়।
হীরের আংটি হাতে হিহি জল্লাদ
হাসিতে রেখেছে ঢেকে রাক্ষুসে দাঁত।
হিংসের ঝকমক্ যশের চূড়োয়
সেখানে আদর্শেরা সহজে গুঁড়োয়।

জীবনের এইসব চড়াই তরাই—
খেলনার জৌলুষে ভুলোনো, ভোলাই।
এ জীবন কোনো এক লক্ষ্যের দিকে
চলছে কি? চলছে কি? প্রশ্নটা ফিকে—
মাঝে মাঝে জ্বলে ক্ষীণ, মাঝে মাঝে নেভে;
কোথায় সে মন বলো যে এখানে দেবে—
বাঁচবার বিশ্বাস; মৃত্যুর মানে—
জীবন সফল হবে দানে-প্রতিদানে?

নামহারা স্মৃতি আর কথাহারা রূপ
ঝিলকিয়ে দেখা দেয়, বলে চুপ্, চুপ!

# মন ও মুহূর্ত

## জ্যোতির্ময় রায়

বাবা মারা গেছেন জন্মের কিছুকাল পরেই। বুকে আঁকড়ে ধরে মা বড় করে তুললেন মাত্র দশটি বছর। তারপর তাঁকে চলে যেতে হল। একমাত্র ভাই মহীতোষের দুটি হাত ধরে তাঁর কোলে তুলে দিয়ে গেলেন অনিতাকে। মহীতোষের নিজের সন্তান চারটি। এই চারটি সন্তানকেই ভালমতো মানুষ করে তোলার সংস্থান তাঁর ছিল না। তার ওপর অনিতার দায় এসে পড়লো তাঁর কাঁধে। তবে কিনা দায় যারা নেয় তারা স্বভাবেই নেয়, সংস্থানের কথা ভাবে না। মহীতোষও ভাবলেন না। দিনরাত্রি অসীম পরিশ্রম করে নিজের সন্তান ক'টির সঙ্গে মানুষ করে তুললেন অনিতাকে। মহীতোষের স্ত্রী স্মৃতিকণাও অতি ভালমানুষ। স্বামীর সঙ্গে বিনা দ্বিধায় বুকে তুলে নিলেন অনিতাকে।

মা বাবার কথা খুব একটা মনে পড়ে না অনিতার। প্রতি বছর পড়াশোনায় ভাল ফল করে ধাপের পর ধাপ এগিয়ে চলেছে সে। কিন্তু সংসারের অভাবটা থেকে থেকে যখন তীব্র হয়ে ওঠে বড় কষ্ট হয় তার। সে স্থির করে এম. এ. পরীক্ষাটা দিয়ে একটা ভাল চাকরি নিয়ে মামাকে সাহায্য করবে। মামাকে সে বলেও সে কথা। পিঠে চাপড় দিয়ে হাসতে হাসতে মহীতোষ বলেন, বেশ বেশ, আমি তো বেঁচে যাই তাহলে। মুখে বলেন বটে, কিন্তু মনে অনিতার একটি ভাল বিয়ে দেবার কথাটাই বড় হোয়ে থাকে।

অনিতা রীতিমতো সুন্দরী। তার ওপর স্বভাবটিও হোয়েছে শান্ত মধুর। স্মৃতিকণা বলেন, এ মেয়ে যে সংসারে যাবে, সেখানে সকলকে সুখী করতে পারবে। নিজেও সুখী হবে। তা ছাড়া বিয়ে দিয়ে সুন্দর একটি সংসার গড়ে দিতে না পারলে এতদিন এত কষ্ট করে বড় করে তোলার সার্থকতাই বা কোথায়?

মহীতোষ অনিতার জন্যে সুপাত্রের সন্ধানে লেগে যান। অনিতাকে এ বিষয়ে কিছু বলবার প্রয়োজনবোধ করেন না তাঁরা। কারণ তাঁরা জানেন অনিতা কখনো তাঁদের অবাধ্য হবে না।

পাত্র একটি পাওয়া গেল। মহীতোষের অবস্থা অনুযায়ীও বটে। দাবীদাওয়া কিছুই নেই। এম. এ. পাশ ছেলে। ব্যবসা ক'রে ভালই উপায় করছে। সংসার বলতে দুটি মাত্র ভাই। নির্ঝঞ্ঝাট।

মহীতোষ দিন স্থির করলেন অনিতাকে একদিন দেখে যাবার।

সারা দুপুর বসে সাধ্যমতো অতিথি আপ্যায়নের ব্যবস্থা করলেন স্মৃতিকণা।

প্রথমটা ঠিক ধরতে না পারলেও পরে অনিতা সবই বুঝতে পারলো। কিন্তু মামা যা স্থির করেছেন, তার ওপর কিছু বলার কথা সে ভাবতে পারে না। নতুন একটা জীবনে তাকে ঢুকতে হবে এই চিন্তার অস্বস্তি নিয়ে কাটিয়ে দিলো দুপুরটা।

বিকেল না হতেই আলমারী খুলে ভাল একখানা শাড়ী বার করে দিয়ে মামী বললেন, —মুখ হাত ভাল ক'রে ধুয়ে কাপড়টা পাল্টে নে। তোর মামার কাছে একজন আসবেন, তোর সঙ্গে আলাপ করতে।

মামীর বলার ধরনে মনে মনে একটু হাসলো অনিতা। তারপর তাঁর কথামতো

সামান্য একটু প্রসাধন সেরে তৈরী হ'য়ে নিলো সে। বারো বছরের মামাতো বোন হাসি হঠাৎ কোত্থেকে ছুটে এসে জড়িয়ে ধ'রে কানে কানে বললো, দিদিরে, তোর বিয়ে! বলেই হাসতে হাসতে ছুটে পালালো।

হাসির মুখে কথাটা শোনামাত্র বুকটা কেমন একবার দুলে উঠলো অনিতার। 'বিয়ে' শব্দটার একটা স্বাদ আছে, এটা যেন মুহূর্তে মনের ওপর দিয়ে পার হোয়ে গেলো একবার। নাঃ সময় যতই এগোচ্ছে বুকটা কেমন যেন করছে। অন্যমনস্ক হবার জন্যে একটা বই খুলে বসলো অনিতা।

কিছুক্ষণের মধ্যে হন্তদন্ত হোয়ে তার সামনে দিয়ে মহীতোষ এগিয়ে গেলেন রান্নাঘরের দিকে স্ত্রীকে খবর দিতে, ভদ্রলোক এসেছেন।

চা জলখাবার ট্রেতে ভাল করে সাজিয়ে ছোক্‌রা চাকরের হাতে দিয়ে বাইরের ঘরে পাঠিয়ে দিলেন স্মৃতিকণা।

মহীতোষ এসে অনিতাকে ডাকলেন,—আয় আমার সংগে।

কলেজে ছেলেদের দেখেছে প্রতিদিন। কথাবার্তা না হোয়েছে এমনও নয়। কিন্তু অনিতা বরাবরই রীতিমতো একটা দূরত্ব রেখে চলেছে তাদের সংগে। কোনো কিছুর সংগে জড়িয়ে প'ড়ে মামাকে বিব্রত করার কথা ভাবতে পারেনি সে। আজ এ একটা নতুন অভিজ্ঞতা হবে।

মামার পেছন পেছন অনিতা গিয়ে ঢুকলো বাইরের ঘরে।

তাদের ঢুকতে দেখেই চেয়ার ছেড়ে উঠে দাঁড়ালো ভদ্রলোকটি। হাত তুলে নমস্কার করলো অনিতাকে, প্রত্যভিবাদন জানাতে গিয়ে মুহূর্তের জন্যে যেন থম্‌কে গেলো অনিতা। ভদ্রলোক সোজা তাকিয়ে আছে তার চোখের দিকে। দৃষ্টিটা একটু তীক্ষ্ন, মনে হয় ভেতরটা পর্যন্ত দেখে নিচ্ছে। কিন্তু—কিন্তু কি অপরূপ চেহারা! ব্যক্তিত্বের সংগে এমন রূপ অনিতা আর দেখেনি কোথাও।

—আয় বোস ওখানে। লোকটির মুখোমুখি বেতের চেয়ারটা দেখিয়ে দিলেন মামা। —বসো হে সুরজিৎ।

মামার কথামতো ধারে এগিয়ে গিয়ে বসলো অনিতা।

অনিতা বসলে পর সুরজিৎ বসলো।

কয়েক মুহূর্ত সবাই চুপচাপ। মহীতোষ বুঝলেন এ সব প্রশ্নোত্তরের জন্যে খানিকটা সহজ অবকাশের প্রয়োজন। তাই তিনি উঠে দাঁড়িয়ে বললেন, —তোমরা আলাপ সালাপ করো, আমি আসছি একটু ভেতর থেকে। অনী, তুই চা-টা ঢেলে দে। চলে গেলেন মহীতোষ।

অনিতা হাত বাড়িয়ে টি পটটা নিলো। রোজ সে-ই বাড়ীর সবাইকে চা করে খাওয়ায়। আজ হাতটা এমন কাঁপছে কেন! ফিফ্‌থ্‌ ইয়ারে পড়ে সে। একজন ভদ্রলোকের সামনে বসে এভাবে ঘামছেই বা কেন! নিজের ওপরেই রাগ হয় অনিতার। কেন সে বেশ সহজ হোতে পারছেনা? আর প্রথম দেখেই মানুষটিকে এমন ভালই বা লাগছে কেন! তবে কি বিয়ের জন্যে মনটা তার প্রস্তুতই ছিলো! জোর করে নিজেকে একটু সামলে নিয়ে চা ঢেলে এগিয়ে দিলো সে সুরজিতের সামনে।

সুরজিৎ আর একবার তীক্ষ্নদৃষ্টি বুলিয়ে নিতে গেলো অনিতার মুখের ওপর দিয়ে, সেই মুহূর্তেই অনিতাও তাকালো চোখ তুলে। উভয়ের দৃষ্টি মিলিত হলো। অনিতা

চোখ নামিয়ে নিলো।

—আপনার বুঝি আরও পড়বার ইচ্ছে ছিলো? অনেকই তো পড়েছেন, আর কি দরকার, চাকরি তো আর করতে যাচ্ছেন না।

মুখে মৃদু হাসি টেনে খুবই স্বচ্ছন্দ আর সুন্দরভাবে কথা বলছে সুরজিৎ। শুনতে ভাল লাগছে অনিতার।

—চাকরিই করবো ভেবেছিলাম। খুবই ছোট থেকে মামা কত কষ্টের ভেতর দিয়ে মানুষ করলেন। তাঁর সংসারে কিছু কাজে লাগবো এই ছিল ইচ্ছে।

—তা সে তো বিয়ে করেও কাজে আপনি লাগতে পারেন। আপনি অর্থের কথা যদি বলেন, তো আমি কথা দিচ্ছি সেদিক দিয়ে কোনো অসুবিধেই হবেনা আপনার।

'আমি' কথাটার ওপর বেশ একটু জোর দিলো সুরজিৎ।

অনিতার মনটা কেমন কৃতজ্ঞ হোয়ে উঠলো লোকটির সম্পর্কে। আর কোনো কথাই সে বললো না।

সুরজিৎও নীরবে খাওয়া শেষ করে বললো,—আচ্ছা, আর আপনাকে আটকে রাখবো না। আপনি গিয়ে মামাকে একটু পাঠিয়ে দিন।

অনিতা দু'হাত তুলে নমস্কার জানিয়ে ধীর পায়ে ভেতরে চলে গেলো।

মহীতোষের সঙ্গে কথা পাকা করে চলে গেলো সুরজিৎ।

দশদিন পর বিয়ে।

মহীতোষ সাধ্যমতো কেনাকাটি সুরু করলেন। সুরজিৎ বিশেষ জোর দিয়ে বলে গেছে, নেহাৎ আত্মীয়ের মধ্যে যাদের না বললেই নয়, তাদের ডেকে খুবই সংক্ষেপে বিয়েটা যেন সারা হয়। বরযাত্রীও আসবে মোট আটজন। অনিতার আড়ম্বরহীন বিয়ের কষ্ট সে পুষিয়ে দেবে বৌভাতের আয়োজন দিয়ে।

তাঁর এত আদরের অনিতার জন্যে এমনি একটি পাত্র পাবেন মহীতোষ ধারণাই করতে পারেন নি।

আর এই দশটা দিন অনিতার যে কি করে কাটলো সে নিজেই জানে না। বইতে মন বসে না। রাতে ঘুম হয় না। একটি মুখ, কয়েকটি কথার টুক্‌রো এই যেন ভরিয়ে রেখেছে তার মন, কান।

আজ অনিতার বিয়ে। সকালে বিস্তৃত আয়োজন নিয়ে বিরাট অধিবাস এলো অনিতার। আত্মীয়স্বজন ভাইবোন সবাই হৈ হৈ করতে লাগলো।

সংক্ষিপ্ত আয়োজনের মধ্যেও সানাইটা বাদ দেন নি মহীতোষ। সানাই-এর চেরাকণ্ঠে আশাওরীর অতুলনীয় মাধুর্য আর বাড়ীর সবার আনন্দের মাঝে ব্যস্ত হোয়ে হুটোপুটি করছেন মহীতোষ আর স্মৃতিকণা।

পাশেই বাড়ীওয়ালার দোতলা বাড়ী। তাঁর ছাদটি আজকের জন্যে মহীতোষকে ছেড়ে দিয়েছেন সদাশয় বেণীমাধববাবু। তারই একটা ভাগে বিয়ের আসর করা হোয়েছে, বাকী অংশে খাওয়ার ব্যবস্থা।

অনিতার কলেজের পাঁচটি বান্ধবী এসেছে সন্ধ্যার একটু আগে। নানা পরামর্শের পর সবাই মিলে এটা-ওটা করে রাজরানীর মতো সাজিয়ে তুললো অনিতাকে। একজন গিয়ে ব্যস্ত স্মৃতিকণাকে হাত ধরে টেনে এনে দেখালো কেমন হয়েছে সাজ।

স্মৃতিকণা অনিতার চিবুকটা তুলে ধরে মুগ্ধচোখে কিছুক্ষণ তাকিয়ে থাকতে থাকতে

ঝর্‌ঝর্‌ করে কেঁদে ফেললেন। অনিতার চোখদুটিও জলে ভরে উঠলো। বন্ধুরা পরিস্থিতিটি তরল করতে হৈ হৈ করে উঠলো। —এই এই, মামীমা দিলেন তো কাঁদিয়ে, সব পাউডার উঠে যাবে, কাজল নষ্ট হোয়ে যাবে।

ওদের কথার ধরনে হেসে ফেললেন স্মৃতিকণা। চোখ মুছে ব্যস্তপায়ে চলে গেলেন নিজের কাজে।

হঠাৎ জোরে সানাই বেজে উঠলো সঙ্গে সঙ্গে শঙ্খ, উলুধ্বনি আর বর এসেছে, বর এসেছে শুনে দুদ্দাড় করে অনিতার বন্ধুরা ছুটলো বাইরে অনিতাকে একা রেখে।

আর বুকটা জোরে জোরে ধক্‌ ধক্‌ করতে সুরু করলো অনিতার। বরবেশী সুরজিতের চেহারা ভেসে উঠলো কল্পনায়। আনন্দে, একটা অজানা ভয়ে অনিতা যেন চেতনার বাইরে চলে গেলো।

—ওমা গো, কি চমৎকার দেখতে হোয়েছে রে তোর বর! বন্ধুরা খুসীতে উচ্ছল হোয়ে ছুটে এসে জড়িয়ে ধরলো অনিতাকে।

তপতী বললা, —হ্যাঁ ভাই আমরা ছ'জন মিলে বিয়ে করতে পারিনা তোর বরকে? আমি যাই, মামাবাবুকে বলি গিয়ে। এমন গম্ভীরভাবে কথাটা বললো সে, যে সবাই হেসে গড়িয়ে পড়লো।

ব্যস্তভাবে কয়েকজন বর্ষীয়সী আত্মীয়া এসে ঢুকলেন ঘরে। একজন বললেন, —চলো মা, তোমরা ওকে নিয়ে ও বাড়ীতে চলো।

বিয়ের অনুষ্ঠানের মধ্যে তীব্র ইচ্ছে সত্ত্বেও অনিতা কিছুতেই মুখ তুলে তাকাতে পারলো না। কি যেন একটা পরম ভাললাগার জিনিসকে সে সযত্নে বাঁচিয়ে রাখছে একান্তে উপভোগ করবে বলে।

এলো শুভদৃষ্টির পালা। পাত্‌লা একটা বেনারসী ওড়নার চারটে কোন্‌ চারজন এয়োতে মিলে টেনে ধরলো বর-বধূর মাথার ওপর দিয়ে। চারিদিকে ঘিরে রয়েছে আত্মীয়, আত্মীয়া ও নিমন্ত্রিতেরা। এক কোণে থোকা বেঁধে ঝুঁকে রয়েছে বন্ধুদের পাঁচটি মুখ। মহিলাদের মধ্যে থেকে বয়স্কারা দুচারজন বর-বধূকে বলছেন, —তাকাও তাকাও, চোখ তুলে ভাল করে চাও।

ধীরে টানা দুটি চোখ তুলে মুখোমুখি দাঁড়ালো মানুষটির চোখের দিকে তাকালো অনিতা। একি! বিস্ময়ে বেদনায় কাঠ হোয়ে গেলো অনিতা। দম আটকে আসছে তার, কি করবে সে, মাথা ঝিম্‌ঝিম্‌ করছে—অজ্ঞান হয়ে যাবে নাকি? এক লহমায় যাকে দেখলো অনিতা, এ তো সে নয়। ভারী ছেলেমানুষী এর মুখের ভাব। টকটকে রঙ। পাত্‌লা লাল ঠোঁট দুটিতে ফুটে আছে একটু হাসির ভাব। তাকিয়ে আছে সে অনিতার দিকে। চোখের দৃষ্টিতেও ছেলেমানুষী ভরা।

সে কই! দশটা দিন ধরে দিনরাত যার কথা ভেবেছে অনিতা। এ কে! মুখের ভাবটা একেবারে উল্টো হলেও চেহারায় খুবই মিল আছে তার সঙ্গে। তবে কি সুরজিত তার ভাইয়ের জন্যে তাকে দেখতে এসেছিল? কেন সে কথাটা তাকে আগে কেউ জানালো না?

এত কথা যে পরিচ্ছন্ন মতো ভাবতে পেরেছে অনিতা তা নয়। কারণ ঠিক ঠিক কিছু ভাববার মতো মনের অবস্থা তার ছিল না। ও ধরনের আবছা কতগুলো ধারণা ঝড়ের বেগে তার মনের ওপর দিয়ে পার হয়ে গেলো মাত্র।

এর পর কখন কি ভাবে বাসর ঘরে গিয়ে সে বসেছে, কিছুই তার স্পষ্ট মনে পড়ে না।

কিন্তু যা হবার তা ঘটে গেছে। জীবনের এই গুরুতর অধ্যায়কে মেনে নেওয়া ছাড়া কোনো উপায় নেই। অনিতাও মেনে নেবে, মন থেকে ক'টা দিনের অপেক্ষমান আকাঙ্ক্ষাকে সম্পূর্ণভাবে মুছে ফেলে। জোর করে মনটা প্রস্তুত করতে চেষ্টা করলো অনিতা। আশ্চর্য, বিয়ের চিঠিটাও সে দেখলো না একবার। তাহলে তো আজ আচম্‌কা এমন আঘাতটা তাকে পেতে হতো না।

বন্ধুরা সুকুমারকে নিয়ে নানা রকম ঠাট্টা সুরু করেছিলো সুকুমারও পাল্টা তাদের এমনই জব্দ করতে লাগলো, যে হেসে হেসে তারা এ ওর গায়ে গড়িয়ে পড়লো।

মামী এসে বললেন, —ওরে এবার তোরা ওদের ছেড়ে দে। আর একটু দুষ্টুমি করে বিদায় নিলো তারা।

সসম্ভ্রমে সুকুমার জিজ্ঞেস করলো, —আচ্ছা, দাদা কি চলে গেছেন?

—না বোধহয়, আমি দেখছি—বলে মামী পেছন ফিরেই—এই যে—বলে মাথার কাপড়টা একটু টেনে সরে গেলেন।

এগিয়ে এলো সুরজিৎ। —চলিরে সুকু, কাল বিকেল চারটের সময় গাড়ী পাঠাবো। বৌ নিয়ে যাবি।

সুকুমার দাদাকে প্রণাম করলো। বেশ কিছুক্ষণ তার মাথায় হাত রেখে দাঁড়ালো সুরজিৎ। প্রাণহীন কলের পুতুলের মতো এগিয়ে গেলো অনিতা। প্রণাম করলো সুরজিৎকে। আল্‌তোভাবে তার মাথায় হাত রেখে অস্ফুটকণ্ঠে আশীর্বাদ করলো সুরজিৎ।

মহীতোষের ছোট বাড়ীটিরই একটা ঘরে সাজিয়ে গুছিয়ে বাসর করা হোয়েছে।

রাত প্রায় দেড়টা বাজে। খাটে বসে আছে অনিতা।

হাতের সিগারেটটা ফেলে দিয়ে হাসিমুখে পাশে এসে বসলো সুকুমার।

—কথা বলবেনা?

—কি বলবো?

—সত্যি, কি যে বলা যায় আমিও ভেবে পাচ্ছি না কিছু। কিন্তু খুব ইচ্ছে করছে বলতে অনেক কথা। তবে একটা কথা বলতে পারি, দাদা আমার জন্যে প্রায় রাজকন্যে খোঁজার মতো বেরিয়ে ছিলেন, বৌ খুঁজতে। অনিতার হাতের ওপর হাত রেখে বললো, আর সত্যিই আমি তাই পেয়েছি। তুমি কি বলো, ঠিক না?

সরলভাবে বলে যাওয়া সুকুমারের কথাগুলো শুনে মৃদু হাসলো অনিতা। বললো, —আমার সম্পর্কে অতবড় ধারণা আমি কি করে করবো? আপনি সুখী হলেই আমি সার্থক।

—আপনি! না ওসব চলবে না, তুমি বলো। এক্ষুণি বলতে হবে, নইলে আমি তোমার সাজ নষ্ট করে দেবো। অনিতার মাথার কাপড়টা টেনে ধরলো সুকুমার।

অনিতা তার ছেলেমানুষী দেখে হেসে ফেললো। —আচ্ছা আচ্ছা, তুমি। কি একটু ভেবে নিয়ে বললো, —আচ্ছা, আমাকে দেখতে তুমি আসোনি কেন?

—তা কি হয়? দাদা থাকতে আমি আসবো আমার জন্যে কনে দেখতে? দাদার কথা বলতে গিয়ে সুকুমারের ছেলেমানুষী ভাবটা চলে গেলো। একটু চুপ করে থেকে বললো সে, —দাদার সম্পর্কে একটা কথা তোমাকে আমার বলবার আছে। তোমার মামা

সবই জানেন। তোমারও জানা দরকার। মা মারা যাবার কয়েক মাসের মধ্যেই ধরা পড়লো দাদার টি. বি.। চিকিৎসার কিছুই বাকী রাখলেন না বাবা। জলের মতো অর্থ ঢেলে গেলেন। চার বছর ভুগে দাদা সেরে উঠলেন, কিন্তু এত বড় আঘাতটা বাবা সইতে পারলেন না। অল্প কয়েক দিনের মধ্যেই মারা গেলেন। দাদার বেশী খাটুনি সইবে না বলে বাবার কারবার সব আমিই দেখি। যদিও উনি এখন একেবারেই ভাল হোয়ে গেছেন, ডাক্তার বলেন বিয়েও করতে পারেন। কিন্তু তা তিনি করবেন না। অসুখটা নিয়ে একটা বাতিকের মতো দাঁড়িয়ে গেছে। প্রত্যেক তিনমাস অন্তর ডাক্তার দেখানো, ওষুধ খাওয়া, যত রকম সাবধানতা আছে সবই এখনও একইভাবে মেনে চলেন। আমি ছাড়া এতবড় স্নেহের পাত্র তাঁর নেই। তুমি দাদাকে যত্ন করবে। তাঁর সমস্ত ভার হাতে তুলে নেবে, এই আমি চাই।

দম বন্ধ করে অনিতা শুনলো সুরজিতের সব কথা। মাথা হেলিয়ে জানালো সুকুমার যা বলছে, সে তাই করবে।

অল্প কয়েক দিনের মধ্যেই সুকুমার তার মিষ্টি সুন্দর স্বভাবে আর ছেলেমানুষী দুরন্তপনায় সম্পূর্ণভাবে জয় করে নিলো অনিতাকে। অনিতা সত্যিই সুখী হয়েছে। সুরজিতের সব রকমের সেবা যত্নের ভার সে হাতে তুলে নিয়েছে। রাত্রে নটায় শুয়ে পড়ে সুরজিৎ। তার আগে কিছুক্ষণ বই পড়ার অভ্যাস। অনিতা আসার পর থেকে সেই পড়ে শোনায়, সুরজিৎকে নিজে পড়তে দেয় না। দুটো থেকে তিনটে পরিচ্ছেদ পড়া হলে একগ্লাস জল খেয়ে শুয়ে পড়ে সুরজিৎ। মশারী ফেলে গুঁজে দিয়ে, বাতি নিভিয়ে চলে আসে অনিতা নিজের ঘরে। দুটি ঘরের মাঝে মস্ত দরজাটা আস্তে ভেজিয়ে দেয়।

সংসারের এদিকটা কাটে এমনি ঠাণ্ডা ভাবে। কিন্তু অন্যদিকে সুকুমারের দৌরাত্ম্যে এক এক সময় হয়রান হোয়ে পড়ে সে। হয়তো বা স্নান সেরে চুল আঁচড়াচ্ছে অনিতা ড্রেসিং টেবিলের সামনে দাঁড়িয়ে, কোত্থেকে চুপিচুপি এসে ঝপ করে দু হাতে অনিতার পাত্‌লা শরীরটা পাঁজকোলা করে তুলে নিয়ে রওনা হবে খাবার ঘরের দিকে।

ছট্‌ফট্‌ করে অনিতা, —আঃ কি হচ্ছে, ছেড়ে দাও লক্ষ্মীটি, চাকর বাকর ভাববে কি?

—কি আবার ভাববে, তুমি আমার বৌ না? সহজকণ্ঠে জবাব দেবে সুকুমার।

খেতে বসে নিজের যেটা ভাল লাগবে, একহাতে জড়িয়ে ধরবে অনিতাকে অন্য হাতে জোর করে দেবে সেটা অনিতার মুখে গুঁজে। একদিন তো বুড়ো চাকর শশীর সামনেই এই কাণ্ড। লজ্জায় অনিতা কি করবে ভেবে পায়না। ভৃত্যটিই বাঁচায় তাকে। সুকুমারকে কোলে পিঠে করে মানুষ করেছে সে। বলে, তুমি লজ্জা পেওনি বৌমা, আমার ছোট্‌দাবাবু চিরকাল, ওই এক রকম। ছোট থাকতে আমাকেই কম জ্বালিয়েছে!

রাত্রে সুরজিৎ বিছানায় বসেছে বালিশে হেলান দিয়ে। খাটের পাশে গদীমোড়া চেয়ারে বসে একটা বিখ্যাত ইংরিজী উপন্যাস পড়ে শোনাচ্ছে অনিতা। জোর করে বইয়ের মধ্যে চোখ গুঁজে থাকে অনিতা। সে যেখানে বসে সেখান থেকে দরজা দিয়ে তাদের ঘরের মাঝামাঝি বসানো সুকুমারের ইজিচেয়ারটা দেখা যায়। সুরজিতের দৃষ্টি এড়িয়ে মুহূর্তের জন্যেও যদি তার চোখটা সে দিকে যায় তো দেখবে সে, তার দিকে তাকিয়ে কতরকমই না ভঙ্গী করছে সুকুমার। কখনও মস্ত হাই তুলে তুড়ি দিচ্ছে, কখনও হাতের ভঙ্গী করে ডাকছে, কখনও বা আর কিছু।

ঘরে ঢুকে কপট রাগে ফেটে পড়ে অনিতা। —তুমি অমন করলে আর আমি দাদাকে

বই পড়ে শোনাবো না। এমন একটা দুঃখের জায়গা পড়ছিলাম। তোমার কাণ্ড দেখে হাসি চাপতে গিয়ে প্রাণ বেরোয় আর কি। একদিন হেসে ফেললে কি কেলেঙ্কারীটাই হবে বলতো?

অনিতা কথা সুরু করার সঙ্গে সঙ্গেই ভীষণ ভালমানুষী মুখের ভাব করে চেয়ারে উঠে একটু ঝুঁকে বসেছিলো সুকুমার। কথা শেষ হতেই পাখার হাওয়ায় উড়তে থাকা অনিতার শাড়ীর আঁচলটা ধরে এমন একটা হ্যাঁচকা টান দিলো, আচম্‌কা টাল সামলাতে না পেরে হুড়মুড় করে অনিতা পড়ে গেলো একেবারে সুকুমারের গায়ের ওপর। ততক্ষণে ওকে বুকের ওপর চেপে ধরেছে সুকুমার।

ছাড়া পেয়ে হাঁপাতে হাঁপাতে অনিতা বলে, —জন্মে দেখিনি বাবা এমন ছেলেমানুষ। মুখ গম্ভীর করে সে, —আচ্ছা, তোমার কি বয়স টয়স হবেনা কোনোদিনই?

চট্‌ করে নীচের ঠোঁটটা ভেতর দিকে ঠেলে বুড়ো মানুষের ভঙ্গী করে কাঁপা কাঁপা গলায় বলে ওঠে সুকুমার, —চলো গো খেতে চলো।

খিল খিল করে জোরে উঠেই অনিতা তাকায় দরজাটার দিকে। ও ঘরে সুরজিৎ ঘুমিয়ে পড়েছে কিম্বা পড়েনি, এত জোরে হাসা ঠিক হল না।

কিছুদিন ধরে অনিতার মনে হচ্ছে সুকুমার আর তাকে একসঙ্গে খুব হাসতে দেখলে বা একটু ঘনিষ্ঠভাবে কথা বলতে দেখলে সুরজিৎ যেন মুহূর্তের জন্যে একটু গম্ভীর হয়ে যায়। সুকুমারও লক্ষ্য করেছে নিশ্চয়ই। কারণ যত ছেলেমানুষীই করুক, দাদার সম্পর্কে নজরটা তার সব সময়ই সজাগ থাকে। একদিন বলেওছে অনিতাকে, —আমাদের জীবনটা দেখে দাদার বোধহয় বিয়ে করতে ইচ্ছে হয়, কিন্তু করবেন না। ভারী কষ্ট হয় ওঁর কথা ভেবে।

কদিন ধরে অফিসের একটা কাজ নিয়ে বড় বেশী ব্যস্ত হোয়ে পড়েছে সুকুমার। বাড়ী ফিরতে প্রায়ই নটা-দশটা বেজে যায়। আজও সুরজিৎ এসে জানালো সুকুমারের ফিরতে দেরী হবে। নিজের একটা কাজে সুরজিতকে যেতে হয়েছিলো সুকুমারের অফিসে দুপুর বেলা।

প্রতিদিনের মতো আজও সুরজিৎ আগেই খেয়ে নিলো। সামনে বসে যত্ন করে খাওয়ালো অনিতা।

সুরজিৎ এসে বসলো খাটে বালিশে হেলান দিয়ে। চেয়ার টেনে অনিতা বসলো বই নিয়ে। কিছুদূর পড়া হতেই বাধা দিলো সুরজিত, —থাক্‌, আজ আর পড়া ভাল লাগছে না।

অনিতা বই বন্ধ করে তাকালো তার দিকে। জানলার দিকে চেয়ে অন্যমনস্কভাবে কি যেন ভাবছে সুরজিৎ।

হঠাৎ ভারীগলায় বললো, —আলোটা নিবিয়ে দাও অনিতা।

বিস্মিত দৃষ্টিতে তার দিকে তাকালো অনিতা। এ কি বলছে সুরজিৎ!

—আলোটা নিবিয়ে দাও। আবার বললো সুরজিৎ।

তার এই কণ্ঠস্বরকে অমান্য করা অনিতার পক্ষে সম্ভব হল না। বই রেখে সুইচটা বন্ধ করে দিয়ে সেখানেই সে একটু থামলো। কি করবে কিছু ভেবে পাচ্ছে না।

—চেয়ারটা টেনে ওই জানলার সামনে বসো।

পূর্ণিমার চাঁদের আলো জানলা দিয়ে এসে পড়েছে খাট অবধি।

অনিতা যন্ত্রচালিতের মতো চেয়ার টেনে জানলার সামনে বসলো।

—তুমি গাইতে জানো?

—সামান্য। নিজে থেকে যেটুকু শেখা—তাই।

—গাও তো একটা—

খুবই নীচু গলায় মিষ্টি স্বরে গান গাইলো অনিতা।

গান শেষ হলে সুরজিৎ বললো, —সিগারেটের টিনটা কাছে এগিয়ে দাও।

—আপনি আর সিগরেট খাবেন? সাবধান করার জন্যেই কথাটা বললো অনিতা, কিন্তু এগিয়ে দিলো টিন, লাইটার, ছাইয়ের বাটি।

—খাই একটা। বেশ ভাল লাগছে। সিগরেট ধরিয়ে ধীরে ধীরে দুটো টান দিয়ে গভীর কণ্ঠে ডাকলো সুরজিৎ, —অনিতা!

অনিতার বিস্ময় শুধু বাড়ছেই। আজ সুরজিতের এ কি ভাব! চুপ করে সে অপেক্ষা করে রইলো কিছু শোনার জন্যে।

—অনিতা, একটা কথা জিজ্ঞেস করবো, সত্যি জবাব দেবে?

—আপনার কাছে আমি অসত্য বলতে পারি না। কি বলছেন বলুন? চাঁদের আবছা আলোয় সুরজিতকে যেটুকু দেখা যাচ্ছে সেদিকে জিজ্ঞাসু দৃষ্টি মেললো অনিতা।

—আমি যেদিন তোমাকে দেখতে গেলাম, সেদিন আমাকেই তুমি পাত্র বলে মনে করেছিলে, তাই না?

উঃ, এ কি করছে সুরজিৎ! যে কাঁটাটা কত চেষ্টায়, কত যত্নে মনের কোন্ অতলে ঠেলে রেখেছিলো সে, কেন সেটা অমন নিষ্ঠুরের মতো টেনে বার করে আনতে চাইছে সুরজিৎ?

--কই কিছু বলছো না যে, জবাব দাও আমার কথার।

—আপনি যা বলছেন তা সত্য।

—হুঁ, একটা নিঃশ্বাস ফেললো সুরজিৎ। বললো, —আমি কখনো বিয়ে করবো না এইটাই স্থির। কিন্তু তোমাকে দেখে প্রথম আমার সেদিন মনে হোয়েছিলো, জীবনে একটা মস্ত দিক থেকে আমি বঞ্চিত রয়ে গেলাম।

সুরজিতের কথায় আর স্বরে কি ছিল কে জানে, দু হাতে মুখ ঢেকে কেঁদে ফেললো অনিতা।

তার নীরব কান্না মন দিয়ে অনুভব করলো সুরজিৎ। স্তব্ধভাবে সিগরেটে টানের পর টান দিয়ে চললো সে।

একটু শান্ত হোয়ে চোখ মুছে উঠে দাঁড়ালো অনিতা। ধীর পায়ে এগিয়ে যেতে যাবে, বাধা দিলো সুরজিৎ।

—এদিকে এসে এখানে বোসো। খাটে তার পাশটা দেখিয়ে দিলো। —আমার কথা শেষ হয়নি অনিতা।

অনিতা বসলো।

সুরজিৎ বলে চললো, —কেন আজ তোমাকে নিজের কথাটা এ ভাবে বললাম বা, তোমার সম্পর্কে যা বুঝেছিলাম সেটা সত্যি কিনা জানতে চাইলাম, জানো?

মুখ তুলে তাকালো অনিতা।

—কারণ, বেশ কিছুদিন থেকে আমার মনের ওপর এই কথাগুলো বড় বেশী করে চেপে বসতে চাইছে। জেনে ও জানিয়ে একটু হাল্কা হওয়া, এর বেশী আর কোনো প্রত্যাশা আমার নেই। ধীরে হাতটা আড়াআড়ি করে রাখলো সে চোখের ওপর। তারপর অনেকটা আপন মনেই বলে চললো, —নইলে কে জানে হয়তো এরই চাপে আবার তারা বুকে বাসা বাঁধবে, কুরে কুরে খেয়ে ঝাঁঝ্‌রা করে দেবে বুকের ভেতরটা—

—না না না, আর্তনাদ করে উঠলো অনিতা। আর সংগে সংগেই নিজের ঘরের দিকে নজর পড়তেই চম্‌কে উঠলো সে।

অন্ধকার ঘরে আবছা চাঁদের আলোয় দেখা গেলো ইজিচেয়ারে সাদা ট্রাউজার পরা একটা পা আর একটা পায়ের ওপর তোলা। হাতের সিগরেটটা ঘন ঘন জ্বলে উঠছে দপ্‌ দপ্‌ করে।

ধীরে উঠে দাঁড়ালো অনিতা, —আলোটা জ্বালি?

—জ্বালো। শুয়ে পড়লো সুরজিৎ।

আলো জেলে, মশারী ফেলে আবার আলো নিভিয়ে দিয়ে আস্তে দরজাটা টেনে নিয়ে নিজের ঘরে এসে দাঁড়ালা অনিতা। জ্বাললো আলো। ক্লান্ত দুটি চোখ তুলে তাকালো সুকুমারের দিকে।

চোখ বুজে স্তব্ধ পাথরের মতো বসে আছে সুকুমার।

অনিতা গেলো স্নানের ঘরে। চোখ মুখ ধুয়ে মুছে এসে দাঁড়ালো ইজিচেয়ারের পাশে। মৃদুকণ্ঠে জিজ্ঞেস করলো, —কখন এলে?

তার কথার কোনো উত্তর না দিয়ে নীরবে উঠে দাঁড়ালো সুকুমার। কাপড় বদলে স্নান সেরে এলো। অনিতা কিছু বলতে চাইছে বুঝেও তাকে কোনো সুযোগ দিলো না। সোজা গিয়ে ঢুকলো খাবার ঘরে।

অনিতা বাধ্য হল তাকে অনুসরণ করতে।

অনিতা কিছুই খেতে পারলো না, লক্ষ্য করলো সুকুমার, কিন্তু বললো না একটি কথাও।

ঘরে এসে সুকুমার গিয়ে শুয়ে পড়লো একপাশ ফিরে।

খাটে এসে বসলো অনিতা, —তুমি কিছু জানতে চাইবে না, কিছু জিজ্ঞেস করবে না?

—কিছু বলবার থাকলে বলো, শুনছি। প্রাণহীন শুক্‌নো গলা সুকুমারের।

গড় গড় করে বলে গেলো অনিতা সন্ধ্যার পুরো ঘটনা, একটি শব্দ বাদ না রেখে।

খাটের ওপর উঠে বসলো সুকুমার। বেশ কিছুক্ষণ নীরবে বসে থেকে কি একটু মনে করে নিয়ে নিজের মনেই যেন বললো, —ও তাই বিয়ের রাত্রে জিজ্ঞেস করেছিলে আমি নিজে তোমাকে দেখতে যাই নি কেন?

আর্ত চাপা কণ্ঠে অনিতা বলে উঠলো, —কিন্তু সত্যিই কি আমি অপরাধ কিছু করেছি? বলো বলো, তুমি বলো—কেন এমন হল?

খাট থেকে নেমে একটা সিগরেট ধরিয়ে জানলার ধারে গিয়ে দাঁড়ালো সুকুমার। সে-ও তখন এই কথাটাই ভাবছে, কেন এমন হয়!

# গত দশকে ভারতবর্ষের আর্থিক বৃদ্ধি ও বণ্টন

প্রণবকুমার বর্ধন

আর্থিক উন্নতিকল্পে সরকারী যোজনার এক দশক অতিক্রান্ত হয়েছে। একথা প্রায়ই শুনতে পাওয়া যায় যে রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে ভারতবর্ষ এক নতুন পরীক্ষা-নিরীক্ষার মাধ্যমে অগ্রগতির প্রচেষ্টায় ব্রতী হয়েছে। এই দেশের গতি-প্রকৃতি বিশ্বের গণতান্ত্রিক প্রগতিশীলতার কষ্টিপাথর ব'লে বিবেচিত হয়েছে। এমন দুরূহ নৈতিক ভার যখন আমাদের স্কন্ধে, আমাদের প্রতি পদক্ষেপ যখন পৃথিবীশুদ্ধ লোকের উন্মুখ দৃষ্টির বিষয়বস্তু, তখন গত দশবছরে আমাদের অভিজ্ঞতার খতিয়ান জাতীয় এবং আন্তর্জাতিক উভয় দিক দিয়েই বিশেষ তাৎপর্যপূর্ণ।

জগৎসভায় আমরা প্রায়শই শতবীণাবেণুরবে প্রচার করে থাকি যে একই সঙ্গে দ্রুত আর্থিক উন্নয়ন এবং সমাজবাদী গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠায় আমরা প্রয়াসী এবং অদূর ভবিষ্যতে যুগপৎ এই দুগ্ধ ও তাম্রকূট সেবনের পরাকাষ্ঠা আমরা প্রদর্শন করব। এদিক দিয়ে গত দশকের অভিজ্ঞতা কিন্তু মোটেই আশাপ্রদ নয়। প্রথমেই ধরা যাক আমাদের আর্থিক বৃদ্ধির মাত্রার কথা। ১৯৫১ সাল থেকে ১৯৬১ পর্যন্ত আমাদের জাতীয় আয় বৃদ্ধি পেয়েছে ৪২ শতাংশ। প্রতিবেশী চীনের জাতীয় আয় ১৯৫৩-৫৭এর মধ্যে বৃদ্ধি পেয়েছে ৫৩ শতাংশ এবং তার পরের দুই বছরেই (১৯৫৮-৫৯) বৃদ্ধি হয়েছে ৬৩ শতাংশ। গত দশ বছরে পশ্চিম ইউরোপের অধিকাংশ দেশ, সোভিয়েট রাশিয়া এবং জাপানের সঙ্গে আমাদের আর্থিক অবস্থার ব্যবধান হ্রাস পাওয়া দূরে থাকুক, বৃদ্ধি পেয়েছে। এদিকে আমাদের লোকসংখ্যা শত্রুর মুখে ছাই দিয়ে বেড়েছে ২১ শতাংশ। ফলে মাথাপিছু আয় বৃদ্ধি পেয়েছে মাত্র ১৬ শতাংশ। হিসেব ক'রে দেখা যায় যে এই ভারতবর্ষেই ঊনবিংশ শতাব্দীর শেষ দিকে এবং বিংশ শতাব্দীর প্রারম্ভে অন্তত দুটি দশকে মাথাপিছু আয় প্রায় ঐ একই হারে বৃদ্ধি পেয়েছিল।

আর্থিক বৃদ্ধির মাত্রার কথা ছেড়ে দিলেও গত দশকে আমাদের ধনবণ্টন ব্যবস্থা নিয়ে চিন্তিত হবার যথেষ্ট অবকাশ আছে। দরিদ্র জনসাধারণের মধ্যে আজ এই অভিযোগ সুস্পষ্ট যে দশবছরের পরিকল্পিত উন্নয়নের পরেও তারা যে তিমিরে ছিল সেই তিমিরেই রয়ে গেছে। তারা সন্দেহ করে যে শম্বুকগতিতে হ'লেও যেটুকু আর্থিক বৃদ্ধি আমাদের হয়েছে তার একটা মোটা অংশ গেছে মুষ্টিমেয় রজতকুলীনের কাছে। নির্বাচনী বৎসরে এইসব প্রশ্ন তোলায় অসুবিধা হচ্ছে যে এতে অনেকেই ভ্রূকুঞ্চিত করবেন বা সোজাসুজি এড়িয়ে যাবার চেষ্টা করবেন। জনশ্রুতি আছে যে সরকার জনসাধারণের চাপে এই সম্পর্কে অনুসন্ধানের জন্য একটি উচ্চক্ষমতাসম্পন্ন কমিটি বসিয়েছেন। কিন্তু তারপরেও এক বৎসরের অধিককাল অতিক্রান্ত হয়েছে, এই কমিটি এখনও আদৌ জীবিত আছে কিনা, বা জীবিত থাকলে জীবনের কি কি লক্ষণ প্রকাশ করছে, কার্যকলাপ কতদূর অগ্রসর হয়েছে এ সম্বন্ধে জনসাধারণ ঘুণাক্ষরেও জানতে পারেনি। বলাবাহুল্য, আগামী নির্বাচনী সময়ের পূর্বে এর ফলাফল প্রকাশিত হবে না।

ভারতবর্ষের ধনবণ্টন ব্যবস্থা নিয়ে গবেষণা করার অসুবিধা আছে অনেক। মাল-

মশলা এতই কম এবং বহুধাবিক্ষিপ্ত যে কোন নিখুঁত এবং সার্বিক সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া প্রায় অসম্ভব। তবুও বিভিন্ন স্থান থেকে কিছু কিছু তথ্য সংগ্রহ ক'রে তার ভিত্তিতে এমন কয়েকটি অনুমান ও প্রকল্প তৈরী করা যায় যা' থেকে গত দশ বৎসরে ভারতীয় ধনবণ্টনব্যবস্থার গতি ও প্রকৃতি সম্বন্ধে কিছু ধারণা করা যেতে পারে।

প্রথমেই দেখা যাক আয়করের পরিসংখ্যান থেকে আয়বণ্টন সম্বন্ধে কিছু জানা যায় কিনা। ভারতবর্ষের গ্রামগুলি বাদ দিলে অন্যত্র যাঁরা ব্যক্তিগত আয়কর দিয়ে থাকেন, জাতীয় আয়ে তাদের অংশ ১৯৫১ সালে ছিল শতকরা ৪.৮, ১৯৫৯-৬০ সালে দাঁড়িয়েছে ৫.৮, যদিও ইতিমধ্যে আয়ের যে অংশ তাঁরা কর হিসাবে দিয়ে থাকেন তা' শতকরা ১৭ থেকে কমে গিয়ে দাঁড়িয়েছে শতকরা ১৩ তে। হিসেব করলে আরও দেখা যায়, সবচেয়ে বেশী লাভ হয়েছে যাঁদের আয় দশ হাজার থেকে পঁচিশ হাজার টাকার মধ্যে পড়ে, অর্থাৎ যাঁরা 'উচ্চ মধ্যবিত্ত' শ্রেণীর অন্তর্ভুক্ত।

ভারতবর্ষের মত কল্যাণরাষ্ট্রে ধনবণ্টনব্যবস্থার বৈষম্য দূরীকরণে করনীতির গুরুত্ব খুবই বেশী। অথচ এদিক দিয়ে আমাদের করব্যবস্থা একেবারেই কার্যকরী হয়নি। গত দশকের মাঝামাঝি আমরা অনেকগুলি নতুন প্রত্যক্ষ কর বসিয়ে বিশ্ববাসীকে চমকে দিয়েছি। কিন্তু আমাদের প্রশাসনিক দক্ষতার দৌলতে সমস্ত ব্যাপারটাই হাস্যকর অকিঞ্চিৎকরতায় পর্যবসিত হয়েছে। যে দেশে সম্পত্তি থেকে মোট বাৎসরিক আয় জাতীয় আয়ের এক চতুর্থাংশেরও বেশী, ১৯৬০-৬১ সালে সে দেশে সম্পত্তিকর থেকে জাতীয় আয়ের ০.০৫ শতাংশ মাত্র পাওয়া গেছে। ব্যয়কর, সম্পত্তিকর, মৃত্যুকর এবং দানকরের মিলিত রাজস্ব জাতীয় আয়ের ০.০৮ শতাংশ মাত্র।

বৈষম্য দূরীকরণে পরোক্ষ করের চেয়ে প্রত্যক্ষ করের উপযোগিতা সর্বজনস্বীকৃত। কিন্তু গত দশ বছরে মোট রাজস্বের যে অংশ আমরা আয় এবং সম্পত্তির উপর প্রত্যক্ষ কর থেকে পাই, তা' ৩৩ শতাংশ থেকে কমে গিয়ে দাঁড়িয়েছে ৩০ শতাংশে, আর জিনিষপত্র ইত্যাদির উপর পরোক্ষকরের অংশ শতকরা ৫৯ থেকে বৃদ্ধি পেয়েছে শতকরা ৬৩ তে। পরোক্ষকরের এই মাত্রাবৃদ্ধির ভার কোন শ্রেণীকে বহন করতে হয় তার পরিচয় পাওয়া যাবে একটা উদাহরণ দিলেই। কেন্দ্রীয় আবগারী শুল্কের যে অংশ কেরোসিন, দেশলাই, চিনি, চা, সাবান, কার্পাসবস্ত্র ইত্যাদি নিত্যব্যবহার্য সামগ্রীর উপর চাপান হয়েছে তা' ১৯৫০-৫১ সালে ছিল শতকরা ৪৩ ভাগ, ১৯৫৯-৬০-এ তা' বেড়ে দাঁড়িয়েছে শতকরা ৫০ ভাগে। অন্যদিকে মোটর গাড়ী, পশমীবস্ত্র, নকল সিল্কজাতদ্রব্য, ইলেকট্রিক পাখা, মোটর স্পিরিট ইত্যাদি বিলাসসামগ্রী বা ধনিব্যবহৃত দ্রব্যের উপর শুল্কের অংশ ৪৮ শতাংশ থেকে কমে গিয়ে দাঁড়িয়েছে ২৬ শতাংশে।

আয়করের পরিসংখ্যান থেকে কৃষিজাত আয় সম্বন্ধে কিছু জানা যায় না। ভূমিস্বত্ব সম্পর্কীয় জাতীয় স্যাম্প্‌ল সার্ভের উপর ভিত্তি ক'রে একটা খসড়া হিসেব ক'রে দেখা গেছে যে ১৯৫৩-৫৪ সালে আমাদের দেশের কৃষিনির্ভর জনসংখ্যার শতকরা দশভাগ মোট কৃষিজ আয়ের অর্ধেক উপভোগ ক'রেছে (এদের মাথাপিছু আয় বছরে ৮৫৮ টাকা), আর বাকী শতকরা নব্বই ভাগের বরাতে মাথাপিছু আয় বছরে ১১২ টাকা। জাতীয় আয়ের পরিসংখ্যানে দেখা যায় যে ১৯৫০-৫১ সাল থেকে ১৯৫৯-৬০ এর মধ্যে কৃষিজ আয় বৃদ্ধি পেয়েছে মোট ১৩০০ কোটি টাকা। খসড়া হিসেব থেকে দেখা যায় যে এই বৃদ্ধির শতকরা ৩০ ভাগেরও বেশী গেছে ধনী কৃষকসম্প্রদায়ের হাতে, ৩০ একরেরও বেশী জমির উপর

যাদের মালিকানা এবং যারা মোট গ্রামীণ লোকসংখ্যার ৩ শতাংশ মাত্র। এই ধনী কৃষকেরা রাজ্যসরকারকে যে কৃষি আয়কর দেয় তা' নামমাত্র এবং এদের মূলধনের স্ফীতি আমাদের সরকারের কর ব্যবস্থার কবল থেকে বলতে গেলে সম্পূর্ণই নিষ্কৃতি পেয়েছে।

ভারতীয় শ্রমিকের আর্থিক অবস্থাটা এবার একটু যাচাই ক'রে দেখা যাক। প্রথমেই নেওয়া যাক কৃষিশ্রমিকদের কথা, যারা মোট গ্রামীণ লোকসংখ্যার প্রায় এক-তৃতীয়াংশ এবং সামাজিক ও আর্থিক উভয় দিক দিয়েই যারা ভারতবর্ষের সবচেয়ে অনুন্নত শ্রেণীগুলির অন্যতম। ১৯৫৬-৫৭ সালে দেখা গেছে এদের মাথাপিছু আয় বছরে ১০০ টাকারও কম। দ্বিতীয় কৃষিশ্রমিক অনুসন্ধান কমিটির রিপোর্ট থেকে জানা যায় যে ১৯৫০-৫১ সাল থেকে ১৯৫৬-৫৭ সালের মধ্যে যখন কৃষিজ আয় বৃদ্ধি পেয়েছে শতকরা ১৩ ভাগ, কৃষিশ্রমিক পরিবারগুলির মোট আয় শতকরা ১১ ভাগ কমে গেছে, পরিবারে উপার্জনকারীর সংখ্যা শতকরা ১০ ভাগ বৃদ্ধি পাওয়া সত্ত্বেও পরিবার পিছু বাৎসরিক আয় শতকরা ২.২ ভাগ কমে গেছে। পরিসংখ্যান পদ্ধতির কিছু কিছু ত্রুটির জন্য ঐ কমিটির অনুসন্ধানের ফলাফলের নির্ভরযোগ্যতা সম্বন্ধে অনেকে সন্দিহান। কিন্তু একথা প্রায় সবাই স্বীকার করেছেন যে গত দশকে আমাদের দেশে কৃষিশ্রমিক সম্প্রদায়ের আপেক্ষিক আর্থিক অবস্থার আরও অবনতি হয়েছে।

১৯৪৮ সাল থেকে ১৯৫৮ সালের মধ্যে জাতীয় আয়ে শিল্পশ্রমিকের অংশ প্রায় একই রয়েছে। সেন্সাস অফ ম্যানুফ্যাকচারিং-এ যে ২৯টি শিল্পকে গণনা করা হয় তাদের আয়ে শ্রমিকের অংশ ১৯৪৮-৫০ সালে ছিল শতকরা ৪৯ ভাগ, ১৯৫৬-৫৮ সালে তা' কমে গিয়ে দাঁড়িয়েছে শতকরা ৪৩.৫ ভাগ। উৎপাদন বৃদ্ধির মান যদি ১৯৫৩ সালে ১০০ ধরা হয়, তবে ১৯৫৮ সালে তা' গিয়ে দাঁড়িয়েছে ১৩২.৭ এ, কিন্তু শ্রমিকের আয়ের মান ১৯৫৮ সালে দাঁড়ায় ১০২.৬ এ। শিল্পদ্রব্যের উৎপাদন বৃদ্ধির একটা বৃহৎ অংশ থেকেই শ্রমিকেরা বঞ্চিত হয়েছে। অন্যদিকে মুনাফার মান ১৯৫০ এ ১০০ ধরলে ১৯৫৮ সালে হয়েছে ১৫২।

গত দশকে ভারতীয় শ্রমিকের আর্থিক অবস্থা বিচার করতে গেলে আর একটি উল্লেখ-যোগ্য বিষয়ের দিকে দৃষ্টি আকর্ষণ করিতে হয় তা' হচ্ছে বেকার ও অর্ধবেকারের সংখ্যা-বৃদ্ধি। দ্বিতীয় পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনার প্রারম্ভে দেশে পূর্ণবেকারের সংখ্যা ছিল পঞ্চাশ লক্ষ, পরিকল্পনার শেষে বেকারদের পল্টনে যোগ দিয়েছে আরও চল্লিশ লক্ষ। এ ছাড়া বর্তমানে অর্ধবেকারের সংখ্যাও দেড় কোটির ঊর্ধ্বে। ভারতবর্ষের বেকার সমস্যার প্রকৃতি সত্যিই ভয়াবহ।

বিভিন্ন গোষ্ঠীর ভোগ্যপণ্যের উপর ব্যয়ের মাত্রা দেখেও দেশের আয়বণ্টন সম্পর্কে কিছু ধারণা করা যায়। ভোগ্যপণ্যের উপর গার্হস্থ্য ব্যয়ের যে হিসেব জাতীয় স্যাম্পল সার্ভে থেকে পাওয়া যায়, তাতে জানা যায় যে, ১৯৫২-৫৩ সাল থেকে ১৯৫৬-৫৭ সালের মধ্যে মোট জনসংখ্যার নিম্নতর তিন-চতুর্থাংশের ব্যয় প্রায় একই রয়েছে, কিন্তু ঊর্ধ্বতন এক-দশমাংশের বয়ের মাত্রা মোট ব্যয়ের ২৫ শতাংশ থেকে ২৮ শতাংশে বৃদ্ধি পেয়েছে। ভোগবৈষম্য এবং জীবনযাত্রার মানের পার্থক্য নগর অঞ্চলেই সবচেয়ে বেশী। ১৯৫২-৫৩ সাল থেকে ১৯৫৬-৫৭ সালের মধ্যে মোট নাগরিক জনসংখ্যার নিম্নতর তিন-চতুর্থাংশের ব্যয় মোট নাগরিক ব্যয়ের ৪৯ শতাংশ থেকে কমে দাঁড়িয়েছে ৪৬ শতাংশে, আর ঊর্ধ্বতন এক-দশমাংশের ব্যয়ের মাত্রা বৃদ্ধি পেয়েছে শতকরা ৩০.৮ ভাগ থেকে ৩৩.১ ভাগে। ক্রমাগত

মুদ্রাস্ফীতি, মুনাফাবাহী বাণিজ্য ও ফাটকাবাজী, কঠোর সরকারী আমদানীনীতির কল্যাণে নিরাপদ আভ্যন্তরীণ বাজার, একচেটিয়া প্রভাব—ইত্যাদি নানা কারণে গত দশকে নাগরিক ব্যবসায়ী এবং শিল্পপতিদের পৌষমাস গেছে। স্ফীত আয়ের বড় অংশটাই শতরন্ধ্র সরকারী করব্যবস্থাকে নিপুণভাবে ফাঁকি দিয়ে গেছে।

এইভাবে বিভিন্ন জায়গা থেকে তথ্য সংগ্রহ করলে দেখা যাবে যে গত দশ বৎসরে ধনবৈষম্যবৃদ্ধি সম্পর্কে সাধারণের মনে যে একটা সন্দেহ রয়েছে তা একেবারেই ভিত্তিহীন নয়। অথচ সমাজতান্ত্রিক ধাঁচে সমাজ গড়বার যে মহান্ আদর্শ আমরা গ্রহণ করেছি সে সম্বন্ধে এখনও আমরা—বিশেষ ক'রে এই নির্বাচনী বছরে—যথারীতি মুখর। অনেকে বলেন যে আর্থিক উন্নতির প্রথম দিকে ধনবৈষম্যবৃদ্ধি প্রায় অপরিহার্য। সমর্থনের জন্য তাঁরা পশ্চিম ইউরোপ ও আমেরিকার ইতিহাস থেকে বিভিন্ন দৃষ্টান্ত তুলে ধরেন। কিন্তু এইসব দেশে আর্থিক উন্নতি এসেছিল মোটামুটি বেসরকারী প্রচেষ্টায়। এক্ষেত্রে ইতিহাসের পুনরাবৃত্তির দোহাই দেওয়ার অর্থ সরকারী পরিকল্পনা প্রচেষ্টার ব্যর্থতা মেনে নেওয়া। আবার অনেকে বলেন যে ধনবৈষম্যনিরসনের চেষ্টা আর্থিক বৃদ্ধির পরিপন্থী, কেননা এতে ব্যক্তিগত কর্মীর উৎসাহ কমে আসে এবং দেশের মোট সঞ্চয়ও কম হয়। কিন্তু যে দেশে জনসাধারণের বৃহৎ অংশ অসহ্য দারিদ্র্যের ভারে ক্লিষ্ট অথচ মুষ্টিমেয় ধনিসম্প্রদায়ের আয় এবং জীবনযাত্রার মান উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পায়, সে দেশে জাতীয় প্রগতির জন্য কতটুকু উৎসাহ বাকী থাকে? আমাদের দেশে জনসাধারণ পরিকল্পনার কাজে যথেষ্ট অন্তরঙ্গভাবে অংশ গ্রহণ করছে না এই মর্মে যে অভিযোগ প্রায়ই শোনা যায় তাতে আশ্চর্য হবার কিছুই নেই। আর সঞ্চয়ের দিকটা বিচার করলে দেখা যাবে যে ১৯৫০-৫১ সাল থেকে ১৯৫৮-৫৯ সালের মধ্যে আমাদের জাতীয় সঞ্চয়ের হার জাতীয় আয়ের ৬.৭ শতাংশ থেকে মাত্র ৭.৭ শতাংশ হয়েছে; অথচ গত দশকের ধনবৈষম্যবৃদ্ধির জন্য আমাদের সঞ্চয়ের হার আরও বৃদ্ধি পাওয়া উচিত ছিল। আসলে আজকের দিনের ধনিসম্প্রদায় উনবিংশ শতাব্দীর ইউরোপের ধনিসম্প্রদায়ের মত পিউরিটানস্বভাবাপন্ন সঞ্চয়শীল নন। তাই ধনবৈষম্যবৃদ্ধির ফলে জাতীয় সঞ্চয়বৃদ্ধির বিশেষ আশা নেই। প্রকৃতপক্ষে আর্থিক উন্নতির জন্য ধনবৈষম্যবৃদ্ধির পক্ষে অর্থনৈতিক যুক্তিগুলি নিতান্তই দুর্বল। সমস্যাটা আসলে রাজনৈতিক। রাজ-নৈতিক স্তরে এর সমাধানের প্রচেষ্টায় যত্নবান না হ'লে ভবিষ্যতে আমাদের যথেষ্ট বেগ পেতে হবে।

# শ্বাপদ

## জ্যোতিরিন্দ্র নন্দী

আমার পড়ার ঘরে ঢুকে সে চুপ করে দাঁড়িয়ে রইল। আমি একবার মাত্র বই থেকে মুখ তুলে আগন্তুকের চেহারাটা দেখে নিলাম। যেন ঐ একবার তাকানোই যথেষ্ট। তাতেই বুঝে নিলাম মানুষটি কেমন। বলতে কি, প্রথম দর্শনেই আমার মন কেমন খারাপ হয়ে গেল; এই মানুষ আমার সঙ্গে থাকবে, এখানে খাবে, হয়তো আমার সঙ্গে এক বিছানায় শোবে চিন্তা করে মনটা ভীষণ খারাপ লাগতে লাগল।

আস্তে আস্তে সে আমার পড়ার টেবিলের কাছে এসে দাঁড়াল। হাত বাড়িয়ে একটা বই তুলল। নামটা পড়ল। দুটো পাতা ওল্টাল। তারপর আবার বইটা রেখে দিল।

আমি তখন গভীর মনোযোগের সঙ্গে বাঁধানো খাতাটা টেনে নিয়ে ক্লাসের অঙ্কগুলি টুকে নিচ্ছিলাম। টেবিলে ছোট টাইম্‌পীসটা টিকটিক শব্দ করছিল। কিন্তু সেই মৃদু শব্দ হঠাৎ যেন অস্বস্তিকর লাগছিল। যেন আমার কাজে বাধা দিচ্ছিল। হঠাৎ মনে হল আমার খুব গরম লাগছে, কানের ভিতর দিয়ে গরম বাতাস বেরোচ্ছে। কাজ করা আর হল না। খাতাটা বন্ধ করে কলমটা হাত থেকে এক রকম ছুঁড়ে ফেলে রেখে দুপদাপ করে ঘর থেকে বেরিয়ে এলাম।

একটা লোকের উপস্থিতি যে কত খারাপ লাগতে পারে বাইরে বারান্দায় দাঁড়িয়ে চিন্তা করতে লাগলাম। অথচ সে আমার কোন অপকার করছিল না, কোনরকম অনিষ্ট-চিন্তা করছিল না। কিন্তু তবু কেন তার ওপর আমার এই বীতস্পৃহা রাগ আক্রোশ প্রথম দিন থেকে বুকের ভিতর দানা বাঁধতে সুরু করল ভেবে পাই নি। হয়তো তাই হয়। রাস্তায় একটা লোক হেঁটে যাচ্ছে—নাম ধাম জানি না স্বভাবচরিত্র কেমন শুনিনি, অথচ লোকটাকে একটুখানি দেখেই কেমন ভাল লেগে গেল, বাসে উঠলাম, আর একটা মানুষ সদয় হয়ে এক পাশে সরে বসে আমাকে বসতে একটু জায়গা করে দিল, কিন্তু কেন জানি মানুষটাকে দেখেই আমার এত খারাপ লাগল যে মুখ ঘুরিয়ে রড্ ধরে ঠায় দাঁড়িয়ে রইলাম; সাধারণ একটা ধন্যবাদ জানাবার মতন আমার মনে উদারতা জাগবে দূরে থাক—তার পাশে বসতে হবে চিন্তা করে দেহমন কুণ্ঠিত হয়ে উঠল। অথচ চেহারায় পোষাকে তাকে ঘৃণা করার কিছু নেই। তবু তার ওপর আমার বিরক্তি বিদ্বেষ ঘৃণা। কাজেই মানুষকে অপছন্দ করার ঘৃণা করার কারণ যেমন চট করে হাতের কাছে খুঁজে পাওয়া যায় না, তেমনি ভাল লাগার যুক্তিও যে সর্বদা উপস্থিত থাকবে বলা শক্ত। যুক্তির চেয়ে চোখের দেখাটাই আগে মনের ওপর কাজ করে। যেমন সেদিন আমার পড়ার ঘরে মানুষটাকে দেখামাত্র তার ওপর আমার মন বিরূপ হয়ে উঠেছিল।

বারান্দায় দাঁড়িয়ে বাগানের ডালিম গাছটা দেখছি, পড়ার ঘর থেকে বেরিয়ে এসে সে আমার পাশে দাঁড়াল। বুঝলাম আমার সঙ্গে কথা বলতে চাইছে। কিন্তু অত চট্ করে আলাপ জমাবার সুযোগ তাকে কে দেয়! আমি গম্ভীর হয়ে নীচে নেমে গেলাম। ঘাসের ওপর পায়চারী করতে লাগলাম। যা আশঙ্কা করলাম, সে নীচে নামল। রাগে দুঃখে আমি সেখান থেকে একরকম ছুটতে ছুটতে বাইরে রাস্তায় চলে গেলাম। আমাকে

এভাবে ছ্‌ুটতে দেখে সে অবাক হয়েছিল, টের পেয়েও আমি দ্‌ূরে সয়ে গেলাম, তার নাগালের বাইরে; তার ছায়া আমার ছায়ার সঙ্গে মিশতে দেব না এমন একটা কঠিন প্রতিজ্ঞায় আমার দ্‌ু পাটির দাঁত কঠিন দ্‌ৃঢ়বন্ধ হয়ে উঠেছিল।

সকালটা এভাবে কাটল। রাস্তায়, কখনো বাগানে। বাড়ির ভিতর ঢ্‌ুকতে ইচ্ছা করছিল না। স্কুলে অঙ্কের মাষ্টারের বিস্তর বকুনি খেলাম হোম-টাস্ক করা হয়নি বলে। ম্‌ুখ ফ্‌ুটে কিছ্‌ু বললাম না। হয়তো আমি যদি স্‌ুকুমারবাব্‌ুকে ব্‌ুঝিয়ে বলতাম কি কারণে অঙ্কগ্‌ুলি করে আনা হয়নি তো তিনি নিশ্চয় আমাকে গালমন্দ না করে চুপ করে যেতেন, একট্‌ু সহান্‌ুভূতি দেখাতেন।

কিন্তু কি করে বলি, বাড়িতে একটি লোক এসেছে, আমার এক মাসতুত ভাই—যাকে দেখে আমার মেজাজ বিগড়ে গেছে। পড়ার টেবিলের কাছে ঘে'সেছিল যখন তার গায়ের বোটকা গন্ধ ঘামের গন্ধ আমার নাকে লেগেছিল; শ্‌ুকনো পে'য়াজের শিকড়ের মত চার পাঁচটা অসমান দাড়ি থ্‌ুতনি ফ্‌ুঁড়ে বেরিয়ে আছে, মাথার চুলগ্‌ুলি খাড়া খাড়া, নখগ্‌ুলি বড় বড়; রং চটা ছোট একটা হাফ-প্যান্ট পরনে—যা তার বয়স ও দেহের কাঠামোর পক্ষে অত্যন্ত বেমানান ঠেকছিল; ম্‌ুগ্‌ুরের মাথার মতন জবরদস্ত হাঁট্‌ু দ্‌ুটোর দিকে তাকিয়ে কথাটা আমার মনে হয়েছিল। এমন একটা অপরিচ্ছন্ন ব্‌ুনো চেহারার মান্‌ুষ আমার মাসতুত ভাই—আর সে আমাদের বাড়িতে থাকবে খাবে শোবে, হয়তো আমার ঘরে আমার বিছানায় আমার পাশে শোবে চিন্তা করে সারা সকাল আমার মাথা গরম ছিল, অঙ্কের স্যার স্‌ুকুমারবাব্‌ুকে যদি ব্‌ুঝিয়ে বলতে পারতাম! না, কাউকে বলা হল না। ক্লাসে চুপচাপ ম্‌ুখভার করে বসে আমার সারাদিন কাটল। সহপাঠীদের গল্পে যোগ দিতে পারিনি। লীগের খেলা, সিনেমা, রকেট, গ্যাগারিন, ইংলিশ চ্যানেল—কত কি গল্প ব্‌ুদ্‌ব্‌ুদের মতন আমার নাকের সামনে চোখের সামনে ভেসে বেড়াল ঘ্‌ুরে বেড়াল—আমি একটা ব্‌ুদ্‌ব্‌ুদ ওড়াতে পারিনি, একটাও ফ্‌ুঁ দিয়ে ভাঙতে পারিনি। কেবল বোকার মতন হাঁ করে তাকিয়ে থেকে সব দেখলাম, শ্‌ুনলাম। মনে হচ্ছিল আমি অপাংক্তেয় হয়ে গেছি, পরিচিত বন্ধ্‌ুদের কাছ থেকে অনেক দ্‌ূরে সরে গেছি। তাদের সঙ্গে কথা বলবার মিশবার অধিকার আমার নেই। কেমন কান্না পাচ্ছিল। দ্‌ূরে বা কাছে এমন একটি মাসতুত ভাই আমার থাকতে পারে কোনদিন চিন্তা করিনি। ওরা—সহপাঠী বন্ধ্‌ুরা আমার ওই ভাইটিকে দেখলে নির্ঘাৎ হেসে ফেলবে নাক সি'টকাবে। আমার এমন জংলী চেহারার এক ভাই আছে যখন তারা জানতে পারবে তাদের কাছে আমিও অস্পৃশ্য হয়ে যাব।

স্কুল ছ্‌ুটির পর বাড়ি ফিরতে ইচ্ছা করছিল না।

নিশ্চয় পথের দিকে হাঁ করে সে তাকিয়ে আছে। আমার জন্য অপেক্ষা। আমার সঙ্গে কথা বলতে মিশতে মান্‌ুষটা কী ভীষণ ছটফট করছিল তখন বোঝা গেছে। সকাল বেলা বলা কওয়া নেই একটা ফাইবারের স্‌ুটকেশ হাতে ঝ্‌ুলিয়ে হাঁট্‌ু অবধি ধ্‌ুলো নিয়ে সে যখন বাড়িতে ঢ্‌ুকল আমি তা দেখে অবাক। টিপ করে মাকে প্রণাম করল বাবাকে প্রণাম করল। মা আমার দিকে তাকিয়ে হেসে বলল, 'চিনতে পারিস? ছোটবেলায় দেখেছিস—তারপর তো আর দেখা হয়নি, তোর মাসতুত ভাই—গণেশ। সোদপ্‌ুরের মাসিমার ছেলে।' সোদপ্‌ুরে আমার এক মাসিমা ছিল জানতাম, ক বছর আগে তিনি মারা গেছেন তা-ও শ্‌ুনেছি—হাঁপানির রোগী মেসোর কষ্টেস্‌ৃষ্টে সংসার চলে—রোগের জন্য তেমন ভাল কাজকর্ম জোটাতে পারছেন না, তার ওপর একটা বড় মেয়ে আছে ঘাড়ে, একটা

ছেলে আছে। মাঝে মাঝে বাবা ও মাকে সেই মেসোর কথা বলাবলি করতে শুনতাম। বোন নেই, কিন্তু তা হলেও মা সেই রুগ্ন মেসো ও তাঁর ছেলে মেয়েকে দেখতে একদিন সোদপুরে গিয়েছিল—তা-ও প্রায় বছর ঘুরতে চলল। এখন সেই সোদপুরের মাসির ছেলে যে এই ছেলে—এই চেহারা আমি কি করে জানব। মাথার খাড়া খাড়া চুল ও থুতনির আগায় পেঁয়াজের শিকড় কটা দেখে আমার প্রথমটায় এমন হাসি পাচ্ছিল। তালগাছের মতন ঢ্যাঙগা শরীর। আর মনে হচ্ছিল লোকটা কালা বোবা হবে। মা তাকে কী প্রশ্ন করছে হয়তো শুনতে পাচ্ছে না; বাবা কী জিজ্ঞেস করছেন বুঝতে পারছে না। কেমন যেন অসহায় শূন্য দৃষ্টি তুলে ধরে বাবাকে দেখছিল মাকে দেখছিল এবং ঘাড় ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে বার বার আমাকে দেখছিল। ঠিক কালা বোবা না হলেও, বোকা মুর্খ আস্ত একটি গর্দভ হবে ওই তালগাছের মতন মানুষটা চিন্তা করে আমি আমার পড়ার ঘরে চলে এলাম। তারপর বুঝি সেই মানুষ মার কথামতন জামাকাপড় ছেড়েছে, মুখ হাত ধুয়েছে, হাঁটুর ধুলো পরিষ্কার করেছে এবং মার দেওয়া চা রুটি যা হোক কিছু খেয়ে আস্তে আস্তে একসময় আমার পড়ার ঘরে এসে ঢুকেছিল। পড়ার ঘর মানে আমার থাকবার শোবার বসবার পায়চারী করবার এবং অনেক কিছু করবার ঘর। আমার সংসার, আমার পনেরো বছরের জীবনের একমাত্র আশ্রয়স্থল চার ফুট ছ ফুট ওই কুঠুরিটা। মুনি-ঋষিদের যেমন গুহাগহ্বর থাকে এবং সেটাই তাদের একমাত্র জগৎ আমার পড়ার ঘরটাও আমার সেই গোপন সুরক্ষিত পবিত্র নির্জন জগৎ। সেখানে হঠাৎ এমন বিদ্ঘুটে চেহারার একটা মানুষকে ঢুকে পড়তে দেখে কি রাগটাই না আমার তখন হয়েছিল।

কিন্তু এখন স্কুল থেকে বাড়ি ফেরার পথে আমার নানারকম দুর্ভাবনা হচ্ছিল। যদি দুপুরে আবার সে আমার পড়ার ঘরে ঢুকে থাকে! বইগুলি ঘাঁটতে পারে, টেবিলের টানাটা খুলে দেখতে পারে; আমার বিছানার বালিশের তলায় কী আছে না আছে শূন্য ঘরে সব নেড়েচেড়ে উল্টেপাল্টে পরীক্ষা করতে তাকে বাধা দেবে কে। বাবা অফিসে, মা নিজের ঘরে পড়ে পড়ে ঘুমোচ্ছে, চাকরটা এসময় বাড়ি থেকে বেরিয়ে তাস পিটতে নিজের আড্ডায় চলে যায়, সুতরাং—

নিশ্চয় বইগুলি ঘাঁটতে ঘাঁটতে কোনো না কোনো একটার পাতার খাঁজের ভিতর লুকিয়ে রাখা দু তিনটা চিঠি ও একটা ফটো তার চোখে পড়বে, টানাটা খুললে প্ল্যাস্টিকের ছোট সেফ্‌টি রেজারটা দেখে ফেলবে; মা কোনোদিন আমার বই বা টেবিলের টানা ঘাঁটা-ঘুঁটি করে না, বাবাকে তো এজীবনে আমার পড়ার ঘরে উঁকি দিতেই দেখিনি, কাজেই নিশ্চিন্ত হয়ে আমি সবকিছু টেবিলের টানার ভিতর বইয়ের খাঁজের মধ্যে রেখে দিতে পারতাম। বালিশের নীচে আজ ভুল করে সিগারেটের প্যাকেটটা রেখে এসেছি। পারত পক্ষে মা আমার বিছানা ধরে না, দরকার হলে চাকরটাকে পাঠিয়ে দেয়, চাদরটা ওয়ারটা খুলে আমি তার হাতে তুলে দিই সাবান দিয়ে কেচে দিতে কি ডাইংক্লিনিং-এ পাঠাতে। কিন্তু তা হলেও সিগারেটটা দেশলাইটা আমি বালিশের নীচে কি তোষকের নীচে রাখি না। আজ কেমন ভুল হয়ে গেল। আর ঠিক আজই সেই লোক আমার ঘরে ঢুকবে। না, ওই গেঁয়োটাকে আমি ভয় করি না। কোথায় সোদপুরের ছেলে আর আমি খাস বালিগঞ্জের ছেলে। এই বয়সে আমি সিগারেট খাচ্ছি কি দাঁড়ি গোঁফ কামাচ্ছি কি কিছু গোপন চিঠিপত্র ও আমার প্রিয় দু একজন ফিল্ম স্টারের ছবি বইয়ের ভিতর লুকিয়ে রেখেছি তা আমি দেখব। এসবের জন্য ওই কিম্ভূতকিমাকার চেহারার গণেশচন্দ্রের কাছে জবাব-

দিহী দিতে বড় একটা গ্রাহ্য করব কিনা। না, আমার ভয়, যদি মাকে বলে দেয়! চিঠির জন্য ভয় করি না। কেননা যে চিঠি লিখেছে সে আমার 'খোকন' নামের পরিবর্তে বুদ্ধি করে 'মণি' নামটা ব্যবহার করেছে। কাজেই এই চিঠি আমার কাছে লেখা নয়, এক বন্ধুর চিঠি, বন্ধু আমার কাছে রাখতে দিয়েছে মাকে স্রেফ বুঝিয়ে বলা যাবে। সেফটি রেজারের জন্যও ভয় করি না। আমার নাকের নীচে ও থুতনিতে কানে চুল গজাচ্ছে—ঘামলে মুখ কুটকুট করে, অসুবিধা হয়—তাই সেগুলি পরিষ্কার করতে অস্ত্রটা হাতের কাছে রাখতে হয়। মাকে বুঝিয়ে বলব, তুমি তোমার বোনপোর মুখখানা একবার দ্যাখ, তার থুতনির ওই জংগল দেখতে যদি তোমার ভাল লাগে তবে এখন থেকে আমিও না হয় আমার মুখটা এমন নোংরা করে রাখব। কিন্তু আমরা যে-জায়গায় আছি যে-পরিবেশের মধ্যে বড় হয়েছি তাতে কোনোরকম নোংরামি অপরিচ্ছন্নতা বরদাস্ত করতে শিখিনি, তুমি তা' ভাল করে জান মা। স্কুলে যাবার সময় জুতোটা চকচকে না থাকলে কি মাথার চুল পরিপাটি করে আঁচড়ান না থাকলে তুমি রাগ কর চোখ রাঙগাও। কাজেই পরিষ্কার পরিচ্ছন্নতার ব্যাপারে এতটুকু ত্রুটি থেকে না যায় সেদিকে ছোটবেলা থেকে আমার কড়া নজর—তোমার কাছ থেকে এই নজর পাওয়া, বাবার কাছ থেকে পাওয়া। নিশ্চয় বাবা টের পেয়েছেন আমি এখন থেকেই ব্লেড দিয়ে মুখ চাঁছতে আরম্ভ করেছি। সেদিন খাবার টেবিলে বসে বাবা আমার মুখের দিকে তাকিয়ে মৃদু মৃদু হাসছিলেন। অভিজ্ঞ মানুষ। তাঁর টের না পাওয়ার কিছু কথা নয়। তার ওপর পুরুষ মানুষ। মা রেজার ব্লেডের কারবার করেন না। কাজেই আমার মুখ দেখে তাঁর টের পাবার কথা নয়। কিন্তু সেদিন সেই নীরব হাসির মধ্যে কি আমার এ-কাজের প্রতি সুন্দর একটা সমর্থন ছিল না। তাই তো তিনি চুপ করে গেলেন। স্কুলের সীমানা ডিঙিগয়ে পরে কলেজে ঢুকব আর আমি দাঁড়ি গোঁফ কামাব, তার আগে রেজার হাতে তোলা দোষের এমন কুসংস্কার বাবার নেই। কাজেই এদিক থেকে আমি নিশ্চিন্ত। ফিল্ম-স্টারের ছবি বইয়ের মধ্যে গুজে রাখা যদি দোষের হয় তো আমাদের বাড়ির দেওয়ালে দেওয়ালে যে ক্যালেন্ডারগুলি ঝুলছে সেগুলি ছিঁড়ে ফেলতে হয়। অথচ বাবা সেগুলি অফিস থেকে আনতে না আনতে মা কত যত্ন করে দেওয়ালে টাঙিগয়ে রাখে। হ্যাঁ, ভয় ওই সিগারেটের জন্য। সিগারেট ধরেছি এই বয়সে জানতে পারলে মার বিস্তর বকুনি খেতে হবে। চাই কি বাবার কানে কথাটা উঠে যেতে পারে। ওই গেঁয়ো ভূতটাই না সরাসরি বাবার কাছে প্যাকেটটা নিয়ে হাজির করে। যেমন আহাম্মকের মতন চেহারা কাজকারবারও সেরকম হবে। বুকটা দমে গেল। কেমন বিশ্রী একটা ভয় গলার কাছে ডেলা পাকিয়ে যন্ত্রণা দিতে লাগল। বাড়িতে ঢুকতে পা দুটো সরছিল না।

কিন্তু ঈশ্বর যার সহায় হন তাকে কে কী করতে পারে!

সিঁড়ি পার হয়ে বারান্দায় উঠতে দৃশ্যটা আমার চোখে পড়ল। বাবার বসবার ঘরের সোফার ওপর হাত পা ছড়িয়ে দিয়ে সোদপুরের গণেশচন্দ্র ঘুমোচ্ছে। চমৎকার নাক ডাকছে। পা টিপে টিপে ভিতরে ঢুকলাম। হাঁ করে ঘুমোচ্ছে মানুষটা। কষ বেয়ে লালা ঝরছে। সোফার নীল বনাতের ওপর টুপ টুপ করে সেই লালা ঝরে আধুলির সাইজের একটা কালো দাগ ধরে গেছে জায়গাটায় এর মধ্যেই। যেন সেই লালার গন্ধে কোথা থেকে একটা মাছি উড়ে এসে ঘুমন্ত মানুষটার মুখের কাছে ঘুর ঘুর করছে। ঘেন্নায় আমার গা বমি বমি করতে লাগল। ঐ বয়সের কোনো মানুষের কষ বেয়ে লালা ঝরতে দেখলে কার না ঘেন্না হয়। তেমনি পা টিপে টিপে সে ঘর থেকে বেরিয়ে আমি আমার ঘরে চলে

এলাম। সতর্ক দৃষ্টি বুলিয়ে টেবিলের বইগুলি দেখলাম। না, ঠিক আছে সব, কেউ ঘাঁটাঘাঁটি করে নি। টেবিলের টানাটা খুলে দেখলাম, যেমনটি সব রেখে গেছলাম জায়গা-মতন রয়ে গেছে, বোঝা গেল কারো হাত পড়েনি। বালিশটা তুলতে সিগারেটের প্যাকেটটা চোখে পড়ল, চট করে ওটা সেখান থেকে সরিয়ে ফেললাম। কোণায় পুরনো খবর কাগজের জঞ্জালের মধ্যে আপাততঃ ওটা গুঁজে রাখলাম। এবার আমি নিশ্চিন্ত। হাল্কা নিশ্বাস ছেড়ে জামাকাপড় ছাড়লাম। 'বোকা লোক', মনে মনে বললাম, 'একদিক থেকে ভাল। শয়তানি বুদ্ধি থাকলে আমার পড়ার ঘরে ঢুকে এটা ওটা নাড়াচাড়া করত, কোথায় কি আছে না আছে খুঁজতে আরম্ভ করত।' কিন্তু তা না করে বাইরের ঘরে সোফার ওপর পড়ে পড়ে ঘুমোচ্ছে বলে সোদপুরের মাসতুত ভাইটি সম্পর্কে আমার তিক্ততা ও বিদ্বেষ যেন একটু কমল।

হাত পা ধুয়ে খেতে বসেছি, তখন মা কথাটা তুলল।

'গণেশের সঙ্গে আলাপ হয়েছে তোর?'

'না তো, এসে দেখি বাবার বসবার ঘরে সোফার ওপর হাত পা ছড়িয়ে ঘুমোচ্ছে। সারা দুপুরই ঘুমোচ্ছে বুঝি?'

মা অল্প হাসল।

'সোদপুর থেকে হেঁটে এসেছে। অতটা রাস্তা হাঁটা যায়। ওইটুকুন ছেলে। ক্লান্ত হয়ে পড়েছে।'

'কেন, বাস বা ট্রেনের পয়সা জোটাতে পারেনি বুঝি?'

'ভীষণ গরীব। একবেলা খাচ্ছে তো আর একবেলা উপোস থাকছে।' মা গম্ভীর হয়ে গেল।

'এখানে কদিন থাকবে?'

'তার ঠিক কি। বলছে কাজকর্মের চেষ্টায় এসেছে।'

'চাকরি।' আমি প্রবলবেগে মাথা নাড়লাম। 'ওই চেহারায় কেউ চাকরি দেবে না।' একটু থেমে পরে বললাম, 'কদ্দুর লেখাপড়া করেছে শুনি?'

'লেখাপড়া আর হল কোথায়। বলছিল সেভেন কেলাসে উঠে আর পড়া চালাতে পারেনি। ইস্কুলের মাইনে দিতে পারে না। নাম কাটা গেছে।'

'তবেই হয়েছে। সাত ক্লাসের বিদ্যা নিয়ে চাকরি! অফিসের বেয়ারার কাজও জুটবে না।'

'না, চাকরি করবে কেন, চাকরি করতে আমি দেব নাকি ওই দুধের ছেলেকে। আমার কাছে যখন এসেছে, দেখি, আবার ইস্কুলে ভর্তি করে দিতে পারি কিনা।'

যেন দুঃস্বপ্ন দেখে আঁৎকে উঠলাম।

'এখানে? আমাদের স্কুলে? আমার সঙ্গে রোজ যাবে?'

'কেন,' আমার চেহারা দেখে মা ঈষৎ হাসল। 'তুই কি মাথায় করে নিয়ে যাবি ওকে!'

'ধেৎ, সেকথা বলছে কে।' গজ গজ করে উঠলাম, 'দাঁড়িগোঁফ গজিয়েছে, এখন যদি ও আবার সেভেন ক্লাসে পড়তে যায় সবাই হাসাহাসি করবে। আমার ভীষণ লজ্জা করবে ওর সঙ্গে স্কুলে যেতে—আমি কাউকে বলতেই পারব না এমন গেঁয়ো জংলী চেহারার ছেলে আমার আত্মীয়—মাসতুত ভাই।'

'ছি!' মা ধমকের সুরে বলল, 'ভাইকে এসব বলে নাকি কেউ? গেছো জংলী হবে

কেন, তোর চেয়ে ওর মুখখানা দেখতে বেশি সুন্দর।' একটু থেমে মা কী চিন্তা করল। তারপর আস্তে আস্তে বলল, 'তুমি সেজেগুজে থাক, আদর যত্নে আছ তাই মাজাঘষা চেহারা। না হলে গণেশের গায়ের রং তোমার চেয়ে ভাল। আর অতবড় ছেলে সেভেন কেলাসে ভর্তি হলে ছেলেরা হাসবে—তা হাসুক, সব বয়সেই মানুষ সব কেলাসে পড়তে পারে, লেখাপড়ায় আবার নিন্দা আছে নাকি।'

'ওই বয়সে কলেজে পড়লে মানাত।' হাসতে যাচ্ছিলাম। মা ভুরু কোঁচকালো।

'ওই দেখতেই মনে হয় না জানি কত বয়স হয়েছে গণেশের, আসলে ওর শরীরের বাড়টা একটু বেশি, দেখছি কেমন যেন ঢ্যাঙ্গা হয়ে উঠেছে এদিকে। ও কিন্তু তোরও ছ মাসের ছোট।'

চমকে উঠলাম, মার কথাটা বিশ্বাস করতে কেমন বাধল।

'তুই হয়েছিস এক ফাল্গুনে, আর তার জন্ম ঠিক পরের ভাদ্রে। হিসাব করে দ্যাখ্ না।' মা আঙুলের কর গুণতে আরম্ভ করল। ঠিক এমন সময় চোখ রগড়াতে রগড়াতে সেখানে গণেশ এসে হাজির। গালে লালার দাগটা তখনো লেগে আছে। যেন মার চোখে তা পড়ল না।

'ঘুম ভাঙ্গল,' আদুরে গলায় মা বোনপোকে কাছে ডাকল, 'আয় একটু দুধ পাউরুটি খেয়ে নে। এই যে খোকন এসেছে। তখন না বার বার বলছিলি, দাদার ইস্কুল কখন ছুটি হবে কখন বাড়ি আসবে।'

পাছে আমার সঙ্গে চোখাচোখি হয় সেই ভয়ে আমি তাড়াতাড়ি দেয়ালের দিকে চোখ ফিরিয়ে নিলাম। কিন্তু টের পেলাম, সদ্য ঘুম ভাঙ্গা করমচা রঙের বড় বড় চোখ দুটো মেলে ধরে সোদপুরের মানুষটা আমাকে গভীর আগ্রহের সঙ্গে দেখছিল।

আর তখন থেকে আমিও তাকে নতুন চোখে দেখতে লাগলাম। আমি কালো, তার গায়ের রং বেশ ফর্সা। আমার চোখ ছোট, তার চোখ দুটো বড় বড়, উঁচু ধারালো নাক—আমার নাক চেপ্টামতন। বয়সে ছোট হয়েও সে আমার চেয়ে মাথায় লম্বা হয়ে গেছে। সেই অনুপাতে তার হাত পা গলা পিঠ কোমর সবই আমার চেয়ে বড় মোটা ও পুষ্ট। মার কাছে বসে সে যখন দুধরুটি খাচ্ছিল মার ঘরের বড় আয়নায় নিজেকে একবার দেখে নিয়ে একটা চোরা দীর্ঘশ্বাস ফেললাম।

অবশ্য আমার মনের ক্ষোভ বেশিক্ষণ রইল না। সোদপুর মানে পাড়া গাঁ। বন জঙ্গলে ভর্তি। সেখানকার মানুষগুলিকে তুমি বুনো জংলী বলতে পার। শহরের মানুষের চেয়ে বুনো জংলীরা বেশি উঁচু লম্বা জোয়ান জবরদস্ত হবেই। আগাছার মতন তারা বেড়ে ওঠে। আমাদের বালিগঞ্জের পার্কের একটা গাছের সঙ্গে জঙ্গলের একটা গাছের তুলনা করলে বেশকমটা যেমন চোখে পড়ে। বাবা সেদিন কি কথায় যেন বলেছিলেন, সভ্য মানুষ চিন্তাশীল মানুষ, দিনরাত যারা এ-ব্যাপারে সে-ব্যাপারে বুদ্ধি খরচ করে বেড়াচ্ছে তারা বুদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে শরীরটাও ক্ষয় করছে—কাজেই অসভ্য জংলী জানোয়ারদের মতন প্রকাণ্ড একটা দেহ সভ্য মানুষদের বড় একটা হয় না। অর্থাৎ বাবা বলতে চেয়েছিলেন, কেবল শরীরের দিক দিয়ে বেড়ে যাওয়া অসভ্যতার লক্ষণ। এখানেও তাই। গণেশচন্দ্রের লম্বা হাত পা চওড়া কাঁধ কোমর আমাকে আর ঈর্ষান্বিত করতে পারল না। কেবল তার নাক চোখ ও ফর্সা রংটাই যা থেকে থেকে মনটাকে খোঁচা দিতে লাগল।

কিন্তু ঝাঁটার কাঠির মতন মাথার খাড়া খাড়া চুল ও অপরিচ্ছন্ন থ্তনির ছবিটা মনে করে সেই খোঁচাটাও একসময় ভুলে যেতে পারলাম। পাছে সে আমার পিছ্ নেয় তাই তাড়াতাড়ি বাড়ি থেকে বেরিয়ে পড়লাম। সোজা আমাদের লেক-ক্লাবে চলে গেলাম। মনের আনন্দে সেখানে সারাটা বিকেল বন্ধুদের সঙ্গে খেলাধুলা করলাম। বাড়িতে এক হবুচন্দ্র মাসতুত ভাই এসেছে কথাটা অনেকক্ষণ ভুলে ছিলাম।

ক্লাবের পিণ্টু ও নন্তুর সঙ্গে লেকের ধারে বসে গল্প করে সন্ধ্যাটাও কাটালাম। কিন্তু যখন বাড়ি ফেরার সময় হল সেই মুখটা আমার মনে পড়তে আরম্ভ করল।

'কি হল, হঠাৎ চুপ করে গেলি যে?'

নন্তু প্রশ্ন করছিল। জোর করে হাসলাম।

'না ভাবছি, এখনি গিয়ে আবার বই নিয়ে বসতে হবে।'

'ও, তার জন্য মন খারাপ।' পিণ্টু হাসল, 'পড়ার বই পড়তে আমার যখনই খারাপ লাগে আমি স্রেফ একটা সিনেমার কাগজ খুলে বসি।'

'কাগজটা বুঝি টেক্সট বইয়ের তলায় লুকিয়ে রেখে পড়তে বসিস?'

'তা ছাড়া কি।' পিণ্টু গম্ভীর হয়ে গেল। 'কত আর নাসিরুদ্দিন মামুদ আর গিয়াসুদ্দিন বলবন মুখস্ত করা যায়। কাজেই তখন—'

'কাজেই তখন সিনেমার কাগজটা খুলে দূরের-মায়া বইয়ের নতুন নায়িকা—কি যেন নাম?' নন্তু আমার দিকে তাকাল।

'চামেলী চ্যাটার্জি।' হেসে বললাম।

'চামেলীর মুখখানা দেখি—কেমনরে পিণ্টু।' পিণ্টুর পিঠে আঙুল দিয়ে খোঁচা দিল নন্তু।

'মাইরি বলছি।' পিণ্টু দু চোখ বুজে ফেলল, 'চামেলীকে আমি ঘুমের মধ্যেও স্বপ্নে দেখি।'

'ধেৎ, তার চেয়ে প্রথম-পলাশ-ফুলে যে মেয়েটা নামছে—কি যেন রে নাম, খোকন?' নন্তু আমার দিকে তাকাল।

'ইরা সোম।' বললাম আমি।

'অনেক বেশি মিষ্টি চেহারা।' নন্তু চোখ দুটো প্রায় বুজে ফেলল।

'আমার ভাই স্বাতী সেনের মুখটাই সবচেয়ে বেশি ভাল লাগে। মরুর-বুকে ছবির নায়িকা।' বললাম, 'তোদের বলতে বাধা নেই, জিওম্যাট্রি পড়ার আগে আমি অনেকক্ষণ ধরে স্বাতীর মুখখানা দেখে নিই।'

'জিওম্যাট্রি বইয়ের ভিতর স্বাতীর ফটো লুকিয়ে রাখিস নিশ্চয়?' নন্তু প্রশ্ন করল।

'তা ছাড়া কি।' আমি হাসলাম।

'সত্যি, কত আর ট্রাপিজিয়ম আর রম্বস মুখস্ত করা যায়।' পিণ্টু এতক্ষণ পর আবার হাসল। 'আয় এইবেলা সিগারেট খাওয়া যাক।' পিণ্টুর জামার পকেট থেকে তকতকে ঝকঝকে একটা নতুন প্যাকেট বেরিয়ে এল। তিনজন প্রাণভরে লেকের ধারের মিষ্টি হাওয়া খেতে খেতে সিগারেট টানলাম। বাড়িতে লুকিয়ে সিগারেট খেয়ে আরাম হত না বলে তিন বন্ধু রোজ সন্ধ্যার দিকে এমন একটা নির্জন জায়গা বেছে নিয়ে ধূমপানের আসর জমাতাম।

একটু রাত করে বাড়ি ফিরলাম। যেন মাংস রান্না হচ্ছিল। গন্ধ পেলাম। আশ্বস্ত

হওয়া গেল। মা যেদিন মাংস রান্না করে বাবা সেদিন রান্না ঘরে বসে থাকবেনই। অসীম উৎসাহ তাঁর এ-ব্যাপারে, দরকার হলে হাতা দিয়ে উনুনের হাঁড়িটা দুবার নেড়েচেড়ে দেন তিনি। কাজেই রাত করে বাড়ি ফেরার জন্য আর ভয় রইল না, বাবার সামনে পড়তে হল না, চট করে বাথরুমে ঢুকে মুখ হাত ধুয়ে সোজা পড়ার ঘরে ঢুকে পড়লাম। আলো জেবলে সতর্ক দৃষ্টি বুলিয়ে টেবিলের বইয়ের সারিটা একবার দেখে নিলাম, টানা খুলে ভিতরটা একবার পরীক্ষা করলাম। দুশ্চিন্তা দূর হল। গণেশচন্দ্র তা হলে এবেলাও আমার ঘরে ঢোকেনি। নিশ্চিন্তমনে চেয়ারে বসে জ্যামিতি বইটা টেনে আনলাম। না, আনতে গেছি, হঠাৎ যেন চৌকাঠের কাছে পায়ের শব্দ হল। বই থেকে হাতটা আপনা থেকে সরে এল। ঘাড় ঘুরিয়ে পিছনের দিকে তাকাতে দেখলাম দরজায় সেই মূর্তি দাঁড়িয়ে আছে, হাঁ করে আমাকে দেখছে। ড্যাবড্যাবে চোখ দুটো দিয়ে আমাকে গিলছে মনে হল।

'কি চাই?' এই প্রথম আমি তার সঙ্গে কথা বললাম, 'এখন না, এখন এ-ঘরে না। আমি পড়াশোনা করব—আমার অনেক পড়া।'

ঠিক তখন মা এসে দরজায় দাঁড়াল।

'আহা এমন করিস কেন—তোর ভাই, খুব ভাল ছেলে গণেশ। সারাদিন আশায় আশায় থেকেছে কতক্ষণ তুই ওর সঙ্গে কথা বলবি।'

চুপ করে গেলাম।

মা আবার বলল, 'তখন তুই স্কুল থেকে এসে খেয়ে আবার সঙ্গে সঙ্গে বেরিয়ে গেলি। ও খুঁজল তোকে, বারান্দায় গেল, বাড়ির সামনের রাস্তাটা দেখল—তুই নেই।'

'আমি আমাদের ক্লাবে গিয়েছিলাম।' অন্যদিকে তাকিয়ে রুষ্ট গলায় বললাম, 'ছুটির পর বাড়ি এসে রোজ ক্লাবে চলে যাই তুমি তো জানই।'

'আমিও গণেশকে বললাম। ও চাইছিল তোর সঙ্গে বেড়াতে যেতে, বলছিল, দাদা এখন পর্যন্ত একটা কথাও বলল না মাসিমা।'

রান্নাঘর থেকে বাবার কাশির শব্দ ভেসে আসতে শুনলাম। বুঝলাম বাবাকে হাঁড়ির কাছে বসিয়ে রেখে মা বোনের ছেলেকে সঙ্গ করে এনেছে আমার সঙ্গে মেলামেশার কথাবার্তা চালানোর সূত্রটা ধরিয়ে দিতে। যেন কচি খোকা। হাঁটি হাঁটি পা পা। অথচ কতবড় একটা শরীর! ছ ফুট লম্বা হবে। কাজেই একটা মস্ত 'ইডিয়ট' ছাড়া আর কিছুই না। মনে মনে বললাম।

'এখন পড়াশোনা কর, তারপর খাওয়াদাওয়া হয়ে যাক—ওর সঙ্গে কথা বলবি। খুব দুঃখ করছিল গণেশ তুই কথা বলছিস না বলে।' মা ঘুরে দাঁড়াল, 'দেখি, মাংসটা বোধ করি হয়ে এল।' রান্নাঘরের দিকে আবার চলল মা। সেই মূর্তিও আর দাঁড়াল না। মাথাটা নীচু করে মার পিছে পিছে চলে গেল। আমার রকমসকম দেখে বুঝতে পেরেছে সে আমি তাকে ভয়ংকর অপছন্দ করছি। তাই আমি বুঝতে দিতে চাইছিলাম।

বাবা ও মার কথার ধরনে বুঝলাম গণেশ পাকাপাকিভাবে এবাড়িতে থেকে যাবে। ভাদ্র মাস। এখন স্কুলে ভর্তি হওয়ার অসুবিধা আছে। নতুন সেশন আরম্ভ হলে আমার স্কুলে ভর্তি হবে। মাংস ভাত খাচ্ছিলাম। কিন্তু তবু মুখে কেমন তেতো তেতো লাগছিল সব। আমার এপাশে বাবা বসে খাচ্ছেন, ওপাশে খেতে বসেছে বুনোটা। আড়চোখে

তাকিয়ে দেখলাম কী ভীষণ খেতে পারে মার সোদপুরের বোনের ছেলে। এক থালা ভাত উড়ে গেছে কখন। মা আবার থালায় এত ভাত ঢেলে দিয়েছে। তা-ও সে সাবাড় করে আনল, অথচ আমার এক বারের ভাত নড়ছে না। বাবা আর কটা ভাত খান। তবু মা বোনপোর সামনে বসে থেকে বারবার সাধাসাধি করছিল, 'এটা খা, ওটা খা—আর দুটি ভাত খেয়ে নে।' দুটি মানে আর এক থালা। রাগে আমার শরীর ফেটে যাচ্ছিল। আবার হাসিও পাচ্ছিল। এই আদর কদিন! ইস্কুলে ভর্তি হোক। ওই সেভেন ক্লাসেই তিনবার ডিগবাজী খাবে এই ছেলে। তখন দেখা যাবে থালা থালা ভাত খাচ্ছে দেখে মা কী করে। আমি জানি মা কোনোদিন বেশিভাত খাওয়া দেখতে পারে না। সুদাস নামে আমাদের এক চাকর ছিল। এইটুকুন ছেলে। অথচ পারলে হাঁড়ির সব ভাত খেয়ে নিত। মা এক একদিন এমন বিরক্ত হত। বাবা বলতেন, যাদের ব্রেণ-ওয়ার্ক অর্থাৎ মাথার কাজ করতে হয় না তারা বেশি ভাত খায়। যেমন মুটে মজুর রিক্সাওয়ালারা। অতিরিক্ত ভাত খাওয়া ছোটলোকের লক্ষণ। মা বলত, দারিদ্র্যের চিহ্ন। অথচ আজ বাবা তো চুপ করে আছেনই, মা আদর করে আর একজনকে ঠেসে ঠেসে খাওয়াচ্ছে। কাজেই আমি চুপ করে রইলাম। যারা ভাত দেবার মালিক তাদের চোখে যদি এই রাক্ষুসে-খাওয়া ভাল লাগে তো আমি কী করতে পারি। বস্তুত এত ভাল মাংস রান্না হওয়া সত্ত্বেও আমি তেমন করে খেতে পারলাম না। মার আদর দেখে হিংসায় আমার বুকের ভিতরটা পুড়ে যাচ্ছিল।

খাওয়াদাওয়ার পাট চুকতে মা আবার তাকে সঙ্গে করে আমার ঘরের দরজায় এসে দাঁড়াল। মার হাতে একটা বড় বালিশ।

'গণেশ এ-ঘরে তোর সঙ্গে শোবে।'

'এইটুকুন তো একটা খাট।' আমার মুখ কালো হয়ে গেল। করুণচোখে মার দিকে তাকালাম। 'তোষকটাও ছোট—দুজনের অসুবিধা হবে।'

'তোমার সবতাতেই অসুবিধে—এমন কোনো ছোট বিছানা না তোমার—দু ভায়ে বেশ শুতে পারবে।'

তবু আমি বিড়বিড় করছিলাম।

'বাবার বসবার ঘরটা তো খালি পড়ে থাকে—সেখানে একজন শুতে পারে।'

'সে ঘরে বঙ্কু শোয় তুই জানিস না।' আগের চেয়েও জোরে ধমক লাগাল মা। 'চাকরের সঙ্গে গণেশকে আমি শুতে বলব নাকি—কেন, তোমার ঘর থাকতে—' বলতে বলতে মা ভিতরে ঢুকল, হাতের বালিশটা আমার বিছানার ওপর রাখল। 'আয় ভিতরে আয়, গণেশ।'

গণেশ ভিতরে ঢুকল। মুখখানা এখন হাসি হাসি। অর্থাৎ আমার আপত্তি টিকছে না বুঝতে পেরে খুশি হয়েছে। ঈশ্বর জানে, রাগে আমার তখন কী করতে ইচ্ছা করছিল! কিন্তু মার জন্য মুখ বুজে সব সহ্য করতে হল। বিছানার চাদরটা টেনেটুনে ঠিক করে দিয়ে দুটো বালিশ পাশাপাশি সাজিয়ে রেখে মা ঘুরে দাঁড়াল।

'তুই এখন শোবি?'

'আমার অনেক পড়া আছে।' মার মুখের দিকে তাকাতে ইচ্ছা করছিল না।

'গণেশ, তোর তো ঘুম পেয়েছে—শুয়ে পড়।'

'আমি পরে শোব, মাসিমা।'

'বেশ তো, খোকন, তোর একটা গল্পের বইটই থাকে তো ওকে দে, বসে বসে দেখুক।'

'গল্পের বই আমি রাখি না। সব টেক্‌সট বই।' দুজনের কারোর দিকে না তাকিয়ে গম্ভীর গলায় উত্তর করলাম।

'বেশ, তবে গণেশ তুই ততক্ষণ বারান্দায় এসে একটু বোস—চমৎকার ফুর ফুরে হাওয়া ওখানটায়।'

মা চৌকাঠের দিকে সরে গেল। আড়চোখে আমি তাকিয়ে দেখছিলাম যাকে বারান্দায় যেতে বলা হল সে কি করে। গেল না বারান্দায়। বিছানার ধারে দাঁড়িয়ে হাঁ করে আমাকে দেখছে, টেবিলটা দেখছে, বইগুলি দেখছে। যেন আজব দেশে এসেছে। আমি আজব দেশের মানুষ। রাগ হচ্ছিল, আবার হাসি পাচ্ছিল, আর সেই সঙ্গে অহংকারে গর্বে বুকের ভিতরটা ফুলে উঠছিল। দেখবেই তো, আমার দিকে বার বার তার না তাকিয়ে উপায় কি! মোটে ছ মাসের বড় হয়ে আমি দু ক্লাস উঁচোয় পড়ছি। আমার কত বই! আর সবগুলি বই কেমন চমৎকার বাঁধানো চকচকে। কতবড় একটা টেবিল আমার, সুন্দর একটা টেবিল-ল্যাম্প, একটা চেয়ার, ধবধবে বিছানা। একলা আমি পড়াশোনা করব বলে থাকব বলে এই ঘর। দেয়ালের গায়ে ব্র্যাকেটে আমার সার্ট প্যান্ট ধুতি পাঞ্জাবি গেঞ্জি পায়জামাই বা ঝুলছে কত। সোদপুর থেকে খালি পায়ে ও হেঁটে এসেছে। আর আমার জুতো চটি মিলিয়ে চার পাঁচ জোড়া। তাই অবাক হয়ে চোখ ঘুরিয়ে সব দেখছে সে। বিছানা জামাকাপড় জুতো বই চেয়ার টেবিল দেখা শেষ করে তারপর এসবের যে মালিক তাকে দেখছে; খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে দেখছে। নিশ্চয় লক্ষ্য করেছে আমার গাল মুখ কত পালিশ পরিচ্ছন্ন—মাথার চুল কেমন পরিপাটি, হাতের নখগুলি কত সুন্দর মসৃণ করে কাটা। গাঁয়ের মানুষ। কাজেই তার জানবার কথা না আমাদের শহরের ছেলেদের সারাক্ষণ কেমন পরিচ্ছন্ন ফিটফাট থাকতে হয়। বেশভূষায় চেহারায় চালচলনে আমরা পান থেকে চুনটুকু খসতে দিই না। আস্তে আস্তে জানবে কেন আমাদের এত ফিটফাট মাজাঘষা চেহারা হয়ে থাকতে হয়। রোজ চন্দন সাবান গায়ে মেখে আমি স্নান করি, মাথায় ভাল সেণ্টেড তেল মাখি, স্নো ক্রীম পাউডার উঠতে বসতে মুখে মাখছি। বুনো জংলীদের এসব জানবার কথা না, এসবের খোঁজখবরও রাখে না তারা। তাই আমার চকচকে চেহারা তাকে এত অবাক করেছে।

সকালের মতন টেবিলের কাছে সরে এসে দাঁড়াল সে।

'কি চাই?'

'কিছু না।' এবার আমার প্রশ্নের উত্তর দিল সে। দাঁতগুলি বেরিয়ে পড়ল। খামকা হাসবার অভ্যাস, বুঝলাম।

'কিছু চাই না তো ওদিকে সরে দাঁড়া।' বিরক্ত গলায় বললাম, 'আমি এখন পড়ব।'

'আমি তোমার ইস্কুলে ভর্তি হব, মাসিমা বলেছেন।'

'ওই চেহারা নিয়ে বালিগঞ্জ বয়েজ স্কুলে ঢুকতে হবে না।'

'কেন!' যেন আকাশ থেকে পড়ল এমন চেহারা করে ফেলল সোদপুরের মাসিমার ছেলে। চেহারাটা দেখে আমার ভাল লাগল। মুখটা অনেকক্ষণ ভার করে রেখে পরে একটা ঢোক গিলল।

'তোমার সঙ্গে যাব—তুমি আমার দাদা—ঢুকতে দেবে না কেন?'

'দাদা বললেই তো তারা তা বিশ্বাস করছে না।'

চুপ করে রইল সে।

'থুতনিতে পেঁয়াজের শিকড়ের মতন কী কতগুলো ঝুলছে, ঝাঁটার কাঠির মতন মাথার চুল, বড় বড় নখ হাতে পায়ে—ইস্কুলের ছেলেরা গাড়ল ছাড়া আর কিছুই ভাববে না—'

হাঁ করে তাকিয়ে থেকে আমার কথাগুলি শুনল সে, তারপর একটা লম্বা নিশ্বাস ফেলল। বনের পশুকে আঘাত করার যে আনন্দ সেরকম একটা কিছু আমি ভিতরে ভিতরে অনুভব করছিলাম।

আর কিছু আপাততঃ বলার প্রয়োজন নেই। ওতেই যথেষ্ট কাজ হবে। চিন্তা করে একটা পড়ার বই টেনে এনে মনে মনে পড়তে সুরু করে দিলাম। অবশ্য পড়ায় আমার এক ফোঁটাও মনোযোগ ছিল না। আড়চোখে দেখছিলাম, গাড়লটা মেঝের দিকে মুখ করে দাঁড়িয়ে আছে। অর্থাৎ দুর্ভাবনার অথই জলে হাবুডুবু খাচ্ছে। আমার ভাল লাগল। অন্তত রাক্ষুসে দাঁতগুলো বার করে আমার সামনে অকারণে আর সে হাসবে না। বলতে কি ওই বোকা হাসিটাই আমার মাথা গরম করছিল বেশি।

কিন্তু দেখা গেল আমার কথাগুলি সে মনেপ্রাণে ধরে রেখেছে। পরদিন সকালে মার কাছে আর্জি পেশ করল। মা তৎক্ষণাৎ বঙ্কুকে দিয়ে বোনের ছেলেকে চুল কাটার সেলুনে পাঠিয়ে দিল। রাত্রে তার পাশে শুয়ে সত্যি আমার ঘুমোতে কণ্ট হচ্ছিল। গায়ের ঘাম ময়লার উট্‌কো গন্ধে বমি আসছিল। আমি বার বার উঃ আঃ করেছিলাম। দুর্গন্ধ শব্দটাও উচ্চারণ করেছিলাম। তাই পরদিন দেখলাম সেলুন থেকে চুলটুল কেটে এসে গণেশচন্দ্র বাথরুমে বসে দারুণভাবে সারা গায়ে সাবান মাখছে। খুশি হলাম। বুনোটা আমার মতন হতে চাইছে। স্নানের পর ধোপদুরস্ত জামাকাপড় পরল। এগুলো বাবার। ছ ফুট লম্বা শরীরে আমার সার্ট পাঞ্জাবী প্যাণ্ট পায়জামা ধরবে না। না হলে পুরোনো বা একটু ছেঁড়ামতন সার্ট প্যাণ্ট আমারই কি কম বাক্সে তোলা আছে। আমার মতন বাবারও ভয়ংকর নাক টান। একটু সুতো উঠে গেলে কি জেল্‌জেলে হয়ে গেলেই সার্টটা পায়জামাটা আর গায়ে তুলতে চান না তিনি। মা সেগুলি ধুইয়ে এনে তুলে রাখে। এখন সেসব কাজে লাগল।

দেখতে মন্দ লাগছিল না সোদপুরের মাসির ছেলেকে। রংটা ফর্সা তো। চুল কেটেছে, গায়ের ময়লা পরিষ্কার করেছে; তার ওপর ধোয়া পাঞ্জাবি পায়জামা গায়ে চড়িয়েছে। আমার পড়ার ঘরে ঢুকে দাঁত বার করে সে হাসছিল, ধরে নিয়েছে আমি তার ওপর এখন বেজায় সন্তুষ্ট। কিন্তু সেরকম কোন লক্ষণ আমি প্রকাশ করলাম না। গম্ভীর হয়ে বললাম, 'ঐ বুনোই থেকে গেলি?'

'"কেন?' তার মুখের হাসি নিভে গেল।

আমি আঙুল দিয়ে থুতনিটা দেখালাম।

নিজের থুতনির ওপর হাত বুলিয়ে সে বুঝতে পারল ব্যাপারটা। কিন্তু যেন এখানে তার কিছু করবার নেই—সম্পূর্ণ নিরুপায়, এমনভাবে সে আমার দিকে তাকাল। তেমনি গম্ভীর থেকে আমি টেবিলের টানা খুলে সেফ্‌টি রেজারটা বার করলাম, চটপট হাতে রেজারে নতুন ব্লেড পরালাম, দেওয়াল থেকে ছোট আরসিটা নামিয়ে টেবিলের ওপর দাঁড় করিয়ে রাখলাম, মুখে সাবান মাখা বুরুশ ঘষলাম—তারপর পাঁচ সাত মিনিটের কাজ। আমার মুখটা দেখতে দেখতে ডিমের মতন মসৃণ তকতকে হয়ে উঠল। ড্যাবড্যাবে চোখ মেলে গণেশ এতক্ষণ আমায় দেখছিল। দেখা শেষ করে সে একটা গাঢ় নিশ্বাস ফেলল।

এখন আর দাঁত বার করল না, অল্প হেসে আস্তে আস্তে বলল, 'মুখের চুলগুলি একদিন কাঁচি দিয়ে কাটতে গেছলাম—আর বাবা দেখতে পেয়ে এমন মার দিল—'

'বাবার সামনে কাটতে গেলে মার দেবেই।' দরজার দিকে সতর্ক দৃষ্টি বুলিয়ে অল্প হেসে বললাম, 'বাবা মা-কে দেখিয়ে সব কাজ করতে গেলে তবেই হয়েছে।'

প্রকাণ্ড একটা ঢোক গিলল গণেশ।

'আমার তো ওই যন্তরটন্তর কিছু নেই।'

'এটা দিয়েই এখন কাজ চালাবি—আর একটা নতুন ব্লেড দেব ওটা পরিয়ে নিবি—দুপুরে মা যখন ঘুমোবে তখন এ-ঘরে বসে চুপি চুপি—বুঝলি?'

খুশি হয়ে সে ঘাড় কাত করল।

'কিন্তু সাবধান—আমার সেফটি রেজার খুব ভাল করে ধুয়ে মুছে রাখা হয় যেন—নোংরামী আমি একেবারে পছন্দ করি না।'

গণেশ এবারও ঘাড় কাত করল।

এক সেকেণ্ড কথাটা চিন্তা করলাম, তারপর চোখের ইসারায় দোরটা আর একটু ভাল করে ভেজিয়ে দিয়ে আসতে বললাম গণেশকে। দেখলাম, আমি যা বলছি, যা করছি তাতেই তার প্রচণ্ড উৎসাহ।

আমার উৎসাহ অবশ্য অন্যদিক থেকে। একটা বুনোকে আমি শিখিয়ে পড়িয়ে মানুষ করে তুলছি। যেমন খেলা দেখাবার জন্য সার্কাসের দলের লোকেরা বনের পশুকে শিখিয়ে পড়িয়ে তোলে। সার্কাসের সিম্পাঞ্জী দাঁড়ি কামায় সিগারেট টানে খবরের কাগজ পড়ে আমার দেখা আছে। যেন সোদপুরের গণেশ সম্পর্কেও আমার সেই ধরনের উৎসাহ।

সিগারেটটা প্রায় শেষ করে এসেছি। গণেশ একভাবে তাকিয়ে আছে। মাঝে মাঝে ঢোক গিলছে।

'অভ্যাস আছে?' ভুরু কুঁচকে প্রশ্ন করলাম।

গণেশ মাথা নাড়ল।

সিগারেটের টুকরোটা তার হাতে তুলে দিলাম, বললাম, 'অভ্যাস নেই যখন খুব আস্তে টান দিবি।'

আস্তে আস্তে টানল সে। কিন্তু তা হলেও চোখমুখ লাল হয়ে গেল। দুবার খুক করে কাশল।

'থাক আর দরকার নেই—ফেলে দে, প্রথমটায় বেশি ধোয়া গিলতে গেলে বেদম কাশতে সুরু করবি।'

আর একটা বড় করে টান দিয়ে গণেশ জ্বলন্ত টুকরোটা হাত থেকে ফেলে দিল। আমি পা দিয়ে মাড়িয়ে আগুনটা নিভিয়ে দিলাম। তারপর সেটা মেঝে থেকে কুড়িয়ে জানালা গলিয়ে দূরে বাগানের ঝোপের ভিতরে ফেলে দিলাম।

গণেশের চোখমুখের লাল ভাবটা তখনো কাটেনি। নাকের ছিদ্র দিয়ে একটু একটু ধোঁয়া বেরোচ্ছিল।

'মাসিমা জানতে পারলে ভীষণ বকুনি দেবে।'

'মাসিমাকে জানাচ্ছে কে আহম্মক।' চাপা গলায় গর্জন করে উঠলাম। ধমক খেয়ে মার বোনপো রাগ করল না। বরং যেন নিশ্চিন্ত হল।

'বাবা আমায় কেবল বলত, সাবধান কারো সঙ্গে মিশে বিড়িসিগারেট যেন আবার অভ্যাস করতে আরম্ভ করিস না, তা হলে মগজ পেকে যাবে—লেখাপড়া হবে না।'

কথা শুনে হাসলাম।

'ছ ফুট লম্বা হয়েছিস মাথায়—এখনো কি তোর মগজ কাঁচা আছে ধরে নিয়েছিস।' একটু থেমে পরে বললাম, 'গাঁয়ের মানুষ তোর বাবা— কি খেলে কি হয় আর কি না খেলে না হয় বড় জানে কিনা, বিড়ি সিগারেট না খেয়ে তুই কোন্ পি. আর. এস পি. এইচ-ডি হয়েছিস শুনি?'

ইংরেজী শব্দগুলি গণেশ বুঝল না, কিন্তু আমার কথাটা বুঝতে পারল তার চোখ দেখে টের পেলাম। মুখ নীচু করে আছে। আমি যে অতি সত্যি কথা বলছি তাতে তার বিন্দুমাত্র সন্দেহ হচ্ছে না। সিগারেট টেনে টেনে আমি ঠোঁট কালো করে ফেললাম অথচ নাইন ক্লাশে পড়ছি—এত এত বই আমার; কথাটা সে না ভেবে পারে না। তাই আমি চুপ করতে চোখ তুলে সে আমার হাতের সিগারেটের প্যাকেটটা আবার দেখতে লাগল। তাজা মাছ দেখে বিড়াল যেমন করে তাকায়। বুনোটার এই তাকানো আমার ভাল লাগল।

মা মহাখুশি। গণেশ আর আমার কাছছাড়া হয় না। যতক্ষণ আমি বাড়িতে গণেশ আমার সঙ্গে আছে, আমার ঘরে আছে। আমার সঙ্গে সে কত কথা বলছে এবং গেঁয়ো ছেলেটা সম্পর্কে আমিও আর মার কাছে কোনরকম খুঁত খুঁত করছি না। 'গণেশ একটু বাবু হয়েছে,' মা মাঝে মাঝে বলে, 'খোকনের সঙ্গে থেকে এটা হয়েছে।' শুনে আমি চুপ করে থাকি। তা তো হবেই, মনে মনে বলি, গেঁয়োটাকে আমি বাবু সেজে থাকতে শিখিয়েছি, সিগারেট ফুঁকতে শিখিয়েছি, একদিন অন্তর দাড়ি গোঁফ কামাতে শিখিয়েছি, আর যখন তখন আমার টেবিল থেকে সিনেমার কাগজগুলি টেনে নিয়ে সুন্দরী অভিনেত্রী রেবা, চামেলী, স্বাতী বা অন্য কোনো মেয়ের মুখের ওপর উপুড় হয়ে থাকতে শিখিয়েছি।

একটা খেলা আমার—একটা আনন্দ। যেন আমার মনের ভাবটা এই, পোষা জন্তুটা আমার সব কিছু অনুকরণ করুক, শিখুক; তারপর কী দাঁড়ায়, কতটা যায় দেখা যাবে।

আমার সেই গোপন চিঠিগুলিও সে দেখল, পড়ল। মিষ্টি হাতের লেখা আদুরে চিঠি, অভিমানের চিঠি, কান্নার চিঠি, উচ্ছ্বাসের অস্থিরতার চিঠি। কে লিখেছে, কাকে লেখা এত সব গোপন পত্র হয়ত বোকাটা বুঝল না। এবং এই জন্য তার মাথা ব্যথাও নেই মনে হত। সিনেমার কাগজ খুলে সুন্দর মুখগুলি দেখতে দেখতে যেমন মাঝে মাঝে সে দীর্ঘশ্বাস ফেলত তেমনি মিষ্টি মিষ্টি চিঠিগুলি পড়া শেষ করে দেয়ালের দিকে চোখ রেখে চুপ করে থাকত আর কী যেন ভাবত।

বুনোটার এই চুপ করে থাকা ও দীর্ঘশ্বাস ফেলাটা আমি উপভোগ করতাম। কিন্তু ঐ পর্যন্ত। আর অগ্রসর হতে দেওয়া হবে না—আর কিছু শেখানো হবে না। এটা বলেছিল আমাকে আমার ক্লাবের বন্ধুরা। কেননা স্কুলে ক্লাসের কোনো ছেলের কাছে ঘুণাক্ষরেও আমার এমন এক বোকারাম মাসতুত ভাই আছে প্রকাশ করিনি। কিন্তু ক্লাবের নন্তু পিন্টুদের কাছে গোপন করিনি। বুনোটা সম্পর্কে তাদের সঙ্গে নানা পরামর্শ করার দরকার ছিল বৈকি। লেকের ধারের নির্জন অন্ধকারে বসে তিনজন সিগারেট টানতে টানতে অদৃশ্য গণেশচন্দ্রকে নিয়ে বিস্তর হাসাহাসি করতাম। নন্তু বলত, 'ছ ফুট লম্বা

তার ওপর গায়ের রংটা খুব ফর্সা বলছিস, কাজেই যেটুকু শেখানো হয়েছে ঐ থাক—আর বেশি শেখাতে গেলে তোর ভাত মারা যাবে।' নন্তুর ইঙ্গিতটা বুঝতে কষ্ট হয়নি। 'পিণ্টু বলছিল, 'হুঁ, ঐ একটা জায়গায় ফাঁক রাখবি—গেঁয়ো গোঁয়ার মানুষ—সব কিছু শেখাবার বিপদ আছে বৈকি।' বন্ধুদের কথা শুনে আমি হেসেছি। আমি যে অনেক বেশি চালাক বন্ধুরা হয়তো ঠিক চিন্তা করে দেখেনি। যদি বুনোটাকে সব কিছু দেখানো শেখানোর মন থাকত তো তাকে নিয়ে নিশ্চয় অন্তত এক আধদিন আমি বাইরে বেড়াতে বেরোতাম। একদিন তাকে আমাদের লেক-ক্লাবের আড্ডায় আনিনি। কি স্কুলের খেলার মাঠে। ওকে সঙ্গে নিয়ে আমি কোনোদিন রাস্তায় বা পার্কেও যেতাম না। যতটা মেলামেশা বা যেটুকু প্রশ্রয় দেওয়া বাড়ির চৌহদ্দীর মধ্যে থেকে। আমার বাইরের জগতে উঁকি দেবার ছাড়পত্র সে পায়নি।

মা মাঝে মাঝে ঘ্যান ঘ্যান করত। ভাইকে সঙ্গে নিয়ে আমি বেড়াতে যাই না কেন। চিড়িয়াখানা, গড়ের মাঠ, মনুমেণ্ট, যাদুঘর কত কি দেখবার আছে। আমি মুখ ভার করে বলতাম, 'আমার সময় নেই।' কাজেই বঙ্কুকে সঙ্গে দিয়ে মা সোদপুরের বোনের ছেলেকে এটা ওটা দেখতে, রাস্তাঘাট চিনতে পাঠাত। আমার কাছে গণেশচন্দ্র এসব আশা করত না যদিও। কেননা বাড়িতে থেকে আমার পড়ার ঘরের দরজার পাল্লা দুটো ভেজিয়ে দিয়ে তাকে যেটুকু দেখিয়েছিলাম চিনিয়েছিলাম তাই নিয়ে সে সন্তুষ্ট ছিল। বস্তুত যদি বা কোনোদিন হাবেভাবে আমার সঙ্গে বেড়াতে বেরোবার ইচ্ছা প্রকাশ করত তো তৎক্ষণাৎ গম্ভীরভাবে আমি মাথা নেড়ে বলতাম, 'এখনো সময় হয়নি, এখনো তোর জংলী ভাবটা পুরোপুরি কাটেনি—তুই আমার মাসতুত ভাই বন্ধুরা যখন শুনবে ভীষণ হাসাহাসি করবে।' সঙ্গে সঙ্গে সে চুপ করে যেত। দেয়ালের দিকে চোখ রেখে ভাবত। তারপর সিনেমার কাগজ খুলে সুন্দর মুখগুলি দেখত। তাকে খুশি রাখতে চট করে প্যাকেট থেকে একটা সিগারেট বার করে দিয়ে খাতাবই বগলে নিয়ে আমি স্কুলে বেরিয়ে গেছি। স্কুল থেকে ফিরে এসে আবার একটা সিগারেট তার কোলের ওপর ছুঁড়ে ফেলে দিয়ে আমি ক্লাবে ছুটে গেছি। আমার পড়ার ঘরে বসে বাবা মা কি চাকর বঙ্কুকে টের পেতে না দিয়ে সে যে লুকিয়ে সিগারেট খেতে শিখেছে এই জন্য আমি খুশি ছিলাম। একটু একটু করে বুনোটার বুদ্ধি বাড়ছে, মনে মনে বলতাম।

ছুটির দিনটাই মুস্কিল। অথচ ছুটির দুপুর, রবিবারের দুপুরটাই সবচেয়ে লোভনীয়। বাবা বাড়িতে থাকেন বলে মার চোখে সেদিন আর এক ফোঁটা ঘুম থাকে না। আর সেদিন চুপি চুপি বাড়ি থেকে বেরোবার মতলব করে জামাটা আমি গায়ে চড়িয়েছি কি মা কেমন করে জানি টের পেয়ে আমার ঘরের দরজায় ছুটে আসে।

'গণেশকেও সঙ্গে নিয়ে যা—এখন তো আর স্কুলে যাচ্ছিস না, ক্লাবে যাচ্ছিস না।' মা হেসে বলত। 'গাঁয়ের ছেলেকে তোদের ক্লাবে নিয়ে যেতে লজ্জা করে বলিস, এমনি না হয় ওকে নিয়ে কোথাও বেড়িয়ে আয়।'

সঙ্গে সঙ্গে জামাটা খুলে ফেলি।

'নাঃ বড্ড গরম। বেরোব না।'

মা আর হাসত না, গম্ভীর হয়ে যেত।

'এসব তোমার বাঁদরামী। গণেশকে সঙ্গে নেবার নাম করতে তোমার মাথা ব্যথা

সুরু হল। আশ্চর্য! নিজের মাসতুত ভাই, ধরতে গেলে নিজের মায়ের পেটের ভায়ের মতন!'

আঘাত পেয়ে মা চলে গেছে। আর আমি মনে মনে বলেছি, বরং এই বুনোটাকে আমি সঙ্গে করে স্কুলে নিয়ে যেতে পারি, ক্লাবেও হয়তো এক আধদিন যাওয়া চলে, কিন্তু এখন আমি যেখানে যাচ্ছি সেখানে অসম্ভব। ভাই বলে, ভাই বোন বাবা মা আত্মীয় বন্ধু —পৃথিবীর কাউকে সেখানে নিয়ে যাওয়া চলে না। এক যেতে পারে আমি আর আমার ঈশ্বর। আর তাই তো আমি এমন একটা নির্জন নিঃসঙ্গ দুপুরের অপেক্ষায় ছিলাম। তার ওপর এখন শরৎকাল। নীল আকাশে সাদা মেঘের ভেলা ভেসে বেড়াচ্ছে। নারিকেল পাতার ঝালর থেকে উজ্জ্বল রৌদ্র চুঁইয়ে পড়ছে। নীচে দীঘির জল আয়নার মতন স্বচ্ছ স্থির। আয়নার বুকে গাছের ছায়া, নীল আকাশের ছবি, সাদা মেঘের টুকরো টুকরো প্রতিবিম্ব। আর জলের কিনারে লম্বা সবুজ ঘাস, ঘাসের ডগায় হলদে ফড়িং।

ছবিটা চোখের সামনে ভেসে উঠতে না উঠতে মিলিয়ে গেছে মার জন্য—নষ্ট হয়ে গেছে। এমন করে দুটো রবিবারের ছুটির দুপুর নষ্ট হয়েছে ব্যর্থ হয়ে গেছে। গণেশকে সঙ্গে নিয়ে যা।

আমার কান্না পায়।

আমার সব কিছু থেকে ঐ দুপুর ঐ ছায়া ঐ রং ঘাস জল মেঘের ছবি আলাদা করে রেখেছি। ওখানে আমি ছাড়া আর কেউ থাকে না, থাকতে পারে না।

এর সঙ্গে আমার সিগারেট খাওয়া, লুকিয়ে দাড়ি কামানো, লুকিয়ে সিনেমার কাগজ খুলে সুন্দর মেয়ের মুখ দেখার কোনো যোগাযোগ নেই। মিষ্টি চিঠিগুলিরও না। চিঠি চিঠি। আর কারোর হতে পারে, অন্য কেউ লিখতে পারে। বললেই হল। লেখা হয়ে গেলে পড়া হয়ে গেলে কয়েক টুকরো কাগজ ছাড়া আর কি! সে সব এক দিকে।

আর এখন, পর পর দুটো রবিবার নষ্ট হবার পর, আজ এই তৃতীয় রবিবারের ছুটির দুপুরে আমি যেখানে যেতে চাইছি—আমার একান্ত গোপন সুন্দর নিভৃত জগতে, আর কেউ না, যাকে দেখলে আমি হাসি, ঘৃণা করি, অনুকম্পা করি, সোদপুরের আধা জানোয়ার আধা মানুষের চেহারার বোকারাম গণেশচন্দ্রকে নিয়ে যাওয়ার কথা চিন্তা করে আমি পায়ে মাথায় শিউড়ে উঠলাম।

অথচ আজ পরম সুযোগ। কি একটা কাজে বাবা কলকাতার বাইরে গেছে। মা ঘুমোচ্ছে। আকাশটাও আজ বড় বেশি নীল। মেঘের টুকরোগুলি অতিরিক্ত সাদা। নারিকেল পাতার ঝালর চুঁইয়ে হীরার মতন উজ্জ্বল রাশি রাশি রৌদ্র আয়নার মতন স্থির স্বচ্ছ দীঘির বুকে ঝরে পড়ে না জানি কী শোভা ধরেছে কল্পনা করে আমি যখন জামাটা ব্র্যাকেট থেকে টেনে আনতে যাব আমার দুই চোখ স্থির হয়ে গেল।

'আমি যাব দাদা।'

'কোথায়?'

'তুমি যেখানে যাচ্ছ।'

'আমি তো কোথাও যাচ্ছি না।'

'ঐ তো জামা পরছ।'

স্থির শক্ত হয়ে দাঁড়িয়ে আছে সে দরজায়। বাবার একটা পুরোনো সিল্কের পাঞ্জাবি গায়ে চড়িয়েছে, সদ্য পাটভাঙ্গা পায়জামা পরেছে। যেন মাকে দিয়ে বাক্স ঘেঁটে এগুলি বার

করে নিয়েছে। অথচ আজ মা উপস্থিত নেই সামনে—পাশের ঘরে ঘুমোচ্ছে। কিন্তু তার জন্য গণেশ চুপ করে বসে নেই। সেজেগুজে তৈরী হয়ে আছে, আমার সঙ্গে বেরোবে। বুঝলাম কদিনে আর একটু চালাকচতুর সাবালক হয়ে উঠেছে বুনোটা। দাদার সঙ্গে বেড়াতে যাবার জন্য মাসিমাকে দিয়ে আর্জি পেশ করানোর দরকার বোধ করছে না। আমার মুখের দিকে তাকিয়ে আধুলির সাইজের দাঁতগুলি বার করে সে হাসছিল। দেখে মাথাটা গরম হয়ে গেল। তথাপি জামাটা গায়ে চড়ালাম। 'আমি কাজে বেরোচ্ছি।' কঠিন গলায় বললাম, 'যেখানে যাচ্ছি সেখানে তোকে নিয়ে যাওয়া চলে না।'

'কেন চলবে না, তুমি তো এমনি বেড়াতে যাচ্ছ—কাজ আবার কি! আমি যাব।'

হতভম্ব হয়ে গেলাম। চিরুনি বুলিয়ে মাথাটা ঠিক করছিলাম। হাতের মুঠোয় চিরুনিটা স্থির হয়ে গেল।

'এমন গেঁয়ো জংলীকে সেখানে সঙ্গে করে নিয়ে যেতে আমার লজ্জা করবে।' রাগে আমার ঠোঁট কাঁপছিল।

'মোটেই আর আমি জংলী নই।' রাগ না করে গণেশ নরম গলায় বলল, 'কাল তুমিই বলছিলে; এখন আমাকে রীতিমত শহুরে ছেলে বলা যায়, তোমার মতন রোজ গায়ে সাবান মেখে স্নান করি, দাড়ি কামাই, সিগারেট খাই, পরিষ্কার জামাকাপড় পরি—সিনেমার কাগজ টাগজ নাড়াচাড়া করি—'

ঠাট্টা করে কাল কথাটা বলেছিলাম বটে। মজা দেখতে যে বুনোটাকে আমি আমার সব কিছু শিখিয়েছি দেখিয়েছি তা তার বুঝবার ক্ষমতা থাকত যদি! তাই আর রাগ না করে হাসলাম।

হুঃ, তোর বাইরেটা শহুরে হয়ে গেছে আমি অস্বীকার করছি না, কিন্তু ভিতরটা? মনটা? এখনো কাঁচা, এখনো গেঁয়ো ভাবটা পুরোপুরি রয়ে গেছে—আর একটু চালাক-চতুর না হলে—'

ড্যাবড্যাবে চোখে ছ ফুট লম্বা মানুষটা আমার মুখ দেখল, দীর্ঘশ্বাস ফেলল। যেন সামনে একটা আরসী পেলে তক্ষুণি সে নিজের মুখটা শরীরটা আর একবার ভাল করে পরীক্ষা করে। এখনো গেঁয়ো বোকা রয়ে গেছে আমার কথা শুনে বিশ্বাস করতে পারছে না।

চিরুনি চালিয়ে চুলটা ঠিক করে ফেললাম।

'দরজা থেকে সরে দাঁড়া।' রুমালে খানিকটা সেণ্ট ঢেলে সেটা পকেটে পুরলাম। গণেশ দরজা জুড়ে দাঁড়িয়ে আছে। ঘর থেকে আমাকে বেরোতে না দেবার মতলব? হেসে বললাম, 'ভাদ্দরের কাঠ ফাটা রোদ উঠেছে দেখছিস তো, এখন বাইরে হাঁটতে মোটেই ভাল লাগবে না। তার চেয়ে ফ্যানটা খুলে দিয়ে আমার টেবিলে বসে আরামসে সিগারেট খা, সিনেমার কাগজটা দ্যাখ, মিষ্টি চিঠিগুলো আর একবার পড়তে পারিস।' পকেট থেকে সিগারেট বার করলাম।

কিন্তু আজ আর সিগারেটের জন্য সে আর হাত বাড়াল না। চেহারাটা বিকৃত করে ফেলল। 'চিঠি পড়ে আর ছবি দেখে কেবল কী হবে। অনেক দেখা হয়েছে—অনেক পড়া হয়েছে—তুমি আমায় বাইরে নিয়ে চল।'

'বাইরে তোমার যাওয়া চলবে না। আমার সঙ্গে চলবে না। বঙ্কুর সঙ্গে যেতে পার।' রাগে আবার গজ গজ করে উঠলাম। 'ঐ চেহারা ঐ বুদ্ধি নিয়ে আমার সঙ্গে যেতে চাইছে, কী আস্পর্ধা!'

বললাম বটে, বলার সঙ্গে সঙ্গে আমার চক্ষু স্থির হয়ে গেল। যেন হঠাৎ একটা আগুনের ঝিলিক দেখলাম সোদপুরের মাসির ছেলের চোখে। অথচ দাঁতগুলি ঢেকে রেখে কেমন করে যেন হাসছে, শয়তানের মতন। অস্বস্তি বোধ করলাম।

রাস্তা ছেড়ে দে।' রুখে উঠলাম আমি।

'আমি সব বলে দেব মাসিমাকে।' গণেশ গম্ভীর হয়ে বলল।

'কি বলবি শুনি?'

'তুমি আমায় সিগারেট খেতে শেখাচ্ছ, এই বয়সে গালে রেজার চালাতে শেখাচ্ছ, সিনেমার মেয়ের মুখ রাতদিন দেখাচ্ছ—'

'হায়রে গর্দভ, হায়রে মূর্খ!' মনে মনে বললাম, 'এসব অপরাধের সঙ্গে তুইও জড়িয়ে আছিস, কাজেই বাবা মার কাছে শাস্তি পেতে একলা আমিই পাব না, তুইও পাবি, কথাটা ভেবেছিস?' কিন্তু তথাপি আমার বুকের ভিতর গুড়গুড় করতে লাগল। গেঁয়ো গোঁয়ার মানুষ, কী বলতে আরো সব কী বলে দেয় মাকে চিন্তা করে চট্ করে রাগটা সংবরণ করলাম। পায়চারী করতে লাগলাম ঘরের ভিতর। এদিকে বাইরে রোদ কমলা রং ধরতে সুরু করেছে—সাদা মেঘের ধারগুলি থেকে এখনি পাটকিলে রং ফুটে বেরোবে —নারিকেল গাছের ছায়ারা লম্বা হতে থাকবে, দীঘির জলের স্বচ্ছ আরসীটা কালো হয়ে নিভে যাবে একসময়। বুকের ভিতর হায় হায় করে উঠল। আমার আর একটা ছুটির দুপুর চিরদিনের মতন নষ্ট হতে চলল হারিয়ে যেতে লাগল। কেমন অস্থির হয়ে উঠলাম। অস্থিরতার মধ্যে বুদ্ধি ঠিক করে ফেললাম।

'আচ্ছা, তাই হবে, চ—তুইও সঙ্গে যাবি।' বুনোটার দিকে তাকিয়ে হাসলাম। সেও হাসল। অতিরিক্ত খুশি হবার দরুন দাঁতগুলি আবার বেরিয়ে পড়ল। দুজন ঘরের বাইরে চলে এলাম।

'চমৎকার দুপুর!'

আমি কথা বললাম না।

'আকাশটা নীল—মেঘগুলো কী সাদা!' আমার পিছনে থেকে সে কথা বলছিল। আমি ভাবছিলাম অন্য কথা।

'সত্যি দাদা, তোমার সঙ্গে বেড়াতে বেরোনো আমার অনেকদিনের ইচ্ছা।' একটু পর আবার বলল ও।

আমার সঙ্গে বেড়াতে বেরোলেই কি আর আমার সমান হওয়া যাবে, মনে মনে বললাম ও হাসলাম। সত্যি, সেখানে গেঁয়োটাকে নিয়ে যাচ্ছি বলে একটু আগে যে ভয়টা হচ্ছিল সেটা তৎক্ষণে কেটে গেছে। আমার ক্লাবের কোনো বন্ধুকে সঙ্গে নিয়ে যাচ্ছি না, ক্লাসের কোনো ছেলেকেও না। পোষা কুকুরটুকুর যেমন লোকে সঙ্গে নিয়ে যায় তেমনি সোদপুরের এই গাড়লটা আমার সঙ্গে যাচ্ছে। আমাদের বালিগঞ্জের ছেলেদের সে কতটুকু দেখেছে, কী জানে! বাড়িতে দেখেছে আমাকে, আমার পড়ার ঘরে দেখেছে, বাবার সামনে দেখেছে, মার সামনে দেখেছে। তাতে আমার কতটুকু জানা হয়েছে দেখা হয়েছে। তাই মনে মনে হাসলাম।

বরং ওটা সঙ্গে যাচ্ছে বলে উৎসাহটা ক্রমেই বাড়ছিল।

অর্থাৎ বুনোটাকে এই কদিনে অনেক কিছু দেখিয়েছি শিখিয়েছি—না হয় আর

একটু দেখবে শিখবে। আমার বুদ্ধির শিকল দিয়ে যখন ওকে বেঁধে রেখেছি, তখন আর ভয় কি! বরং নতুন একটা খেলা হবে। আর একটু দেখে শিখে গেঁয়োটা কতটা অগ্রসর হয় মজা দেখা যাবে।

ট্রাম ডিপো পিছনে রেখে সরু পথ ধরেছি। তখন থেকে পথের দু ধারে নারিকেল গাছের সারি সুরু হল। একটা দুটো পাখি ডাকছিল মাঝে মাঝে।

'মনে হয় গাঁয়ের রাস্তায় এসে গেছি, দাদা।'

'হুঁ, তোদের সোদপুরের জঙ্গল।'

ঠাট্টাটা সে বুঝল না। সত্যি কোনো জঙ্গলের কাছে এসেছি কিনা দেখতে অবাক হয়ে এদিক ওদিক তাকায় আর চপ্পলের শব্দ করে হাঁটে। বাবার এক জোড়া পুরোনো চপ্পল পরে এসেছে।

'তুই সাঁতার জানিস?'

'খুব।' উৎসাহে লম্বা পা ফেলে আমার সঙ্গে এবার কাঁধ মিলিয়ে হাঁটতে আরম্ভ করল বুনোটা। 'আমরা কোনো দীঘিটিঘির ধারে যাচ্ছি বুঝি?'

'হুঁ', সংক্ষেপে বললাম, 'পদ্মদীঘি।'

'যদি পদ্ম ফুটে থাকে, আমি সাঁতার কেটে জল থেকে এন্তার ফুল তোমার জন্যে তুলে আনব, দাদা।'

'তাই আনবি।' খুশি হয়েছি এমন ভান করে বললাম, 'এখন শরৎকাল, এখন তো পদ্ম ফোটার সময়।' আর মনে মনে বললাম, বোকাটাকে সঙ্গে এনে ভালই করেছি। আমি সাঁতার জানি না, অথচ মাঝে মাঝে পদ্ম ফোটে, ইচ্ছা থাকলেও দুটো একটা ফুল আমি ওকে তুলে এনে দিতে পারি না।

'এই শোন্।' বললাম, 'গাছে চড়তে পারিস?'

'খুব।' অতিরিক্ত খুশির দরুন গলার এমন ঘোঁৎ শব্দ করে সে হাসল যে প্রথমটায় চমকে উঠলাম, যেন একটা পশুর গলার শব্দ শুনলাম। গলা বড় করে গণেশ বলল, 'গায়ে থেকে মানুষ, গাছে চড়তে শিখব না!'

ভাল, মনে মনে বললাম, ওদের দীঘির পাড়ের বাগানের পেয়ারা গাছে কত পেয়ারা পেকেছে, কামরাঙা গাছে কামরাঙা, অথচ গাছে চড়া শেখা হয়নি বলে একটা ফলও আমি ওকে পেড়ে দিতে পারি না। আজ গাড়লটাকে দিয়ে পদ্ম তুলে আনা, গাছের ফল পাড়া সব কাজ চলবে।

যেন দাদার সব কাজ করে দেবার বল বিক্রম নিয়ে ছ ফুট লম্বা কাঠামোটা আগে আগে হেঁটে চলল। এখন আর তার ওপর আমার বিদ্বেষ নেই, বা তার জন্য লজ্জা পাবার কারণ নেই। এমন একটা প্রয়োজনীয় জন্তু সঙ্গে থাকা দরকার চিন্তা করে হাল্কা মনে আমিও হাঁটতে লাগলাম।

'বাঁয়ে।' পিছন থেকে হেঁকে উঠলাম। গণেশ বাঁ দিকে মোড় নিল। প্রথমে মেহেদীর বেড়া, তারপর মাধবীর ঝোপ, তারপর কাঠমালতির জঙ্গল পার হয়ে সবুজ ঘাসের ফ্রেমে আঁটা সেই আশ্চর্য দীঘির কাছে আমরা এসে গেলাম।

না, জলের আয়নায় নারিকেল গাছের ছায়া, সাদা মেঘ, নীল আকাশের ছবি দেখবার আগে আমার চোখ সরে গেল ওদিকে। করবী গাছের ছোট্ট ছায়ায় দাঁড়িয়ে আছে ও। আমার জন্য অপেক্ষা করছে। নিশ্চয় অনেকক্ষণ দাঁড়িয়ে আছে। আমার দেরি হয়ে গেল

সঙ্গে তর্ক করতে। শেষ পর্যন্ত যদিও ওটাকে সঙ্গে আনতে হল। মনটা খারাপ হয়ে গেল। নিশ্চয় রাগ করেছে ও আমার এত দেরি দেখে। অন্যদিন দেখা হওয়া মাত্র ছুটে এসেছে। আজ চুপ করে দাঁড়িয়ে আছে। আজ তার বেশভূষা অন্যরকম। ফ্রক না, শাড়ি পরেছে। মেঘের রং। চট্ করে মনে পড়ে গেল। ওটাই তার মেঘডম্বুর শাড়ি। টালিগঞ্জের মাসিমা জন্মদিনে উপহার দিয়েছে, সেদিন বলছিল। এখানেও মাসিমা। কথাটা মনে পড়ে একটু হাসি পেল।

'এই, তুই বোস, নারকেল গাছের ছায়ায় চুপ করে বসে থাক।' বুনোটাকে বসিয়ে দিয়ে আমি করবী গাছের কাছে ছুটে গেলাম।

'চুপ করে আছ কেন?' ওর হাত ধরলাম।

হাত ছাড়িয়ে নিল ও। দু হাত তুলে খোঁপা ঠিক করতে ব্যস্ত হয়ে পড়ল। এই নিয়ে দুদিন আমি তাকে খোঁপা পরতে দেখলাম। যদিও এম্নি বেণী করে রাখলেও ওকে কম সুন্দর দেখায় না। কিন্তু খোঁপা পরলে বেশি সুন্দর লাগে। মেঘডম্বুর শাড়ির সঙ্গে মেঘের থোকার মতন খোঁপাটাই চমৎকার মানিয়েছে। যেমন ফ্রকের সঙ্গে চেরা-বেণীটা ভাল লাগে।

'কথা বলছ না কেন?'

'দু রবিবার আসনি কেন?'

'ও, তাই অভিমান।' অল্প হাসলাম। কিন্তু বলতে পারলাম না ওই বুনোটা সঙ্গে আসতে চেয়েছিল, লজ্জা করছিল ওটাকে সঙ্গে করে এখানে আসতে। বললাম, 'শরীরটা খারাপ ছিল, তাই আসা হয়নি।'

'যত সব বাজে ওজর, ইস্ কী মিথ্যা কথাই না বলতে পার তোমরা বালিগঞ্জের ছেলেরা!'

'বিশ্বাস কর!'

'মোটেই বিশ্বাস করি না তোমার কথা।' ঠোঁট ফোলাল ও, ভুরু কোঁচকালো। 'নিশ্চয় তুমি আর কারো সঙ্গে প্রেম করছ।'

'আর কে, আবার কে!' হাসতে গিয়ে অবাক হয়ে আমি ওর ফোলা ঠোঁট কোঁচকানো ভুরু জোড়া দেখলাম।

'তা কত মানুষ থাকতে পারে।' আকাশের দিকে চোখ ঘোরালো ও। 'নন্তুর বোন হতে পারে, পিণ্টুর ছোট পিসি হতে পারে।'

'মোটেই না, তোমার গা ছুঁয়ে বলছি, ওদের দিকে তাকাতে আমার ঘেন্না করে।' ও দেখতে পায় এমন করে ঘাসের ওপর থুথু ফেললাম। 'নন্তুর বোনটাকে দেখলে আমার শাকচুন্নির কথা মনে হয়, পিণ্টুর ছোট পিসিকে মনে হয় পেত্নী একটা।'

এবার ও ঘাসের দিকে তাকায়, দুই ঠোঁটের মাঝখানে হাসির রেখা জাগল।

'তোমরা বালিগঞ্জের মেয়েরা এমন ভুল বোঝাবুঝি কর—সত্যি দুঃখ হয়।' ওর হাত ধরলাম, এবার হাত ছাড়াল না ও।

আমি হাসলাম।

'আসলে আমার অসুখ করেনি, বুঝলে, ওই যে নারকেল গাছের ছায়ায় উল্লুকটা বসে আছে, ওটার জন্য আসা হয়নি—দুটো রবিবার নষ্ট হল।'

'কে ও!' রুবি নারিকেল ছায়ার দিকে চোখ ফেরায়।

'সোদপুরের ছেলে। মা বলে, আমার মাসতুত ভাই—কিন্তু আমি ভাই বলে স্বীকার করি না।'

কিন্তু রুবি একটু বেশিক্ষণ সেদিকে তাকিয়ে থাকে, তারপর আস্তে আস্তে চোখ ফেরায়।

'রংটা খুব ফর্সা, কেমন না?'

'ওই ফ্যাসফেসে রংই একটা আছে—আর কিছু নেই।'

'উঁচুলম্বা আছে ছেলেটা।'

'ওই মাথায় তালগাছের মতন লম্বা হয়েছে—ভেতরে কিছু নেই।'

'কেন!' ছোট একটা ঢোক গিলল রুবি।

'বোকা—একেবারে বোকা।' আবার ঘাসের ওপর থুথু ফেললাম আমি। নারিকেল গাছের ছায়ার দিকে চোখ ফিরিয়ে রুবি আবার একটু সময় কী ভাবে।

'লেখা পড়া জানে না?'

'সেভেন পর্যন্ত বিদ্যা।' অল্প হাসলাম। 'হয়তো তা-ও না, বলে বটে।'

'একবার কাছে ডাক না।' রুবি আর একটা ছোট ঢোক গিলল।

'কি হবে কাছে ডেকে। ভয়ংকর বুনো। কথা বলে সুখ পাবে নাকি ওর সঙ্গে।' আমি নাক কোঁচকালাম। 'সদ্য পাড়া গাঁ থেকে এসেছে। যখন আমাদের বাড়িতে এসে উঠল তখন তুমি যদি চেহারাটা দেখতে। এই লম্বা চুল মাথায়, থুতনিতে দাড়ির জঙ্গল, কী নোংরা বা বেশভূষা! তবু তো আমাদের এখানে থেকে থেকে ক'দিনে একটু পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন থাকতে শিখেছে।'

'জলের দিকে তাকিয়ে আছে।' রুবি অল্প হাসল।

'হুঁ, পদ্মফুল দেখছে। দেখছ না কেমন হাবার মতন একদিকে তাকিয়ে আছে।' নীচু গলায় হাসলাম। 'তুমি যে একটি মেয়ে—আমি যে তোমার সঙ্গে কথা বলছি, দেখতে পাচ্ছে, অথচ এদিকে তাকাচ্ছে না। অর্থাৎ মেয়েটেয়ে সম্পর্কে কোনো জ্ঞানই তার নেই, সেসব কোনো বোধই ঈশ্বর তার ভিতর দেয়নি। হাঁ করে তাকিয়ে জল আর জলের পদ্ম দেখছে তো দেখছেই।'

'সরল—সাদাসিধা খুব, কেমন না?'

'গরু—গাধাও বলতে পার।' রুবির চোখের ভিতর তাকালাম। 'কাজেই এখানে, তোমার ও আমার মধ্যে ওটাকে আনতে পেরেছি। কেননা, মাথায় কিস্‌সু নেই যার তাকে দিয়ে ভয়ও নেই—গোড়ায় ভয় করছিলাম সঙ্গে আনতে। তাই তো দুটো রবিবার আসা হল না।'

রুবি লম্বা মতন একটা নিশ্বাস ফেলল। চোখের পালক ঘাসের দিকে নেমে গেল ওর। একটু চুপ থেকে আমি আবার হাসলাম।

'অবিশ্যি আমার সঙ্গে থেকে একটু একটু শহুরে হতে শিখছে—ঐ দেখে দেখে যেটুকু অনুকরণ করার—তার বেশি না, নিজে থেকে কিছু করবার বুঝবার ক্ষমতাই ঈশ্বর তাকে দেয়নি।'

'কি শিখেছে শুনি!' রুবি হাসল না।

'আমরা বালিগঞ্জের ছেলেরা কী করি কেমন করে থাকি তুমি কি জান না। এই ধর যেমন রোজ গায়ে সাবান মাখা। আমার সঙ্গে এক বিছানায় শোয়। সাবান মেখে স্নান না

করলে আমি আমার বিছানায় ওকে শ্তে দেব নাকি। আমি একদিন অন্তর শেভ করি—বলে কয়ে ওটাও ওকে অভ্যাস করিয়েছি। রামছাগলের মতন মুখ করে রাখলে আমি আমার ঘরে ঢুকতে দিতাম না ওকে।'

'আর?' রুবি এবার মুচকি হাসল।

'আমি স্মোক করি তুমি জান, দেখাদেখি একটু আধটু সিগারেট টানে এখন বোকাটা। আমি সিনেমার কাগজ রাখি তুমি জান। আমার দেখাদেখি সেগুলো নাড়াচাড়া করে মাঝে মাঝে, সুন্দর মেয়ের মুখ থাকলে ছবিটা ঘুরিয়ে ফিরিয়ে দেখে।'

'তবে আর কি, তবে তো একরকম পাকিয়ে এনেছ।' রুবি হঠাৎ যেন কেমন গম্ভীর হয়ে গেল।

'ধেৎ—ও আবার পাকবে কি, পাকতে যাওয়ার জন্যও বুদ্ধি থাকা চাই; ওই তো বললাম, যেটুকু দেখছে সেটুকুই করছে—তার বেশি না। যেমন একটা বানরকে সিগারেট খাওয়া শেখালে সিগারেট খাবে এ-ও তেম্নি।'

'ইস্—ভীষণ বাড়িয়ে বলছ তুমি তোমার ওই মাসতুত ভাই সম্পর্কে।' রুবি আবার আকাশের দিকে চোখ তুলল, কেমন যেন অস্বস্তিবোধ করছে ও—চেহারা দেখে বুঝলাম।

'মোটেই না।' আমারও খারাপ লাগল বোকাকে বোকা স্বীকার করে নিতে রুবির আটকাচ্ছে কেন। 'তুমি বললে বিশ্বাস করবে? তোমার সব কটা চিঠি ওই গাড়লটা পড়েছে, আমিই পড়তে দিয়েছি—'

'মাইরি?' চমকে উঠল ও, চোখের পাতা দুটো কেঁপে উঠল।

'তাতে কি।' ব্যাপারটাকে সহজ করে দিতে আমি হাল্কা গলায় হাসলাম। 'ওই পড়াই সার—একটা চিঠি পড়ে তা থেকে কোন আইডিয়া করে নেওয়ার ক্ষমতা ভগবান ওকে দিয়েছে নাকি। যখন পড়ল, তখন পড়ল, যেমন সিনেমার কাগজ উল্টে একটা সুন্দর মেয়ের ছবি যখন দেখল—দেখল, ব্যস্ তারপর এই নিয়ে কিছু ভাবা বা চিন্তা করা ওই অজবুকটার কাছ থেকে তুমি আশা করতে পার না।'

কিন্তু তবু রুবির দুশ্চিন্তার ভাব কাটছে না।

আমি আর এক দফা হাসলাম।

'যদি তাই হত তো চিঠি পড়া শেষ করে আমায় নিশ্চয় এক আধবার সে জিজ্ঞেস করত, কার চিঠি কে লিখেছে বা কেন এত মিষ্টি মিষ্টি কথা লেখে—চিঠিতে আমার বা তোমার নামধাম নেই যখন।'

'হ্যাঁ, তা-ও বটে।' এবার একটু খুশি হল ও। আমার চোখের দিকে তাকাল।

''ডাকব কাছে? তুমি কথা বলে দেখবে?' আবার আমি নাকের আগাটা কোঁচকালাম। 'তখন বুঝবে কেমন বুনো জংলী মার ওই সোদপুরের বোনের ছেলে।

রুবি অস্পষ্টভাবে ঘাড় কাত করল।

'এই গণেশ।'

গণেশ চমকে উঠে চোখ ফেরাল। জল দেখা শেষ করে এখন বুঝি ওধারের বাগানের পেয়ারা আর কামরাঙ্গা গাছ কটা দেখছিল গুনছিল।

'ইদিকে আয়।' হাত তুলে ডাকলাম।

ছ ফুট লম্বা শরীর নিয়ে হাঁদারাম উঠে দাঁড়াল। কাছে ডেকেছি বলে বেজায় খুশি। আমি ঈশ্বরকে ডাকছিলাম রুবির সামনে না বাতাসার মতন গোল মাথার দাঁতগুলি যার

করে দিয়ে বুনোটা হাসতে আরম্ভ করে। কিন্তু ঈশ্বর আমার ডাক শুনবে কেন, যার যেমন স্বভাব গড়ে দিয়েছে—দু হাত দুয়ে থাকতে সব কটা দাঁত সে মেলে ধরল। তা-ও যদি শব্দ করে হাসত অজবুকটা। কাঁঠালের কোয়ার মতন এতগুলি দাঁত বার করে চুপ করে হাসতে থাকলে যে-কেউ তাকে ইডিয়ট ছাড়া আর কিছু মনে করবে না, করতে পারে না। অবশ্য রুবি চুপ করে ছিল। কিন্তু ওর চোখ মুখের অবস্থা কেমন হল আমি দেখিনি। আমার লজ্জা করছিল তখন রুবির দিকে তাকাতে; ঘাসের দিকে তাকিয়ে ছিলাম। অবস্থাটা একটু সয়ে আসতে কটমট করে আমি গণেশের দিকে তাকালাম। যেন আমার এই তাকানোর অর্থ সে বুঝল। দাঁতের সারি বুজিয়ে ফেলল। রুবি একদৃষ্টে গণেশকে দেখছিল, ওর চেহারার কোনো পরিবর্তন বোঝা গেল না। কেবল হাত তুলে খোঁপাটা ঠিক করছিল।

'গণেশ চমৎকার সাঁতার কাটতে জানে।' বললাম রুবিকে।

'তাই নাকি।' আমার দিকে চোখ ফেরাল ও।

'যদি তুমি চাও তো ওই সুন্দর পদ্মফুলটা সে তোমাকে তুলে এনে দিতে পারে। কেমন পারবি না, গণেশ?' আবার সে দাঁত বার করছিল, কিন্তু আমি চোখের ইসারায় ধমক দিতে সেগুলো আর বার করতে সাহস পেল না, ঠোঁট বোজা রেখে গণেশ হেসে ঘাড় কাত করল।

'নীচে ইজের আছে না তোর?'

'আছে।'

'তবে ওই ঝোপের পাশে গিয়ে পা'জামাটা খুলে আয়।'

কথা না কয়ে গণেশ কেয়াফুলের বড় ঝোপটার ওপাশে ছুটে গেল। রুবির দিকে তাকিয়ে হাসলাম।

'আমি যা বলব তাই শুনবে। বুদ্ধি না থাকায় একটা মস্ত সুবিধে। পোষা কুকুরের মতন, ওকে দিয়ে আমি যা ইচ্ছা করাতে পারি।'

রুবি কথা বলছিল না। কেয়ার ঝোপের দিকে ওর চোখ। গণেশ ঝোপের ওপাশ থেকে বেরিয়ে এল। বুঝলাম ওটা বাবার পুরনো ইজের—দু জায়গায় ফুটো হয়ে গেছে; তাল গাছের গুঁড়ির মতন ইয়া লম্বা দুটো পা, তার ওপর চুলে ভর্তি—আমার কেমন ঘেন্না করছিল গাড়লটার দিকে তাকাতে, তবু এতক্ষণ পায়জামা পাঞ্জাবিতে একরকম লাগছিল, এখন বনের পশু ছাড়া কিছু কল্পনা করা যায় ওকে? আর ঐ অবস্থায় রুবির সামনে এসে দাঁড়িয়েছে দেখে আমি ধমক লাগালাম।

'এখানে এলি কেন, জলে নেমে পড়—ফুলটা তুলে আন।'

'বোটা শুদ্ধ তুলে আনবে।' রুবি বলল, রুবি এই প্রথম বুনোটার সঙ্গে কথা বলল। বস্তুত তাতে তার একটু বেশি খুশি হবার কথা, কিন্তু তৎক্ষণাৎ জলের দিকে ছুটে গেল বলে চেহারাটা দেখতে পেলাম না। আমার মনে হয় না একটি মেয়ের মুখে একথা শোনার পরও গণেশের চেহারার খুব একটা পরিবর্তন ঘটেছিল—কেননা, ফুলটাই এখানে তার লক্ষ্য, ওটা এনে কোনো মেয়ের হাতে তুলে দেবার মধ্যে যে উত্তেজনা—একটা অন্য ভাব থাকতে পারে তা ভেবে দেখার মতন মগজ তাকে দেয়নি ঈশ্বর।

'এসো আমরা জলের কাছে যাই।' রুবি বলল। রুবির হাত ধরে আমি দীঘির দিকে এগোই। তখন রোদ্রের কমলা রং ধরেছে। জলে নেমে এত জোরে গেঁয়োটা সাঁতার কাটছে, হাত পা ছুঁড়ছে যে ঈষৎ লাল হয়ে আসা মেঘের ছায়া, নীল আকাশ, নারিকেল

গাছের সুন্দর ছবিগুলি ভেঙেচুরে কোথায় যেন মিলিয়ে গেল। সবটা দীঘির জল তোলপাড় করে একটা জানোয়ার সাঁই সাঁই করে পদ্মবনের দিকে ছুটেছে। দৃশ্যটা কেমন অস্বস্তিকর লাগছিল, অথচ রুবির জন্য ডাঁট শুদ্ধ পদ্ম ফুল ছিঁড়ে আনতেই হবে। আড়চোখে রুবিকে দেখলাম, দৃশ্যটা তার ভাল লাগল কি খারাপ লাগল বোঝা গেল না। মুখের রেখার কোনো পরিবর্তন ছিল না। চোখের কালো লম্বা পালকগুলি স্থির করে ধরে রেখে ও জল দেখছিল।

ফুল নিয়ে গণেশ ফিরে এল। কোমর জলে দাঁড়াল। রুবি হাত বাড়াল ফুলটা ধরতে।

'না', আমি বাধা দিলাম, 'তুই আর একটু কাছে উঠে আয়, গণেশ।'

আমার কথামত সে তীরের কাছে উঠে এল।

'ওর খোঁপায় গুঁজে দে পদ্মটা।'

রুবি চমকে উঠল, আমার চোখের দিকে তাকিয়ে মুচকি হাসল। আমি আদেশ করলাম, 'দে, সুন্দর করে গুঁজে দে ওটা ওর চুলে।' গম্ভীর হয়ে গণেশ দাঁতগুলি বার করতে চেয়েছিল, আমার চোখের ধমক খেয়ে নিজেকে সংশোধন করল। রুবি ঘাড় নোয়াল! গণেশ ওর খোঁপার চুলের ভিতর ফুলটা আটকে দিল। খোঁপাটা একটু নড়ে গেল। রুবি হাত দিয়ে ওটা ঠিক করতে চেয়েছিল, কিন্তু দেখা গেল বাঘের থাবার মতন বিশাল দুটো হাতের তেলো দিয়ে চেপেচুপে গণেশই ওটা ঠিক করে দিয়েছে। রুবি একটু লাল হয়ে উঠল।

'যা, আর একটা ফুল নিয়ে আয়।'

বলা মাত্র পশুর মতন ঝাঁপিয়ে গণেশ জলে পড়ল।

'ইস্, এমন লজ্জা করছিল আমার।' রুবি বলল।

'কেন, কাকে লজ্জা', আমি হাসলাম, 'ওর মাথায় কিছু আছে নাকি; তোমার চুলে গুঁজে দিচ্ছিল বলে অন্যকোনরকম ধারণা তার মনে এসেছিল, তুমি আশা করতে পার না —যদি ওই বোকাটাকে দিয়ে তোমার লজ্জা করে তবে একটা গাছকে দিয়েও তোমার লজ্জা পাওয়া উচিত।'

রুবি ঠোঁট ফাঁক করে হাসল।

'আহা, তা হলেও তো পুরুষ।'

'তার সে খেয়ালই নেই সে একটা পুরুষ, আর—আর তুমি এমন ফুটফুটে চেহারার একটি নরম মেয়ে।'

রুবি ঢোক গিলল, চুপ করে রইল।

'বরং আমার ভয় হচ্ছিল বুনোটার হাতের নখগুলির জন্য, বাঘের নখের মতন এত বড় এক একটা নখ; যখন তোমার খোঁপা ঠিক করে দিচ্ছিল ঘাড়ের নরম চামড়ায় ওই নখের আচড় না লাগে, রক্ত না বেরোয়।'

'না, কিছু হয়নি।' রুবি নরম গলায় হাসল ও হাত দিয়ে নিজের ঘাড় কাঁধটা ছুঁয়ে দেখল। গণেশ ততক্ষণে সাঁতার কেটে পদ্মবনের কাছাকাছি চলে গেছে।

'তুমি ফুলটা গুঁজে দিলে না কেন?' রুবি প্রশ্ন করল।

ঘাড় কাত করে হাসলাম।

'আমি তো অনেক গুঁজেছি—তোমার খোঁপায় কম ফুল গুঁজে দিয়েছি! আজ

বুনোটাকে দিয়ে কাজটা করালাম।'

'আর একটু শহুরে হতে শেখাচ্ছ বুঝি ওকে?'

'হ্যাঁ, তা-ও বলতে পার।' অল্প শব্দ করে হাসলাম, 'বা বলতে পার মজা দেখছিলাম, খেলাচ্ছিলাম, একটা পশুকে নিয়ে খেলাতে তোমার ভাল লাগে না? কেমন করে ও তোমার খোঁপাটা হাটকায় মাথাটা দু হাতে চেপে ধরে?'

রুবি আর কথা বলল না, একটা গাঢ় নিশ্বাস ফেলল।

গণেশ পদ্ম নিয়ে ফিরে এল।

রুবি আবার হাত বাড়াল। আমি বাধা দিলাম না। গণেশ ওর হাতে ফুলটা তুলে দিতে রুবি সেটা তাড়াতাড়ি ব্লাউজের ফাঁকে বুকের ওপর গুঁজে রাখল।

'আয়, এইবেলা জল থেকে উঠে আয়।' গম্ভীর হয়ে গণেশকে ডাকতে সে তীরে উঠে এল। যেন আমি তার ওই অবস্থায়—ভিজা ইজের পরা ভিজা গা-মাথা নিয়ে গাড়লের মূর্তি হয়ে রুবির সামনে দাঁড়িয়ে থাকা একেবারেই পছন্দ করব না অনুমান করে কাপড় বদলাতে সে ঝোপের দিকে ছুটে যাচ্ছিল, আমি বাধা দিলাম।

'উঁহু, আরো কাজ আছে, ফল পাড়তে হবে—পা'জামা পরে গাছে চড়া সুবিধা হবে না।' রুবির দিকে ঘাড় ফেরালাম, 'কটা পাকা পেয়ারা পেড়ে দিক তোমাকে?'

রুবি কিন্তু খুশি হল কিনা বুঝলাম না, কেবল ছোট ঘাড়টা একটু কাত করল ও। আমরা বাগানের দিকে চললাম। গণেশ আগে, আমি ও রুবি পিছনে। গাছের ছায়া তখন লম্বা হয়ে গেছে, রোদের রং আরো গাঢ় হয়েছে, ঝিঁঝি ডাকছিল।

গণেশকে গাছে তুলে দিয়ে দুজনে নীচে দাঁড়ালাম। দেখলাম, এখন যেন রুবির উৎসাহ একটু একটু করে বাড়তে আরম্ভ করেছে। আঙুল দিয়ে গাছের ডাশা পেয়ারাগুলি ও দেখিয়ে দেয়, আর, এক ডাল থেকে আর এক ডালে ঝুলে পড়ে গণেশ সেগুলি ছিঁড়ে ছিঁড়ে নীচে ছুঁড়ে ফেলে।

'এখন অনায়াসে একটা বানর কি শিম্পাঞ্জী বলে ধরে নিতে পার তুমি গণেশকে: দ্যাখ ঐ মগডাল থেকে লম্বা হাত বাড়িয়ে কেমন করে পেয়ারা ছিঁড়ছে।' রুবি আমার সঙ্গে হাসল না, পেয়ারা কুড়াতে ব্যস্ত হয়ে পড়ল। টুপ টাপ করে গাছ থেকে ক্রমাগত পেয়ারা পড়ছে মাটিতে। একটা পেয়ারা ওর খোঁপার ওপর পড়ল, পদ্মের দুটো পাপড়ি খসে পড়ল পেয়ারার বাড়ি লেগে, একটা এসে পড়ল রুবির বুকের ঠিক মাঝখানে। যদি আমি এমন করতাম, গাছে চড়তে না জানি, যদি মাটিতে দাঁড়িয়ে থেকেও এভাবে ওর চুল কি বুকের ওপর পেয়ারা ছুঁড়ে ফেলতাম রুবি খিলখিল করে হেসে সারা হত। কিন্তু এখন ও হাসছে না, কেননা ইচ্ছা করে বা দুষ্টামী করে কেউ তার মাথা বা বুক লক্ষ্য করে পেয়ারা ছুঁড়ে মারছে না। গাছের ওপর যে আছে তার সেরকম দুষ্টামী করার, ছেলেমানুষী খেলা খেলবার বুদ্ধিই নেই রুবি এটুকু বুঝে ফেলেছে, তাই না ও এত গম্ভীর। রুবির জন্য আমার কষ্ট হল।

'কেবল কুড়াচ্ছ, একটা খাও না, খেয়ে দ্যাখ কেমন মিষ্টি।' একটা পেয়ারা তুলে আমি রুবির দিকে বাড়িয়ে দিলাম, এতক্ষণ পর ও হাসল।

'তুমি খাও, তুমি বসে বসে পেয়ারা খাও, আমি কুড়িয়ে দিচ্ছি।' রুবি এক ডজন পেয়ারা আমার সামনে ঘাসের ওপর জড়ো করে রাখল। খুশি হয়ে তৎক্ষণাৎ ঘাসের ওপর চেপে বসলাম। রুবির দেওয়া একটা পেয়ারায় কামড় দিয়ে মনে হল অমৃত। ও ঘামছিল।

ছ্বটে ছ্বটে পেয়ারা কুড়াচ্ছে বলে খোঁপাটা আবার ঢিলে হয়ে গেছে। আমার ইচ্ছা করছিল হাত দিয়ে চেপে খোঁপাটা জায়গামতন বসিয়ে দিই। আর সেই সঙ্গে আমার হাতের নখগ্বলির ওপর নজর পড়ল। কত পরিচ্ছন্ন মস্বণ। র্বিবর গলা বা ঘাড়ের চামড়ায় এই নখ লাগলে ও ব্বঝতে পারবে না—টেরই পাবে না—এমন পালিশ করে কাটা; আর সেই তুলনায় গাছের ব্বনোটার প্রত্যেকটা আঙ্বলের নখের কী বিশ্রী বীভৎস চেহারা। বলতে কি গণেশের নখগ্বলির কথা মনে পড়তে ম্বখের পেয়ারাটা পর্যন্ত বিস্বাদ হয়ে গেল। ইচ্ছা করছিল র্বিবকেও আবার কথাটা মনে করিয়ে দিয়ে দ্বজনে একসঙ্গে হাসি।

হঠাৎ চোখে পড়ল পেয়ারা কুড়াতে কুড়াতে র্বিব একট্ব দ্বরে সরে গেছে। গাছের গায়ে গাছ, ব্বঝলাম একটা গাছের ডাল বেয়ে গাড়লটা আর একটা গাছে চলে গেছে। 'আর পেয়ারা দিয়ে কী হবে, অনেক হয়েছে,' ডেকে বলতে ইচ্ছা করছিল। কিন্তু চুপ করে রইলাম। র্বিব ফলগ্বলি কুড়িয়ে আনন্দ পাচ্ছিল, ওকে বাধা দিলাম না।

অগত্যা সিগারেট ধরালাম। পেয়ারা কত খাওয়া যায়! দ্বটো খেয়ে আমার ঢেকুর উঠছিল। সিগারেট ধরিয়ে টান দেওয়ার সঙ্গে সঙ্গে গণেশও গাছ থেকে নেমে পড়ল।

'কি হল, হয়ে গেল?' আমি হাসলাম, র্বিবর দিকে তাকিয়ে হাসলাম, ও আমার কাছে চলে এল। বোকাটা দ্বরে গাছতলায় দাঁড়িয়ে আছে চুপ করে। ঐ পোষাক নিয়ে আমার সামনে হ্বট করে আসতে সাহস পাচ্ছে না। সত্যি, ঈশ্বর এই বয়সেই মার বোনের ছেলেকে কী প্রকাণ্ড একটা শরীর তৈরী করে দিয়েছে—অস্বরের মতন কোমর হাত পা ও ব্বকের চেহারা; কোমরে হাত রেখে পেয়ারা তলায় স্থির হয়ে দাঁড়িয়ে আছে। আমার আদেশের অপেক্ষা করছে, আমি ডাকলে তবে কাছে আসবে, যতক্ষণ ডাকব না আসবে না। কথাটা চিন্তা করে এত ভাল লাগছিল। র্বিবও ব্বঝতে পেরেছে, অতবড় একটা শরীর ঐ ব্বনোটার, অথচ তুলনায় কত ছোটখাট একটি মান্বষ হয়ে আমি তাকে হাতের ম্বঠোয় রেখে দিয়েছি।

আঁচলের পেয়ারাগ্বলি র্বিব আমার সামনে ঘাসের ওপর রাখল। পেয়ারার পাহাড় জমে গেল। অনেকক্ষণ ছ্বটোছ্বটি করার দর্বন ঘন ঘন নিশ্বাস পড়ছিল ওর।

'একট্ব জিরিয়ে নাও এখানে বসে।' বলতে চেয়েছিলাম, তার আগেই র্বিব সোজা হয়ে দাঁড়াল। 'চলি।'

'কোথায় আবার।' আমি ঢোক গিললাম। ও অল্প হাসল।

'কামরাঙ্গাগ্বলো পেকে আছে কদিন ধরে—সেগ্বলো পেড়ে দেবে।'

খ্বশি হয়ে তৎক্ষণাৎ ঘাড় কাত করলাম।

'হ্বঁ গাড়লটাকে দিয়ে সব কটা পাড়িয়ে নাও।' আস্তে বললাম, তারপর ঘাড় ফিরিয়ে হাঁক দিয়ে গণেশকে বললাম, 'এই গণেশ, এখন কামরাঙ্গা গাছে উঠতে হবে।'

গণেশ সঙ্গে সঙ্গে ঘাড় কাত করল। র্বিবর চোখের দিকে তাকিয়ে আমি ঠোঁট টিপে হাসলাম। যদিও এই হাসিটাকে 'মেয়েলী হাসি' বলে ও মাঝে মাঝে ঠাট্টা করে, এখন করল না; এখন ও পাল্টা ঠোঁট টিপে হাসল। এখানে আমার হাসির অর্থ র্বিব চট্ করে ব্বঝে নিয়েছে। আর দাঁড়ায় না ও, কামরাঙ্গা গাছের দিকে ছ্বটে গেল। গণেশ আগেই চলে গেছে।

যেন আর একটা কি কথা আমি বলতে চেয়েছিলাম, কিন্তু ঝাঁকড়া মাথার বাতাবী লেব্ব গাছটার জন্য র্বিবকে দেখা গেল না।

আমি নিশ্চিন্তমনে হাতের সিগারেটটা টানতে লাগলাম। রোদটা একেবারে মজে

গেছে। ঝিঁঝির ডাক ক্রমে খরতর হয়ে উঠছে। সুন্দর একটি হাওয়া দিতে আরম্ভ করেছে বলে বাতাবীলেবুর পাতাগুলি থেকে থেকে দুলছিল। দুজনকে দেখতে পাওয়া যাচ্ছিল না, কিন্তু রুবির গলা শুনছিলাম।

ওর গলার স্বর শুনে আমি বুঝতে পারছিলাম, উৎসাহ বেড়ে গেছে। 'ওই যে, আর একটা, আর একটা, পেকে টুসটুসে হয়ে আছে, কেমন হলদে হয়ে আছে ঐ কামরাঙাটা।' চেঁচিয়ে বলছিল ও। একটা পাখি ডাকছিল। কিন্তু পাখির স্বরের চেয়েও রুবির গলা যে অনেক বেশি মিষ্টি সিগারেট টানতে টানতে আমি তা অনুভব করছিলাম। একটা কথা মনে পড়ে যাওয়ায় হাসলাম। কেননা রুবির ছোট্ট একটা খিলখিল হাসি ইতিমধ্যে আমার কানে এসেছে। অর্থাৎ এতক্ষণ পর, অনেকক্ষণ চেষ্টার পর রুবি বুনোটাকে নিয়ে খেলতে পারছে; রুবি নিশ্চয় হাসি দিয়ে তাকানো দিয়ে বোকারাম গণেশের মধ্যে দুষ্টামী বুদ্ধি জাগাতে পেরেছে; বোধ করি ইচ্ছা করে গণেশ ওঁর খোঁপা লক্ষ্য করে এক আধটা কামরাঙা ছুঁড়ে ফেলতে পারে; তাই রুবির হাসি।

জড়বুদ্ধির একটা মানুষকে আমি বাধ্য করে ফেলেছি, হাতের মুঠোয় নিয়ে এসেছি, তাই আমার আনন্দের অবধি ছিল না; এখন রুবিও সেটা পারছে, একটা জানোয়ারকে বশ করে ফেলেছে, তাকে নিয়ে খেলছে। রুবির সঙ্গে এই নিয়ে পরে আলোচনা করা যাবে চিন্তা করে আমি তখনি উঠলাম না, চুপ করে বসে সিগারেট টানতে লাগলাম, যেন আশা করছিলাম রুবির খিলখিল হাসিটা আর একবার শুনব।

একটা দমকা হাওয়া উঠল, উঠল আবার সঙ্গে সঙ্গে থেমেও গেল। আমি একটু নড়েচড়ে বসলাম। কেননা একটু সময়ের জন্য বাতাসটা কেমন যেন অস্বস্তি জাগিয়ে দিয়ে গেল। বাতাস বন্ধ হবার সঙ্গে সঙ্গে চারদিকটা যেন বেশি চুপচাপ হয়ে গেল। গাছের পাতা আর নড়ছে না। রুবির গলা শুনছি না, বা ওধারে গাছের ডালে উঠে কেউ ফলটল পাড়ছে সেরকম কিছু আভাস পাচ্ছি না! পাতার খসখস কি ছোটখাট ডাল ভাঙার শব্দ—কিছু না। সব মরে আছে স্থির হয়ে আছে। ঝিঁঝির ডাকটাও থেমে আছে। বুকের মধ্যে কেমন করে উঠল।

উঠে আস্তে আস্তে বাতাবীলেবু গাছটার দিকে এগোলাম। এক সময় লেবু গাছ পিছনে ফেলে, জঙ্গল মতন জায়গাটা, যেখানে সারি সারি তিনটে কামরাঙা গাছ, সেখানে চলে গেলাম। কাউকে দেখলাম না। অতি সূক্ষ্ম আওয়াজ করে কি একটা পোকা কোন গাছের শুকনো ডাল না শিকড় যেন কুড়ে কুড়ে খাচ্ছিল। কেমন ভয় হল মনে। বস্তুত সেখানে কোনো মানুষ চুপ করে বসে বা স্থির হয়ে দাঁড়িয়ে থাকতে পারে বিশ্বাস করতে বাধছিল, এত নির্জন, এমন নিঃসঙ্গ মনে হচ্ছিল বাগানের ভিতরটা। কামরাঙা গাছ দেখা শেষ করে আমি লিচু গাছের কাছে গেলাম। লিচুর সময় না, কাজেই জায়গাটা আরো শূন্য স্তব্ধ মনে হল। দুবার আমি রুবির নাম ধরে ডাকলাম, তিনবার গণেশকে ডাকলাম। কোনো সাড়া নেই। বা বলা যায় আমার ডাকের উত্তরে আতাবনের ওদিকটা থেকে বাদুড়ের পাখার ঝাপ্টা ভেসে এল। আতাজঙ্গলের দিকে যাব কি, বেশ অন্ধকার হয়ে গেছে ততক্ষণে, সাপের হিসহিস শব্দের মতন একটা শব্দও ভেসে আসছিল ওদিক থেকে। তা ছাড়া আতা পাকতে আরম্ভ করেনি যে ওরা ওখানে যাবে। আমি নিশ্চিত ছিলাম ওরা সেখানে নেই; আবার পেয়ারা তলায় ফিরে এলাম, দীঘির ধারে ছুটে এলাম। জলের বুক কালো হয়ে গেছে। অন্যদিন এসময়টায় তারার ঝিকিমিকি ছবি ধরে রাখে

দীঘিটা আরসি হয়ে—আজ সেরকম কোনো ছবি ছিল না, অথবা ছিল, আমিই দেখিনি, দেখার চোখ ছিল না; চোখ দুটো কেমন ঝাপসা হয়ে উঠল একটু সময়ের মধ্যে। ঝাপসা দৃষ্টি নিয়ে যে-কথাটা ভাবতে ভাবতে আমি বাগান থেকে সেদিন বেরিয়ে এসেছিলাম, তা ঠিকই হয়েছিল। আর দশজনের ভাবনার সঙ্গে আমার ভাবনা মিলে গিয়ে তা চিরকালের সত্য হয়ে রইল।

কিন্তু মাঝে মাঝে আমার মনে হত, ওরা বাগানেই ছিল, বাগান থেকে বেরিয়ে কোথাও যায়নি। সেই সন্ধ্যার ছবিটা আমার মনে পড়ত। যাকে বুনো বলতাম গাড়ল বলতাম, সে আর মানুষের আকৃতি নিয়ে ছিল না, বাগানের একটা গাছ হয়ে অরণ্যের সঙ্গে মিশে গিয়েছিল, আর সেই অরণ্য আমাদের বালিগঞ্জের ঝকমকে মেয়ে রুবিকে জীর্ণ করে ফেলেছিল।

# সুরাটে ইংরাজ কুঠি

## জন ওভিংটন

[জন ওভিংটন নামক জনৈক পাদ্রী ১৬৮৯ খৃষ্টাব্দে সুরাটে ইংরাজকুঠির ধর্মযাজক নিযুক্ত হইয়া ভারতবর্ষে আসেন। ভারতে তাঁহার ছয় বৎসরের অভিজ্ঞতা লইয়া লিখিত পুস্তক *A Voyage to Suratt* তিনি ১৬৯৬ সালে প্রকাশ করেন।

তদানন্তীন কালের তথ্যের আকর বলিয়া পুস্তকটি আজ বহুদিন হইল ঐতিহাসিকদের সমাদর লাভ করিয়া আসিতেছে। ওভিংটনের লেখার ভঙ্গী এতই সরস, তাঁহার কৌতূহল এতই বিস্তৃত, দৈনন্দিন জীবনযাত্রার খুঁটিনাটি বর্ণনার ক্ষমতা এতই চিত্তাকর্ষক যে সাধারণ সাহিত্যমোদী পাঠকগণও এই পুস্তকটি আগ্রহের সহিত পড়িতে পারেন।

ওভিংটনের সরস লেখনীর গুণে সপ্তদশ শতাব্দীর শেষভাগের সুরাট জীবন্তভাবে মূর্ত হইয়া উঠিয়াছে। একদিক হইতে এই পুস্তকটির বোধ হয় সব চেয়ে বড় মূল্য হইল যে ইহা ভারতে ইংরাজ বণিকদের আদিপর্বের প্রত্যক্ষদর্শীর বিবরণী। ওভিংটন যখন সুরাটে আসেন তখন ইংরাজ বণিকরা সবেমাত্র ভারতবর্ষে ঘাঁটি গাড়িতে আরম্ভ করিয়াছে। এই বুদ্ধিমান ইংরাজ পাদ্রী তাঁহার দেশীয় বণিকগণের দৈনন্দিন জীবনযাত্রা, তাহাদের বাণিজ্যপদ্ধতি, তাহাদের রাজনীতি ইত্যাদি যে অন্তর্দৃষ্টির সহিত বিবৃত করিয়াছেন তাহার ঐতিহাসিক মূল্য অতুলনীয়। ইহা পাঠ করিলে বুঝিতে অসুবিধা হয় না যে সকল ইউরোপীয় জাতিগণের মধ্যে ইংরাজরাই কেন মুঘলদরবারের সামান্য কৃপাভিক্ষার্থী বণিকদল হইতে কালক্রমে ভারতবর্ষের একছত্র অধীশ্বর হইয়া দাঁড়াইল।

ওভিংটনের পুস্তকে সুরাট ছাড়া তাঁহার সমুদ্রযাত্রা, আফ্রিকা, আরব, বাংলা ও আরাকানের বিবরণী, গোলকোণ্ডার বিপ্লব, ভারতবর্ষ, পারস্য ও গোলকোণ্ডার মুদ্রার আলোচনা, এমন কি গুটিপোকা চাষের তথ্যাদিও রহিয়াছে।

বর্তমান প্রবন্ধটি ওভিংটনের পুস্তকের অন্তর্গত 'সুরাটে ইংরাজ কুঠির বিবরণী' নামক পরিচ্ছেদটির অনুবাদ।]

বাণিজ্যসম্পর্কিত একটি পুস্তিকা হইতে জানিতে পারা গেল যে ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানী বৎসরে একুনে এক লক্ষ পাউণ্ড ব্যয় করেন। এই ব্যয়াধিক্যের অবশ্য কারণ রহিয়াছে। ইংরাজ জাতির সম্মান ও ব্যবসায় অক্ষুণ্ণ রাখিবার জন্য কোম্পানীর কর্তৃপক্ষ তাঁহাদের সম্ভ্রান্ত কর্মচারীগণের শুধু ভালভাবেই নহে পরন্তু বেশ জাঁকজমকের সহিত বাস করা প্রয়োজন বোধ করেন। যে সকল ভ্রমণকারী সুরাট, মাদ্রাজের ফোর্ট সেণ্ট জর্জ, পারশ্যের অন্তর্গত গোমবোর্ণ অথবা বাংলা মুলুকে গিয়াছেন তাঁহারাই ইহা স্বচক্ষে দেখিবার সুযোগ পাইয়াছেন। প্রাচ্যদেশে এইগুলিই ইংরাজ জাতির প্রধান প্রধান বাণিজ্যের কুঠি। এই কুঠিগুলিতে কোম্পানীর এক এক জন করিয়া অধ্যক্ষ মোতায়েন আছেন। তাঁহার এবং তাঁহার অধীনস্থ কুঠিয়ালগণের মাহিনা ও অন্যান্য পাওনা বাবদ মোটা টাকা বরাদ্দের ব্যবস্থা আছে।

ভারতের বিভিন্ন অঞ্চলে বিশেষ বিশেষ পণ্যদ্রব্য উৎপন্ন হয়। ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর কর্মচারীগণ এই সকল পণ্য খরিদ করিয়া জাহাজে চালান দিবার ব্যবস্থা করেন। ইংরাজ কুঠিয়ালগণ যদি সর্বদা সজাগ ভাবে এই ব্যবসায় তদারক ও রক্ষা না করেন তাহা হইলে অন্যান্য ইউরোপীয় ব্যবসায়ীগণ অতি অল্পকালের মধ্যেই তাহা দখল করিয়া লইবে। তখন তাহারা শুধু মশলা দ্বীপেরই নহে সমগ্র ভারতের ব্যবসাই একচেটিয়া করিয়া লইবে এবং

ভারতবর্ষ হইতে মশলা, রেশম, সুতীবস্ত্র, ভেষজপদার্থ, বহুমূল্য প্রস্তর এবং অন্যান্য যাবতীয় ভারতীয় পণ্য যথেচ্ছদরে ইউরোপে বিক্রয় করিবে। কিছুদিন পূর্বে একদল লোক মুঘল বাদশাহকে ইংরাজদের অপেক্ষা অধিক কর দিবার প্রস্তাব দিয়া সুরাট অঞ্চলের ব্যবসায়ের একচেটিয়া স্বত্ব করায়ত্ত করিবার চেষ্টা করে। ইউরোপীয় বণিকগণ মালাবার উপকূলে ইংরাজদের অপেক্ষা অধিক দরে গোলমরিচ ক্রয় করিয়া ও দেশীয় বণিকগণকে নানাবিধ ভেট প্রদান করিয়া সেই অঞ্চলে আমাদের বাণিজ্য লণ্ডভণ্ড করিয়া দিবার আপ্রাণ চেষ্টা করিতেছে। এই সকল কারণে ভারতের বিভিন্ন অঞ্চলে আমাদের কুঠি রাখা একান্ত প্রয়োজন। যদি একবার এই কুঠিগুলি উঠাইয়া লওয়া হয় তাহা হইলে ইংলণ্ড ও ভারতের মধ্যে সকলপ্রকার ব্যবসাবাণিজ্য অনতিবিলম্বে লোপ পাইবে। তখন ইউরোপীয় বণিকগণ যে কাজ ঘুষ বা নজর দ্বারা সফল করিতে পারে নাই তাহা অন্যান্য উপায়ে হাঁসিল করিবে এবং তাহাদিগের হাত এড়াইয়া ভারত হইতে কোন পণ্যদ্রব্যই ইউরোপে চালান যাইবে না। সেইজন্য আমাদের কুঠিয়ালগণের এক প্রধান কাজ হইল অন্যান্য ইউরোপীয় ব্যবসায়ীগণের প্রতিটি চালের উপর কড়া নজর রাখা, তাহাদের মতলব ও উদ্দেশ্য সঠিকভাবে অনুধাবন করিয়া তাহা বানচাল করা। এই কর্তব্য সম্পাদনের জন্য মধ্যে মধ্যে মুঘল বাদশাহকে নজর দেওয়ার প্রয়োজন হয়। শুধু বাদশাহকেই নহে, তাঁহার দরবারের প্রধান প্রধান আমীর-ওমরাহ এবং তাঁহার প্রিয়পাত্রগণকেও প্রয়োজনমত উপঢৌকন দিয়া তাঁহাদের সন্তুষ্টিসাধন করা দরকার যাহাতে ইংরাজ বণিকগণ তাঁহাদের অনুগ্রহ হইতে বঞ্চিত না হয়।

এই সকল কারণেই ভারতীয় ব্যবসা ও বাণিজ্যের সহিত সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিগণ মনে করেন যে ব্যবসা অক্ষুণ্ণভাবে চালাইতে হইলে ইংরাজ কুঠিয়ালগণের যাবতীয় খরচ ছাড়াও অন্যান্য-ভাবে সাহায্য করা আবশ্যক। ভারতীয় ব্যবসায় হইতে যদি কিছু লোক ব্যক্তিগত ভাবে লাভবান হয় তাহাতে বাধা দেওয়া সমীচিন নাও হইতে পারে। কারণ, একথা স্মরণ রাখা দরকার যে অন্যান্য ইউরোপীয় ব্যবসায়ীগণের চক্রান্ত ব্যর্থ করিয়া ভারতে ইংরাজ ব্যবসায় বজায় রাখার ফলে সমগ্র ইংরাজ জাতির প্রভূত উপকার সাধিত হইতেছে। দিনেমার বাণিজ্য-পোতগুলির ন্যায় ইংরাজ জাহাজগুলিও যাহাতে উভয় জাতির শত্রু ফরাসীদের হাত এড়াইয়া নির্বিঘ্নে স্বদেশে প্রত্যাবর্তন করিতে পারে তাহার ব্যবস্থা করা সমগ্র ইংরাজ জাতির কর্তব্য।

সুরাটে যে অট্টালিকাটিতে ইংরাজ কুঠিয়ালগণ বাস করেন তাহার মালিক স্বয়ং মুঘল বাদশাহ। সুরাটের এই অন্যতম শ্রেষ্ঠ অট্টালিকাটি শহরের উত্তর-পশ্চিম ভাগে অবস্থিত। ইহাতে অধ্যক্ষের একটি মহল ছাড়াও চল্লিশজন কর্মচারীর অত্যন্ত আরামের সহিত বাস করিবার বন্দোবস্ত আছে। বাড়িটির বাৎসরিক ভাড়া ৬০ পাউণ্ড। আমাদের জমিদার আওরঙজেব কিন্তু প্রায়শঃই এই অর্থ গ্রহণ করেন না। তাঁহার আদেশ অনুযায়ী এই অর্থ বাড়িটির সৌন্দর্যসাধন, মেরামতি অথবা আয়তন বৃদ্ধি করার জন্য ব্যয়িত হইয়া থাকে। গৃহটির সংলগ্ন কয়েকটি তাওয়াখানা, গুদাম, একটি পুষ্করিণী ও একটি হামাম রহিয়াছে।

কোম্পানীর পশ্চিমাঞ্চলের অধ্যক্ষ এই অট্টালিকাটিতে বাস করেন। বোম্বাইয়ের শাসন-ভার ইঁহার হস্তে ন্যস্ত। ইঁহাকে 'মাননীয়' উপাধিদ্বারা সম্মানিত করা হয়। কয়েকজন অধ্যক্ষ সুরাটে কিয়দ্দিন বাস করিয়া প্রভূত অর্থ সঞ্চয় করিতে সক্ষম হইয়াছিলেন। বৎসরে তিনশত পাউণ্ড মাহিনা ব্যতিরেকে তাঁহারা জাহাজী ব্যবসায়ী হইতে নানাপ্রকার সুযোগ-

সুবিধা পাইয়া থাকেন। ইহা ছাড়া সমগ্র প্রাচ্যদেশে তাঁহারা ব্যক্তিগতভাবে ব্যবসা করিতে পারেন। এই ব্যবসায় অত্যন্ত লাভজনক। ইংরাজ জাতির ব্যক্তিগত স্বাধীনতার রীতি অনুযায়ী অধ্যক্ষ ছাড়া ছোট বড় সকল কর্মচারীকেই ইচ্ছানুসারে বাণিজ্য করিবার পূর্ণ অধিকার দেওয়া আছে। দিনেমার কুঠিয়ালগণ এই সুবিধালাভের জন্য লালায়িত, কিন্তু তাহাদের পক্ষে কোনপ্রকার ব্যক্তিগত ব্যবসায়ে লিপ্ত হওয়া সম্পূর্ণরূপে নিষিদ্ধ।

কর্মচারীদের মধ্যে অধ্যক্ষের পর মুহুরীর স্থান। তাঁহার নিম্নে ভাণ্ডারী এবং তাঁহার তলায় মুৎসুদ্দী। এই চারজনকে লইয়া কাউন্সিল গঠিত। কাউন্সিলের সভ্যগণের মধ্যে অধ্যক্ষের দুইটি ভোট। কোম্পানীর কাজকর্ম ও ব্যবসাবাণিজ্য কিভাবে চালাইতে হইবে কাউন্সিলের সভ্যগণ মন্ত্রণা করিয়া স্থির করেন। কোম্পানীর কুঠিয়ালগণের শাসন-ভারও ঐ কুঠিয়ালগণের হস্তে ন্যাস্ত।

কোম্পানীর কর্মসচিব কাউন্সিলের সভ্য নহেন, কিন্তু তিনি কাউন্সিলের মন্ত্রণার সময় উপস্থিত থাকেন এবং তাঁহাদের হুকুম তামিল করিতে সাহায্য করেন। কাউন্সিলের কোন সভ্যের পদ খালি হইলে তাঁহার দাবী সর্বাগ্রে। কোম্পানীর অন্যান্য কর্মচারীগণ তাঁহাদের পদের উচ্চতা ও কার্যকাল অনুযায়ী ক্রমে ক্রমে কাউন্সিলের সভ্য নির্বাচিত হন। অবশ্য কোম্পানীর কর্তৃপক্ষ ইচ্ছা করিলে কোন কুঠিয়ালকে পুরাতন ও উচ্চপদস্থ কর্মচারী-দের টপকাইয়া কাউন্সিলের সভ্য করিয়া দিতে পারেন। কিন্তু সাধারণতঃ তাঁহারা এই ক্ষমতা ব্যবহার করেন না, কারণ প্রচলিত ব্যবস্থা সকল দিক হইতেই ন্যায্য। তাহা ছাড়া এই ব্যবস্থায় কার্যও সুষ্ঠুভাবে সম্পাদিত হয় এবং কোম্পানীর স্বার্থ অক্ষুণ্ণ থাকে।

ধর্মযাজককে সাধারণতঃ পদমর্যাদায় তৃতীয় স্থানীয় বলিয়া ধরা হয়। গোমস্তা, কেরাণী ও শিক্ষানবীশী—ইঁহারা কুঠির অন্যান্য কর্মচারী। এই সকল কর্মচারীগণকে তাঁহাদের নিজ নিজ পদে তিন বৎসর হইতে পাঁচ বৎসর কার্য করিবার পর অথবা বিলাত হইতে আসিবার সময়ে চুক্তিবন্ধ মেয়াদ অতিবাহিত হইলে উচ্চতর পদে নিযুক্ত করা হয়। শিক্ষানবীশ প্রথমে কেরাণী এবং তৎপরে গোমস্তার পদে উন্নীত হন। পদোন্নতির সঙ্গে সঙ্গে কর্মচারীগণের মাহিনা বাড়ে এবং তাঁহারা অন্যান্য সুবিধালাভ করেন। বেতন ছাড়া কোম্পানী ইহাদের বাস ও গ্রাসাচ্ছাদনের সম্পূর্ণ ব্যয়ভার বহন করেন। তাহা ছাড়া সুরাট হইতে চীন অবধি সকল দেশের সঙ্গে ইঁহাদের ব্যক্তিগতভাবে ব্যবসা চালাইবার অবাধ স্বাধীনতা আছে। এই ব্যবসায়ে ইঁহারা সাধারণতঃ শতকরা শতভাগ মুনাফা করিয়া থাকেন। যদি কেহ কেবলমাত্র সোনারূপার ব্যবসায় করেন তাহা হইলে লভ্যাংশ টাকায় আট আনা দাঁড়ায়। কর্মচারীগণের মধ্যে যাঁহাদের সুনাম রহিয়াছে অথচ অর্থ নাই তাঁহারা চীনদেশের সহিত কারবারের জন্য স্থানীয় বেনেদের নিকট হইতে শতকরা ২৫৲ টাকা সুদে কর্জ লইতে পারেন। জাহাজ মাল লইয়া নির্বিঘ্নে সুরাটে পৌঁছিবার পর ধারের টাকা শোধ দিতে হয় এবং যদি কোন কারণে পণ্যবাহি জাহাজ পথিমধ্যে নিমজ্জিত হয় তাহা হইলে ধার শোধের প্রয়োজন হয় না। ব্যবসায়ে লাভের পরিমাণের তারতম্য রহিয়াছে এবং তাহা স্থানের দূরত্ব ও ব্যবসায়ের সুযোগ সুবিধার উপর নির্ভর করে।

কোম্পানীর কাজ চালাইবার জন্য এবং অধ্যক্ষ ও কাউন্সিলের সভ্যগণের ফরমাইশ খাটিবার জন্য চল্লিশ পঞ্চাশজন বেতনপ্রাপ্ত ব্যক্তি নিযুক্ত রহিয়াছে। ইহারা প্রতিদিন প্রাতে অধ্যক্ষের নিকট হাজিরা দিয়া তাঁহার হুকুম তামিল করে ও দৈনন্দিন কাজের ফিরিস্তি গ্রহণ করে। কাজকর্ম সারিবার পর প্রতিদিন সন্ধ্যায় তাহারা অধ্যক্ষের নিকট 'হুজুরে

হাজিরা' দিবার জন্য জমায়েৎ হয় এবং অধ্যক্ষ তাঁহার ইচ্ছানুযায়ী বিদায় দিলে তাহারা শহরে নিজ নিজ গৃহে প্রত্যাবর্তন করে। এই সকল লোক ছাড়া অধ্যক্ষের ফাইফরমাস খাটিবার জন্য আরও কয়েকজন ভৃত্য নিযুক্ত থাকে। সেইরূপ মুহুরীর জন্য দুইজন এবং ধর্মযাজক ও কাউন্সিলের অন্যান্য সভ্য ও কর্মসচীবের জন্য একজন করিয়া লোক থাকে।

কোম্পানীর সুনাম ও সম্মান এবং ব্যবসায় স্বার্থ অক্ষুণ্ণ রাখাই কুঠিয়ালগণের সর্বপ্রধান কর্তব্য। সর্বনিম্নদরে মাল ক্রয় করিয়া উচ্চদরে বিক্রয় করিবার জন্য ইহারা সদা-সর্বদা সচেষ্ট।

অধ্যক্ষ ও অন্যান্য কুঠিয়ালগণ বৎসরে একবার মাহিনা পাইয়া থাকেন। মুহুরীর মাহিনা ১২০ পাউন্ড, কাউন্সিলের অন্য দুইজন সভ্যের মাহিনা ৪০ পাউন্ড। গোমস্তাগণ ১৫ পাউন্ড ও কেরাণীগণ ৭ পাউন্ড বার্ষিক মাহিনা পাইয়া থাকেন। ইহা ছাড়া কাউন্সিলের সভ্যগণ ও কর্মসচীব আরও নানাপ্রকার সুবিধা ভোগ করেন। যাহারা মাসিক বেতনভোগী তাহারা ৪৲ টাকা করিয়া পাইয়া থাকে এবং ইহারা তাহাদের সর্দারগণের অধীনে কাজ করিয়া থাকে। মাসের পয়লা হাজিরা দিয়া ইহারা প্রথমে চন্দ্রের বন্দনা করিয়া অধ্যক্ষের নিকট ভক্তিপূর্ণভাবে আর্জি পেশ করে। অধ্যক্ষ তখন একজন কর্মচারীকে ইহাদের পাওনা মিটাইয়া দিবার আদেশ দেন।

কুঠিকর্মে নিযুক্ত বহুসংখ্যক ভারতীয় ভৃত্যগণ যাহাতে আড়তের কোন মালপত্র চুরি না করে সেইজন্য আড়তদার প্রতিদিন সন্ধ্যায় গৃহে ফিরিবার পূর্বে মালপত্রের হিসাব নেয়। যদি কোন জিনিষ পাওয়া না যায় তাহা হইলে এই ভৃত্যদিগকে কুঠি হইতে বাহির হইবার পূর্বে তল্লাশ করা হয়। কিন্তু তাহাদের সততাই আমাদের সর্বপ্রধান ভরসা, চুরি হইতে লোকসানের রক্ষাকবচ। আজ বহু বৎসরের মধ্যে ইহাদের কাহারও বিরুদ্ধে একটিও চুরির অভিযোগ হয় নাই। এই সকল ভৃত্যগণ এতই বিশ্বস্ত ও অনুগত যে যখনই অধ্যক্ষ কোন সোনাদানা বা রূপার কারবার করেন তখন সেই গোপনীয় তথ্য ইহাদের মধ্যে কয়েক-জনকে জানাইয়া দেন। সেই ভৃত্যগণ একটি পাইপয়সার বেহিসাব না করিয়া সেই কার্য নির্বিঘ্নে সুসম্পন্ন করে।

অধ্যক্ষের অনুমতি ছাড়া কোন কুঠিয়াল কুঠি ছাড়িয়া বাহির হইতে পারেন না অথবা বাহিরে থাকিতে পারেন না বা দেশ ছাড়িয়া যাইতে পারেন না। কুঠির ফটকে দিবারাত্র পাহারাদার মোতায়েন থাকে যাহাতে কোন সন্দেহজনক ব্যক্তি কুঠির অভ্যন্তরে প্রবেশ না করিতে পারে। কিন্তু প্রতি বৃহস্পতিবার রাত্রে পাহারাদার ছুটি লইয়া গৃহে যাইবার জন্য আর্জি করে। কারণ সে মুসলমান ও বিবাহিত এবং তাহার মতে সে যদি তাহার স্ত্রীর' সহিত সপ্তাহে অন্ততঃ একবার দেখা না করে তাহা হইলে দাম্পত্য কলহ ঘটা অস্বাভাবিক নহে। সুরাটের রাস্তায় ভিখারীগণ সাধারণতঃ "জিমরুত সাহাব, জিমরুত সাহাব" বলিয়া ভিক্ষা প্রার্থনা করে। বৃহস্পতিবার রাত্রে কিন্তু তাহারা বলে, "মহাশয়, আজ বৃহস্পতিবার, আজ বিশেষ করিয়া আপনার কৃপাভিক্ষা করি। আজ আপনি দয়া করিলে আমি আমার স্ত্রীর মনোরঞ্জন করিতে সমর্থ হইব।"

প্রতিদিন অধ্যক্ষ ও কুঠিয়ালগণ একত্রে বসিয়া আহার করেন। কুঠিয়ালগণের পদ-মর্যাদানুযায়ী ভোজনের টেবিলে বসিবার স্থান নির্দিষ্ট রহিয়াছে। সুরাট ও পারিপার্শ্বিক অঞ্চল হইতে সর্বোৎকৃষ্ট মাংস, সিরাজের মদ্য ও আরক মদ্য ইত্যাদি সুখাদ্য ও সুপেয় প্রচুর পরিমাণে পরিবেশিত হয়। খাদ্য ও পানীয়ের জন্য প্রতিবৎসর সহস্র সহস্র মুদ্রা

ব্যয় করা হয়। দৈনন্দিন ভোজনের ব্যবস্থা বেশ রাজকীয়। দুই তিনজন কসাই ও দুই তিনজন খানসামা মাংস সরবরাহ ও রন্ধনের জন্য নিয়োজিত থাকে। কুঠিয়ালগণ অবশ্য ইউরোপীয় মদ্য ও বিলাতী বিয়ারই সবচেয়ে বেশী পছন্দ করেন কারণ যাবজ্জীবন তাঁহারা এইগুলিই পান করিতে অভ্যস্ত। সেইজন্য চড়াদাম হইলেও ইঁহারা এই সকল পানীয় ক্রয় করিয়া পরমানন্দে পান করেন। একজন ধনাঢ্য ভারতীয় আমাদিগের ভোজনের কায়দাকানুন দেখিবার জন্য ও আমাদিগের ভোজ্যদ্রব্য আস্বাদন করিবার বাঞ্ছা প্রকাশ করিলে অধ্যক্ষ তাঁহাকে নিমন্ত্রণ করেন। ভোজনকালে যখন পানীয়ের বোতল খোলা হয়, তখন তাহা হইতে ফেনা নির্গত হইতে দেখিয়া তিনি অত্যন্ত অবাক হইয়া যান। অধ্যক্ষ মহাশয় তাঁহাকে তাঁহার বিস্ময়ের কারণ জিজ্ঞাসা করাতে তিনি উত্তর দেন যে বোতল হইতে ফেনা ছিটকাইয়া পড়িতে দেখিয়া তিনি অবাক হন নাই। তিনি ভাবিয়া কুল-কিনারা পাইতেছেন না যে কিরূপে এই পানীয়কে বোতলের মধ্যে প্রবিষ্ট করানো হইয়াছিল।

অধ্যক্ষ ও কাউন্সিলের সভ্যগণ প্রতিসন্ধ্যায় একত্রে নৈশভোজন করিয়া থাকেন। এই সময়ে তাঁহারা নানা বিষয়ে আলাপচারী হন। কোম্পানীর কাজকর্ম লইয়াও আলোচনা হয়। যাহাতে কুঠিয়ালগণের মধ্যে বিবাদ বা হিংসা না দেখা দেয়, যাহাতে তাঁহারা সৌহার্দ্য-পূর্ণভাবে বাস করিয়া কুঠির কাজকর্ম নির্বিঘ্নে ও সুষ্ঠুভাবে সম্পাদন করেন সেই পন্থা নির্ধারণের আলোচনা করেন।

ভোজনের পূর্বে ও পরে একজন ভৃত্য একটি রূপার বড় জলপাত্র ও একটি গামলা লইয়া হাজির থাকে। যে কোন দেশেই হস্ত ও মুখ প্রক্ষালন করা উত্তম অভ্যাস। ভারতে গরম ও ধুলার জন্য ইহা একান্ত প্রয়োজনীয়। ভোজনের পাত্রগুলি খাঁটি রূপার তৈরি, ওজনে ভারী ও বৃহদাকার। পানপাত্রগুলিও রৌপ্য নির্মিত। যাহাতে সকল রুচির লোক ভোজনে সমান আনন্দ ও পরিতৃপ্তি লাভ করেন সেইজন্য ইংরাজ, পর্তুগীজ ও ভারতীয় পাচক তাঁহাদিগের স্বকীয় প্রথায় মাংস ও অন্যান্য খাদ্য রন্ধন করেন। পোলাও একটি প্রধান ভারতীয় খাদ্য। ইহা এমনভাবে প্রস্তুত করা হয় যে প্রত্যেকটি চাউল আলাদা আলাদা থাকে। সুগন্ধি মশলা ও সিদ্ধ কুক্কুট ইহাতে ব্যবহৃত হয়। আর একটি প্রিয় খাদ্য হইল ভারতীয় প্রথায় রাঁধা মুরগী। মুরগী ছাড়াইয়া একটি ছোট পাত্রে মাখন দ্বারা ভাজিয়া বাদাম ও কিসমিসের পুর দিয়া ইহা পাক করিতে হয়। কাবাব নামক দেশীয় খাদ্যও ইংরাজগণের বড় প্রিয়। ইহা প্রস্তুত করিতে ছাগ বা গোমাংসের ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র খণ্ডের প্রয়োজন। এই মাংসখণ্ডগুলিতে নুন ও গোলমরিচ মাখাইয়া রসুন মিশানো তৈলে ডুবাইয়া লইয়া মাংসখণ্ডগুলির মধ্যে সুগন্ধি পাতা ঠাসিয়া একটি শিকে গুঁজিয়া আগুনের উপর ঘুরাইয়া ঘুরাইয়া ঝলসাইয়া লইতে হয়। বাঁশের কোঁড়, আমের আচার ও সয়াসীমের চাটনী ক্ষুধা-উদ্রেকের জন্য সর্দাসর্বদা মজুত থাকে। সুরাটের বাসিন্দগণের হিং অত্যন্ত প্রিয় বস্তু এবং পিঠাজাতীয় খাদ্যে ইহার ব্যবহারের বড়ই ধুম। যদিও হিং-এর স্বাদ ও গন্ধ অতীব অপ্রীতিকর তথাপি ইংরাজগণ ইহার খাদ্যগুণের জন্য মাঝে মাঝে ব্যবহার করিতে প্রলুব্ধ হয়েন। সময়ে সময়ে দেশীয় ব্যক্তিগণ এত বেশি হিং ব্যবহার করেন যে তাহার গন্ধে মনে হয় যে সারা সুরাট সহর ভরিয়া উঠিয়াছে।

রবিবার ও অন্যান্য ছুটির দিনে কুঠিতে আরও সমারোহের সহিত ভোজনের আয়োজন হইয়া থাকে। পরবের দিনে হরিণ, ময়ূর, খরগোস ও তিতির ও অন্যান্য প্রকারের মাংস এবং পেস্তা, প্লাম, চেরী ও এ্যাপ্রিকট ইত্যাদি নানাপ্রকার পারশ্যদেশ-জাত ফল

থাকে। ইউরোপীয় ও দেশী মদ্য পরিমিতভাবে পান করা হয়। ভোজনের পূর্বে ইংলণ্ডেশ্বরের স্বাস্থ্য ও কোম্পানীর উত্তরোত্তর উন্নতি কামনা করিয়া মদ্যপান করা হয়। ভোজন শেষ হইলে সকলে মিলিতভাবে কিয়ৎক্ষণ নির্মল আমোদ প্রমোদে অতিবাহিত করেন।

মধ্যে মধ্যে উৎসবের দিনে অধ্যক্ষ কুঠিয়ালগণকে সুরাটের সমীপবর্তী কোন মনোরম উদ্যানে নিমন্ত্রণ করেন। উদ্যানের মধ্যস্থিত জলাশয়ের ধারে বৃক্ষসমূহের সুশীতল ছায়ায় ইঁহারা আনন্দে সারাদিন অতিবাহিত করেন। অধ্যক্ষ ও তদীয় পত্নী পাল্কিতে চড়িয়া তথায় গমন করেন। পাল্কি বহিবার জন্য ছয়জন বাহক প্রস্তুত থাকে এবং এক সময়ে চারজন করিয়া পাল্কি কাঁধে লয়। অধ্যক্ষের কিছু সম্মুখে দুইজন তুড়ুক সওয়ার দুইটি বড় বড় পতাকা লইয়া অগ্রসর হয়। ঘোড়াগুলি পারশ্য বা আরব দেশ হইতে বহুমূল্যে ক্রয় করিয়া আনা হইয়াছে।

এই দুইটি এবং কুঠিয়ালদিগের চড়িবার অন্যান্য অশ্বগুলির জিন ও সাজসজ্জা যেরূপ দামী সেইরূপ জমকালো। গদীগুলি কাজকরা মখমলের, লাগাম ও নোক্তা ও গদীর পশ্চাদভাগ নক্সাকাটা রূপার পাতে মোড়া। দেশীয় ভৃত্যগণের সর্দার ঘোড়ায় চড়িয়া চলে এবং তাহার পশ্চাতে চল্লিশ পঞ্চাশজন ভৃত্য পদব্রজে গমন করে। অধ্যক্ষের পিছনেই কাউন্সিলের সভ্যগণ বড় বড় গাড়িতে চড়িয়া চলেন। গাড়িগুলি খোলা; কেবল যেগুলিতে তাঁহাদের স্ত্রীরা থাকেন সেগুলি ঢাকা। গাড়িগুলির দরজার হাতলগুলি রূপার পাতে মোড়া এবং প্রত্যেকটি একজোড়া সুন্দর বলদে টানিয়া লইয়া চলে। অন্যান্য কুঠিয়ালগণ হয় গাড়িতে নয় ঘোড়ায় চড়িয়া যাত্রা করেন। কোম্পানীর কার্যে অধ্যক্ষ ও কুঠিয়ালগণের ব্যবহারের জন্য কোম্পানী ঘোড়ার ব্যবস্থা রাখেন। কুঠিয়ালগণ অবশ্য হাওয়া খাইবার জন্যও ঘোড়াগুলিকে ব্যবহার করিতে পারেন। অধ্যক্ষ ও কর্মচারীগণ কুঠির বাহিরে গেলে সহরের মধ্য দিয়া এইভাবে জাঁকজমকের সহিত শোভাযাত্রা করিয়া চলেন।

সুরাটে সকাল ও সন্ধ্যায় মৃদুমন্দ বায়ু বহিতে থাকে এবং তখন উত্তাপ প্রশমিত হয়। দিবাভাগে যখন সূর্যের প্রখর কিরণে তাপমাত্রা বৃদ্ধি পায় তখন কুঠিয়ালগণ প্রত্যহ এক বোতল করিয়া পানীয় ও ঠাণ্ডা মাংস লইয়া নদী বা জলাশয়ের তীরে বৃক্ষের ছায়ায় প্রত্যহ দুই চারি ঘণ্টা কাটাইয়া আসেন। কাউন্সিলের সভ্য বা ধর্মযাজক কখনই চারি পাঁচ জন সহিস ও তুড়ুক সওয়ার পরিবেষ্টিত গাড়ি ছাড়া কুঠি হইতে বহির্গত হন না। এইভাবে বাহির হইলে দেশীয় লোকজনের তাঁহাদের প্রতি ভক্তি ও সম্ভ্রম জন্মে এবং ইংরাজ দেখিলেই তাঁহাদের সমীহ করিয়া চলে। তাহারা আমাদিগের বন্ধুত্বের মূল্য দেয় এবং আমাদের সহিত পরিচিত হইতে গর্ববোধ করে। ইংরাজদিগের ঠাট ও সততা দেখিয়া দেশীয় লোকেরা তাহাদের নিজেদের সরকার অপেক্ষা ইংরাজদের বড় মনে করিয়া থাকে। ফলে বহু দুস্থ ও নিস্ব দেশীয় ব্যক্তি তাহাদের কষ্ট লাঘবের জন্য নিজেদের সরকারের শরণাপন্ন না হইয়া ইংরাজদের সাহায্য প্রার্থনা করে।

কুঠিয়ালগণ স্বগৃহে বিলাতী কায়দায় ভোজন করেন, কিন্তু কুঠির বাহিরে দেশীয় কায়দা অবলম্বন করেন। দেশীয় ভোজনে খাদ্য ও পানীয় পারশ্য দেশীয় গালিচার উপর ঘরের মধ্যস্থলে রক্ষিত হয় এবং ভোজনকারীরা চতুর্দিকে ঘিরিয়া বসিয়া আহার করেন।

পণ্যদ্রব্য কেনাবেচার সুবিধার জন্য কোম্পানী দালাল নিযুক্ত করেন। এই দালালগণ জাতিতে বেনে, ভারতীয় পণ্যদ্রব্যের দরদাম ইহাদের নখদর্পণে। ইহারা শতকরা তিন টাকা

দস্তুরীতে কাজ করে। বৎসরে একবার করিয়া ইহাদের বড় পরব দেওয়ালীর দিনে আমাদের নববর্ষের ন্যায় ইহারা অধ্যক্ষ, কাউন্সিলের সভ্য, ধর্মযাজক, চিকিৎসক ও অন্যান্য কুঠিয়াল দিগকে তাঁহাদের পদমর্যাদা অনুযায়ী মণিমাণিক্য, সোনারূপা, রেশমবস্ত্র ইত্যাদি নানাপ্রকার বহুমূল্য জিনিষ ভেট দিয়া থাকে। ইহার ফলে নিম্নপদস্থ কুঠিয়ালগণ তাহাদের মাহিনা, বাস ও গ্রাসাচ্ছাদন ছাড়া সারা বৎসরের পরিধেয় বস্ত্র বিনামূল্যে পাইয়া থাকে। সুতরাং ইহাদের মাহিনা হইতে কোনকিছু ব্যয় না করিয়াও সুখে স্বচ্ছন্দে বাস করিতে পারে। ধর্মযাজক ও চিকিৎসকের অবশ্য আরও উপরি পাওনা রহিয়াছে। বড়দিনের সময়ে অধ্যক্ষ ইঁহাদিগকে বিশেষ পারিতোষিক প্রদান করেন। যখনই কোন ব্যক্তির ইঁহাদের সাহায্যের প্রয়োজন হয় তখনই ইঁহারা সমুচিত পারিশ্রমিক পাইয়া থাকেন।

কুঠিয়ালগণের শারীরিক অসুস্থতা বা ব্যাধি হইলে তাহাদিগের তত্ত্বাবধান করিবার জন্য একজন দেশীয় ও একজন ইংরাজ চিকিৎসক রহিয়াছেন। ইংরাজ চিকিৎসকের বাৎসরিক বেতন ৪০ পাউন্ড কিন্তু কুঠির বাহিরে পসার হইতে তিনি বিলক্ষণ অর্থ উপায় করেন। রোগের চিকিৎসার জন্য যে যে ঔষধ, গাছগাছড়া, প্রলেপ, মলম ইত্যাদির প্রয়োজন তাহা কোম্পানীর খাতে অবিলম্বে ক্রয় করিবার ঢালা হুকুম আছে। কি সুসময়ে কি দুঃসময়ে কুঠিয়ালগণের যাহাতে কোনোরূপ অভাব বা অসুবিধা না ঘটে কর্তৃপক্ষ সেদিকে সর্বদা সতর্ক দৃষ্টি রাখেন।

স্বাচ্ছন্দ্য ও বিলাসের মধ্যে বাস করিয়া যাহাতে কুঠিয়ালগণের আত্মিক বিকৃতি না ঘটে, যাহাতে শারীরিক স্বাস্থ্যের ন্যায় তাহাদের নৈতিক স্বাস্থ্যও অটুট থাকে, তাহার ভার ধর্মযাজকের উপর ন্যস্ত। ধর্মযাজকের বাৎসরিক বেতন ১০০ পাউন্ড। ইঁহার ভরণপোষণ কোম্পানীর দায়ীত্ব। ইঁহার পরিচর্যার জন্য ভৃত্য রহিয়াছে এবং ইঁহার দরকারানুযায়ী গাড়ি বা ঘোড়া মজুত থাকে। নানা দেশ হইতে আগত ইংরাজ নাবিক ও বণিকগণ ইঁহাকে নানাস্থান হইতে সংগৃহীত দুষ্প্রাপ্য ও মহার্ঘ্য জিনিষ উপঢৌকন দিয়া তাঁহাদের ভক্তি জ্ঞাপন করেন। তাহা ছাড়া জন্ম, মৃত্যু ও বিবাহে পৌরোহিত্য করিলে তিনি রীতিমত দক্ষিণা পাইয়া থাকেন। মোটকথা ধর্মযাজককে সুখ ও স্বাচ্ছন্দ্যে রাখিবার জন্য কোনোরূপ কার্পণ্য করা হয়না। পদমর্যাদায় তিনি কুঠির মধ্যে তৃতীয় স্থানীয়। কিন্তু একথা বলিলে অত্যুক্তি হইবে না যে তাঁহাকে প্রত্যেক কুঠিয়াল এরূপ সম্ভ্রম ও ভক্তি করিয়া থাকেন যে তিনি এই অঞ্চল বা এমনকি সমগ্র হিন্দুস্থানের সর্বোময় কর্তা হইলেও এত খাতির পাইতেন কি না সন্দেহ।

প্রতি রবিবারে ধর্মযাজককে একবার উপদেশ পাঠ ও তিনবার প্রার্থনা পরিচালনা করিতে হয়। তাহা ছাড়া তিনি একদিন অন্তর কুঠির গীর্জায় সকালে কার্যারম্ভের পূর্বে এবং সন্ধ্যায় দৈনন্দিন কার্যসমাধার পর প্রার্থনা গ্রহণ করেন। তিনি যুবক কুঠিয়ালগণকে প্রশ্নোত্তর দ্বারা নিয়মিত ধর্মোপদেশ দেন। ইনি সুরাটের অধীনস্থ মালাবার উপকূলে কারওয়ার, কালিকট ও রাটেরাস্থিত গীর্জাগুলির নিয়মিত তদারক করিতে যান এবং সেই সকল স্থানের ধর্মযাজকগণকে তাঁহাদের কার্য সম্পর্কে উপদেশ দেন।

ওলন্দাজগণের কুঠিতে ধর্মযাজক নাই। সেইজন্য তাহারা শিশুর জন্মের পর খৃষ্ট-ধর্মসম্মত উপায়ে তাহাদের প্রার্থনাগৃহে স্নান করাইবার জন্য ইংরাজ ধর্মযাজকের সাহায্য যাচিঞা করিয়া থাকে। ওলন্দাজগণের প্রার্থনাগৃহটিকে প্রথম দর্শনে অস্ত্রশালা বলিয়া ভ্রম হওয়া অস্বাভাবিক নহে কারণ তাহাদের গোলাগুলি ও অস্ত্রশস্ত্র সেইস্থানেই মজুত রাখে।

মৃতব্যক্তিগণকে গোর দিবার জন্য সহর হইতে অর্ধ মাইল দূরে একটি পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন স্থানে কবরখানা রহিয়াছে। কবরগুলিকে কুঠিয়ালগণ অতীব সুন্দর ও সুশোভিত করিয়া তৈয়ারী করিতে আপ্রান চেষ্টা করেন। এই নয়নাভিরাম কবরগুলিকে বহুদূর হইতে দেখা যায় এবং সুন্দর স্থাপত্যের নিদর্শন হিসাবে এগুলি সুরাট নগরীর সৌন্দর্য বর্ধন করে। ইংরাজদিগের গোরস্থানে যে দুইটি কবর সর্ববৃহৎ ও সুদৃশ্য তাহার মধ্যে একটি জন অক্সটন নামক এক ভদ্রলোকের স্মৃতি বহন করিয়া রহিয়াছে। অন্যটি সুরাটের সুবিখ্যাত ভূতপূর্ব অধ্যক্ষ মাননীয় অর্জ্জাস্ সাহেবের। ওলন্দাজগণের কবরগুলির মধ্যে প্রধান দুইটির একটি তিন বৎসর পূর্বে মৃত এক প্রধান কর্মচারীর জন্য নির্মিত হইয়াছিল। অপরটি একজন রগুড়ে ওলন্দাজ নৌ-অধ্যক্ষের। ইহার কবরটির ওপর মদ্য মিশ্রিত করিবার তিনটি পাত্র খোদিত আছে বোধ হয় এই কারণে যে মদ্যই ছিল তাঁহার জীবনের প্রিয় সঙ্গী। এই ভূতপূর্ব নাবিকের বন্ধুগণ মাঝে মাঝে যখন তাঁহার কবর দর্শন করিতে যান তখন তাঁহারা খোদিত পানপাত্রগুলি দেখিয়া এতই আমোদ অনুভব করেন যে এমত প্রতীতি হওয়া অস্বাভাবিক নহে যে তাঁহারা ভুলিয়া গিয়াছেন যে তাঁহারা মৃতের সম্মুখে গোরস্থানে দণ্ডায়মান রহিয়াছেন।

অনুবাদ : লালবিহারী গুপ্ত

# আধুনিক সাহিত্য

জীবনের সব স্তরে, সব যুগে সংঘর্ষ ঘটছেই। মানুষকে এই দলাদলি আর বাদ-প্রতিবাদের মধ্য দিয়েই পথ চলতে হয়। আজকের দুনিয়ায় আজ-কাল-পরশুর যে নিকট সংঘাত-সংঘর্ষের ঘনঘটা একালের ব্যক্তিচেতনায় প্রতিফলিত হয়ে সাহিত্যে আধুনিক বক্তব্য, আধুনিক ভঙ্গি, আধুনিক গদ্য-পদ্য হয়ে উঠছে,—বাংলা কবিতার আধুনিক স্তর বলতে সেই বিশ্বব্যাপী বিচ্ছুরণেরই একটা অংশ বুঝতে হবে। দেওয়ালের পোকাটা—অচিরেই মোহিনী আলোর আগুনে যে ছাই হয়ে যাবে,—আর দেওয়ালের টিকটিকি—যে 'ঘৃণ্য ঠাণ্ডা হিংসে',—'বিদ্রুপ-কশা-রসনা গুটিয়ে' যে 'ওৎ-পাতা সংহার' মূর্তিতে প্রতীক্ষা করছে,—প্রেমেন্দ্র মিত্র এই দু'পক্ষের মামলার কথা তুলে বলেছেন—

কে জানে, বুঝি বা পোকা টিকটিকি
দুই নয়।
পর্দাটা ঠেলে উঁকি দেবে কত,
মজে-ই দেখো না অভিনয়!

এবং এ সংঘর্ষ যে কেবলই বাইরের জগতে, তা নয়। জীবনের রহস্য দুর্ভেদ্য। ভাবুকের জল্পনা চলছেই। কে আমি? কী এই জগৎ? মৃত্যুর ওপারে কিছু আছে কি? ইতিহাসের বেড়া ডিঙিয়ে কল্পনা অতীতে-ভবিষ্যতে এগিয়ে যায়। এইভাবে ঘুরতে-ঘুরতে,—সংশয়ে দুলতে-দুলতেই কৈশোর-যৌবন-প্রৌঢ়ত্ব এসে জরায় পেঁছোয়। প্রেমেন্দ্র মিত্রের সেই আত্মানুসন্ধানের শেষ কয়েক লাইন এই দিক থেকে স্মরণীয়—

তবু হাই ওঠে না'ক। দীর্ঘশ্বাস পড়বেই বা কেন?
সাজানো ছকের ঘুঁটি। ওঠা নামা সমান অলীক
কলেই ঘুরুক সব। পেঁছোবার ভাবনা যদি ছাড়ো
নিষ্ফল নাগরদোলা দেখবে নিজে ঘুরেই মোহিত।

এ দর্শনে মন ভরবে কী ভরবে না, সে অন্য কথা। কিন্তু আধুনিক সাহিত্য—তথা আধুনিক কবিতা সম্বন্ধে—এইসব জল্পনা-প্রকাশের মধ্য দিয়েই একটা ধারণা মনে আসে। সমকালীন মানব-সভ্যতার অবস্থা উল্লেখ করে সেই সূত্রে নিজের আদর্শের কথা বলা,—এবং বলবার ভঙ্গিতে বিস্ময়ে হোক্, প্রেমে হোক্,—অন্য কোনো আবেগে হলেও ক্ষতি নেই,—ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতার স্বাদ সঞ্চার করা—এই বস্তু আর এই ভঙ্গিরই নাম 'আধুনিক' ভঙ্গি! জানি না, এ মন্তব্যে সংজ্ঞা-প্রণয়নের বৈজ্ঞানিকতা অটুট রইলো কি না; কিন্তু কোনো কবি যদি শুধু এই সাধনাতেই সিদ্ধি লাভ করেন, তাহলেই হোলো। তার বেশি আর কী-ই বা চাই! অবিশ্যি 'দুর্বোধ্য' না হলে 'আধুনিক কবিতা'-ই হোলো না—এরকম মতও মাঝে মাঝে শোনা গেছে। ছাব্বিশ বছর আগে,—১৩৪২-এর "কবিতা" পত্রিকায় এই মন্তব্যটি ছাপা হয়েছিল : 'কাব্যজিজ্ঞাসুদের সমর্থনে এ-কথা অন্তত বলা হোক্ যে সাধারণ মানুষ সাধারণভাবে পড়ে বুঝতে না পারলেই কবিতা হোলো না—কিম্বা ভালো কবিতা তা-ই, সাধারণ মানুষ সাধারণভাবে পড়েই যা বুঝতে পারে—এমন স্থূল মূঢ়তা

কোনো অধ্যাপকের উচ্চ আসন থেকেও কখনো ধ্বনিত হয়নি।' এ অবিশ্যি অংশ মাত্র। সে-প্রবন্ধে অন্য কথাও ছিল। দুর্বোধ্যতা সম্বন্ধে উদ্ধৃত উক্তিটির কিছু ঝাঁজ কমিয়ে দিয়ে অচিরেই বলা হয়েছিল : 'পাঠকের বোধগম্য হওয়া কবিতার কর্তব্য নয়; কিন্তু এটা দেখা যে যথার্থ কবিতা—যত বিচিত্র রীতি ও প্রকৃতিরই হোক্ না—যথার্থ রসজ্ঞের মর্মস্পর্শ করতে শেষ পর্যন্ত ব্যর্থ হয়নি—অবিশ্যি নিতান্ত ব্যক্তিগত রুচির খাতিরে কিছু গলতি ধরতেই হবে।' কিন্তু তথাকথিত দুর্বোধ্যতাও যে একটা ফ্যাশান, সেটা বুঝতে দেরি হয়নি। সেই "কবিতা" পত্রিকারই দ্বিতীয় সংখ্যায় লেখা হয়েছিলঃ 'আধুনিকতা জিনিসটাই সাময়িক ও আপেক্ষিক : আজকের দুর্জয় একেলিয়ানা মামুলি সাবেকিয়ানায় পরিণত হতে বেশিদিন লাগে না, ভালো চিরদিনই ভালো।...আধুনিকতায় বিশুদ্ধ ও নির্দোষ হয়েও কবিতা যে খারাপ হতে পারে তার প্রমাণ কোনো-কোনো যুবক কবি যথেষ্টই দিয়েছেন।' এ উদ্ধৃতি এখানে প্রয়োগ করা হোলো প্রধানত এই কারণে যে, বাংলা কবিতার ক্ষেত্রে ১৯৩৫-৩৬ থেকে "কবিতা" পত্রিকাই ভঙ্গিসর্বস্ব 'আধুনিকতা'র মোহ জাগিয়ে তুলেছিল—এই ঐতিহাসিক সত্যের সঙ্গে এ-অংশ একত্র ভেবে দেখা দরকার। সেকালে সেই "কবিতা" পত্রিকাকেও বলতে হয়েছিল : 'আমাদের দেশের বিশেষ এক সুধীশ্রেণীকে সম্প্রতি এই আধুনিকতার মোহে পেয়ে বসেছে। এ নিয়ে দুঃখ করতুম না, যদি জানতুম তাঁদের কারো-কারো মধ্যে কবিত্বশক্তির স্ফুলিঙ্গ আছে। দুর্বলের মুখ-ভ্যাঙচানো হাস্যকর, কিন্তু শক্তির বিকৃতি শোচনীয়। কোনো চলতি ঢঙে কি লোভনীয় কতগুলো মতবাদে অতিরিক্ত আসক্তি কাব্যের স্বাভাবিক প্রেরণাকে বিকৃত করে তুলতে বাধ্য। তার উদাহরণ বর্তমানে বিরল নয় আমাদের দেশে। কোনো মতের মোহে পড়ে সেই মতের সঙ্গে খাপ খাইয়ে রচনা করার মত দুর্গতি কবির পক্ষে আর-কিছুই হতে পারে না।'

তারপর 'আধুনিকতা' সম্বন্ধে আরো অনেক কথা বলা হয়েছে। রবীন্দ্রনাথই বলে গেছেন। বুদ্ধদেব বসুও বলেছেন। "কবিতা"র দ্বিতীয় সংখ্যার পূর্বোক্ত আলোচনার পরে, দ্বিতীয় বর্ষে—১৩৪৪ সালের আষাঢ় সংখ্যায় সমর সেনের প্রশস্তি ('নবযৌবনের কবিতা') লিখতে বসে বুদ্ধদেব নিজের কথা তুলেছিলেন। তাঁর নিজের নবযৌবনের কাব্য "বন্দীর বন্দনা"র সঙ্গে সমর সেনের "কয়েকটি কবিতা" তুলনা করে তিনি সেখানে আধুনিকতা সম্বন্ধে আর একটি ইশারা লিপিবদ্ধ হতে দিয়েছিলেন : 'তুলনায় এইটেই দেখা গেলো যে "কয়েকটি কবিতা" অনেক বেশি আধুনিক'। "বন্দীর বন্দনা"র বিদ্রোহ সম্পূর্ণ ব্যক্তিগত, "কয়েকটি কবিতা"র বিদ্রোহের উৎস সামাজিক বিরোধ ও শ্রেণী-সংঘর্ষ।' কিন্তু 'আধুনিকতা' কি তাহলে বিশেষ সমাজের বিশেষ সাময়িক গণ্ডীতেই একান্ত আবদ্ধ হয়ে থাকা? শুধুই পাঁজির হিসেব?

রবীন্দ্রনাথ কি যথেষ্ট আধুনিক হয়েও সত্যিকার চিরন্তন নন? রবীন্দ্রনাথের নানা প্রবন্ধে-নিবন্ধে, নানা চিঠিপত্রে সে-প্রসঙ্গ উত্থাপিত হতে দেখা গেছে। সমকালীন প্রশংসা বা নিন্দা কোনোটাই চূড়ান্ত নয়। রবীন্দ্রনাথ লিখেছিলেন—'কত পূজার নৈবেদ্য মন্দিরের পথ বদলিয়েছে সাহিত্যের ইতিহাসে যখন তার সাক্ষ্য দেখি তখন সমসাময়িক দলিলের উপর আস্থা রাখতে সাহস থাকে না। এমন কি যখন দেখা যায় জীবিতকালে কোনো কবি বা কৃতী সর্বজনীন প্রশংসা পেয়েছে, তার খ্যাতির সত্যতা সম্বন্ধে সন্দেহ লাগে। আশঙ্কা হয় যে তাদের লেখা বা কাজ কোনো সাময়িক মৌতাতের যোগান

দিয়েছে—নেশা কেটে গেলে খোঁয়ারির দিনে খ্যাতির বিপদ ঘটবে—নেশার ঝোঁকে পূর্বে যদি ভুল বিচার হয়ে থাকে, অবসাদের দিনে তার উল্টো দিকে আবার বিচারে ভুল হবে।' ১৯৩৩-এর ২৬এ সেপ্টেম্বর এ চিঠি লেখা হয়,—এবং বুদ্ধদেববাবুর "বৈশাখী"তে (১৩৫২) এটি ছাপা হয়। অর্থাৎ সাময়িক মৌতাত সম্বন্ধে রবীন্দ্রনাথ এ'দের বার বার সতর্ক হতে বলেছিলেন।

তবু সাময়িক বিশেষ বিশেষ মতামত, ভঙ্গি ইত্যাদি পুরোপুরি পরিত্যাগ করে চলাও সম্ভব নয়। এবং অন্য দেশ থেকে কতকগুলি স্থানের নাম, নদীর নাম, মানুষের নাম আমদানি করাটাও দোষের নয়। 'আমদানি' কথাটা কোনোরকম তুচ্ছার্থে ব্যবহৃত হচ্ছে না। একজন লেখক যখন অ্যাথেন্স, মুনিক, বস্টন, বার্বেডোস দ্বীপ, ত্রিনিদাদ, পানামা ইত্যাদি নানা অঞ্চলে ভ্রমণের সুযোগ পান—এবং এই অর্থে ভ্রমণই যখন তাঁর জীবন হয়ে ওঠে, তখন সেই ভ্রমণের মানচিত্র তো সেই লেখকের রচনায় কিছু পরিমাণে, কিছু-না-কিছু প্রভাব রেখে যাবেই। অর্থাৎ তিনি তাঁর স্বদেশের নিকট-কালের ঘটমান ঘটনাস্রোত ও বস্তুসম্পর্ক দূরে রক্ষা করে,—সমুদ্রে, বন্দরে সুদূরের পিয়াসী হয়ে ঘুরে বেড়াবেন; এবং তারই মধ্যে তাঁর কবিতার চিত্রপটে কখনো বা বস্টনে স্যর বেনেগল রাও-এর 'শুভ্র কেশ, তাপসিক মুখে স্নিগ্ধ হাসি' দেখা যায়,—কখনো ইউ-এন-এর কেরানিত্বে স্বস্তিহারা নরেন্দ্রের হাঁটা-বসা-শোওয়া-স্বপ্ন দেখার কাহিনী প্রবেশ করে—

মান্‌হাটানের পথে জ্বলন্ত রোদ্দুরে<br>
হাঁটি দেখি সারি সারি পণ্য মাংস মদ<br>
স্তূপ করা দৈত্যপুরে—মনে আসে ঘুরে<br>
দূর থেকে কোন্‌ হাওয়া যেখানে সম্পদ<br>
কেনার জিনিসে নয়;

অমিয়বাবুর "পারাপার", "পালাবদল" থেকে ধরলে তাঁর সদ্যপ্রকাশিত এই কবিতা-সংগ্রহ "ঘরে ফেরার দিন" বেশ খানিকটা সময়ের দূরত্বে ব্যবহিত বলতে হয়। রবীন্দ্র-শতবর্ষ উৎসবের বছরে প্রকাশিত এই "ঘরে ফেরার দিন"-এর প্রথম কবিতাটিই হোলো 'রবীন্দ্রনাথের উদ্দেশে'। রবীন্দ্রনাথের মধ্যে যে সনাতন ব্রহ্মচিন্তা, এবং নিত্যজ্যোতির প্রতি যে প্রণতি উচ্চারিত হয়েছিল, সেই মহিমার কথা স্মরণ করেছেন অমিয়বাবু। সেই স্মৃতিবন্দনার পরে বইয়ের মোট সত্তরের চেয়ে বেশি কবিতা পর পর সাজিয়ে দেওয়া হয়েছে। এই কবিতাগুলি 'অন্তরা' এবং 'অধুনা'—এই দুই শ্রেণীতে ভাগ করে সাজানো হয়েছে। "পালাবদল"-এর 'সমাবর্ত' কবিতাটিই এক দিক থেকে অমিয় চক্রবর্তীর স্বভাবের স্মারক বলা চলে। বার বার সময়ধারার চিন্তা,—আর, কিছু কিছু রঙ-রূপ-ধ্বনির মধ্য দিয়ে স্থানের ব্যাপ্তি, কালের রহস্য, জীবনের বিস্ময়, স্মৃতিবিস্মৃতির ইঙ্গিত তুলে ধরা—এ-সবই সেই 'সমাবর্ত' লেখাটিতে দেখা গিয়েছিল। আর, শব্দের দিকে আগ্রহ সব গভীর কবিদের মতন তাঁরও আছে। তাঁর 'আগুনি বেগুনি', 'প্রাণনী', 'নির্বিত আকাশ', 'ঝিনুকি সন্ধ্যা', 'স্বর্ণায়না বসুমতী' ইত্যাদি প্রয়োগের অভ্যাস বাংলা কবিতার অনুরাগী পাঠক মাত্রেরই জানা কথা। "ঘরে ফেরার দিন" সে-দিক থেকে নতুন কিছু নয়। তবে 'সার্কাস'-এর মতন কবিতা অমিয়বাবু এর আগে আর কখনো লিখেছেন বলে মনে পড়ে না। এতে ঠিক পুরোপুরি হাসির ঢেউই নয়,—ঈষৎ বিষাদের ভাব যেন মিশে আছে। সার্কাসের রঙ্‌-মাখা সঙ্‌ বলেছে :

বত্রিশ বছর নখে শূন্য আঁচড়িয়ে
হেঁটেছি চৌতলা উঁচু সরু তার দিয়ে
শুনি ঝোড়ো তালি,
সার্কাস সাবাস ক্লাউন শখের বাঙালি।

এবং এ সার্কাস আমাদের জীবনেই ঘটমান।—

কোথাও পালানো নয়, ভিড়ে-চড়া বাস্
একেবারে সামনে আনে : এ কাজে অবশ্য
পপভ্, চ্যাপলিন, ডিস্নি সবার নমস্য—
ঝলমল প্রাণ থেকে ছলছল বুকে,
আশ্চর্যের নানা ভঙ্গি কত কী কৌতুকে;
তুমি আমি আসবো যাবো, তাঁবুর নিশান
উড়বে আজ আসানসোলে, কাল বর্ধমান।

ছন্দের ঢেউয়ে ঢেউয়ে কখনো উচ্ছলতা, কখনো উদাসীনতা সঞ্চার করবার ক্ষমতা আছে অমিয় চক্রবর্তীর। ১৯৬০-এ স্যান ডিয়েগো-তে লেখা 'নীল চোখ' কবিতাটির কথাই উদাহরণ হিসেবে স্মরণ করা যেতে পারে :

ভাঙলো যখন আকাশভাঙা শেষরাঙানো লহরী,
জানলে কি তা অস্তদিনের প্রহরী।
ভিড়ের মাদল ব্যাঞ্জো বাজা ঘূর্ণিসাজে
স্যান ডিয়েগো
আলোর জেটি স্যান ডিয়েগোর দূর জাহাজে...'

—এ ছবি আর এই গান বাংলা কবিতায় বিদেশের আমদানি বললে একে কোনোমতেই তুচ্ছ করা হয় না। বরং এই কথাই স্বীকার করবার অভিপ্রায় ব্যক্ত হয় যে, বাংলা কবিতায় সংঘাত-সংঘর্ষহীন প্রকৃতি-অনুভবে বা অন্যতর রূপোপলব্ধিতে চিরকালের যে-আগ্রহ অতীতে এ দেশেরই আলোছায়া, নদীগিরি অবলম্বন করে চরিতার্থ হয়েছে, অমিয় চক্রবর্তীর ভ্রমণসুখ সেই ধারাতেই যুক্ত হোলো। আর, মনে পড়ে রবীন্দ্রনাথের শেষ বয়সের "বনবাণী" "বিচিত্রিতা" থেকে শুরু করে শেষ পর্যন্ত তাঁর কাব্যভঙ্গিতে যেসব লক্ষণ দেখা গিয়েছিল, তারই কোনো কোনো লক্ষণ,—যেমন ছোটো ছোটো লাইন, সহজ মিল—কখনো প্রত্যাশিত শব্দে কখনো বা আকস্মিক কোনো প্রয়োগে! 'সেই আমার, নেই আমার' লাইনটা রবীন্দ্র-নাথের কথাই মনে করিয়ে দেয়। রবীন্দ্রনাথের শেষ বয়সে 'মন্ত্র' কথাটার দিকে তাঁর যে ঝোঁক দেখা গিয়েছিল,—তিনি যে মন্ত্রের ভাষা-ভঙ্গির ভাবনাপথে কবিতার ভঙ্গি সম্বন্ধে ভেবেছিলেন, সে-ঘটনাও মনে পড়লো। পুরোনো দৃশ্যই আমরা বার বার দেখে যাই। অমিয় চক্রবর্তী সেই কথাই বলেছেন তাঁর এ বইয়ের শেষ কবিতা 'একই ছবি'তে। পর্দা ওড়ে তেতলায়,—পুরোনো রাস্তায় পাথর একইভাবে ছড়িয়ে আছে। সকালে একভাবে রোদ পড়ে, বিকেলে আর-একভাবে। তাই দেখে,—নিজের মনের কথা ভেবে,—তিনি লিখেছেন :

বিলম্বিত একই ছবি বাসনা অন্তিম শেষ রোদে
কী মূর্তি ধরেছে ঐ চূড়া-তলে প্রার্থনার বোধে।

এসব ছত্রে রাজনীতি-অর্থনীতি-সমাজনীতির কোনো সমারোহ-ঘোষণাও নেই, কোনো-

রকম কায়দা বা কসরতের প্রদর্শনীও নেই। এ দুর্বোধ্যও নয়, পদ্যপাঠের পদ্যও নয়। রবীন্দ্রনাথের শেষ বয়সের এক শ্রেণীর কবিতার প্রৌঢ় রূপানুরাগ সর্বান্তঃকরণে নিজের কবি-চৈতন্যে গ্রহণ করে,—নিজের ধারণায় নিয়ে ভারতবর্ষ থেকে অনেক দূর দূর দেশে অমিয় চক্রবর্তী যে ভ্রমণে নিযুক্ত আছেন, তাঁর সদ্য-প্রকাশিত কবিতাসংগ্রহে সেই পরিচয়ই পুনরায় ব্যক্ত হয়েছে। তিনি বসন্তে উদাসীন নন—

বসন্ত আজো সেই পুষ্পবেশের
বক্ষ-দোলানি আনে অন্যদেশের,
ইদানীং মার্কিন;
এখানে বরং
শানটুঙ্ টাই পরি
কাঁচ সবুজের রং,
রেশমি আমেজে ধরি
যে-খুশি হয়নি লীন (আভা দেয় দূর চীন)
টলমল নদীজলে, অন্য তারার তলে
আয়ু বায়ু গায়ে দোলে
আলো মার্কিন,
শেষ বেলা কাছে আসা দিন।

এদিকে প্রেমেন্দ্র মিত্রও রূপানুরাগী, কিন্তু তাঁর দৃশ্যক্ষেত্র আমাদেরই 'লুপ লাইনের গ্রামটা'তে—সেই যেখানে—

সবুজ শিরোপা বাঁধা তে-ঢেঙা তালের পাহারায়
শর-ঝোপের ফোয়ারা-তোলা, রাঙা মাটির ঢেউ-এ গড়ানো।

—কিংবা শহর কলকাতার গড়ের মাঠে, মনুমেণ্টের পদতল থেকে ভিক্টোরিয়া মেমোরিয়ালের সীমানা অবধি ('দিনটা', 'লগ্ন' ইত্যাদি)! তিনি যতো ভ্রমণের সুযোগ পেয়েছেন, অমিয় চক্রবর্তী পেয়েছেন তার চেয়ে অনেক বেশি। ভ্রমণের নানা ছবি—তা দূরেরই হোক আর কাছেরই হোক,—সেইসব ছবির সঙ্গে এ-যুগের ভাবনা জুড়ে দিতে দুজনেই বিশেষ আগ্রহী। যেমন গড়ের মাঠে কে যেন বলেছে 'কটা বাজে',—আর সেই প্রশ্ন শুনে প্রেমেন্দ্র বলেছেন—

আচমকা তার 'কটা বাজে' প্রশ্ন শুনে তবু
ভ্রম হয় যে
এই শহরের প্রাণ-পুরুষই বুঝি—
মহামুক্তি লগ্ন জানতে চায়। [ লগ্ন ]

শহরের বাঁধানো রাস্তা যতোই ছড়িয়ে যাক্,—জীবনের মসৃণ শৃঙ্খলাবোধ যতোই পরিব্যাপ্ত হোক্,—তবু প্রাণের নিজস্ব তাগিদেই আমরা নদী, ঝড়, পাহাড়ের প্রত্যাশী হয়ে থাকবো।

পাহাড় না হলে
পারবে কী নদী বহাতে!
নদী না বহালে
বন্যা ভাসাবে কি দিয়ে?

এবং পাহাড়ের ভাবনা তিনি এই 'কখনো মেঘ'-এর লেখাগুলিতে বারেবারেই ভেবেছেন। 'কোনো এক দুরারোহ হিম-শৈল-শিখরে' নিঃসঙ্গ শ্যেন-এর [ 'শ্যেন' ] ছবিতেও যেমন, 'সনদ' কবিতাটিতেও তেমনি পাহাড় দেখা দিয়েছে একই ভূমিকায়। তাঁর পাহাড়-প্রীতি যেমন অকৃত্রিম, বারান্দা-চিন্তাও [ 'বারান্দা' ] তেমনি অনিবার্য। এইরকম 'বারান্দা'-ই তাঁর ছোটগল্পেও দেখা গিয়েছিল একদা। বারান্দা আর শূন্যতা তাঁর কাছে পরস্পরের প্রতিশব্দের মতন! আগেকার আমলের নীল শূন্যতা নয়—সুখ-দুঃখ-যন্ত্রণা-উল্লাস দিয়ে 'জীবনের বয়ন-বিলাস',—আর, কালের বল্মীক এসে যেখানে সেই জীবন-নক্সা ফুটো করে দেয়, সেখানকার শূন্যতার কথাই [ 'আয়নায়' ] এ আমলে সর্বাধিক!

আকাশে উড়ে-যাওয়া হাঁসের কলধ্বনি শুনে, কোনো দিন কারও চেতনায় সংসারের চিহ্নিত পথ যে হঠাৎ অন্ধকারে হারিয়ে যেতে পারে,—'বিকল হতেও পারে দিশারী চুম্বক' [ 'কলধ্বনি' ],—অথবা অন্য ভূমিকায়, অন্য পরিবেশে কখনো মনে মনে এ উদ্ভাসনও ঘটা সম্ভব যে—'প্রাণ তো সময়-সত্য, জানে আদি জানে অবসান' [ 'তির্যক' ]—এসব ভাবনা প্রেমেন্দ্র মিত্রের পূর্ব-পর্বেও শোনা গেছে,—পুনরায় শোনা গেল। 'মৎস্য, কূর্ম, বরাহ ছাড়িয়ে এসে—নৃসিংহ হয়ে বামনই বংশধর'—মানব-সভ্যতার এ পৌরাণিক দেবচিন্তা একালের আলোয় তিনি নতুনভাবে উদ্ভাসিত হতে দিয়েছেন :

সূর্যের ঢেউ ছলকায় শুধু বহ্নি,
সেই আগুনেও কোথা ছিল এত খাদ!
বিগ্রহ যত ধ্যানের মন্ত্রপূত
বোধন না হতে কেন তার অবসাদ! [ কারিগর ]

'ছলনা' কবিতাটিতে তাঁর শান্তি-কামনা ফুটেছে। 'অগাণিতিক'-এ তিনি সৃষ্টির কূট অঙ্ক মেলাবার ভাবনা ভেবেছেন। এসবই তাঁর আগের পর্বের পুনঃপ্রকাশ। যেমন অমিয় চক্রবর্তী, তেমনি প্রেমেন্দ্র মিত্র—দুজনেই বাংলা সাহিত্যের আধুনিক প্রিয় কবি,—দুজনেই নিজের নিজের অভ্যস্ত পথে কখনো মেঘ দেখছেন, কখনো বা আলো,—জীবনের লেন-দেন ফুরোবার যে অন্ধকারের কথা জীবনানন্দের একটি প্রসিদ্ধ কবিতায় বেজে উঠেছিল,—সব পাখি নীড়াভিমুখী হবার পরবর্তীকালের সেই অন্ধকারের কথা এঁদের দুজনের লেখাতেই মাঝে মাঝে অনুভব করা যাচ্ছে। প্রেমেন্দ্র মিত্রের প্রশ্নমনস্ক ক্ষিপ্রভঙ্গি এবং অমিয় চক্রবর্তীর রূপাবেশ—অধুনা দুই-ই সেই অন্ধকার-সচেতন!*

হরপ্রসাদ মিত্র

* ঘ'র-ফেরার দিন—অমিয় চক্রবর্তী। নাভানা। কলিকাতা। মূল্য ৩·৫০ ন. প.।
কখ'না 'মেঘ—প্রেমেন্দ্র মিত্র। ইণ্ডিয়ান অ্যাসোসিয়েটেড পাবলিশিং কোং প্রাইভেট লিঃ। কলিকাতা। মূল্য ৪·০০ টাকা।

# সমালোচনা

The Testament of Adolf Hitler: The Hitler-Borman Documents. Cassell. London. 8*s*.

জার্মানির ন্যাৎসী বিপ্লব ও তাহার অধিনায়ক হিট্‌লার সম্পর্কে যুদ্ধোত্তর যুগে বহু মৌলিক উপাদান আবিষ্কৃত ও প্রকাশিত হইয়াছে। উপরোক্ত Hitler-Borman Documents তাহাদের মধ্যে অন্যতম। বইখানার ভূমিকা লিখিয়াছেন অক্সফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয়ের ইতিহাসের অধ্যাপক এইচ, আর, ট্রেভর-রোপার।

যে-সব চিন্তা ও পরিকল্পনা তাহার মনে আলোড়িত হইত হিটলার তাহা তিনবার Table-talk-এর মাধ্যমে ঘনিষ্ঠ সহচর-অনুচরদের কাছে প্রকাশ করিয়াছিলেন। প্রথমবার করিয়াছিলেন ১৯৩২-৩৩ সালে। তখনও ন্যাৎসীদল ক্ষমতায় আসীন হয় নাই, কিন্তু শীঘ্রই হইবে এ বিষয়ে সন্দেহের অবকাশ ছিল না। ঐ সময় হিটলার একবারে রাজদণ্ড হস্তগত হইলে কি ভাবে উহা পরিচালিত করিবেন এ সম্পর্কে তাহার মনের ভয়াবহ গোপন পরিকল্পনা অন্তরঙ্গদের কাছে ব্যক্ত করেন। সরকারীভাবে এই কথোপকথন কখনও প্রকাশিত হয় নাই। তবে কয়েক বৎসর পরে (১৯৩৯ সালে) হার্মান র‍্যসনিং নামক হিটলারের একজন ভূতপূর্ব অনুচর *Hitler's Table Talk* নাম দিয়া উহা ছাপাইয়াছিলেন। দুর্ভাগ্যবশতঃ এই কথোপকথনের সত্যতা সম্পর্কে তখন অনেকেই সন্দেহ প্রকাশ করিয়াছিলেন। ইংলন্ডের প্রধান মন্ত্রী নেভিল চেম্বারলেইন বলিয়াছিলেন তিনি এই কথোপকথনের একটি বর্ণও বিশ্বাস করেন না।

এর পরে হিটলার দ্বিতীয়বার তাঁহার মনের অভিপ্রায়-অভিসন্ধির কথা তাঁহার বিশ্বস্ত অনুচরদের কাছে ব্যক্ত করেন ১৯৪২-৪৩ সালে। তখন সমগ্র ইয়ুরোপে হিটলারের জয়-জয়কার। একটি একটি করিয়া ইয়ুরোপ ভূখণ্ডের দেশগুলি দুর্ধর্ষ জার্মান শক্তির কাছে পদানত হইয়াছে। পূর্বপ্রান্তে রুশিয়া তখনও দণ্ডায়মান, কিন্তু জার্মানবাহিনী রুশিয়ার বুকের উপর দিয়া ধাবমান এবং অনতিবিলম্বে রুশিয়াও ভাঙিয়া পড়িবে এ বিষয়ে কাহারও মনে সন্দেহ নাই। ঠিক এই সময় হিটলার তাঁহার বিশ্ববিজয়ের সুদূরপ্রসারী পরিকল্পনার কথা অকুণ্ঠিত-চিত্তে অন্তরঙ্গদের কাছে ব্যক্ত করেন, এবং তাঁহার সেক্রেটারী মার্টিন বোরম্যান তাঁহার উক্তিগুলি লিপিবদ্ধ করিয়া রাখেন। যুদ্ধের পর বোরম্যানের এই অনুলিপি জার্মানিতে পাওয়া যায়, এবং ১৯৫২ ও ১৯৫৩ সালে ইহার ফরাসী ও ইংরাজি অনুবাদ প্রকাশিত হয়।

শেষবার হিটলার তাঁহার চিত্তলোকের দ্বার খুলেন ১৯৪৫ সালের গোড়ার দিকে। ইতিমধ্যে যুদ্ধের মোড় ঘুরিয়াছে। হিটলারের বিজয়-পতাকা তখন সর্বত্র ধূলি-বিলুণ্ঠিত, এবং তাঁহার সাধের জার্মান রাষ্ট্র মিত্রপক্ষীয় সৈন্যবাহিনীর আক্রমণে ক্ষত-বিক্ষত ও বিধ্বস্ত। যে আশা-ভরসা নিয়া ১৯৩৯ সালে হিটলার যুদ্ধে নামিয়াছিলেন তাহা এখন নির্বাপিত-প্রায়। যুদ্ধে জার্মানির পরাজয়ের অনিবার্যতা সম্বন্ধে সন্দেহের অবকাশ নাই। এই

ভাগ্য-বিপর্যয়ের সময় তাহার মনে যে-সব কথা তোলপাড় করিতেছিল সে-সব কথা হিটলার তাহার অনুরক্তদের কাছে ব্যক্ত করেন, এবং সেক্রেটারী বোরম্যান পরম নিষ্ঠার সহিত সেগুলি লিপিবদ্ধ করিয়া রাখেন। কেন এমন হইল? কেন এই নিদারুণ ভাগ্য-বিপর্যয় ঘটিল? কোথায় ভুল হইয়াছে? হিটলারের মনে তখন সর্বক্ষণ এই প্রশ্ন। উত্তরে পৃথিবীর বড় বড় রাষ্ট্র ও রাষ্ট্রনায়কদের ও ইয়ুরোপের রাজনৈতিক পরিস্থিতি ও ভবিষ্যৎ সম্পর্কে হিটলার যে-সব মতামত ব্যক্ত করিয়াছিলেন উপরোক্ত Hitler-Borman Documents-এ তাহা প্রকাশিত হইয়াছে। হিটলারের জীবনাদর্শ ও আলো-অন্ধকার মিশ্রিত তাঁহার মনের আকৃতি ও বিকৃতি এই Documents গুলিতে রূপায়িত হইয়াছে।

কেন যুদ্ধে জার্মানির পরাজয় ঘটিল এ সম্পর্কে অনেক বিচার-বিশ্লেষণের পর হিট্‌লার যে মত প্রকাশ করিয়াছেন তাহা সম্পূর্ণ সত্য না হইলেও সর্বৈব মিথ্যা বলিয়া উড়াইয়া দেওয়া যায় না। হিট্‌লার বলিয়াছেন ইটালীর সহিত মিতালিই জার্মানির ভাগ্য-বিপর্যয়ের কারণ। হিটলার মুসোলিনীকে শ্রদ্ধার চক্ষে দেখিতেন, কিন্তু ইটালীয়ান্‌ তথা ল্যাটিন জাতিদের প্রতি তাঁহার অশ্রদ্ধার অন্ত ছিল না। ইটালীর সহিত মিতালি রক্ষা করিতে গিয়া তিনি পৃথিবীর সর্বত্র ইয়ুরোপীয় সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে দণ্ডায়মান হইতে পারেন নাই এবং তাহার ফলে এসিয়া ও আফ্রিকার অগণিত স্বাধীনতাকামী জনগণের সমর্থনলাভে বঞ্চিত হন। কিন্তু ইহাই শেষ কথা নয়। শেষ কথা হইল ইটালীকে বাঁচাইতে গিয়া তাঁহার রুশিয়া আক্রমণের তারিখ পাঁচ সপ্তাহ পিছাইয়া দিতে হইয়াছিল। হিটলার স্থির করিয়াছিলেন ১৫ই মে জার্মানবাহিনী রুশিয়ার উপর বিপুল বিক্রমে ঝাঁপাইয়া পড়িবে এবং শীতের আগেই রুশিয়া-বিজয় সম্পন্ন করিবে। কিন্তু ইতিমধ্যে মুসোলিনী তাঁহার অজ্ঞাতে গ্রীস আক্রমণ করিয়া এক সঙ্কটাপন্ন অবস্থার সৃষ্টি করিয়াছিলেন। হিটলারের সাহায্য ভিন্ন তাঁহার এই সঙ্কট হইতে ত্রাণ পাইবার দ্বিতীয় উপায় ছিল না। হিটলার জার্মান বাহিনী পাঠাইয়া মুসোলিনীকে রক্ষা করিলেন, কিন্তু ইহার ফলে তাঁহার রুশিয়ার বিরুদ্ধে অভিযান পিছাইয়া দিতে হইল। ১৫ই মে'র পরিবর্তে ২১শে জুন জার্মান বাহিনীর রুশ-অভিযান সুরু হইল। হিটলারের মতে এই পাঁচ সপ্তাহই তাহার সমস্ত পরিকল্পনাকে বানচাল করিয়া দিয়াছে। ১৫ই মে অভিযান সুরু করিতে পারিলে শীতের আগেই জার্মান বাহিনী রাশিয়ার মেরুদণ্ড ভাঙ্গিয়া দিতে পারিত এবং সমগ্র রুশিয়া না হউক অন্ততঃ ইয়ুরোপীয় রুশিয়া দখল করিতে পারিত। কিন্তু ২১শে জুন অভিযান সুরু হওয়ায় তাহা হইল না; অভিযান শেষ হওয়ার আগেই রুশিয়ার প্রচণ্ড শীত ও তুষার-বর্ষণে জার্মান বাহিনী একেবারে পঙ্গু হইয়া পড়িল। ১৮১২ খৃষ্টাব্দে রুশিয়ার শীত ও বরফ রুশিয়াকে নেপোলিয়নের হাত হইতে রক্ষা করিয়াছিল। ১৯৪১-৪২ খৃষ্টাব্দে আবার সেই শীত ও বরফ রুশিয়াকে বাঁচাইল। এর পর হইতেই যুদ্ধের মোড় ঘুরিতে আরম্ভ করিল।

ইতিহাসের দৃষ্টিতে হিটলারের এই মত কতদূর গ্রাহ্য হইবে সে প্রশ্ন এখানে উত্থাপন করিব না। তবে একটি কথা বলা প্রয়োজন। হিটলারের পরিকল্পনা অনুসারে জার্মান বাহিনী যদি রুশিয়ার মেরুদণ্ড ভাঙ্গিয়া দিতে পারিত, তাহা হইলেই যে জার্মানী এই বিশ্বযুদ্ধে জয়লাভ করিতে পারিত তাহা নিঃসন্দেহে বলা যায় না। একটি অথবা একাধিক জাতিকে যুদ্ধে পরাজিত করা এক কথা, তাকে দীর্ঘকাল পদানত রাখা অন্য কথা। রুশিয়া জয় করিতে পারিলে হিটলার তথা জার্মানি বহুপ্রকার নূতন সমস্যার সম্মুখীন হইত, এবং

এই সমস্যাগুলির সমাধান নিশ্চয়ই সহজসাধ্য হইত না। হয়ত এ সমস্যাসমূহের গুরুভারে জার্মানি নিজেই ভাঙিয়া পড়িত।

পৃথ্বীশচন্দ্র চক্রবর্তী

The Law. *By* Roger Vailland. Translated from the French by Peter Wiles. Penguin. 4*s*.
The Sovereigns. *By* Roger Vailland. Translated from the French by Peter Wiles. Jonathan Cape. London. 13*s* 6*d*.

সিসিলি থেকে সিরেচ্চিয়ো, নেপল্‌স্‌ থেকে লিরেচ্চিয়ো—এই দুই হাওয়া এসে খেলে দক্ষিণ ইতালীর পোর্তো মানাকোরের সমুদ্রতীরে। গাছপালা কখনো এদিকে নুয়ে পড়ে, কখনো ওদিকে। পোর্তো মানাকোরে শহরের মাঝখানে চৌমাথায় ভ্রাম্যমান অলস বেকার যুবকেরা তাকিয়ে দেখে, কোন হাওয়া জিত্‌ল। হাওয়া বয়, কিন্তু পরিবর্তনের নয়। রোম সাম্রাজ্যের বিখ্যাত ইউরিয়া শহরের আমল থেকে সিরেচ্চিয়ো ও লিরেচ্চিয়ো বইছে, কখনো একদিকের হাওয়া উত্তাল হয়ে ওঠে, কখনো আরেকদিকের।

বুড়ো বটের মতো এখানকার দুর্ধর্ষ জমিদার। আইনের খাতিরে প্রতাপ কিছুটা খর্ব হলেও নিজের এলাকার মধ্যে এখনো প্রবল। ডন সেজারে ইউরিয়ার ইতিহাসে পণ্ডিত, প্রাচীন শিল্পের সমঝদার সংগ্রাহক। সত্তর বৎসর বয়সেও শিকারে বেরোন, এবং আত্মীয়-পরিবার ও প্রজাদাসদাসীর কোনো কুমারী মেয়ের বিবাহ হতে পারে না যতক্ষণ পর্যন্ত বিপত্নীক ও নিঃসন্তান ডন সেজারের সঙ্গে তারা রাত্রিযাপন না করে।

পোর্তো মানাকোরের সবচেয়ে জনপ্রিয় খেলা—The Law। তাসে যার ভাগ্য খোলে সে হয় খেলায় দণ্ডমুণ্ডের কর্তা। তার অধিকার খেলার অন্যান্য যোগদানকারীদের মধ্যে একজনকে অবাধে চূড়ান্তভাবে অপমান করার। যাকে অপমান করা হয় তার প্রতিবাদের কোনো উপায় নেই। তাকে চুপ করে বসে থাকতে হয় তাসের মুখ চেয়ে। যখন তার ভাগ্য খুলবে তখন অপমানের অধিকার হবে তার। এই অধিকার যে পায় সে তার নির্বাচিত লোককে যত কৌশলে অপমানে জব্দ করতে পারে তত তার বাহাদুরী। চারিদিকে লোক রুদ্ধশ্বাসে লক্ষ্য করে এই মান-অপমানের খেলা।

এই খেলাই পোর্তো মানাকোরের জীবনের পরিবর্তনহীন প্রতীক।

উপন্যাসের শেষে দেখা যায় গুণ্ডাদলের সর্দার ধরা পড়তে পড়তেও পুলিশের সাহায্যে বেঁচে গিয়ে নির্দোষীকে জেলে পাঠায়। মেরুদণ্ডহীন দোদুল্যমানচিত্ত বিচারকের সুন্দরী স্ত্রী সর্দারের ছেলের সঙ্গে পালাতে গিয়ে পারে না, পুলিশের কর্তার লালসার কাছে ধরা দেয়। বুড়ো ডন সেজারে উপদংশজাত পক্ষাঘাতে মরে জবরদস্ত কুমারী দাসী-কন্যার বক্ষে হাত রেখে। অর্থাৎ পোর্তো মানাকোরের ব্যর্থতার বেড়াজাল থেকে বেরোতে কেউ পারে না। শাসনব্যবস্থা, বেশভূষা আচারবিচারের যতই পরিবর্তন হোক, প্রাচীন ইউরিয়ার আমল থেকে যেন মানুষের মনের কোনো মৌলিক পরিবর্তন নেই।

চরিত্রচিত্রণে, বৈপরীত্যের সমাবেশে, বর্ণনার সজীবতায় পোর্তো মানাকোরের জীবন

পাঠকের সামনে সুস্পষ্ট হয়ে ওঠে। লেখক শুধু দুই হাওয়ার খেলা দেখিয়েই সন্তুষ্ট, কোনো দলের প্রতি স্পষ্ট সহানুভূতির পরিচয় নেই। যা আছে তা হচ্ছে রিয়্যালিটির প্রতি সম্ভ্রম—তা সে রিয়্যালিটি যতই ক্ষয়িষ্ণু হোক না কেন। দক্ষিণ ইতালীয় সমাজের অচলায়তন অতি যত্নে রূপায়িত করা হয়েছে। এই রূপায়নই যেন উপন্যাসের সম্পূর্ণ উদ্দেশ্য। তা সত্ত্বেও লেখকদের অন্তর্নিহিত ব্যঙ্গ ধরা পড়ে। অব্যক্ত হলেও এই ব্যঙ্গ অতি তীক্ষ্ণ। কিন্তু এই উপন্যাসের প্রধান উৎকর্ষ একটি সমাজকে সংহত ও জীবিন্তভাবে চিত্রায়ণের মধ্যে। অনুবাদের মধ্য দিয়েও ভাষার অনুত্তেজিত স্থিরতা ও বর্ণনার সুষ্ঠুতা আনন্দ দেয়। অতি কুশলী, সুপাঠ্য ও উপভোগ্য উপন্যাস সন্দেহ নেই।

একই লেখকের পর পর লেখা দুই উপন্যাস এত ব্যবধান সাধারণতঃ পাওয়া যায় না। *The Sovereigns*-এ আঙ্গিকের কৌশল প্রচুর, ভাষা ও ঘটনাপ্রবাহ কৌতুকপ্রদ, কিন্তু সারবস্তু কিছুই নেই। বক্তব্যহীন, নিরুৎসাহ এক লেখক স্ত্রীর অনুমত্যানুসারে পরকীয়া-সংসর্গের দ্বারা কীভাবে পুনরুজ্জীবিত হয়ে লেখার প্রেরণা ফিরে পেলেন তারই কাহিনী *The Sovereigns*। উপন্যাসের নামকরণ ঐ লেখকের দর্শন অনুযায়ী। প্রতি মানুষের ব্যক্তিত্ব সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র এবং স্বাধীন, সমস্ত সামাজিক নীতিবোধের ঊর্ধ্বে, অতএব Sovereign।

*The Law*তে যে সমাজচেতনা ছিল এখানে তা লুপ্ত হয়ে হঠাৎ ব্যক্তিনির্ভর হয়ে পড়েছে। পরকীয়াসঙ্গমের পরেও লেখককে প্রেরণাহীন বলেই আমাদের মনে হয়, কারণ লেখকের পুনরুজ্জীবিত লেখনী প্রথম যে কয়েকটি লাইন লেখে তা এই উপন্যাসেরই প্রথম অনুচ্ছেদ! প্রেরণাহীন লেখক নিজের নিরুৎসাহকে উপজীব্য করে ক্লান্ত লেখনী চালালেন—ফল এই উপন্যাস। *The Law* পড়ে যতখানি উৎসাহিত হতে হয় ততখানি হতাশ করে *The Sovereigns*। প্রথম উপন্যাসে জীবনের প্রতি যে অনুসন্ধিৎসা ছিল তা এখানে নির্জীব আত্মরতিতে পরিণত হয়েছে।

**চিদানন্দ দাশগুপ্ত**

People and Life. *By* Ilya Ehrenburg. MaCgibon & Kee. London. 25*s.*

১৮৯১ সালে যে-ব্যক্তির জন্ম, এবং তারপর যার সত্তর বছর এই পৃথিবীতে অতিবাহিত হয়েছে, তিনি অবশ্যই পেছন ফিরে তাকাতে পারেন। ইলিয়া এহ্‌রেনবুর্গের সাম্প্রতিক গ্রন্থ এই বক্তব্যেরই স্বাক্ষর। যদিও কিয়েভ প্রদেশে তাঁর জন্ম, কিন্তু জীবনের সব থেকে গুরুত্বপূর্ণ বছরগুলি কেটেছে বাইরে। তিনি অনেক ঘটনার সঙ্গে ব্যক্তিগতভাবে পরিচিত। দু'টি বিশ্বযুদ্ধ, রাশিয়ার বিপ্লব—এই সমস্ত কিছুই তাঁর চোখের ওপর দিয়ে ঘটে গেছে। জীবনের প্রায় সায়াহ্নে উপস্থিত এহ্‌রেনবুর্গ তাই হাসি কান্নায় উচ্ছল দিনগুলির দিকে ফিরে তাকিয়েছেন। তাঁর মনে অনন্ত সংশয়। বারে বারে সন্দেহ তাঁর মনকে আঘাত করেছে। স্বভাবতই তিনি দ্বিধা বোধ করেছেন, যদি সকলের চিত্র যথাযথ উপস্থিত না করতে পারেন!

গ্রন্থের প্রারম্ভেই তিনি বলেছেন—

I have long wanted to write about some people I have met during my life, some of the events I have perticipated in or seen ; but more than once I have put off the task: either circumstances were against it or I was overcome by doubts wheather I could re-create the image of a man, a picture faded with years, wheather I could rely on my memory.

কিন্তু তাঁর মনে সঞ্চিত সেই সব বিচিত্র রঙীন স্মৃতি কোথাও আবছা হয়ে যায়নি। বরঞ্চ সময়ের ব্যবধান তার রঙ অনেক বেশী সুন্দর, অনেক বেশী উজ্জ্বল করে তুলেছে। অতীত ও বর্তমানের এই দুস্তর ব্যবধানের ওপর এহ্‌রেনবুর্গের সোৎসাহ আবেগ সেতুবন্ধ করেছে।

১৯০৬ সাল। এহ্‌রেনবুর্গের বয়স তখন মাত্র পনের। বৈপ্লবিক কাজে যুক্ত থাকার জন্য তিনি গ্রেপ্তার হন। কিছুকাল কারাজীবন যাপনের পর তিনি বাধ্য হন নির্বাসন গ্রহণ করতে। নির্বাসিত জীবন যাপনের জন্য প্যারিসে এলেন। এবং অচিরেই এখানকার শিল্পী ও লেখকগোষ্ঠীর মধ্যে নিজের একটি স্থান করে নিলেন। তাঁর প্যারিসের জীবন অনন্ত বিস্ময়ের সঞ্চার করে। এখানকার অভিজ্ঞতা তাঁর অপরিমেয়। এখানে তিনি সব কিছুরই সম্মুখীন হয়েছেন। উপবাস। নিরন্তর উদ্বেগ। আর তার সঙ্গে যুক্ত হয়েছে মদ্যপান, প্রেম এবং বিরহের ইতিহাস। তাঁর জীবনে প্যারিসের স্মৃতি এক স্থায়ী চিত্র। তাঁর লেখায় প্যারিস সর্বত্র সোচ্চার।

বস্তুত এই জীবনের অপূর্ব অনুভূতির ইতিহাসই গ্রন্থের অধিকাংশ স্থান অধিকার করেছে। তাঁর প্যারিসে অবস্থান কাল : ১৯০৬-১৯১৭ সাল। রুশ বিপ্লবের আগে পেট্রোগ্রাডে ফিরে যাবার আগে পর্যন্ত তিনি প্যারিসে ছিলেন। এখানকার স্মৃতি আলো অন্ধকারের মত সাধারণ ও সুন্দর।

প্রসঙ্গত উল্লেখযোগ্য, লেনিনের সঙ্গে তাঁর প্রথম সাক্ষাৎকার এখানেই ঘটে। অথচ এই সাক্ষাৎকারের বিবরণ এহ্‌রেনবুর্গ অত্যন্ত সংক্ষেপে দিয়েছেন। অনন্য নিপুণতার সঙ্গে লেনিনের জীবনের অন্য একটি দিক তিনি পাঠক সাধারণের কাছে তুলে ধরেছেন।

প্যারিসকে এহ্‌রেনবুর্গ ভিন্ন চোখে দেখেছেন। তাঁর কাছে প্যারিসের জীবন অন্য এক সুরে বাঁধা। এর অন্য এক দিক আছে। যা' উজ্জ্বল নিওন আলোয় পরিমিত ধনীর বিলাসকেন্দ্র নয়। তাঁর কাছে প্যারিসের আবেদন স্বতন্ত্র। যার কাফেখানায় দরিদ্র শিল্পী এবং লেখকের দিনের পর দিন কেটেছে। যেখানে সাধারণ মানুষ রাত দশটার সময় ঘুমতে যায় এবং ভোরবেলা ঘুম থেকে ওঠে। আত্মীয়, পরিজনে ঘেরা সংসারের ছোট পরিধিতে এখানকার মানুষের মনের শিকড় বিস্তৃত।

এই প্যারিস শহরকেই এহ্‌রেনবুর্গ ভালবেসেছেন। সেখানকার দরিদ্র, ভবঘুরে শিল্পী-লেখকের সান্নিধ্যের উত্তাপ একটু একটু করে গ্রহণ করেছেন। তাঁর পরিমণ্ডল গড়ে উঠেছিল এপোলিনেয়ার, ম্যাক্স জ্যাকব, রিভিয়ারা, মদিলিয়ানি, পিকাসো, জাডকাইন প্রমুখকে নিয়ে। এ নামের তালিকা দীর্ঘ হতে দীর্ঘতর করা যায়। সেই অন্তরঙ্গ বৃত্তের আরো যারা বিশিষ্ট কেন্দ্রবিন্দু ছিলেন, তাঁদের অনেকের নাম আমাদের কাছে অপরিচিত।

মদিলিয়ানির ওপর সম্পূর্ণ একটি পরিচ্ছদ তিনি রচনা করেছেন। এই চরিত্র চিত্রণে আমরা লেখকের অনবদ্য সংবেদনশীলতার পরিচয় পাই। মদিলিয়ানির চিত্র, তাঁর জীবন,

তাঁর প্রেম—সব কিছু অসাধারণ অন্তরঙ্গ আবেগে এক সহৃদয় সুহৃদের হৃদয় দিয়ে তিনি লিখেছেন। আমরাও লেখকের সঙ্গে সহসা ফুসফুসের রোগে আক্রান্ত মদিলিয়ানির অকাল মৃত্যুতে যন্ত্রণা বোধ করি। আর সেই সঙ্গে প্রশ্ন আসে মনে। জেনে-র কি আত্মহত্যা করা ছাড়া উপায় ছিল না। এক মৃত্যু কেন আর এক অকাল মৃত্যুর অপার যন্ত্রণা সৃষ্টি করল!

এমন অনেকে আছেন, যারা চিত্রকলা সম্পর্কে রুশীয় মতামতের ওপর তির্যক দৃষ্টিপাত করেন। কেবলমাত্র এ-দেশের শিল্প রসিকের রসবেত্তা সম্পর্কে সন্দেহ প্রকাশ করেই তাঁরা ক্ষান্ত হন না। এমন মন্তব্যও প্রকাশ করেন যে, বস্তু-সাদৃশ্য চিত্র ছাড়া সেখানে অন্য ছবি সমাদৃত নয়। মদিলিয়ানির চিত্র সম্পর্কে এহ্‌রেনবুর্গ তাঁর নিজের বক্তব্য উপস্থিত করে অনেক সন্দেহের নিরসন করেছেন। এহ্‌রেনবুর্গ লিখেছেন—

He somctimes painted nudes, but most of his works were portraits. He created a multitudes of people: their sadness their frozen immobility, their hunted tenderness, their air of doom move the gallery visitors.

It may be that some zealots of realism will say that Modigliani played tricks with nature, that the women he painted have too elongated neck and arms. As if a painting were an anatomical drawing! Do not thoughts emotions passions alter the proportions? Modigliani was not a remote observer: he did not contemplate people from a distance, but lived with them. These are the portraits who loved longed and suffered ; . . .

পিকাশো সম্পর্কেও ইতস্তত অনেক কথা লেখক বলেছেন। সকলেই কৌতুকবোধ করবেন রাশিয়ান মেয়েটির সঙ্গে এহ্‌রেনবুর্গের কথোপকথনের বিবরণ পাঠ করে। মেয়েটি বলেছিলেন পিকাশো অঙ্কিত এহ্‌রেনবুর্গের ছবির দিকে তাকিয়ে। 'আমার পিকাশোর ছবি অর্থহীন মনে হয়। তিনি আপনার বন্ধু, তাই আপনি তাঁর ছবির ভক্ত।' অবশ্যই এহ্‌রেনবুর্গ এ প্রগলভ উক্তিতে বিস্মিত হননি। এমনকি ক্ষুব্ধও না। লক্ষ্য করার বিষয় পিকাশো কম্যুনিস্ট হওয়া সত্ত্বেও তিনি কোথাও তাঁর সম্পর্কে অপ্রাসঙ্গিক বাক্-বিস্তারের চেষ্টা করেননি। আর কে না জানেন মদিলিয়ানির রাজনৈতিক অনীহার কথা! তিনি তাঁর ভাইকেও বোকা ভাবতেন। কারণ মদি-র ভাই ছিল সমাজবাদী। হ্যাঁ, বন্ধুমহলে মদিলিয়ানি মদি নামেই পরিচিত।

অতীতকে এহ্‌রেনবুর্গ শ্রদ্ধার সঙ্গে, আবেগের সঙ্গে স্মরণ করেছেন। সেই পুরনো দিনকে কোথাও লুকোবার চেষ্টা তিনি করেননি। প্যারিসের জীবন তাঁর কোনোমতেই রাজনৈতিক কাজে আবদ্ধ ছিল না। অথচ তা' নিয়ে কোথাও তিনি লজ্জা প্রকাশ করেননি। প্রত্যেক মানুষই তার অতিক্রান্ত যৌবনের দিকে ফিরে তাকায়। সে জীবনের ঝড়, এলোমেলো বাতাসের শিহরণের স্মৃতি তাকে অতীত কাতর করে তোলে। এহ্‌রেনবুর্গের ক্ষেত্রেও এই কথা সত্য। প্যারিসের অতি পরিমিত রাজনৈতিক জীবনের জন্য তিনি দুঃখবোধ করেননি। তাঁর দুঃখের কারণ আজকের প্যারিস। যার ছবি এখন একেবারেই বদলে গিয়েছে। প্যারিসকে তিনি এত ভালবাসতেন বলেই এত সহানুভূতি, এত স্বচ্ছন্দ আবেগের সঙ্গে

তাঁর নিজের জীবনকে প্যারিসের সঙ্গে মিলিয়ে মিশিয়ে দেখতে পেরেছেন।

য়ুলি মারটভ সম্পর্কেও এহ্রেনবুর্গের বক্তব্য উল্লেখ্য। লেনিনের অন্যতম প্রধান বিরোধী, মেনশেভিক মারটভ সম্পর্কে লেখকের উক্তি প্রনিধানযোগ্য।

......I sometimes met Yuly Martov, the wellknown Menshevik, a gentle and attractive man of the utmost integrity.... He was wretchedly unhappy over the collapse of the Second International; he coughed, went about in a threadbare overcoat, shivered with cold and like Lipinski—tried to convince me—though in reality he was convincing himself.

আজ আর সন্দেহ থাকা উচিত নয় যে, সোভিয়েট রাষ্ট্রে কঠোর নিয়মের রাজত্বের অবসান ঘটেছে। তার স্থলাভিষিক্ত হয়েছে পরমতসহিষ্ণুতা এবং মানবতাবোধ। সেখানে এখন নতুন বাতাস সঞ্চারিত।

পুরনো নিয়মের বেড়া এখন একেবারে ভেঙ্গে গেছে। সেই বেড়া ভাঙ্গার ঝড় লেখকের অন্যতম উপন্যাস *The Thaw*-এর সূচনা করে। এই আবহাওয়ার পরিপূরক আর একটি উপন্যাস *The Spring*। আর এহ্রেনবুর্গের সাম্প্রতিক আত্মকথা *People and Life* নূতন সুরে বাঁধা, এক নূতন জীবনবোধের দৃষ্টান্ত।

এহ্রেনবুর্গ এই বক্তব্যের সঙ্গতি রক্ষা করেছেন। চেকভের বড় গল্প The Duel-এর অংশ বিশেষ তাই তাঁর মনকে এত বেশী বিচলিত করেছে।

'In search of truth men make two steps forward and one step back but the desire for truth and stubborn will drive them forwards and who knows? Perhaps their boat will sail to the real truth:'

চেকভের সঙ্গে তিনি তাঁর কণ্ঠ মিলিয়েছেন। আর সেই সঙ্গে বলেছেন—

To-day far continents have become a suburb. Even the moon has somehow come nearer. But for all that the past has not lost its power, and if within a life time a man changes his skin an infinite number of times—almost as often as his suits—still he does not change his heart; he has but one.

**নৃপেন্দ্র সান্যাল**

**স্তেফান জেৎবাইগের গল্প-সংগ্রহ**—১ম ও ২য় খণ্ড। অনুবাদ : দীপক চৌধুরী। রূপা অ্যাণ্ড কোম্পানী। মূল্য প্রতি খণ্ড পাঁচ টাকা।

**মোনালিসা**—আলেকজাণ্ডার লারনেট হলেনিয়া। অনুবাদ : বাণী রায়। রূপা অ্যাণ্ড কোম্পানী। মূল্য ২·৫০ টাকা।

অনুবাদ যে-কোনো সাহিত্যেরই শ্রীবৃদ্ধি ঘটায়। বাংলাদেশে কৃত্তিবাস-পরাগল খানের সময় থেকে শুরু ক'রে আজ পর্যন্ত সার্থক অনুবাদের সংখ্যা কম নয়। গত পাঁচিশ বছরে বাংলা

সাহিত্যর যে আশ্চর্য উন্নতি ঘটেছে তাতে অনুবাদ ও ভাবানুবাদের অবদানও বিশেষভাবে স্মরণীয়।

এই পটভূমিতে যখন আধুনিক কালের প্রথিতযশা সাহিত্যিককে অনুবাদকর্মে আত্ম-নিয়োগ করতে দেখি, তখন খুবই আশান্বিত হ'য়ে উঠি। বাংলা সাহিত্যের অনুবাদ বিভাগটি একেবারে দীন না হলেও যশস্বী সাহিত্যিকেরা এদিকে কমই আকৃষ্ট হন। কবিতায় তবু প্রেমেন্দ্র মিত্র, সুধীন্দ্রনাথ দত্ত, বিষ্ণু দে এবং বুদ্ধদেব বসুর মতো কৃতী কবিদের অনুবাদের কাজে আত্মনিয়োগ করতে দেখা যায়। কথাসাহিত্যের ক্ষেত্রে কিন্তু হঠাৎ আলোর ঝলকানির মতো অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্ত এবং (অনুবাদে না হোক সম্পাদনার কাজে) বুদ্ধদেব বসুর নাম নিয়েই সন্তুষ্ট থাকতে হয়। বাকী যাঁরা আছেন, তাঁরা প্রধানতই অনুবাদ-সাহিত্যিক। এঁরাও আমাদের ধন্যবাদের পাত্র। কিন্তু প্রধানত যাঁরা কথাসাহিত্যিক তাঁরা এ পথে আসেননি বলেই যে এই সব অনুবাদকদের কাজে নামতে হ'য়েছে সে অসহায়তার কথাও ভুলে গেলে চলবে না।

কাজেই দীপক চৌধুরী এবং বাণী রায়ের মতো কথাসাহিত্যিককে অনুবাদ-শিল্পে হাত লাগাতে দেখে আনন্দিত বোধ করেছি। এইভাবে অন্যান্য লেখক-লেখিকা এদিকে এগিয়ে এলে আমাদের উপকারই হবে। কারণ অনুবাদ কেবল ভাবের দিগন্তকেই প্রসারিত করে না। রচনাশৈলী এবং শব্দসম্ভারকেও পরিপুষ্ট করে। সার্থক অনুবাদক মাত্রেই জানেন, উন্নত ধরনের কোনো সাহিত্যকর্মের অনুবাদকালে রচনারীতি, বাচনভঙ্গী ও শব্দপ্রয়োগের যে একাগ্র অনুশীলন ঘটে তাতে কেবল উপস্থিত অনুবাদটিই সার্থক হ'য়ে ওঠে এমন নয়, অনুবাদকের স্বকীয় রচনাও ভবিষ্যতে লাভবান হ'য়ে উঠতে পারে। তার কারণ, রসোত্তীর্ণ অনুবাদ কেবল ভাষান্তর নয়, মূল রচনার সঙ্গে অনুবাদকের ঐক্যানুভূতির দ্বিতীয় সৃষ্টি। অনুবাদকের অভিজ্ঞতা-ভাণ্ডারও যে এই প্রক্রিয়ায় ঐশ্বর্য-মণ্ডিত হবে এ তো বলাই বাহুল্য।

স্তেফান জেবায়াইগ বর্তমান শতাব্দীর একজন স্বনামধন্য লেখক। সাহিত্যের প্রায় সমস্ত বিভাগে, এমন কি অনুবাদেও, তিনি ছিলেন সিদ্ধহস্ত। বাংলাতে তাঁর কয়েকটি উপন্যাস এর আগে অনূদিত হ'য়েছে। সেদিক থেকে তিনি বাঙালী পাঠকের কাছে অপরিচিত নন। দীপক চৌধুরীর অনুবাদের ফলে সে পরিচয়ের দিগন্ত আরো অনেক দূর প্রসারিত হল। দুটি খণ্ডে মোট বারোটি গল্প অনূদিত হয়েছে। প্রত্যেকটি গল্পই স্বকীয় মহিমায় উজ্জ্বল এবং অনুবাদ সাবলীল।

দুঃখের সঙ্গে বলতে হয়, বাণী রায়ের অনুবাদ কিন্তু তেমনভাবে আকৃষ্ট করতে পারে নি। একে তো মূল বইটিই কিছুটা অকিঞ্চিৎকর, তার উপর অনুবাদিকা ভাষার উপর অযথা জুলুম ক'রে তাকে প্রায় ভীতিপ্রদ ক'রে তুলেছেন। এই আধা ঐতিহাসিক আধা কাল্পনিক রচনায় তিনি এতো বেশী তৎসম শব্দ এবং বিদেশী বাক্যাংশের আক্ষরিক অনুবাদের সন্নিবেশ ঘটিয়েছেন যে রীতিমতো শিরদাঁড়া খাড়া করে পড়তে হয়। ফলে জ্ঞান হয়তো আমাদের কিছুটা বাড়ে, কিন্তু শিল্পানুভূতির যে-সূক্ষ্ম আনন্দের জন্যে আমরা গল্পসাহিত্যের দ্বারস্থ হই তার কোনো ঠিকানা পাওয়া যায় না। তুলনায়, ভূমিকাটি বরং অনেক সুলিখিত।

মণীন্দ্র রায়

**ক্যাক্‌টাস্‌**— বিমলাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়। ইণ্ডিয়ান অ্যাসোসিয়েটেড পাবলিশিং কোং প্রাইভেট লিঃ। কলিকাতা ৭। মূল্য ৩·০০ টাকা।

কলেজ স্ট্রীট থেকে কালীঘাট : বাসে চড়ে এই পথ অতিক্রম করা প্রাণান্তকর প্রয়াস। সেদিন শ্রীযুক্ত বিমলাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় "ক্যাক্‌টাস্‌" বইটি ছিল আমার পথের সংগী। বইটি পড়তে পড়তে মুহূর্তের মধ্যে চলে এলাম, মনেই হলো না যন্ত্রণাদায়ক বাসযাত্রার কথা। "ক্যাক্‌টাস্‌"-এর প্রধান গুণ সুখপাঠ্যতা। বস্তুতঃ লঘু প্রবন্ধের আকর্ষণ এইখানে যে, তা সাধারণ গল্প-উপন্যাসের চেয়েও সুখপাঠ্য।

ক্যাক্‌টাস্‌ নামে যে আপাত বৈষম্য—রুক্ষতা ও কোমলতা, মননশীলতা ও সহৃদয়তা, বৈদগ্ধ ও পরিহাসরসিকতা, তার সুন্দর সমন্বয় হয়েছে এই গ্রন্থে।

লঘু প্রবন্ধ যে বিষয়ীর ব্যক্তিত্বের প্রকাশ, তা "ক্যাক্‌টাস্‌" পড়া মাত্রই অনুভব করা যায়। বিষয়বৈচিত্র্য এই গ্রন্থের প্রধান আকর্ষণ নয়, লেখক-ব্যক্তিত্বের আকর্ষণই বড়ো কথা। 'বিবাহ', 'খাওয়া ও খাওয়ানো', 'গণিতের দুঃখ', 'জ্যোতিষ ও জ্যোতিষী', 'হারাধন', 'পেরেক', 'শ্বশ্রু-চরিত-কথা' প্রভৃতি বিষয়ের আলোচনায় মজলিশী প্রজ্ঞাবান লেখককে চিনে নিতে পারি।

মুখবন্ধে লেখক বলেছেন, এই বই লঘু প্রবন্ধের পঞ্চম সংকলন। জানিয়েছেন, তাঁর বয়স পঞ্চাশ হয়েছে। লেখক-জীবনে পঞ্চত্ব-প্রাপ্তি নয়, পঞ্চমত্ব-প্রাপ্তি। একটি আশ্চর্য সত্য কথা বলেছেন, 'এ ধরনের বই আমার লাস্ট সিন। অরিজিন্যাল সিন্‌ হ'ল মধ্যবিত্ত বুদ্ধিজীবীর ঘরে জন্মানো, সে ঘরে ভূমিষ্ঠ হলেই আপনি কলম ছোটে, মুখে খই ফোটে। তাই মুখবন্ধ।'

বাঙালি মধ্যবিত্ত সাহিত্যসাধনার পটভূমির যে আশ্চর্য-সত্য পরিচয় লেখক দিয়েছেন, তা আমাদের সকলেরই মনের কথা। মৌলিক ভাবনা, সমাজচিন্তা, এবং সেই চিন্তাভাবনা প্রকাশের রসোত্তীর্ণ ফল "ক্যাক্‌টাস্‌"।

বাঙালি বাচাল, এই অপবাদ সুপ্রচলিত। লঘুপ্রবন্ধে সেই অপবাদ অধুনা প্রায়শই সত্য বলে প্রমাণিত হচ্ছে। তার কারণ অধিকাংশ লঘু প্রবন্ধকার কেবল লঘুতারই অধিকারী, তার উৎস প্রজ্ঞার অধিকারী নন। মানবস্বভাব ও মানবজগৎ সম্পর্কে তাঁদের কোনো বক্তব্য নেই। সেগুলি অর্থহীন প্রলাপোক্তি। অধুনা তারই নাম রম্যরচনা। সুখের কথা, বিমলাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় সস্মিত প্রজ্ঞার অধিকারী। তিনি ভিজে বাঙালিপনার, ন্যাকামির লৌকিক সংস্কারের ও অযৌক্তিক সমাজবিন্যাসের সমালোচক। কিন্তু বন্ধুরূপে আলাপচারণায় উৎসাহী, বাঙালিস্বভাব ও মানবস্বভাবের প্রতি বিমুখ নন, এবং তির্যক ব্যঙ্গে শ্লেষে হাসিতে, কখনো গুরুকথার মিশেল দিয়ে, কখনো বা নির্মম সত্য উচ্চারণ করে তাঁর মানবপ্রীতির পরিচয় দিয়েছেন। "ক্যাক্‌টাস্‌"-এর আয়নায় বাঙালি পাঠক আত্মদর্শন করতে পারেন। আশা করব, এই বই তাঁর লাস্ট সিন্‌ হবে না, আরো দৃশ্যপট তিনি দেখাবেন।

**অরুণকুমার মুখোপাধ্যায়**

Familiar as you are with this symbol as the mark that identifies the finest products in tyres, tubes and automotive accessories, it now gains added significance as Goodyear India's giant factory goes into production on a 70-acre site at Ballabgarh, 21 miles from New Delhi.

Representing a capital investment of Rs. 6 crores this factory houses the most modern tyre-making machinery including the revolutionary, exclusive 3-T Process developed by Goodyear India's American associates after 5 years of research and an expenditure of 5 million dollars.

The Indian factory is the 59th Goodyear plant in the world...the latest manufacturing unit to help further Goodyear's programme of serving people everywhere, in all walks of life. This factory will have full access to the experience, know-how and technical resources of the vast Goodyear international organisation, which is continually engaged in developing new products and improved processes.

At Ballabgarh, Goodyear India has not merely laid the foundation of a factory but also of an ideal—the ideal of serving India's expanding economy and at the same time, building an international edifice of progress and goodwill.

**GOODYEAR**

WORLD'S LARGEST TYRE COMPANY

# প্লেট নদীর তীরে রবীন্দ্রনাথ

## ভিক্টোরিয়া ওকাম্পো

১৯২৪ সালের সেপ্টেম্বর মাসে শুনলাম রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর বুয়োনেস এয়ার্স হয়ে পেরু যাবেন। সেই থেকেই কবির জন্যে কি অধীর আমাদের প্রতীক্ষা। আমরা যারা জিদ-এর ফরাসী অনুবাদে, ইয়েটস-এর ভূমিকা সংবলিত তাঁর নিজের অনুবাদে ও জুয়ান র‍্যামন জিমেনেজ-এর স্ত্রী জেনোবিয়া ক্যামপ্রুবি-র স্প্যানিশ ভাষার অনুবাদে তাঁর কবিতা পড়েছি তাদের কাছে সে বৎসরের সেটা একটা মস্তবড় ব্যাপার। আমার জীবনে ত সেটি মহত্তম ঘটনাবলীর একটি।

তখন "লা নেসিঅঁ" পত্রিকায় কয়েকটি প্রবন্ধ লিখে সবে আমি সাহিত্যের ক্ষেত্রে প্রবেশ করেছি। ওই পত্রিকায় আমি প্রথম যে তিনটি প্রবন্ধ পাঠাই তার বিষয়গুলি উল্লেখ করবার মত। প্রবন্ধ তিনটির বিষয় হল 'দান্তে' 'রাস্কিন' ও 'মহাত্মা গান্ধী'। ১৯২৪ সালের মার্চ মাসে সেগুলি প্রকাশিত হয়। চতুর্থ প্রবন্ধটির নাম ঠিক হয়েছিল, 'রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের রচনা পাঠের আনন্দ'। রবীন্দ্রনাথকে সংসঙ্গেই আলোচনা করবার ব্যবস্থা হয়েছিল। তাঁর সঙ্গীদের একজন তাঁর স্বদেশবাসী। একজন ইতালীয় কবি, একজন ইংরেজ প্রবন্ধকার ও আমার পূজনীয় যে ভারতবাসীর যথাযোগ্য বিশেষণ আমি খুঁজে পাই না—এই তিনজনকেই আমার আলোচনার বিষয় করা থেকে আমার সাহিত্যিক ক্ষমতার দৌড় না হোক মনের ঝোঁক কোনদিকে তা অন্ততঃ বোঝা গেছে।

সান ইসিদ্রোতে সেবার মধুর উষ্ণ বসন্ত অবতীর্ণ হয়েছিল। সেই সঙ্গে গোলাপ ফুলের আশ্চর্য ছড়াছড়ি। সারা সকাল সমস্ত জানলা খুলে দিয়ে আমি সেই গোলাপের গন্ধ উপভোগ করতাম আর রবীন্দ্রনাথ পড়তাম। তাঁর কথা ভাবতাম, তাঁকে চিঠি লিখতাম আর তাঁর প্রতীক্ষা করতাম। তখনকার সেই পড়া লেখা ভাবা আর অপেক্ষা করার ফলই পরে "লা নেসিঅঁ"-তে প্রকাশিত হয়েছে। তাঁর জন্যে সেই পথ চেয়ে থাকার দিনে একবারও ভাবতে পারিনি যে কবি সান ইসিদ্রোর শৈলবাসে একদিন আমার অতিথি হবেন। বুয়োনেস এয়ার্স-এ স্বল্পকালের অবস্থানের মধ্যে তাঁর ভক্তদের সঙ্গে দেখা করবার তিনি সময় পাবেন এ আশা করার সাহসও হয়নি। আমি অবশ্য ভক্তদেরই একজন।

'রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের রচনা পাঠের আনন্দ' প্রবন্ধটি আমি আবার পড়েছি। এ প্রবন্ধের নাম 'রবীন্দ্রনাথের জন্যে প্রতীক্ষা'ও দেওয়া যেত। "টেস্টিমোনিয়স" নামে পরে প্রকাশিত আমার রচনা সংগ্রহে এ প্রবন্ধটি আমি দিইনি, কারণ রবীন্দ্রনাথকে পৃথকভাবে একটি বই উৎসর্গ করার বাসনা আমার ছিল।

উল্লিখিত প্রবন্ধটিতে ফরাসী লেখক প্রুস্ত ও রবীন্দ্রনাথের মধ্যে তুলনামূলক একটা আলোচনার চেষ্টা ছিল। একদিকে পাশ্চাত্ত্য জগতের অস্থির যন্ত্রণার একজন প্রতীক, আর একদিকে এক বাঙালী মনীষী যিনি শুধু প্রাচ্যের প্রতিভূ নয়, পূর্ব ও পশ্চিমের সেতুবন্ধনের সূচনাস্বরূপ।

আজ তাঁর জন্মশতবার্ষিকীর শুভমুহূর্তে তাঁর কাছে আমার ঋণের কথা বলার প্রয়োজন আমি অনুভব করি, তাঁর জন্মভূমির মানুষ যাতে আমার আমার কথা শুনতে পায়। তাঁর সঙ্গে আবার আলাপ করার এই সবচেয়ে ভালো উপায়। ১৯২৪ সালের সেই গোলাপের প্রাচুর্যে ভরা বসন্তে জীবনের মত যত ঘনিষ্ঠভাবে তাঁকে পেয়েছিলাম আজও তেমনি পাচ্ছি, কারণ 'অসতো মা সৎ গময়ঃ' তিনিই আমায় শিখিয়েছিলেন।

"গীতাঞ্জলি" আমার হাতে যখন প্রথম আসে তখন তা যুগল আশীর্বাদের মতই হয়ে উঠেছিল, কারণ তখন আমার জীবনে এমন একটি সংকটকাল চলছে যৌবনের কাছে যা উদ্দেশ্যহীন বলে মনে হয়। কোনো একজনের কাছে নিজের মন খুলে ধরবার প্রয়োজন আমি অনুভব করেছিলাম। একমাত্র ঈশ্বরকেই সেই একজন ভাবা যায়। কিন্তু ঈশ্বরে বিশ্বাস আমার ছিল না, অন্তত প্রতিহিংসাপরায়ণ সংকীর্ণচিত্ত চিররুষ্ট সীমিত যে ঈশ্বরকে আরাধনা করতে আমায় বৃথাই শেখানো হয়েছিল সে ঈশ্বরে নয়। কিন্তু ঈশ্বরের প্রতি এই অবিশ্বাস আমার জীবনে ক্রমশঃ বেড়েই চলেছিল এবং সে সঙ্কটে অভাবের ভেতর দিয়েই একটা উপস্থিতির তীব্র অনুভূতি হয়ে উঠছিল। সেই অনুভূতিই আমায় যেন বলেছে—একমাত্র আমার কাছেই তোমার হৃদয় তুমি উন্মুক্ত করতে পার। আমাকে ছাড়া দুঃসহ তোমার নিঃসঙ্গতা।

মনের এই অবস্থায় আমি "গীতাঞ্জলি" খুলে ধরি:—

> বিধিবিধান বাঁধন ডোরে
> ধরতে আসে, যাই যে সরে
> তার লাগি যে শাস্তি নেবার
> নেব মনের তোষে।
> প্রেমের হাতে ধরা দেব
> তাই রয়েছি বসে।

রবীন্দ্রনাথ এসব কবিতায় যে প্রেমের কথা বলেছেন তার দ্বারা আমি তখন জর্জরিত নয়, কিন্তু রবীন্দ্রনাথের ঈশ্বর এমন একজন, যাঁর কাছে সেই পার্থিব (আমার কাছে পবিত্র) প্রেমের কথাও বলা যায়। মহৎ ক্যাথলিক লেখক Peguy এই প্রেম সম্বন্ধেই বলেছেন যে এ প্রেম হল সেই আরেক প্রেমেরই, 'প্রতিমা ও সূচনা, কায়া ও সাধনা।' সেই আর এক প্রেম, শিরাবাহী যে শোণিতের দুর্বহ ভারে আমরা মর্ত্যভূমিতে বদ্ধ সে ভার যার নেই। Peguy যার জন্যে প্রার্থনা করেছিলেন আমি যেন সেই ব্যাধ-বিতাড়িত মৃগীর মত, লুকোবার জায়গা না পেয়ে যে ছুটে বেরিয়েছে। তাই রবীন্দ্রনাথের এইসব কবিতা পড়তে

পড়তে আনন্দে কৃতজ্ঞতায় আমার চোখে জল এসেছিল। অত দূরের বাণীও আমার কাছে অপরিচিত মনে হয়নি।

সংসারেতে আর যাহারা আমায় ভালবাসে
তারা আমায় ধরে রাখে বেঁধে কঠিন পাশে।
তোমার প্রেম যে সবার বাড়া
তাই তোমার-ই নূতন ধারা—
বাঁধ নাকো লুকিয়ে থাক
ছেড়েই রাখ দাসে।

নিজের মনে আমি বলেছিলাম,—হে রবীন্দ্রনাথের দেবাদিদেব, তুমি কিছু থেকেই আমায় আড়াল করতে চাও না, যে অন্ধকারে তোমায় আমি রেখেছি, তাও তুমি গ্রাহ্য করো না। কি গভীর ভাবেই না আমায় তুমি চেনো। তুমি সেই গোপন দেবতা যিনি জানেন চিরদিন আমি তাঁর সন্ধানী। সেই করুণাময় ঈশ্বর, যিনি জানেন তাঁর কাছে আমার যাবার পথ স্বেচ্ছাধীন।

কোন্‌খানে কোন্‌ মুহূর্তে ব্যাপারটি ঘটে যায় আমার স্পষ্ট মনে আছে। ফিকে ধূসর রেশমী আবরণে সজ্জিত একটি ঘর। শ্বেত মর্মরের একটি অগ্নিকুণ্ডের দেয়ালে আমি তখন হেলান দিয়ে দাঁড়িয়ে আছি।

সে বাড়িটি আর নেই। যাদের কাছে আমি ব্যথা পেয়েছি সেদিন আর যাদের ব্যথা দিতে পারি বলে আশঙ্কা করেছি তারাও নেই কেউ। নেই সেই কবিও, পরম বন্ধুর পক্ষেও যা অসাধ্য সেই অশ্রুজলের আশীর্বাদ যিনি আমার জীবনে এনেছিলেন। আমার মনে যে সব ছবি শুধু স্মৃতিতে জেগে আছে, আমার সঙ্গেই সে সব অমোঘভাবে শূন্যতায় হারিয়ে যাবে, ইতিপূর্বে সব যেমন গেছে।

আমার চোখের জল যা ঝরিয়ে ছিল সেই "গীতাঞ্জলি" কিন্তু থাকবে। রবীন্দ্রনাথ না তাঁর ঈশ্বরের কথা ভাবছিলাম ঠিক না বুঝেই আমি আবৃত্তি করেছিলাম,—

যদি তোমার দেখা না পাই প্রভু
এবার এ জীবনে
তবে তোমায় আমি পাইনি যেন
সে কথা রয় মনে।
যেন ভুলে না যাই বেদনা পাই
শয়নে স্বপনে।

হে রবীন্দ্রনাথের দেবতা!—মনে মনে আমি ভেবেছিলাম,—এমন কেউ কি আছে, যে কোন না কোন ক্ষণে বিরহ বেদনার তীব্রতা অনুভব করেনি, এ বেদনার স্বরূপ সে বুঝুক বা না বুঝুক। মিলনের এই যে আকুতি, কি প্রাচ্যে কি প্রতীচ্যে, সর্বত্রই প্রেম বলেই অভিহিত।

গীতাঞ্জলির একটি কবিতা এই সূত্রে উল্লেখ করছি—

হেরি অহরহ তোমারই বিরহ
ভুবনে ভুবনে রাজে হে।
কতরূপ ধরে কাননে ভূধরে
আকাশে সাগরে সাজে হে।

সারা নিশি ধরি তারায় তারায়
অনিমেষ চোখে নীরবে দাঁড়ায়
পল্লব দলে শ্রাবণ ধারায়
তোমারি বিরহ রাজে হে।

## দুই

সেই আমার প্রথম রবীন্দ্রনাথ পড়া আর চোখের জল ফেলার দশ বছর বাদে ১৯২৪ সালের ৬ নভেম্বর রবীন্দ্রনাথ বুয়োনেস এয়ার্স-এ আসেন। রোমে' রোলাঁর বইয়ের মাধ্যমে গান্ধীর সঙ্গে, আর প্রত্যক্ষভাবে রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে আমার সাক্ষাৎ পর পরই ঘটে। আমার জীবনের আরো অনেক কিছুর মত এই ঘটনাচক্রের মিল এমন বিস্ময়কর যে কোন বিচিত্র নক্সার মত এ জীবন আগেই পরিকল্পিত বলে আমার সন্দেহ হয়েছে।

স্বরাজ, অহিংসা, সত্যাগ্রহ, স্বদেশী প্রভৃতি শব্দের সঙ্গে কয়েকমাস ধরে আমি যখন পরিচিত তখনই সেই 'মহান প্রহরী' প্লেট নদীতে দেখা দিলেন। দেশপ্রেম দুজনেরই সমান তীব্র হলেও নবভারত নির্মাতা এই দুই মহাপুরুষের মধ্যে গরমিল যে কত আমি তখনই জানতাম। রবীন্দ্রনাথ পূর্ব ও পশ্চিমের সহযোগিতায় বিশ্বাসী। গান্ধী ইংরাজের বিরুদ্ধে অসহযোগ আন্দোলন একমাত্র আত্মরক্ষার অস্ত্র হিসাবে ব্যবহার করা প্রয়োজন মনে করেছেন। ১৯২০ সালে অসহযোগ আন্দোলন শুরু হয়েছে। সে আন্দোলন যখন চার বৎসর পার হয়েছে তখন রবীন্দ্রনাথ এখানে পদার্পণ করলেন। অসহযোগ আন্দোলনের কয়েকটি দিকের কথা ভেবে তিনি তখন উদ্বিগ্ন। 'নিজেকে আর সকলের কাছ থেকে বিচ্ছিন্ন করে কোন দেশের মুক্তি হতে পারে না। হয় সকলের সঙ্গে মুক্তি নয় অবলুপ্তি'—তিনি লিখেছিলেন। ভয় তাঁর গান্ধীকে নয়। গান্ধীকে শাশ্বত কালের একজন মহামানব বলে তিনি মনে করতেন। তাঁর ভয় ছিল সংকীর্ণ দল পাকান গোঁড়াদের। মহতের বাণী গড্ডলিকার কাছে পৌঁছবার পথে কিভাবে বিকৃত হয় জেনে তিনি শঙ্কিত হয়েছেন।

আর সকলের মত রবীন্দ্রনাথও সুতো কাটুন আর বিদেশী পোশাক পুড়িয়ে ফেলুন। আজ এই আমাদের কর্তব্য—বলেছিলেন গান্ধী।

একদিকে মহাত্মা, আর একদিকে কবিগুরু। অনেকেই আমরা কার দিকে হেলব কাকে বেশী ভক্তি করব বুঝে উঠতে পারি নি।

ভাগ্যই এই দুজনকে প্রায় একসঙ্গে আমার জীবনে আবির্ভূত করেছিল। তাঁদের রহস্যাচ্ছন্ন দেশ থেকে এসে দুজনে আমাকে এই জ্বলন্ত প্রশ্নের সম্মুখীন করেছিলেন—সুন্দরের সাধনা না সাধুপুরুষ হবার? আমি বুঝেছিলাম যে এ'দের একজনের প্রবণতা নিজের বাইরের কিছুকে নিখুঁত করে তোলার দিকে (যা শিল্পীর ধারা) আর একজনের চেষ্টা তাঁর কর্মের ভেতর দিয়ে নিজেকে সর্বাঙ্গ সুন্দর করার। (যা সাধুপুরুষের সাধনা) লেখক বা যে কোন শিল্পী তাঁর সৃষ্টিকে যতখানি নিখুঁত সৌন্দর্য দিতে পারেন, তাঁর মহত্ত্ব ঠিক ততখানিই। তাঁর নিজের জীবনে সে সৌন্দর্যের সম্পূর্ণতা নাও থাকতে পারে। নিজের জীবন যদি অকলঙ্ক মাধুর্যে মণ্ডিত করতে পারেন তাহলে তাতেই সাধুপুরুষের সার্থকতা। তাঁর জীবন তাঁর শিল্প।

"গীতাঞ্জলি"র ভূমিকায় ইয়েটস লিখেছেন যে রবীন্দ্রনাথের কোন স্বনামধন্য

স্বদেশবাসী তাঁকে কোন সময়ে বলেছিলেন—আমাদের মধ্যে তিনিই প্রথম ঋষিপ্রতিম পুরুষ যিনি জীবনকে অস্বীকার করেন নি। তাঁর বাণী জীবন থেকেই উদ্বুদ্ধ। সেই জন্যেই তিনি আমাদের পরম প্রিয়।

শিল্প ও ঋষিকল্পতা সম্বন্ধে আগে যা বলেছি তার মানে এই নয় যে সত্তার পূর্ণতার কোন দাম রবীন্দ্রনাথের কাছে ছিল না বা তিনি তা অবহেলা করে শিল্পের পরম সৌষ্ঠবকেই বড় করে ধরেছেন। বরং কথাটা ঠিক তার উল্টো বলে আমি ভালো করেই জানি। আমি শুধু এইটুকুই বলতে চাই যে গান্ধীর কাছে সমস্ত ব্যাপারটা ছিল অনেক সরল, কারণ যতদূর জানি শিল্পী ও সাধকের যে নিদারুণ দ্বন্দ্ব রবীন্দ্রনাথকে পীড়িত করেছে গান্ধী তা কখনো অনুভব করেন নি। রবীন্দ্রনাথের মত গান্ধী বহির্জগতের রূপ-রস সম্বন্ধে একান্ত সচেতন ছিলেন না। তিনি তাই তাঁর সমস্ত প্রেমের সঞ্চয় ইন্দ্রিয়াতীত সৌন্দর্যেই ঢেলে দিতে পেরেছিলেন। আমাদের এই শতাব্দীতে যে দুজন মহাপুরুষ সাধনার সর্বোচ্চ শিখরে পেঁাচেছেন তাঁদের সম্বন্ধে এই অন্ততঃ আমার ব্যক্তিগত ধারণা।

যে দ্বিধাদ্বন্দ্বে রবীন্দ্রনাথ সে সময় জর্জর ছিলেন এবং তাঁর ঘনিষ্ঠ সান্নিধ্য লাভ করার সময় যার আভাস আমি পেয়েছিলাম বলে মনে করি, এখান থেকে চলে যাওয়ার কিছুকাল পরে লিখিত তাঁর দুটি পত্রেও তার চিহ্ন রয়েছে।

প্রথম চিঠিটি ১৯২৫-এর ১৩ জানুয়ারী 'Giulio Cesare' জাহাজ থেকে লেখা। তিনি লিখছেন :

তুমি দেখেছ অনেক সময় দেশের জন্যে আমার মন কেমন করেছে। এই ব্যাকুলতা ভারতবর্ষের জন্যে ততটা নয়, যতটা সেই শাশ্বত সত্যস্বরূপের জন্যে যার মধ্যে আমার অন্তর মুক্তি পায়। আমার ব্যক্তিসত্তার ওপর যে কোন কারণে মনোযোগ যখন প্রগাঢ় হয়ে ওঠে এই সত্যস্বরূপ তখন সম্পূর্ণ আচ্ছন্ন হয়ে যায়। সেই আমার সত্যকার আবাস, যেখানে আমার মধ্যে যা পরম তা প্রকাশের ডাক পরিবেশের মধ্যেই আমি পাই। কারণ তাতেই অমোঘভাবে আমায় বিশ্ববোধের গভীরতায় নিয়ে যায়। আমার মনের জন্যে এমন একটি নীড় একান্ত প্রয়োজন যেখানে আকাশের বাণী অবারিতভাবে বর্ষিত হতে পারে। আলোক ও মুক্তি ছাড়া আর কোন প্রলোভন সে আকাশের নেই। এই নীড় আকাশকে ঈর্ষা করে' তার প্রতিদ্বন্দ্বী হবার বিন্দুমাত্র উপক্রম করলেই আমার মন যাযাবর বিহঙ্গের মত সুদূর কোন উপকূলে উড়ে যেতে চায়। আলোকের মধ্যে আমার যে মুক্তি তা কিছুক্ষণের জন্যেও ব্যাহত হলেই আমার মনে হয় কুজ্ঝটিকায় আচ্ছন্ন প্রভাতের মত আমি যেন কোন ছদ্মবেশের বোঝা বইছি। নিজেকে আমি আর দেখতে পাই না, আর এই অস্বচ্ছতা দুঃস্বপ্নের মত তার দুর্বহ শূন্যতায় আমার শ্বাসরোধ করে দেয়। অনেকবার আমি তোমায় বলেছি যে আমার স্বাধীনতা ত্যাগ করবার স্বাধীনতা আমার নেই। কারণ এ স্বাধীনতার ওপর প্রথম দাবী আমার জীবনদেবতার তাঁর নিজের উদ্দেশ্যসিদ্ধির জন্যে। কখনো কখনো এই সত্যটুকু ভুলে গিয়ে আরামের বন্ধনে নিজেকে আমি আলস্যভরে বাঁধা পড়তে দিয়েছি। কিন্তু প্রতিবারই তার পরিণাম হয়েছে সর্বনাশা। রুদ্র এক দেবতা আমায় ভগ্ন প্রাচীরের পথে মুক্ত প্রান্তরে ঠেলে পাঠিয়েছে...

বিশ্বাস করো আমার মধ্যে এমন একটি দাবী কাজ করে যা আমার নয়। মায়ের ওপর শিশুর দাবী ত ব্যক্তির দাবী শুধু নয়, সে দাবী বিশ্বমানবতার, পবিত্র তার উৎস। বিধাতার কোন বিশেষ অভিপ্রায় পূরণের জন্যে যারা আসে তারা ওই শিশুর মত। ভালবাসা ও

আনুগত্য যদি তারা পায় ত নিজেদের উপভোগের জন্যে নয়, তার চেয়ে মহৎ কোন উদ্দেশ্যেই তা নিয়োজিত হওয়া উচিত। শুধু ভালোবাসাই নয় আঘাত ও অপমান অবহেলা ও অস্বীকৃতি তাদের ধূলোয় গুঁড়িয়ে দেবার জন্যে নয় তাদের জীবনের শিখা আরও উজ্জ্বল করে তোলবার জন্যেই তারা পায়।

এ চিঠির একটি অর্থ আছে। চিঠি যখন রবীন্দ্রনাথ লেখেন তখন এবং তার অনেক আগে থেকেই তিনি অসুস্থ ছিলেন এবং আমি আর এল. কে. এল্মহার্স্ট ডাক্তারের নির্দেশানুযায়ী তাঁকে বিশ্রাম নেওয়াতে চেয়েছিলাম। তাঁকে আরো কিছুদিন থেকে যাবার জন্যে আমি পীড়াপীড়ি করি। একসঙ্গে অনেক লোককে দর্শন দিয়ে তিনি যাতে নিজেকে অতিরিক্ত ক্লান্ত না করেন সে বিষয়েও আমি তাঁর ওপর জোর খাটিয়েছিলাম। তাঁর সম্বন্ধে এই উদ্বেগের দরুণই, রবীন্দ্রনাথকে আমি বেড়া দিয়ে রাখতে চাই বলে লোকে আমার বিরুদ্ধে অভিযোগ করেছিল। যে কেউ তাঁর কাছে আসতে চায়, তাদের সকলের জন্য দ্বার মুক্ত না করে রাখার জন্যে রবীন্দ্রনাথও অনুযোগ জানিয়েছিলেন কিন্তু তাঁর কথামত কাজ করে দিনের শেষে তাঁর অসীম ক্লান্তি দেখে আমি সত্যই অত্যন্ত ভাবিত হয়ে উঠি। কি আমার তাহলে কর্তব্য?

নিজের ঘরে বসে কবিতা লিখে বা বাগানে পায়চারী করে সময় কাটানো রবীন্দ্রনাথের অনেক সময়ে অন্যায় মনে হত। এদিকে ডাক্তারের বিধানের বিরুদ্ধে নিজেকে তিনি ক্লান্তিতে ক্ষয় করছেন দেখলে আমরাও কেমন অপরাধী বোধ করতাম।

সেই বছরেরই আগস্ট মাসে রবীন্দ্রনাথ শান্তিনিকেতন থেকে আমায় লিখলেন :

রোমেঁ রোলাঁ সুইজারল্যান্ডে তাঁর বাড়ির কাছে একটি স্যানাটোরিয়মে ডাক্তার যতদিন থাকতে বলেন ততদিন আমায় ধরে রাখতে চান। তুমি সেখানে আমায় অভ্যর্থনার জন্যে থাকলে খুশি হতাম। কিন্তু তা বোধ হয় হবে না।...নদীর ধারের তোমার সেই সুন্দর বাড়িটিতে গ্রীষ্মের শেষ পর্যন্ত থাকতে পারলাম না বলে চিঠিতে তুমি দুঃখ প্রকাশ করেছ। তুমি ত জানো না কতবার মনে হয়েছে যদি থাকতে পারতাম। সেই মধুর নিভৃতি থেকে কর্তব্যের আহ্বানই আমায় টেনে বার করেছে। সেই নিভৃত কোণটি যেন শুধু নিষ্ফল আলস্যে কাটাবার জন্যেই তৈরী মনে হয়। কিন্তু আজ দেখছি যে সেখানে যখন ছিলাম তখন অলস অবসর যাদের পক্ষে একান্ত অনুকূল সেই লাজুক কাব্যস্তবকে আমার সাজি প্রতিদিন ভরে উঠেছে। আমি জানি আমার অনেক কষ্টে গড়ে তোলা নানা সৎকার্যের কীর্তিস্তম্ভ ধ্বংস হয়ে ধূলি বিলীন হয়ে যাবার বহু পরেও এই কাব্যকুসুমগুলির অধিকাংশই অম্লান থাকবে।...

মনে হয় তাঁর চিঠির ওই দুটি উদ্ধৃতি থেকে কবির দুটি দিক পরিষ্কারভাবে বোঝা যায়। এ তাঁর মনের বা বলা যায় তাঁর বিবেকী চেতনার দুটি বিবাদী রূপ।

একদিকে রয়েছে জীবন-দেবতার জন্যে কর্তব্যের খাতিরে আত্মদান। সেই জীবন-দেবতার নির্দেশে কবি এই সত্য উপলব্ধি করেছেন যে আঘাত বেদনা অবহেলা লাঞ্ছনা যাই আসুক না কেন সে সবও প্রেমের মতই তাঁকে গ্রহণ করতে হবে নিজেকে সমৃদ্ধ করে তোলবার জন্যে। আরেক দিকে এক এক সময়ে এই স্বেচ্ছান্যস্ত কর্তব্য সম্বন্ধে তিনি সন্দেহাকুল হন। তাঁর সমস্ত সুকীর্তি ধ্বংস হবার পরও যা বেঁচে থাকবে সেই কবিতাগুলি লেখার প্রেরণা নিষ্ফল আলস্যের মধ্যে যেখানে পেয়েছেন সে আশ্রয় ছেড়ে আসার যৌক্তিকতা সম্বন্ধে তাঁর মনে প্রশ্ন জাগে।

তবে এই চিঠিগুলি সান ইসিদ্রোতে থাকবার পর কবি লিখেছিলেন। সুতরাং ঠাণ্ডা লেগে অত্যন্ত অসুস্থ হয়ে তিনি যখন আমাদের দেশে পদার্পণ করেন সেই নভেম্বর মাসে ফিরে যাওয়া যাক। এই ঠাণ্ডা লাগার দরুণ আর ডাক্তারের পরামর্শেই আশাতীতভাবে আমি তাঁর কাছে যাবার সুযোগ পেয়ে এমন কিছু তাঁর জন্যে করতে পারি যার ফলে উপকৃত হই প্রথমে আমি নিজেই। সত্যি কথা বলতে গেলে আমাকে ওইটুকু করতে দিয়ে তিনি আমাকেই বাধিত ও উপকৃত করেন।

এখন যা লিখছি তা আমার রোজনামচা থেকে নেওয়া। এসব রোজনামচা আমি কখনো প্রকাশিত করব কিনা জানি না।

রবীন্দ্রনাথ তখন প্লাজা হোটেলে আছেন। আমি আর আমার এক বন্ধু তাঁর সঙ্গে সেখানে গিয়ে দেখা করব ঠিক করলাম। তাঁর সেক্রেটারী এল. কে. এল্মহার্স্ট তাঁর দুর্ভাবনার কথা আমাদের জানালেন। কবি সবে বিশ্রী রকম ইনফ্লুয়েঞ্জায় ভুগে সেরে উঠছেন। ডাক্তারেরা তাঁকে ভালো করে পরীক্ষা করে জানিয়েছেন যে তাঁর হৃদয় যে রকম দুর্বল তাতে আণ্ডিজ পাহাড় পার হওয়া তাঁর পক্ষে সম্ভব হবে না। পেরু-র গভর্নমেণ্ট স্বাধীনতা শতবার্ষিকী উৎসবের জন্যে তাঁকে যে নিমন্ত্রণ করেছে তা তাঁকে প্রত্যাখ্যান করে লিমা শহরে যাওয়ার সংকল্প ত্যাগ করতে হবে। ভারতে ফিরে যাবার আগে রবীন্দ্রনাথের বুয়েনোস এয়ার্স-এর বাইরে কোথাও বিশ্রাম করা দরকার। শুনে আমি তৎক্ষণাৎ এল্মহার্স্টকে জানালাম যে আমিই সমস্ত ব্যবস্থা করে শহরের কাছে একটি বাগান বাড়ি খুঁজে সেখানে রবীন্দ্রনাথকে পাঠাবার ভার নেব। সান ইসিদ্রোতে যে বাড়িটির কথা আমি ভাবছিলাম সেটি আমার মা-বাবার। তাঁরা সেটি ছেড়ে দিতে পারবেন কিনা তখনো জানতাম না। কিন্তু রবীন্দ্রনাথ সম্পূর্ণ সুস্থ হয়ে ওঠার জন্যে থাকতে পারেন, নগর কোলাহলের বাইরে এমন একটি জায়গা অবিলম্বে যেমন করে হোক খুঁজে বার করব ঠিক করলাম। এ আমার কতবড় সৌভাগ্য যে ঠিক তাঁর এই প্রয়োজনের মুহূর্তেই আমি সেখানে উপস্থিত থাকতে পেরেছিলাম।

এল্মহার্স্ট-এর সঙ্গে প্রাথমিক আলাপের পর আমরা রবীন্দ্রনাথের সুইট-এ গেলাম। তাঁর সেক্রেটারী আমাদের বসবার ঘরে রেখে বেরিয়ে গেলেন। এই সাক্ষাৎকারের ফল কি হবে সে বিষয়ে মনে মনে তখন আমি অত্যন্ত উদ্বিগ্ন। লজ্জা সংকোচের অস্বস্তি তখন আমার এত বেশী যে সেখান থেকে পালিয়ে আসবার কথাও আমার মনে উদয় হয়েছিল। ঠিক সেই সময়ে রবীন্দ্রনাথের দেখা পেলাম।

স্তব্ধ স্নিগ্ধ অথচ সুদূর (অন্ততঃ আমার কাছে তাই মনে হয়েছিল) আমাদের দেশের 'লামা'দের মত তাঁর মাথাটি হেলাবার ভঙ্গীতে অসীম অবজ্ঞা ও দর্পই প্রকাশ পেত যদি না গভীর করুণায় তা দ্রব ও শোধিত না হত। বয়স যদিও তাঁর তখন চৌষট্টি (আমার বাবার বয়স) তবু তাঁর হাল্কা বাদামী মুখে একটি বলিরেখাও পড়েনি। মসৃণ ললাটে একটি কুঞ্চন নেই। মাথায় শুভ্র ঢেউ-খেলানো কেশরাশি সুগঠিত স্কন্ধের ওপর নেমে গেছে। মুখের নিচের দিক শ্মশ্রুতে ঢাকা। তাতে ওপরের দিকটা প্রাধান্য পেয়েছে। খড়্গনাসা এবং চিবুক ও ভ্রুর দৃঢ় অথচ নমনীয় গড়ন মিলিত হয়ে একটি বিরল সৌন্দর্য সৃষ্টি করেছে। তাঁর কোন কোন আলোকচিত্রে এই রূপটি ধরা পড়ে। নিখুঁত পল্লবে ঢাকা কালো চোখের দৃষ্টিতে যৌবনের দীপ্তি অক্ষুণ্ণ। সে দৃষ্টি যেন শ্মশ্রুর গাম্ভীর্য ও মাথার শুভ্র জ্যোতির্মণ্ডলের মত চুলের প্রতিবাদ। তিনি দীর্ঘকায় এবং দেহের গড়ন পাতলাই বলা

যায়। সুগঠিত হাতদুটির মন্থর ললিত নাড়াচাড়ার ভঙ্গীতে তাদেরও যেন একটি বিশেষ ভাষা আছে মনে হয়। (অনেক বছর পরে বিখ্যাত ভারতীয় নর্তক-নর্তকীদের দেখে তাঁর হাতের এবং ভঙ্গীর কথা আমার স্মরণ হয়েছিল)।

যাঁর সঙ্গে স্বপ্নেই আমি সুপরিচিত এবং যাঁকে শুধু কবিতাগুলির ভেতর দিয়ে অত্যন্ত ঘনিষ্ঠ বলে মনে হয়েছিল, চোখের সামনে সেই সুন্দর মানুষটিকে হঠাৎ উপস্থিত হতে দেখে যেন একেবারে পাথর হয়ে গেলাম। যার সাক্ষাতের জন্যে সমস্ত মন ব্যাকুল তাকে হঠাৎ সামনে পেলে লাজুক মানুষদের এই অবস্থাই হয়। নিজে রুদ্ধবাক হয়ে আমি আমার বন্ধুকেই কথা বলতে দিলাম। বন্ধুর মন্তব্যগুলো আমার ভালো লাগল না, কারণ আমি নিজে যা বলতে পারতাম তার সঙ্গে সে মন্তব্যের কোন সম্পর্কই নেই। হঠাৎ আমি এই ক্ষণিক সাক্ষাৎকারে ছেদ টেনে দিলাম। মনে মনে ঠিক করলাম যেভাবে হোক সুযোগ সৃষ্টি করে' এরপর আমি একলাই আসব।

আমি তারপর বাবা-মার কাছে ছুটে গেলাম। গিয়ে শুধু হতাশই হতে হ'ল। কারণ তাঁরা সান ইসিদ্রোতে বাগান বাড়িটি ছেড়ে দিতে পারবেন না বলে জানালেন। আমার এক ভ্রাতৃস্থানীয় আত্মীয়ের কথা তখন মনে পড়ল। কাছেই 'মিরালরিও' নামে তার একটি চমৎকার বাগান বাড়ি ছিল। সে বাড়িটি আমায় ভাড়া দিতে রাজী হল। মনে হল যেন সে আমায় প্রাণে বাঁচিয়েছে। আমি আবার ছুটলাম হোটেলে। এল্মহার্স্টকে জানালাম যে দুদিনের মধ্যেই সব ব্যবস্থা হয়ে যাবে। শুধু ঘরগুলো পরিষ্কার, আসবাবপত্রগুলো পালিশ আর 'মিরালরিও'-তে দরকারী জিনিসপত্রের সঙ্গে আমার চাকরদের পাঠাতে যেটুকু দেরী। সে সব দিনগুলো ব্যস্ততায় ভরা। বুয়েনেস এয়ার্স থেকে সান ইসিদ্রোতে যাচ্ছি আর আসছি।

বাগান বাড়িটি নতুন আর বেশ বড়। চুনকাম করা ধবধবে চেহারা, তার মধ্যে জানলার খড়খড়ি পাল্লা সবুজ। 'বাস্ক'দের বাড়ির ধরনে সেটা তৈরী। বাগানটিও বেশ প্রশস্ত। পাহাড়ের মাথা থেকে প্লেট নদীর দৃশ্য অপরূপ। সেটা ছিল সবচেয়ে সুগন্ধী ফুলের মরশুম—'এসপিনিল্লজ', হানিসাক্ল্ গোলাপ। ফুলগুলি অন্ততঃ অতিথির মর্যাদা রাখবে।

রবীন্দ্রনাথের সান ইসিদ্রো যাবার তারিখ ১২ই নভেম্বর একদিন সত্যিই এসে গেল। ইতিমধ্যে তাঁর সঙ্গে আর দেখা করিনি। সেদিন তাঁর হোমরা-চোমরাদের সঙ্গে মধ্যাহ্ন-ভোজন করবার কথা। এইসব হোমরা-চোমরা-রা নতুন বিশিষ্ট কেউ এলে ঠিক তাদের পাকড়াও করেন, থিয়েটারের নটনটীর মত তাঁদের নিয়ে শুধু হুজুগ করবার উদ্দেশ্যেই অবশ্য। এঁদের মধ্যে কেউ কেউ কবিকে আবোল-তাবোল আজগুবি প্রশ্ন করে নিশ্চয়ই ব্যতিব্যস্ত করবেন ভেবে আমার অত্যন্ত বিরক্তি হচ্ছিল। আমি লজ্জিত বোধ করছিলাম। মেজাজটাও খারাপ হয়ে গিয়েছিল।

গাড়ি করে প্রায় তিনটের সময়ে যখন তাঁকে আনতে গেলাম তখন শহরে প্রচণ্ড ঝড় বইছে। ধুলোর ঘূর্ণিতে আমরা ঢাকা পড়ে যাচ্ছি। প্লেন গাছের ছেঁড়া কচি পাতা আর কাগজের টুকরো এদিকে থেকে ওদিকে ফুট-পাথের ওপর ঘুরপাক খাচ্ছে। আকাশের খানিকটা হরিদ্রাভ আর খানিকটা সিসের মত কালচে। বোঝা যাচ্ছে বৃষ্টি নামার দেরী নেই। নিয়ে আসতে যে আধঘণ্টা লাগল তার সারাক্ষণই এই এক অবস্থা, বাড়ির ভেতর প্রবেশ করাটা তাই তুলনায় অত মধুর লাগল। বাইরের গাছগুলিতে ঝোড়ো হাওয়ার শব্দ, ঘরগুলির স্তব্ধতাকে যেন গভীর করে তুলেছে। সমস্ত ঘর আমি ফুলে ভরে দিয়েছিলাম।

সেই ফুলগুলি আর বাড়িটির নির্জনতা দরজা বন্ধ করার সঙ্গে যেন আমাদের অভ্যর্থনা জানালে।

সেই বিকেলেই আকাশ কোনো কোনো দিকে কালো আর কোনো দিকে সোনালী হয়ে উঠল। এ রকম জ্বলন্ত আর সেই সঙ্গে ভয়াল গাঢ় আকাশ আমি আগে কখনও দেখিনি। নদীতীর আর গাছগুলির সবুজ যেন সেই আকাশের পাণ্ডুরতা আর পীতাভায় আরো উজ্জ্বল হয়ে উঠেছে। নদী তার নিজের ভাষায় ঊর্ধ্বাকাশের দৃশ্য যেন ব্যাখ্যা করছে। রবীন্দ্রনাথের ঘরের বারান্দা থেকে আমরা ব্যাহত ঝটিকাক্ষুব্ধ অপরাহ্ণের দিনন্ত বিস্তৃত এই দৃশ্য দেখলাম।

কবিকে বারান্দায় নিয়ে যেতে যেতে বলেছিলাম,—আপনাকে নদীটা আমায় দেখাতেই হবে। সে দৃশ্য অপরূপ করে তোলার জন্যে সবকিছু যেন আমার সঙ্গে সেদিন একজোট হয়েছে মনে হ'ল। গাঢ় মেঘের প্রান্তে উজ্জ্বল আলোর পাড় কি বিস্ময়কর।

পরে এই বারান্দাটি তাঁর একান্ত আপনার হয়ে উঠেছিল। এইখান থেকেই তিনি আরেক বারান্দার আরেক কবি বোদলেয়ারের মত গোলাপী বাষ্পের ওড়নায় ঢাকা সন্ধ্যা দেখছেন। বোদলেয়ার অবশ্য শীর্ণ সিন নদীর পার থেকে দেখেছিলেন।

এ বারান্দার কথা স্মরণ করে পরে কবি শান্তিনিকেতন থেকে আমায় লিখেছেন—আমার দুর্বলতা এখনও কাটিয়ে উঠতে পারিনি।...শরীরের এই অবস্থায় আমার মন অনেক সময়ে সান ইসিদ্রোর সেই বারান্দায় চলে যায়। তোমার বাগানের অজানা লাল নীল ফুলের রাশির ওপর সকালের সেই প্রথম আলো পড়ার ছবিটি আমার স্পষ্ট মনে পড়ে। সেই সঙ্গে মনে পড়ে বড় নদীটির জলে অবিরাম রঙের খেলা। আমার নির্জন বারান্দা থেকে সে দৃশ্য দেখতে কখনো আমার ক্লান্তি আসেনি।

আমি নিজে থেকেই কবিকে মিরালরিওতে ঢোকার পরই ওই বারান্দায় নিয়ে গিয়েছিলাম। মনে মনে আমি নিশ্চিত যেন জানতাম যে এখান থেকে বিদায় নেবার সময় তিনি কিছু যদি সঙ্গে নেন তাহলে এই স্মৃতিটুকু অন্ততঃ নিয়ে যাবেন—সকাল বিকেলের আলোয় প্রতিমুহূর্তে বদলানো এই নিসর্গদৃশ্যের স্মৃতি। এ নিসর্গদৃশ্য-ই তাঁকে দেবার যোগ্য উপহার।

এক সপ্তাহ মাত্র রবীন্দ্রনাথ সান ইসিদ্রোতে থাকতে চেয়েছিলেন, তার বদলে সেখানে তাঁকে এক মাস কুড়ি দিন থাকতে হল। কারণ ডাক্তারেরা সবাই দৃঢ়ভাবে জানালেন যে বিশ্রাম তাঁর তখনও একান্ত প্রয়োজন। তাঁকে ডাক্তারদের আদেশ যতখানি সম্ভব মানাতে আমি চেষ্টা করেছিলাম।

তখন ১৪ই নভেম্বর তারিখে লা নেসিয়'র জানিয়ে দিয়েছে যে রবীন্দ্রনাথ অত্যন্ত অসুস্থ বলে লিমায় গিয়ে রাষ্ট্রপতি লেগুইয়ার নিমন্ত্রণ গ্রহণ করতে পারবেন না। সমস্ত উদ্বেগ দুর্ভাবনা সত্ত্বেও যে ইনফ্লুয়েঞ্জার জন্যে এই ব্যাপার ঘটল তার প্রতি আমি মনে মনে কৃতজ্ঞ হইনি বললে মিথ্যা বলা হবে।

নিজে আমি মিরালরিওতে থাকতাম না। কাছেই বাবার বাড়িতে তখন আমি রাত্রি কাটাই। কিন্তু প্রতিদিন আমি মিরালরিওতে যেতাম আর প্রায়ই সেখানে খাওয়াদাওয়াও করতাম। কারণ বাড়িতে আমার কোন রাঁধুনি ছিল না। আমার সব চাকরবাকরকে রবীন্দ্রনাথের সেবাতেই লাগিয়ে ছিলাম। যে মানুষটি আমার অসীম ভক্তি শ্রদ্ধার পাত্র তিনি যেন যতদূর সম্ভব স্বচ্ছন্দ বোধ করেন এই ছিল আমার কামনা। সারাক্ষণ আমার উপস্থিতিতে

হয়ত তিনি অস্বস্তি বোধ করতে পারেন বলে আমার মনে হয়েছিল। তাঁকে খুশি করবার জন্যে আমি আমার হৃদপিণ্ডটাও বুঝি উপড়ে দিতে পারতাম। রাণী চন্দের "আলাপচারী রবীন্দ্রনাথ" থেকে সবেমাত্র আমি জেনেছি যে কবি আমার তখনকার মনোভাব ভুল বুঝেছিলেন। রাণী চন্দের বই-এ দেখছি যে আমি আর্জেনটিনার প্রাচীন এক ঔপনিবেশিক পরিবারের মেয়ে বলে রবীন্দ্রনাথ ভেবেছিলেন, তাঁর সঙ্গে যাঁরা দেখা করতে আসতেন তাঁদের সঙ্গে আমি মিশতে চাইতাম না। এ ধারণা আমার জীবনধারা আর আমার অন্তরের অনুভূতির এতখানি বিপরীত যে আমার সম্বন্ধে একথা ভাবার কথা আমি কল্পনাও করতে পারিনি। বিবেচনার সঙ্গে সাবধানী হয়েছি বলে নিজের মনে যখন গর্ব অনুভব করেছি তখন দেখছি বোকা স্কুলের মেয়ের মতই আমি ছেলেমানুষী করেছিলাম। আমার আত্ম-ত্যাগের—সত্যি-ই তা আত্মত্যাগ—ভুল অর্থ হয়েছে।

যাই হোক মিরালরিও থেকে দূরে যতক্ষণ থাকতাম সময়টা একেবারে বৃথাই নষ্ট হচ্ছে মনে হত। পরম সৌভাগ্যবতী হয়েও আমি সে সৌভাগ্য সম্পূর্ণ কাজে লাগাতে পারিনি।

লজ্জা আর লোভ, দ্বিধা আর আগ্রহের দ্বন্দ্ব চলছিল আমার মধ্যে। কবির সান্নিধ্যের একটি কণা থেকে বঞ্চিত হতে চাইনি বলে, অনেক সময়ে তাঁকে উত্যক্ত করবার সাহস না পেয়ে নিজেকে সান্ত্বনা দেবার জন্যে আমি রান্নাঘরে রাঁধুনি বা ভাঁড়ারে বাটলার যোশে ও তাঁর স্ত্রী ফিলোমেনার সঙ্গে সুদীর্ঘ আলাপ চালাতাম। তারা সত্যিই সুখী। মিরালরিওতে তারা সারাক্ষণ কবির সেবায় তাঁর সান্নিধ্যে থাকতে পায়। আমি তাদের ঈর্ষা করতাম।

বিকেলে সাধারণতঃ চায়ের সময়ে একবারের মত সাহস করে আমি তাঁর দরজায় ভীরু করাঘাত করতাম। যেন আমি বাইরের জগতের কেউ।

কে বিজয়া? সারাদিন খুব ব্যস্ত ছিলে!—তিনি বলতেন।

নিজের ভাষাহীনতাকে ঘৃণা করে মনে মনে বলতাম যে ব্যস্ত সত্যিই ছিলাম শুধু আপনাকে যথাসময়ে দেখতে আসার অপেক্ষায়।

এমনিভাবে একটু একটু করে রবীন্দ্রনাথকে তাঁর বিভিন্ন ভাবের ঘোরের মধ্যে আমি জানলাম। একটু একটু করে কখনো অশান্ত কখনো নিতান্ত অনুগত এমন একটি তরুণ প্রাণকে তিনি জয় করে' নিলেন, শুধু অশোভন বলেই পোষা কুকুরের মত যে তাঁর দরজার বাইরে শুয়ে থাকতে পারেনি।

## তিন

রূপসাগরে ডুব দিয়েছি
অরূপরতন আশা করি।

আর্জেনটাইনে যতদিন ছিলেন প্রায় তার সবটাই রবীন্দ্রনাথ সান ইসিদ্রোতে কাটান। শুধু হপ্তা খানেকের জন্যে ৪০০ কিলোমিটার দূরে মার দেল প্লাটার কাছে একটি জায়গায় গিয়েছিলেন। সেই নভেম্বর মাসের একটি খবরের কাগজে দেখছি Punta chica-র মুনি বলে তাঁর উল্লেখ করেছে। (Punta chica সান ইসিদ্রোর শেষ অন্তরীপ। বাগান বাড়িটি তার কাছেই ছিল।)

যদিও আমাদের দেশে পদার্পণের সঙ্গে সঙ্গেই রবীন্দ্রনাথ সাংবাদিকদের জানিয়ে

দিয়েছিলেন যে তিনি শিক্ষাগুরু ও কবি, রাজনীতিবিদ নন এবং সেই সঙ্গে এ কথাও স্পষ্ট করে বলেছিলেন যে গত তিন বছর ধরে গান্ধীর সঙ্গে তাঁর পথের ছাড়াছাড়ি হয়েছে, তবু আমি বুঝতে পারছিলাম ভারতের ও পৃথিবীর রাজনীতির আলোড়ন তাঁর মনকে ভারাক্রান্ত করে রেখেছে। সে সময়ে আমি জাতীয় ও আন্তর্জাতিক রাজনীতি ও রাজনীতিবিদদের সম্বন্ধে বিশেষ কিছু জানতাম না। (এখনো জানি না।) তাদের ছোট বড় সব ভুল, বড় বুকনির নামে আসলে ঠেলাঠেলির ঝগড়া, প্রতিবেশীর নিন্দা আর নিজেদের সাধুতা আর ন্যায়নিষ্ঠতার প্রশংসা, এ সবই আমার অজানা ছিল। সে সমস্ত গলাবাজি আমার কাছে নেহাৎ ফাঁপা ফাঁকিবাজি বলে মনে হ'ত। বিরক্তি ধরে যেত সে সব শুনে।

তবু ভারতবর্ষে কি হচ্ছে না হচ্ছে তার কিছুটা খবর আমি জানতাম এবং গান্ধীকে আবিষ্কার করে তাঁর ভক্ত হওয়ার দরুণ, পাছে আমার মূঢ়তায় রবীন্দ্রনাথ আঘাত পান এই ভয়ে একটি কথাও সে বিষয়ে বলতে সাহস করতাম না। আর কি-ই বা আমি বলতে পারতাম আমার চেয়ে হাজার গুণ ভালো করে যা তাঁর জানা ছিল না। তাঁর দেশ তখন যে সংগ্রামে নিযুক্ত তার দরুণ যদি তিনি দুঃখ পান তা হলে সে দুঃখ বাড়াবার জন্যে সে বিষয়ে প্রশ্ন তোলা আমার সাজে না। সাংবাদিকের মন আমি পাইনি। বড় লেখকদের সঙ্গে আমার বন্ধুত্বকে আমি ব্যবসার মূলধন করিনি কখনো কিংবা আমার অতিথি হবার দরুণ তাঁদের নিংড়ে বার করা রস আমার পাঠকদের জোলো লেবুর সরবৎ হিসেবে পরিবেশন করিনি।

আমি জানতাম ভারতের খবর পেলে তিনি অস্থির বিষণ্ণ হতেন। তাঁর মেজাজ বদলে যেত। তাঁর মধ্যে এসব লক্ষণ দেখলেই আমি বুঝতাম ভারতবর্ষের খবর এসেছে। কি হয়েছে জিজ্ঞাসা করবার সাহসটুকু পর্যন্ত না পেয়ে আমি তাঁর ঘরের আশেপাশে ঘুরঘুর করতাম।

কোন কোন বিষয়ে রবীন্দ্রনাথ একেবারে শিশু ছিলেন। এমন অসামান্য একজন মানুষ সম্বন্ধে এ কথা বলার জন্যে আমি মার্জনা চাইছি। কিন্তু যাঁরা মহৎ তাঁদের মহত্ত্বের এটিও একটি অঙ্গ যে সাধারণ মানুষ যে সামান্য মৃত্তিকায় গড়া মহৎ হলেও তাঁরাও তাই। যদি তাঁরা নিরবচ্ছিন্নভাবে শুধু বীর বিজ্ঞ ও অভ্রান্ত হতেন তাহলে তাঁদের হয়তো শ্রদ্ধা করতাম অনেক বেশী কিন্তু ভালবাসতাম অনেক কম। ঠিক মনে নেই কোন ফরাসী লেখক যেন বলেছিলেন,—নিখুঁতে অরুচি!

গান্ধীর সঙ্গে কথা বলবার সৌভাগ্য আমার হয়নি কিন্তু প্যারিসে তাঁর বক্তৃতা শুনেছি। আধ্যাত্মিক শক্তিতে আমায় অভিভূত করলেও তাঁকে দেখে মন বিরূপ হয়নি। হয়ত তাঁরও সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম কিছু খুঁত ছিল। কিংবা হয়ত হৃদয়ের পবিত্রতায় যে চরম উৎকর্ষের কাছে তিনি পৌঁছেছেন চিন্তার ক্ষেত্রে সে উৎকর্ষের শিখরে পৌঁছোতে পারেননি।

পুরানো খবরের কাগজের তাড়া ঘেঁটে রবীন্দ্রনাথের স্বাস্থ্য সম্বন্ধে কি লেখা হয়েছিল খুঁজলাম। দেখলাম তিনি যেন নিজেকে ক্লান্ত না করেন, ডাক্তারদের সেই অনুজ্ঞার কথা সেখানে রয়েছে। সম্পূর্ণ সেরে না ওঠা পর্যন্ত কবিকে বাধ্য হয়েই কয়েক সপ্তাহ বিশ্রাম করতে হয়েছিল। তাঁর স্বাস্থ্যের জন্যে দায়ী ছিলাম আমি আর এল্মহার্স্ট। ডাক্তারদের কথা যাতে তিনি মানেন তাই দেখাই আমাদের কাজ। রোগীর বক্তব্য হল—'যারা আমাকে দেখতে চায় তাদের সঙ্গে আলাপ করা আমার কর্তব্য।' আমাদের তাতে উত্তর—আবার পাল্টা অসুখে না পড়েন তা দেখার দায়িত্ব আমাদের। তাঁর কথায় সায় দেওয়া আমাদের

পক্ষে অসম্ভব। তাঁর ইচ্ছের বিরুদ্ধে দর্শনপ্রার্থীদের আমরা ঢুকতে দিচ্ছি না, হয় তিনি এই অভিযোগ করবেন, নয় ভাগ্য ভালো হলে ভক্তদের সঙ্গে আর মন্দ হলে হুজুগবাজদের সঙ্গে কথা বলে দিন কাটিয়ে নিজেকে ক্ষয় করবেন। পাছে তিনি অপ্রসন্ন হন এই ছিল আমার বিষম ভয়, কিন্তু অন্য দিকে আবার ভাবনা হতো যে ভয় করে তেমন শক্ত হতে না পারার দরুণ তাঁর আরোগ্য লাভে আমি বিলম্ব ঘটাচ্ছি।

আমি যা করছি তার ভঙ্গীটা পাশ্চাত্ত্য কিনা শেষ পর্যন্ত নিজেকে প্রশ্নও করেছি। কিন্তু তারপর অধৈর্যের সঙ্গে ভেবেছি—'দূর হোক গে যাক্ এসব ভাবনা। কবি হোক বা না হোক জ্ঞানী কিংবা মূর্খ যাই হোক মানুষ প্রতীচ্যে যেমন প্রাচ্যেও তেমনি শরীরের যত্ন না নিলে মারা পড়ে।'

নিজের মধ্যে আমার পিতার বয়সী এই মানুষটির ওপর মাতৃত্বের একটি প্রবল দায়িত্ববোধ আমি আবিষ্কার করলাম। সময়ে সময়ে তাঁকে শিশুর মতো না দেখে সত্যিই পারিনি।

তবু সবচেয়ে ভয় ছিল তাঁর কাছে একটা উপদ্রব হয়ে ওঠবার। তাঁর কাছে একটা চিঠি পেয়ে তাই কি আশ্বস্তই না হয়েছিলাম! সে চিঠিতে এই কথাগুলি ছিল,—

যাকে সাধারণ ভাষায় অতিথিবৎসলতা বলা হয়, তার জন্যে কাল রাত্রে তোমায় যখন ধন্যবাদ দিয়েছিলাম তখন আশা করেছিলাম যে যা বলতে চেয়েছিলাম তার অনেকটাই যে অব্যক্ত থেকেছে তা তুমি বুঝবে।

কি নিঃসঙ্গতার ভার যে আমি বয়ে বেড়াচ্ছি, বিশেষ করে আমার আকস্মিক ও অসামান্য খ্যাতিলাভের পর যে ভার আমার ওপর বিশেষভাবে চেপে বসেছে তা যে কি দুর্বহ, তোমার পক্ষে বোঝা কঠিন। আমি যেন হতভাগ্য সেই এক দেশ যেখানে এক অশুভক্ষণে এক কয়লার খনি আবিষ্কৃত হয়েছে। তার ফলে সে দেশের ফুলের আর আদর নেই, বনের গাছ সব কাটা পড়েছে আর ঐশ্বর্য সন্ধানীদের নির্মম দৃষ্টির সামনে অনাবৃত হয়ে সে পড়ে আছে। আমার বাজার দর বেড়েছে আর ব্যক্তিসত্তার মূল্য গেছে হারিয়ে। ব্যথিত বাসনায় অবিরাম পীড়িত হয়ে এই মূল্যই আমি খুঁজতে চাই।

আজ আমার মনে হচ্ছে এই মহার্ঘ দান আমি তোমার কাছে পেয়েছি। আমি আসলে যা তার জন্যেই তোমার কাছে আমার সমাদর, আমার বাইরের অন্য কিছুর জন্যে নয়।

মিরালরিও-তে রবীন্দ্রনাথ সকালবেলায় হয় লিখতেন নয় আমার সঙ্গে একটু-আধটু বাগানে বেড়াতেন। তাঁর ঘরের বারান্দা থেকে তিনি মনোযোগের সঙ্গে দূরবীন দিয়ে আমাদের দক্ষিণ আমেরিকার সব পাখি পর্যবেক্ষণ করতেন; হাডসন পড়তেন। বিকেল-বেলা আসত গাড়ি বোঝাই অনুরাগী ভক্তের দল। তিনি কখনো কখনো পাহাড়ের চূড়ার কিনারায় ঘাসের ওপরই তাদের নিয়ে বসে আলাপ করতেন। ব্যারট্‌স্ নামে এক ভদ্রলোক তাঁর কাছে প্রায়ই আসতেন। তিনিই মাঝে মাঝে যারা ইংরেজি জানে না তেমন দলের কাছে দোভাষীর কাজ করতেন। অন্য সময়ে এ কাজ আমায় করতে হত।

কখনো কখনো অপ্রত্যাশিত সব মানুষ আসতেন। থিওজফিস্টরা আসতেন খুব বেশী। রবীন্দ্রনাথ তাঁদেরই একজন ভেবে বোধ হয়। একদিন এক অচেনা মহিলা এসে রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে তখুনি দেখা করবার জন্যে জেদ ধরলেন। বৃথাই আমি কবিকে রক্ষা করবার চেষ্টা করলাম। তিনি আমার সব কথা ঠেলে জেদী মহিলার সঙ্গে দেখা করলেন। শেষে আমরা শুনলাম যে মহিলাটি কবির কাছে তাঁর স্বপ্নের ব্যাখ্যা শুনতে এসেছিলেন।

মহিলাটি নাকি স্বপ্নে হাতি দেখেছেন। ভারতবর্ষে যখন হাতি আছে তখন রবীন্দ্রনাথের নিশ্চয়ই তাঁর স্বপ্নের মানে জানা উচিত!

সকলের কাছেই সহজলভ্য হওয়ার মানে যে কি তা রবীন্দ্রনাথকে বোঝাবার একটা বড় সুযোগ পাওয়া গেছল। তাঁকে গণকঠাকুর ভাবা সত্যিই চূড়ান্ত ব্যাপার!

রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে আমাদের দেশের সত্যিকার যাঁরা শ্রেষ্ঠ প্রতিনিধি তাঁদেরই দেখা করাতে আমি চেয়েছিলাম। যেমন রিকার্ডো গুইরালডেজ। তখনও যে উপন্যাসে তিনি প্রচুর খ্যাতি অর্জন করেন সেই "ডন সেগুনদো সোম্ব্রা" প্রকাশিত হয়নি। এই উপন্যাসের নায়ক একজন 'গাউচো'। সে পাম্পাস অর্থাৎ আমাদের দেশের বিরাট প্রান্তরের মানুষ। বইটি রিকার্ডোর নিজের প্রদেশের 'গাউচো'দের নামে উৎসর্গ করা।

রিকার্ডো ছিলেন কবি ও ঔপন্যাসিক। রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে পরিচয়ের সময় তিনি বিখ্যাত হননি। সে খ্যাতি তিনি পেয়েছিলেন তিন চার বছর বাদে তাঁর মৃত্যুর পূর্বাহ্নে। আমাদের দুর্ভাগ্য যে অসুস্থ হওয়ার দরুণ ডাক্তারদের আদেশে আর্জেনটিনা ও সেখানকার মানুষদের ভালো করে জানবার সুযোগ রবীন্দ্রনাথের হয়নি।

একদিন কবি পাশ্চাত্ত্য সঙ্গীত শোনবার ইচ্ছা প্রকাশ করলেন। ব্যবস্থা করে ক্যাস্ত্রো কোয়ার্টেটকে আমি সান ইসিদ্রোতে আনালাম। জুয়ান জোসে ক্যাস্ত্রো আজ আমাদের একজন অগ্রগণ্য সাঙ্গীতিক।

সেদিন রবীন্দ্রনাথ ভারতবর্ষ থেকে সম্ভবতঃ উদ্বেগজনক সংবাদ পেয়ে একটু বিমর্ষ ছিলেন। দোতালার ঘর থেকে তিনি বার হননি। শুধু দরজাটা একটু খুলে রেখেছিলেন। বাজিয়েরা নিচের খালি হলঘরে বাজাতে বসলেন। আমি শুধু রবীন্দ্রনাথ যে ঘরে ছিলেন সেইটে দেখিয়ে দিলাম।

রবীন্দ্রনাথের স্মৃতিকথায় পড়া একটি ঘটনা স্মরণ করে আমি নিজের মনে না হেসে পারিনি। লণ্ডনে যখন তিনি একজন তরুণ ছাত্র তখন একজন ইংরাজমহিলার অনুরোধে ইঙ্গভারতীয় এক রাজকর্মচারীর বিধবার বন্ধ দরজার বাইরে তাঁকে স্বরচিত একটি শোক-গাথা গাইতে যেতে হয়েছিল। সারারাত গ্রামের সরাই-এ শীতে কাঁপবার পর তাঁকে সেই বিধবা মহিলার ঘরের বন্ধ দরজার বাইরে দাঁড় করিয়ে বলা হয়েছিল ভেতরের গৃহস্বামিনীর উদ্দেশ্যে গান গাইতে।

আমার বন্ধুদের অবশ্য বন্ধ দরজার সামনে গান গাইতে হয়নি। ডেবুসি, র‍্যাভেল আর বোরোদিন আধখোলা দরজা দিয়ে কবির কাছে যেতে পারতেন। তরুণ ভারতীয় ছাত্র এতদিনে প্রতিশোধ নিয়েছে বলে এই ব্যাপার নিয়ে ঠাট্টা করবার ইচ্ছে আমার অনেক সময় হয়েছে। কিন্তু সাহস পাইনি।

সেদিন ফরাসী দুজনের চেয়ে রুশ বোরোদিন তাঁর কাছে কম দুর্বোধ ঠেকেছিল। তিনি যা লিখেছিলেন তা আমার মনে আছে। তিনি লিখেছিলেন, 'আমার নিশ্চিত ধারণা হয়েছে যে আমাদের ও তাদের (তিনি পাশ্চাত্ত্য সঙ্গীতের কথা বলছিলেন) সঙ্গীতের বাস দুই ভিন্ন কক্ষে। এক দরজা দিয়ে তারা হৃদয়ে প্রবেশ করে না।'

আমাদের পাশ্চাত্ত্য সঙ্গীত তাঁর কাছে সেই রকমই এলোমেলো লাগত যেমন আমার প্রথম প্রথম একঘেয়ে লাগত তাঁর মুখে শোনা বাংলা গান। এইভাবেই আমি বুঝতে শিখি যে এতদিন যা ভেবেছি তা ভুল। সঙ্গীত সর্বজনীন ভাষা নয়।

অবশ্য র‍্যাভেল দেবুসি বোরোদিন, এমনকি ফাল্লা ও আর্জেনটাইন সাঙ্গীতিক নয়।

তাদের সংগীত যথার্থই বিদেশের আমদানি। কিন্তু আর্জেনটিনার নিজস্ব সেই দরের জিনিস কিই-বা তাঁকে আমি শোনাতে পারতাম? কিছুই না। অবশ্য আর্জেনটিনার লোক-গীতি ও নৃত্যের সুর আছে শোনাবার। সেই জন্যেই রিকার্ডো জুইরালদেসকে তার গীটার সমেত ডাকা হয়েছিল। এটা একেবারে পুরোপুরি আর্জেনটাইনের জিনিস।

রবীন্দ্রনাথ গোড়ার দিকে এখানে থাকতে শীতে কষ্ট পেয়েছিলেন, এখন ডিসেম্বরে তাঁর গরমে কষ্ট হতে লাগল। আমার বন্ধু মার্টিনেজ দে হোজ-দের তাই কয়েকদিনের জন্যে তাঁদের চাপাদমালাল-এ আমায় যেতে দেবার জন্যে অনুরোধ জানালাম। 'এসটানসিয়ায়' তাঁদের বাড়ি তাঁরা রবীন্দ্রনাথের জন্যে ছেড়ে দিলেন। আমরাও তৎক্ষণাৎ সেখানে রওনা হলাম। আটলাণ্টিক সমুদ্র থেকে মাত্র কুড়ি কিলোমিটার দূরে জায়গাটি সত্যিই চমৎকার। মার্টিনেজ দে হোজ-রা বংশানুক্রমে সবাই ইংলণ্ডে মানুষ। বিলাতী ধরনে তাঁদের বাড়ি সাজান। বাড়িটি একজন ইংরেজ স্থপতির তৈরী। রবীন্দ্রনাথ একবার বলেছিলেন—এ বাড়ি অর্থহীন জিনিসে ভর্তি। তিনি কি বলতে চেয়েছিলেন আমি বুঝি। একদিক দিয়ে তাঁর কথা যথার্থ, (আর্জেনটিনার এস্টানসিয়ায় নিজস্ব আর্জেনটাইন জিনিস দেখবার আশা করার দিক দিয়ে) আরেক দিকে ভুল। সেখানে প্রাচীন স্পেনের আসবাবপত্রও অমনি অর্থহীন হ'ত।

আর্জেনটিনার বিশেষত্ব যাতে ধরা পড়ে এমন কিছু খুঁজতে গিয়ে রবীন্দ্রনাথ যে সাধারণতঃ বিফল হয়েছেন তা বোঝা যায়। Far away and long ago (অনেক দূরে অনেক আগে) বইটি হাডসন যে আর্জেনটিনা দেখে লিখেছিলেন ১৯২৪ সালে তার অস্তিত্ব ছিল না। আর্জেনটিনায় ভূমিষ্ঠ ওই ইংরেজ লেখকের চোখ দিয়েই কিন্তু রবীন্দ্রনাথ আমাদের দেশকে জেনেছিলেন। হাডসনের বর্ণিত অতীত আর্জেনটিনা তখন আর নেই। তা বিবর্তনশীল এমন কি বিপ্লবপন্থী এক তরুণ জাতিতে রূপান্তরিত হয়েছে।

দেশ দূরে থাক কোন একজন মানুষের অন্তর্প্রকৃতি বোঝা সম্পূর্ণ ভিন্ন জাতি ধর্ম ও জীবনধারার অন্য কারো পক্ষে সহজ নয়। রবীন্দ্রনাথ জাহাজ থেকে আমায় লিখেছিলেন —'আমি জাত-পর্যটক নই। অচেনা কোন দেশকে জানবার এবং মনের একটি বিদেশী নীড় গড়বার উদ্দেশ্যে নতুন বিস্তৃত অভিজ্ঞতার ক্ষেত্র থেকে উপকরণ সংগ্রহ করবার জন্যে যে শক্তি ও উৎসাহ দরকার তা আমার নেই।'

তবু আশ্চর্যের কথা এই যে সান ইসিদ্রোর প্রতি একটি আকর্ষণ তাঁর মন থেকে যায়নি। একদিক দিয়ে অবশ্য সান ইসিদ্রোই তাঁর কাছে ছিল আর্জেনটিনা। একথা তিনি অনেকবার আমায় বলেছেন। 'বিশাল নদীটির কাছে যে বাড়িটিতে আমায় রেখেছিলে অদ্ভুত তার পরিবেশ। ক্যাক্টাস ঝোপগুলির বিকট বিচিত্র ভঙ্গিমা তাকে যেন অস্বাভাবিক দূরত্ব দিয়ে ঘিরে রেখেছে। দুস্তর ব্যবধানের পার থেকে সেই বাড়িটির ছবি আমার মনকে এখনো টানে। কোন কোন অভিজ্ঞতা যেন রত্নদ্বীপের মত জীবনের প্রত্যক্ষ মহাদেশ থেকে বিচ্ছিন্ন। মানচিত্রে তাদের অবস্থান-রেখা অস্পষ্টই থেকে যায়। আমার জীবনের আর্জেন-টিনার অধ্যায়ও তাই। তুমি হয়ত জানো, সেই রৌদ্রোজ্জ্বল দিনগুলি আর সেই মমতা-স্নিগ্ধ সেবার স্মৃতিকে ঘিরে আমার কয়েকটি শ্রেষ্ঠ কবিতা রচিত হয়েছে। পলাতকরা ধরা পড়েছে আর তারা ধরা পড়েই থাকবে, বিদেশী ভাষার ব্যবধান ঘুচিয়ে তুমি তাদের কাছে আসতে না পারলেও।'

এ চিঠির তারিখ ১৯৩৯ মার্চ। রবীন্দ্রনাথ যে কবিতাগুলির উল্লেখ করেছেন সেগুলি

বাংলায় "পূরবী" নামে প্রকাশিত হয়েছে। কলকাতা থেকে এই বইটি প্রকাশিত হওয়ার কথা তিনি আমায় জানান। লেখেন—'আমি তোমায় একটি বাংলা কবিতার বই পাঠাচ্ছি। নিজে তোমার হাতে এটি দিতে পারলে আমি সুখী হতাম। বইটি তোমাকে আমি উৎসর্গ করেছি, যদিও এতে কি আছে তা তুমি কখনো জানতে পারবে না। এই বইয়ের বেশীর ভাগ কবিতাই সান ইসিদ্রোতে থাকার সময় লেখা। আশা করি কবির চেয়ে তার কবিতার বইটি তোমার বেশী দিনের সঙ্গী হবার সুযোগ পাবে।'

বুয়োনেস এয়ার্সে পি. ই. এন ক্লাবের সম্মেলনের সময় তাঁকে নিমন্ত্রণ করিনি বলে রবীন্দ্রনাথ আমার কাছে অনুযোগ করেছিলেন। বলেছিলেন যে বয়সের ভার ও স্বাস্থ্যের অবস্থা অগ্রাহ্য করেই তিনি এখানে আসার জন্যে সমুদ্রে পাড়ি দিতে প্রস্তুত ছিলেন।

১৯৩০ সালে রোমেঁ রোলাঁ লেখেন যে রবীন্দ্রনাথ তাঁর নিজের দেশেই কিছুটা প্রবাসীর জীবন কাটান (তাই জায়গা বদল করে বেড়ানো তাঁর প্রয়োজন)। রোলাঁ লেখেন যে তরুণেরা রবীন্দ্রনাথের কাছ থেকে সরে গিয়ে গান্ধীকে অনুসরণ করছে। "ঘরে-বাইরে"-এর মত উপন্যাসে ভারতবর্ষ নাকি নিজেকে আর খুঁজে পাচ্ছে না।

এই থেকে আর্জেন্টিনার এক প্রকাশকের কথা আমার মনে পড়ল। ফর্সটার তাঁর মহৎ উপন্যাসে *A Passage to India* তাঁকে প্রকাশের জন্য দিতে চাওয়ায় তিনি বলেছিলেন—'এ বই অনুবাদ করে লাভ কি কারণ ফর্সটার যথাযথভাবে যার কথা লিখেছেন সে ভারতবর্ষ আর বৃটিশের অধীন নয়।'

কোন উপন্যাসের সার্থকতা যদি এই সবের ওপর নির্ভর করত তাহলে অনেক আগেই লোক *War and Peace* পড়া বন্ধ করত, কারণ রাশিয়া আর জারদের অধীন নয়। তরুণেরা কিছুদিন কোন মহৎ সাহিত্য সৃষ্টিকে ভুলে থাকতে পারে। তাদের পরে যারা আসছে তারাই হয়ত সে বই নতুন করে আবিষ্কার করবে। আগের দল তখন বুড়ো হয়ে গেছে।

রোমেঁ রোলাঁ সেই তারিখেই আবার লিখেছেন যে কবির শেষ জীবন দুঃখের। সময় কাটাতেই তিনি ছবি আঁকা ধরেছেন এবং এই একই কারণে প্যারিসে এমন সব তথাকথিত উঁচু সমাজের লোকের নিমন্ত্রণ চাইছেন ও রাখছেন যাঁরা তাঁর যোগ্য নয়। এ রকম খেলো হওয়ার নিন্দে করছে 'আমাদের ফরাসী বন্ধুরা' (এ-সব সুইস রোমাঁ রোলাঁর নীতিবাগীশ ফরাসী বন্ধুরা বোধ হয়)।

রোমেঁ রোলাঁ যে সময়ের কথা বলছেন আমি তখন প্যারিসে রবীন্দ্রনাথের সঙ্গেই ছিলাম। ক্যাপ মার্টিন থেকে ফিরে মাত্র কয়েকদিন তিনি প্যারিসে কাটান। সান ইসিদ্রো-র মত প্যারিসেও আমি তাঁকে দেখাশোনা করি, আর আমার অত্যন্ত অনুগত যে 'ফণি'কে রবীন্দ্রনাথ অত্যন্ত স্নেহ করতেন সে তাঁর সবকিছু গোছগাছ করবার ভার নেয়। 'ফণি'র আসল নাম এস্তেফানিয়া আলভারেজ। আমার যখন কৈশোর তখন থেকে চল্লিশ বছরেরও বেশী সে আমরণ আমার সহচরী হয়ে সর্বত্র আমার সঙ্গে থেকেছে।

১৯৩০-এ রবীন্দ্রনাথ প্যারিসে কার সঙ্গে দেখা করছেন আর কার সঙ্গে করেননি সব আমার জানা। তাঁর লেখার অনুবাদক জিদ-এর সঙ্গে প্রথম সেবার তাঁর সাক্ষাৎকার হয়। আমি সেখানে উপস্থিত ছিলাম। আঁদ্রে জিদ একাই এসেছিলেন। পল ভ্যালেরি, জ্যাঁ ক্যাসু আর মানব সম্পর্কিত ম্যুজিয়ম-এর জর্জেস আঁরি রিভিয়ের তাঁর সঙ্গে দেখা করতে আসেন। আমার অনুরোধে রিভিয়ের কবির ছবিগুলির প্রদর্শনীর ব্যবস্থা করেন। অ্যাবি ব্রেমঁদ অ্যাবি মুজিয়ের ও কাউন্টেস ম্যাথু দ্য নোয়াইয়ের সঙ্গে তিনি মধ্যাহ্ন

ভোজনের নিমন্ত্রণে মিলিত হয়েছিলেন। এই সাত জনের চারজন অন্ততঃ সাহিত্য ক্ষেত্রে সুবিখ্যাত। তাঁদের অন্ততঃ স্থূল বৈষয়িক বুদ্ধির মানুষ বলা যায় না। ম্যাডাম দ্য নোয়াই-এর অবশ্য বড় বংশে জন্ম আর পল ভ্যলেরিও তথাকথিত উঁচু সমাজের অনেকের বন্ধু। কিন্তু তাতে রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে মেলামেশা করবার অযোগ্য তাঁদের কেন ভাবা হবে আমি বুঝতে পারি নি।

রবীন্দ্রনাথ সান ইসিদ্রোতে থাকবার সময় যে খাতায় তাঁর "পূরবী-"র কবিতাগুলি বাংলায় লিখতেন সেটি আমাকে মুগ্ধ করেছিল। কবিতার কাটাকুটি নিয়ে তিনি খেলা করতেন। কলম দিয়ে সেগুলো তিনি এক কবিতা থেকে আর এক কবিতায় টেনে নিয়ে যেতেন। তাতে এই খেলাচ্ছলে টানা রেখাগুলো হঠাৎ জীবন্ত হয়ে উঠত। আদিম প্রাগৈতিহাসিক সব জন্তু, পাখি, মানুষের মুখ তার ভেতর থেকে উঁকি দিত। তাঁর কবিতার ভুলগুলি নতুন এক রূপলোক সৃষ্টি করে আমাদের দিকে রহস্য মধুর হাসি হাসত বা ভ্রূকুটি করত। এ রকম একটি পাতার ফটো তুলতে দেবার জন্যে তাঁকে আমি মিনতি করেছিলাম। আমার অনুরোধ তিনি রেখেছিলেন। এই খাতাটিতেই চিত্রশিল্পী রবীন্দ্রনাথের সূচনা বলে আমার মনে হয়। পেন্সিলে কি তুলিতে তাঁর স্বপ্নগুলি অনুবাদ করবার তাগিদ এইখানেই তিনি প্রথম অনুভব করেন। তাঁর এই রেখার হিজিবিজি আমার এত ভালো লাগে দেখেই তিনি তা চালিয়ে যেতে উৎসাহিত হয়েছিলেন। ছ' বছর বাদে প্যারিসে যখন তাঁর সঙ্গে আমার দেখা হয় তখন আর তিনি হিজিবিজি কাটছেন না, সত্যি আঁকছেন। আমার ফরাসী বন্ধুদের সাহায্যে তাঁর ছবির যে প্রদর্শনীর আমি আয়োজন করি তা বিশেষ সফল হয়েছিল।

রবীন্দ্রনাথের যে সত্তর বছর বয়সে ছবি আঁকার অদম্য আগ্রহ জেগেছিল এবং বার্লিনে তাঁর ছবি বিক্রি হচ্ছে জেনে তিনি যে নতুন শিক্ষার্থীর মত খুশি হয়েছিলেন তাতে আমি দোষের কিছু দেখি না। ভারতের তখন দুঃসময় চলেছে একথা সত্য। নেতারা সব তখন কারারুদ্ধ। রোমেঁ রোলাঁ অভিযোগ করেছেন যে 'রবীন্দ্রনাথ অন্য জগতে সরে গেছেন।' একথা সত্য যে, যিনি একাধারে শিল্পী ও গুরু, নিজের বাইরে ও ভেতরে নিখুঁত শিল্পের পরাকাষ্ঠা সৃষ্টির আকূতি যাঁর সমান তীব্র, সেই রবীন্দ্রনাথ তখন এমন এক সংকটাবর্তের মধ্যে পড়েছিলেন যেখানে শিল্পীই বড় হয়ে উঠেছিল। নিজে নিষ্পাপ না হলে কেউ যেন অন্যকে বিচারের দণ্ড হাতে না নেয়। নিজের স্বপ্নসাধকে রূপে বর্ণে অনুবাদ করার এই প্রচণ্ড আকূতির দোলায় যখন তিনি দুলছিলেন তখন সব সত্যকার শিল্পী যা ভাবে তাই তিনি ভেবেছিলেন নিশ্চয়। ভেবেছিলেন—'অনেক অধ্যবসায়ে গড়া আমার সব সংকার্যের প্রাসাদ চূড়া যখন ধ্বংস হয়ে বিস্মৃতি বিলীন হয়ে যাবে তখনও বহুকাল ধরে আমার এই রেখা রঙের কবিতাগুলি বোধ হয় থাকবে অম্লান।'

## চার

'আমারে তুমি অশেষ করেছ
এমনি লীলা তব'

আমাদের দেশে থাকবার সময় রবীন্দ্রনাথের ওপর এমন সব ভক্ত আর হুজুগে নিষ্কর্মার দল উপদ্রব করতে আসত যে স্বাস্থ্যের খাতিরেই তাঁকে রাখতে হত পাহারা দিয়ে।

আগেই এ বিষয়ে উল্লেখ করেছি। কিন্তু যাদের কথা ভাবা যায় না এমন লোকের কাছেও তাঁর সম্বন্ধে কৌতূহলের হুজুগ যে পৌঁচেছিল তা দেখাবার জন্যে আমি এ যাবৎ অপ্রকাশিত একটি কাহিনী বলছি। তখন আমরা সান ইসিদ্রোতে থাকি। আমার সহচরী 'ফণি' দুটি কি তিনটির বেশী ইংরেজি কথা না জানলেও রবীন্দ্রনাথের অত্যন্ত প্রিয় হয়ে উঠেছিল। রবীন্দ্রনাথের জিনিসপত্র গোছাতে আর তাঁর পোশাক-আশাকের তদ্বির করতে ফণি রোজ তাঁর ওখানে যেত। একদিন তার কাছে শুনলাম যে রবীন্দ্রনাথের পোশাকগুলি জীর্ণ হয়ে এসেছে। শীতের জন্যে তাঁর আরো গরম কিছু পোশাক দরকার। এখন পোশাকের ব্যাপারে Dior-এর যেমন নাম ডাক তখনকার দিনে তেমনি ছিল ফরাসী আচ্ছাদনশিল্পী Paquin-এর। বুয়েনেস এয়ার্স-এ Paquin-এর কারবারের একটি শাখা ছিল। সবচেয়ে ভালো পোশাকের কাপড় সেখানে আমি পাব জানতাম। রবীন্দ্রনাথের একটি জোব্বা নিয়ে তৎক্ষণাৎ সেখানে গেলাম। পাটল রঙের নরম একরকম পশম পছন্দ করে প্রধান পরিচালিকা অ্যালিসকে আমি রবীন্দ্রনাথের জোব্বাটির হুবহু একটি নকল তৈরী করতে বললাম। সেই সঙ্গে রবীন্দ্রনাথের পোশাকের ফরমাস যে তাদের দেওয়া হয়েছে এ কথা ঘুণাক্ষরে কাউকে না জানাতে বললাম। 'কানাকানি এখুনি শুরু হয়েছে টের পাচ্ছি।' বলে তাকে সাবধান করায় অ্যালিস সব রকম দিব্যি গেলে জানালে যে সে একেবারে বোবা হয়ে থাকবে। কোন রকম গুজব যাতে না উঠতে পারে সে জন্য পোশাকটা কোনো ফ্যান্সি ড্রেস বল-এর জন্যে তৈরী হচ্ছে বলে কারিগরদের সে বোঝাবে বলে আশ্বাস দিলে। তারপর জিজ্ঞাসা করলে—'পোশাকটা পরিয়ে দেখতে কখন যাব।'

পোশাক পরিয়ে দেখার কি দরকার—বলায় অ্যালিস কেমন যেন একটু অপ্রস্তুত হয়ে গেল। তারপর আমায় ধরে বসল দয়া করে তাকে পোশাকটা নিজে নিয়ে যাবার অনুমতি দিতে।

দোহাই আপনার!—সে মিনতি জানালে,—একটিবার শুধু তাঁকে দেখে তাঁর দাড়িটা স্পর্শ করতে চাই।

কি যা তা বলছ—আমি ধমক দিলাম—তাঁর শাদা দাড়ি ত অদ্ভুত কিছু নয়। শাদা দাড়ি আর সবার যেমন হয় তাঁরও তেমনি।

না, না ম্যাডাম—সে ব্যাকুলভাবে প্রতিবাদ জানালে—আমি ফটোতে দেখেছি, তাঁকে দেখতে ঠিক পিতা ঈশ্বরের মত।

এ কথার আর জবাব নেই। কোন প্রাণে আমি অ্যালিসকে জোব্বা পরাবার ছলে পিতা ঈশ্বরের কাছে গিয়ে তাঁর দাড়ি স্পর্শ করতে বাধা দিই। রোমের ভক্তেরা এমনি করেই ত সেন্ট পিটারের চরণ স্পর্শ করত।

অ্যালিসকে তারপর একদিন সত্যিই দেখা গেল একমুখ আলপিন নিয়ে রবীন্দ্রনাথের কাছে হাঁটু গেড়ে বসে তাঁর জোব্বার পাড় টেনে দিয়ে হাতার ঝুল ঠিক করছে। রবীন্দ্র-নাথ-কে আমি সাবধান করে দিয়েছিলাম—একটু ধৈর্য ধরবেন। অ্যালিস বলে আপনি পিতা ঈশ্বরের মত দেখতে।

কবি ভেবেছিলেন অ্যালিস সামান্য মফস্বলী মেয়েদরজী মাত্র। পোশাক পরিয়ে পরীক্ষা করা শেষ হলে অ্যালিসের সঙ্গে আমি দরজা পর্যন্ত গেলাম। আমার যেন কোন অপরাধের চক্রান্তে জড়িত এমনভাবে তাকে সাবধান করে বললাম—'ভগবানের দোহাই! কাউকে যেন একথা ভুলেও বোলো না।'

রবীন্দ্রনাথের পোশাক তৈরী করে দিয়েছে Paquin, এ কথা জানলে যারা চোখ কপালে তুলবে সেই নীতিবাগীশদেরই ছিল আমার ভয়। কিন্তু তিনি যখন ওই পোশাক পরেন আর আমি তা তৈরীও করাচ্ছি, তখন যতদূর সম্ভব সেটা নিখুঁত করবার চেষ্টাই বা করব না কেন? এ তৃপ্তি আমার, শুধু আমার। নিজেকে এ আনন্দ থেকে বঞ্চিত করবার মত নিষ্ঠাবতী আমি নই। বলাই বাহুল্য রবীন্দ্রনাথ এ ব্যাপারের কিছুই জানতে পারেন নি। আমাদের সব কাজ খুঁটিয়ে দেখে বিচার করেন এমন কেউ যদি কোথাও থাকেন, তিনি আমার এ স্খলন ক্ষমা করবেন আমি জানি।

রবীন্দ্রনাথ ভালো মেজাজে থাকলে সাহস পেয়ে আমি অনেক সময় তাঁকে জ্বালাতন করবার জন্যে বলতাম—গুরুদেব, বিলেতে কিশোর বয়সে যখন আপনি পড়তে গেছলেন তখন নিশ্চয় আপনার সৌন্দর্য ছিল চমকে দেবার মত। সব ইংরেজ মেয়েরাই কি তখন আপনার প্রেমে হাবুডুবু?

গম্ভীরভাবে তিনি বলতেন,—নিশ্চয়ই! তারপর হেসে উঠতেন।

আমার যৌবনে যেমন রবীন্দ্রনাথও তেমনি তাঁর যৌবনে সেক্সপিয়রকে ভালবেসেছিলেন। রোমিও-জুলিয়েটের প্রেমের সেই উচ্ছ্বাস, অক্ষম লিয়ারের সেই আক্ষেপের প্রচণ্ডতা, ওথেলোর সন্দেহ-দীর্ণ চিত্তের সর্বগ্রাসী আগুন আমাদের মুগ্ধ বিস্ময় জাগাত। আমাদের সীমিত সামাজিক জীবন, আমাদের সংকীর্ণ কর্মক্ষেত্র চারিদিকে এমন একঘেয়ে বৈচিত্র্যহীনতার বেড়া দিয়ে ঘেরা ছিল যে উদ্দাম অনুভূতি সেখানে প্রবেশের পথ পেত না। তাই আমাদের হৃদয় ইংরাজী সাহিত্যের তীব্র আবেগের সঞ্জীবনী আঘাতের জন্যে আপনা থেকেই লালায়িত হয়ে থাকত। আমাদের ত সাহিত্যকলার রসমাধুর্য উপভোগ নয়, বন্ধ জলার মত বন্যাতরঙ্গকে আনন্দোদ্বেল অভ্যর্থনা।

তাঁর প্রকৃতিবিলাসও ছিল আমার মত। 'আমাদের বাগানের প্রত্যেকটি নারকেল গাছের একটি বিশিষ্ট সত্তা ছিল আমার কাছে।'

স্বাধীনতা সম্বন্ধেও তাঁর মত আমার সঙ্গে মিলত।

'শাসন যাদের হাতে তারা স্বাধীনতা হরণ করে রাখবার কারণ হিসেবে এই যুক্তিই বারবার শোনায় যে স্বাধীনতার অপব্যবহার হতে পারে। কিন্তু সে সম্ভাবনা না থাকলে স্বাধীনতাই ত অর্থহীন। অপব্যবহারের ভেতর দিয়েই সব কিছুর ব্যবহার শেখা যায়। আমার নিজের বেলা বলতে পারি যে স্বাধীনতা পেয়ে যদি কিছু ভুল কোথাও করে থাকি তবে তাই থেকেই সে ভুল শোধরাবার পথ সব সময়েই খুঁজে পেয়েছি। শারীরিক বা মানসিক কর্ণমর্দন করে যা আমায় জোর করে গেলাবার চেষ্টা করা হয়েছে, তা আমি কখনো নিজের করে নিতে পারি নি। স্বাধীনভাবে যেখানে আমি নিজের খুশিমত ছাড়া পাই নি সেখানে দুঃখই পেয়েছি শুধু। আমার দাদা জ্যোতিরিন্দ্র আমায় নিজস্ব আত্মোপলব্ধির পথে যাবার স্বাধীনতা দিয়েছিলেন। তাইতেই আমার অন্তর্প্রকৃতির কাঁটাও যেন গজিয়েছিল, তেমনি তার ফুলও। এই অভিজ্ঞতা থেকেই মন্দকে যত না আমি ভয় করতে শিখেছি ভালো করার জবরদস্তিকে তার চেয়ে বেশী। নৈতিক কি রাজনৈতিক যে কোন পিটুনি পুলিসেই আমার দারুণ আতঙ্ক।'

ধর্ম সম্বন্ধে একমাত্র তাঁর ধারণাই আমার সমীচীন মনে হয়েছে। 'বাহ্যিক শাস্ত্র থেকে যে ধর্ম আমরা পাই তা কখনো আমাদের সত্যি আপন হয় না। তার সঙ্গে আমাদের সম্পর্ক শুধু অভ্যাসের। অন্তরের ধর্ম লাভ করা মানুষের সারাজীবনের সাধনার অভিযান। চরম

দুঃখ না পেলে তার জন্ম হয় না। নিজের প্রাণের শোণিত পান করেই তার পুষ্টি। সুখ পাক বা না পাক এ পথ যে নিয়েছে পরম সার্থকতার আনন্দে তার যাত্রা সমাপ্ত হবে।'

না, রবীন্দ্রনাথের ভারতবর্ষ আমার আমেরিকা থেকে সুদূর ছিল না। এই সমস্ত ভাবনা বা ঘোষণায় এমন কিছু ছিল না যাতে আমার মন সায় দেয় নি, বা যা আমারও নিজস্ব নয়। সত্যি কথা বলতে কি, আমি নিজের মধ্যে তার প্রতিধ্বনি শুনেছি। নিজের প্রকাশ করবার ক্ষমতা না থাকলেও, আরেক জনের মুখে এসব কথা শুনে আমার চোখে জল এসেছে। নিজেকে যা ভারাক্রান্ত করে রেখেছে কোন বইয়ে তা খুঁজে পাওয়াও এক-রকম মুক্তি।

অন্তর আমার এইসব বিষয়ের চিন্তায় পরিপূর্ণ হলেও এই নিয়ে আলোচনা আমরা করতাম না বললেই হয়। তাঁর কাছে থাকলে লজ্জায় আমার মুখে কথা ফুটত না। রবীন্দ্র-নাথ ভাবতেন আমি ইংরাজি শব্দ খুঁজে পাচ্ছি না বোধ হয়। কিন্তু ভাষার দৈন্য নয় স্বয়ং রবীন্দ্রনাথই আমায় মূক করে রাখতেন। কিংবা তাঁর সম্বন্ধে আমার যে গভীর শ্রদ্ধা ও অনুরাগের কথা তিনি নিজে জানতেন না তাই আমায় বাধা দিত। আমার সম্বন্ধে তাঁর অজ্ঞতা আমি দূর করবার চেষ্টা করি নি। কি করে তিনি জানবেন যে সমাগত বসন্তের দিনে তারই বাতাসের মত লঘু স্বচ্ছন্দ সাজ যে তরুণী মেয়েটির ছিল, তাঁকে উত্যক্ত করতে ভয় পেয়েও যে রোগী হিসেবে তাঁর পরিচর্যা করবার দায়িত্ব নিতে দ্বিধা করে নি, নিত্য নীরবে যে তরুণী তাঁর পাশে এসে বসে থাকত, সেই মেয়েটি তাঁর সমস্ত লেখা মুখস্ত করে রেখেছে।

আর্জেনটিনা ছেড়ে যাবার পর রবীন্দ্রনাথ আমায় জাহাজ থেকে লেখেন,—'একসঙ্গে যখন ছিলাম, তখন কথা নিয়েই আমরা খেলা করেছি বেশী। পরস্পরকে স্পষ্ট করে জানার শ্রেষ্ঠ সুযোগগুলি চেষ্টা করেছি হেসেই উড়িয়ে দিতে। এ ধরনের কৌতুকহাস্য মনের আবহ অস্থির করে তোলে, তলার ধুলো উড়িয়ে শুধু আমাদের দৃষ্টি করে আচ্ছন্ন।' কিন্তু আমার সম্বন্ধে তাঁর ও তাঁর সম্বন্ধে আমার দৃষ্টিকোণের তফাৎ ছিল। রবীন্দ্রনাথ যে কে এবং কি তা আমি জানতাম। তাঁর লেখাতে তাঁর যে পরিচয় আগে পেয়েছি প্রত্যক্ষ দেখায় তা সম্পূর্ণ হয়েছিল। কিন্তু অচেতন মনের আলোকপাতে ছাড়া আমার মত একটি নির্বাক মেয়ের কিছুই তাঁর জানবার কথা নয়। 'তোমায় চিনি গো চিনি ওগো বিদেশিনী! তুমি থাক সিন্ধু-পারে...' আমার নীরবতায় আমার মনের কথা কি তিনি সত্যি শুনতে পেয়েছিলেন? বোধ হয় পান নি বলেই মনে হয়। পরস্পরকে জানা আমাদের একান্ত একতরফা। দুঃখ যদি আমার কিছু থাকে তা এই যে 'সেই এক বিদেশিনী' তাঁর কত কাছে ছিল তা তিনি কখনো জানলেন না। জানলেন না, আকাশ সমুদ্রের দুস্তর ব্যবধান সত্ত্বেও দুটি দেশ আপাতঃ অসম্ভব কি মিলনসূত্রে বাঁধা ছিল। তিনি কখনো জানতে পারেন নি সাগরপারের সেই গানগুলি শুনতে শুনতে আমি যেন মহৎ পাশ্চাত্ত্য কবি সেন্ট জন পার্স-এর কথাগুলি আগেই অনুমান করতে পেরেছিলাম। 'এই আমার স্বদেশে আমি পুনপ্রতিষ্ঠিত হলাম। আত্মার ছাড়া আর কিছুর ইতিহাস নেই।' পশ্চিমের লোকেদের প্রাচ্যের চিন্তা বোঝবার ক্ষমতা আছে কিনা মাঝে মাঝে রবীন্দ্রনাথেরও সন্দেহ হত। মনে আছে এসটানসিয়া চাপাদমালাল-এ আমরা যখন ছিলাম তখন একদিন বিকেলে তিনি একটি কবিতা লেখেন। তিনি কবিতাটি যখন শেষ করছেন ঠিক সেই মুহূর্তে আমি তাঁর ঘরে ঢুকেছিলাম। ঘরটি বেশ বিশাল, লাল ড্যামাস্কের পর্দায় সাজান। টানা সার্সির জানলাগুলি থেকে প্রথম নিদাঘের কাঁচ সবুজ

বনভূমি দেখা যায়। ঝকঝকে পালিশ করা বিলাতী আসবাবপত্র থেকে মোসের একটা মৃদু গন্ধ। আমাদের চারিদিকে দিগন্তব্যাপী স্তব্ধতা—Teros আর benteveous-এর ধ্বনিগাম্ভীর্যে আর পালিত নধর পশুদের সুদূর শান্তিময় ডাকে প্রগাঢ় আর্জেন্টিনার সেই অসীম নৈঃশব্দ। বৃষ্টি পড়ছিল আগে থেকেই। আমাদের আটলান্টিক উপকূলের তীক্ষ্ণ নেশা ধরানো বাতাস যেন বুকের মধ্যে স্পন্দন জাগায়!

'চায়ের সময় হয়ে এল।'—আমি বলেছিলাম—'কিন্তু নীচে নামবার আগে কবিতাটি অনুবাদ করে আমায় শোনাতে অনুরোধ করছি।'

তাঁর সামনে ছড়ানো পাতাগুলোর ওপর ঝুঁকে বালির ওপর পাখিদের পদচিহ্নের মত সূক্ষ্ম রহস্যময় অজানা বাংলা অক্ষরগুলি আমি দেখতে পাচ্ছিলাম।

রবীন্দ্রনাথ পাতাটি তুলে নিয়ে অনুবাদ করে শোনাতে শুরু করলেন। অনুবাদটা আক্ষরিক তিনি আমায় বলেছিলেন। মাঝে মাঝে একটু থেমে তিনি যা শোনালেন তাতে আমার মন আশ্চর্যভাবে উদ্ভাসিত হয়ে উঠল। দস্তানা পরে' যেমন জিনিস ছোঁয়া অনুবাদের সাহায্যে কিছু পড়া অনেকটা তাই। আমার মনে হল সেরকম দস্তানা পরে, নয়, যেন ভাগ্যগুণে বা অলৌকিক কোন উপায়ে আমি রবীন্দ্রনাথের রচনাবস্তুর প্রত্যক্ষ নিবিড় স্পর্শ এতদিনে পেয়েছি। অনুবাদের দস্তানা আমাদের স্পর্শেন্দ্রিয়কে অসাড় করে দিয়ে শব্দের সত্যকার অনুভব পেতে দেয় না। শব্দের মূল্যই কিন্তু সবচেয়ে বেশী, কারণ শুধু কবিরাই তাই দিয়ে গোচর ও অগোচরের মধ্যে, প্রতিদিনের স্থূল প্রত্যক্ষ অবাস্তবতা আর কবিতার অপ্রত্যক্ষ সত্যকার বাস্তবতার মধ্যে ভঙ্গুর সেতু নির্মাণ করতে পারেন।

রবীন্দ্রনাথকে আমি ইংরাজি রূপান্তরটিকে পরে লিখে রাখতে বলি। পরের দিন তিনি সেটি আমায় তাঁর সুন্দর ইংরাজি হস্তাক্ষরে লিখে দেন। তাঁর সামনে কবিতাটি পড়ে আমার আশাভঙ্গ আমি গোপন করতে পারি নি। ক্ষুব্ধ হয়ে বলেছিলাম—কাল যা যা পড়ে শুনিয়েছিলেন তা সব ত এখানে নেই। কেন সেগুলি বাদ দিয়েছেন? সেইগুলিই ছিল কবিতাটির মূল, তার প্রাণ।

তিনি উত্তরে বললেন যে সে সব কথা পাশ্চাত্ত্য পাঠকদের ভালো লাগবে না তিনি ভেবেছিলেন। কেউ যেন আমায় চড় মেরেছে মনে হল। রাঙা হয়ে উঠল আমার মুখ। রবীন্দ্রনাথ অবশ্য যা সত্য বলে বুঝেছিলেন তাই আমায় জানিয়েছিলেন। আমি যে আহত হতে পারি তা কল্পনাও করেন নি। আমি অত্যন্ত জোর দিয়ে বলেছিলাম, এই একটিবার অন্ততঃ তিনি দারুণ ভুল করেছেন। এভাবে জোর দিয়ে তাঁর সঙ্গে কথা আমি খুব কমই বলি, যদিও আকস্মিক আবেগ আমার স্বভাবগত।

আরেকবার এই চাপাদমালাল-এই বোদলেয়ারের কয়েকটি কবিতা আমি তাঁকে অনুবাদ করে শোনাতে চেষ্টা করি। ভালো করেই জানতাম যে আমি অসাধ্যসাধন করবার চেষ্টা করছি। তবু বোদলেয়ার-এর কয়েকটি ভাব তাঁর কিরকম লাগে আমি জানতে উৎসুক ছিলাম। Invitation au voyage কবিতাটি আমি পড়ছিলাম। পড়তে পড়তে এই ছত্রে যখন এলাম—

Des meubles luisants
Polis par les ans
De'coreraient notre chambrae
Les plus rares fleurs

Me'lant leur odeurs
Aus vagues senteurs de I'ambre
Les riches plafonds
Le muriors profunds
La splendour orientale. . . .

তখন রবীন্দ্রনাথ আমায় বাধা দিয়ে বলে উঠলেন—বিজয়া, তোমার আসবাবপত্রের কবিকে আমার ভালো লাগছে না।

কথাগুলো ও তা বলার সুর এমন কৌতুকের যে আমি না হেসে উঠে পারলাম না। আমার অনুবাদের দৌলতে এক ফরাসী কবিপ্রতিভা আসবাবপত্রের কবি হয়ে উঠেছেন। অনুবাদ অনেক সময় প্রাণঘাতী হতে পারে।

১৯৩০-এ ক্যাপ মার্টিন-এ আর প্যারিসে আবার যখন রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে দেখা হল তখন তিনি চাইলেন যে আমি তাঁর সঙ্গে লণ্ডনে যাই। তিনি অক্সফোর্ডে বক্তৃতা দিতে যাচ্ছিলেন। এর চেয়ে আনন্দ আমি আর কিছুতে পেতাম না, কিন্তু তখন আমি নিউ ইয়র্কে ওয়াল্ডো ফ্র্যাঙ্কের সঙ্গে দেখা করবার সব ব্যবস্থা করে ফেলেছি। যে রিভিউটি আমি বার করতে যাচ্ছিলাম এবং সেই বছরের শেষেই যেটি প্রকাশিত হবার কথা তারই বিষয়ে আলোচনার জন্যে এই সাক্ষাতের আয়োজন।

আমার নিউ ইয়র্কে রওনা হবার কারণ জানিয়ে আমি রবীন্দ্রনাথকে লিখি—আমরা দক্ষিণে যে দুঃখে পীড়িত ওয়াল্ডো ফ্র্যাঙ্ক উত্তরেও তাই সয়েছেন। যখন বুঝলাম যে এই অনাথ-দশা আমরা দুজনেই অনুভব করছি তখন এ কথাও আমাদের মনে হল যে, কোন দিন সমস্ত মহাদেশে এর প্রতিকার হতে পারে...কারণ বহুজনই এ ব্যাপারে আমাদের সাথী। ইওরোপের অভাব আমরা দুজনেই গভীরভাবে অনুভব করি, কিন্তু সেখানে গিয়ে যখন বাস করি তখন দুজনেই বুঝি যে প্রাণের যে সুধা আমাদের প্রয়োজন ইওরোপ তা দিতে পারে না। এককথায় এই সত্যই আমরা উপলব্ধি করি যে আমরা আমেরিকারই আপন—সেই স্থূল সংস্কৃতিহীন বিশৃঙ্খল অপরিণত আমেরিকা। সে আমেরিকা আমাদের দুঃখই দেয় কিন্তু তার জন্যে অনিচ্ছাতেও সব দুঃখ বরণ করতে আমরা প্রস্তুত। আমরা দোভাষী পত্রিকা বার করবার কথা ভেবেছি। তাতে আমেরিকার সমস্যার কথা থাকবে আর আমাদের সাধ্যমত সংগৃহীত শ্রেষ্ঠ সাহিত্যিক রচনা। এ অভিজ্ঞতা সার্থক হতে পারে।

রিভিউটির তখনও নামকরণ হয় নি। পরে সেটিই *SUR* নামে প্রকাশিত হয়েছিল। তবে দু'ভাষায় প্রকাশের কল্পনা আমরা বাতিল করেছিলাম।

১৯৩০-এর জুন নর্দ স্টেশনের প্ল্যাটফর্মে শেষবার আমি রবীন্দ্রনাথকে আলিঙ্গন করি। তাঁর বন্ধু সি. এস. অ্যান্ডরুজ ও সেক্রেটারী আর্যম তাঁর সঙ্গে ছিলেন।

তাঁর সঙ্গে চিঠিপত্র ছাড়া আর আমার সাক্ষাৎ হয়নি। আমি তাঁকে একটি আরাম-কেদারা দিয়েছিলাম। সেটি বরাবর তাঁর কাছে ছিল ও এখন শান্তিনিকেতনে আছে বলে আমি জানি। চিঠিতে কখনো কখনো এটির কথা তিনি উল্লেখ করেছেন।

'তোমার সেই আরাম-কেদারায় দিনে রাত্রে বহুক্ষণ আমি ডুবে থাকি। এতদিনে তোমার সঙ্গে বোদলেয়ার-এর যে কবিতা পড়েছিলাম তার কাব্যময় অর্থ আমার কাছে ধরা পড়েছে!'

কথায় বার্তায় যেমন চিঠিপত্রেও তেমনি রবীন্দ্রনাথের তীক্ষ্ণ কৌতুকরসবোধ ফুটে উঠত।

'কোনো কোনো প্রাণী মৃত্যুর বিপদ এড়াতে মরার ভাণ করে। ডাক্তাররা আমায় তাদের অনুকরণ করার পরামর্শ দিয়েছেন। আমি যেন না নড়িচড়ি, কথা না বলি, কারুর সঙ্গে দেখাসাক্ষাৎ না করি—অর্থাৎ মরে গেছি এমনিভাবে যেন থাকি। সুতরাং তোমার দেওয়া যে কেদারাটি আমার সঙ্গে সমুদ্র পারাপার করেছে তার কাছে সম্পূর্ণভাবে আমায় আত্মসমর্পণ করতে হবে।'

মেয়েদের সম্বন্ধে Ortega y Gasset-এর একটি উক্তি আমি রবীন্দ্রনাথকে অনুবাদ করে পাঠাই। তিনি তার উত্তরে একটি দীর্ঘ মজার চিঠি আমায় লেখেন। সে চিঠির শেষটা এই রকম—মেয়েদের সঙ্গে ঠাট্টা করা আমার বারণ, কিন্তু এ চিঠির কয়েকটি মন্তব্য লঘু চাপল্যের ধার ঘেঁষে গেছে। প্রত্যাদিষ্ট মহাপুরুষ না হলেও যাকে তাই বলে ধরা হয় ভুল বোঝার ভয় সত্ত্বেও তাকে যে মাঝে মাঝে হাসির ধমকটা বার করে ফেলতে হয়, একথা বুঝলে তুমি আমায় ক্ষমা করবে।

তিনি জানতেন যে আমি হাসতে ভালবাসি। অবস্থাগতিকেও মহাপুরুষদের হাসতে মানা কিনা আমি জানি না। আমার ত বিশ্বাস যে মেকী মহাপুরুষরাই সব সময়ে গম্ভীর। জ্ঞানে ও করুণায় বিশ্বব্যাপী শ্রদ্ধা এমন কি ভক্তি অর্জন করেছেন এমন একজনের সম্বন্ধে কেউ একদা বলেছিল—'ও'র ঋষিত্ব লাভের একমাত্র অন্তরায় হল খুশির অভাব।' এ মন্তব্যের যাথার্থ্য আমাকে চমৎকৃত করেছিল।

আর্জেনটিনায় থাকবার সময়ে রবীন্দ্রনাথের জীবনের গোটা একটি দিক এবং তাঁর মনের দ্বন্দ্ব বোঝবার জন্যে আমি তৈরী ছিলাম না। সেগুলি স্পষ্ট করে দেখে তার সম্পূর্ণ মানে আমি বুঝেছিলাম অনেক পরে, যখন শুধু বইপড়া বিদ্যা নয় জীবনই আমাকে অনুরূপ দ্বন্দ্বের সামনে ফেলেছিল। তাঁকে কতবার না তখন স্মরণ করেছি।

দু'বছর আগে বিলাতের মনোরম ডার্টিংটন হলে যখন কয়েকদিনের জন্যে ছিলাম তখন এল. কে. এল্মহার্স্ট তাঁর কাছে গুরুদেবের লেখা কয়েকটি পত্রাংশ দেখান। সেগুলি টুকে নিয়ে তার দুটি প্রকাশ করার অনুমতি আমি চেয়ে নিই। ১৯২৪-এ যখন রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে পাহাড়ের মাথায় 'পারাইসোস' বা 'টিপার' তলায় বসতাম বা বারান্দা থেকে দুজনে নীচের নদীর শোভা দেখতাম তখন চিঠির এইসব কথাগুলি আমাকে এভাবে নাড়া দিত না। আমার কাছে সেগুলি শুধু সুন্দরই মনে হত। ১৯৫৬-এ সেগুলি পড়বার সময় যা হয়েছে সেই তীব্র সাড়া অনুভব করতাম না। পত্রাংশগুলি এই—'অত্যাচারে নিপীড়িত হওয়াও সহ্য করা যায়, কিন্তু প্রতারিত হয়ে মিথ্যা বিগ্রহের পূজায় মত্ত হওয়ার দুর্ভাগ্যে সমস্ত যুগেরই চরম অপমান।'

'মানুষের সঙ্গে ইতিহাস কখনো কখনো প্রতারণা করছে। নানা দুর্ঘটনার সমাবেশে আসলে যারা ক্ষুদ্র তাদের ফাঁপিয়ে মহত্ত্বের ব্যঙ্গরূপ দিয়েছে। সত্যের এই বিকৃতি কখনো কখনো প্রতিষ্ঠার সুযোগ যে পায় তার কারণ এই নয় যে এই সমস্ত ক্ষুদ্র মানুষের মধ্যে আশ্চর্য কোন শক্তি থাকে। কারণ এই যে যাদের তারা চালিত করে তাদেরই পরম কোন দুর্বলতা এই নেতাদের মধ্যে মূর্ত।'

এ কথার গভীরতা বুঝতে আর তা আমারও নিজস্ব বলে উপলব্ধি করতে আমার অনেক সময় লেগেছিল। ছোট হলদে ফুলে সমুজ্জ্বল 'টিপাস'-এর ছায়ায় আর তখন আমি বসে নেই। প্রহরীর মত বিলাতী 'লন' ঘিরে থাকা পুরানো ইউ গাছের সারির দিকে জানলা থেকে তখন আমি চেয়ে আছি। সেগুলি এত গাঢ় সবুজ যে প্রায় কালো মনে হয়। গুরুদেব

আমি ও এল্মহার্স্ট যে মাসে সান ইসিদ্রোতে মিলিত হয়েছিলাম, এও সেই নভেম্বর মাস। কিন্তু এখন বত্রিশ বছর বাদে কবির দুটি বন্ধুই শুধু ডেভনশায়ারে এসে মিলেছেন। আমাদের দেশের রৌদ্রোজ্জ্বল নভেম্বর ইংলণ্ডে আসন্ন শীতের বার্তা নিয়ে আর্দ্র ও কুজ্ঝটিকাচ্ছন্ন।

বিষাদের ঋতু এটি। কিন্তু এই কুয়াশাচ্ছন্ন ভিজে ঋতুর আমার কাছে একটি বিশেষ আকর্ষণ ছিল এবং আমি নিজে বিষণ্ণ বোধ করি নি। এইমাত্র যে সব যন্ত্রণার কথা পড়েছি আর শুধু লেখার ভেতর দিয়ে নয় নিজের জীবনের অভিজ্ঞতার মধ্য দিয়ে যা এখন নিদারুণ সত্য বলে জেনেছি—তাতেও আমি বিষণ্ণ নই। একদিন দুঃসহ বিষাদ আমাকে কাতর করেছিল, যখন যৌবনের সমস্ত ঐশ্বর্য নিয়ে আমি সেই ঐশ্বর্যের মাঝেই বন্দিনী ছিলাম। সেই সময়টিতে "গীতাঞ্জলি" পরম মুক্তির কান্না আমায় কাঁদিয়েছিল। তবু তখনকার মত এখনও সম্পূর্ণ এ কথার অর্থ বুঝেছি বলব না—'আমার জীবনের আনন্দময় দিশারী সমস্ত দ্বন্দ্ব বাধা জটিলতার মধ্য দিয়ে যে পরমাশ্চর্য কৌশলে তার গভীর মর্ম সার্থক করবার পথে আমায় নিয়ে চলেছেন।'

এইটুকু শুধু আমি জানি যে আর সকলের মত আমার বেলাতেও জীবন যে রহস্যময় নক্সা এঁকেছে তার পাঠোদ্ধার করতে না পারলেও কোনো হতাশা না নিয়ে এমন কি তেমন বিষণ্ণ না হয়েও আমি তার কথা ভাবতে পারি। এই যে প্রজ্ঞা, যা আমার বেলায় ঠিক প্রজ্ঞা নয় বরং কতকটা অনুভূতি ও সহজাত বোধ, এর জন্যে বেশীর ভাগ এমন দুটি মানুষের কাছে আমি ঋণী, যাঁরা দূর এক দেশে অন্য এক সভ্যতা ও জাতির প্রতিনিধি। (সে আপাতঃভিন্ন সভ্যতা ও জাতির মূল না হোক শাখা পৃথক) এঁরা দুজনে হলেন গান্ধী ও গুরুদেব। প্রথম জনকে আমি একবার মাত্র দেখেছি ১৯৩১-এ। তাঁর কথাও শুনেছি সেই একবার। আমার চিরকালের আনন্দ এই যে দ্বিতীয় জনের সঙ্গে আমার পথ মিলে মিশে গিয়েছে।

দুজনের সম্বন্ধেই কথা বলবার অধিকারী আমি নিজেকে মনে করি না। আমি যা বলি তা শুধু 'সোচ্চার অনুভূতি' বলতেন বোধ হয় রবীন্দ্রনাথ। একবিন্দু অশ্রু কি একটি হাসি-কে কাব্যে রূপান্তরিত করার ক্ষমতা যদি আমার থাকত তাহলে আমার কথাগুলি একটি কবিতা হতে পারত। সে ক্ষমতা আমার নেই। চোখের জল আমার চোখেই রইল মুখের হাসি মুখেই।

সমুদ্র কি আমাদের দেশের পাম্পা বা প্লেট নদীর মত আপাতঃ অসীম অকূল কিছুর সামনে দাঁড়ালে মনে হয় এমন কোন বিশ্বের প্রান্তে আছি যার কোন সীমান্ত নেই। আমাদের শারীরিক ক্ষমতার পরিমাণই সে জগৎ আমাদের কাছে সীমিত করে রাখে।

ভালোবাসা হৃদয়ে এই অসীমতার অনুভূতিই জাগায়। কিন্তু দৃষ্টির চেয়ে হৃদয়ের শক্তি অনেক বেশী। সে আরো বহু দূরে পৌঁছোয়।

রবীন্দ্রনাথ বলেছেন যে তাঁর জীবনে এমন মুহূর্ত এসেছে যখন সীমার আপাতঃতুচ্ছতা আর অসীমের আপাতঃশূন্যতা দূর হয়ে গেছে দুইয়ের মিলনে। সীমার মধ্য দিয়ে অসীমকে পাওয়ার সেই আনন্দ শুধু প্রেমেই সম্ভব।

উইলিয়ম ব্লেক এই কথাই অন্যভাবে বলেছেন, '...পৃথিবীর সব কিছুই ঈশ্বরের বাণী।' রবীন্দ্রনাথের অনুবাদক ইয়েটস ব্লেকের রচনা সংগ্রহের ভূমিকায় ব্যাখ্যা করে লিখেছেন যে বিশ্বসৃষ্টির যা কিছু স্থূল ইন্দ্রিয়গোচর তার মধ্যেই শয়তানের স্পর্শ যার আর এক নাম

হল অস্বচ্ছতা। আর শুধু অধ্যাত্ম-ইন্দ্রিয় দিয়ে যার নাগাল পাওয়া যায় তাই একমাত্র বাস্তবতা।

যখনই বুঝতে পারি যে 'সীমার আপাতঃতুচ্ছতা' 'অসীমের আপাতঃশূন্যতার' মতই মিথ্যা তখনই সেই স্থির বিশ্বাস আমাদের মধ্যে জাগতে শুরু করে যে 'পৃথিবীর সব কিছুই ঈশ্বরের বাণী'।

সমস্ত প্রাকৃতিক ঘটনা অজানা শক্তির প্রেরিত রূপক-বার্তা বলে ব্লেক বিশ্বাস করতেন। রবীন্দ্রনাথেরও সেই রকম প্রত্যয় বোধ হয়েছিল। তবে এই 'প্রাকৃতিক ঘটনা'র পাঠোদ্ধার করা সব সময়ে সহজ নয়।

পাশ্চাত্ত্য ও দক্ষিণ আমেরিকার মানুষ হয়ে গান্ধীজী ও গুরুদেবের কাছে আমার যা ঋণ তা যেন না-জেনে-পাওয়া কোন সম্পদের উত্তরাধিকার প্রত্যর্পণ।

এমন এক দরজা তা আমার ও আরো বহুজনের জন্যে মুক্ত করে দিয়েছে যা রুদ্ধ থাকলে সত্যের সঙ্গে আমাদের বিচ্ছেদ ঘটে। সত্য বলতে আমি এই বুঝি—সীমার তুচ্ছতা আর অসীমের শূন্যতা দৃষ্টিভ্রম ছাড়া কিছু নয়। এই দৃষ্টিভ্রম (দান্তের 'ফলসো ইমাজিনেয়ার') আমাদের সব বিচার বিকৃত করে পৃথিবীকে নরক করে তুলতে পারে। তাঁরা ধন্য যাঁরা এই নরক থেকে সম্পূর্ণ উদ্ধারে না হোক, ত্রাণ যেখানে দিয়ে পাওয়া সম্ভব সেই দরজা অন্ততঃ খুলতে আমাদের সাহায্য করেন। উপলব্ধি ছাড়া মুক্তির পথ নেই। সে পথ যদি পরিষ্কৃত হয়—ব্লেক বলেছেন তাহলে সব কিছু মানুষের কাছে অনন্ত বলে প্রতীয়মান হবে।

সান ইসিদ্রো-তে থাকবার সময় রবীন্দ্রনাথ আমায় কয়েকটি বাংলা কথা শিখিয়েছিলেন। আমি শুধু একটা কথাই মনে রেখেছি আর ভারতবর্ষকে সেই কথাই বলব—ভালোবাসা।

আত্মার ছাড়া আর কিছুর ইতিহাস নেই। ইতিহাস মানে শুধু আত্মারই ইতিহাস।

অনুবাদ: প্রেমেন্দ্র মিত্র

# বরপুত্র রবীন্দ্রনাথ

## সর্বপল্লী রাধাকৃষ্ণন

১৯৪০ সালের আগস্ট মাসে শান্তিনিকেতনে যে বিশেষ সমাবর্তনের অনুষ্ঠান হয়, তাতে স্যার মরিস গয়ার এবং আমি উভয়ে অক্সফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রতিনিধি হিসাবে উপস্থিত হই, রবীন্দ্রনাথকে 'ডক্টর অব্ লিটারেচার' উপাধিতে ভূষিত করবার জন্য। সেই মানপত্রে একটি উক্তি ছিল : 'সকল কলাদেবীর প্রিয়তম তুমি...'

রবীন্দ্রনাথ এমন ঘরে জন্মগ্রহণ করেন যেখানে সৃষ্টিকর্মের ধারা অব্যাহতভাবে চলেছে। তাঁর নিজেরই ভাষায় বলতে গেলে, 'আমরা লিখেছি, গান গেয়েছি, অভিনয় করেছি—সকল দিকেই নিজেদের যেন ঢেলে দিয়েছি।' কি সংগীতে, কি নৃত্যে, চিত্রকলায় আর সাহিত্যের প্রতিটি ক্ষেত্রে, কবির অতি-সূক্ষ্ম শিল্পচেতনা আর প্রতিভা আপনাকে উন্মুক্ত, বিকশিত করেছে। বর্তমান কালের মধ্যে এসিয়ায় যত কবির আবির্ভাব হয়েছে, তাঁদের মধ্যে নিঃসংশয়ে সবচেয়ে লব্ধপ্রতিষ্ঠ ও কীর্তিমান্ হলেন রবীন্দ্রনাথ। তাঁর রচনাবলী একাধিক ভাষায় অনূদিত হয়ে বহু দেশের সুধী ও সুলেখক, শিল্প ও সাহিত্যের রসগ্রাহী ভাবুক ও প্রেমিকের মনে প্রেরণা জুগিয়েছে।

কারয়িত্রী-প্রতিভার অধিকারী হয়ে কাব্য সংগীত ও চিত্রকর্মে তিনি প্রাক্তন সংস্কার কাটিয়ে নতুন পথ দেখিয়েছেন। ঐতিহ্য ও সংস্কার শুধু অতীতের সংগে সামঞ্জস্য নয়, প্রাক্তন থেকে মুক্তিও বটে। এ যাবৎ অলক্ষিত সংযোগ-সম্পর্কগুলিকে তিনি নতুন করে দেখলেন, আর বিশ্বমানবের সামনে এক অখণ্ড একাত্ম পৃথিবীর স্বপ্নচিত্র তুলে ধরলেন। নিখিল মানুষের ঐক্যসাধনার দৃঢ় প্রত্যয়ে, অপরিচিতের সংগে আত্মীয়-বন্ধনের চরম বিশ্বাসে, তাঁর মহান্ কল্পনা ও শিল্পকর্মের সমগ্র শক্তি তিনি নিয়োজিত করে গেছেন।

কবির ব্যক্তি-সত্তা ছিল প্রাণশক্তির দীপ্যমান আধার। দীর্ঘায়ত সুঠাম দেহ, রাজকীয় মহিমায় ভাস্বর। কুঞ্চিতকেশ শোভন-শ্মশ্রু এই শান্ত সমাহিত মূর্তি যাঁরা প্রত্যক্ষ করেছেন, তাঁরা সকলেই অভিভূত হয়েছেন। "Everyman remembers" নামক স্মৃতি-চিত্রগ্রন্থে আর্নেস্ট রিস্ লিখেছেন, 'একদিন সন্ধ্যায় দরজায় মৃদু করাঘাত হল। পরিচারিকা দরজা খুলেছে, আমিও হল্-এ ঢুকে এগিয়ে এসেছি। দেখি, চৌকাঠে দাঁড়িয়ে রয়েছেন আগন্তুক। সে এক আশ্চর্য আবির্ভাব! দীর্ঘ পুরুষদেহ, ধূসর শ্মশ্রু; পরনে এক আঁট-সাঁট ধূসর রঙের জোব্বা, পা পর্যন্ত ঝুলে নেমে এসেছে। ক্ষণিকের জন্য স্তম্ভিত হয়ে গেলাম, বাক্যস্ফূর্তি হল না। মনে হল যেন ধর্মগুরু স্বয়ং ইসেয়া আমার দুয়ারে অবতীর্ণ!'

আমরা সমকালীন ব্যক্তিদের যে দৃষ্টি দিয়ে বিচার করি, তার কিছুটা বিকৃত হয়ে

থাকে, এ রকম একটা ধারণা চলিত আছে। কেন না, প্রথমতঃ রয়েছে বন্ধুত্বের দায়—নিরপেক্ষ মত পোষণের প্রধান অন্তরায়। দ্বিতীয়তঃ, যে পরিপ্রেক্ষণের বিশেষ প্রয়োজন, তার অভাব প্রায়ই ঘটে থাকে। যাঁদের কর্ম ও জীবন আমাদের অতি ঘনিষ্ঠ, তাঁদের কৃতিত্বকে আমরা নিজেদের খেয়াল ও রুচি অনুযায়ী কখনও নামিয়ে দেখি, কখনও বা অতিরিক্ত মূল্য দিয়ে বসি। আজকের দিনে যাঁদের সার্থক বলে ভাবি, কিছুদিন পরে তাঁদের গুরুত্ব যায় কমে। আবার বর্তমানে যাঁরা তেমন আমল পান না, পরবর্তী কালে হয়তো তাঁদের অর্থগৌরব বৃদ্ধি পায়। সুতরাং ভারত তথা বিশ্বসম্পর্কে রবীন্দ্রনাথের যে ভবিষ্য কল্পনা, তা হয়তো সত্যদর্শীর ভবিষ্যদ্‌বাণীর মতোই একদিন সফল হয়ে উঠবে।

ভারতবাসী আমাদের কাছে রবীন্দ্রনাথের বাণী কতটা সারগর্ভ, তার জাজ্বল্য প্রমাণ হল ভারতের ঐতিহ্য। ইতিহাসের গুরুভারে আনত এই দেশ আক্রমণে ও লুণ্ঠনে কতবার বিধ্বস্ত হয়েছে, চরম উন্নতি আর অধোগতির মাঝখানে বার বার দোলায়িত হয়েছে। তবু যুগ যুগ ধরে সে সব সঙ্কট কাটিয়ে ওঠার সাধনায় আত্মিক শক্তির বলেই আবার স্বপ্রতিষ্ঠ হতে পেরেছে। নিজেকে ফিরে পাওয়ার এই নিরন্তর উদ্যম ও সাফল্য ভারতীয় ইতিহাসের পৌনঃপুনিক ঘটনা। যুগসন্ধির বিপর্যয়-কালেই ঘটে মহাপ্রাজ্ঞজনের আবির্ভাব, যাঁরা আমাদের বিচ্যুতি ও পতন সম্বন্ধে সাবধান করে দেন। উপনিষদের সত্যদ্রষ্টা ঋষিরা, বুদ্ধ ও মহাবীর, অশোক ও আকবর, কবীর এবং নানকের মতো বিজ্ঞপুরুষেরা নিজ নিজ সময়সীমায় তৎকালীন সমাজচেতনাকে জাগ্রত করেছেন। অধ্যাত্ম-সম্পদের মূল সত্যগুলি স্মরণ করিয়ে দিয়েছেন, ঋতাপসরণ আর স্বাধিকার-প্রমাদের জন্য তীব্র ভর্ৎসনা করেছেন। আমরা ভাগ্যবান্ যে আমাদের জীবদ্দশায় এমন কয়েকজন পুরুষ ও নারীর দর্শন পেয়েছি যাঁরা বিবেকে সাহসে অনন্য ও বলীয়ান্, যাঁরা মানুষের চিত্তশুদ্ধি ঘটিয়ে তার জীবনদৃষ্টিকে ভিন্ন পথে নিয়ন্ত্রিত করেছেন।

ভারতের মর্মবাণী প্রসঙ্গে রবীন্দ্রনাথ বলে গেছেন—'ভারতবর্ষকে আমি ভালোবাসি, এর অর্থ নয় আমি তার প্রকৃতি-পরিবেশকে প্রতিমার আসনে বসাতে চাই। ভারতের মাটিতে ভূমিষ্ঠ হয়েছি, সেই দৈব সুযোগের জন্যও নয়। ভারত যে তার মহান সন্ততিদের উদ্বুদ্ধ চেতনার অমৃতক্ষরণকে বহু কোলাহল বিপর্যয়ের মধ্যেও সযত্নে রক্ষা করে চলেছে, এইটিই আমার মমত্বের প্রকৃত কারণ।' জীবনে আমাদের একাধিক স্খলন থাকতে পারে, কিন্তু লেখায় কোনও অন্যায় কথা প্রকাশ করতে আমাদের স্বাভাবিক বিরূপতা আছে। গভীর বিনয়ের সঙ্গে রবীন্দ্রনাথ তাই বলেছেন,—'জীবনে যা কিছু করেছি, তার সবগুলি যে খাঁটি সত্য, এমন কথা বলি না। কিন্তু আমার কবিতায় যা বলেছি বা বলতে চেয়েছি, তার কোনোটাই মেকি নয়। ঐখানেই আমার দেবতার স্থান যেখানে জীবনের গভীরতম সত্যগুলি উদ্‌ঘাটিত হতে পেরেছে।' চিরদিনই তিনি উচ্চে, আরও উচ্চে, তাঁর লক্ষ্য নিবদ্ধ করেছেন,—

'হেথা যে গান গাইতে আসা আমার
হয় নি সে গান গাওয়া
আজও কেবলই সুর সাধা, আমার
কেবল গাইতে চাওয়া।'

(গীতাঞ্জলি)

৪

রবীন্দ্রনাথ কোনও বাণী বহনের দায়িত্ব নিয়ে আসেন নি। তাঁর মাহাত্ম্য, দিব্য সত্যের উন্মোধনে। সাধারণ জীবনের তুচ্ছতা ও গ্লানিকর আবহ থেকে মানুষকে তুলে ধরা, এমন এক লোকে তার উত্তরণ সম্ভব করে দেওয়া—যেখানে শাশ্বত গভীর সত্যগুলি আত্মপরতায়, নিঃসার কূটতর্কজালে মলিন ও আচ্ছন্ন হয়ে যায় নি, যেখানে মানুষের দৈনন্দিন অস্তিত্ব এক শক্তিমান্ পরম কাম্য জীবনে রূপায়িত হতে পারে—এইটেই আরও কঠিন কাজ, দুর্লভ কৃতিত্ব।

মানুষের মধ্যেই আছে ঈশ্বর-বিকাশ। আর সেই তার সত্তার দূরপনেয় ভিত্তি। এই মর্ম-প্রস্তরকে লঙ্ঘন করার সাধ্য তার নেই। পার্থিব সামগ্রীর আকর্ষণ ছেদন করার উর্ধ্বমুখী প্রয়াস, ইন্দ্রিয়জগৎ থেকে নিষ্ক্রান্ত হয়ে স্বার্থক্লিন্ন স্থূল বস্তুভার থেকে আত্মাকে মুক্ত করা, বাহিরের অন্ধকার ভেদ করে অন্তরালোক-তীর্থে আপনাকে পৌঁছে দেওয়ার চেষ্টা—এইটাই হল মানবের স্বধর্ম। মানব-প্রকৃতিতে রয়েছে সত্যের অন্বেষা, যা মিথ্যা ও বিভ্রমের মধ্যে মনকে বরাবর নিমজ্জিত রাখতে দেয় না, রয়েছে সত্যের তৃষ্ণা, যা কখনোই দীর্ঘকাল মনের অসত্য-লগ্ন হয়ে থাকাটা বরদাস্ত করে না।

রবীন্দ্রনাথ কোনও দিন দাবি করেন নি যে তিনি এক মৌলিক দর্শন উদ্‌ভাবন করেছেন। ভারতীয় ঐতিহ্য ও সংস্কার নিয়ে দার্শনিক আলোচনা কিংবা তত্ত্ব-বিশ্লেষণ তাঁর উদ্দেশ্য ছিল না। যা করতে চেয়েছেন ও করেছেন, তা হল সরস অলংকারে ঘরোয়া রূপকের সাহায্যে, নিজস্ব বাক্‌প্রতিমায় ঐতিহ্যের স্বরূপকে জীবন্ত ভাবে ফুটিয়ে তোলা এবং আধুনিক কালের জীবনের সঙ্গে তার সঙ্গতি কোথায় দেখিয়ে দেওয়া। আধ্যাত্মিক ভাবাদর্শকে নতুন করে বোঝানো ও ব্যাখ্যা করা ভারতীয় জীবন-ইতিহাসের একটা বড় বৈশিষ্ট্য আর সেইটাই এক ধরনের স্বতন্ত্র সৃষ্টির কাজ। ভাবুক ও শিল্পী রবীন্দ্রনাথ নিপুণ ব্যাখ্যাকার, তিনি সেই কাজই করে গেছেন। টাইম্‌স লিটারারি স্যাপ্লিমেণ্ট-পত্রিকায় তাঁর সম্বন্ধে যথার্থ মন্তব্য করা হয়েছিল : 'ভারতের এই মহান কবির চেয়ে বোধ হয় আর কোনও বর্তমান কবি এতটা ধর্মস্থ নন এবং কোনও ধার্মিক ব্যক্তিরই তাঁর মতো কবি-প্রবণতা নেই।'

যে যুগে বহু বুদ্ধিবাদী মানুষ ব্যক্তিগত সুখ-স্বাচ্ছন্দ্য, বিশ্বব্যাপী নৈরাশ্য, নিরাসক্তি আত্মস্থতা, এবং মৃদু, কখনও বা উগ্র, নাস্তিক্যবুদ্ধি নিয়েই তৃপ্ত, সে সময়ে রবীন্দ্রনাথই ভারতের সুপ্রাচীন শাস্ত্রবিধৃত অধ্যাত্ম-আদর্শের মূল্য এবং যাথার্থ্য সম্পর্কে প্রত্যয়শীল হতে পেরেছিলেন। তিনি বলেছিলেন : 'উপনিষদের শ্লোক আর বুদ্ধদেবের উপদেশগুলি আমার নিকট গভীর অন্তরলোকের বস্তু এবং সেই কারণেই তারা অনন্ত জীবনের বিস্তার-সম্ভাবনায় সমৃদ্ধ। আমার নিজের জীবনে তাদের বারবার ব্যবহার করেছি, শিক্ষাদানেও তাদের প্রয়োগ করে দেখেছি যে শুধু আমার কাছেই নয়, অপর জনের কাছেও তারা যথেষ্ট অর্থময়। আমার এই বিশেষ সাক্ষ্য ও সমর্থনের একটা মূল্য আছে, কারণ তার মধ্যে রয়েছে ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা।' তিনি জানতেন যে এই সব প্রাচীন উক্তি-উপদেশের মাধ্যমে যে প্রকৃত ধর্ম উন্মোচিত হয়েছে, তার ভিতর এমন একটি পরমত-সহিষ্ণু নিরভিমান সমাহিত শান্ত শ্রী আছে, যার আবেদন ভারতের বাইরে জনসমাজের চিত্তকেও স্পর্শ করেছে। তাই বলেছেন : ভারতবর্ষকে জানতে হলে সেই যুগে যেতে হবে যখন এ দেশ তার ভূগোল-সীমার উর্ধ্বে

উঠে আপন আত্মাকে উপলব্ধি করেছে, পূর্ব দিগন্ত ঝলমল-করা উদার আলোয় অবিনশ্বর সত্তাকে ব্যক্ত করেছে।

প্রেমালোকের এই অনির্বাণ বর্তিকা ভারতবর্ষই প্রাচীর গগনে জ্বালিয়ে রেখেছে। আর রবীন্দ্রনাথই জাতীয় স্মৃতিসম্পদকে পুনরুজ্জীবিত করে দেশবাসীকে গৌরবের অধিকার দিয়েছেন।

মানব-প্রকৃতির অন্তর্বিরোধ থেকে জন্মায় ধর্ম-সন্ধিৎসা, সত্যজিজ্ঞাসা। যেখানে কেউ অ-মৃত নয়, কিছুই চিরস্থায়ী নয়, সেই ভঙ্গুর জগতে আমরা কি করে নিশ্চিন্ততা ও স্থায়িত্ব পেতে পারি? নিশ্চিতির এই সন্ধান থেকেই উপলব্ধি করা যায় যে আমাদের মধ্যে এমন কিছু আছে যা প্রকৃতির চেয়ে বড়। জড়জগৎ আর মানসলোক—এ দুয়ের মাঝখানে সেতু বন্ধন করছে মানুষ নিজে। 'আমার সত্তার এক কোটিতে আমি মাটি ও পাথরের সঙ্গে একাত্ম, কিন্তু অপর প্রান্তে তাদের সব কিছু থেকে আমি পৃথক্, ভিন্ন।' এই বিকর্ষণ বা দ্বন্দ্বকে অতিক্রম করা আয়াসসাধ্য ও কষ্টকর—

জড়ায়ে আছে বাধা, ছাড়ায়ে যেতে চাই—<br>ছাড়াতে গেলে ব্যথা বাজে।

তোমারে আবরিয়া ধূলোতে ঢাকে হিয়া,<br>মরণ আনে রাশি রাশি—<br>আমি যে প্রাণ ভরি তাদের ঘৃণা করি,<br>তবুও তাই ভালোবাসি।

(গীতাঞ্জলি)

এই পৃথিবীর অন্তরালে অসীমের পরম সত্য যে বর্তমান, উদ্ধৃত বাক্যগুলি তারই সমর্থন।

শান্তম্, শিবম্, অদ্বৈতম্—অর্থাৎ পূর্ণতা, শান্তি ও অদ্বৈত-ভাব, এই ভাবে রবীন্দ্রনাথ ঈশ্বর বর্ণনা করেছেন। তিনি ব্যক্তিক, আবার অতি-ব্যক্তিক। তিনি ভিতরে ও বাহিরে; সকলের মধ্যে আবার সকলের ঊর্ধ্বে। কবি বলেছেন: এ বিষয়ে কথা বলার অধিকার আমার নেই, কিন্তু ধর্ম আমার কাছে প্রত্যক্ষ, বাস্তব সত্য। যদি কখনও কোনও ভাবে আমি ঈশ্বর কি, উপলব্ধি করতে পেরে থাকি কিংবা স্বপ্নদৃশ্যপটের মতো ঈশ্বরাভাস যদি সৌভাগ্যক্রমে আমার গোচরে এসে থাকে, তা হলে সে দৃষ্টি আমি পেয়েছি এই ধূলি-ধরণীতেই। বনস্পতি আর পশুপক্ষী, মানব ও বিশ্বের মাঝখান দিয়েই আমার এ বিশেষ দেখা সম্ভব হয়েছে।

উপনিষদের বাণীর সঙ্গে সুর মিলিয়ে রবীন্দ্রনাথ বলেছেন, পরমাত্মা মানুষের মধ্যেই বসতি করেন। ভাবের জন্ম ও রূপ-পরিগ্রহ ঘটে শিল্পীর হৃদয়লোকে, গোপন রহস্যের মতো। তাই তিনি লিখে গেছেন:

'যেটা যথার্থ চিন্তা করব, যথার্থ অনুভব করব, যথার্থ প্রাপ্ত হব, যথার্থরূপে প্রকাশ করাই তার একমাত্র স্বাভাবিক পরিণাম—এটা একেবারে আমার প্রকৃতিসিদ্ধ—ভিতরকার একটা চঞ্চল শক্তি ক্রমাগতই সেই দিকে কাজ করছে। অথচ সে শক্তিটা যে আমারই তা ঠিক মনে হয় না, মনে হয় সে একটা জগৎব্যাপ্ত শক্তি আমার ভিতর দিয়ে কাজ করছে। যে-সমস্ত

তর্কযুক্তি আমি আগে থাকতে ভেবে রাখি, তার মধ্যেও আমার আয়ত্তের বহির্ভূত আর-একটি পদার্থ এসে নিজের স্বভাব-মত কাজ করে এবং সমস্ত জিনিসটাকে মোটের উপরে আমার অচিন্ত্যপূর্ব করে দাঁড় করিয়ে দিয়ে যায়। সেই শক্তির হাতে মুগ্ধভাবে আত্মসমর্পণ করাই আমার জীবনের প্রধান আনন্দ।' (ছিন্নপত্রাবলী : শিলাইদহ। ১৩ই অগস্ট ১৮৯৪)
আরও বলেছেন : বললে হয়তো অহমিকার মত শোনাবে। কিন্তু যে শক্তির কথা বলছি, সেটা 'আমিত্বে'র চেয়েও বড় আমার গভীর ব্যক্তি-সত্ত্বার নিজস্ব বস্তু। তার কাছে আমাকে খাঁটি থাকতে হবে। লোকে যাকে সুখ বলে, তা যদি যায়—লোকে যদি আমায় ভুল বোঝে, ত্যাগ করে, ঘৃণাও করে—তবু সেই জীবনদাত্রী শক্তির প্রতি নিষ্ঠা আমার অটুট রাখতেই হবে।

জীবনে দেবতার প্রতিষ্ঠা আছে বলেই আমরা শুচিতা কামনা করি, সত্যকে পেতে ব্যগ্র হই। অস্তিত্বের গভীরে অন্তর-লোকে, আমাদের সত্যকারের শক্তি ও ঐশ্বর্য খুঁজতে হবে। সেই আত্মশক্তি-চর্চার ফলে আসে বিপদ ও ক্ষয়-ক্ষতির সম্মুখে আত্মস্থতা, লাভ-লোকসানের হিসাব-নিকাশ ছেড়ে স্বার্থত্যাগের প্রেরণা, মৃত্যুকে পরোয়া না করা আর সমষ্টির অঙ্গীভূত হয়ে মানব-সমাজের প্রতি আমাদের অগণিত কর্তব্যের দায়িত্ব গ্রহণ। প্রত্যেক মানুষেরই কিছু-না-কিছু অবকাশ থাকা দরকার, যেখানে সে নিজের সঙ্গে একটু একাকিত্ব পেতে পারে, যখন আপনার মধ্যে যা কিছু গোপন ও গভীরতম, তাকে মুখোমুখি চিনতে ও বুঝতে পারে। এল্‌মহার্স্ট সাহেবকে এক চিঠিতে তিনি লিখেছিলেন : আমার আত্মিক অস্তিত্বের চারপাশে নিঃসঙ্গতার একটা অসীম অবকাশ আছে। সেই নির্জনতার আবেষ্টন ভেদ করে আমার ব্যক্তিগত জীবনের কণ্ঠস্বর হয়তো প্রায়ই বন্ধু-বান্ধবের নিকটে পৌঁছায় না। তার জন্য, তাঁদের চেয়ে আমার বেদনাই বেশি। আর যে কোনও মানুষের মতোই আমারও প্রাণে ব্যাকুলতা জাগে এই ব্যক্তিগত জগৎকে কাছে পাওয়ার জন্য,—হয়তো বেশি করেই বাজে......

এই নির্জন ধ্যান ও তন্ময়তার শুচিকর মাহাত্ম্যে কবির আস্থা ছিল গভীর। সুদীর্ঘ জীবনের একটি দিনেও অনন্ত সত্যের সঙ্গে তাঁর সঙ্কেত-মিলন কিংবা অভিসার-লগ্ন ব্যর্থ বা ভ্রষ্ট হয় নি। তাই তাঁর নিবেদন ছিল বিরামহীন, 'আলো—আরও আলো'র জন্য প্রার্থনার অন্ত ছিল না।

দুঃখের বিষয়, আমাদের মতো অধিকাংশ মানুষ ঐ সব চিরন্তন সত্য, শাশ্বত মূল্যের প্রতি উদাসীন, বুঝি বা অন্ধ। তাই রবীন্দ্রনাথের মতো কবিরাই ঘোষণা করে থাকেন, অসীমের আলোক অলীক নয়। গানের সুরে নিমন্ত্রণ-লিপি পাঠান—যেন উন্মুখচিত্তে সেই আলোকের সংঘাতে স্পর্শে ও প্রভাবে আমরা নিজেকে খুলে দিই, স্নিগ্ধ স্নাত অভিষিক্ত হই। তাঁরই কবিতার অংশ উদ্ধৃত করে বলা যায়—

আলোকের পথে প্রভু, দাও দ্বার খুলে—
আলোক-পিয়াসী যারা আছে আঁখি তুলে,
প্রদোষের ছায়াতলে হারায়েছে দিশা,
সমুখে আসিছে ঘিরে নিরাশার নিশা।
নিখিল ভুবনে তব যারা আত্মহারা,
আঁধারের আবরণে খোঁজে ধ্রুবতারা,
তাহাদের দৃষ্টি আনো রূপের জগতে
আলোকের পথে।

৫

রবীন্দ্রনাথ ছিলেন পূর্ণতার অনুরাগী—জীবনের বহু দিকের বৈচিত্র্যের বিকাশই ছিল তাঁর লক্ষ্য। মোক্ষ সংসার-বিরাগ নয়, কায়মনোবাক্যের সুসমঞ্জস মিলন। দেহ মন আত্মার সম-বিকাশ। উপনিষদ্ বলেছেন : প্রাণারামং মন শান্তি সমৃদ্ধং অমৃতং।

আত্ম-সমাহিত মন কর্মহীন হয়ে থাকে না। 'আপনি প্রভু সৃষ্টিবাঁধন প'রে বাঁধা সবার কাছে।' জগতে যতদিন দুঃখ-দহন রইবে, ধর্মপরায়ণ ব্যক্তিরও কাজ থাকবে ততদিন এই পৃথিবীতে।

তপস্বিতা হল মনের একটা বিশেষ গঠন, একটি বিবিক্ত ভাব। 'নিবৃত্তরাগস্য গৃহং তপোবনং'। অনাসক্ত মানুষের কাছে গৃহই তপোবন। সংসার-ত্যাগের প্রয়োজন আবিশ্যক নয়—

"আমি হব না তাপস, হব না, যেমনি বলুন যিনি।
... ... ...
আমি ত্যজিব না ঘর, হব না বাহির উদাসীন সন্ন্যাসী,
যদি ঘরের বাহিরে না হাসে কেহই ভুবন-ভুলানো হাসি।
যদি না উড়ে নীলাঞ্চল
মধুর বাতাসে বিচঞ্চল
যদি না বাজে কাঁকন-মল রিনিক্‌ঝিনি,
আমি হব না তাপস, হব না, যদি না পাই গো তপস্বিনী।
আমি হব না তাপস, তোমার শপথ, যদি সে তপের বলে
কোনো নূতন ভুবন না পারি গড়িতে নূতন হৃদয়তলে।"

কবি আরও বলেছেন—

"বৈরাগ্যসাধনে মুক্তি, সে আমার নয়॥
অসংখ্য বন্ধন-মাঝে মহানন্দময়
লভিব মুক্তির স্বাদ।
... ...
ইন্দ্রিয়ের দ্বার
রুদ্ধ করি যোগাসন, সে নহে আমার।
যে-কিছু আনন্দ আছে দৃশ্যে গন্ধে গানে
তোমার আনন্দ রবে তার মাঝখানে॥

(নৈবেদ্য)

কবি অন্যত্রও বলেছেন : লক্ষ লক্ষ প্রাণী নিয়ে বিচিত্র এই বিশ্বের মেলা। আর ছেলেখেলা ভেবে, তোমরা তাকে অবহেলায় ফেলে যাও!

বিশ্বমানবের সঙ্গে একাত্মবোধই ঈশ্বরের সান্নিধ্যলাভ। "গীতাঞ্জলি"তে আছে

তিনি গেছেন যেথায় মাটি ভেঙে
করছে চাষা চাষ—
পাথর ভেঙে কাটছে যেথায় পথ,
খাটছে বারো মাস।
রৌদ্রে জলে আছেন সবার সাথে,

ধুলা তাঁহার লেগেছে দুই হাতে—
তাঁরি মতন শুচি বসন ছাড়ি
আয় রে ধুলার 'পরে॥
(গীতাঞ্জলি)

অধ্যাত্ম-দৃষ্টি, পূত হৃদয় এবং বিশ্বমৈত্রী—সরল ধর্মবোধের এই ধারাগুলি শতাব্দ-কালক্রমে ধীরে ধীরে রুদ্ধ হয়ে গিয়েছে, দেশের অবনতি ঘটিয়েছে। চারি দিকের এই পুঞ্জীভূত গোঁড়ামি ও সংস্কারের বিরুদ্ধে রবীন্দ্রনাথ উঠে দাঁড়িয়েছিলেন, বলেছিলেন ভারতের অধোগতির মূল কারণ এই জাতিভেদ ও ধর্মবিরোধ, বঞ্চিত ও রিক্তদের প্রতি চরম উদাসীনতা। যাঁরা সত্যকারের ধার্মিক, তাঁরা চিরদিনই ঐ সব পিষ্ট ও নির্যাতিত, খাপছাড়া আর অবিশ্বাসী, গৃহহারা ও পরিত্যক্তদের উপর স্নেহ-মমতা ঢেলে দিয়েছেন। আজকের দিনে একেবারে অচল অসঙ্গত সংস্কারগুলোর প্রামাণ্যের উপর শিথিল নির্ভরতায় যত সব সামাজিক বিধি-নিষেধ মাথা পেতে মেনে নিয়েছি বলেই আমাদের এত দুর্দশা। জাতির সবচেয়ে বড় শত্রু বিদেশী অরি নয়, অন্তরের বৈরিদল। নিজেদের কবল থেকে আমাদের নিজেদেরই বাঁচাতে হবে—

হে মোর দুর্ভাগা দেশ, যাদের করেছ অপমান
অপমানে হতে হবে তাহাদের সবার সমান।
মানুষের অধিকারে
বঞ্চিত করেছ যারে,
সম্মুখে দাঁড়ায়ে রেখে তবু কোলে দাও নাই স্থান,
অপমানে হতে হবে তাহাদের সবার সমান।
(গীতাঞ্জলি)

ঈশ্বরের মহান্ সৃষ্টি এই বিশ্বসমাজে অস্পৃশ্য বলে কিছু নেই। নগ্ন ক্ষুধার্ত আতুর অপরিচিত, সকলের কাছে আমাদের প্রেম পৌঁছে দিতে হবে—

যেথায় থাকে সবার অধম দীনের হতে দীন
সেইখানে যে চরণ তোমার রাজে
সবার পিছে, সবার নীচে,
সব-হারাদের মাঝে　　　　(গীতাঞ্জলি)

কবি আরও বলেছেন—তোমায় যখন আঘাত হেনে বিদ্ধ করে, সে বেদনা যে আমারও।

রবীন্দ্রনাথ দেশবাসীদের আহ্বান জানিয়েছেন—সেই মূল মানবধর্মে আবার প্রতিষ্ঠিত হতে। যন্ত্রবৎ জীবন পরিচালনা থেকে আত্মরক্ষা করা যেমন দরকার, জীবনকে স্বাধীন ও স্বচ্ছন্দ গতিশীল রূপ দেওয়া তেমনি এক মানবিক দায়িত্ব : 'ভারতের জরাবিহীন জাগ্রত ভগবান আজ আমাদের আত্মাকে আহ্বান করিতেছেন, যে আত্মা অপরিমেয়, যে আত্মা অপরাজিত, অমৃতলোকে যাহার অনন্ত অধিকার, অথচ যে আত্মা আজ অন্ধপ্রথা ও প্রভুত্বের অপমানে ধুলায় মুখ লুকাইয়া। আঘাতের পর আঘাত বেদনার পর বেদনা দিয়া তিনি ডাকিতেছেন, আত্মানং বিদ্ধি। আপনাকে জানো। (কর্তার ইচ্ছায় কর্ম)

৭

শান্তির নীড় শান্তিনিকেতনে পিতা দেবেন্দ্রনাথ ঈশ্বর-আরাধনার জন্য একটি আশ্রম প্রতিষ্ঠা করেন। রবীন্দ্রনাথ সেই আশ্রমকে কেন্দ্র করে স্থাপনা করলেন একটি বিদ্যাপীঠ। এই বিদ্যালয়ের কথা ভাবলেই মনে পড়ে আমাদের প্রাচীন তপোবনগুলি, যেখানে গুরু-শিষ্যদল ভূয়োদর্শী ধ্যান-ধারণা, সাধুজীবন আর গভীর ধর্মবিশ্বাসের মাধ্যমে মুক্তির পথ সন্ধান করেছিলেন, আত্মজ্ঞান লাভ করেছিলেন। শান্তিনিকেতনে এই ব্রহ্মচর্য-আশ্রমে কোনও প্রাণিহত্যা, কোনও প্রতিমা-পূজা যেমন নিষিদ্ধ, অপর ধর্মের দেবতা বা উপাসনা-সম্পর্কে কোনও অশ্রদ্ধেয় মন্তব্য তেমনি গর্হিত। যদিও এই বিদ্যালয়ের যা-কিছু কর্ম অনুষ্ঠান হিন্দু ঐতিহ্য অনুসারেই চালিত হয়, তবু বুদ্ধ খৃষ্ট মহম্মদ নানক প্রভৃতি মহা-পুরুষদের জন্মদিনের স্মারক উৎসব শ্রদ্ধার সঙ্গেই পালিত হয়ে থাকে।

রবীন্দ্রনাথ ভারতবর্ষকে ভালোবেসেছিলেন তার আদর্শ-নিষ্ঠার জন্য। তিনি বলেছেন: ভারতবর্ষ আমার প্রিয় ভূমি, যে হেতু এ দেশ আমার কাছে একটা ভৌগোলিক আকারমাত্র নয়, ধারণার বস্তু। অতএব প্রচলিত অর্থে আমাকে দেশপ্রেমিক বলা চলে না। নিখিল মানবসমাজ থেকেই আমার সঙ্গী সাথী খুঁজতে হবে।

কবির মূল প্রেরণা যদি চ ভারতবর্ষই জুগিয়েছে, তাঁর সৃষ্টির আবেদন বিশ্বজনীন। যুগ যুগান্ত ধরে এ দেশ আত্মস্থিতি, বীর্য, ধর্মবোধ, পরমতসহিষ্ণুতা আর আতিথ্যনিষ্ঠার জন্য প্রসিদ্ধি লাভ করে এসেছে। মাঝে মাঝে আদর্শচ্যুতি ঘটেছে, এ কথাও সত্য। তবে পুরনো কাঠামোকে একেবারে বর্জন না করে তাকে দৃঢ় করে তোলা আর বাহিরের প্রভাব ও সংস্পর্শকে বিচার-বুদ্ধি দিয়ে প্রয়োজন-অনুসারে নিজের করে নেওয়া—এই মনোভঙ্গী আমাদের অর্জন করা যে দরকার, রবীন্দ্রনাথ সে কথা একাধিক বার বলেছেন। 'সমাজের প্রাচীন মহৎ স্মৃতি, বৃহৎ ভাব ও কীর্তিকে' রক্ষা করা অথচ 'বর্তমানের সহিত সন্ধি' করে 'নূতন সংঘর্ষকে' স্বীকার করা অর্থাৎ 'ভাবসূত্রটিকে রক্ষা' করে 'সচেতন ভাবে এক কালের সহিত আর-এক কালকে' মিলিয়ে নেওয়া—এই হল রবীন্দ্রনাথের ঈপ্সিত 'কর্মযোগ'। তাঁর মতে, নিজস্ব সম্পদ ত্যাগ করে বিদেশীর 'প্রসাদভিক্ষা'র চেয়ে চরম কাঙালপনা আর নেই। আবার ঠিক তেমনি, যা-কিছু বিদেশী সব বর্জনীয়, এই ভেবে নিজেদের খাটো করার মতো পরম লজ্জাকর গ্লানি আর কিছু থাকতে পারে না। পাশ্চাত্ত্যের অন্ধ মোহে ভারতের অনুকরণ-প্রবৃত্তিকে তিনি তীব্র নিন্দা করেছেন। বলেছেন, অপরের আবর্জনাকুণ্ড থেকে ভারতবাসী যেন 'পরিত্যক্ত ছিন্নবস্ত্র' আহরণ করে চলেছে।

'নকলের নাকাল' প্রসঙ্গে রবীন্দ্রনাথ মন্তব্য করেছেন : অনুকরণ জিনিসটা হচ্ছে,—অপরের চর্ম দিয়ে নিজের কঙ্কাল আচ্ছাদন। ফলে যা দাঁড়ায়, তা প্রতি মুহূর্তে ত্বক্ আর অস্থির মধ্যে লোমহর্ষণ অনন্ত ঘর্ষণ! ভারতবর্ষ অপরের কাছে এই ব্যর্থ দাসত্ব পরিত্যাগ করুক। জগতের বিভিন্ন মানুষ-জাতিকে একত্র বন্ধনের মহৎ ব্রতে আপনাকে নিযুক্ত করুক। ঐক্যই পরম সত্য, বিভেদ অকল্যাণ। কবি বলেছেন : 'বহুর মধ্যে ঐক্য-উপলব্ধি বিচিত্রের মধ্যে ঐক্য-স্থাপন—ইহাই ভারতবর্ষের অন্তর্নিহিত ধর্ম।' ভারত কি ভাবে চিরকাল মিলনের এই সূত্রটিকে বজায় রেখেছে, সে কথা স্মরণ করিয়েছেন। বলেছেন, নানা বিপর্যয় ও বিরোধের সম্মুখীন হয়েও পরকে শত্রুকল্পনায় ত্যাগ না করে একটি বৃহৎ সমন্বয়-ব্যবস্থার মধ্যে সকলকেই স্থান দিতে চেয়েছে। প্রত্যেক নূতন সংঘাতে আপনাকে বিস্তার

করতে পেরেছে বলেই ভারত আজও টি'কে আছে। সেই ভারতবর্ষের উপর কবির ছিল অটল বিশ্বাস। এখনও পর্যন্ত এ দেশ ধীরে ধীরে পুরাতনের সঙ্গে নবীনের এক আশ্চর্য আপস সাধন করে চলেছে। প্রত্যেকেই এই 'চেতনার কার্যে' যোগদান করুক। নিষ্প্রাণতায় কিংবা প্রতিরোধ-স্পৃহায় ভুল পথে চালিত হয়ে এই 'বাহিরের সহিত ভিতরের সামঞ্জস্য-চেষ্টা' যেন ব্যর্থ না হয়, এই ছিল তাঁর গভীর প্রত্যাশা।

একটি মহৎ আদর্শকে কার্যে পরিণত করার জন্য রবীন্দ্রনাথ আজীবন সাধনা করেছেন। সেই আদর্শ হল, সহানুভূতি ও অন্তর-মিলন, সত্য ও প্রেমের ভিত্তিতে মানব-সমাজের বিভিন্ন অংশের ঐক্য-বন্ধন। তাঁর 'বিশ্বভারতী' এমনই এক আন্তর্জাতিক বিশ্ববিদ্যালয়, যেখানে নিখিল মানব যুক্ত হয়েছে একটি সুপরিকল্পিত নীড়ে—'যত্র বিশ্বং ভবতি একনীড়ং'। এই প্রতিষ্ঠানে তিনি বিশ্ববোধের এক মানসভূমি রচনা করতে চেয়েছিলেন যাতে শিক্ষার্থীরা প্রতীচ্য ও প্রাচ্য সভ্যতার মধ্যে গভীর মিলগুলি বুঝতে পারে, পরস্পর-যুক্ত মানবসমাজের স্বরূপ-চেতনায় দীক্ষিত হয়। টমাস হার্ডি একবার বলেছিলেন : 'জগতের সমস্যা সমাধানের একমাত্র উপায়—বিভিন্ন দেশ ও জাতির ভাব-বিনিময়।' আমাদের প্রাচীন ঋষিরা জাতি ও ধর্মগত সঙ্কীর্ণতার প্রশ্রয়ে তাঁদের উদার মানব-দৃষ্টিকে খণ্ডিত বিকৃত করেননি। মানুষের মধ্যেই আমরা ভূমাকে প্রত্যক্ষ করি। সকল মানুষের নির্বিরোধ সখ্যেই বিকশিত হতে পারে মানব-সত্তার চিরন্তন রূপ। কিন্তু রবীন্দ্রনাথ তাঁর জীবদ্দশায় প্রত্যক্ষ করলেন এ পৃথিবীর তপ্ত রুধির-স্নান। দেখে গেলেন, মানুষেরই মোহান্ধ নির্বুদ্ধিতায় মৃত্যুর চেয়ে তিক্ত নির্মম বেদনার অশ্রুসমুদ্র। সভ্যতার ক্ষয়িষ্ণু মুমূর্ষু অবস্থায় দেখা দেয় অবক্ষয়ের চরম লক্ষণ—মানবিক মূল্যবোধের প্রতি অসীম উদাসীনতা। গৃধ্নুতায়, স্থূলবস্তু-প্রীতিবশে ঘটে আত্মার বিনাশ, সংস্কৃতির অধোগতি।

১৯৪১ সালে, মৃত্যুর কয়েক সপ্তাহ আগে, অশীতিতম জন্মদিনে রবীন্দ্রনাথ 'সভ্যতার সংকট' নামে এক প্রবন্ধ লেখেন। তাতে তিনি বলেন—

'জীবনের প্রথম আরম্ভে সমস্ত মন থেকে বিশ্বাস করেছিলুম য়ুরোপের সম্পদ—অন্তরের এই সভ্যতার দানকে। আর আজ আমার বিদায়ের দিনে সে বিশ্বাস একেবারে দেউলিয়া হয়ে গেল। আজ পারের দিকে যাত্রা করেছি—পিছনের ঘাটে কী দেখে এলুম, কী রেখে এলুম—ইতিহাসের কী অকিঞ্চিৎকর উচ্ছিষ্ট-সভ্যতাভিমানের পরিকীর্ণ ভগ্নস্তূপ।'

তবু মানুষের ভবিষ্যতে তাঁর আস্থা একটুও ম্লান হয়নি। তাই আবার বলেছেন—'কিন্তু, মানুষের প্রতি বিশ্বাস হারানো পাপ, সে বিশ্বাস শেষ পর্যন্ত রক্ষা করব। আশা করব মহাপ্রলয়ের পরে বৈরাগ্যের মেঘমুক্ত আকাশে ইতিহাসের একটি নির্মল আত্মপ্রকাশ হয়তো আরম্ভ হবে......'

শত সহস্র বৎসরের ভারে আনমিত এই পৃথ্বী বাত্যাবর্ষণে বিধ্বস্ত হয়েও জীবনের জয়যাত্রার জন্য নিত্য প্রস্তুত হয়। মানব-প্রকৃতির মধ্যে একটি কঠোর সহনশীলতা আছে। অপরাজেয় এই মানবধর্ম হয়তো পারমাণবিক শক্তিসংঘর্ষের পরও টি'কে থাকবে। নিদারুণ

কষ্ট আর অপমানের ভয়াবহ মূল্য দিয়েও 'অগ্রসর হবে তার মহৎ মর্যাদা ফিরে পাবার পথে।' এই বিপর্যয় ঠেকানো সম্ভব হবে কি না সে বিষয়ে নিশ্চিত না হয়েও রবীন্দ্রনাথ পরাভবকে চরম বলে বিশ্বাস করতে চাননি। বলেছিলেন, আমাদের চিন্তার আচরণের সর্ববিধ ভঙ্গীতে আমূল পরিবর্তন আনতে হবে। অদৃষ্টের হাতে আমরা তো অসহায় ক্রীড়নক নই—

আর সকলেরে তুমি দাও
শুধু মোর কাছে তুমি চাও।

(বলাকা)

আকস্মিক নয়, দৈবও নয়; আমাদের অপূর্ণতা অক্ষমতাই আমাদের বর্তমান পরিস্থিতি রচনা করেছে। ভবিষ্যতের দায়িত্ব আমাদেরই হাতে। অশিক্ষা বিদ্বেষ এবং স্বার্থপরতার উৎস থেকে যা জন্মায়, সেই কৃতকর্মের বিলোপ ঘটিয়ে আমাদের আর-এক নূতন যুক্তিভিত্তিক সভ্য সমাজ-শৃঙ্খলা গড়তে হবে।

১৯৩৭ সালে তাঁর জন্মদিবসের কিছু পূর্বে লিখিত এক কবিতায় রবীন্দ্রনাথ বলেছেন যে মানব-প্রীতিই তাঁকে বাঁচিয়ে রেখেছে। বেদনার্ত নিপীড়িত অপমানিত মানবাত্মার প্রতি অসীম মমত্বই এক মুমূর্ষু সভ্যতার ধ্বংস ও বিনষ্টির ঊর্ধ্বে তাঁকে স্থান দিয়েছে—

ঐ মহামানব আসে;
দিকে দিকে রোমাঞ্চ লাগে
মর্ত্য ধূলির ঘাসে ঘাসে।
সুরলোকে বেজে ওঠে শঙ্খ,
নরলোকে বাজে জয়ডঙ্ক
এল মহাজন্মের লগ্ন।
আজি অমারাত্রির দুর্গতোরণ যত
ধূলিতলে হয়ে গেল ভগ্ন।
উদয়শিখরে জাগে মাভৈঃ মাভৈঃ রব
নবজীবনের আশ্বাসে।
জয় জয় জয়রে মানব-অভ্যুদয়,
মন্দ্রি উঠিল মহাকাশে॥

(নববর্ষ ১৩৪৮)

সে সময়ে ভারতে ও বাহিরে বিশ্বে যে ঝড় বইছিল, তাতেও কবির সুচির প্রত্যয় এবং আত্মসমাহিতি অটল ছিল। বলেছিলেন, যে সব কারণে মনে অবসাদ ও নৈরাশ্য জাগে, সেগুলি কুজ্‌ঝটিকা। আর সেই কুয়াসার আস্তরণ ভেদ করে যখন সৌন্দর্যের ক্ষণিক রশ্মি আত্মপ্রকাশ করে, তখন বুঝতে পারি শান্তিই সত্য, দ্বন্দ্ব মিথ্যা। প্রেম সত্য, হিংসা অসত্য। আর বিচ্ছিন্ন বিভিন্নতায় নয়, ঐক্যেই পরম সত্য।

১৯১৯ সালে ১২ই এপ্রিল তারিখে রবীন্দ্রনাথ গান্ধীজীকে যে চিঠি লেখেন, তার শেষ করেছিলেন এই আবাহন জানিয়ে—

Give me the supreme courage of love, this is my prayer,
the courage to speak, to do, to suffer at thy will,

to leave all things or be left alone...
Give me the supreme faith of love, this is my prayer,
the faith of life in death, of the victory in defeat,
of the power hidden in the frailness of beauty, of the
dignity of pain that accepts hurt, but disdains to
return it.

জগতের আজ বড় প্রয়োজন এই উদারদৃষ্টি বিশ্বপ্রেমের।

হাঙ্গেরিতে ব্যালাটন হ্রদের কাছে কবি তখন বাস করছিলেন, অসুখের পর আরোগ্য কামনায়। সেখানে ১৯২৬ সালে ৮ই নভেম্বর তারিখে, তিনি এক বৃক্ষরোপণ করেন। অতিথিদের খাতায় নিম্নলিখিত চরণগুলি লিখে দেন—

হে তরু এ ধরাতলে
রহিব না যবে
তখন বসন্তে নব
পল্লবে পল্লবে
তোমার মর্মরধ্বনি
পথিকেরে কবে
ভালোবেসেছিল কবি
বেঁচে ছিল যবে।

বহুবিচিত্র গভীর ব্যঞ্জনাময় তাঁর সকল রচনাতেই এই মানবাত্মার কথা তিনি লিখে গেছেন, যে আত্মা অবিনশ্বর। তাঁর শ্রেষ্ঠ কবিতাগুলিতে এমন সব জিনিস আছে যা হৃদয়কে গভীরভাবে নাড়া দেয়, মনকে পূর্ণ করে তোলে, যার আবেদন সময়ের সীমা অতিক্রম করে শাশ্বত হয়ে থাকবে। মানুষের কর্ম সম্বন্ধে টলস্টয় একবার বলেছিলেন, 'কিছুই থাকবে না—না অর্থ, না প্রতিপত্তি। বিরাট সম্পদ, এমন কি বিশাল রাজ্য—সকলেরই বিনাশ অবশ্যম্ভাবী। কিন্তু আমাদের সৃষ্টিতে যদি সত্যকারের শিল্পের একটি স্পর্শকণাও লেগে থাকে, তবেই তা সার্থক, মৃত্যুঞ্জয়।'

জয়ন্তি তে সুকৃতিনো রসসিদ্ধাঃ কবীশ্বরাঃ
নাস্তি যেষাম্ যশঃকায়ে জরামরণজম্ ভয়ম্।

অনুবাদ: বিমলাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়

# রবীন্দ্রনাথ ও জাতীয়তাবাদ

## আইজায়া বার্লিন

ভারতীয় সভ্যতা সম্পর্কে, এমনকি তার শ্রেষ্ঠ সম্পদ্‌গুলি সম্পর্কেও আমি অজ্ঞ। স্বপক্ষে শুধু এইটুকুই বলতে পারি, যে দুটি সংস্কৃতির মধ্যে ভৌগোলিক এবং ঐতিহাসিক ব্যবধান যেখানে অগাধ, সেখানে সেতুরচনার কাজ সত্যই দুরূহ। আর তা ছাড়া কোনও সংস্কৃতির সার্থকতম যে দান, যেখানে তার বাণী সবচেয়ে সত্য এবং স্পষ্ট, সে হ'ল শিল্পকলা। সেই শিল্পকলাকে বিদেশী মাধ্যমে রূপান্তরিত করা কঠিন। আমার মতো যাঁরা ইংলণ্ডে শিক্ষা-লাভ করেছেন, তাঁরা জানেন গ্রীস্-রোমের সাহিত্য সম্বন্ধেও এ কথা প্রযোজ্য। পাশ্চাত্ত্য সভ্যতার তারা উৎসস্থল। পুরুষানুক্রমে আবহমান কাল থেকে তারা আমাদের কাছে পরিবেশিত হ'চ্ছে। কিন্তু তবুও হোমার বা ইস্‌কিলস্ বা ভার্জিলের ইংরেজি অনুবাদে যতই সৌষ্ঠব থাক না কেন, মূল রচনার সে দীপ্তি পাওয়া যায় না। আর একটু স্পষ্ট করে বলতে পারি, যে কোনও কবিতার অনুবাদেই কেউ কখনও প্রতিভার স্পর্শ পায়নি। গদ্য বর্ণনায়, যেখানে হৃদয়মনের বিশেষ কোনও অবস্থা, অথবা কোনও তত্ত্ব, অথবা মানবসাধারণের সুপরিচিত কোনও পরিস্থিতির কথা বলা হ'চ্ছে, সেখানে অনুবাদেও অনেকখানি আভাস দেওয়া যায়। টল্‌স্টয়ের প্রতিভাকে চিনতে হ'লে রুষভাষা না পড়লেও চলে,. বাইব্‌ল্-এর সৌন্দর্যে মুগ্ধ হ'তে হ'লে হিব্রু এবং গ্রীক্ জানতে হয় না। নাট্যসাহিত্য সম্পর্কেও এ কথা কিছুটা সত্য, কারণ চিরন্তন মানবসাধারণের পরিচিত চরিত্র এবং কীর্তিকলাপই তার সামগ্রী। এবং এ কথা কেউ অস্বীকার করবে না যে শেক্সপিয়রের বিভিন্ন ভাষার অনুবাদ ফরাসী, জার্মান, রুষ জাতির ওপরে অসামান্য প্রভাব বিস্তার করেছে; মলিয়ের, শিলার, ইব্‌সেন—এ'রা কবি হ'লেও বিদেশী পটে এ'দের রচনা রূপান্তরিত করা যায়। কিন্তু সে ক্ষেত্রেও, যাঁদের নাটকের কাব্যরস প্রধানতঃ শব্দগুলিকে আশ্রয় করেছে—যেমন রাসীন্, কর্নেই, বোধহয় কল্‌ডেরনও এবং আধুনিক নাট্যকাব্যের প্রতিনিধি য়েট্‌স্, হফ্‌মান্‌শ্‌ঠাল, এলিয়ট, লর্‌কা, ক্লোদেল—এ'দের নাটক অনুবাদে তেমন সাড়া দেয় না। যদি মূল রচনাগুলির সঙ্গে আমাদের পরিচয় থাকে, তাহলে হয়তো আমরা অনুবাদের প্রশংসা ক'রে থাকি, অনুবাদকের কৌশল ও বিচক্ষণতায় মুগ্ধ হই। কিন্তু আমি মনে করি অনুবাদটি স্বয়ং একটি স্বাধীন কাব্যসৃষ্টি না হ'লে অল্প লোকেই তার দ্বারা বাস্তবিকই অভিভূত হয়। এবং সে ক্ষেত্রে এই রূপান্তরিত রচনাটি অনুবাদকের কল্পনা ও প্রতিভার কাছেও ঋণী, কাজেই সে ভিন্ন ব্যাপার। এরকম রূপান্তর প্রশংসনীয়, কখনও কখনও চমৎকারও বটে, কিন্তু সে তো এক নতুন সৃষ্টি, সে তো সেতু নয়, নয় সেই বিশ্বস্ত আত্মবিলোপ—মূল শিল্পের প্রকৃতির কাছে যা অভিনেতাদের মতো তদ্গতচিত্ত অনুবাদকেরা ক'রে থাকেন। বিশুদ্ধ কবিতার বেলা একথা সবচেয়ে সত্য। গদ্য বা নাট্যসাহিত্যের ধরনে অনুবাদ এখানে প্রায় অসাধ্য। কবিতা থাকে শব্দের মধ্যে, একটি বিশেষ ধরনের ভাব ও প্রাণের ভঙ্গী থেকে তারা জন্ম নেয় এবং শুধু সেই ভাষায় যারা ভাবতে এবং অনুভব করতে পারে, সে ভাষা তাদের মাতৃভাষা হোক আর নাই হোক, শুধু তাদের কাছেই তার বাণী সঞ্চারিত হ'তে পারে। 'অনুবাদে যা হারিয়ে যায় তাই হ'ল কবিতা'। আমেরিকার কবি রবার্ট্ ফ্রস্টের নামে প্রচলিত এই উক্তিটির

মধ্যে যথার্থ সত্য আছে ব'লে আমি মনে করি।

একথা বলার প্রথম উদ্দেশ্য ভারতীয় সাহিত্য সম্পর্কে আমার অজ্ঞতার দোষ লাঘব করা। আমি সামান্য যেটুকু জানি, তাও অনুবাদের ঘষা কাচের মধ্য দিয়ে। এবং তা থেকে মনে হয় ভারতীয় সাহিত্যের প্রকৃতি কি গদ্যে, কি মহাকাব্যে, কি দর্শনে—প্রধানতঃ কাব্যিক, এমনকি গীতিধর্মী। অবশ্য এ আলোচনা আমার বিষয়ের কেন্দ্রস্থলেও নিয়ে এল, অর্থাৎ রবীন্দ্রনাথ—'রবীন্দ্রনাথ এবং জাতীয়তাবোধ'। জাতি জিনিসটার যদিও নানা উপাদান, নানা দিক, নানা চিহ্ন আছে, তবু তার মধ্যে একটা শক্তিশালী, বোধহয় সবচেয়ে শক্তিশালী উপাদান হ'ল ভাষা। ঐতিহাসিক, সামাজিক এবং ভৌগোলিক প্রভৃতি অন্যান্য উপাদানের সমন্বয় তাকে খর্ব করতে পারে, কিন্তু তার শক্তিকে তাই ব'লে অস্বীকার করা যায় না। মানুষ যত পরিণত ও আত্ম-সচেতন হয়, তত বেশি সে ইন্দ্রিয়রূপকল্পের বদলে ভাষার সাহায্যে চিন্তা ও অনুভব করে। প্রসিদ্ধ অর্থনীতিবিদ্ লর্ড কেন্‌স্‌কে একবার প্রশ্ন করা হয়েছিল তিনি কিসের সাহায্যে ভাবেন—শব্দের সাহায্যে, না রূপকল্পের সাহায্যে। তাতে তিনি বলেছিলেন, 'আমি ভাবের সাহায্যে ভাবি।' মজার উত্তর, কিন্তু সত্যি নয়, বোধহয় কোন গুরুত্ব দেবার জন্যেও নয় ঃ প্রায় অর্থহীন বললেই চলে। আমরা হয় শব্দ দিয়ে, নয়তো রূপকল্প দিয়ে চিন্তা করি; শোনা যায় যে শিশুরা, আদিম মানুষেরা, শিল্পীরা এবং সম্ভবতঃ মেয়েরাও, শব্দের চেয়ে রূপকল্পের সাহায্যেই বেশি ভাবেন। কিন্তু যেই আমরা সুসম্বন্ধভাবে ভাব ব্যক্ত করতে থাকি, অমনি আমাদের প্রচলিত প্রতীকের সাহায্য নিতে হয়—এবং প্রধানতঃ তা ভাষা। ভাষার ওপর রবীন্দ্রনাথের ছিল অসাধারণ দখল, এবং আমার মনে হয় সামাজিক ও রাজনৈতিক জীবনের সঙ্গে ভাষার যোগ সম্পর্কে তিনি অনেক কথা বলেছেন—আজকের দিনে তার প্রগাঢ় মূল্য আছে।

জাতীয়তাবাদকে আমি প্রশংসা বা নিন্দা করতে চাই না। জাতীয়তাবাদের নামে বহু মহান্ কীর্তি এবং নিদারুণ পাপ সংঘটিত হয়েছে। বর্তমানে ভাঙনের একমাত্র কারণ এ-ই নয়, আরও বহু রাজনৈতিক ধর্মনৈতিক মতবাদ আছে, শক্তিমত্তার লালসা আছে, এবং জাতীয়তাবাদী নয় এমন স্বার্থ আছে যা ঠিক একই রকম বৈপ্লবিক, বর্বরোচিত এবং দুর্দান্ত। তা হ'লেও আজকের জগতে জাতীয়তাবাদই প্রবলতম শক্তি ব'লে আমার মনে হয়। য়ুরোপেই প্রথম এর প্রচণ্ড উৎক্ষেপ—ফরাসী বিপ্লবের অন্যতম পরিণামস্বরূপ—সেখানে আরও কতকগুলো শক্তির সঙ্গে মিলেই এ কাজ ক'রে এসেছে—যেমন গণতন্ত্র, স্বাতন্ত্র্যবাদ, সাম্রাজ্যবাদ। কিন্তু যেখানেই এদের নিজেদের মধ্যে বিরোধ ঘটেছে, সেখানেই জাতীয়তাবাদ অবশ্যম্ভাবীরূপে জয়ী হয়েছে এবং তার প্রতিদ্বন্দ্বীদের পরাস্ত ক'রে নিস্তেজ ক'রে ফেলেছে। জর্মান রোমাণ্টিকবাদ, ফরাসী সমাজবাদ, ইংরেজী স্বাতন্ত্র্যবাদ, য়ুরোপীয় গণ-তন্ত্রবাদ, সব জাতীয়তাবাদ দ্বারা খর্ব এবং বিকৃত হয়েছে। জাতীয়তাবাদের দম্ভ এবং লোভের যে স্রোত ১৯১৪-র সংঘাতে পর্যবসিত হয়েছিল, তার কাছে এরা সবাই পরাস্ত হয়েছিল। যারা জাতীয়তাবাদের শক্তিকে ছোট ভেবেছিল, যেমন নর্মান্ এঞ্জেল বা লেনিন বা কৌলিক সাম্রাজ্যবাদীরা বা বিশ্বপুঁজিবাদীরা—এবং সর্বোপরি যারাই ভেবেছিল যে এর শক্তিকে তারা নিজেদের প্রয়োজনমতো কাজে লাগাতে পারবে, তারা সবাই ঘটনার ধারা বুঝতে ভুল করেছিল এবং সাজা পেয়েছিল। দৃষ্টান্তস্বরূপ বলা যায়, আজকের দিনে সাম্যবাদ নিশ্চয় একটি বিপুল শক্তি, কিন্তু জাতীয়তাবোধ ছাড়া সে ঠিক এগোতে পারে না। চীনে অথবা এসিয়ার যে সব অঞ্চল একদা ফরাসী বা ওলন্দাজশাসিত ছিল সেইসব দেশে,

আফ্রিকায়, কিউবায় আজ তাই ঘটছে ব'লে মনে হয়। মার্ক্সবাদ এবং জাতীয়তাবোধের মধ্যে যখন বিরোধ বাধে—আধুনিক ইতিহাসে তার দৃষ্টান্ত সবারই মনে পড়বে—তখন মার্ক্সবাদের দৃষ্টিভঙ্গী ও আন্দোলনের অনেকখানি হানি হয়, জাতীয়তাবাদের সঙ্গে যোগ দিয়ে তার যতই বৈষয়িক শক্তি ও শ্রীবৃদ্ধি হোক না কেন।

জাতীয়তাবাদকে সরাসরি একটি অযৌক্তিক এবং সংকীর্ণ শক্তি ব'লে নিন্দা করা যায়, যেমন মার্ক্সবাদী এবং ক্যাথলিকরা, নব্য আন্তর্জাতীয়তাবাদীরা এবং অপরাধভীত প্রাক্তন সাম্রাজ্যবাদীরা, এবং স্বভাবতঃই তাদের দ্বারা উৎপীড়িত সকল শ্রেণীর, সকল জাতির এবং সকল ধর্মের লোকেরা করেছেন। কিন্তু তার চেয়েও প্রয়োজনীয় হ'চ্ছে ওর মূল প্রকৃতিকে বুঝতে পারা। জাতীয়তাবাদ প্রায়ই জন্ম নেয় আহত মানবমর্যাদাবোধ থেকে, পরিচিতি-লাভের আকাঙ্ক্ষা থেকে। এই আকাঙ্ক্ষা মানবেতিহাসের একটি প্রবলতম শক্তি। এ অনেক সময় বিকট রূপ নেয়, কিন্তু আসলে এ অস্বাভাবিক বা মারাত্মক কিছু নয়।

আমার মনে হয় আজকের যুগে এই পরিচিতিলাভের আকাঙ্ক্ষাই দুনিয়ায় সবচেয়ে উদগ্র শক্তি। এর বিচিত্রমুখী সত্তা অনেক সময় সুসন্নিহিত এবং পরস্পর প্রতিক্রিয়া-শীল রূপ নেয়—কখনও ব্যক্তিগত কখনও সমষ্টিগত; নৈতিক, সামাজিক, রাজনৈতিক; তা হলেও নানারূপের মধ্যেও এর স্বকীয়তা ঠিকই বজায় থাকে। ছোট ছোট রাষ্ট্রেরা স্বতন্ত্র সত্তা ব'লে পরিগণিত হ'তে চায়, এবং বড় বড় রাষ্ট্রের সঙ্গে সমান হ'য়ে বেঁচে থাকবার, বড় হবার, স্বাধীন হবার, নিজের কথা বলার দাবী করে। দরিদ্র চায় ধনীর সমকক্ষ ব'লে পরিচিত হ'তে, ইহুদিরা খ্রীস্টানের, কালোরা শ্বেতদের, মেয়েরা পুরুষের, দুর্বলেরা সবলের। আধুনিক যুগে কেন্দ্রীকৃত রাষ্ট্রের মধ্যেও সংখ্যালঘু সম্প্রদায়েরা শক্তি এবং মর্যাদার জন্য লড়াই করে : সচ্ছল সমাজগুলিতে এটা সবচেয়ে ভালো ক'রে বোঝা যায়। সেখানে এই পরিচয়ের দাবী সবচেয়ে প্রভাবশালী যে রূপ নেয় সে হ'চ্ছে শ্রেণী-সচেতনতা। আমার নিজের দেশে যেমন এইটেই হ'চ্ছে সামাজিক অশান্তির গভীরতম মূল। ব্রিটেন এবং য়ুরোপের বহু অংশে যে অর্থনৈতিক বিপ্লব নিঃশব্দে ঘটে গেছে, তা বহু অর্থনৈতিক রোগের নিরাময় করেছে, প্রাণধারণের মান উন্নত করেছে, আর্থিক ও রাষ্ট্রনৈতিক ক্ষমতার অভূতপূর্ব প্রসার ঘটিয়েছে। আমাদের যুগের অপেক্ষাকৃত ন্যায়সঙ্গত ব্যবস্থায় অর্থনৈতিক অনিশ্চয়তা বা রাষ্ট্রনৈতিক অসামর্থ্যের ভার পাশ্চাত্য দেশের অধিকাংশ তরুণদের মন পীড়িত ক'রে রাখে না, যা রাখে তা হ'চ্ছে তাদের সামাজিক পদমর্যাদার অনিশ্চয়তা—কোথায় তাদের স্থান, কোথায় তারা থাকতে চায় বা চাইতে পারে তাই নিয়ে সংশয়। অর্থাৎ যথেষ্ট স্বীকৃতিলাভের অভাবের জন্য তাদের ক্ষোভ। অবস্থা তাদের স্বচ্ছল হ'তে পারে, কাজে উৎসাহ থাকতে পারে, কল্যাণরাষ্ট্র তাদের স্বার্থ রক্ষা করতে পারে, তবুও তারা যেন যথেষ্ট স্বীকৃত নয়। কাদের দ্বারা স্বীকৃত? 'ওপর মহলের লোকেদের' দ্বারা, শাসক-শ্রেণীর দ্বারা। বহুনায়কতান্ত্রিক সমাজে—যেমন বংশানুক্রমিক অভিজাতশ্রেণীশাসিত সমাজে (আজ অবশ্য য়ুরোপে তেমন কিছু নেই) এই প্রচেষ্টা এক শ্রেণীর সঙ্গে আরেক শ্রেণীর শক্তির লড়াইরূপে দেখা দেয়। ইংলন্ড, এবং পশ্চিমের অনেক দেশে অবস্থা আরও জটিল : যেখানে অপরিচিত এবং স্বল্পপরিচিতেরা তাদের সমাজে এমন এক একটি দলের অস্তিত্ব সম্পর্কে সচেতন, রাষ্ট্রনৈতিক ক্ষমতা না নিলেও যারা—সামাজিক, সাংস্কৃতিক বা চিন্তার জগতের মূল সুরটি ধরিয়ে দেয়। এরা বিরোধী রাষ্ট্রনৈতিক দলভুক্ত হ'তে পারে; কিন্তু তাদের মধ্যে মিল এই, যে তাদের সবার আত্মবিশ্বাস সমান, ব্যক্তি ও সমাজ-

জীবনের রুচির নিয়ন্তারূপে নিজেদের গণ্য করতে তারা অভ্যস্ত। যদি তারা কখনও কোনও সামাজিক বা রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠানের বিরুদ্ধে বিদ্রোহও করে, তবু সেটা খাঁটি আদবকায়দা অনুযায়ী করতে ভোলে না, কারণ তারা হ'চ্ছে বিদগ্ধ সম্প্রদায়ভুক্ত। এ গোষ্ঠীর বাইরের লোকেরা অবশ্যই এদের অধিকারবোধকে অতিরঞ্জিত ক'রে দেখে, কিন্তু তাহলেও বিষম সমাজে মানুষ সাধারণতঃ জানে কারা তার উন্নতির পথে বাধা দিচ্ছে। বিদগ্ধদল অবশ্যই আছে। তবে ইংলণ্ডে তারা এখনও অনেকটা পুরুষানুক্রমিক, এবং পাব্‌লিক স্কুল, বিশ্ববিদ্যালয় এবং মানববিদ্যার সঙ্গে সংশ্লিষ্ট। যারা তার অন্তর্ভুক্ত হ'তে চায় তাদের কাছে এখনও এদের সংহতি ঈর্ষা ও সমাদরের বস্তু। সাধারণতঃ এ সব ক্ষেত্রে যা হ'য়ে থাকে, এদের তারা অবজ্ঞা দেখানোর ভান করতে পারে এবং প্রতিক্রিয়াশীল, ক্ষয়িষ্ণু প্রভৃতি বলতে পারে, কিন্তু মনে মনে তারই সঙ্গে ঈর্ষা করে এবং এদের সমর্থনের জন্য লুব্ধ হয়। যারা এর বহির্ভূত তারা দরিদ্র কিংবা রাজনৈতিক ক্ষমতাহীন নাও হ'তে পারে। স্যর চার্ল্‌স্‌ স্নো-র 'দুই সংস্কৃতি'র ধারণা আমার কাছে মোটের ওপর ভুল মনে হয়। কিন্তু আপাত-দৃষ্টিতে একেবারে অবিশ্বাস্য মনে হয় না, কারণ অ্যাংলোস্যাক্সন দেশে এমন বহু বৈজ্ঞানিক আছেন, যাঁরা মনে করেন ঈর্ষাজনক এক ক্ষুদ্র জগতে তাঁদের প্রবেশাধিকার নেই। যদিও চতুর্দিকে ঘোষণা করা হচ্ছে যে তাঁরা বৈজ্ঞানিকেরাই আজ সবচেয়ে প্রভাবশালী, ভবিষ্যৎ সমাজগঠনে মানবতাবাদী বিদগ্ধসমাজ অথবা তারই আওতায় বর্ধিত অমাত্যসমাজের চেয়ে তাঁদেরই দায়িত্ব বেশি, তবু তাঁদের সান্ত্বনা নেই। তাঁরা জানেন প্রকৃত দলপতি কারা। যখনই সমাজগঠনের কোনও একটা প্রণালী সমান জরুরী অন্যান্য কতকগুলি প্রণালীর সঙ্গে তাল মিলিয়ে চলতে না পারে, তখনই এই পরিস্থিতি দেখা দেয়। এ যুগের ইতিহাসে অবিচার, অত্যাচার, বেদনাকে বিদ্রোহের যথেষ্ট কারণ ব'লে মনে হয় না। যে সমাজের গঠন একটি বিশিষ্ট শ্রেণীর হাতে বহুদিনসঞ্চিত ক্ষমতা থাকার ফলে বেশ সংহতি পেয়েছে, সেখানে মানুষ বহু শতাব্দী ধ'রে কষ্ট পেয়ে আসতে পারে। টনক নড়ে তখনই যখন এই সংহতি কোনও কারণে ভেঙে পড়ে। মার্ক্স্‌বাদীরা যন্ত্রশিল্পের উদ্ভাবনকে এই রকম একটি কারণ ব'লে মনে করেন সেটা স্মরণ রাখবার মতো। যখন অনুরূপ কোনও কারণে ভারসাম্য নষ্ট হ'য়ে যায়, তখন শক্তির পুনর্বণ্টনের একটা সুযোগ ঘটে, যারা ওলটপালট ঘটাতে চায়, তাদের সেটা সুবর্ণসুযোগ। আমাদের দুনিয়ায় আজ দুর্দিন দেখা দিচ্ছে তার কারণ ব্যক্তিগত প্রতিভা ও কৃতিত্ব, অর্থনৈতিক শক্তি ও সামর্থ্য কোন কিছু এই সর্বপ্রধান বস্তু সামাজিক মর্যাদালাভের আকাঙ্ক্ষার সঙ্গে তাল মিলিয়ে চলতে পারছে না। এই মর্যাদার অভাব, বাপমায়ের অসম্মান, সন্তানের লাঞ্ছনা—এইসব থেকেই মানুষ রাজনৈতিক চরমপন্থা অবলম্বন করে। অবশ্য এটা রাজনৈতিক রূপ না নিয়ে সামাজিক বা শিল্পগত রূপও নিতে পারে। 'রাগী ছোকরার দল', 'বীট্‌নিক', মার্কিন হিপ্‌ভক্তেরা তারই দৃষ্টান্ত এবং মিঃ অ্যান্টনি ক্রস্‌ল্যান্ড যাকে 'অল্‌ডারম্যাস্টন্‌ আন্দোলন' ব'লে অভিহিত করেছেন, অনেকাংশে সেটাও, যদিও তার পিছনে একটি রাজনৈতিক ও সামাজিক আদর্শবাদও কাজ করছে। পশ্চিমী দুনিয়ায় এ কোনও নতুন ঘটনা নয়। এ কথা সর্ববিদিত যে ফরাসী বিপ্লবের কারণগুলির মধ্যে অন্যতম হ'চ্ছে অষ্টাদশ শতাব্দীতে ফরাসী মধ্যবিত্তদের অর্থ-নৈতিক ক্ষমতা ও রাজনৈতিক স্বীকৃতির মধ্যে বিপুল অসামঞ্জস্য। ঊনিশ ও বিশ শতকের বিপ্লবীরা অনেক সময়েই ছিলেন সমাজে অস্বীকৃত কিন্তু ক্ষমতাবান্‌ এবং নিজের চেষ্টায় মানুষ, এমনি ব্যক্তিদের সন্তান। রাশিয়ার বেলা এ কথা বিশেষভাবে সত্য। রুষ বিপ্লবের

উৎস ছিল এক অত্যাচারী শাসনপদ্ধতির বিরুদ্ধে নৈতিক ও রাজনৈতিক ক্ষোভ, আর রাষ্ট্র যাঁদের যোগ্য মর্যাদা দেয়নি, সেইসব মানুষদের স্বীকৃতিসন্ধান। রুষ সাম্রাজ্যের দ্রুত-প্রসারী শিল্প-বাণিজ্যপুষ্ট ধনিক সম্প্রদায় সেদিন অভিজাতসভায় আসন পাচ্ছিলেন না। অহংকার এবং নৈতিক মর্যাদাবোধ অনেক সময় বাস্তব স্বার্থবোধকে ছাড়িয়ে যায়। তাই তাঁদের উত্তরপুরুষেরা পশ্চিম থেকে আমদানি মানবিকতার আদর্শে উদ্বুদ্ধ হ'য়ে এমন বিপ্লবী মন্ত্রে দীক্ষা নিলেন, যা শুধু রাজনৈতিক অবস্থারই বিরোধী হল না, তাঁদের পিতৃপুরুষের অর্থনৈতিক ভিত্তিরও বিরোধী হল। মধ্য য়ুরোপ এবং বল্‌কানে তাই ঘটেছিল—বিত্তবান্‌ পিতার সন্তানেরা বিদেশী শিক্ষালাভের সুযোগ পেয়ে এবং পিতৃ-পুরুষের সামাজিক মর্যাদার অভাবে ক্ষুব্ধ হ'য়ে চরমপন্থী হ'য়ে ওঠেন। আমার মনে হয় তুরস্ক, মিশর, সিরিয়া এবং ইরাকেও পাশাদের অবজ্ঞাত উচ্চমধ্যবিত্ত সম্প্রদায়ের ছেলেদের বেলায়ও এই জিনিসই ঘটেছিল।

এই অসন্তোষ সাধারণতঃ কোনও একটি ক্ষমতাসম্পন্ন সম্প্রদায়ের বিরুদ্ধেই ব্যক্ত হয়—পাশাদের বিরুদ্ধে যেমন হয়েছিল; অথবা অনেকসময় আন্দোলনের মন্ত্রদাতাদের বিরুদ্ধেই উদ্গিরিত হয়—ফ্রাঙ্কলিন্‌ রুজভেল্ট্‌, স্ট্যাফোর্ড্‌ ক্রিপ্‌স্‌, বার্ট্রাণ্ড রাসেল্‌দের বিরুদ্ধে, বিপ্লবী জির'দীদল আর ফ্রান্স-রাশিয়া-আমেরিকার অভিজাত চরমপন্থীদের বিরুদ্ধে। —মানুষের সঙ্গিহীনতায়, সুপিনদ্ধ সমাজের মধ্যে ভাঙন ধরার ফলে এর মূলে আরও গভীরে। রাস্কিন্‌ এবং মরিস্‌, এবং তাঁদেরও আগে ফুরিয়ের্‌ এবং মার্ক্স্‌ এবং প্রুধন্‌ দেখিয়ে দিয়ে গেছেন যে অতিমাত্রায় যন্ত্রশিল্পের প্রসারের ফলে কী ক'রে সমাজের মধ্যে আস্তে আস্তে ফাটল ধরে, এবং মানুষের প্রগাঢ়তম মূল্যগুলির অবনতি ঘটে—স্নেহ প্রেম বিশ্বস্ততা ভ্রাতৃত্ববোধ, একটি সাধারণ লক্ষ্যের প্রেরণা, এবং শৃঙ্খলা, সুষ্ঠুতা, কর্মনিষ্ঠা লুপ্ত হয়। এর পরিণাম আমাদের সুপরিচিত—মানুষ ক্রমশঃ মনুষ্যত্ব হারায় এবং রূপ নেয় সর্বহারা—জনগণ—কামানের খোরাক। কালে কালে এর প্রতিষেধক আবার এর থেকেই উদ্ভূত হয়: সবচেয়ে আত্মসচেতন এবং সুবেদী মানসে বিপ্লবী মনোভাবের সঞ্চার এবং সেই সঙ্গে খণ্ডিত সমাজকে আবার পূর্ণতা দেবার আকাঙ্ক্ষা, এবং মানুষে মানুষে সেই প্রীতি ও শ্রদ্ধার সম্পর্ক ফিরিয়ে আনার ইচ্ছা—সমস্ত সত্য মানবিক সম্পর্কের যা ভিত্তিস্থল।

আমাদের যুগের সমস্ত সামাজিক ও রাষ্ট্রীয় বিপ্লবের মূলে মানুষ ব'লে, সমকক্ষ ব'লে পরিগণিত হবার এই দাবী। স্বীকৃতিলাভের জন্য হাহাকারের এটা হ'ল আধুনিক রূপ—উগ্র, বিপজ্জনক, কিন্তু ন্যায়সঙ্গত এবং মূল্যবান্‌। ব্যক্তি, গোষ্ঠী, শ্রেণী, জাতি, রাষ্ট্র এবং বিরাট একদল মানুষ স্বীকৃতিলাভের জন্য ক্ষোভ জানায় তাদের বিরুদ্ধে, যারা তাদের মানবমর্যাদার ন্যূনতম মান থেকে বঞ্চিত ক'রে রেখেছে, পদদলিত করে রেখেছে তাদের দাবীকে। গত দুশো বছরের জাতীয়তাবাদী আন্দোলন এই অনুভূতিতে ভরা। এক জাতি, এক শ্রেণী, অথবা এক দৃষ্টিভঙ্গীর লোকেদের ঐক্যবোধ আহত হ'লে তার থেকে সঞ্চারিত হয় জাতীয়তাবাদ। সাধারণতঃ তা দুয়ের একটি রূপ নেয়: হয় আপন অক্ষমতার, অথবা পিছিয়ে থাকার সচেতনতা বা উন্নততর জাতির অনুকরণ ক'রে তাদের সমান হবার প্রচেষ্টা: নতুন রাষ্ট্রের এবং নতুন নেতাদের এই আকাঙ্ক্ষা—রাজনৈতিক ঐক্য, শিল্পবাণিজ্যের শক্তি, যন্ত্রশিল্প ও সাংস্কৃতিক জ্ঞান—সবকিছুর সাহায্যে এগিয়ে যাওয়া—যাতে 'ওরা' আর 'আমাদের' নীচু নজরে না দেখতে পারে। অপর পক্ষে দেখি সখেদে নিজেকে পৃথক্‌ ক'রে সরিয়ে রাখার ইচ্ছা, অসমান প্রতিযোগিতা পরিহার করে আপন সুকৃতির উপরে মনঃসংযোগ,

এবং প্রতিদ্বন্দ্বীর উচ্চঘোষিত গুণাবলীর চেয়ে আপন কীর্তির শ্রেষ্ঠত্ববোধ। আহত আত্ম-সম্মানের এটা একটা স্বাভাবিক প্রকাশভঙ্গী, ব্যক্তির পক্ষেও যেমন, রাষ্ট্রের পক্ষেও তেমনি। একে আশ্রয় ক'রে যে মতবাদ খাড়া হ'য়ে ওঠে, তাও সুপরিচিত। বিদেশীর সস্তা মালের চেয়ে আমাদের অতীত, আমাদের ঐতিহ্য অনেক বেশি ঐশ্বর্যবান্—বিদেশীর পিছনে ছোটা যে কোন অবস্থাতেই অসম্মানজনক এবং আপন অতীতের প্রতি কৃতঘ্নতা; আমাদের আধ্যাত্মিক এবং ঐহিক অবস্থা সেই প্রাচীন উৎসের কাছ থেকেই ফিরিয়ে আনতে পারি, যা একদিন, হয়তো কুয়াশাচ্ছন্ন এক অতীতে, আমাদের শক্তিমান করেছিল, সমাদর ও ঈর্ষার পাত্র ক'রে তুলেছিল। রুষ ইতিহাসের ছাত্রদের নিশ্চয় মনে পড়বে ঊনবিংশ শতকের পাশ্চাত্ত্যবাদী ও স্লাভ্‌প্রেমিকদের মধ্যে স্মরণীয় সেই বিতর্কের কথা। একদল দোহাই দিচ্ছেন বিজ্ঞানের, সংস্কারমুক্তির, যুক্তিবাদের, স্বাধীনতার, সভ্যতার যা কিছু শ্রেষ্ঠ দান পশ্চিমে কুসুমিত হ'য়ে উঠেছে সেই সবের; অপর দল পশ্চিমকে ধিক্কার দিচ্ছেন তার কঠিন অমানুষিকতার জন্য, তার সংকীর্ণ, শুষ্ক, আইনমাফিক নীরসতার জন্য, তার অন্ধ অনুশাসন আর অরাজকতার মধ্যে দোলার জন্য, তার সামাজিক অন্যায় আর প্রেমহীন মানবসম্পর্কের জন্য। তাঁরা চান রাশিয়ার সেই নির্মল অতীতের সেই 'জেব', 'মৌল' সমাজব্যবস্থায় ফিরে যেতে, যেখানে অমাত্যতন্ত্র ছিল না, পীটার দি গ্রেটের তৈরী শ্রেণীবৈষম্য ছিল না। তাঁরা সেই ভ্রাতৃত্ববোধের দোহাই দিয়েছিলেন, যা স্লাভ্‌জাতিগুলিকে একসূত্রে বেঁধেছিল। মানুষ তখন পরস্পরের অঙ্গাঙ্গী ছিল, কেবল অধিকারের দাবী নিয়ে চিৎকার করত না। অধিকার মানেই সীমারেখা সৃষ্টি, মানুষের মধ্যে প্রাচীর সৃষ্টি, স্বাভাবিক ভালোবাসা থাকলে যার দরকার হয় না, যেমন এক পরিবারের মানুষদের মধ্যে হয় না। অর্থাৎ যে বিষয়টির ওপর আমি জোর দিতে চাই তা হ'ল এই, উভয় দলই এক স্বীকৃতিলাভের ইচ্ছা দ্বারা প্রণোদিত। ১৯১৭-তেই সে ইচ্ছার মৃত্যু হয়নি।

এই একই চিন্তা ও অনুভূতির আদল পাওয়া যায় জার্মান রোম্যাণ্টিক্‌বাদীদের মধ্যে. সেই লেখক এবং চিন্তানায়কদের মধ্যে, যাঁরা দেশবাসীদের মুগ্ধ ক'রে ভাবতে শেখালেন যে একটি জাতি হ'চ্ছে একটি বিরাট সম্মিলিত সত্তা আর তার কাজ হ'চ্ছে 'গণ-আত্মা'কে প্রকাশ করা। এইভাবে তাঁরা বৈজ্ঞানিক বিশ্লেষণ, কার্তেসিয় জাতীয়তাবাদ এবং ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্য-বাদ, 'গাণিতিক গণতন্ত্র', ক্ষয়িষ্ণু পশ্চিমের নির্জীব যান্ত্রিকতা—অর্থাৎ সংক্ষেপে, ফরাসী প্রভাবের (যে প্রভাব সপ্তদশ শতাব্দীতে তাদের দাবিয়ে রেখেছিল এবং অষ্টাদশ শতাব্দীতে সাংস্কৃতিক অবমাননার ভারগ্রস্ত করেছিল) পরিবর্তে আনলেন সূক্ষ্ম অনুভূতিসম্পন্ন অন্তর্দৃষ্টি এবং কাব্যিক চেতনা। এমন কি স্বাধীন, দৃপ্ত, সমৃদ্ধ ইংলণ্ডেও এই মনোভাব ঘনিয়ে উঠল ঐতিহ্যের আদর্শীকরণে, বার্ক্‌ এবং কোল্‌রিজের যুক্তিবাদ-বিরোধিতায়, এবং নব্যমধ্যযুগবাদীদের প্রাক্‌-শ্রমশিল্পযুগের ইংলণ্ডে এবং পুরাতন ধর্মমতে ফিরে যাবার চেষ্টায়। য়ুরোপের সর্বত্র এই জিনিস দেখা দিয়েছিল। এ-ও এক ধরনের স্বীকৃতিসন্ধান—আমরা কী আছি এবং কী হ'তে পারি, ইতিহাসে আমাদের দান এবং মূল্য—অন্য জাতির কাছে না হ'লেও অন্ততঃ আপনজনদের কাছে এটুকুর স্বীকৃতি। এই যে আত্মশক্তি লাভের জন্য নিজের মধ্যে অপসরণ—এর মধ্যে একটা 'আঙুরফল টক'-গোছের ভাব আছে : 'ওরা' যদি 'আমাদের' দাম না দেয়, 'আমরাও' তা'হলে 'ওদের' চাই না। না, আরও বেশি, আমরা ওদের ঘৃণা করি, ওদের সর্বনাশ ঘনিয়ে এসেছে বলে মনে করি, ওরা হ'ল 'পচন্ত পশ্চিম'। ওরা আমাদের যা দোষ ব'লে মনে করে—যেমন আমাদের আদিম সরলতা, আর

ওরা যে সব গুণের আদর করে—অতিবৈদগ্ধ্য, রাজনৈতিক চেতনা, আধুনিক দৃষ্টিভঙ্গী—আমাদের মধ্যে সেগুলির অভাব কোনও ত্রুটি নয়, আসলে এগুলি হ'ল আমাদের নৈতিক এবং আধ্যাত্মিক শক্তিরই লক্ষণ, অন্ধ ওরা তা বুঝতে পারে না।

আমার মনে হয় আজকের দিনে যে সব নতুন জাতি বিদেশী শাসনের জোয়াল ঝেড়ে ফেলে উঠে ব্যক্তিবিশেষ বা শ্রেণীবিশেষের অকারণ প্রভুত্বমদে মেতে উঠেছে, তাদের পিছনেও এই ধরনের বিদ্বেষের ভাবই কাজ করছে। উদারপন্থীরা যথার্থই এই মনোভাবের নিন্দা করেন। কিন্তু তবু একে বোঝা দরকার। বুঝলেই যে ক্ষমা করতে হবে এমন নয়। কিন্তু তাই ব'লে পুরানো উপনিবেশবাসীরা যে বিদেশীদের সদয় শাসনের চেয়ে স্বদেশীদের নির্দয় শাসনও সহ্য করতে রাজি, সেদিকে অবজ্ঞাভরে আঙুল দেখালেই চলবে না। এটা কোনও অদ্ভুত বা নিন্দনীয় মনোভাব নয়। সমস্ত অত্যাচারই ঘৃণার যোগ্য, কিন্তু আপন লোকের খবরদারি বিদেশীর হুকুমের চেয়ে কম অবমাননাকর—সে হুকুম যতই সুবিবেচনাপূর্ণ এবং নিঃস্বার্থ হোক না কেন—এ মনোভাব নিশ্চয় বুঝতে কষ্ট হয় না।

তবু রাজনৈতিক স্বাধীনতা পেলেই সবসময় স্বরাজের আকাঙ্ক্ষা, স্বীকৃতির আকাঙ্ক্ষা চরিতার্থ হয় না। এমনও হ'তে পারে যে বিদেশী সংস্কৃতির ছাপ আমার নিজের সংস্কৃতির ওপর খুব গভীর হ'য়ে পড়েছে, এবং আমার সভ্যতাকে কিছুটা বিকৃত ক'রে ফেলেছে, কিন্তু তবুও তাকে সম্পূর্ণ ঝেড়ে ফেলতে গেলে ক্ষতির সম্ভাবনা। হয়তো অবাঞ্ছিত উৎস থেকে এলেও তার সত্য, মহৎ বা আনন্দদায়ক কতকগুলি দিক আছে যাকে আমি উপেক্ষা করতে পারি না। এবং স্বাধীনতার গর্বে যদি প্রাচীন বর্মচর্মের ভার কাঁধে তুলে আমি তার সব দান ভুলে যেতে চাই, তাতে হয়তো নিজেকে সংকীর্ণ করে ফেলব; প্রাদেশিকতার, অসহিষ্ণুতার গোঁড়ামি হয়তো আমাকে পেয়ে বসবে; কাল যা সত্য ব'লে জানতাম আজ হয়তো জোর ক'রে তা অস্বীকার করব। যে সমস্ত প্রতিষ্ঠান সদ্য স্বাধীনতা পেয়েছে এবং পুরানো মনিবের শিক্ষা ভুলতে পারছে না, তাদের সবারই এই সমস্যা। হয়তো মনিবের শিক্ষা সম্পূর্ণ পরোপকারপ্রবৃত্তিপ্রসূত হয়নি, হয়তো নিজের স্বার্থেই হয়েছে। অন্ততঃ ভারত ও ইংলণ্ড সম্পর্কে কার্ল্ মার্ক্স্ এ কথা ঠিকই বলেছেন। তবু এ কথা মানতে হবে যে ইংরেজরা অতি অল্প সময়ের মধ্যে এবং যথেষ্ট সুফলের সঙ্গে তাদের ভারতীয় প্রজাদের অনিবার্য বস্তুগত ও বুদ্ধিগত পরিবর্তনের মধ্যে দিয়ে নিয়ে গিয়েছে। হয়তো মাঝে মাঝে তাদের আচরণ বর্বরোচিত হয়েছে, কিন্তু ভারতীয়েরা নিজেরা এত দ্রুত এই পরিবর্তন সাধন করতে পারত না।

রবীন্দ্রনাথকে নিয়ে আমার আলোচনা সুরু, কিন্তু সেখান থেকে আমি অনেক দূরে স'রে গেছি। এবার আবার সেইখানে ফিরে যেতে চাই; কারণ আমার এই চিন্তাগুলি তাঁরই প্রবন্ধ ও ভাষণমালা প'ড়ে আমার মনে জেগেছে। তাঁর কতকগুলো লেখা বছর দুই আগে আমার বন্ধু হুমায়ুন কবির আমাকে পাঠিয়েছিলেন। ইঙ্গ-ভারতীয় সম্পর্ক বিষয়ে আমার জ্ঞান সামান্য। আমি যা বলব তা অনেকের কাছে অসত্য বা অবান্তর বা অজ্ঞতা ব'লে মনে হ'তে পারে। যদি তাই হয়, তবে আমি সংশোধনের অপেক্ষায় থাকব। রবীন্দ্রনাথের লেখা পড়তে পড়তে আমার মনে হয়েছে যে তাঁর সামনে যে সব সমস্যা দেখা দিয়েছিল, বিশেষ ক'রে শিক্ষাপ্রকরণ এবং ভারতীয় ঐক্যসম্বন্ধে সমস্যাগুলি, তা উনিশ শতকের রাশিয়া কিংবা জার্মানির আর বিশ শতকের আমেরিকার চিন্তানায়ক এবং সংস্কারকদের সমস্যা থেকে খুব ভিন্নধরণের নয়। কারণ এই সব দেশের সংস্কৃতি দীর্ঘকাল বিদেশীয় শাসনের ফলে এক

দ্বিধাবিভক্ত অবস্থায় উপনীত হয়। একদিকে বিদেশী আদর্শ অনুকরণ ক'রে কিছু তোতা-পাখি ও মর্কট সৃষ্টির আশঙ্কা থাকে এবং দেশীয় গুণগুলি লুপ্ত পায়; অন্ততঃ বিদেশী দেবতাদের ভজনা ক'রে সে গুণগুলির স্বাভাবিক বিকাশের পথ বিকৃত হ'য়ে যায়। অন্য পক্ষে বিদেশী বিষটা ততদিনে অনেক গভীরে প্রবেশ ক'রে ফেলে। জার্মানদের কাছ থেকে আশা করা যায় না, যে তারা গ্রীক্ লাটিন্ সাহিত্য, রোমান্ আইন, ফরাসী 'মহাযুগের' লেখকদের ভুলে যাবে—এগুলো তাদের শিক্ষার ভিত্তিস্বরূপ। রুষ অভিজ্ঞতা আরও শিক্ষাপ্রদ। পীটার দি গ্রেট্ তাঁর প্রজাদের মনে এক তীব্র চমক লাগিয়েছিলেন। তিনি প্রাচীর ভেঙে ফেলে, দরজা জানলা খুলে দিয়ে এমন একটি শিক্ষিত সমাজের সূচনা ক'রে দিলেন, যাদের অভ্যাস এবং দৃষ্টিভঙ্গী মোটেই রুষজাতিসুলভ ছিল না। একটি বিদেশী ভাষা—ফরাসী-চর্চার মধ্য দিয়ে তারা মধ্যযুগীয় দারিদ্র্য, অজ্ঞতা, গ্রাম্যতায় নিমগ্ন জনসাধারণের থেকে নিজেদের আলাদা ক'রে ফেলল। এর ক্ষত বহুগভীরপ্রসারী হ'ল। একে সারাবার জন্য দুশো বছর ধ'রে রাশিয়ার প্রতিটি সমাজকল্যাণসাধক, প্রতিটি শিক্ষিত লোক মাথা ঘামিয়েছিলেন। তাঁদের মধ্যে যাঁরা অধিকতর অন্তর্দৃষ্টিসম্পন্ন ছিলেন, তাঁরা বুঝেছিলেন, যে ফরাসী বা জার্মানির সাংস্কৃতিক আক্রমণকে অগ্রাহ্য ক'রে তাকে রোখা যাবে না, আক্রমণকারীদের তাড়িয়ে দিলেও কোন ফল হবে না, শুধু সময়কেই পিছিয়ে দেওয়া হবে, কারণ রাশিয়া পৃথিবীরই অংশ, আর দরজা-জানলা বন্ধ ক'রে দুর্ভেদ্য প্রাচীর তুলে বাইরের রাজনৈতিক বা অর্থনৈতিক প্রভাবকে ঠেকানো যায় না। কোন কোন সাহসী প্রতিক্রিয়াশীল ব্যক্তি ঠিক এই মতবাদই প্রচার করেছিলেন। যদি ধর্মসংস্কারমুক্ত শিক্ষা বন্ধ করা যায়, প্রগতিকে রোখা যায়, রাশিয়াকে আজকালকার মতো যোগাযোগরহিত এবং আলাদা ক'রে দেওয়া যায়, তবে এই মারাত্মক পাশ্চাত্ত্য বীজাণু ধ্বংস হ'তেও পারে, অন্ততঃ কম ক্ষতিকর হ'তে পারে। কিন্তু এই কঠোর পন্থা আজ অবধি কৃতকার্য হ'তে পারেনি। প্রাচীন সংস্কৃতি দিয়ে আধুনিক মানুষের প্রয়োজন মেটেনা। প্রাচীনের ওপর নবীনের প্রলেপ দরকার; তা নইলে হয় পাথর বনে যেতে হবে, নয় বিদেশীর অক্ষম অনুকরণ করতে হবে। একটি জাতি কোন দুর্লভ গাছ নয়; সাধারণ বিশ্বের খোলা হাওয়ার মধ্যেই তার বিকাশ সম্ভব। মৃত সভ্যতার রসে কৃত্রিম আলোয় তার পূর্ণতা লাভ হ'তে পারে না। রবীন্দ্রনাথের রচনা আমি যা পড়েছি, তা থেকে মনে হয়েছে গত শতাব্দীর শেষভাগে ভারতবর্ষকে ঠিক এমনি এক সমস্যারই সম্মুখীন হ'তে হয়েছিল। তিনি যথার্থ জ্ঞানীপুরুষের মতো অতি প্রাচীন ও অতি নবীনের মাঝখান দিয়ে একটি সমন্বয়ের কঠিন পথ অবলম্বন করেছিলেন। আমি জানি কেউ কেউ মনে করেন রবীন্দ্রনাথ পশ্চিমের কাছে বড়ো বেশি আত্মসমর্পণ করেছিলেন। ইংরেজিতে তাঁর যে সব লেখা পড়া যায়, তা থেকে এ ধারণা আমার হয়নি। আমার মনে হয়েছে তিনি ঠিক মাঝের পথটি নিতে পেরেছিলেন। এই সংকটমুহূর্তে দেশবাসীর ও জগতের চোখ ধাঁধানোর ও অক্ষয় খ্যাতি পাবার লোভ সংবরণ ক'রে উভয়পক্ষের নিন্দা কুড়িয়েও এই যে সত্যান্বেষণ—একেই বলে পরম বীর্য।

একদিকে ইংলন্ড, অন্যদিকে ভারতের সুমহান্ অতীত। রবীন্দ্রনাথ ভালোকরেই বুঝেছিলেন যে ইংরেজি সাহিত্য বরও বটে শাপও বটে। 'শিক্ষার হেরফের' প্রবন্ধে যারা ভারতবর্ষকে ভুলে স্কুলেপড়া ইংরেজির গর্বে স্ফীত হ'য়ে ওঠে তাদের তিনি বলেছিলেন 'অসভ্য রাজারা যেমন বিলাতী সাজগোজ করে কতকগুলো সস্তা বিলাতী কাচখণ্ড পুঁতি প্রভৃতি লইয়া শরীরের যেখানে সেখানে ঝুলাইয়া রাখে।' যেখানে শিক্ষার সঙ্গে ছাত্র-

জীবনের কোনও যোগ নেই, আছে সুদূরে কোনও জীবনধারার সঙ্গে, সেখানেই এটা ঘটে। টলস্টয় তাঁর শিক্ষা সম্বন্ধে প্রবন্ধে এ কথা খুব পরিষ্কার ক'রে বলেছেন। এ দ্বন্দ্বের ফলে যে স্নায়ুবৈকল্য দেখা দেয় তা কেবল ভারতবর্ষেই ঘটেনি, আমেরিকানদের জীবনের কোন কোন ব্যাপারে মনে হয়—অবশ্য এ সম্পর্কে আমি নিশ্চিত নই—যে অ্যাংলো-স্যাক্সন দেশের বাইরের থেকে যারা এসে ওখানে বসবাস করেছিল, তাদেরও কেবল শেক্সপিয়র আর ডিকেন্স্ আর থ্যাকারে অথবা হথর্ন্ বা মার্ক টোয়েন্ বা মেল্ভিল্ পড়তে হয়েছিল ব'লেই এ ব্যাপার ঘটেছে। এ সব বইয়ে যে জীবনের কথা পাওয়া যায় তা অ্যাংলো-স্যাক্সনদের অথবা ডাচ্ বা জার্মান বা স্ক্যাণ্ডিনেভিয়দের পূর্বপুরুষদের পক্ষে কল্পনা করা সম্ভব ছিল, কিন্তু রুষ বা বোহিমিয় বা গ্রীক্ বা ইহুদি অথবা সিসিলি বা সিরিয়া বা আফ্রিকার অধিবাসীদের পক্ষে কেমন ক'রে তা সম্ভব হবে? রবীন্দ্রনাথ বলেছেন যে এ অবস্থা যখন ঘটে, তখন জীবন ও শিক্ষাতে যাত্রাদলের সঙেদের মতো ঠোকাঠুকি বেধে যায়। তাই তিনি বাংলাভাষার পুনরুজ্জীবন চেয়েছিলেন—সে অন্ততঃ একটা স্বাভাবিক প্রকাশের পথ হবে, ধারকরা পোষাক হবে না। আবার সেই সঙ্গেই তিনি এ-ও বুঝেছিলেন যে ইংরেজির দ্বার রুদ্ধ ক'রে রাখলেও চলবে না, যন্ত্রতন্ত্রহীন পশ্চিমীপাপমুক্ত সেই সনাতন এক যুগে ফিরে যাওয়ার রাস্তাও বন্ধ যদিও এই যান্ত্রিকতার ফলে স্বাভাবিক মানবমূল্যগুলি ক্ষয়প্রাপ্ত হ'তে থাকবে। তিনি বুঝেছিলেন, যে ভারতের সঙ্গে ইংলণ্ডের সম্পর্কে শত উপকার থাকলেও আসলে সেটা অসুস্থ সম্পর্ক। ইংরেজরা এদেশে বণিকের বেশে এসে রাজা হ'য়ে বসেছিল, এবং দু'চারজন নিঃস্বার্থ ভারতসেবী ছাড়া (তাঁদের তিনি অকুণ্ঠ প্রশংসা করেছেন) রাজা-প্রজার সম্পর্ক উভয়ের দৃষ্টিকেই বিকৃত ক'রে রেখেছিল। উভয়েই পরস্পরকে সমশ্রেণীর মানুষ, আত্মীয় ব'লে দেখতে ভুলেছিল। হেগেল্-এর 'ফেনোমেনলজি'তে এই মনোভাবের চমৎকার বর্ণনা আছে; এবং একশো বছর পরে ই, এম, ফর্স্টার অন্যভাবে এই একই তত্ত্ব ব্যক্ত করেছেন। রবীন্দ্রনাথ কিন্তু ইংরেজচরিত্র এবং ইংরেজের কীর্তি বুঝেছিলেন এবং তার প্রশংসাও করেছেন। ধীর ভাবে তার বিচার তিনি করেছেন এবং আমার মতে সুবিচারই করেছেন। ইংরেজের দান তিনি ফেলে দিতে বলেন নি। কিন্তু বিজাতীয় ভাষায় স্বাধীন সৃষ্টি সম্ভব নয়। বিদেশীর ভাষা স্বাধীন চিন্তাকল্পনার ওপর আঁটজামার মতো চেপে থাকে, তাকে অস্বাভাবিক ক'রে তোলে, হয়তো কখনো চমৎকার চাতুর্য (কন্রাড বা আপলিনেয়ার যেমন) দেখায়, আর কখনো অস্বস্তিকরভাবে পীড়াদায়ক হ'য়ে ওঠে। তাই প্রথম প্রয়োজন হচ্ছে কথা বলতে পারার ক্ষমতা। পরের স্বরে বিজ্ঞতা ফলানোর চেয়ে নিজের স্বরে যা-তা বলার অধিকারও শ্রেয়ঃ। 'ব্রিটিশ ব্যবস্থা যতবড়োই হউক তাহা আমাদের নহে।...নিজের চক্ষুকে অন্ধ করিয়া পরের চক্ষু দিয়া কাজ চালানো কখনোই ঠিকমতো হইতে পারে না'—এ কথা রবীন্দ্রনাথ ১৯০৮-এ প্রাদেশিক সম্মিলনীর সভাপতির অভিভাষণে বলেছিলেন। ভারতের পক্ষে ইংরেজি হ'চ্ছে বিশ্ব-জগতের একটি বাতায়নস্বরূপ। তাকে বন্ধ করা অপরাধ হবে এই রকম তাঁর ধারণা ছিল ব'লে আমার মনে হয়। কিন্তু বাতায়ন তো দুয়ার নয়, তার ভিতর দিয়ে ঘরে প্রবেশ করার চেষ্টা বড়ো অদ্ভুত হবে। 'ইংরেজরাও, যতদূর সম্ভব, এমনভাবে চলিতেছে যেন আমরা কোথাও নাই। ...ইংরেজের খাতায় হিসাবের অঙ্কে আমরা কতবড়ো একটা শূন্য।' স্বয়ং মর্লি এই অপরাধে অপরাধী। এ অবস্থায় কী ক'রে ভারতীয়েরা অন্যের মূল্যায়নের ওপর ভরসা না রেখে নিজেদের চালিত করবে? শক্তি অর্জনের দ্বারা। আবার রবীন্দ্রনাথের কথায়

বলি : 'আর কোনো দান দানই নহে, শক্তিদানই একমাত্র দান।' মীলিয়ান্ কথোপকথনে থ্যুকিডিডিস্-এর মতো, মাকিয়াভেল্লির মতো, সমস্ত মহৎ বস্তুনিষ্ঠ চিন্তানায়কদের মতো তিনি বুঝেছিলেন যে অজ্ঞতা, অবাস্তব আদর্শবাদ, সত্যকে এড়িয়ে কেবল আবেগমন্থনের চেষ্টা সময় সময় অবিশ্বাস এবং বর্বরতার মতনই সর্বনাশ হ'তে পারে। তারই দৃষ্টান্ত-রূপে তিনি ব্রহ্মা ও ছাগশিশুর গল্প ফেঁদেছেন। দুর্বল ছাগশিশু একবার ব্রহ্মার কাছে গিয়ে কেঁদে বলেছিল, 'ভগবান্, পৃথিবীতে সবাই আমাকে খেতে চায় কেন?' ব্রহ্মা উত্তর দিয়েছিলেন, 'বাপু, অন্যকে দোষ দেব কী, তোমার চেহারা দেখলে আমারই খেতে ইচ্ছে করে।' এই নিদারুণ গল্পটি থেকে রবীন্দ্রনাথ এই শিক্ষাই গ্রহণ করছেন যে মানুষকে বীর্যবান্ হ'তে হবে—শক্তি না থাকলে সমতা থাকবে না, সুবিচার থাকবে না। সমস্ত রাষ্ট্রের সাম্য চাই এ কেবল ফাঁকা ধর্মের বুলি। মানুষের যা স্বভাব তাতে দুর্বলের প্রতি ন্যায়বিচার দুর্লভ এবং কঠিন। আর মানবপ্রকৃতিকে আমূল বদলানো—সে স্বপ্ন বললেই চলে। হাতের কাছে যা পাওয়া যাচ্ছে তাই দিয়েই মানুষের উন্নতিসাধন করতে হবে, সাধুসন্তদের যোগ্য দুর্লভ পুণ্যের অধিকারী হ'য়ে নয়। মানুষ স্বীকৃতি চায়। ঠিক কথা। শক্তিমান্ না হ'লে সে তা পাবে না। সহযোগিতা এবং সংগঠনের সাহায্যে তাকে সেই শক্তি অর্জন করতে হবে, তার জন্য কৃতজ্ঞতার আশা করলেও চলবে না। শক্তির অন্যান্য রাস্তা আছে : কিন্তু রবীন্দ্র-নাথ তাদের বর্জন করেছেন। নীট্শের অনৈতিকতা, হিংসার পথ আত্মঘাতী কারণ তাতে প্রতিহিংসা জাগিয়ে তোলে। এ বিষয়ে রবীন্দ্রনাথ টল্স্টয় ও মহাত্মা গান্ধীর সঙ্গে একমত। কিন্তু তিনি টল্স্টয়ের রুদ্ধ সরলীকরণ, তাঁর আত্মনির্বাসন বা অরাজক মনোভাব চান নি; অথবা মহাত্মাজীর (আমার ভুল হ'লে সংশোধন আশা করবো) অরাজনৈতিক বা ধর্মনিরপেক্ষ-তার অতীত লক্ষ্যগুলিও তিনি চান নি। যখন তিনি একান্তভাবে সংস্কৃতির কথাই ভেবেছেন তখনও রবীন্দ্রনাথের কাছে সংগঠনের অর্থ ছিল পাশ্চাত্ত্য পদ্ধতিগুলির স্বাঙ্গী-করণ। তাছাড়া চাই জনসাধারণের সঙ্গে শিক্ষিতদের সেতুবন্ধন, কারণ তা না হ'লে বিদগ্ধতন্ত্র বহুনায়কতন্ত্র, অবিচারের সূত্রপাত হবে, জনসাধারণ স্বীকৃতির জন্য চীৎকার ক'রে উঠবে, ফলে সমাজের কাঠামো ভেঙে পড়বে, আসবে বিপ্লব। না, শক্তি নিশ্চয় অর্জন করতে হবে, কিন্তু শান্তির মধ্য দিয়ে। 'ইংরেজ আমাদের আত্মাভিমানে আঘাত করে। তার কারণ আমরা নিঃস্ব। আমরা যখন শক্ত হইব তখন তাহারা আমাদের ভাই বলিয়া সম্বোধন করিবে। ততদিন তাহারা আমাদের ঘৃণাই করিবে, ভাই বলিবেনা।' যার আছে তাকেই দেওয়া হবে। ভিক্ষার দ্বারা কিছুই মিলবে না শুধু আত্মাবমাননা আরও অতলে নামবে। ভারতবর্ষ যত-দিন দুর্বল থাকবে ততদিন তার অসম্মানের বোঝা বাড়বে। এই হ'ল মূল সুর—বর্তমান শতাব্দীতে আমরা এ সুর আরও অনেক শুনেছি : নানা রাষ্ট্রের, শ্রেণীর মহাদেশের সদ্য-জাগ্রত সামাজিক আত্মচেতনা এই সুরে ঘোষিত হয়েছে। যারা নিজেদের সম্মান করতে জানে তারাই অন্যের কাছে সম্মান পায়। অতএব আমাদের মুক্ত হ'তে হবে, আর কেউ আমাদের সাহায্য করবে না; বরঞ্চ যতই অন্যের সাহায্য পাব ততই আমাদের বন্ধনদশা র'য়ে যাবে। ইংরেজ বলে সে আমাদের ন্যায়নিষ্ঠা দিয়েছে। হ'তে পারে কিন্তু আমরা যা সবচেয়ে বেশি চাই, সব মানুষ যা চায়, সে হ'ল মনুষ্যত্ব। সেখানে 'ন্যায়' মিললে 'ক্ষুধার্তকে রুটির বদলে পাথর দেওয়ারই সামিল হয়। সে পাথর দামী হ'তে পারে, দুর্লভ হ'তে পারে কিন্তু ক্ষুধা মেটায়না।' সে ক্ষুধা মিটবেও না যতক্ষণ না আমরা জেগে উঠে নিজেদের ঘর সাজিয়ে-গুছিয়ে তুলব। আন্তর্জাতিকতা খুবই মহৎ আদর্শ, কিন্তু সে আদর্শ সফল হয় শুধু

তখনই, যখন প্রত্যেকটি গ্রন্থি—অর্থাৎ প্রত্যেকটি জাতি—পরস্পরের টান রাখবার মতো শক্তি ধারণ করে। রবীন্দ্রনাথের শ্রেষ্ঠ গুণগুলির মধ্যে একটি হ'ল, যে তিনি এ কথা বুঝতে পেরেছিলেন। এতে তাঁর অনাবিল দৃষ্টি এবং জগৎ সম্বন্ধে সচেতনতারই প্রমাণ পাওয়া যায়, যা কবিদের মধ্যে দুর্লভ। এ কথা তিনি বুঝেছিলেন যখন হালকা আন্তর্জাতীয়তাবাদ প্রচারিত হচ্ছিল। বিভিন্ন জাতি, সম্প্রদায় এবং রাষ্ট্রের প্রতিনিয়ত শুনতে হচ্ছিল যে তাদের সীমারেখা উচ্ছেদ করতে হবে, সংঘাত থেকে বিরত হতে হবে, নিজেদের বৈশিষ্ট্যকে লুপ্ত ক'রে এক বিশ্বসমাজের অন্তর্ভুক্ত হতে হবে। চরম আদর্শ হিসেবে এ কথা খুব ভালো, যে পৃথিবীতে সব জাতির একই মর্যাদা এবং শক্তি হবে। কিন্তু যতদিন অসাম্য থাকবে ততদিন এ কেবল দুর্বলের কাছে হিতোপদেশ। দুর্বলেরা যখন স্বীকৃতি চাইছে, হয়তো বেঁচে থাকবার প্রাথমিক অধিকারই চাইছে, তখন এ উপদেশ ছাগলের কাছে বাঘের সদুপদেশ দানেরই সামিল। ঐক্য কেবল সমানদের মধ্যেই হ'তে পারে, অন্ততঃ খুব বেশি অসমানদের মধ্যে হ'তে পারে না। নইলে মাৎস্যন্যায়। যারা বিশৃঙ্খল, দুর্বল, লাঞ্ছিত, অপমানিত, তাদের আগে শক্তি দিতে হবে, শৃঙ্খলা দিতে হবে, মুক্তি দিতে হবে, নিজেদের মধ্যে যে সামর্থ্য আছে তাকে বৃদ্ধি ও বিকাশের সুযোগ দিতে হবে, নিজের ভাষায়, নিজের মাটিতে। অন্যের স্মৃতির সাহায্য নিয়ে নয়, অন্যের কাছে ঋণ ক'রে নয়। জাতীয়তাবাদের এই কথাটিই চিরন্তন সত্য—আত্মশক্তি নির্ধারণের চেষ্টাই সবচেয়ে বড় চেষ্টা। জাতীয়তাকে শক্ত করলেই আন্তর্জাতিকতা সম্ভব। এর দুদিকে দুটি বড় বড় সংকট : একদিকে আন্তর্জাতিকতার মুখোশ পরা ক্ষুধিত নেকড়ের দল, মুখে তাদের ক্ষুদ্র রাষ্ট্রের আত্মনিয়ন্ত্রণের বিরুদ্ধতার কথা; অন্যদিকে ছাগশিশুর মত ভুক্ত হবার অসুস্থ ইচ্ছা, দ্বন্দ্ব সংঘাত ত্যাগ ক'রে বৃহত্তর ঐক্যের অংশ হবার ইচ্ছা, নিজেদের অস্তিত্ব, অতীত এবং মানবীয় দাবী ভুলে যাবার ইচ্ছা দায়িত্বের বোঝা, স্বাধীনতার বোঝা ঘাড় থেকে নামিয়ে দেবার ইচ্ছা। রবীন্দ্রনাথ এই দুয়ের মধ্যে সংকীর্ণ পথটি বেছে নিয়েছিলেন, কঠিন সত্যের পথ থেকে কখনো স্খলিত হন নি। অতীতের প্রতি মুগ্ধ আকর্ষণকে তিনি সমর্থন করেননি—তাকে তিনি 'অতীতের যূপকাষ্ঠে আবদ্ধ ছাগশিশুর' সঙ্গে তুলনা করেছেন, এবং যারা এর সমর্থন করেছেন তাদের তিনি নিন্দা করেছেন—প্রতিক্রিয়াশীল বলে, প্রকৃত রাজনৈতিক স্বাধীনতার স্বরূপ তাঁরা জানেন না বলে। তিনি দেখিয়েছেন, যে এ'দের স্বাধীনতার জ্ঞানও বিলিতী এবং বিলেত থেকে ধার করা। বিশ্বনাগরিকতার বিরুদ্ধে বলতে গিয়ে তিনি বলেছেন যে ইংরেজরা নিজের পায়ে দাঁড়িয়েছে, ভারতবাসীদেরও তাই করতে হবে। ১৯১৭ সালে আবার তিনি 'প্রভুর পায়ে সব কিছু ত্যাগ করার' বিরুদ্ধে বলেছেন,—সে প্রভু ব্রাহ্মণই হোন আর সাহেবই হোন। অর্থাৎ তাঁর মতে ভারতবর্ষকে ইংরেজ-মুক্ত হ'তে হবে, কিন্তু ইংরেজের মধ্যে যেটুকু সত্য ছিল, তাকে ছেড়ে দিলে চলবে না। তাতে হয়তো স্বদেশীরাই ভারতবর্ষের পিছনে ছুরি মারবে—তারা বোমার দলই হোক আর আপোষকামীরাই হোক। তিনি জানতেন যে এতে ফল হবে না। ভারতীয়েরা সংখ্যায় অনেক, ভারতবর্ষ বিপুল দেশ, কাজেই শান্তির পথেই লক্ষ্যে পৌঁছোনো যাবে। সবাই মিলে এগিয়ে যাওয়াই হ'চ্ছে আসল। এবং তাই হয়েছে।

আমি আগেই বলেছি যে এ ক্ষেত্রে অত্যুক্তির আশঙ্কা, চরমপথ অবলম্বন করার আশঙ্কা খুবই ছিল। হয়তো যাঁরা চরমপন্থী হন, ইতিহাসে তাঁদেরই নাম লেখা থাকে। প্লেটো এবং আরিস্টট্‌ল, খ্রীস্টকাহিনীর লেখকেরা, মাকিয়াভেল্লি, হব্‌স্‌, রুসো, কাণ্ট্‌, হেগেল্‌, মার্ক্স্‌, সবাই অত্যুক্তির পথ নিয়েছিলেন। একটা দেশকে বিপ্লবমন্ত্র দেওয়া সহজ, একটিমাত্র ব্যক্তি

বা একটিমাত্র দলের কাছে আর সব কিছুকে অধীন ক'রে তোলা সহজ। অতীতে ফিরে যাও, বিদেশী শয়তানের দিকে পিছন ফেরাও, শুধু নিজের শক্তিকে বিকশিত ক'রে তোলো—এ সব কথা বলা সহজ। ভারতবর্ষ এ সব কথা শুনেছেও। রবীন্দ্রনাথ এ সব কথা বুঝতে চেষ্টা করেছেন, তাকে যোগ্য মর্যাদা দিয়েছেন, এবং তাকে মার্জিত ক'রে নিয়েছেন। আমার মনে হয় তাঁর সুদীর্ঘ এবং অসামান্য ফলপ্রসু জীবনে তিনি সামাজিক বা রাজনৈতিক কাজের চেয়ে আরও সৃষ্টিশীল সাধনায় ব্যাপৃত ছিলেন। তাঁর লক্ষ্য ছিল যা কিছু সুন্দর তাই সৃষ্টি করা, আর যা কিছু সত্য তাকে ব্যক্ত করা। এতে অনেক সংযম, অনেক ধৈর্য, অনেক তিতিক্ষার প্রয়োজন। সমাজ, সংস্কৃতি ও শিক্ষার কথা বলতে গিয়ে তিনি যা সত্য তাই বলেছেন, তাকে অতিমাত্রায় সরল ক'রে তোলেন নি। সেইজন্যই বোধ হয় সকলের কানে তাঁর কথা পেঁাছোয়নি। মার্কিন দার্শনিক সি,আই, লুইসের একটি কথা আমার কাছে অমূল্য ব'লে মনে হয়। তিনি বলেছেন, 'এ কথা আগে থাকতে মনে করবার কোনই কারণ নেই যে সত্যকে আবিষ্কার করলেই তা মনোরম হবে।' তা যদি নাও হয় তবু মনোরম কথা বলার চেয়ে সত্য বলা অনেক ভালো। আমি ধারণা করতে পারি, যে দেশের অতীত এত সমৃদ্ধ এবং যার ভবিষ্যৎ বোধহয় সমৃদ্ধতর, সে দেশ প্রকৃতির দুর্লভতম দান এক প্রতিভাধর কবির জন্য কেন এত গৌরব অনুভব করে। সে কবি সংকটের দিনে দেশবাসীকে তাঁর বাণী দিয়ে গেছেন। তারা হয়তো শুধু যুক্তিই চায়নি, অলৌকিক কিছুও চেয়েছিল। কিন্তু কবি অবিচলিত থেকে নিজে যা সত্য ব'লে বুঝেছেন শুধু তাই তাদের শুনিয়ে গেছেন।

অনুবাদ: **দেবব্রত মুখোপাধ্যায়**

# রবীন্দ্রনাথ

## লর্ড হেলশাম

আজ আমরা যে মহামানবের জন্মশতবার্ষিকী উদ্‌যাপন করছি তিনি নিঃসন্দেহে মহৎ কবি। কিন্তু কেবল কবি বললে তাঁর পরিপূর্ণ পরিচয় হয় না, সব কবিই মানুষ হিসেবে মহৎ নয়, কিন্তু মহৎ মানুষ মাত্রই কবি। কারণ বস্তুজগতে, শব্দসম্ভারে বা মানবসম্পর্কে যেখানেই নতুন সৃষ্টির আবির্ভাব, কবির কাব্য রচনার সঙ্গে তা সমধর্মী। বস্তুতঃ রচনা বা সৃষ্টির এই ক্ষমতাই প্রতিভার প্রকৃত এবং অভ্রান্ত লক্ষণ। রবীন্দ্রনাথ ছিলেন প্রতিভাধর মহা-মানব। কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে প্রচলিত অর্থেও তিনি কবি, শব্দ ব্যবহার করে তিনি কবিতা লিখেছেন, গান বেঁধেছেন এবং শিক্ষিত ও অশিক্ষিত তাঁর স্বদেশবাসী সকলেরই কণ্ঠে সে কবিতা ও গান ধ্বনিত। মাতৃভাষার অন্তর্নিহিত শক্তি এবং যুগের আত্মাকে সম্যক উপলব্ধি করে-ছিলেন বলেই তা সম্ভব হয়েছিল।

এ কথা অবশ্য সত্য যে গীতাঞ্জলির ইংরিজি অনুবাদের জন্যেই রবীন্দ্রনাথ নোবেল পুরস্কার পেয়েছিলেন। কিন্তু তবু আমার মনে হয় না যে কেবলমাত্র তাঁর কাব্য প্রতিভার ভিত্তিতেই লণ্ডনে তাঁর শতবার্ষিকী উদ্‌যাপনের আয়োজন হয়েছে। কবিতার যথার্থ অনু-বাদ সম্ভব নয় এবং আমার বিশ্বাস যে সকলেই স্বীকার করেন যে অনুবাদে তাঁর কাব্যরসের বিপুল হানি হয়েছে। অথচ তাঁর মাতৃভাষা বাঙলা। যে ভাষায় তিনি কাব্যরচনা করেছিলেন, এদেশে বিশেষ কেউ জানে না। রবীন্দ্রনাথ ছিলেন চিন্তানায়ক। যে ভাষায় চিন্তাকে তিনি রূপদান করেছেন তার সৌন্দর্যের চেয়ে চিন্তার উৎকর্ষের জন্যই তিনি বৃটেনে বেশী সমাদৃত হবেন।

ব্যাপক এবং বিশিষ্ট দুই অর্থেই রবীন্দ্রনাথ একান্তভাবে ধর্মনিষ্ঠ ছিলেন। প্রেম, প্রকৃতি, দেশজদৃশ্য নিয়ে কবিতা তিনি প্রচুর লিখেছেন, কিন্তু তাঁর কবিতার মূল সুর ধর্মাত্মক, এমন কি মিস্‌টিকও। গীতাঞ্জলি প্রধানতঃ হয়তো সম্পূর্ণভাবেই ভক্ত এবং ভগবানের প্রেমলীলার কাব্য। রবীন্দ্রসাহিত্য পাঠকালে তাঁর ধর্মবোধের কথা মনে রাখতেই হবে, তার প্রকৃতি নির্ণয়ও একান্ত প্রয়োজনীয়। যে ধর্মপ্রাণতা রবীন্দ্রনাথের চিন্তাকে উদ্দীপ্ত করত ভারতবর্ষ এবং য়ুরোপে যে পরিমাণে তার দৈন্য দেখা দিয়েছে, রবীন্দ্রনাথের মৃত্যুর পর বোধ হয় সেই পরিমাণেই তাঁর খ্যাতির লাঘব হয়েছে।

ধর্মনিষ্ঠ হয়েও রবীন্দ্রনাথ ছিলেন মানবতাবাদী—সাধারণ ধার্মিক ব্যক্তিদের সঙ্গে এই-খানেই তাঁর তফাৎ। মানবতাবাদে যাঁরা বিশ্বাসী, তাঁদের মধ্যে অনেকেই জাতীয়তাবাদে বিরাগী। কিন্তু মানবতাবাদে বিশ্বাসী হয়েও তিনি ছিলেন জাতীয়তাবাদী। তাঁর কাছে স্বদেশপ্রীতি এবং মানবতাবাদ পরস্পর বিরোধিতা তো নয়ই, বরং একই দর্শনের, একই ধ্যানের অঙ্গীভূত। তিনি বিশ্বাস করতেন যে সভ্য মানবসমাজের সংস্কৃতি এবং দর্শন এক। এবং সত্যিকারের জাতীয় সংস্কৃতি ব'লে যদি কিছু থাকে তবে বিশ্বসংস্কৃতিরই অঙ্গ এবং প্রকাশ হিসাবেই তার সার্থকতা। বর্তমান যুগে এ বিশ্বাসের প্রয়োজন যত বেশি, আমাদের দুর্ভাগ্যবশত আজ সে বিশ্বাস তত বেশি দুর্বল।

রবীন্দ্রসাহিত্যের নিগূঢ় অন্তর্লোকে রয়েছে প্রাচ্য এবং পাশ্চাত্ত্য সভ্যতার সংঘাতের

চেতনা। তাঁর যুগে এ সংঘাত সব চেয়ে বেশি তীব্র হয়ে দেখা দিয়েছিল। তিনি বৃটেনকে পাশ্চাত্ত্য সভ্যতার প্রতীক বলে ধরে নিয়েছিলেন, এবং প্রধানত সংস্কৃত সাহিত্যের ভিত্তিতে প্রতিষ্ঠিত বাঙলা সংস্কৃতির মধ্যে তিনি প্রাচ্য সভ্যতার প্রকাশ দেখেছিলেন। এই দুই সভ্যতার সম্পর্কের চেতনা তাঁর সাহিত্যকে আজকের দিনেও আমাদের পক্ষে সমকালীন করে রেখেছে। এই দুই জগতেই তাঁর বিচরণ ছিল স্বচ্ছন্দ। একথা বললেও অত্যুক্তি হবে না যে তিনি প্রাচ্য এবং প্রতীচ্য দুই সভ্যতাকেই ভালবাসতেন, কিন্তু এককভাবে কোনটাই তাঁর মন ভরে নি। সেই অতৃপ্তির ফলেই তাঁর বিশাল সাহিত্য রচনা, নাটক, উপন্যাস, কবিতা, গল্প, বক্তৃতা, গানের মধ্যে আত্মপ্রকাশ, বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা, এবং দেশদেশান্তরে ভ্রমণে তাঁর প্রতিভার অমিত উৎসার। তিনি জন্মগ্রহণ করেছিলেন ভারতীয় বিদ্রোহের চার বছর পরে, তাঁর মৃত্যু হয়েছে ভারতবর্ষ স্বাধীন হবার ছ বছর পূর্বে। সুতরাং ভারতবর্ষে বৃটিশ রাষ্ট্রের প্রত্যক্ষ শাসনের যে মেয়াদ, তার প্রায় সবটা জুড়েই তাঁর জীবৎকাল। মহাত্মা গান্ধী ছাড়া তিনিই প্রথমে বাংলা এবং পরে সর্ব ভারতের জাতীয় চেতনাকে প্রকাশ করেছেন, জাতির ভবিষ্যতকে নির্দিষ্ট করেছেন। বৃটেন এবং ভারতবর্ষের মধ্যে আজ যে মৈত্রীর বন্ধন, রবীন্দ্রনাথের সাধনার ফলেই তা সম্ভব হয়েছে।

পাশ্চাত্ত্য জগতে রবীন্দ্রনাথ প্রধানতঃ লেখক বলেই খ্যাত এবং আমার মনে হয় লেখক হিসেবেই এদেশেও সকলে তাঁকে দীর্ঘকাল মমতার সঙ্গে স্মরণ করবে। বৃটেনে তিনি বহুবার নানা উপলক্ষ্যে এসেছেন। স্কুলের ছাত্র হিসেবে তিনি ইংলণ্ডে বাস করেছেন, সাহিত্য সৃষ্টিতে আত্মনিয়োগ করবার আগে আইনের ছাত্র হিসেবেও থেকেছেন। ১৯১২ খৃষ্টাব্দে তিনি এদেশে আবার এসেছিলেন এবং পর বৎসর বক্তৃতা দেবার জন্যে ফিরে আসেন। তিনি এদেশে শেষবারের মতন আসেন ১৯৩০ খৃষ্টাব্দে। সেবার তিনি অক্সফোর্ড বিশ্ব-বিদ্যালয়ে হিবার্ট-বক্তৃতা দেন এবং সেই বক্তৃতামালা পরে "মানুষের ধর্ম" নামে পুস্তকাকারে প্রকাশিত হয়। এদেশের বহু খ্যাতিমান ব্যক্তির সঙ্গে তাঁর বন্ধুত্ব ছিল, যেমন স্যার উইলিয়াম রোথেনস্টেইন এবং ডব্লু. বি. ইয়েটস। ইয়েটসই ইংরেজী গীতাঞ্জলির ভূমিকা লেখেন এবং গীতাঞ্জলিই রবীন্দ্রনাথের কাব্যসংকলনের প্রথম স্বকৃত ইংরেজী অনুবাদ। এই কবিতা সংগ্রহই পাশ্চাত্ত্য জগতে তাঁর প্রতিভাকে প্রথম উদ্ভাসিত করে।

আমি শুনেছি যে আধুনিক যুগের বাংলা সাহিত্যে রবীন্দ্রনাথ অদ্বিতীয়। তিনি অসংখ্য গল্প লিখেছেন, নাটক লিখেছেন, প্রবন্ধ রচনা করেছেন, তবু সারাজীবন তিনি মুখ্যতঃ কবিই ছিলেন। আমার বিশ্বাস তাঁর সবচেয়ে বড়ো সাহিত্যকীর্তি তাঁর কবিতা এবং নাটক, বিশেষতঃ তাদের মধ্য দিয়ে বাংলার জীবন এবং গ্রাম বাংলার উদ্বোধন। ১৯১৩ খৃষ্টাব্দে যখন নোবেল পুরস্কার দ্বারা পাশ্চাত্ত্য জগতে তাঁর প্রতিভার সমাদর করল, সারা এশিয়ায় তিনিই প্রথম এ স্বীকৃতি পান।

রবীন্দ্রনাথের সমস্ত সাহিত্য সৃষ্টিই ভাষার সৌন্দর্যে অনবদ্য। আমরা তার সৌন্দর্য আন্দাজ করতে পারি মাত্র, পুরোপুরি উপলব্ধি করতে পারি না—এটা আমাদের দুর্ভাগ্য। তবু মূল কবিতার অনুপম সৌন্দর্য অনুবাদেও ধরা পড়েছে। বিশেষ করে অন্যান্য লেখায় যেমন উপন্যাসে, বাংলার দিগন্তছোঁয়া নদীতে ভ্রমণের কাহিনীতে আমি শুনেছি, অনুবাদেও মূল রচনার মহত্ত্ব ও মাধুর্য বহুল পরিমাণে বোঝা যায়।

রবীন্দ্রনাথ সেই স্বল্পসংখ্যক শিল্পীদের একজন যাঁরা শিল্পের বহু শাখায় পারদর্শী। তাই তাঁকে বলা হয়েছে ভারতীয় রেনেসাঁর দাভিঞ্চি। জীবনের শেষ পর্যায়ে তিনি ছবি

আঁকতে শুরু করলেন এবং শিল্পের অন্যান্য শাখায় যেমন এক্ষেত্রেও অতি অল্প সময়ের মধ্যে প্রচুর ছবি আঁকলেন। তাঁর ছবির প্রকৃতিগত স্বাতন্ত্র্য প্রথম দৃষ্টিতেই নজরে পড়ে, ভারতীয় সনাতন শিল্পরীতির সঙ্গে বাহ্যত তার সম্পর্ক নেই বললেই চলে। বরঞ্চ তাঁর ছবি দেখে আধুনিক য়ুরোপীয় চিত্রকলার কথাই মনে আসে এবং তাই য়ুরোপীয় দর্শকদের কাছে তার আবেদন অনেক বেশি দ্রুত হবার সম্ভাবনা। এ বিষয়ে যাঁরা পারদর্শী, তাঁরা কিন্তু বলেন রবীন্দ্রনাথের চিত্রশিল্প যে নিগূঢ় অথচ নিশ্চিতভাবে ভারতীয় একথা অস্বীকার করবার উপায় নেই।

এসব ছাড়া রবীন্দ্রনাথ সংগীতসাধকও ছিলেন এবং সেক্ষেত্রেও তাঁর প্রতিভা শিল্পের অন্যান্য ক্ষেত্রের তুলনায় অনুজ্জ্বল নয়। নিজের বহু কবিতা মিলিয়ে তিন হাজারেরও বেশি গানে তিনি সুর দিয়েছেন।

রবীন্দ্রনাথের খ্যাতি তাঁর কাব্যপ্রতিভার ওপরই দৃঢ়ভাবে প্রতিষ্ঠিত, কিন্তু দার্শনিক হিসেবেও তিনি প্রখ্যাত হয়েছিলেন এবং দর্শনশাস্ত্রে তাঁর উৎসাহ সমস্ত জীবনব্যাপী এবং অত্যন্ত গভীর। বেদান্ত দর্শনের মূলে উপনিষদের সূত্র কবিপ্রতিভার দ্বারা তিনি তাদের ব্যাখ্যা করেছেন। নিজের অভিজ্ঞতার আলোকে তাদের নূতন করে প্রকাশিত করেছেন। জীবাত্মা ও পরমাত্মার অদ্বৈত ঐক্য উপনিষদের বাণী। তিনি মনে প্রাণে সে বাণীকে গ্রহণ করেছিলেন।

রবীন্দ্রনাথের নিজের ভাষায়—

এ আমার শরীরের শিরায় শিরায়
যে প্রাণ তরঙ্গমালা রাত্রিদিন ধায়
সেই প্রাণ ছুটিয়াছে বিশ্বদিগ্বিজয়ে।
সেই প্রাণ অপরূপ ছন্দে তালে লয়ে
নাচিছে ভুবনে।

সংসার বর্জন করে ভগবান মেলে, এ মতবাদ রবীন্দ্রনাথ পুরোপুরি অস্বীকার করেছেন। তিনি বিশ্বাস করতেন যে ঈশ্বর স্বয়ং কর্মী এবং তাঁর কর্মে আমাদের যোগ দিতে হবে। ইন্দ্রিয়ের দ্বার রুদ্ধ ক'রে প্রকৃতির সৌন্দর্যকে অবহেলা করা ছিল তাঁর স্বভাববিরুদ্ধ।

ইংরাজি "গীতাঞ্জলি"র একটা কবিতায় তাঁর ভীষণ অনুভূতির পরিচয় মেলে—

এই যে তোমার প্রেম ওগো হৃদয় হরণ
এই যে পাতায় আলো নাচে সোনার বরণ—

তাঁর জীবনদর্শন ছিল আবেগময় এবং মূলতঃ মানবীয়, নিরুত্তাপ বুদ্ধির কসরৎ তাঁর মনকে স্পর্শ করেনি। তাঁর মানবপ্রেম, ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য জগতের প্রতি তাঁর এই ভালবাসার জন্যই বোধ হয় তিনি চিরকাল মানুষের হৃদয় আকর্ষণ করতেন।

শান্তিনিকেতনে তিনি যে আদর্শকে রূপ দিতে চেয়েছিলেন, তার উল্লেখ না করলে রবীন্দ্রনাথের প্রতি শ্রদ্ধানিবেদন সম্পূর্ণ হবে না। মধ্যজীবনে যেখানে তিনি ঘর বেঁধে-ছিলেন, সেখানে বিরাট তরুচ্ছায়ায় পৃথিবীর বিভিন্ন অঞ্চল থেকে পণ্ডিতব্যক্তি এসে তাঁর সঙ্গে মিলিত হয়েছিলেন। এখানেই প্রকৃতির স্বাভাবিক পরিণতির মতন ধীরে ধীরে আন্তর্জাতিক সংস্কৃতির কেন্দ্র বিশ্বভারতী গড়ে উঠল। এ প্রচেষ্টায় তিনি অকুণ্ঠ সাহায্য পেয়েছেন দুজন ইংরেজের কাছ থেকে, রেভারেণ্ড চার্লস্ এনড্রুজ এবং উইলিয়াম পিয়ারসন।

রবীন্দ্রনাথ এবং গান্ধী, দুজনার সঙ্গেই তাঁরা কাজ করেছেন। দুজনেই তাঁদের ভালবেসেছিলেন। আজ তাঁদের কথাও আমাদের স্মরণ করা উচিত।

অন্য অনেকে আমার চেয়ে আরো ভালোভাবে শান্তিনিকেতনের আদর্শ সম্বন্ধে আপনাদের বলতে পারবেন। তাঁর বসন্তোৎসবের কথা, বিরাট গাছের ছায়ায় পাঠরত শিশুদের কথা, আজকের যান্ত্রিকতার হট্টগোল থেকে সরে অধ্যয়নরত পরিণতবুদ্ধি শিক্ষার্থীদের কথা তাঁরা আপনাদের বলবেন। আমি শুধু বলব যে রবীন্দ্রনাথ তাঁর শ্রেষ্ঠ রচনার অনেকগুলি শান্তিনিকেতনেই রচনা করেছিলেন, বাঙলার মাটিতে এমন প্রতিষ্ঠান স্থাপন করেছিলেন যে, কোনকালে তার বিনাশ নেই।

রাজনীতির বাস্তব বিষয় নিয়ে আমার কারবার, আমার মতন রাজনৈতিকের মুখে এ প্রশস্তি বিচিত্র শোনাতে পারে। কিন্তু রবীন্দ্রনাথ যে ভারতের সাম্প্রতিক ইতিহাসে একজন বিরাট ব্যক্তিত্বসম্পন্ন জাতীয় নেতা, সে কথা কি করে ভুলব? অবশ্য তিনি কোনদিনই প্রচলিত অর্থে রাজনৈতিক ছিলেন না এবং এ সম্বন্ধে আমাদের ধারণা পরিষ্কার রাখা প্রয়োজন। এক অর্থে তিনি রাজনীতিকে অপছন্দই করতেন কিন্তু জাতির লক্ষ্য সাধনে রাজনীতির ভূমিকাকে তিনি স্পষ্টভাবে স্বীকার করেছেন। তাঁকে যে রাজনৈতিক কর্মপ্রবাহে যোগ দিতে হয়েছিল এক অর্থে তা তাঁর ইচ্ছার বিরুদ্ধে, তাঁর মানসিক নির্মিতির বিরুদ্ধে তো বটেই। তাঁর লেখায় প্রায় সর্বত্রই জাতির পুনরুজ্জীবনের যে দীপ্ত পরিচয় মেলে, তাঁর নিজের রাজনৈতিক কার্যকলাপের চেয়ে সেই বাণীই স্বাধীনতা সংগ্রামে তাঁর দেশবাসীকে উদ্বুদ্ধ করেছে। স্বাধীনতার প্রত্যেকটি সংগ্রামের জন্য, ইতিহাসের প্রত্যেক বিপ্লবের জন্যই কবির প্রয়োজন। তাঁর রচনায় সে যুগের আত্মা প্রকাশিত হয়, কবির বাণী সংঘাত ও বিপ্লবের পথে মশাল জেবলে ধরে। বিংশ শতাব্দীর সূচনায় রবীন্দ্রনাথ ভারতবর্ষের স্বাধীনতা সংগ্রামে সেই ভূমিকা গ্রহণ করেছিলেন।

জাতীয়তাবাদের সংকীর্ণ উগ্র আবেগে রবীন্দ্রনাথ কখনই বিশ্বাসী ছিলেন না, এ ধরনের জাতীয়তাবাদের অন্তর্নিহিত বিপদ সম্বন্ধে তাঁর চেতনা ছিল প্রখর। যেখানেই তিনি উগ্রজাতীয়তার প্রকাশ দেখেছেন, মানবতার বিরুদ্ধে বিদ্রোহ বলে তার নিন্দা করেছেন। সমস্ত পৃথিবীর মানুষ শান্তি এবং ঐক্যের মধ্যে বাস করবে, শান্তিময় এবং পূর্ণতর জীবনের জন্য তারা সাধনা করবে এই ছিল তাঁর লক্ষ্য। সেই লক্ষ্য সাধন করতে হলে সকলকেই স্বাধীন হতে হবে, ভারতবর্ষকে স্বাধীনতা অর্জন করে নিজের জাতির এবং সাংস্কৃতিক স্বাতন্ত্র্য ঘোষণা করতে হবে। রবীন্দ্রনাথ এবং গান্ধীর মধ্যে বহু বিষয়ে অমিল ছিল, কিন্তু দুজনেই একই স্বপ্ন দেখতেন, দুজনেরই লক্ষ্য একই ধরনের বলে এত পার্থক্য সত্ত্বেও তাঁদের পরস্পরের প্রতি বন্ধুত্ব এবং শ্রদ্ধা কোনদিন ক্ষুণ্ণ হয়নি।

ভারতবর্ষ স্বাধীন হবার ছ'বছর আগে রবীন্দ্রনাথের মৃত্যু হল, এটা আমাদের দুর্ভাগ্য। ১৯৪৭ খৃষ্টাব্দে যেদিন ভারতের স্বাধীনতা ঘোষিত হল, তিনি যদি সেই দিনটি প্রত্যক্ষ করতে পারতেন তা হলে তাঁর শেষ জীবনের লেখায় যে হতাশার সুর, তা নিশ্চয়ই দূর হয়ে যেত। বৃটিশ সাম্রাজ্যের রূপান্তরে, কমনওয়েলথ-এর আবির্ভাবে তিনি নিশ্চয়ই এ শতাব্দীর সবচেয়ে আনন্দজনক পরিণতি ব'লে অকুণ্ঠ অভিনন্দন জানাতেন। বৃটেন এবং ভারতবর্ষের সম্পর্ক মাত্র কয়েক বৎসরের মধ্যে এমন নাটকীয়ভাবে পাল্টে যাবে, ১৯৪১ সালের যুদ্ধতিক্ত দিনে একজন অশীতিপর বৃদ্ধের পক্ষে তা কল্পনা করা সহজ ছিল না। কমনওয়েলথ প্রতিষ্ঠার ফলে বর্তমানে প্রাচ্য এবং পাশ্চাত্ত্যের মধ্যে বন্ধুত্বের, সহযোগিতার

এবং পরস্পরকে বোঝবার সহস্র পথ খুলে গেছে, বেঁচে থাকলে রবীন্দ্রনাথ তাতে নিশ্চয়ই আনন্দিত হতেন।

কমনওয়েলথ প্রতিষ্ঠার পর চৌদ্দ বৎসর অতিবাহিত হয়েছে। ইংরেজ এবং ভারতবাসী এই নতুন পরিস্থিতির পূর্ণ সদ্ব্যবহার করেছে। আমার মনে হয় প্রাচ্য এবং পাশ্চাত্ত্যজগতে বৃটেন এবং ভারতের মতো এমন সহমর্মী দুটি দেশ আর খুঁজে পাওয়া যাবে না। এ ঘটনা রবীন্দ্রনাথের কাছে শুধু যে অভিনন্দনই পেত তা নয়, তাঁর জীবন এবং সাধনাই প্রধানতঃ একে সম্ভব করেছে।

রবীন্দ্রনাথের মতো প্রতিভা পৃথিবীতে খুব কমই আসে। তাঁর ধ্যানের জগৎ বাস্তবরূপ নেবার পূর্বেই ভবিষ্যৎ দ্রষ্টা ঋষির মৃত্যু হয়। কিন্তু তাঁর বিশ্বাস, তাঁর প্রতিভা অনুগামীদের মনে সেই ধ্যানকে সঞ্চারিত করে এবং তারাই তাকে সিদ্ধির পথে এগিয়ে নিয়ে যায়।

রবীন্দ্রনাথ চলে গেছেন, কিন্তু আমরা রয়েছি। তাঁর মহিমা, তাঁর স্মৃতিই আজ আমাদের সকলকে একই ক্ষেত্রে সমবেত করেছে। ভগবান এবং মানুষের প্রতি তাঁর প্রেমের উজ্জ্বল ঐশ্বর্য, মানবাত্মার বিশ্বজনীনতার প্রতি তাঁর আস্থাকে আগামীকালে বয়ে নিয়ে যাবার মতো সংকল্পের স্থিরতা এবং সৎ মনোবৃত্তি আমাদের আছে কিনা, ভবিষ্যতই তার বিচার করবে।

# রবীন্দ্রনাথ ও নোবেল পুরস্কার

## আঁদ্রে অস্টারলিং

১৯১৩ সাল। পৃথিবীতে তখনও শান্তি বজায় আছে। তাই যখন ভারতের মহান্ কবিকে সাহিত্যের জন্য নোবেল পুরস্কার দেওয়া হল, তখন অনেকের কাছেই এটা শুভ ইঙ্গিত বা আশ্বাস বলে মনে হয়েছিল। হাত বাড়িয়ে পশ্চিম যেন অভিনন্দন জানাল পূবকে। কবিও তাঁর ধন্যবাদ জানিয়ে তার-বার্তায় এই ভাবটি প্রকাশ করলেন যে গভীর মর্মজ্ঞতাই দূরকে নিকট আর পরকে ভাই করতে পেরেছে। ইংলণ্ডে তাঁর খ্যাতি তখনও পর্যন্ত খুবই অল্প দিনের। তবু রয়্যাল সোসাইটির সদস্য এক ইংরেজ লেখক টি. স্টার্জ মুর পুরস্কার-যোগ্যতার বিবেচনার জন্য তাঁর নাম দাখিল করেছিলেন।

নির্বাচনী-সমিতির বিবরণী থেকে প্রকাশ পায় যে সুইডিশ আকাডেমির কাছে এই প্রস্তাব চমক-জাগানো কৌতূহলের সৃষ্টি করেছিল। অবশ্য একথা সত্য, যে কমিটির তদানীন্তন চেয়ারম্যান হ্যারল্ড হিয়ার্ন তাঁর নিজস্ব মতামত স্পষ্টভাবে ব্যক্ত করতে চাননি। তবে এই রকম একটা মন্তব্য করেছিলেন যে, রবীন্দ্রনাথের কাব্যে কতটুকু তাঁর ব্যক্তিগত সৃষ্টি আর কতখানিই বা ভারতীয় সাহিত্যের ক্লাসিক্যাল ঐতিহ্য থেকে পাওয়া, তা নির্ণয় করা কঠিন। তাই কমিটি প্রথমে আর একটি প্রস্তাবিত নাম সম্পর্কে বিশেষ ভাবে বিবেচনা করতে লাগলেন। ইনি হলেন এমিল ফাগুয়ে, ফরাসী সাহিত্যের ঐতিহাসিক এবং নীতিশাস্ত্রবিৎ।

যাই হোক, রবীন্দ্রনাথের স্বপক্ষে আকাডেমির মধ্যে উৎসাহী সমর্থকেরও অভাব ছিল না। এঁদের মধ্যে একজন হলেন প্যার হলস্ট্রম, যাঁর চমৎকার প্রবন্ধগুলি থেকে বোঝা যায় যে কবির সম্বন্ধে তাঁর নবজাগ্রত শ্রদ্ধা অন্তর্দৃষ্টিময় আলোচনায় উদ্ভাসিত হয়ে উঠেছে। আকাডেমির মধ্যে এই বিতর্কের যে প্রীতিকর পরিণাম ঘটল, তার জন্য নিঃসংশয় বহুলাংশে দায়ী হল ভার্নার ভন হাইডেনস্টাম-লিখিত একটি রসজ্ঞ আলোচনা। ইনি নিজেই তিন বছর আগে নোবেল পুরস্কারে সম্মানিত হয়েছিলেন। রবীন্দ্রনাথ যে ইংরেজি ভাষায় "গীতাঞ্জলি" নিবেদন করেন, তারই এক অপরিস্ফুট সুইডিশ-নরওয়েজিয়ন অনুবাদের মাধ্যমে "গীতাঞ্জলি"র আস্বাদ পেয়ে হাইডেনস্ট্যাম বলেছিলেন : 'এ কবিতাগুলি যখন আমি পড়ি, তখন আমার মন গভীর ভাবে আলোড়িত হয়েছিল। গত বিশ বছর বা তারও কিছু বেশি কালের মধ্যে এদের সমতুল্য কোনও গীতমর্ম 'লিরিক' পড়েছি বলে মনে হয় না। এদের প্রসাদে বহু আনন্দঘন মুহূর্ত আমি উপভোগ করেছি,—মনে হয়েছে যেন এক নূতন ঝরনার নির্মল জল পান করছি। তাঁর প্রতিটি উপলব্ধি ও চিন্তা-বিধৃত গভীর প্রেমময় ধর্মভাব, তাঁর পূত হৃদয়, তাঁর ভাষার স্বভাবসুন্দর মহান গাম্ভীর্য—সব মিলে এমন এক অখণ্ড রূপ সৃষ্টি করেছে যার গভীর অতীন্দ্রিয় সৌন্দর্যের তুলনা বিরল। তাঁর রচনায় এমন কিছু পাওয়া যাবে না,—যা বিতর্কের সৃষ্টি করে বা আঘাত দেয়; যা তুচ্ছ, পার্থিব অথবা অহমিকা-স্পৃষ্ট। যদি কোনও কবির সম্পর্কে বলা যায় যে নোবেল পুরস্কার পাওয়ার মতো তাঁর যোগ্যতা-গুণে আছে, তা হলে ইনিই সেই কবি......এখন, শেষ পর্যন্ত যদি সেই জাতের প্রকৃত উচ্চ-মান আদর্শ কবির সাক্ষাৎ আমরা পেয়েই থাকি, তা হলে তাঁর

দাবি পাশ কাটিয়ে যাওয়া আমাদের উচিত কর্ম হবে না। বহু সংবাদপত্রে ঘোষিত হওয়ার পূর্বে একটি প্রতিভাময় নাম আবিষ্কার করার গৌরব আমাদের ভাগ্যে এই প্রথম জুটল. অনেক আগামী দিনেও এ সুযোগ হয় তো আর মিলবে না। আর তাই যদি যথার্থ প্রতিপন্ন করতে হয়, তা হলে আর ইতস্ততঃ করা চলে না। আবার এক বছর স্থগিত রেখে এই শুভ লগ্ন নষ্ট করা উচিত হবে না।'

আকাডেমি-সদস্যদের মধ্যে, খুব সম্ভব, মাত্র একজনই ছিলেন যিনি রবীন্দ্রনাথের কাব্য আদি ভাষায় পড়তে পারতেন। আমার স্পষ্ট মনে পড়ছে, যখন আমি লুন্ড-এ সাহিত্য-বিষয় নিয়ে অধ্যয়ন করি, তখন বিখ্যাত কবির সুপণ্ডিত নাতি ইসেয়াস টেন্যার-এর সঙ্গে একবার দেখা করতে যাই—রবীন্দ্রনাথের কাব্য সম্বন্ধে যথোপযুক্ত ধারণা অর্জন করতে হলে সব চেয়ে ভালো উপায় কি, সেই কথাটা জিজ্ঞাসা করতে। সরল বৃদ্ধ পণ্ডিত অমনি তাঁর লাইব্রেরী ঘরে মই লাগিয়ে ওপরের শেল্‌ফ থেকে বাংলা ভাষার একখানি ব্যাকরণ পেড়ে আনলেন। আমাকে বললেন যে, দু' তিন সপ্তাহ বইটা ভালো করে পড়লে, ঠাকুরের মাতৃ-ভাষায় তাঁর কাব্য বুঝতে পারবো! এখানে বলে রাখি, টেন্যার মোটেই তামাশা করে কথা কন নি।

যাই হোক, এর কয়েক বছরের মধ্যেই রবীন্দ্রনাথের অপেক্ষাকৃত তাৎপর্যপূর্ণ রচনাগুলি বিভিন্ন ভাষায় অনূদিত হয়ে প্রকাশিত হতে লাগল। আর সেই সঙ্গে নোবেল পুরস্কার যে যোগ্যপাত্রেই অর্পণ করা হয়েছে, এ ধারণা সর্বত্রই স্বীকৃতি পেতে লাগল। ভারতেও এই পুরস্কার-প্রাপ্তি সর্বসাধারণের সানন্দ সমর্থন লাভ করে এবং সেই থেকে ভারতীয়রা আগ্রহ-ভরে বরাবরই নির্বাচন বা মনোনয়ন সম্পর্কে তাঁদের প্রস্তাব পাঠিয়েছেন। সাহিত্য-ক্ষেত্রে নোবেল পুরস্কারের গুরুত্বকে অতিরঞ্জিত না করেও বোধ হয় সঙ্গতভাবেই বলতে পারি যে সেদিন বাহান্ন বছরের কবিকে সম্মানিত করে, সুইডেন তাঁর আন্তর্জাতিক প্রতিষ্ঠার পথ প্রশস্ত করতে সাহায্য করেছিল। তাই আমার মনে হয়, এই ক্ষুদ্র বিবরণীর কিছু কৌতূহল-মূল্য থাকতে পারে।

সকলেই বোধ হয় জানেন যে বিংশ শতাব্দীর দ্বিতীয় দশকে রবীন্দ্রনাথ সুইডেনে দু'বার এসেছিলেন। রেশমের মত দীর্ঘ কুঞ্চিতকেশ সেই অপূর্বগঠন শির আজও চোখের সামনে দেখতে পাচ্ছি। মনে পড়ছে সেই মরমী দৃষ্টি—বিখ্যাত পর্যটক ও আবিষ্কারক স্বেন হেডিনের বাড়ীতে বসে সঞ্চরণশীল হ্রদ লপ-নরের কাহিনী নিবিষ্ট মনে শুনছেন গৃহস্বামীর মুখ থেকে! রবীন্দ্রনাথ প্রায়ই নিজের কথা তৃতীয় পুরুষে উল্লেখ করতেন : 'কবি বলেন...' তাঁর এই বাচনভঙ্গী কবিজনোচিত মূর্তির সঙ্গে সঙ্গতি রক্ষা করছে বলে আমাদের কাছে খুবই স্বাভাবিক মনে হয়েছিল।

রবীন্দ্রনাথের জীবন-চরিতেই প্রকাশ যে একদিকে তাঁর সৃজনশীল রচনা আর অপর দিকে, একই সঙ্গে সংস্কারক-শিক্ষক হিসাবে, তাঁর কর্মজীবন। কর্মের মাঝে মাঝে ধ্যান-গম্ভীর বিরতি—এই দ্বৈত সত্তার যতদূর সম্ভব পূর্ণ সদ্ব্যবহার তিনি করেছিলেন। অবশ্য ব্যাঘাত-জনিত চাঞ্চল্য তাঁর মানসকে যে একেবারে স্পর্শ করেনি তা নয়। তবে ওরই মধ্যে, গম্ভীর বহমান নদীর মতই তাঁর সত্তা ছিল প্রশান্তি-পূর্ণ। শ্রেষ্ঠ এই কবিপুরুষ উদারচরিত সাধকের মতো ঘুরে বেড়িয়েছেন, সমকালীনদের শ্রদ্ধার্ঘ্য গ্রহণ করে। এই নিরন্তর পরিভ্রমণ তাঁকে ভারতের অতুলনীয় অলংকার দূত হিসাবে চিহ্নিত করেছিল, যদিও ভারতের রাষ্ট্রীয় স্বাধীনতা তিনি দেখে যেতে পারেন নি।

তাঁকে 'ভারতের গয়টে' বলা হয়। উভয়ের মধ্যে একটা সাদৃশ্য হচ্ছে, অন্ধ জাতীয়তা-বাদ এবং রাজনৈতিক বাদ-বিসংবাদ সম্পর্কে একটা বিশেষ মনোভাব। উভয়ের মধ্যেই দেখা যায় সৃজনশীল মানুষের তন্ময়ত্ব, নির্দলীয় মানুষের আত্মরক্ষায় মাথা তুলে দাঁড়াবার দাবি।

পারস্পরিক জ্ঞানের উন্মোধনে প্রাচ্য ও প্রতীচ্যের ক্রমাগ্রসর মিলন বা সামঞ্জস্যপূর্ণ অন্বয়—এই ছিল রবীন্দ্রনাথের কাম্য আদর্শ। কিন্তু এই প্রচেষ্টাকে অন্যায়ভাবে আপোস বলে ভুল করা হয়েছিল। ভারতীয়দের মধ্যেও সমালোচকের অভাব ছিল না। তাঁদের বিবেচনায়, রবীন্দ্রনাথের কাব্যে বড় বেশি পাশ্চাত্ত্য প্রভাব আর সেই কারণেই পশ্চিমের পাঠক-সাধারণের চিত্ত তিনি অত সহজে জয় করতে পেরেছিলেন। একজন ভারতীয় সমালোচক তো বলেই ফেলেছিলেন : 'বাংলা দেশ য়ুরোপকে রবীন্দ্রনাথ দেয় নি—বরং য়ুরোপই রবীন্দ্রনাথকে দিয়েছে বাংলা দেশকে।'

এ কথা সত্য যে প্রাচীন উপনিষদের দর্শন আর বহু যুগসঞ্চিত জ্ঞানরহস্যের ঐতিহ্য-পুষ্ট রবীন্দ্রনাথের কাব্যপ্রেরণা এখনও আমাদের অনুপলব্ধ। কিন্তু য়ুরোপীয় পাঠক বুঝতে পারে যে তাঁর বাক্‌প্রতিমায় ভারতীয় পৌরাণিকতার প্রাচুর্য থাকলেও, কল্পনার বিচিত্র ঐশ্বর্য সত্ত্বেও তাঁর কাব্যশিল্প অনেকাংশেই সহজ ও মুক্ত। তাঁর কবি-কৃতি বোঝবার জন্য অন্তরিত কোনও জটিল তন্ত্রমন্ত্রের প্রয়োজন হয় না। তাঁর কাব্য যেন এক স্নিগ্ধশীতল ছায়াবীথি, অজানা পাখীদের কলগীতে মুখর। কিন্তু লতাগুল্মের ঘনবেষ্টন প্রবেশ-প্রার্থীদের বিমুখ করে না। কবি এক নিগূঢ় উচ্চ সত্যের সন্ধান দেন, তবে ইন্দ্রিয়দ্বার রুদ্ধ করে সব কিছু আনন্দ বর্জন করে যোগাসনে বসে নয়।

ভারতের যে প্রান্তে তিনি জন্মগ্রহণ করেন, সেখানে প্রবাহিণী মাতৃসমা পদ্মা নিয়তই তাঁকে বিচিত্র দ্যুতিময় নানা প্রতীক চিত্র জুগিয়েছেন; তারা যেন দেবী ও লক্ষ্মীর পূজায় উৎসৃষ্ট ভেসে-যাওয়া দীপাবলি। বড় সুন্দর হয়ে তাঁর সঙ্গীত বেজে ওঠে, যখন দূর থেকে কর্ম-ক্রীড়া-রত নিখিলের ধ্যানে তিনি মগ্ন। তাঁর একটি কবিতার একটি লাইনে আছে—'জগৎ-পারাবারের তীরে শিশুরা করে খেলা।' আর দিনের শেষে, ফুল যেমন মুদে আসে. কবিও তেমনি সহজ ভাবে বিদায় নেন,—বলেন : এই আনন্দভোজে বীণা বাজানোর ভার ছিল আমার উপর। যা জানি ও পারি, তা করেছি। এখন প্রভু তোমাকে শুধাই—শেষ ক্ষণ কি এল এবার যখন ভিতরে এসে তোমার মুখ দেখতে পাবো, উজাড় করে ঢেলে দেবো নিভৃত প্রাণের নৈবেদ্য?

কিন্তু আজকের দিনে এই সুষমার, এই মোহের কতটুকু রেশ টিকে আছে? এ প্রশ্নের অকুণ্ঠ জবাব দেওয়া যায় না। কারণ রবীন্দ্রনাথও তাঁর যুগেরই মানুষ। ভিক্টোরীয় ইংলণ্ডের একাধিক নিকট ও সমকালীন কবির মতই তাঁরও অদৃষ্টে ঘটেছে বিপর্যয়,—যখন প্রথম জীবনের বহু মধুময় উজ্জ্বল সৃষ্টি এই লৌহযুগের নূতন ঝঞ্ঝায় ঝরে' খসে গিয়েছে! স্বপ্নদ্রষ্টার পূতশুভ্র পরিচ্ছদ এ যুগের ঝুল-কালি আর রক্তবর্ষণে মানায় না। তবে তাঁর সেই রোমাণ্টিক হিন্দুস্থানের দর্শন পেতে হলে গ্রীষ্মের দিনে সূর্যোদয়ের আগেই উঠতে হয়, ব্রাহ্ম মুহূর্তে—যখন সব কিছুই নূতন ও স্বতন্ত্র—যখন এক অজানা দৈব উপস্থিতির অদৃশ্য পদক্ষেপে ঘাসের উপর শিশিরবিন্দু ঝলমলিয়ে ওঠে...

# আধুনিক সাহিত্য

আলোচ্য বইটি রবীন্দ্রশতবর্ষপূর্তি উপলক্ষে প্রকাশিত নানা বইয়ের মধ্যে একটি উল্লেখযোগ্য বই। এই বইটি প্রকাশিত হয়েছে টেগোর কমেমোরেটিভ ভল্যুম সোসাইটির পক্ষ থেকে। এর একটু ইতিহাস আছে। দুই বছর আগে আমেরিকার বিখ্যাত প্রতিষ্ঠান 'ফোর্ড ফাউন্ডেশন' পণ্ডিত নেহরু ও ডঃ রাধাকৃষ্ণনের সঙ্গে আলোচনা করে, সমসাময়িক সামাজিক প্রসঙ্গ সম্বন্ধে রবীন্দ্রনাথের নানা প্রবন্ধ ও বক্তৃতা থেকে নির্বাচিত কয়েকটি বিশিষ্ট রচনার ইংরেজি অনুবাদ ভারতবর্ষ ইংলণ্ড ও আমেরিকায় প্রচারের সিদ্ধান্ত করেন। তারই ফল এই বইটি।

ইয়োরোপ ও আমেরিকায় রবীন্দ্রনাথের প্রতিষ্ঠা হয় প্রথমত গীতাঞ্জলির কবি হিসাবে। ইংরেজি গীতাঞ্জলির পর রবীন্দ্রনাথের নাটক ও কবিতার অনুবাদের সঙ্গে সঙ্গে ইয়োরোপ ও আমেরিকায় বহুল প্রচার হয়েছিল মূল ইংরেজিতে লেখা একাধিক গদ্য রচনার বই, যেমন *Sadhana, Personality, Nationalism, Creative Unity, The Religion of Man*. এই রচনাগুলির মধ্যে পরিচয় পাওয়া যায় যেমন ভারতীয় ঐতিহ্যের বৈশিষ্ট্যের তেমনি একটি বিরাট মননশীল মনের যা সমৃদ্ধ হয়েছিল প্রাচ্য ও পাশ্চাত্ত্য ভাবধারার সঙ্গমে অবগাহন করে। কবিকে দার্শনিক বলা যে খুব সঙ্গত নয় *The Philosophy of Rabindranath Tagore*-এর লেখক ডঃ রাধাকৃষ্ণন একথা স্বীকার করেছেন। তবু রবীন্দ্রদর্শন বলে একটি বহুল প্রচলন আছে এবং এই কথাটি একেবারে নিরর্থক নয়। কেননা দার্শনিক না হলেও কবিদেরও একটা জীবনদর্শন থাকতে পারে। রবীন্দ্রনাথের জীবনদর্শন বলতে যা বোঝায় তা ঐ ইংরেজি বইগুলির মধ্যে যত স্পষ্টভাবে পাওয়া যায় তা বোধ হয় তাঁর বিরাট বাংলা রচনা-সাহিত্যেও পাওয়া যায় না। তার কারণ ইংরেজি রচনাগুলি তাঁর প্রৌঢ় বয়সের রচনা এবং ঐগুলিতে পাওয়া যায় রবীন্দ্রনাথের পরিণত চিন্তার সারমর্ম। কিন্তু রবীন্দ্রনাথের জীবনদর্শনের পুরো পরিচয় ইয়োরোপ, আমেরিকা এতদিন পায় নি কেননা *Nationalism* বাদে উল্লিখিত বইগুলিতে রবীন্দ্রনাথের আধ্যাত্মিক চিন্তাই বিশেষভাবে প্রকাশ পেয়েছে। অবশ্য রবীন্দ্রনাথের *Nationalism*-বইয়ের বক্তৃতাগুলি শুধু পাশ্চাত্ত্য দেশে নয় জাপানেও কিছু আলোড়ন সৃষ্টি করেছিল (এই বক্তৃতামালার শুরু হয় জাপানেই) কিন্তু সে আলোড়ন বেশি দিন স্থায়ী হয়নি। এ যেন একটা অপলাপ মাত্র—আসল রবীন্দ্রনাথ হলেন (ইয়োরোপ আমেরিকার চোখে) কবি ও মিস্টিক, বোধ হয় কবির থেকে মিস্টিকই বেশি, কেননা "গীতাঞ্জলি" বাদে রবীন্দ্রনাথের আর কোনো কাব্যগ্রন্থ ইয়োরোপ আমেরিকাকে অভিভূত করে নি। তার কারণ ভাষান্তরে কবিতার চরিত্রবিকার ঘটতে বাধ্য। তা ছাড়া রবীন্দ্রনাথ তাঁর কবিতাগুলি এত কাটছাঁট করে ইংরেজিতে অনুবাদ করেছিলেন যে মূল রচনার রস এই অনুবাদগুলিতে সামান্যই পাওয়া যায়। বিদেশী ভাষায় অনূদিত রবীন্দ্রনাথের নাটকগুলিও এই মিস্টিকের ছবিই আরও গাঢ় রঙে ফুটিয়ে তুলেছিল।

কিন্তু বাংলার মাটিতে এই যে একটি বিরাট মানুষ বছরের পর বছর, দিনের পর দিন, অবগাহন করেছেন প্রবহমান কালস্রোতে, সাড়া দিয়েছেন সমসাময়িক জীবনের ঘটনার পর

ঘটনায়, গদ্যে ও পদ্যে, বক্তৃতামঞ্চে ও মাসিকপত্রের পাতায়—তাঁর কতটুকু পরিচয় ইয়োরোপ আমেরিকা এতদিন পেয়েছিল?

এই অপরিচয় মোচনের যে চেষ্টা আলোচ্য বইতে হয়েছে তার সার্থকতার প্রমাণ পাওয়া যায় *Times Literary Supplement*-এর Embattled Idealist শিরোনামায় সমালোচনা প্রসঙ্গে এই উক্তিতে—

This volume of Tagore's essays, published to commemorate the centenary of his birth, will administer a salutary shock to those who think of him as a Shelleyan lyric poet or a purveyor of vaguely mystical conceits. He emerges from these pages as a tough-minded and courageous man, an idealist certainly, but one with a clear conception of the practical application of his ideals to the world. If his poetry often errs through a lack of concreteness, the fault is not carried over into his social and political thinking. In these essays he is lucid, practical and passionately embattled against superstition and sentimentality.

প্রসঙ্গক্রমে বলা যেতে পারে ইংরেজ কবি শেলিও অবশ্য ছিলেন embattled idealist—ম্যাথ্যু আর্নল্ড্ যাই বলুন না কেন।

বইটিতে রবীন্দ্রনাথের মোট আঠারোটি প্রবন্ধ বা বক্তৃতার ইংরেজি অনুবাদ সংকলিত হয়েছে, যথা : ১। শিক্ষার হেরফের (১৮৯২ সালে, অর্থাৎ রবীন্দ্রনাথের ৩১ বছর বয়সে সাধনা পত্রিকায় প্রকাশিত); ২। স্বদেশী সমাজ (১৯০৪); ৩। শিক্ষা-সমস্যা (১৯০৬); ৪। ততঃ কিম (১৯০৬); ৫। সভাপতির অভিভাষণ (১৯০৮ সালে রাজসাহীতে বঙ্গীয় প্রাদেশিক সম্মেলনে পঠিত); ৬। পূর্ব ও পশ্চিম (১৯০৮); ৭। হিন্দু বিশ্ববিদ্যালয় (১৯১১); ৮। যাত্রার পূর্বপত্র (১৯১২ সালে ইয়োরোপ যাত্রার প্রাক্কালে শান্তিনিকেতন আশ্রমবাসীদের কাছে লিখিত); ৯। কর্তার ইচ্ছায় কর্ম (১৯১৭); ১০। *The Centre of Indian Culture* (ইংরেজিতে লেখা : ১৯১৯); ১১। শিক্ষার মিলন (১৯২১); ১২। সত্যের আহ্বান (১৯২১); ১৩। স্বরাজ সাধন (১৯২৫); ১৪। *A Poet's School* (ইংরেজি রচনা : ১৯২৬); ১৫। পল্লী-প্রকৃতি (১৯২৮); ১৬। সমবায় (১৯২৯)। ১৭। কালান্তর (১৯৩৩); ১৮। সভ্যতার সংকট (১৯৪১)।

এর চাইতেও ভালো সংকলন হতে পারত কিনা সে বিষয়ে নিশ্চয় মতভেদ ঘটতে পারে। কোনো বড় লেখকের সমগ্র রচনাবলী থেকে এমন কোনো সংকলন বাছাই করা যায় কি যা সকলের মনঃপূত হবে? আলোচ্য সংকলনটি তৈরি করতে কিন্তু চেষ্টার ত্রুটি হয়নি। প্রথমত বাছাই করা হয়েছিল ত্রিশটি প্রবন্ধ ও এই বাছাই করার ভার দেওয়া হয়েছিল এমন ছত্রিশজন ব্যক্তির ওপর রবীন্দ্রসাহিত্যের সঙ্গে যাঁদের অন্তরঙ্গ ও গভীর পরিচয় সর্বজন-স্বীকৃত, যেমন : প্রশান্তচন্দ্র মহলানবিশ, প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায়, রাজশেখর বসু, পুলিন-বিহারী সেন, কাজি আবদুল ওদুদ, অমল হোম, নীহাররঞ্জন রায়, সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়, কালিদাস নাগ, বুদ্ধদেব বসু, হীরেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়, প্রবোধচন্দ্র সেন ইত্যাদি। দ্বিতীয়ত, এঁরা যে ত্রিশটি প্রবন্ধ বাছাই করেছিলেন তার ইংরেজি অনুবাদ ভারতবর্ষ ব্রিটেন ও আমেরিকার বিশিষ্ট সাহিত্যিক ও পণ্ডিতদের কাছে পাঠিয়ে তাঁদের যুক্তি অনুসারে এই

প্রবন্ধগুলি থেকে বইটির আঠারোটি প্রবন্ধ নির্বাচন করা হয়। এ ছাড়া আর কি উপায় ছিল জানি না।

*Times Literary Supplement*-এর মতে বইটির নামকরণও সার্থক হয়েছে কেননা, Whether he is writing about the theory of education, local political questions, world issues, economics, poetry, religion or whether he is describing the fundamentals of an endemic Indian culture or lecturing his compatriots out of their inertia, his thought begins with and continually refers back to his ideal of 'Universal Man' and a world society established by intelligence and maintained by tolerance.

রবীন্দ্রসাহিত্যের সঙ্গে যাঁদের ঘনিষ্ঠ পরিচয় আছে তাঁদের মনে করিয়ে দেওয়ার প্রয়োজন নেই যে রবীন্দ্রনাথের কৈশোর রচনাতেও বিশ্বমানবের ধ্যান অত্যন্ত স্পষ্টভাবে পাওয়া যায়। ষোলো বৎসর বয়সে লেখা "কবি-কাহিনী" থেকে একটি দৃষ্টান্ত দেওয়া যেতে পারে—

হিমাদ্রি, মানুষ সৃষ্টি আরম্ভ হইতে
অতীতের ইতিহাস পড়েছ সকলি,
অতীতের দীপশিখা যদি হিমালয়
ভবিষ্যৎ অন্ধকার পারে গো ভেদিতে,
তবে বল কবে গিরি, হবে সেই দিন
যে দিন স্বর্গই হবে পৃথ্বীর আদর্শ!
সে দিন আসিবে গিরি, এখনই যেন
দূর ভবিষ্যৎ সেই পেতেছি দেখিতে
যেই দিন এক প্রেমে হইয়া নিবন্ধ
মিলিবেক কোটি কোটি মানবহৃদয়।

কিন্তু এই সঙ্গে এই কথাও মনে রাখা দরকার যে রবীন্দ্রনাথের সাহিত্য, বিশেষভাবে তাঁর কাব্য, পুষ্ট হয়েছে বাংলার মাটির রসে। এই বইটির ভূমিকায় শ্রীযুক্ত হুমায়ুন কবির এই প্রসঙ্গে বলেছেন যে জমিদারির কাজ তদারক করার জন্যে রবীন্দ্রনাথকে যখন পদ্মার ধারে বাস করতে হয়েছিল তখন তিনি secured entry into a world unknown to the majority of the new educated class and struck roots in some of the deepest levels of the collective consciousness of the people. এইভাবে শুরু হল বাঙালির মননে নতুন এক অধ্যায়। বাংলাদেশকে বাঙালি নতুন করে দেখল রবীন্দ্রনাথের চোখ দিয়ে। ভাষান্তরিত রবীন্দ্রকাব্যে বাংলার মাটির সৌরভ উবে গিয়েছে বলে *Times Literary Supplement*-এর সমালোচক তাতে concreteness অভাবের কথা উল্লেখ করেছেন।

বাংলাদেশের ও বাঙালির সমস্যা রবীন্দ্রনাথের মনকে কী ভাবে পঞ্চাশ বছর ধরে ক্রমাগত নাড়া দিয়েছে তার পরিচয় আলোচ্য প্রবন্ধগুলিতে বারবার পাওয়া যায়। এই প্রসঙ্গে কবির সাহেব তাঁর মূল্যবান ভূমিকাতে উল্লেখ করেছেন যে কোনো কোনো সমালোচক অভিযোগ করেছেন যে ১৯০৮ সাল পর্যন্ত রবীন্দ্রনাথের চিন্তাকে আচ্ছন্ন করেছিল ভারত-

বর্ষ ততটা নয় যতটা বাংলাদেশ আর তাঁর মনের টান ছিল বিশেষ করে হিন্দুদের ওপর। এই অভিযোগের উত্তরে রবীন্দ্রনাথের 'হিন্দু বিশ্ববিদ্যালয়' প্রবন্ধের একটি অংশ উদ্ধার করা যেতে পারে—

"বাঙালি বাংলা ভাষার বিশেষত্ব অবলম্বন করিয়াই সাহিত্যের যদি উন্নতি করে তবেই হিন্দিভাষীদের সঙ্গে তাহার বড়ো রকমের মিল হইবে। সে যদি হিন্দুস্থানীদের সঙ্গে সস্তায় ভাব করিয়া লইবার জন্য হিন্দির ছাঁদে বাংলা লিখিতে থাকে তবে বাংলা সাহিত্য অধঃপাতে যাইবে এবং কোনো হিন্দুস্থানী তাহার দিকে দৃক্‌পাতও করিবে না। আমার বেশ মনে আছে অনেকদিন পূর্বে একজন বিশেষ বুদ্ধিমান শিক্ষিত ব্যক্তি আমাকে বলিয়াছিলেন, 'বাংলা সাহিত্য যতই উন্নতিলাভ করিতেছে ততই তাহা আমাদের জাতীয় মিলনের পক্ষে অন্তরায় হইয়া উঠিতেছে। কারণ এ সাহিত্য যদি শ্রেষ্ঠতা লাভ করে তবে ইহা মরিতে চাহিবে না—এবং ইহাকে অবলম্বন করিয়া শেষ পর্যন্ত বাংলা ভাষা মাটি কামড়াইয়া পড়িয়া থাকিবে। এমন অবস্থায় ভারতবর্ষে ভাষার ঐক্যসাধনের পক্ষে সর্বাপেক্ষা বাধা দিবে বাংলা ভাষা। অতএব বাংলা সাহিত্যের উন্নতি ভারতবর্ষের পক্ষে মঙ্গলকর নহে।' সকল প্রকার ভেদকে ঢেঁকিতে কুটিয়া একটা পিণ্ডাকার পদার্থ গড়িয়া তোলাই জাতীয় উন্নতির চরম পরিণাম, তখনকার দিনে ইহাই সকল লোকের মনে জাগিতেছিল। কিন্তু আসল কথা বিশেষত্ব বিসর্জন করিয়া যে সুবিধা তাহা দু-দিনের ফাঁকি—বিশেষত্বকেই মহত্ত্বে লইয়া গিয়া যে সুবিধা তাহাই সত্য।

"আমাদের দেশে ভারতবর্ষীয়দের মধ্যে রাষ্ট্রীয় ঐক্যলাভের চেষ্টা যখনই প্রবল হইল, অর্থাৎ যখনই নিজের সত্তা সম্বন্ধে আমাদের বিশেষভাবে চেতনার উদ্রেক হইল তখনই আমরা ইচ্ছা করিলাম বটে মুসলমানদিগকেও আমাদের সঙ্গে এক করিয়া লই, কিন্তু তাহাতে কৃতকার্য হইতে পারিলাম না। এক করিয়া লইতে পারিলে আমাদের সুবিধা হইতে পারিত বটে, কিন্তু সুবিধা হইলেই যে এক করা যায় তাহা নহে। হিন্দু মুসলমানের মধ্যে যে একটি সত্য পার্থক্য আছে তাহা ফাঁকি দিয়া উড়াইয়া দিবার জো নাই। প্রয়োজনসাধনের আগ্রহবশত সেই পার্থক্যকে যদি আমরা না মানি তবে সেও আমাদের প্রয়োজনকে মানিবে না।"

কবির সাহেব তাঁর ভূমিকায় রবীন্দ্রনাথের এই কথারই সারমর্ম ব্যাখ্যা করেছেন। ভারতীয় ঐতিহ্যের বিচিত্র ধারার সঙ্গে রবীন্দ্রনাথের পরিচয় কতটা অন্তরঙ্গ ছিল তার নিদর্শন ছড়িয়ে আছে সমগ্র রবীন্দ্র-সাহিত্যে। কিন্তু রবীন্দ্রনাথ শতাব্দীবাহিত ভারতীয় সাধনার স্বরূপ উপলব্ধি করেছিলেন বাংলাদেশের মাটিতে দাঁড়িয়ে।

আজকাল কারও কারও মুখে শোনা যায় সর্বভারতীয় ঐক্য প্রতিষ্ঠার জন্যে ভারতবাসীর ধ্যান হওয়া উচিত—আগে ভারতবাসী তারপর বাঙালি, গুজরাটি, মারাঠি ইত্যাদি। রবীন্দ্রনাথের বাণী এই আদর্শের প্রতিবাদ। নিবিড়ভাবে বাঙালি ছিলেন বলেই রবীন্দ্রনাথ সমগ্র ভারতবর্ষের মহত্তম প্রতিনিধি হতে পেরেছিলেন আর এই বাঙালিত্বের মধ্যে দিয়েই তাঁর ধ্যানে সত্য হয়ে উঠেছিল বিশ্বমানবের আদর্শ।

পদ্মার বক্ষে নৌকোয় দিনের পর দিন একলা থাকার সময়ে রবীন্দ্রনাথ যেমন একদিকে দেখেছিলেন দ্যুলোকের শিল্পী প্রহরের পর প্রহর নদীর স্রোতে রচনা করছেন আলোছায়ার আলপনা তেমনি দেখেছিলেন বাংলার গ্রামবাসীদের অবর্ণনীয় জলকষ্ট। 'স্বদেশী সমাজ' প্রবন্ধের জন্ম হয়েছিল এই মর্মান্তিক অভিজ্ঞতা থেকে। জীবনের প্রান্তে এসে আবার যৌবনের এই অভিজ্ঞতার স্মৃতি হল 'সভ্যতার সংকট'-এর প্রেরণা। দু'শ বছরের ব্রিটিশ

শাসনের পর দেশে অর্থাৎ যে বাংলা দেশকে তিনি অন্তরঙ্গভাবে জানতেন সেই দেশে জলের অভাব ও শিক্ষার অভাব তাঁকে কী রকম বিচলিত করেছিল সেই সময়ে যাঁরা কবির কাছাকাছি ছিলেন তাঁরা জানেন। তবু শেষ পর্যন্ত তিনি ঘোষণা করলেন, 'মানুষের প্রতি বিশ্বাস হারানো পাপ'। এই বিশ্বাস রবীন্দ্রনাথ দিয়ে গেলেন সমগ্র বিশ্বকে তাঁর চরম দান হিসেবে।

রবীন্দ্রনাথের সামাজিক বা রাষ্ট্রিক চিন্তায় কোথাও যে কোনো ত্রুটি নেই সে কথা নিশ্চয়ই বলা চলে না; তাঁর চিন্তার ধারা রাষ্ট্রতত্ত্বের বা সমাজতত্ত্বের বিজ্ঞান-নির্দিষ্ট প্রণালীতে সব সময়ে হয়তো প্রবাহিত হয়নি। কিন্তু এ হল নিতান্তই গৌণ ব্যাপার। রবীন্দ্রনাথের উন্মুখ সতেজ মনের পরিচয় পাওয়া যায় তাঁর সমাজ ও রাষ্ট্রচিন্তায়। এই পরিচয় স্তরে স্তরে উদ্ঘাটিত হয়েছে *Towards Universal Man* বইতে।

শ্রীযুক্ত হুমায়ুন কবিরের ভূমিকা এই বইটির উল্লেখযোগ্য অংশ। কবির সাহেব কোথাও কোথাও হয়তো এমন কথা বলেছেন যা সকলে মেনে নিতে পারেন না। কিন্তু রবীন্দ্রনাথকে পুরোপুরি ও সব দিক দিয়ে বিচার করে এমন কথা আজ পর্যন্ত কে বলেছেন যা সর্বজনগ্রাহ্য হয়েছে? রবীন্দ্রনাথের কীর্তি বিরাট ও বিচিত্র বলেই তা সম্ভব নয়।*

হিরণকুমার সান্যাল

*Towards Universal Man *By* Rabindranath Tagore. Asia Publishing House, Bombay. Rs. 12.50.

# সমালোচনা

**বিচিত্রা**—রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর। বিশ্বভারতী, কলিকাতা ৭। মূল্য ছয় টাকা।

রবীন্দ্র শতবর্ষপূর্তি উপলক্ষ্যে বিশ্বভারতী এই সংকলন গ্রন্থটি প্রকাশ করেছেন। যে কোনো সংকলনগ্রন্থ নিয়ে খুঁতখুঁত করা মোটেই দুঃসাধ্য নয়, বিশেষত যখন রবীন্দ্রনাথের মতো লেখকের রচনা নিয়ে সে-গ্রন্থ সংকলিত। বিশ্বভারতীর উদ্যোক্তারা এই দুরূহ দায়িত্ব সম্বন্ধে সম্পূর্ণ অবহিত, রবীন্দ্র-সাহিত্যের জনকয়েক সুপরিচিত সুধীর সহযোগিতায় ও সুযোগ্য সম্পাদকের বিচার বুদ্ধিতে এই দুরূহ কার্য সুসম্পন্ন হয়েছে। এই সংকলন গ্রন্থের মূল উদ্দেশ্য সুধীরঞ্জন দাস মহাশয় যেভাবে ব্যক্ত করেছেন তা' সাধিত হয়েছে, অর্থাৎ এ-গ্রন্থে বিশাল রবীন্দ্রবর্ষের কথঞ্চিৎ দিগ্‌দর্শন সম্ভব হয়েছে। গ্রন্থের তিনটি প্রধান অংশে ভারসাম্য রক্ষা পেয়েছে। প্রবন্ধ অংশে ৩১৮ পৃষ্ঠা, আখ্যান অংশে (অর্থাৎ গল্প, উপন্যাস, গদ্যনাট্য, কাব্যনাট্য) ৪৫২ পৃষ্ঠা, কবিতা অংশে ২৩৫ পৃষ্ঠা। নেহাৎ পাটোয়ারি বিচারেও এ-গ্রন্থের ক্রেতা সামান্য অর্থব্যয়ের বিনিময়ে অনেকগুণ বেশি দামের জিনিস পাবেন। কতকগুলি ছোটোগল্প ছাড়া এখানে আছে গোটা একটি উপন্যাস "চতুরঙ্গ", চার চারটে নাটক, "লক্ষ্মীর পরীক্ষা," "বিসর্জন", "ডাকঘর", "মুক্তধারা"। এমন কবিতা ও গান সংকলিত হয়েছে যাদের সৌন্দর্য সর্বজন স্বীকৃত। আমার নিজ বিচারে এ-সংকলনের প্রবন্ধ অংশ সবচেয়ে মূল্যবান, এ-অংশে এমন কতকগুলি প্রবন্ধ ও চিঠিপত্র সমাবেশিত হয়েছে যা সচরাচর সাধারণ পাঠকের হাতের কাছে থাকে না। দুরূহ কাজে নিযুক্ত হয়ে সংকলন কর্তা সংবেদনশীল বিচার বুদ্ধির পরিচয় দিয়েছেন।

এ-গ্রন্থের সংকলিত রচনাগুলি সম্বন্ধে সম্বিচারী আলোচনার অবকাশ রিভিউ-প্রবন্ধে নেই কেননা এ-রচনাগুলির আলোচনা মানে সমগ্র রবীন্দ্র-সাহিত্যের আলোচনা, তেমন আলোচনার স্থান প্রবন্ধে তো নয়ই, বৃহদায়তন পুস্তকে যদি-বা আছে (তেমন পুস্তক অবশ্য বাঙলা ও অন্য ভাষায় এখনো আছে), আমার সংশয় রবীন্দ্রনাথের বিচিত্র সর্বত্রগামী প্রতিভা সম্বন্ধে সম্যক ধারণা করার জন্য—সে-প্রতিভার দিকে নির্দেশ বহন করেছে বর্তমান সংকলন গ্রন্থের সার্থক নামকরণ—সমগ্র রবীন্দ্র-সাহিত্য বিচারের, রবীন্দ্র-প্রতিভার সমঞ্জস রূপচিন্তনের সময় এসেছে কি? কত যে বিচিত্র এই প্রতিভা তার কিছু গৌণ প্রমাণ পাওয়া যায় এই শতবর্ষপূর্তি বৎসরে রবীন্দ্রনাথ সম্বন্ধে যে-অসংখ্য প্রবন্ধ ও আলোচনা প্রকাশিত হয়েছে সেদিকে নজর করলে। সমগ্রভাবে মূল্যায়নের জন্য চাই প্রমাণ-নিষ্ঠ তথ্যানুগ সমানুভূতিসম্পন্ন সহৃদয় আলোচনা, কিন্তু তেমন আলোচনা এখন সম্ভব কি? আমার বিচারে সম্ভব নয়, কেন সম্ভব নয় তা'র কয়েকটি কারণ পেশ করি।

১। রবীন্দ্রনাথের যাবতীয় রচনা এখনো সাধারণ পাঠকের অধিগম্য কিনা সন্দেহ। অনেক চিঠিপত্র এখনো প্রকাশিত হয়নি, এখনো সহসা কোনো সাময়িকী পত্রে অপ্রকাশিত-পূর্ব রচনা প্রকাশিত হচ্ছে।

২। রবীন্দ্রনাথের গ্রন্থপঞ্জী প্রস্তুত হয়নি, হয়তো কেউ এ কার্যের অধিকারী আছেন

কিন্তু এখন অবধি সম্পূর্ণ গ্রন্থপঞ্জী লোক সমক্ষে নেই। আমি গ্রন্থতালিকার কথা ভাবছি না, ভাবছি আধুনিক গ্রন্থবিজ্ঞানসম্মত পঞ্জীর কথা, যেমন পঞ্জী (পরিতাপের বিষয়) আমাদের সাহিত্যে আদৌ নেই, বিব্লিঅগ্রাফি কথাটির বড়ই অপব্যবহার শুনতে পাই চারদিকে, অথচ সুসম্বন্ধ গ্রন্থপঞ্জী বিদেশী ভাষায় প্রচুর। ইংরেজ গ্রন্থপঞ্জীবিৎ টি. জে. ওয়াইজ-এর অ্যাশ্‌লে লাইব্রেরী ক্যাটালগ ব্যবহার করলে (যদিও ওয়াইজ মহোদয়ের সততা সম্বন্ধে কিছু সন্দেহের অবকাশ আছে) শুধু পঞ্জীপ্রমাণে সমালোচকের প্রভূত উপকার হয়। পাণ্ডুলিপি সম্বন্ধে, গ্রন্থের বহিরঙ্গ সম্বন্ধে, প্রতিটি তথ্য, গ্রন্থের বিবিধ সংস্করণ সম্বন্ধে তথ্য ইত্যাদি কত না তথ্য বিব্লিঅগ্রাফি শাস্ত্রের কল্যাণে আধুনিক সমালোচকের সাধ্যায়ত্ত। রবীন্দ্রপ্রতিভার সম্যক আলোচনার পূর্বে এ সমস্ত তথ্যের পরিবেশন হওয়া নিতান্ত প্রয়োজন।

এসব তথ্যের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট অন্য এক শ্রেণীর তথ্যও আবশ্যক। রবীন্দ্রনাথের কোনো একখানা বইয়ের কথা চিন্তা করুন, ধরা যাক, "সোনার তরী"। প্রত্যেকটি কবিতার জন্মবৃত্তান্ত লিপিবন্ধ হওয়া দরকার; যত তথ্য প্রমাণ আমাদের আয়ত্তে আছে তার সাহায্যে এ-বৃত্তান্ত রচিত হবে। কবে, কেন, কোথায়, কোন আত্মিক ও সাংসারিক পরিবেশে কবিতাগুলি রচিত হয়েছিল, কোথায় কীভাবে প্রকাশিত হয়েছিল, প্রকাশের পরে সমকালীন পাঠকজগতে প্রতিক্রিয়া কেমন হয়েছিল? কবিতাগুলির After-history কী? শেক্‌সপীয়রের রচনাবলী সম্বন্ধে এহেন বিস্তীর্ণ তথ্য আমাদের আয়ত্তে আছে। রবীন্দ্ররচনা সম্বন্ধে ঠিক ততটা বিস্তীর্ণ তথ্য সমাবেশ যদিও বা এখনই সম্ভব না হয়, কিছুটা শাদামাটা হিসাবে হওয়া আদৌ দুরূহ নয়।

৩। গ্রন্থপঞ্জীর সঙ্গে সঙ্গে চিত্রপঞ্জী প্রস্তুত হওয়া একান্ত দরকার। এই দুখানা পঞ্জী ও রবীন্দ্রনাথের বিস্তৃত জীবনকাহিনী আমাদের হাতের কাছে থাকলে হয়তো কোনো কোনো সাম্প্রতিক সমালোচনার শিথিল দায়িত্ব অনুমান-সর্বস্বতার দৌরাত্ম্য থেকে আমরা রেহাই পেতাম। তার চেয়েও বড়ো কথা, চিত্রশিল্প ও সাহিত্যশিল্প দুইয়ের তুলনায় উভয় শিল্প সম্বন্ধেই আমাদের জ্ঞান ও উপভোগ উজ্জ্বলতর হ'ত, আমরা আরো ভালো বুঝতে পারতাম এক শিল্পে অভূতপূর্ব পারঙ্গমতায় সমৃদ্ধ হয়েও কোন তীব্র সৃজনী প্রেরণায় তিনি অনভ্যস্ত অন্য শিল্পকর্মে নিযুক্ত হয়েছিলেন, চিত্রশিল্পের একান্ত শৈল্পিক রূপে তিনি এমন কোনো সুযোগ পেয়েছিলেন কি যা সাহিত্যশিল্পে পাওয়া সম্ভব নয়?

৪। তাঁর অন্যান্য রচনাবলীর কথা ছেড়ে দিয়েও শুধু কবিতাগুলির ও কোনো ভেরিয়রিঅরাম্‌ সংস্করণ আমাদের সম্মুখে নেই। অথচ ইয়েট্‌সের কবিতার প্রামাণ্য ভেরিয়রিঅরাম্‌ সংস্করণ কবেই বেরিয়ে গেছে যদিও রবীন্দ্রনাথের মৃত্যুর মাত্র দু'বছর আগে তাঁরও মৃত্যু হয়েছিল। নিষ্ঠাবান সমালোচকের পক্ষে এহেন সংস্করণ অতীব মূল্যবান। কবির যে কোনো কবিতা সম্পর্কে আলোচনায় যদি প্রবৃত্ত হই, তখন যদি কবিতাটির পাণ্ডুলিপি আমাদের সামনে থাকে আর সেই সঙ্গে থাকে প্রথম প্রকাশ থেকে কবির জীবৎকাল অবধি প্রকাশিত সব কয়টি সংস্করণের পাঠান্তর, তা হলে সেগুলির তুলনায় মূল্যবান সিদ্ধান্তে পৌঁছনো সম্ভব। বিদেশী সাহিত্যের সমালোচনায় এই পদ্ধতির অনেক সুন্দর দৃষ্টান্ত দেখা যায়। কীট্‌সের 'ওড্‌ টু নাইটিঙ্গেল্‌' কবিতার পাণ্ডুলিপি বিচারে অধ্যাপক রিড্‌লে প্রমাণ করেছেন যে এ কবিতার পাঠান্তরে শুধু দুচারিটি শব্দপ্রয়োগের তারতম্যই হয়নি, কবির চিন্তারও বিবর্তন হয়েছে, কাব্যবস্তু অনেকটা বদলে গেছে। রবীন্দ্রনাথের পাণ্ডু-

লিপিতেও কি এহেন প্রগাঢ় বিবর্তনের নিদর্শন পাওয়া যাবে? "সঞ্চয়িতা"র ও অন্যান্য কোনো কোনো গ্রন্থে যে কয়েকটি ফটোস্টাট দেখতে পাই সেগুলির নির্ভরে মনে হয় যে রবীন্দ্রনাথের পাণ্ডুলিপিগুলিতে অনেক মূল্যবান চিন্তাসংযোগের আকর বিদ্যমান। পাণ্ডু-লিপি অবশ্য সাধারণ পাঠকের অধিগম্য নয়, তার জন্য থাকবে ভেরিয়রম্ সংস্করণ। কিন্তু শুধু পাণ্ডুলিপি নয়, বিভিন্ন সংস্করণের পাঠান্তর ও রূপান্তর লক্ষ্য করতে পারলেও আমাদের সমালোচনা শক্তিমান হতে পারে। "বিচিত্রা"-গ্রন্থে দেখতে পাচ্ছি একাধিক আকর-গ্রন্থের ব্যবহার হয়েছে। সূচীপত্রের নির্দেশ থেকে জানতে পাই যে কোনো ক্ষেত্রে ১৩৪০ সালের "সঞ্চয়িতা"র পাঠগ্রহণ করা হয়েছে, কোনো ক্ষেত্রে প্রথম সংস্করণ "চয়নিকা"র পাঠ, কোনো ক্ষেত্রে চতুর্থ সংস্করণ "চয়নিকা"র পাঠ। বর্তমান সম্পাদক কোন্ যুক্তিতে বিভিন্ন পাঠ গ্রহণ করেছেন তা জানাননি, আমার অনুমান যে মূলতঃ সংক্ষেপীকৃত পাঠ ছিল তাঁর লক্ষ্য, কিন্তু বর্তমান সম্পাদনার যুক্তি ও প্রণালী আমার আলোচ্য নয়। আমার প্রশ্ন, রবীন্দ্রনাথ নিজেই কেন বিভিন্ন সংস্করণে বিভিন্ন পাঠ প্রবর্তিত করেছিলেন? এ সব পাঠান্তরের পটভূমিতে কোনো শৈল্পিক উদ্দেশ্য বা শৈল্পিক মূল্য উপস্থিত ছিল কি? আমার কথাটি পরিষ্কার করার জন্য ইয়েট্সের একটি কবিতা লক্ষ্য করছি। কবিতাটির নাম The Sorrow of Love, এটি প্রথমে প্রকাশিত হয়েছিল *The Rose* নামক কাব্যগ্রন্থে ১৮৯৩ সালে। নিচে কবিতাটির প্রথম পাঠ ও পরবর্তী পাঠ দুই দিলাম, বাঁদিকের ছত্রগুলিতে প্রথম পাঠ ডান দিকেরগুলিতে শেষের পাঠ।

প্রথম পাঠ : The quarrel of the sparrows in the eaves,
The brawling of a sparrow in the eaves.

দ্বিতীয় পাঠ : The brilliant moon and all the milky sky,
The brilliant moon and all the milky sky,
And all that famous harmony of leaves,
And all that famous harmony of leaves.
Had blotted out man's image and his cry.

And then you came with those red mournful lips,
A girl arose that had red mournful lips
And with you came the whole of the world's tears,
And seemed the greatness of the world in tears,
And all the trouble of her labouring ships
Doomed like Odysseus and the labouring ships
And all the trouble of her myriad years.
And proud as Priam murdered with his peers.

Arose, and on the instant clamourous eaves,
Arose, and on the instant clamourous eaves,

A curd-pale moon upon an empty sky,
A climbing moon upon an empty sky,
And all that lamentation of the leaves,
And all that lamentation of the leaves
Are shaken with earth's ald and weary cry.
Cloud but compose man's image and his cry.

পাঠ দুইটির অন্তর্বর্তী কালে ইয়েট্সের কাব্যচিন্তায় প্রগাঢ় পরিবর্তন ঘটেছিল, সে পরিবর্তনের ছাপ শেষ পাঠান্তরে। প্রথম পাঠে যেখানে যা কিছু ছিল কাব্যিক, নমনীয়, মৃদু, সে সব বর্জন করে কবি এখন ইস্পাত-কঠিন সংহতির প্রয়াসী। প্রথম ছত্রের quarrel বদলে brawling লেখা হয়েছে, নতুন শব্দটিতে রূঢ়তার আমদানী হয়েছে। কবি এখন কর্কশ পৌরুষের অভিলাষী। দশম ছত্রে ছিল curd-pale moon, কাব্যিকতার চেষ্টায় ক্লান্ত, তার বদলে এসেছে climbing—ঋজু আবেদনসম্পন্ন কথা। শেষ ছত্রের earth's old and weary cry, রোমাণ্টিক কল্পনা বিলাসে বিলম্বিত স্বরবর্ণের ধূসর গোধূলির দিকে হাত বাড়িয়েছে, কিন্তু man's image and his cry ভাব সংহত এবং প্রতীকী ইশারার সন্ধানী। প্রথম পাঠের সমস্ত আবছায়া উল্লেখ ছেঁটে ফেলে বাকপ্রতিমাগুলিকে এখন প্রত্যক্ষ, সাবয়ব করা হয়েছে, এখন 'তুমি'র বদলে বিশেষ একটি কন্যার উল্লেখ হয়েছে, অডিসিয়ুস্ ও প্রিয়ামের উল্লেখে ট্রয়ের সংগ্রাম সুনির্দিষ্ট হয়েছে। প্রথম পাঠটিতে ইয়েট্স্-কাব্যের তরুণ রূপ, দ্বিতীয়টিতে পরিণত রূপ। রবীন্দ্রনাথের কাব্যেও কি এহেন পরিমার্জনা হয়েছিল পাঠ থেকে পাঠান্তরে, এমন পরিমার্জনা যাতে তাঁর কাব্যকারুর বিবর্তনের ইতিহাস বিধৃত? পরিশ্রমী পাঠক অবশ্য এখনো সমস্ত সংস্করণ সামনে রেখে তুলনায় প্রবৃত্ত হতে পারেন কিন্তু প্রামাণ্য ভেয়ারিঅরম্ সংস্করণ প্রস্তুত হলে ভবিষ্যতে অনেক অনর্থক পরিশ্রমের লাঘব হবে।

৫। সবচেয়ে বেশি দরকার রবীন্দ্রনাথের সম্পূর্ণ জীবন কাহিনী। একথা বলার সময় আমি অশেষ কৃতজ্ঞতার সঙ্গে প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায় মহাশয়ের মূল্যবান জীবনীর কথা বিস্মৃত হইনি কিন্তু স্যর এড্মণ্ড্ চেম্বার্স যে ধরনের শেক্স্পীয়র-জীবনী রচনা করেছেন, সে ধরনের সর্বগ্রাহী অনুরাগে রবীন্দ্রনাথের জীবনের যাবতীয় ঘটনা লিপিবন্ধ ও পঞ্জীকৃত হওয়া দরকার। আমার কল্পিত এই জীবনীতে শুধুই সাহিত্যিক ঘটনা স্থান পাবে না, রবীন্দ্রনাথের সহস্রমুখী প্রতিভা থেকে উৎসারিত প্রতিটি কর্মের সন্ধান পাওয়া যাবে। প্রমাণ নির্ভরে লিপিবন্ধ থাকবে রবীন্দ্রনাথ কবে কোন্ রচনায় কোন্ চিত্রকর্মে নিযুক্ত ছিলেন, সে সব কর্ম কবে সাঙ্গ হল; কোন্ কোন্ বই তিনি পড়েছেন, কাদের সঙ্গে মিলেছেন। এ গ্রন্থে থাকবে তাঁর অন্যান্য সব কর্মের বিবরণ—ধর্মীয়, রাজনৈতিক, সামাজিক, শৈল্পিক, ব্যবহারিক জীবনের অসংখ্য ঘটনাবলী। সার্থকনামা "বিচিত্রা" গ্রন্থে রবীন্দ্র-প্রতিভার বৈচিত্র্য ও বিশালতার দিকে ইশারা আছে, যে-বিচিত্রের সন্ধানী রবীন্দ্রনাথ ছিলেন সারাজীবন: 'জগতের মাঝে কত বিচিত্র তুমি হে/তুমি বিচিত্ররূপিণী।' বিচিত্র প্রতিভার প্রতিটি দিক আলোচনা করার কালে অন্য প্রতিটি দিক সম্বন্ধে অবহিত হতে হবে, একটি দিক নিয়ে যিনি বই বা প্রবন্ধ লিখবেন তাঁর বইয়ে বা প্রবন্ধে অন্য দিকগুলির সংযোগ সূত্র নির্দিষ্ট হবে, তবেই না রবীন্দ্রপ্রতিভার যোগ্য আলোচনা হবে। আজ এই মুহূর্তে অনেক ব্যক্তি আমাদের মধ্যে আছেন যাঁরা রবীন্দ্রনাথকে জানতেন। রবীন্দ্রনাথের ব্যক্তিত্ব সম্বন্ধে

এ'দের নিজেদের ধারণা থাকার দরুণ যে-ধারণার পরিপ্রেক্ষিতে এ'রা রবীন্দ্রনাথের কর্ম সম্বন্ধে যত সহজে আলোচনা করতে পারেন, ভবিষ্যতের পাঠক সাক্ষাৎ পরিচয়ের সেই অমূল্য সুযোগ থেকে বঞ্চিত হবেন, তাঁদের জন্য (কেননা তাঁদের অনুরাগেই রবীন্দ্রনাথ চিরজীবী থাকবেন) এ যুগের বাঙালীর কর্তব্য রবীন্দ্রনাথ সম্পর্কিত যাবতীয় আকর তথ্য সংগ্রহ করা, লিপিবন্ধ করা।

সাধারণ বিচারে এসব কাজ হয়তো খুব উদ্দীপনাময় নয়। এসব কাজ অধ্যবসায়ী গবেষকের কাজ। কেউ বা হয়তো এ কাজকে আর্কেঅলজিক্যাল আলোচনা বলে তুচ্ছ করবেন, কিন্তু আর্কেঅলজি তুচ্ছ নয় আর নিষ্ঠাবান সাহিত্য সমালোচনার গোড়ার কথা, তথ্য সংগ্রহ, অন্য অধিকাংশ সমালোচনায় পল্লবগ্রাহিতা মাত্র। টি. এস. এলিয়ট বলেছেন : Any book, any essay, any note in *Notes and Queries* which produces a fact even of the lowest order about a work of art is a better piece of work than nine-tenths of the most pretentious critical journalism. তথ্য সংগ্রহের এই শ্রমসাধ্য কার্য কর্মীর শ্রদ্ধাসম্পন্ন চিত্তের পরিচায়ক, কিন্তু তার চেয়েও বড়ো কথা এই তথ্যপঞ্জীর নির্ভরে রবীন্দ্রনাথের শিল্পীজীবনের অপার বৈচিত্র্য পাঠকের কাছে সুষ্ঠুরকমে প্রতিভাত হবে।

"বিচিত্রা" গ্রন্থের সমালোচনা লিখতে গিয়ে এসব কথা যেন ধান ভানতে শিবের গীত: কিন্তু শিবেরই গীত।

অমলেন্দু বসু

Thirty-seven Paintings of Rabindranath Tagore. Ministry of Scientific Research and Cultural Affairs, Govt. of India, New Delhi.
Drawings and Paintings of Rabindranath Tagore, Lalit Kala Academi, New Delhi. Rs. 25.00.
Twelve Paintings by Rabindranath Tagore, Tata Iron and Steel Company, Calcutta. Rs. 8.00.

সার্থক লেখক, এমন কি মহৎ কবিরা কেউ কেউ সার্থক ছবি এ'কেছেন, এমন দৃষ্টান্ত পৃথিবীর ইতিহাসে বিরল নয়। নিজেদের আত্মপ্রকাশের ক্ষুধার নিবৃত্তি ঘটেনি তাঁদের শুধু কাব্য বা নাটক, গল্প বা উপন্যাস রচনা করে; তার তাড়নায় কখনও কখনও তাঁরা নক্‌সা কেটেছেন, ছবি এ'কেছেন, তক্ষণ কর্ম করেছেন, কখনও লীলাচ্ছলে, শুধু চিত্ত-বিনোদনের জন্যে, কখনও সৃষ্টিপ্রেরণার অনিবার্যতায় এবং সেই হেতু গভীর নিষ্ঠায় ও অভিনিবেশে। এতে অবশ্য বিস্ময়ের কিছু নেই। বহুকালের অভ্যাসে প্রকাশের মাধ্যম অনুযায়ী শিল্পের নামকরণ একটা সংস্কারে দাঁড়িয়ে গেছে; ধ্বনির মাধ্যমে যিনি নিজকে প্রকাশ করেন, তাঁকে আমরা বলি গায়ক, শব্দ ও বাক্য নিয়ে যাঁর প্রকাশ তাকে বলি কবি বা সাহিত্যিক, রঙ ও রেখার মাধ্যম যাঁর তিনি চিত্রী। শিল্পীর ব্যক্তিত্ব বড় জটিল; তাঁর একই ব্যক্তিসত্তায় গায়ক, কবি, চিত্রী সকলেই বিরাজমান সূক্ষ্ম অথচ বিচিত্র প্রমাণ-

পারিপাট্যে। সার্থক কবি ও লেখকরা সার্থক ছবি এঁকেছেন এমন প্রমাণ যেমন আছে তেমনই সার্থক চিত্রী বা ভাস্কর বা গায়ক সার্থক সাহিত্য রচনা করেছেন সে-প্রমাণও আছে। রিচার্ড হ্বাগনার তাঁর অপেরাগুলোর জন্যে যে অগুণতি স্কেচ করেছিলেন, শিল্পের ক্ষেত্রে তার মূল্য ও মর্যাদা তুচ্ছ করবার মত নয়। তবু, কবি ও লেখকদের ছবি আঁকার প্রমাণ যত বেশি, চিত্রী বা গায়কদের সাহিত্যরচনার প্রমাণ তত নয়।

য়ুরিপিডিস ও পেত্রার্ক যে ছবি আঁকতেন, এ-তথ্য হয়ত অনেকের জানা নেই। চীন-দেশে অনেক কবি ছিলেন চিত্রী, অনেক চিত্রীই ছিলেন কবি। প্রাচীন ভারতবর্ষের ক্ল্যাসিকাল যুগে সম্ভ্রান্ত নাগরিকেরা প্রায় সকলেই একটু আধটু ছবি আঁকা অভ্যাস করতেন; বাৎস্যায়ন তাঁর কামসূত্রে তাঁদের কথা বলেছেন। দান্তে, গ্যেটে, টলস্টয়, গোগোল, ব্লেক, জর্জ সেনড, রাঁবো, স্টিনডবের্গ, পুশকিন, পল ভ্যালেরি, বদলেয়ার, লেউস ক্যারল, পিয়ের লোটি, ওয়াশিংটন আরভিং, এডগার এ্যালান পো, হানস ক্রিশ্চিয়ান এনডারসন, রবার্ট লুই স্টিভেনসন, জ্যাঁ কক্‌তো, রসেটি, ভিকতর হুগো, হফম্যান, ডি. এচ. লরেন্স, ওয়েলস, গার্সিয়া লর্কা, কিপলিং, থ্যাকারে, মার্ক টোয়েন—এলোমেলো ভাবে কয়েকজন কবি ও লেখকের নামোল্লেখ করছি; এঁদের প্রত্যেকেই ছবি আঁকায় অভ্যস্ত ছিলেন, এবং কেউ কেউ বিশেষ দক্ষতার পরিচয়ও রেখে গেছেন। তাঁদের ছবির মূল্য ও মর্যাদা নিয়ে অল্পবিস্তর আলোচনাও হয়েছে। ১৯৫৭ সালের অগস্ট মাসের The Unesco *Courier*-এ এঁদের অনেকের ছবির কিছু কিছু প্রতিলিপি ছাপা হয়েছে, অল্প বিস্তর আলোচনাও আছে। রবীন্দ্রনাথের ছবি সম্বন্ধে একটি প্রবন্ধও আছে এই সংখ্যাটিতে, কয়েকটি প্রতিলিপিসহ; বস্তুত রবীন্দ্রনাথের ছবি কেন্দ্র করেই এই বিশেষ মূল্যবান সংখ্যাটির পরিকল্পনা করা হয়েছিল। এর আগেও, কবির জীবিতকালে এবং মৃত্যুর পরে, দেশে বিদেশে রবীন্দ্রনাথের ছবি নিয়ে রসিক ও বিদগ্ধ সমালোচকেরা নানা কথা বলেছেন, নানা আলোচনা করেছেন, বেশির ভাগ কোনো প্রদর্শনী উপলক্ষে। রবীন্দ্রনাথ নিজেও নিজের ছবি সম্বন্ধে নানা উপলক্ষে নানা মন্তব্য লিখে রেখে গেছেন—চিঠিতে, প্রবন্ধে, কবিতায়। বাংলায় লেখা অন্তত একখানা স্বতন্ত্র গ্রন্থও আছে, এবং সেটি বেশ তথ্যপূর্ণ।

কবির জন্মশতবার্ষিক উপলক্ষে কবিকীর্তির ও কবিজীবনের বিচিত্র দিকের সঙ্গে সঙ্গে রবীন্দ্রনাথের আঁকা ছবি নিয়েও আলোচনা যা এ যাবৎ হয়েছে তার পরিমাণ কম নয়। ছোট ছোট স্বতন্ত্র রচনা তো অনেকেই লিখেছেন, নানা প্রতিলিপি ছাপা হয়েছে, নানা তথ্যের উল্লেখ করা হয়েছে, নানা দিক থেকে এই বিশেষ ক্ষেত্রে কবিকীর্তির বিচার হয়েছে। বড় সুদৃশ্য সুবিন্যস্ত পোর্টফোলিও-এ্যালবামও প্রকাশিত হয়েছে একাধিক, অল্পবিস্তর আলোচনা সহ। ভারত সরকারের বৈজ্ঞানিক গবেষণা ও সাংস্কৃতিক মন্ত্রণা দপ্তর এবং ভারতীয় ললিতকলা আকাদমী যে দুটি এ্যালবাম-গ্রন্থ বার করেছেন, দুটিই খুব উল্লেখ-যোগ্য প্রকাশন। তা ছাড়া, টাটা আয়রন ও স্টীল কোম্পানী বারোখানা ছবি ও প্রতিলিপি সহ যে পোর্টফোলিও বার করেছেন, তারও উল্লেখ করতে হয়। প্রথম এ্যালবামটি খুব স্বল্প সংখ্যায়, বোধ হয় ২০০ কি ২৫০ কপি, ছাপা হয়েছে, প্রচুর অর্থব্যয়ে এবং রঙ্গীন ছবি মুদ্রণের একান্ত সাম্প্রতিক রীতি ও আঙ্গিক অনুযায়ী। শুনেছি, ৩৭ খানা ছবির এই এ্যালবামটির প্রত্যেকটি খণ্ডের জন্য খরচ হয়েছে প্রায় ১৫০০৲/১৬০০৲ টাকার মত। এ হেন উদ্যমের ফসল যে খুবই মূল্যবান হবে, তাতে আর সন্দেহ কি? শুধু দুঃখ হয় এই ভেবে যে, এ্যালবামটিতে ছবিগুলোর প্রতিলিপি ছাড়া আর কিছু নেই—নামপৃষ্ঠা নেই,

পরিচয়পত্র নেই, ছবিগুলোর তালিকা পর্যন্ত নেই; কবে, কোথায় ছাপা হয়েছে, কারা প্রকাশক, কিছুই উল্লেখ নেই। তবে, স্বীকার করতেই হয়, ছবির এই ধরনের সুষ্ঠু প্রতিলিপি, মূলের প্রকৃতি ও চরিত্র রক্ষার এমন সজাগ প্রয়াস সত্যই অত্যন্ত দুর্লভ। তাছাড়া, প্রতিলিপিগুলোও মূলের আকৃতি ও প্রমাণও অক্ষুণ্ণ আছে। দ্বিতীয় এ্যালবামটির প্রকাশনেও রুচির সৌষ্ঠব, মুদ্রণ পারিপাট্য এবং অঙ্গসজ্জা সত্যই খুব প্রশংসনীয় এবং ললিতকলা আকাদমী এজন্য আমাদের কৃতজ্ঞতা দাবি করতে পারেন। এই গ্রন্থের রঙ্গীন ছবির প্রতিলিপিগুলিতেও মূলের প্রকৃতি ও চরিত্র অক্ষুণ্ণ। ছোট একবর্ণ প্রতিলিপিগুলোও খুব বিশ্বস্ত ও সুস্পষ্ট। আর, পৃথ্বীশ নিয়োগী মশায়ের নাতিদীর্ঘ পরিচায়িকাটিও খুব সুলিখিত, যদিও কোথাও কোথাও কেউ কেউ কিছুটা দুর্বোধ্যতার আপত্তি তুলতে হয়তো পারেন। তাছাড়া, প্রথমোক্ত এ্যালবামটির মত এ এ্যালবামটিতে কোনো ছবিরই সন-তারিখ দেওয়া নেই; থাকলে ভালো হত। প্রথমটির মত এ এ্যালবামটিও ভারত সরকারের উদ্যম ও অর্থানুকূল্যে প্রকাশিত এবং বোধ হয় সেইজন্যই মাত্র পঁচিশ টাকার বিনিময়ে এ-ধরনের গ্রন্থ শিক্ষিত সাধারণের হাতে পৌঁছানো সম্ভব হয়েছে। এ-বিষয়ে, বস্তুত পৃথিবীব্যাপী রবীন্দ্র জন্মশতবার্ষিক উৎসব উদযাপনে ও পালনে ভারত সরকার যে তৎপরতা দেখিয়েছেন, যেভাবে সর্বপ্রকার আনুকূল্য প্রকাশ করেছেন তার মর্যাদার অধিকাংশ বৈজ্ঞানিক গবেষণা ও সাংস্কৃতিক মন্ত্রণাদপ্তরের প্রাপ্য। টাটা কোম্পানীর সুরুচিসম্পন্ন এ্যালবামটিও প্রশংসার দাবি রাখে। বারোখানা ছবি প্রত্যেকটিই সুনির্বাচিত, সুমুদ্রিত এবং এক পৃষ্ঠার মুখবন্ধে কবির উক্তি ও রচনা থেকে যে উদ্ধৃতি দেওয়া হয়েছে তার প্রত্যেকটিই প্রাসঙ্গিক, এবং পৃথক পৃথক হলেও একটি পরম্পরাগত যুক্তিসূত্রে গাঁথা। একটি ব্যবসায়-প্রতিষ্ঠান এ-ব্যাপারে যে-উদ্যম প্রকাশ করেছেন, যে বিনাদ্বিধায় অর্থব্যয় করেছেন এবং যে সুষ্ঠু সুরুচির পরিচয় দিয়েছেন তার উল্লেখ না করলে অত্যন্ত অন্যায় হবে। রবীন্দ্রনাথের ছবির যাঁরা অনুরাগী, তার সৃষ্টি-কর্মের এই বিশেষ দিকটি সম্বন্ধে যাঁরা উৎসাহী তাঁরা এই তিনটি এ্যালবাম-গ্রন্থের সঙ্গ উপভোগ করে লাভবান হবেন, এ-বিষয়ে আমার বিন্দুমাত্র সন্দেহ নেই।

গ্রন্থ সমালোচনায় গ্রন্থোক্ত বিষয়ালোচনার সুযোগ স্বল্প। তবু, খুব সংক্ষেপে দু-একটি তথ্যের উল্লেখ করছি; এ-বিষয়ে যাঁরা অনুরাগী তাঁরা বিবেচনা করে দেখতে পারেন।

প্রথমত, একথা সত্য নয় যে, রবীন্দ্রনাথ আগে কখনও ছবি আঁকা অভ্যেস করেননি। কবির একাধিক প্রাসঙ্গিক রচনায় উল্লেখ আছে, যখন তাঁর ৩০/৩২ বৎসর বয়স, তখনই তিনি অনেক সময় চিত্রবিদ্যার প্রতি 'হতাশ প্রণয়ের লুব্ধ দৃষ্টিপাত' করতেন। "কড়ি ও কোমল" রচনার সময় যে তিনি ছবি আঁকার বিদ্যেটা নিয়ে মাথা ঘামাতেন তার কিছু উল্লেখ "জীবনস্মৃতি" গ্রন্থে আছে। ৩৯ বৎসর বয়সে জগদীশচন্দ্র বসুকে একখানি পত্রে লিখছেন, 'শুনে আশ্চর্য হবেন একখানা sketch book নিয়ে বসে বসে ছবি আঁকচি......'। দাদা জ্যোতিরিন্দ্রনাথও তাই করতেন এবং এ-ব্যাপারে তাঁর দক্ষতার পরিচয় অনেকের জানা আছে। কিন্তু রবীন্দ্রনাথের sketch book-খানা গেল কোথায়? চিত্রী মুকুল দে মশায়ের একটি স্বীকারোক্তি আছে যে, কবি তাঁকে নিজের স্কেচের একখানা বই রাখতে দিয়েছিলেন। মুকুলবাবু রক্ষিত স্কেচ বইখানা কি সেই sketch book যার উল্লেখ করেছেন কবি জগদীশচন্দ্রের কাছে চিঠিতে?

দ্বিতীয়ত, চিত্রী হিসেবে যে-রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে পৃথিবীর পরিচয়, তাঁর জন্ম ১৯২৮এ। তারপর ১২/১৩ বছর তিনি সমানে নেশায় পাওয়া মানুষের মত যত ছবি এঁকেছেন তার সংখ্যা তিন হাজারের উপর; ১৫০০-র বেশি ছবি শান্তিনিকেতন রবীন্দ্র সদনেই আছে। সংখ্যা বিচারে এই সময়ের মধ্যে এতগুলো ছবি আঁকা প্রায় অবিশ্বাস্য, তবু বিশ্বাস না করে উপায় নেই। 'এক-এক দিনে দু'তিনখানা ছবিও এঁকেছেন, দেখেছি এবং আঁকতেন যেন possessed বা আচ্ছন্ন অবস্থায় একটি মানুষ সমানে তুলি চালিয়ে যাচ্ছে, অত্যন্ত দ্রুত ও অস্থিরভাবে। কবির ছবিতে অনেকে একটা অনির্দেশ্য প্যাসনের উল্লেখ করেছেন; একথা অস্বীকার করবার উপায় নেই। কিন্তু, এর কারণ কি? শুধু অবচেতনার উল্লেখ করে প্রশ্ন।

তৃতীয়ত, অনেকে বলে থাকেন রবীন্দ্রনাথের ছবিতে ছবি-আঁকার কোনো ব্যাকরণ-প্রকরণ নেই; যে-পটুত্ব স্বপ্রকাশ ছবিগুলোতে তা অশিক্ষিত পটুত্ব। কথাটি কি সত্য? তাঁরা কি কবির রেখাচিত্র এবং 'চিত্তিরবিচিত্তির'গুলি ভাল করে বিচার করে দেখেছেন? কিংবা তাঁর রঙীন ছবির রং-প্রলেপের নীচে যে রেখাঙ্কন আছে, যা অনেক সময় শুধু চোখেও ধরা পড়ে, তার বিশ্লেষণ করেছেন?

চতুর্থত, অনেকে আরও বলেন যে, রবীন্দ্রনাথের সমসাময়িক সাহিত্যসৃষ্টির সঙ্গে তাঁর ছবিগুলোর কোনো প্রকৃতিগত বা কল্পনাগত সাযুজ্য নেই। কথাটা কি সত্য? তাঁরা কি সমসাময়িক কবিতা ও ছবিগুলো ভালো করে বিশ্লেষণ করে দেখেছেন? জানি, এ ধরনের উক্তির জন্য দায়ী রবীন্দ্রনাথ স্বয়ং। তবু, সবিনয়ে বলি, এ-ব্যাপারে আমার সন্দেহ অকারণ নয়।

**নীহাররঞ্জন রায়**

**রবীন্দ্রায়ণ** (প্রথম ও দ্বিতীয় খণ্ড)—পুলিনবিহারী সেন সম্পাদিত। বাক্-সাহিত্য। কলিকাতা-৯। মূল্য প্রতি খণ্ড দশ টাকা।

যে দেশে সভ্যতার সূচনা প্রাক্-ইতিহাসের পর্যায়ে পড়ে এবং যার ইতিবৃত্তের সময় গণনায় শতাব্দের চেয়ে সহস্রাব্দ প্রয়োগ করাই সঙ্গত মনে হয়, সেখানে আশী বছরের জীবন নিতান্তই ক্ষীণ আয়ুষ্কাল। কিন্তু প্রাচীনত্বের গৌরব আর দীর্ঘ কালমাহাত্ম্য মেনে নিয়েও বলা চলে যে ভারতীয় ঐতিহ্যের পাতায় মাত্র ঐ আশীটি বছর এমন এক স্বাক্ষর রেখে গেছে যা একটি বিস্তৃত সমগ্র যুগের পক্ষেও সম্ভব হয়নি। একদিকে ঔপনিষদিক সংস্কৃতি ও সাধনা, অপর দিকে আধুনিক সমাজ-চিন্তার বলিষ্ঠ সরসতা—এ দুয়ের মিলন রবীন্দ্র জীবনে ও মানসে বিধৃত হয়ে প্রমাণ করেছে, আয়তির চেয়ে কীর্তি মহৎ। সেই কীর্তির তথ্য-আহরণ ও বিশ্লেষণ কম মহৎ কাজ নয়।

গত চল্লিশ বছরে, বিশেষ করে শেষ দুই তিন দশকে, বাংলা দেশে রবীন্দ্র-সাহিত্যের যে রকম চর্চা ও অনুশীলন হয়েছে, তা শুধু আনন্দের কথা নয়, গৌরবেরও বিষয়। রবীন্দ্র-সাহিত্যের বিভিন্ন দিক নিয়ে যে সব গবেষণা করা হয়েছে, তাঁর জীবন ও সাধনা সম্পর্কে যে সব গ্রন্থ রচিত হয়েছে ও হচ্ছে, তার অনেকগুলিই সারবান। ফলে, কবির

শিল্পভাবনা ও কর্মসূচী সম্বন্ধে এমন অনেক জ্ঞাতব্য সংগৃহীত ও পরিবেশিত হয়েছে, যার বিষয়ে আমাদের জ্ঞান এতাবৎ অসম্পূর্ণ বা উদাসীনতায় অনধিগত ছিল। রবীন্দ্র-চর্চায় দৃষ্টিভঙ্গীর পরিবর্তন হয়েছে, তাঁর গদ্য কাব্য সঙ্গীত ও চিত্রকলার নানামুখী আলোচনায় অনুশীলনের পদ্ধতি এবং বিচারের মান-সূত্রও বদলাচ্ছে। অনুন্বন্ধ উচ্ছ্বাস আবার শিথিল বক্রোক্তি, কোনোটাই এখন গ্রাহ্য নয়। তাই রবীন্দ্র-সাহিত্য ও বিচিন্তার, জীবনের ও বাণীর যথার্থ মূল্য নিরূপণে বাংলায় এবং অন্যত্রও একটি 'ট্র্যাডিশন' গড়ে উঠছে। অনুশীলনের পরিধি ক্রমবিস্তৃত হওয়ার ফলে গবেষণার ক্ষেত্র যেমন বেড়ে গেছে, বিষয়-বিভাগ এবং বিশেষবিৎ চর্চার মূল্য এবং প্রয়োজনীয়তাও তেমনি স্বীকৃত হচ্ছে।

এই সর্বজনস্বীকৃতি এবং সর্বজনগ্রাহ্যতাতেই রবীন্দ্ররচনার সার্থকতা। যেসব ভাবনা কল্পনা সত্যানুভূতি ও উপলব্ধি তাঁর সঙ্গীতে কাব্যে কথিকায় আখ্যানে চিত্রে প্রবন্ধে অজস্র মুক্তার মতো বিকীর্ণ হয়ে আছে, সেগুলি কাল স্তর ও বিষয়ানুযায়ী সমসূত্রে ও বিভিন্ন গুচ্ছে গ্রথিত করে সর্বসমক্ষে সম্যক্ আলোচনায় প্রতিষ্ঠিত করাই এখন দেশবাসীর সবচেয়ে বড় কর্তব্য। একমাত্র গুণগ্রাহী, দায়িত্ববোধসম্পন্ন, নিষ্ঠাশীল সম্পাদনায় এই গুরু কৃত্য নিষ্পন্ন হতে পারে। "রবীন্দ্রায়ণ" দুই খণ্ডে শতবর্ষপূর্তির প্রকৃত লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য বিনা আড়ম্বরে, পরিচ্ছন্ন রুচিবত্তায়, সেই দায়িত্ব পালন করেছে বলেই এই ভূমিকার অবতারণা। রবীন্দ্র-প্রতিভার সমস্ত দিক যে পূর্ণাঙ্গভাবে আলোকিত হল এর ফলে, অথবা বিষয়ান্তর অবলম্বন করে নূতনতর নিবন্ধের প্রয়োজন আর নেই—এমন কথা কেউই বলতে চাইবেন না, সম্পাদকও সে দাবি করবেন না।

রবীন্দ্র-প্রতিভার প্রায় সকল পরিচিত বিভাগগুলি আলোচ্য সঙ্কলনে উপস্থাপিত হয়েছে এবং বিভিন্ন আলোচনায় কখনও সাধারণ ও ব্যাপকভাবে, কখনও সীমিত অথচ গভীরভাবে, বিভিন্ন দৃষ্টি থেকে সুধীবৃন্দ বিশেষ ধরনের আলোকপাত করেছেন। ভাষা ও ভঙ্গীর স্বতন্ত্রতায় আলোচনাগুলিতে বৈশিষ্ট্য ও বৈচিত্র্য এসেছে, যদিও কোনো কোনো ক্ষেত্রে এক আধটি প্রবন্ধ আংশিক লক্ষণাক্রান্ত হয়ে পড়েছে। কিন্তু তাতে তেমন ক্ষতি হয়নি, অন্ততঃ পুনরুক্তি দোষ ঘটেনি। বরঞ্চ বলা যেতে পারে, একজন লেখক হয়তো একটি ব্যাপক বিষয়বস্তুর অবতারণা করেছেন, তার পরে অপর কোনও লেখক হয়তো ক্ষুদ্রতর পরিসরে সেই বিষয়েরই একটি অংশকে আশ্রয় করে আরও বিশদ বিশ্লেষণ করেছেন। যেমন প্রথম খণ্ডে 'উপন্যাসের চরিত্র ও রবীন্দ্রনাথ' লেখাটির পরে 'দামিনী' প্রবন্ধটি সুন্যস্ত হয়ে অর্থ-মণ্ডিত হয়ে উঠেছে। এ ধরনের সংযোজন-বৈশিষ্ট্যের জন্য সম্পাদক ধন্যবাদ পেতে পারেন। 'উপনিষদ ও রবীন্দ্রনাথ' আর 'রবীন্দ্রদৃষ্টিতে কালিদাস' আপাতদৃষ্টিতে ভিন্নধর্মী রচনা নিশ্চয়ই। কিন্তু বিষয়ানুগ পৃথকীকরণ করেও বলা যেতে পারে রবীন্দ্র রচনার উৎস ও মূল ভিত্তি নির্ণয়ের দিক থেকে,—ঐতিহ্যপুষ্টির দিক থেকে, এ দুটি প্রবন্ধের সুরে খুব বেশি তফাত নেই।

"রবীন্দ্রায়ণ" দুই খণ্ড একত্র করে দেখলে বোঝা যাবে, জয়ন্তী বা শতবার্ষিকী উপলক্ষে যে নানা ধাঁচের সংকলন-গ্রন্থ প্রকাশিত হয়েছিল এবং হয়েছে, তা থেকে এই বই কিছু স্বতন্ত্র। কারণ এর মধ্যে প্রতিনিধিস্থানীয় একাধিক লেখক আছেন সত্য, কিন্তু লেখক-গোষ্ঠীর অস্তিত্বটা প্রধান তথ্য নয়। রবীন্দ্রনাথই মুখ্য, তাঁর প্রতিভার বহুমুখী আলোচনাই মূল উদ্দেশ্য। আরও লেখক আরও বিষয়-আলোচনা সন্নিবেশিত করা যেতে পারত, একথা বলা চলে নিশ্চয়ই। কিন্তু কোনো একটা জায়গায় এসে থামতে হয়, সীমা-

রেখা টানতে হয়, এ কথাও সত্য। সুতরাং যা আছে, যা পাওয়া গেছে, তার বিন্যাস সুষ্ঠু এবং পরিকল্পনা শোভন ও সংগত কিনা, সেইটাই বিচার্য। সে বিচারে সম্পাদক কৃতিত্বের সহিত উত্তীর্ণ হতে পেরেছেন এই কারণে যে, তিনি শুধু রবীন্দ্র-গ্রন্থ-পঞ্জীর নির্ভুল সংগ্রাহক এবং রবীন্দ্ররচনার পাঠশুদ্ধি ও পাঠান্তর-সম্পর্কে প্রামাণ্য তথ্যধারক নন, কবি-সান্নিধ্য-লালিত, পরিবেশ-পুষ্ট এবং ঐতিহ্যানিষিক্ত হয়েও বুদ্ধি ও বিজ্ঞানসম্মত গবেষণায়, সচেতন সম্পাদনায় আস্থা রাখেন।

মোট ছয় শত পৃষ্ঠারও বেশী এ দুই গ্রন্থ ভবিষ্যতের পাঠক-গবেষকের কাছে মূল্যবান আকর-গ্রন্থ হিসাবে ব্যবহৃত হবে, এটা আশা করা অসংগত হবে না এবং গত বিশ ত্রিশ বছর ধরে রবীন্দ্র-আলোচনার গতি-ধারা এবং অভিমুখিতার একটি সুগ্রথিত নির্দেশ-সূচী বলে গণ্য হবে। প্রথম খণ্ডে ষোলটি প্রবন্ধ আর এগারোখানি খ্যাতনামা শিল্পীদের আঁকা চিত্র, দ্বিতীয় খণ্ডে প্রবন্ধ-সংখ্যা হল বিশ এবং মৌল চিত্র, আলোক-চিত্র এবং হস্ত-লিপির চিত্র-সংখ্যা হল বাইশ। এর তৃতীয় পরিচয় হচ্ছে, পরিধি অর্থাৎ আলোচ্য বিষয়ের নির্ধারণ, নিগূঢ়তর আলোচনার অবকাশ এবং রবীন্দ্র-চর্চার ভবিষ্য ইংগিত। এই তিনটি পরিচয়ে এই কথা বোধ হয় প্রমাণিত হয় যে বৃহদায়তন সম্পাদনার যে দায়িত্ব ও নৈপুণ্যের নমুনা পশ্চিমী প্রকাশনে দেখা যায়, তার দোসর এ দেশে বিরল নয়।

গ্রন্থভুক্ত প্রবন্ধগুলির কোনোটিই স্বল্পায়তন নয়, কারণ পরিসরের অজুহাতে বক্তব্যকে সংকুচিত ও সংক্ষিপ্ত করবার প্রয়োজন ঘটেনি। বরঞ্চ লেখকরা যতদূর সম্ভব আলোচনার সূত্রকে স্বাভাবিক সম্পূর্ণতায় এনে শেষ করেছেন। তাই এতগুলি প্রায়-পূর্ণাংগ প্রবন্ধের সবিশেষ আলোচনা এখানে সম্ভব নয়, কয়েকটি বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য প্রবন্ধের পরিচয় দিয়ে ক্ষান্ত হতে হবে। বলা বাহুল্য, রসজ্ঞ গুণগ্রাহী পাঠকরা দুই খণ্ড "রবীন্দ্রায়ণ" আদ্যন্ত পড়ে সমগ্র দৃষ্টি দিয়ে রবীন্দ্র-সত্তার সামগ্রিক পরিচয় পাবেন এবং তার চেয়েও বড় কথা—রবীন্দ্র-চর্চায় উৎসাহিত হয়ে তাঁরা কবির সমস্ত রচনা,—বিশেষ করে তাঁর যাবতীয় গদ্য, প্রবন্ধ, জিজ্ঞাসু মন নিয়ে পড়বেন। 'বিশ্বকবি' সম্বোধনে, সগৌরব অনুষ্ঠান-পালনে, কিংবা মৌখিক ভক্তিবিহ্বলতায় যে নিশ্চিন্ত আত্মতৃপ্তি, তার বিষম গলদ ও ফাঁকি কোথায়, সে কথা অতুলচন্দ্র গুপ্ত মহাশয় তাঁর অসম্পূর্ণ শেষ লেখাটিতে ব্যক্ত করে গেছেন। বিদেশী পণ্ডিত সমালোচকদের মন্তব্য ও মতামতের মূল্য যাই হোক, রবীন্দ্র-সাহিত্যের যথার্থ রসগ্রহণ ও বিচার এ দেশের পাঠকদের আত্মনির্ভর অনুশীলন এবং উদ্বোধনেই একমাত্র সম্ভব হতে পারে। বিশ্বব্যাপী জীবন ও আলোকস্রষ্টা সবিতার কেবল স্তুতি নিতান্তই অর্থহীন হয়ে যায়, যদি না সাবিত্রী মন্ত্রের অর্থ বুঝি। রবি-প্রদক্ষিণও শুধু যান্ত্রিক হয়ে যায়, যদি উত্তর ও দক্ষিণ মিলিয়ে সমগ্র অয়ন না দেখি এবং প্রতিটি অয়নাংশের ভোগ্য ফল আস্বাদ না করে, শুধুই অন্ধাবর্তে পরিক্রমা করতে থাকি।

প্রথম খণ্ডের বিষয়াবকাশ সুনির্দিষ্ট, তা মূলতঃ সাহিত্যিক। অর্থাৎ কবির সাহিত্য-কর্মের মধ্যে আবদ্ধ। প্রসংগতঃ কোনো কোনো প্রবন্ধে বিষয়ান্তর এসে গেছে এবং সেটা ন্যায্য ও স্বাভাবিক, যেহেতু কবির মনোজগৎ থেকে একেবারে সম্পর্কলেশহীন হতে পারে না। তবে মোটের ওপর, প্রথম খণ্ডে কবিকৃতির উপরই প্রবন্ধগুলির দৃষ্টি-নিবদ্ধ। এই সৃজনশীল কবি-মানসের বিভিন্ন দিক রয়েছে—যেমন কবি-ভাবনার বা কাব্য-প্রেরণার উৎস, মানস-মণ্ডল, তার উপাদান, কবি-কল্পনার প্রকৃতি, গতি-রীতি ও বিবর্তন, মগ্নময়তা ও বহির্মুখিতার রূপ-সম্পর্ক, প্রকাশ-ভংগী, ভাষা ও ছন্দের বিশ্লেষণ। এইসব উপকরণ নিয়ে

যে ষোলটি প্রবন্ধ লেখা হয়েছে, তাদের জাতি ও মান সব ক্ষেত্রে সমান নয়, কিন্তু লেখকের স্বতন্ত্র দৃষ্টিকোণ থেকে বিচারিত হয়ে তারা সুলিখিত এবং নানা জ্ঞাতব্য তথ্যে পরিপূর্ণ। যদিও শ্রীযুক্ত প্রমথনাথ বিশীর 'রবীন্দ্রসাহিত্যের তিন জগৎ'-এ স্থানে স্থানে গূঢ় গভীর অন্তর্দৃষ্টির পরিচয় দেয়, তবু এই রকম আলোচনার পদ্ধতিতে, মোটামুটি সহজ বোধগ্রাহ্য কয়েকটি তথ্যোপকরণকে বিপরীত কোটিতে স্থাপন করে', তারপর কিছুটা বাগ্‌বহুল, ঈষৎ ফেনায়িত মন্তব্য ও ব্যাখ্যার জালে টেনে একত্র প্রতিষ্ঠিত করার স্বভাবসিদ্ধ ভঙ্গীতে, কেমন যেন একটা সোচ্চার নাটকীয়তা, একটু প্রগল্‌ভ অতিকথনের আভাস এসে যায়। সমালোচনার শিক্ষিত পটুত্ব সত্ত্বেও এই ত্রুটিটুকুর উল্লেখ করা যেতে পারে। তাঁর দৃষ্টি বহুসঞ্চারী ও সন্ধানী। কিন্তু বোধ হয়, বেশি বলার জন্য মাঝে মাঝে স্রোতের চেয়ে তীরের কথাই বড় হয়ে ওঠে। তাঁর লক্ষ্যভেদ-নৈপুণ্য চমৎকার। তবে দৃষ্টি সমভাবে নিবদ্ধ না থাকার দরুণ কিছু শৈথিল্য অনিবার্য।

অথচ 'রবীন্দ্রনাথের কবিতায় ভাষা ব্যবহার' এবং 'বাংলা গদ্য ও রবীন্দ্রনাথ' এই দুটি প্রবন্ধের রচয়িতা মূলতঃ সাহিত্যিক বলে কীর্তিত না হয়েও তাঁদের বক্তব্য ও প্রতিপাদ্যকে কেমন ঋজু প্রত্যক্ষ ও সংহতভাবে উপস্থাপিত করেছেন। শ্রীসুকুমার সেনের পরিচ্ছন্ন রচনাটিতে একাধিক দিক্‌নির্দেশ আছে, লেখাটি স্বয়ংপূর্ণ অথচ নানা সম্ভাবনার ইঙ্গিত দেয়। সংস্কৃত কবিদের ভাষাব্যবহারের সঙ্গে রবীন্দ্রনাথের শব্দপ্রয়োগ-সাদৃশ্য তিনি কুশলী ভাষাতত্ত্ববিদের মতই দেখিয়েছেন। শ্রীভবতোষ দত্তও রবীন্দ্রনাথের বাংলা গদ্যের ব্যবহার, বিবর্তন ও বৈশিষ্ট্য খুব পরিষ্কার করে দেখাতে পেরেছেন, বিষয়টি কঠিন হওয়া সত্ত্বেও। কবির প্রোজ স্টাইল সম্পর্কে এই বিশদ অথচ সূক্ষ্ম আলোচনাটি যথেষ্ট মূল্যবান মনে করি। এতে বাংলা গদ্যের, প্রথমতঃ প্রাক্‌-রবীন্দ্র যুগের ইতিহাসটি, ভাষাব্যবহার এবং রচনাশৈলীর দিক থেকে, অতি সঙ্গতভাবে যুক্ত ও আলোচিত হয়েছে। আর যে রীতি অবলম্বন করে লেখক রবীন্দ্রনাথের গদ্যরীতির নবরূপায়ণের কীর্তি-ব্যাখ্যা করেছেন, সেই রীতিতে বিজ্ঞানী বিশ্লেষণ লক্ষ্য করি। মনে হয়, মর্ম ও কনটেণ্ট,—আঙ্গিক ও অন্তর্বস্তু অর্থাৎ বাহক এবং বাহ্য—এ দুই পদার্থের সমন্বয় কোথায় কিভাবে সার্থক, পরিস্ফুট হচ্ছে—এটা শিল্পীর সৃষ্টি-নিদর্শন থেকে প্রমাণ করাই হচ্ছে প্রকৃত আলোচনা। লেখক কোথাও ভাসা-ভাসা সৌখীন সমালোচনার সিদ্ধান্ত খাড়া করেন নি। রবীন্দ্রনাথকে রবীন্দ্রনাথেরই ব্যাখ্যা দিয়ে তিনি সাজিয়েছেন। 'বিদ্যাসাগর চরিত', 'বাংলা জাতীয় সাহিত্য'. 'বাংলা ভাষা-পরিচয়', 'বিদ্যাসাগর স্মৃতি', 'প্রাচীন সাহিত্য', 'ভাষা ও ছন্দ' প্রভৃতি নানা রচনা থেকে তিনি কবির শব্দ ও স্টাইল সম্বন্ধে মতামত উদ্ধৃত করেছেন এবং সবচেয়ে প্রশংসার কথা,—কবির গদ্যরীতি-নির্মাণের ক্রমিক ইতিহাসটি সযত্নে গঠন করেছেন। গদ্যের চরিত্র কেমন পর্বভেদে বদলাচ্ছে, বিষয়ভেদে বিষয়াশ্রয়ী প্রকাশভঙ্গিমা পরিবর্তিত হচ্ছে, অনুগামী কিভাবে স্রষ্টা হয়ে উঠছেন,—এক কথায়, বর্ণন-চিত্রণে, পূর্বসূরি-সমালোচনায়, সাহিত্য-বিজ্ঞান-শিল্প সম্বন্ধীয় উক্তিতে, ধর্মসম্পর্কিত ভাষণে, আর সব শেষে সমাজ ও সভ্যতার উপর রবীন্দ্রনাথের 'প্রফেটিক' উক্তির মধ্য দিয়ে তাঁর গদ্য লেখার ভঙ্গী কাল ও স্তর-অনুযায়ী কেমন করে একেকটি চরিত্র-বৈশিষ্ট্য অর্জন করছে, আর সেই সঙ্গে সকুণ্ঠ কবির একক কণ্ঠস্বর কিভাবে শেষ পর্যন্ত ভাষা ও শব্দ পরীক্ষার তরঙ্গ পার হয়ে অকুণ্ঠ আত্ম-প্রকাশ ও আত্মপ্রত্যয়ের নিরাভরণ তীক্ষ্ণতায় এসে সমাহিত হচ্ছে, নূতন নূতন যুগপর্বের সংঘর্ষে এই নূতন চিন্তা ও ভাষার জীবন-ইতিহাসটুকু, বিবর্তনের সূত্রে, উজ্জ্বল ও সুন্দরভাবে গ্রথিত হয়ে রইল

এই সমন্বিত প্রবন্ধটিতে।

শ্রীযুক্ত প্রবোধচন্দ্র সেনের 'রবীন্দ্রদৃষ্টিতে কালিদাস' একটি প্রতিনিধি-স্থানীয় রচনা। ইতিহাস-জ্ঞানের সঙ্গে সাহিত্যবোধ কিভাবে যুক্ত হলে সাহিত্য-সন্দর্ভ সার্থক হয়, প্রবন্ধটি তার জীবন্ত প্রমাণ। লেখকের মস্ত গুণ—প্রাঞ্জল ভাষায় বিশ্লেষণের নৈপুণ্য। তিনি অনায়াসে বক্তব্যের মূলে গিয়ে পৌঁছুতে পারেন। আর এমন সুসঙ্গত উদ্ধৃতি প্রয়োগ খুব কম নিবন্ধেই দেখা যায়। 'প্রাচীন ভারতবর্ষের অনেক বিষয়ে অসামান্যতা ছিল সন্দেহ নাই' —রবীন্দ্রনাথের এই প্রথমোক্তি দিয়ে প্রবন্ধের সূত্রপাত। তারপর কবির প্রাচীন ভারত-চেতনা, ভারতীয় সংস্কৃতি-চেতনা এবং ইতিহাস-বোধ কেমন অচ্ছেদ্যভাবে জড়িত, একটি থেকে আর একটি বোধের উদয়, লেখক তা দেখিয়েছেন অন্বয় ও বিস্তারের সাহায্যে। কবির সংস্কৃতি-চেতনার উৎস তিনটি—বুদ্ধ, অশোক এবং কালিদাস। আর এই ত্রয়ী-প্রীতি রবীন্দ্রনাথকে কি রকম শ্রমশীল নিষ্ঠায় ও সৃজন-প্রচেষ্টায় উদ্বুদ্ধ করেছে, প্রবোধ সেন মহাশয় সেই চরিত্র-পূজারী কবির মনোজগৎ, তার পরিবেশ সৃষ্টির উপকরণগুলি বিশ্লেষণ করে দেখিয়েছেন। কালিদাসের কাব্য রবীন্দ্রনাথকে শুধু কল্পনার জারক রসেই সঞ্জীবিত করে নি, প্রাচীন কবির ব্যক্তিত্ব-সন্ধিৎসায় অনুপ্রাণিত করেছিল। তাই কালিদাস-চর্চার এত বিচিত্র শোভা, এত বিভিন্ন পর্যায়। কালিদাসের জগৎকে রবীন্দ্রনাথ নূতনভাবে আবার সৃষ্টি করেছেন, আবিষ্কার করেছেন। কালিদাসের কবি-কল্পনা, শুচিতা, সৌন্দর্যবোধ ও প্রণয়াদর্শ রবীন্দ্র-মানসকে কতখানি রসিত ও অনুভাবিত করেছে, তাঁর তপোবন-প্রীতি ব্রহ্মচর্যনিষ্ঠা ও সত্যকামী জীবন-শিল্প-সংযম সৃষ্টি করেছে আর বাম-দক্ষিণ শিব-কল্পনার অপরূপ অভিব্যক্তিতে প্রেরণা জুগিয়েছে, এ সব তথ্য এই প্রবন্ধে যুক্তি শৃঙ্খলায় পরিবেশিত হয়েছে। কালিদাসের কবি-সত্তা আর রবীন্দ্রনাথের কবি-সত্তা কোথায় কিভাবে সম্পৃক্ত, কি চেতনায় উভয়ের মিলন, কোন্ চিত্রে ও অনুষঙ্গে তাঁদের চিন্তান্বয় ঘটেছে—আর কালিদাস-ঐতিহ্যের সঙ্গে ভারতের আত্মিক মিলনের আকাঙ্ক্ষা ও প্রেরণা শান্তিনিকেতনে কেমন অলক্ষ্যালক্ষ্যে ভারতীয় সংস্কৃতি সমাজ ও সধর্মের প্রতিষ্ঠায় এবং বিকাশে সহায়তা করেছে— এইসব অন্তর-কথার বিশ্লেষণ-রূপ প্রতিফলিত হয়েছে এই প্রবন্ধে।

শ্রীযুক্ত বীরেন্দ্র বিশ্বাসের 'রবীন্দ্রনাথের শব্দ' প্রবন্ধে রবীন্দ্রনাথ কর্তৃক ব্যবহৃত শব্দের মধ্যে যেগুলির প্রতি কবির অনুরাগ পুনঃ পুনঃ প্রয়োগে ধরা যায়, সেগুলি একেকটি করে তিনি বিচার বিশ্লেষণ করেছেন। এ শুধু পরিসংখ্যানের যান্ত্রিক কাজ নয়; সংগ্রাহকের যত্ন-শ্রম নিয়ে কবির শব্দভাণ্ডারের উত্তরাধিকৃত, অর্জিত এবং সৃষ্ট সম্পদকে দেখানো হয়েছে ব্যাকরণসম্মত টীকার মাধ্যমে। এ ছাড়া, আরো প্রবন্ধ রয়েছে প্রথম খণ্ডে যেমন শ্রীঅজিত দত্তের 'রবীন্দ্রনাথের ছোট গল্প', শ্রীকানাই সামন্তর 'দামিনী', শ্রীসুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়ের 'রবীন্দ্রনাথ ও বাঙলাভাষা', শ্রীশশিভূষণ দাশগুপ্তের 'উপনিষদ্ ও রবীন্দ্রনাথ'—যেগুলির প্রতিটি সুচিন্তিত ও সুলিখিত। শ্রীসোমনাথ মৈত্রের 'রবীন্দ্র প্রতিভার বৈচিত্র্য' আর শ্রীমতী লীলা মজুমদারের 'ছোটদের জন্য' রচনা দুটি সংক্ষিপ্ত সাধারণ-ধর্মী রচনা হলেও প্রাঞ্জল, সারবান্ এবং সহজ বৈশিষ্ট্যের অধিকারী। বাকি লেখাগুলির মধ্যে বিশেষভাবে উল্লেখ করতে হবে শ্রীঅলোকরঞ্জন দাশগুপ্তের 'উপন্যাসের চরিত্র ও রবীন্দ্রনাথ', শ্রীঅমলেন্দু বসুর 'রবীন্দ্রনাথের বাক্‌প্রতিমা', শ্রীসুনীলচন্দ্র সরকারের 'আধুনিক বিশ্বকবির আবির্ভাব' এবং শ্রীবিনয়েন্দ্রমোহন চৌধুরীর 'রবীন্দ্রনাথের গল্পে প্রকৃতি'। প্রথম দুটি প্রবন্ধ 'টেকনিক' অর্থাৎ শিল্পমার্গ-সংক্রান্ত রচনা এবং আঙ্গিক-বিচারের মধ্য দিয়ে সৃষ্টির বৈশিষ্ট্য ও

রূপ-নির্ণয়। অলোকরঞ্জন কবি কিন্তু তাঁর ভাষা সচেতনভাবেই গদ্য, কড়া হাতে বিশ্লেষণের গদ্য। আর অমলেন্দু বসু এমন একটি সম্পূর্ণ সুন্দর নিবন্ধ লিখেছেন যার মধ্যে তত্ত্বের তীক্ষ্ণতা আবার কাব্যের বিচ্ছুরিত জ্যোতিও আছে। রবীন্দ্রনাথের উপন্যাস ও চরিত্রের সামগ্রিক নির্ধারণ না করে অলোকরঞ্জন একটি নির্বাচিত সূত্র বেছে নিয়েছেন—যা দিয়ে 'ক্রাফ্‌ট অব ফিকশ্যন' অর্থাৎ উপন্যাস-গঠন রীতির বিবর্তন দেখানো যায়। সেই সূত্রটি তিনি মনে করেন রবীন্দ্র চরিত্রের মূল সূত্র, যার সঙ্গে তাঁর সৃষ্ট চরিত্রগুলির জীবনদৃষ্টিতে একটি অন্তর মিল রয়েছে। এই প্রসঙ্গে লেখক ভূমিকাস্বরূপ বঙ্কিমচন্দ্রের উপন্যাস-ধারণা ও নির্মাণপদ্ধতির অবতারণা করেছেন এবং "চতুরঙ্গ" "ঘরে-বাইরে" "যোগাযোগ" আর "শেষের কবিতা"র গঠনশৈলী ও 'ডিকশ্যন' সম্পর্কে কয়েকটি এমন মন্তব্য করেছেন যা সূক্ষ্ম ও নিপুণ, যদিও লেখকের কোনও কোনও সিদ্ধান্তে মন সায় দেয় না। বিদেশী তুলনা প্রতিতুলনা এবং সমালোচনার আপ্ত-বাক্যে তেমন আস্থা না রেখে, যদি তিনি নিজস্ব বিশ্লেষণ-রীতি ধরে অগ্রসর হতেন, যেমনটি করেছেন "যোগাযোগ" উপন্যাসের বেলায়, তাহলে ফল আরও ভালো হত।

শ্রীঅমলেন্দু বসুর প্রবন্ধে আলোচনার ধারাটি নূতন, অন্ততঃ বাংলা সাহিত্যে। একমাত্র *নবেন্দু বসু 'কবিতার প্রকৃতি'তে এই ধরনের আলোচনা শুরু করেছিলেন। আলোচ্য প্রবন্ধটিতে রবীন্দ্রনাথের পোয়েটিক স্টাইল ও তার বিশ্লেষণ, ইমেজ বা বাক্‌ প্রতিমার ব্যবহার, প্রয়োগের সঙ্গতি কাব্যিক সার্থকতা, আবেগের উৎস এবং আবেদনের বৈশিষ্ট্য—এই বিষয়গুলির বিস্তারিত অথচ পারম্পরিক সুসংবদ্ধ আলোচনা পাওয়া যাবে। এই রচনাটি "রবীন্দ্রায়ণ"-ভুক্ত অন্যান্য লেখার মধ্যে স্বাতন্ত্র্যে উজ্জ্বল। বিনয়েন্দ্র চৌধুরী একটি সুপরিচিত বিষয় নিয়ে লিখেছেন। লেখাটি আরও তথ্য নির্ভর এবং পূর্ণাঙ্গ করা যেতে পারত। কিন্তু তাঁর বক্তব্য যে গতানুগতিক নয় এবং সংক্ষেপে মূল কথাটি তিনি যে পাঠকের সামনে তুলে ধরতে জানেন, তার প্রমাণ প্রবন্ধের পঞ্চম অনুচ্ছেদ, শেষ স্তবকটি। আর যে রচনাটি সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য, বিচারশীল পাঠকের দৃষ্টি ও মনকে তৃপ্ত করতে পারে, সেটি 'আধুনিক বিশ্বকবির আবির্ভাব'। এই নামকরণের প্রতিটি অংশ তাৎপর্য-মণ্ডিত। য়ুরোপের ক্ল্যাসিক্যাল যুগ থেকে বর্তমান কালের 'বিশ্বকবি' আখ্যার ও সংজ্ঞার আলোচনা, ঊনিশ শতকে বাংলার ভাব-জগতের ধারা, মানবীয় সংস্কৃতি ও ধারণার পটভূমিতে রবীন্দ্র-চিত্তে বিশ্বসমস্যার প্রত্যক্ষ উদয় ও উপলব্ধি, বিশ্বমানব প্রীতি থেকে উদ্ভূত বিশ্বকবির নূতন চেতনা ও সৃষ্টিকর্ম,—এক কথায় কোন্‌ পরিবেশে, কোন্‌ কোন্‌ বিশেষ মনীষার স্পর্শে রবীন্দ্রনাথের বিশ্ববোধ রূপ পরিগ্রহ করেছে, সুনীল সরকার তার ব্যাখ্যা করেছেন। দেখিয়েছেন "সন্ধ্যা-সংগীতে"ই কবি অন্তর্দ্বন্দ্বের পালা সাঙ্গ করে বিশ্ব-প্রকৃতি ও বিশ্ব-মানবের পথ খুঁজে পেয়েছেন। এইখানেই 'আবির্ভাব' শব্দটির অর্থ সংহত হয়ে উঠেছে। মানস-গঠন ও কবি-কৃতির এ রকম ইতিহাস-সম্মত বিজ্ঞানী আলোচনা ইতিপূর্বে শুধু ধূর্জটিপ্রসাদের "বক্তব্য" গ্রন্থে রবীন্দ্রালোচনায় পাওয়া গিয়েছিল। প্রসঙ্গতঃ বলা উচিত, সুনীল সরকার রবীন্দ্রনাথের উপর বোদ্‌লেয়রের তীক্ষ্ণ একাগ্রতার প্রভাব উল্লেখ করে উত্তেজনার মাত্রা কাটিয়েছেন।

প্রথম খণ্ডের পরিচয়পত্র কিছু দীর্ঘ হয়ে গেল এই কারণে যে, এখানকার প্রবন্ধগুলিতে কবির উত্তরাধিকার, অন্তর্দ্বন্দ্ব বিবর্তন সাধনা ও উপলব্ধি, সংক্ষেপে কবির শিল্পরীতির ও মানস তৈরীর ক্রমবিকাশ নানাভাবে একেকটি দৃষ্টিকোণ থেকে আলোচিত হয়েছে। সেই

জন্যই সাহিত্য পাঠকের কাছে এই খণ্ডটি সমাদর লাভ করবে। কিন্তু তাই বলে দ্বিতীয় খণ্ডের ঐশ্বর্য মোটেই কম নয়। প্রথম খণ্ডের প্রবন্ধগুলি মূলতঃ রবীন্দ্র-সাহিত্যের বৈচিত্র্য-বিশ্লেষণ। দ্বিতীয় খণ্ডের রচনাগুলি মুখ্যতঃ রবীন্দ্রনাথের ছবি গান নৃত্যনাট্য এবং শিক্ষা সমাজ ও সংস্কৃতি সম্পর্কে তাঁর চিন্তাধারার পরিচিতি। অবশ্য কবির সকল চিন্তার প্রকাশই তাঁর নিজস্ব বাক্‌চিত্র ও প্রতিমা-প্রয়োগে পুরোপুরি সাহিত্যিক। তবু মনে হয়, যদি সম্পাদক দ্বিতীয় খণ্ড থেকে সুলিখিত তিনটি রচনা—শ্রীহিরণকুমার সান্যালের 'তিন পুরুষ', সাহানা দেবীর 'কবির সংস্পর্শে' এবং শ্রীশঙ্খ ঘোষের 'রবীন্দ্রনাথের পত্রধারা' প্রথম খণ্ডে দিতেন, তা হলে ভালো মানাত। অথবা সাহিত্য, সঙ্গীত ও চিত্রকলার উপর রচিত প্রবন্ধগুলি তিনটি গুচ্ছে বিভক্ত করে প্রথম খণ্ডে, আর ধর্ম দর্শন শিক্ষা সংস্কৃতি ও সমাজচিন্তা সম্পর্কিত রচনাগুলি পুরোপুরি দ্বিতীয় খণ্ডে সন্নিবিষ্ট করতেন, তাহলে বোধ হয় সুবিধা হত। অবশ্য সব রচনাগুলি একত্র হাতের কাছে না পেলে সম্পাদকের কোনো পরিকল্পনা কার্যকরী হয় না। যাই হোক, দ্বিতীয় খণ্ডে যা পাওয়া গেছে, তার মূল্য বেশি, বিশেষ পাঠক-শ্রেণীর কাছে। কারণ সমাজ সংস্কৃতি শিক্ষার বিভিন্ন ক্ষেত্রে রবীন্দ্রনাথের চিন্তানায়কত্ব আর কর্মসূচীর বিশদ বর্ণন তাঁর সাহিত্যালোচনার চেয়ে এখনও পর্যন্ত কমই আছে।

দ্বিতীয় খণ্ডের প্রতিটি প্রবন্ধের পরিচয় দেওয়া সম্ভব নয়, কারণ প্রত্যেক লেখকই নির্ধারিত বিষয় নিয়ে কিছু-না-কিছু নূতন কথা শুনিয়েছেন। শুধু তাই নয়, তাঁরা প্রায় সকলেই স্বক্ষেত্রে প্রতিনিধি-স্থানীয় লেখক এবং নির্দিষ্ট বিষয়সম্পর্কে যোগ্যতার অধিকারী। আচার্য নন্দলাল বসু, চিত্রশিল্পী শ্রীবিনোদবিহারী মুখোপাধ্যায় এবং শ্রীপৃথ্বীশ নিয়োগী কবির ছবি আঁকা, চিত্ররচনার ভিত্তি এবং শিল্পকর্মের পদ্ধতি নিয়ে তিনটি দিক থেকে আলোচনা করেছেন। তার ফলে, কিছু কিছু মতদ্বৈধ থাকলেও, যা স্বাভাবিক, তিনটি প্রবন্ধ ভালো করে পড়লে কবির চিত্ররীতি ও চিত্রচরিত্র সম্পর্কে একটি মূল্যজ্ঞান অর্জন করা যায়, রবীন্দ্রনাথের শিল্পভাবনার উৎস, উদ্ভাবন ও সিদ্ধি সম্পর্কে একটি সুস্পষ্ট ধারণা লাভ করা যায়।

রবীন্দ্রসঙ্গীতের উপর শ্রীপ্রফুল্লকুমার দাসের 'রবীন্দ্রসঙ্গীতের সূচনায় জ্যোতিরিন্দ্রনাথ' লেখাটি মনোরম, তথ্য প্রমাণে উত্তীর্ণ। শ্রীরাজ্যেশ্বর মিত্র 'রবীন্দ্রনাথের সঙ্গীত চিন্তা' নিয়ে যে সব প্রসঙ্গ অবতারণা করেছেন, সঙ্গীতবিদ্‌ কোনও কোনও লেখক তার কিছু অংশ অন্যত্র আলোচনা করেছেন। তাহলেও এগুলি দামী কথা এবং পুনরালোচনার প্রয়োজন রয়েছে। কারণ রবীন্দ্রসঙ্গীতের মৌলিক চরিত্র-সম্পর্কে এখনও জনমত রীতিমত শিক্ষিত হয়নি এবং বিশেষজ্ঞদের আলোচনাও সম্পূর্ণ ও সংস্কারবর্জিত হয়ে ওঠেনি। উচ্চাঙ্গ সঙ্গীত সম্পর্কে রবীন্দ্রনাথের নিজস্ব শিক্ষার ভিত্তি ও অভিমতে যথেষ্ট দৃঢ়তা ছিল, অতএব সঙ্গীতের সৃষ্টিকর্মে, কথা ও সুরের অঙ্গাঙ্গী মিশ্রণে, সংযত গায়নপদ্ধতিতে তাঁর পরিকল্পনা ও প্রকাশ ঐতিহ্য-বিচ্ছিন্ন না হয়েও কতটা মৌলিক ও বৈশিষ্ট্যমণ্ডিত সে সব প্রসঙ্গ রাজ্যেশ্বর মিত্র নিপুণভাবেই বলেছেন। সবচেয়ে মূল্যবান অংশটি তানবিস্তারের অবকাশ সম্পর্কে কবির মতামত। অলঙ্কারের অতিসমাবেশে নারী-সৌন্দর্য কিংবা বর্ণপ্রলেপের বাহুল্যে ছবির শোভা যেমন ক্ষতিগ্রস্ত হয়, একটি রাগ গাইতে গিয়ে যাবতীয় তানের বিস্তারবৈচিত্র্য ততটাই অবাঞ্ছনীয়। প্রতিটি গান নিজস্ব তাগিদে যেখানে গড়ে ওঠে, কথা দিয়ে যেখানে রাগ-রূপ ফোটাতে হয়, সেখানে তানের যতটুকু অবসর ও প্রয়োজন, ততটুকুই সুপরিমিত-

ভাবে প্রয়োগ করা দরকার। সঙ্গীত চিন্তায় রবীন্দ্রনাথের বৈশিষ্ট্য হচ্ছে সৃষ্টিস্বাধীনতা আর সংযম, এই মূল কথা রাজ্যেশ্বর মিত্র ভালো করে বুঝিয়েছেন। *বিমলচন্দ্র সিংহ 'রবীন্দ্রনাথের নৃত্যনাট্য' নামক তাঁর শেষ রচনাটি যত্ন ও শ্রদ্ধা সহকারে লিখেছিলেন। রবীন্দ্রনাথের নাটকে সংলাপ ও কথা সুরের সাহায্যে কতটা সার্থকভাবে নিয়ন্ত্রিত রূপায়িত হয়, লেখক কতকগুলি উপযোগী উদ্ধৃতি দিয়ে তা বিশ্লেষণ করে দেখিয়েছেন।

এরপর রবীন্দ্রনাথের নানা বিষয়ে চিন্তা ও কর্মের পরিচয় পাওয়া যাবে ঐ সব বিভিন্ন বিষয় নিয়ে লেখা অনেকগুলি প্রবন্ধে—যেমন শ্রীবিনয় ঘোষের 'রবীন্দ্রনাথ ও বাংলার লোক-সংস্কৃতি', শ্রীরবীন্দ্রকুমার দাশগুপ্তের 'দার্শনিক রবীন্দ্রনাথ', *রথীন্দ্রনাথ ঠাকুরের 'পল্লীর উন্নতি : পিতৃস্মৃতি' এবং শ্রীহীরেন্দ্রনাথ দত্তের 'রবীন্দ্র শিক্ষানীতির মূলকথা'। বিনয় ঘোষ তাঁর প্রবন্ধে স্বক্ষেত্রেই বিচরণ করেছেন এবং তথ্য পরিবেশনে কার্পণ্য করেন নি। রবীন্দ্র দাশগুপ্ত একটি গভীরাত্মক বিষয় নিয়ে সুচিন্তিত প্রবন্ধ লিখেছেন কিন্তু কি জানি কেন, বোধ হয় ভাষার দিক থেকে কিছু আড়ষ্টতার জন্য, লেখাটি তেমন জমতে পায় নি। রথীন্দ্র-নাথ ঠাকুরের লেখাটি প্রাঞ্জল আখ্যানের সুন্দর নমুনা, শুধু স্মৃতিচিত্র নয়—গ্রামোন্নয়ন চেষ্টায় রবীন্দ্রনাথের ক্রিয়াকলাপের একটি মনোজ্ঞ বর্ণনা। আর শ্রীহীরেন্দ্রনাথ দত্ত রবীন্দ্রনাথের শিক্ষানীতি সম্পর্কে এমন অনেক কথা সাজিয়েছেন ও বক্তব্যকে সুস্পষ্ট করেছেন মাত্রাবন্ধ যুক্তি ও উদ্ধৃতির মাধ্যমে যে পড়তে পড়তে মনে হয়, রবীন্দ্রনাথের শিক্ষাদর্শন সংক্রান্ত যা কিছু নিবন্ধ এ যাবৎ পড়েছি, তাদের চেয়ে এ রচনাটি কত সরস ও সংক্ষিপ্ত। 'শিক্ষক' শব্দটির লৌকিক ও বাঙময় অর্থ, রবীন্দ্রনাথের কাছে ঐ শব্দটির প্রকৃত সংজ্ঞা, শিক্ষণরীতি সম্পর্কে কবির নিজস্ব মত ও তার ব্যবহারিক প্রয়োগ, ডিসিপ্লিনের সঙ্গে যুক্তির মিশ্রণ, তাঁর যাবতীয় পরীক্ষা ও সংস্কারের লক্ষ্য ও পরিণাম—এ সব জিনিস একটি অনতিদীর্ঘ প্রবন্ধ-কলেবরে প্রাঞ্জল-ভাবে পরিস্ফুট হয়ে উঠেছে। শিক্ষানীতির 'মূল' কথাটাই লেখকের প্রতিপাদ্য।

রাজনীতি অর্থনীতি ইতিহাস ও বিজ্ঞান—এ চারিটি বিষয়কে একত্র নিয়ে ঐসব বিভিন্ন ক্ষেত্রে রবীন্দ্রনাথের চিন্তাধারা নিয়ে লেখা প্রবন্ধগুলির এবার উল্লেখ করতে হয়। এই প্রবন্ধ সমষ্টি আমার কাছে সবচেয়ে অর্থবান এবং মূল্যবান মনে হয়েছে। শ্রীশচীন সেনের 'রাষ্ট্র বনাম সমাজ' বিশেষজ্ঞ-রচনা, কিন্তু সাধারণ পাঠকের কাছেও এ প্রবন্ধটি রবীন্দ্রনাথের সমাজ ও রাষ্ট্র সম্বন্ধে ধারণার অভিনবত্ব পৌঁছে দিয়েছে। শ্রীজ্যোতিরিন্দ্র দাশগুপ্তের 'রবীন্দ্ররচনায় মুক্তির রাষ্ট্রদর্শন' এই কথাটি পরিচ্ছন্নভাবে বুঝিয়েছে যে কবি প্রোফেশ্যানলভাবে রাজনৈতিক আর দার্শনিক ছিলেন না কিন্তু 'ব্যক্তি' ছেড়ে 'মানুষের' মুক্তি-সন্ধান যদি রাষ্ট্রবিজ্ঞানের আধুনিকত্ব প্রমাণ করে, তাহলে 'মানুষের ধর্ম'-লেখক রবীন্দ্রনাথও আধুনিক চিন্তার সূত্র দিয়ে গেছেন। অর্থনীতির প্রসঙ্গে শ্রীভবতোষ দত্তের 'আর্থিক উন্নতি ও রবীন্দ্রনাথ' অত্যন্ত পরিষ্কার ও গোছানো লেখা। আধুনিক কালের 'কম্যুনিটি প্রজেক্ট' ব্যবস্থার যে মূলনীতি, তা রবীন্দ্রনাথ অনেক আগেই বুঝেছিলেন এবং সে জন্যই কম্যুনিটিকে স্টেটের চেয়েও বড় বলে মানতেন। "স্বদেশী সমাজ" "সমবায় নীতি" এবং "রাশিয়ার চিঠি" থেকে আর্থিক উন্নতির কার্যকরী উপায় ও ব্যবস্থা সম্বন্ধে কবির ধারণা, কর্মপদ্ধতি এবং ক্রমিক নৈরাশ্যের একটি পূর্ণ পরিচয় লেখক উপস্থাপিত করেছেন।

রবীন্দ্রনাথের ইতিহাসবোধ সম্পর্কে আছে তিনটি রচনা—শ্রীনীহাররঞ্জন রায়ের 'রবীন্দ্রনাথ ও ভারতীয় ঐতিহ্য', শ্রীগোপাল হালদারের 'রবীন্দ্রনাথ ও যুগচেতনা' এবং

শ্রীদিলীপকুমার বিশ্বাসের 'রবীন্দ্রনাথের ইতিহাস-চিন্তা'। প্রথম প্রবন্ধে লেখক তাঁর স্বভাবসিদ্ধ পটুতায় কবির ইতিহাস-প্রীতিজাত ভারতের ঐতিহ্য-সন্ধান, নানা চেষ্টা ও ঔৎসুক্য আর বিস্তারিত চর্চা ও চিন্তার ফলে যে সব সিদ্ধান্তে তিনি উপনীত হয়েছিলেন, প্রবন্ধকার তারই ধারাবাহিক পরিচিতি দিয়েছেন। ভারতীয় ঐতিহ্যের সামগ্রিক রূপ গঠন আর ঐক্যসাধনা সংস্কৃতিবান কবির কাছে পরম লক্ষ্য ও আদর্শ ছিল—এইটাই লেখকের মূল বক্তব্য। শ্রীগোপাল হালদারের প্রবন্ধে তাঁর বিষয়ানুগ 'অ্যাপ্রোচ' বিশেষভাবে লক্ষণীয়। কবির যুগচেতনাকে ও তার বিবর্তনকে ঐতিহাসিক প্রণালীতে তিনি বিচার করেছেন। রবীন্দ্রমানসের পটভূমি নির্ণয় করে তিনি একেকটি পর্বে বিভিন্ন ঘটনা ও সমস্যার সংঘাত ও প্রভাব দেখিয়েছেন কবির জাগ্রত ও গ্রহিষ্ণু চিত্তে। শেষে দেখিয়েছেন, "কালান্তরের" প্রবন্ধাবলী থেকে "সভ্যতার সংকট" পর্যন্ত শেষ পর্যায়ে রবীন্দ্রনাথের যুগচেতনা মানবতার পরম সত্যে এসে পৌঁছেচে। গোপাল হালদারের লেখায় মুন্সিয়ানার প্রশংসা করতেই হবে। কিন্তু সেই সঙ্গে একটি ত্রুটির উল্লেখ করা চলতে পারে। এ প্রবন্ধটিতে বিভাগ-বিশ্লেষণ পরস্পর যুক্ত হয়ে একটি পূর্ণতার সৃষ্টি করতে পারে নি, যা আশা করা গিয়েছিল। সে তুলনায় লেখক হিসাবে কম অভিজ্ঞ হয়েও শ্রীদিলীপকুমার বিশ্বাস তাঁর প্রবন্ধে আলোচ্য বিষয়কে আরও বিস্তারিত অথচ বিন্যস্ত করতে পেরেছেন। পড়ে মনে হয় লেখক খুব যত্ন নিয়ে লিখেছেন, ভেবেচিন্তে কবির ইতিহাস চিন্তা ও চর্চার এক একটি বিষয়সূত্র ধরে এগিয়েছেন। তথ্যসংগ্রহ ও বিশ্লেষণের অভাব ঘটেনি, আর সেই সঙ্গে রচনাটি স্বাভাবিক গতিতে এসে পূর্ণতা লাভ করেছে। উদ্ধৃত উক্তগুলির গোলকধাঁধায় কোথাও খেই হারিয়ে যায় নি। বিষয়টির মধ্যে জট আছে, কিন্তু লেখায় নেই।

এদিক থেকে তৃপ্তিদায়ক এবং পরিপূর্ণ প্রবন্ধ শ্রীপরিমল গোস্বামীর 'রবীন্দ্রনাথ ও বিজ্ঞান'। গোপাল হালদারের দৃষ্টি ও লেখার ভঙ্গীর সঙ্গে এ রচনার মিল আছে। আলোচনাটি সম্পূর্ণ বৈজ্ঞানিক, তথ্যনির্ভর, যুক্তিবাদী এবং আশ্চর্যভাবে রসিত। এ ধরনের রচনা অনেকদিন পড়বার সৌভাগ্য হয়নি। এর মধ্যেও পর্ববিভাগ আছে, বিজ্ঞান-চেতনা বিজ্ঞান প্রীতি এবং বৈজ্ঞানিক সত্যকামনার ক্রমিক বিবর্তন ও ব্যাখ্যা আছে। কিন্তু প্রথম থেকে শেষ পর্যন্ত লেখকের দৃষ্টি একাগ্র, ছোট ছোট বাক্যসমষ্টিতে বক্তব্য অত্যন্ত পরিষ্কার। তথাকথিত অতীন্দ্রিয়বাদী কবির দৃষ্টি ও সৃষ্টির আনন্দ যে বিজ্ঞানী রীতিতে ছোটকে বড়র সঙ্গে, জানাকে অজানার সঙ্গে মিলিয়ে দেখার আনন্দ—এই জায়গাগুলি লেখক গভীর প্রত্যয়ের সঙ্গে লিখেছেন। বিশেষ করে ভালো লেগেছে এ প্রবন্ধের এই কয়টি অংশ—দ্বন্দ্ব ও দ্বন্দ্বোত্তীর্ণ সত্য, উপমায় বিজ্ঞান, একই সত্যের দুটি দিক, বিবর্তনে বিশ্বাস কবিসত্তার অবিচ্ছেদ্য অংশ আর বিজ্ঞানে কবিমানসের বিস্ময়কর ব্যাপ্তি। বিস্ময়-প্রকাশ অবৈজ্ঞানিক কিন্তু বিস্ময় যেমন কাব্যের উৎস, তেমনি বিজ্ঞানের অন্ততঃ প্রেরণা। বিস্ময়ে অভিভূত হলে বৈজ্ঞানিক হয়তো মেটাফিজিকস্-এর দিকে ঝুঁকে পড়েন। কিন্তু কবির সে ভয় নেই। তাই জড়ের মধ্য থেকে প্রাণোদ্গম আর খণ্ড খণ্ড বিচিত্রের মধ্যে অখণ্ড ঐক্য বোধের আনন্দে গান গেয়ে উঠতে তাঁর দ্বিধা নেই।

মনে হয় রবীন্দ্রনাথের 'ধর্ম' সম্বন্ধে, আর জাতীয় জীবনের সংগঠক হিসাবে তাঁর ভূমিকা নিয়ে দুটি প্রবন্ধ পেলে যেন এই প্রচেষ্টা আরও সার্থক লাগত। যদিও এ দুটি বিষয় প্রসঙ্গতঃ কয়েকটি প্রবন্ধে আলোচিত হয়েছে, কিন্তু স্বতন্ত্র ও একাগ্রভাবে হয় নি। 'ধর্ম' বলতে কবি কে বুঝতেন, ধর্মচেতনা তাঁর জীবন ও শিল্পকে কতটা প্রত্যক্ষভাবে নিয়ন্ত্রিত

করেছিল, 'পার্সোনাল' কিংবা 'অর্গ্যানাইজড রিলিজ্যন'—কোন্ দিকে তাঁর আস্থা ছিল, এই সব নিয়ে একটি পৃথক আলোচনা আর জাতীয় জীবন সংগঠনে কবির কংক্রীট দান, তাঁর কর্মসূচী এবং উক্তিগুলির সম-গ্রন্থন থাকলে "রবীন্দ্রায়ণ" যেন সর্বাঙ্গসুন্দর হতে পারত।

**বিমলাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়**

**রবীন্দ্রসঙ্গীত প্রসঙ্গ** (১ম খণ্ড)—প্রফুল্লকুমার দাস। জিজ্ঞাসা। কলিকাতা-২৯। মূল্য তিন টাকা পঞ্চাশ ন.প।

রবীন্দ্রসঙ্গীত অভিজাত ক্ল্যাসিক্যাল পর্যায়ে পড়ে—কি কোন নূতন শ্রেণীর অন্তর্গত এই নিয়ে বাদানুবাদ ও বিচার-বিশ্লেষণের এখনো শেষ হয়নি। মনে হয় শাস্ত্রীয় রাগ ও তালের সমাবেশ নিয়ে আত্মপ্রকাশ করলেও রবীন্দ্রসঙ্গীত তার কথা, সুর, ছন্দ ও বিকাশ বৈশিষ্ট্য নিয়ে স্বতন্ত্র একটি শ্রেণী গঠন করেছে যদিও সে শ্রেণী ঐতিহ্যবাহী ভারতীয় সঙ্গীতেরই অন্তর্ভুক্ত। রবীন্দ্রনাথ গান রচনা করেছেন বিচিত্র বিষয়ে ভারতেরই ভাব ও আদর্শকে বহন করে। তাঁর গানে আছে তাই বৈচিত্র্যের বিন্যাস, কিন্তু একত্বের অখণ্ড অনুস্যূতি এবং অপার্থিব আনন্দলাভের আকুলতা। সুর ও কথার সামঞ্জস্য দিয়ে তিনি অর্ধনারীশ্বর রূপের করেছেন গঠন এবং রস ও ভাবের মধ্যে এনেছেন সুসঙ্গতি।

রবীন্দ্রনাথের সঙ্গীত-প্রতিভার পরিচয় দিয়ে আজ পর্যন্ত অনেক গ্রন্থই রচিত ও প্রকাশিত হয়েছে এবং তাতে করে তাঁর গানকে বোঝার বা গানের ভাব ও সৌন্দর্যকে উপলব্ধি করার পথ সুগম হয়েছে। রবীন্দ্রনাথ নিজেই ছিলেন সঙ্গীত সাধক, রসিক ও পরমপ্রেমিক। সঙ্গীত-সাধনার সঙ্গে সঙ্গে গান-রচনার ধারাও ছিল তাঁর মধ্যে উৎসারিত। প্রতিভাবান গানরচয়িতা তিনিই হতে পারেন যিনি গানসাধনার সঙ্গে সঙ্গে নূতন প্রেরণায় গা ভাসিয়ে নূতন ছন্দে গান রচনা করতে পারেন। নূতন রচনার মাঝেই রচয়িতার প্রতিভা করে আত্মপ্রকাশ এবং সঙ্গীত-সাহিত্যের ভাণ্ডারও হয় ঐশ্বর্যমণ্ডিত।

বর্তমান আলোচ্য "রবীন্দ্রসঙ্গীত প্রসঙ্গ" গ্রন্থটির আলোচনা একটু স্বতন্ত্র ও স্বাধীন। গ্রন্থের আলোচনাভঙ্গি সাধারণত একটু ক্ল্যাসিক্যাল স্পর্শযুক্ত এবং শাস্ত্রপন্থী—যা সচরাচর রবীন্দ্রসঙ্গীতের গ্রন্থ-সমালোচনার ক্ষেত্রে চোখে পড়ে না। বর্তমান গ্রন্থটিকে তাই চিরাচরিত ধারার একটু পরিপন্থী বলে মনে হওয়াও বিচিত্র নয়। অথচ স্বাধীন ও সঠিক আলোচনা-শৈলীকে পরিপন্থীই বা বলি কেমন করে।

"রবীন্দ্রসঙ্গীত প্রসঙ্গে" রচনার সূচনায় গ্রন্থকার সাতটি পাঠক্রমের পরিচয় দিয়াছেন, তারমধ্যে ছ'টি ক্রিয়াসিদ্ধ অংশ ও একটি তত্ত্বসিদ্ধ অংশ। শাস্ত্র ও সাধনা নিয়ে সকল দেশের সকল জাতির গ্রন্থ রচিত। রবীন্দ্রসঙ্গীতেও যে শাস্ত্রজ্ঞানের উপযোগিতা আছে গ্রন্থকার একথা বলেছেন এবং আমরাও সর্বতোভাবে স্বীকার করি। অনেকের মতে রবীন্দ্রনাথ ব্যাকরণের বন্ধন এড়িয়েছিলেন বলে তাঁর গান এত স্বচ্ছন্দবিহারী ও লীলায়িত হতে পেরেছিল, আর তারি জন্য সুরের গতি হয়েছিল স্বাধীন। কিন্তু ব্যাকরণের খুঁটিনাটি নিয়ে আলোচনার অবতারণা বিশেষভাবে না করলেও তিনি যে একটু সুনিবন্ধ নিয়মের পক্ষপাতী ছিলেন একথা তাঁর বিচিত্র আলোচনার মধ্য থেকে জানা যায়। উচ্ছৃঙ্খলতা ও নিয়মহীনতাকে

তিনি কোনদিন কোন বিষয়ে স্থান দিয়েছেন বলে আমরা মনে করি না। তাছাড়া তাঁর গানের কাব্যধর্মী কথা, সুর ও তাল শাস্ত্রসঙ্গত ছিল, সুতরাং তাঁর গানে ব্যাকরণের জটিলতা প্রকাশ্যভাবে স্থান না পেলেও নিয়মানুবর্তিতাকে তিনি তাঁর জীবনে ও সৃষ্টির প্রতিটি বিষয়ে গ্রহণ করেছিলেন একথা স্বীকার করা ছাড়া উপায় নাই। তাই তাঁর সংগীতের কথা বা সাহিত্য এবং সুর বা রাগ-রাগিণীদের সম্যক পরিচয় পেতে গেলে শাস্ত্র তথা ব্যাকরণ-চর্চার প্রয়োজন আছে বৈকি। তাই গ্রন্থে তত্ত্বাসিন্ধাংশের সমাবেশ করে শিল্পরুচিসম্পন্ন গ্রন্থকার রচনাসৌষ্ঠবেরই পরিচয় দিয়েছেন, অসঙ্গতি কিছু সৃষ্টি করেন নি একথা বলতে পারি।

তত্ত্বাসিন্ধাংশের আলোচনায় গ্রন্থকার একেবারে প্রচলিত নিয়ম-কানুনকে হুবহু অনুসরণ না করে বিচারী রবীন্দ্রনাথের নিজস্ব ধারাকে বেশীর ভাগ অনুসরণ করলে বোধ হয় আরো সুসঙ্গত হত। অবশ্য দু-একটি জায়গায় যে তিনি এ সম্বন্ধে আলোচনা করেন নি তা নয়। যেমন রাগ পূরবী তথা পূর্বীয় প্রসঙ্গে বলেছেন: 'রবীন্দ্রনাথ তাঁর অধিকাংশ পূর্বীরাগের গানে শুদ্ধধৈবত ব্যবহার করেছেন। আবার একই গানে দুই-ধৈবতযুক্ত পূর্বীরাগের ব্যবহার করেছেন......।' বাঙ্গালাদেশে 'পূর্বী' পূরবী নামে পরিচিত এবং শুদ্ধধৈবতকে নিয়েই সার্থক। রাগ আসাবরীর বেলায়ও গ্রন্থকার বলেছেন, 'রবীন্দ্রনাথ তাঁর অধিকাংশ আসাবরীরাগের গানে কোমল-ঋষভ ব্যবহার করেছেন।' কিন্তু কেন ব্যবহার করেছেন সেকথা তিনি কোন জায়গায় বলেন নি। এরকম শাস্ত্রসঙ্গত রাগে রবীন্দ্রনাথ স্বাধীন মনোবৃত্তি ও সৃজনীশক্তি নিয়ে বাংলাদেশের ঐতিহ্যবাহী স্বতন্ত্র ধারাকে যে বিশেষভাবে গ্রহণ করেছেন একথা বলা বাহুল্য।

গ্রন্থকার মাত্রা, ছন্দ ও তাল পর্যায়ে সুন্দর সুসঙ্গত আলোচনা করেছেন যা রবীন্দ্র-সঙ্গীতের শিক্ষার্থী ও পথচারীদের একান্ত প্রয়োজনীয়। রবীন্দ্রনাথের প্রতিভায় ও সৃজনশক্তিতে যে মৌলিকতার স্পর্শ ছিল একথা বলাই বাহুল্য। রাগ, তাল, ছন্দ, মাত্রা সকল বিষয়ে রবীন্দ্রনাথ যেমন প্রাচীন ধারায় অনুসরণ করেছেন তেমনি স্বতন্ত্র দৃষ্টিভঙ্গী নিয়ে নূতনতারও আশ্রয় নিয়েছেন। অচলায়তনের বিরুদ্ধে চিরদিনই তাঁর সংগ্রাম, তাই চলা-পথকে গতিরুচ্ছল করতে এবং নূতন পথচলাকে সম্মান ও সম্মতি জানাতে তিনি কসুর করেন নি। রবীন্দ্রনাথ হয়তো ছন্দের বেলায় একেবারে নূতন সৃষ্টি করেন নি, কিন্তু পরীক্ষা-নিরীক্ষা করে তার প্রয়োগ ও বিকাশের কৃতিত্ব দেখিয়েছেন। গ্রন্থকার ৬২ থেকে ৭১ পাতা বিভিন্ন তালের ছন্দ ভাগ করে পরিচয় দিয়েছেন যাতে করে শিক্ষার্থীদের পথ-প্রদর্শকের কাজ করবে।

অষ্টম পাঠক্রমের তত্ত্বাসিন্ধাংশপর্যায়ে তিনি বর্ণ, কাকু, রাগালাপ, রাগের প্রকারভেদ, রাগসঙ্গীতে গানের শ্রেণীবিভাগ, এবং গীতিশ্রেণী হিসাবে ধ্রুবপদ, হোরী বা ধামার, খেয়াল, টপ্পা, ঠুংরি, তেলেনা, ত্রিবট প্রভৃতি পরিচয় দিয়েছেন। 'মূল হিন্দী গান ও ভাঙা রবীন্দ্র-সঙ্গীত' পর্যায়ে তাঁর আলোচনা আরো তথ্যপূর্ণ ও সমৃদ্ধ। শ্রদ্ধেয়া ইন্দিরাদেবী চৌধুরাণী রচিত "রবীন্দ্রসঙ্গীতের ত্রিবেণী সংগম" গ্রন্থের পর ঠিক এত সুন্দর ও সুষ্ঠুভাবে এ সম্বন্ধে আলোচনা কেউ করেন নি। রবীন্দ্রনাথ হিন্দী গানের অনুসারী হয়ে অনেক গান রচনা করেছেন, কিন্তু তাই বলে সেগুলি হুবহু অনুসরণ নয়, সেই অনুসৃত রচনার মধ্যে ব্যক্তি ও রচনা-স্বাতন্ত্র্যের স্পষ্ট ছাপ বর্তমান। "রবীন্দ্রস্মৃতি" গ্রন্থে স্বর্গীয়া ইন্দিরাদেবী বলেছেন অনেক পুরাতন বাংলাগানের অনুসরণ করেও রবীন্দ্রনাথ গান রচনা করেছিলেন

("সঙ্গীত-স্মৃতি" দ্রষ্টব্য), কিন্তু তাঁর রচিত গানগুলির মধ্যে রচনাচাতুর্য আরো সুস্পষ্ট। "রবীন্দ্রসঙ্গীত-প্রসঙ্গে"র গ্রন্থকার প্রফুল্লকুমার দাস ১১৫—১১৭ পৃষ্ঠায় মূল হিন্দী গানের পাশাপাশি ভাঙা রবীন্দ্রসঙ্গীতের অনেকগুলি গানের পরিচয় দিয়েছেন এবং তাদের বেশীর ভাগই সঙ্গীতনায়ক গোপেশ্বর বন্দ্যোপাধ্যায় ও স্বর্গীয় রামপ্রসন্ন বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়ের গ্রন্থ থেকে নেওয়া। বিষ্ণুপুর-ঘারাণার গানগুলি যে উৎস থেকেই সংগ্রহ করা হোক না কেন, তারা যে সেনী ঘরের গানের প্রতিচ্ছবি সে বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই এবং এথেকে রবীন্দ্রনাথ যে বিষ্ণুপুর-ঘরাণাকেই তাঁর গানে বা গান রচনায় বেশী সম্মান দিয়েছেন তা বেশ বোঝা যায়। তবে তাঁর সঙ্গীতগুরু বিষ্ণু চক্রবর্তীর প্রভাবকে যে তিনি কোনদিনই তাঁর গানে কাটিয়ে উঠতে পারেন নি একথা স্বীকার্য।

আলোচ্য গ্রন্থে 'রবীন্দ্রসঙ্গীতের অনুষঙ্গ', 'গান ও গায়কি', 'সঙ্গীত সম্পর্কে রবীন্দ্রনাথের উক্তি' ও 'রবীন্দ্রসঙ্গীতের ধারা' বিষয়বস্তুগুলি গ্রন্থের সৌষ্ঠব বৃদ্ধি করেছে। গায়কি ও স্টাইল একই শ্রেণীভুক্ত তবে একটি সঙ্গীতে এবং অপরটি সাহিত্যে ও কাব্যে। রবীন্দ্রসঙ্গীতেও যে গায়কি আছে একথা স্বীকার্য এবং এই গায়কির স্বতন্ত্র রূপ বা ধারাকে অনুসরণ করে গানের প্রতিফলন হলে তবেই রচিত গান হয় সার্থক। প্রচলিত ধারায় নিজস্ব সৃষ্টি স্বীকৃত, কিন্তু সেই ধারার গতিরুচ্ছলতা যাতে নূতন সৃষ্টির চাপে মন্থর বা শুষ্ক না হয় তা সর্বতোভাবে লক্ষ্য রাখা দরকার।

পরিশেষে আলোচ্য গ্রন্থের রূপায়ণে যে মাঝে মাঝে কোন ত্রুটি নাই সে কথা বলি না। যেমন (১) ৫১ পৃষ্ঠায় 'বর্তমানে ষড়্‌জগ্রামের মধ্যমকে, ভরতোক্ত অবিনাশী, অবিলোপী ও অলঙ্ঘ্য মধ্যমকে, ষড়্‌জগণ্য করে গায়ণ বা বাদন-ক্রিয়া সম্পন্ন হয়। ষড়্‌জস্থানের এরূপ পরিবর্তনে...' প্রভৃতি আলোচনাগুলি একটু জটিলতার আশ্রয় নিয়েছে সম্ভবত অপর কোন গ্রন্থের হুবহু আশ্রয় করার জন্য। আলোচ্য বিষয় মূল্যবান, কিন্তু ষড়্‌জগ্রামের রূপান্তর সম্বন্ধে আরো বিশদ আলোচনা না হলে বিষয়টি ঠিক পরিস্ফুট হয় না। (২) ৫৭ পৃষ্ঠায় রাগের জাতি সম্বন্ধে আলোচনাটি আরো তথ্যপূর্ণ হওয়া উচিত ছিল, কেন না সঙ্গীতশাস্ত্রে 'জাতি' শব্দটি নানানভাবে সার্থক। শ্রুতি, রাগ ও শ্রেণী এই তিনটির বেলায়াই 'জাতি' শব্দটির অন্তর্নিবেশ দেখা যায়। কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে তাদের মধ্যে পার্থক্যের পরিচয়ও দেওয়া প্রয়োজন।

পরিশেষে বক্তব্য, রবীন্দ্রসঙ্গীতসম্বন্ধে প্রকাশিত পূর্ব পূর্ব গ্রন্থ অপেক্ষা বর্তমান গ্রন্থের আলোচনা, বিচার-বিশ্লেষণ, ও সাঙ্গীতিক বিষয়ের বিভাজন-প্রণালী ও বিষয়নির্বাচন বেশ নূতন এবং গঠনমূলক। রবীন্দ্রসঙ্গীত ভারতীয় ক্ল্যাসিক্যাল ও আঞ্চলিক সঙ্গীত শ্রেণীর অর্ধনারীশ্বর মূর্তি, সুতরাং তার অনুশীলন ও অভ্যাসের জন্য শিক্ষার্থীর শাস্ত্র ও সাধনা বিষয়ে সজাগ থাকা দরকার। গ্রন্থের নিজে রবীন্দ্রসঙ্গীতে ও উচ্চাঙ্গ ক্ল্যাসিক্যাল সঙ্গীতে অভিজ্ঞ থাকার জন্য গ্রন্থের রচনা, পরিকল্পনা ও রূপায়ণকে এত সবল ও সফল করতে সমর্থ হয়েছেন। রবীন্দ্রসঙ্গীতের অনুশীলন ও অভ্যাসকে তিনি আরো বৈজ্ঞানিক ভিত্তির ওপর স্থাপন করায় সর্বসাধারণের কৃতজ্ঞতাভাজন হবেন বলে আশা করি। রবীন্দ্রসঙ্গীতের শিক্ষার্থীগণকে আমরা নিঃসন্দেহে এই গ্রন্থের বিষয়বস্তু ও বিচারশৈলী অনুসরণ করতে অনুরোধ করি।

স্বামী প্রজ্ঞানানন্দ

Gitanjali *By* Rabindranath Tagore. Macmillan & Co Ltd., London. Rs 3.00.

বর্তমান শতাব্দীর দ্বিতীয় দশকের প্রারম্ভে গীতাঞ্জলির ইংরেজী অনুবাদ লণ্ডনের ম্যাকমিলান অ্যাণ্ড কোম্পানী প্রথম প্রকাশ করেন। য়ুরোপের পাঠকদের কাছে সেই রবীন্দ্রনাথের প্রথম আবির্ভাব। ইংরেজী ভাষী এবং সমগ্রভাবে য়ুরোপের উপর এই অপূর্ব ধর্মগীতিগুলির কি প্রভাব হয়েছিল সে কথা এই শতবার্ষিকী উপলক্ষে অন্যরা বলেছেন এবং বলবেন। আমার স্বদেশে অর্থাৎ আইসল্যাণ্ডে গীতাঞ্জলির আবির্ভাব এবং আমার উপর তার প্রভাবের কথাই আমি বলব, কেননা আমার শুধু সে কথাই বলবার অধিকার আছে।

গীতাঞ্জলির ইংরেজী অনুবাদ প্রকাশিত হবার চার বছর পরে এড্ডা এবং সাগার কবিত্বময় আইসল্যাণ্ডের ভাষায় তার অনুবাদ প্রকাশিত হল। অনুবাদ করেছিলেন ম্যাগনাস আরনাসন নামে একজন প্রতিভাধর সাহিত্যপ্রেমিক যুবক, তিনি তখন আমেরিকায় বাস করতেন। একখানা ছোট, সুন্দর বই হয়ে গীতাঞ্জলি প্রকাশিত হল এবং বইখানি আমার হাতে যখন প্রথম পৌঁছল তখন আমার বয়স পনেরো। আর তৎক্ষণাৎ তার বহুদূর থেকে ভেসে আসা বিচিত্র সূক্ষ্ম সংগীত আমার কৈশোরোচিত ধার্মিকতার গভীর মর্মে প্রবেশ করল। আমি আজো কোন কোন বিশেষ মুহূর্তে মনের অন্তরতম গহনে তার ধ্বনি শুনতে পাই।

যেমন য়ুরোপের তেমনি আমাদের দেশের পাঠকদের কাছেও গীতাঞ্জলি একটি আশ্চর্য সুন্দর ফুলের রূপ এবং সৌরভ নিয়ে দেখা দিয়েছিল যে ফুল আমরা আগে কখনো দেখি নি। গীতাঞ্জলির অনুপ্রেরণায় বহু কবি কাব্যধর্মী গদ্যরচনার পরীক্ষায় উদ্বুদ্ধ হয়েছিলেন। সুদূর স্ক্যাণ্ডিনেভিয়ার দেশগুলিতেও কাব্যধর্মী গদ্যের যে প্রচলন শুরু হয়েছিল তার উৎস ছিলেন রবীন্দ্রনাথ। আমিও যৌবনে সে ধরনের রচনা করতে চেয়েছিলাম কিন্তু সফল হতে পারি নি। আমি সেদিন বুঝিনি যে গীতাঞ্জলির প্রকাশভঙ্গী বা ফর্ম তার মর্মকথা বা বিষয়বস্তুর তুলনায় গৌণ। আমার মনে হয় যে একথা বোঝেন নি বলেই রবীন্দ্রনাথের অধিকাংশ য়ুরোপীয় ভক্তের অনুকরণের চেষ্টা ব্যর্থ হয়েছিল। রবীন্দ্রকাব্যের যে নৈসর্গিক ভিত্তি, গ্রীষ্মপ্রধান দেশের উষ্ণ আবহাওয়া ও প্রাণবন্ত প্রকাশ য়ুরোপে নাই। পরিবেশের এ পার্থক্যের দরুণ গীতাঞ্জলির সমধর্মী কাব্যসৃষ্টি য়ুরোপে সম্ভব হয় নি। গীতাঞ্জলির কবিতায় ঐশী প্রেরণার প্রকাশ আমাদের মুগ্ধ করে, কিন্তু তা এক ভিন্নতর আবহাওয়া দ্বারা নির্দিষ্ট অর্থাৎ এক ভিন্নতর সভ্যতার সৃষ্টি। ভারতবর্ষে যে মানুষটি গাছের ছায়ায় বসে আছে ভগবান তার কাছেও উপস্থিত। গৌতম বুদ্ধের চোখে যে দৃষ্টি, অর্ধনগ্ন পথচারী ফকিরের চোখেও সে দৃষ্টির পরিচয় সে দেশে মিলতে পারে। আমাদের দেশে খোলা মাঠে বসে ভগবানের চিন্তা করতে গেলে ঠাণ্ডায় জমে যাবার অথবা ঝড়ে উড়ে যাবার সম্ভাবনাই বেশী।

রবীন্দ্রনাথের ভগবান আশ্চর্য; তিনি বন্ধু, তিনি প্রেমিক, তিনি পদ্মফুল, যে অপরিচিত বিদেশী নদীতে নৌকো ভাসিয়ে বাঁশি বাজিয়ে চলে তার মধ্যেও ভগবানের প্রকাশ। ভূমধ্যসাগর অঞ্চলে ইহুদীদের বাইবেল বিষয়ক কবিতায় রবীন্দ্রনাথের ভগবানের তুলনা পাওয়া যাবে, চীন দেশের তাও-তেহ কিংয়ের মধ্যেও কখনো কখনো তাঁর পরিচয় মিলবে, কিন্তু মধ্য যুগের পরে য়ুরোপে তাঁর ঠিকানা মেলে না। সে যুগে সন্ন্যাসীরা

প্রকৃতির খোলা হাওয়া থেকে, তার গন্ধস্পর্শ থেকে দূরে, গীর্জার অন্ধকার বন্ধ ঘরে সাধনা করতেন,—সেই কৃচ্ছ্রসাধনের অবসানের সঙ্গে সঙ্গে ভগবৎ অনুভূতিও যেন লোপ পেয়েছে। আজকাল য়ুরোপের ভগবান হয় জগৎজোড়া কোন ফার্মের ডিরেক্টর অথবা শিশুর খেলার জগতের কল্পনার সঙ্গী। মৃত্যুকালে অথবা বিপদের সঙ্গীন মুহূর্তেই আমরা তাঁকে স্মরণ করি। হয়তো সেই কারণেই রবীন্দ্রনাথের এই বাস্তব আত্মিকবোধ য়ুরোপের মানুষের মনে বহুকাল বিস্ময়ের বস্তু হয়ে থাকবে। প্রাচ্যের তুলনায় আমাদের পার্থিব সম্পদ অনেক বেশি। সে ঐশ্বর্য থেকে আমরা বঞ্চিত কিন্তু গীতাঞ্জলির গানে কবি বলেছেন 'যাবার বেলা এই কথাটাই বলে যেন যাই, যা দেখেছি, যা শুনেছি তুলনা তার নাই'—সে গানে অন্তরের যে ঐশ্বর্য প্রকাশিত, সে তুলনায় আমরা নিঃস্ব।

**হ্যালডর ল্যাক্সনেস**

**রবীন্দ্রনাথ : শতবার্ষিকী প্রবন্ধ-সংকলন**—গোপাল হালদার সম্পাদিত। ন্যাশনাল বুক এজেন্সি প্রাঃ লিমিটেড। কলিকাতা ১২। মূল্য পাঁচ টাকা

দশটি প্রবন্ধে রবীন্দ্রনাথের বিচিত্রমুখী প্রতিভার বিভিন্ন দিক নিয়ে দশজন লেখক আলোচনা করেছেন, এবং সেই সংগ্রহ সম্পাদনা করে 'নিবেদন'-এ শ্রীযুক্ত গোপাল হালদার জানিয়েছেন যে, ভারতবর্ষের ইতিহাসের ধারায় তো বটেই—ব্যাপক ক্ষেত্রে, এশিয়া-আফ্রিকার নব জাগরণের সমকালীন অনন্যসাধারণ এক ব্যক্তিত্বের অধিকারী ছিলেন রবীন্দ্রনাথ। রবীন্দ্র-প্রতিভার মধ্য দিয়ে তাই আমরা আমাদের কালের সঙ্গে কালান্তরের সংযোগ অনুভব করি,—'ভাবী কালের আভাসও আমরা লাভ করি'। এই অপরিসীম পরিব্যাপ্তি এবং অপরিসীম গভীরতার তত্ত্ব কয়েকটি মাত্র প্রবন্ধের সাহায্যে সম্পূর্ণভাবে আলোচনা করা সম্ভব নয়। সম্পাদক নিজেই জানিয়েছেন—'আয়োজন সংকল্পানুযায়ী সুসম্পন্ন হল না। রবীন্দ্র-প্রতিভার কোন কোন প্রধান দিক অনালোচিত রইল, অন্য কোনো কোনো দিকেও বিস্তৃত আলোচনা সম্ভবপর হয়নি, আলোচনায় ক্রমভঙ্গও অনিবার্য হয়ে পড়েছে।'

এরকম বিপুল ক্ষেত্রে যা ঘটা স্বাভাবিক, তাই ঘটেছে। সেজন্যে কুণ্ঠা নিষ্প্রয়োজন। যাঁরা আলোচনায় যোগ দিয়েছেন, তাঁদের গৃহীত বিষয়গুলি যথাক্রমে এই : 'সার্বভৌম কবি' লিখেছেন শ্রীহীরেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়; শ্রীসরোজ বন্দ্যোপাধ্যায় লিখেছেন 'রবীন্দ্রনাথের চিত্রকল্প ও প্রতীক'; শ্রীরবীন্দ্রনাথ গুপ্তের লেখাটির নাম 'রবীন্দ্রনাথের উপন্যাস'; শ্রীনারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায় লিখেছেন 'রবীন্দ্রনাথের ছোটগল্প'; শ্রীবিষ্ণু দের লেখাটির নাম 'চিত্রশিল্পী রবীন্দ্রনাথ'; শ্রীসত্যেন্দ্রনারায়ণ মজুমদারের প্রবন্ধ 'রবীন্দ্রনাথ ও লোক-সংস্কৃতি'; সম্পাদক শ্রীগোপাল হালদার নিজে লিখেছেন 'রবীন্দ্রনাথের স্বাদেশিকতা'; শ্রীসুশোভন সরকার লিখেছেন 'রবীন্দ্রনাথ ও বাংলার নবজাগরণ'; শ্রীচিন্মোহন সেহানবিশের প্রবন্ধ 'রবীন্দ্রনাথের আন্তর্জাতিক চিন্তা'; আর, শেষ লেখাটি শ্রীহিরণকুমার সান্যালের 'রবীন্দ্রনাট্য প্রসঙ্গে'। এই প্রবন্ধ-সংগ্রহের প্রারম্ভে আছে শ্রীযামিনী রায়ের আঁকা রবীন্দ্রনাথের প্রতিকৃতির প্রতিলিপি।

'সার্বভৌম কবি' প্রবন্ধে হীরেন্দ্রনাথ বলেছেন যে, আধুনিক কালে মানুষের চিরন্তন

মহিমা রবীন্দ্রনাথের রচনায় যে সৌকর্যে ব্যক্ত হয়েছে, তার তুলনা নেই; তাঁর মননের এবং কল্পনার ব্যাপ্তি অতুলন; তীব্রতা আর গভীরতার স্বাদও সেখানে অপরিসীম—তবে, তাঁর নিজের কথায়—'মহাকাশে সংখ্যাহীন গ্রহ-নক্ষত্র বিলীন হয়ে গেলেও প্রকৃতির হানি হয় না, কিন্তু পূর্বের দিকে তাকিয়ে ঘাসের যে প্রতিটি ডগা রোজ হেসে ওঠে সেখানে অসীম হৃদয়ের সকল যন্ত্র এবং কৌশল অবস্থিত না থাকলে তো চলে না। এই তীব্রতা আর গভীরতার দিক থেকে বিচার করলে রবীন্দ্রনাথকে একেবারে পৃথিবীর সবচেয়ে সেরা, মুষ্টিমেয় কয়েকজন কবির সারিতে না বসিয়ে তাদেরই কাছে, কিন্তু একটু নামিয়ে, জায়গা দেওয়াই হয়তো সমীচীন। অবশ্য মনে রাখতে হবে যে শেক্সপীয়রের মতো যিনি প্রায় প্রশ্নাতীত, তাঁর লেখাতেও গলদের অভাব নেই—এ বিষয়ে ড্রাইডেন, ভল্‌তেয়র, জন্‌সন্‌ প্রমুখ গুণীর বক্তব্য স্মরণীয়।'

প্রধানত রবীন্দ্রনাথের সম্বন্ধে হীরেন্দ্রনাথের আন্তরিক শ্রদ্ধাই এ-প্রবন্ধে ব্যক্ত হয়েছে, তবু এই ধরনের উক্তি একবার নয়,—একাধিকবার ঘটেছে। যেমন তিনি বলেছেন: রবীন্দ্রনাথ কবিতার ক্ষেত্রে 'বিশ্বরূপ দর্শন' করতে পারেন নি,—শিল্পের অন্যান্য ক্ষেত্রে তাঁর যে-রকম 'দৃপ্ত, প্রসন্ন পদক্ষেপ', কবিতার ক্ষেত্রে সে-রকম নয়, এই ধরনের মন্তব্যও আছে। তিনি বলেছেন, রবীন্দ্রনাথ কবি হিসেবে শেক্সপীয়র এবং দান্তের চেয়ে একটু নিরেশ—'রবীন্দ্রনাথের কথা বলতে গিয়ে যে এই স্তরের মহাকবিকে স্মরণ করতে হয়, এটাই তাঁর মহত্ত্বের এক প্রমাণ, কিন্তু তাঁদের মহিমা রবীন্দ্রপ্রতিভায় আবৃত হয়েছে কল্পনা করা অসমীচীন।' "বলাকা"র কোন্‌ কোন্‌ কবিতা যুদ্ধের আগে লেখা, কোন্‌গুলিই বা পরে লেখা, সে-বিষয়ে কিঞ্চিৎ উল্লেখ করে তিনি বলেছেন, 'মহাকবিত্বের যদি কোনো পরীক্ষা থাকে তো "বলাকা"র সঙ্গে সঙ্গে রবীন্দ্রনাথ তাকে উত্তীর্ণ হয়ে বহুদূরে চলে গেলেন।' তাঁর পরবর্তী কাব্যধারায় ছন্দ আর বিষয়বস্তুর নতুনত্বও লক্ষ্য করেছেন হীরেন্দ্রনাথ, আবার, "পূরবী"তে যে ভূরি পরিমাণে 'সার্থক ও সুশোভন পুনরুক্তি' ঘটেছে, সে-কথাও বলতে কুণ্ঠিত হন নি। কথায় কথায় রবীন্দ্রনাথের সমালোচক-সত্তার প্রসঙ্গও উঠেছে,—অন্যান্য কথাও দেখা দিয়েছে, যদিও কবিসত্তার আলোচনাই এ-প্রবন্ধের মুখ্য উদ্দেশ্য। যাঁরা উগ্র রবীন্দ্র-ভক্ত, তাঁদের এ লেখাটি উত্তেজিত করবে, সন্দেহ নেই। তবে, উগ্রতা এক-এক রকম মেজাজের লক্ষণ,—সকলের মেজাজ সমান নয়। অতএব হীরেন্দ্রনাথের এই ব্যক্তিগত মন্তব্য যাঁরা উগ্রতর মন্তব্যে চিহ্নিত করবেন, তাঁদের কাছে হীরেন্দ্রনাথের এই কথাটিও পুনরায় নিবেদন করা দরকার যে, 'রবীন্দ্রনাথের কাছে আমাদের প্রত্যাশার অন্ত নেই বলেই যেখানে যে কবির কোনো বিশিষ্ট উৎকর্ষের দিব্য জ্যোতি দেখি, তখনই মন সন্ধান করে রবীন্দ্রকাব্যে কোনো অনুরূপ সিদ্ধির আশায়। কিন্তু মহামহীরূহের মহিমারও তো সীমা আছে।' এই সীমা-সচেতনতার দিকে এ-সংকলনের একাধিক লেখকের ইশারা একটু বিশেষভাবেই চোখে পড়ে।

রবীন্দ্রনাথের চিত্রকল্প ও প্রতীকের আলোচনায় সরোজ বন্দ্যোপাধ্যায় বলেছেন—'কড়ি ও কোমল পর্যন্ত রবীন্দ্রনাথের কাব্যপ্রয়াসে যে খঞ্জতা, তার মূলে কবির কল্পনার অপ্রস্তুতি।' "সোনার তরী"তে পৌঁছেই 'সচল অভিজ্ঞতাকে তাঁর কবিমানস যে প্রথম স্থায়িভাবে হৃদয়ঙ্গম করেছে, সেটা বোঝা যায়। এই তাঁর বিশ্বাস। সোনার তরী-ছিন্নপত্রের সময়টাকে তাই তিনি বিশেষভাবে সমৃদ্ধ বলে মনে করেছেন। 'সোনার তরী' কবিতায় তিনি 'রূপক-নির্মাণের সাহসিক অভিনবত্ব' লক্ষ্য করেছেন। সোনার তরীতে 'যাহা ছিল নিয়ে গেল সোনার তরী' উক্তিতে পাকাধানের সোনালী সমারোহ বিলুপ্ত হবার যে বেদনা ব্যক্ত হয়েছে,

সেই বেদনার দিকে তর্জনী তুলে, লেখক দেখিয়েছেন 'সোনার ধানের সঙ্গে বিচ্ছেদের এই স্মৃতি রবীন্দ্র-মানসের সমগ্রে জড়িয়ে যাওয়ার ফলে অতঃপর অধিকাংশ ক্ষেত্রেই বিচ্ছেদ-কল্পনায় স্বর্ণবর্ণ স্বাভাবিক অনুষঙ্গ হিসাবে আকৃষ্ট হয়েছে।...স্বর্ণবর্ণ "সোনার তরী"-"চিত্রা" পর্যায়ে বহু ব্যবহৃত বর্ণ-প্রসঙ্গ।' এবং এই ধারাক্রমে এগিয়ে গিয়ে, তিনি 'সোনার তরী'র হৃদয় যমুনা', 'পরশ পাথর', 'নিরুদ্দেশ যাত্রা' কবিতায় আর "চিত্রা"র 'দিনশেষ'-এ রবীন্দ্রনাথের নিঃসঙ্গতাবোধের রূপক-শোভার কথা স্মরণ করেছেন। অতঃপর 'বিরাট চিত্তের সঙ্গে মানবচিত্তের ঘাত-প্রতিঘাত'-জনিত রূপক 'রাজা', 'প্রভু', 'শিব', 'রুদ্র' ইত্যাদির কথা উঠেছে। একই আবেগে 'ঝড়'-রূপকের এবং আনুষঙ্গিক অন্যান্য সংকেতের কথাও বিবেচ্য। সোনার তরী-চিত্রার পরে "ক্ষণিকা"কে তিনি যে অসামান্য রচনা বলে উল্লেখ করেছেন, সরোজবাবুর সে-মন্তব্য খুবই সংগত হয়েছে। "বলাকা"র 'চমকে-ঝলকে'র সঙ্গে "ক্ষণিকা"র 'নদী-জলে পড়া আলোর মতন ছুটে যা ঝলকে ঝলকে'—উক্তির অনুভূতিগত অন্বয়ের ভাবনাও সংগত। বলা বাহুল্য, এই ধরনের পুঙ্খানুপুঙ্খ সন্ধান সম্পূর্ণ করে তোলা সময়সাপেক্ষ কাজ, এবং ছোটো একটি প্রবন্ধের পাত্রে সব কথা নিঃশেষে বলাও সম্ভব নয়। 'পরিশেষ'-এর 'জপমালা'—সংকেতের উল্লেখ করে সেখানে রবীন্দ্রনাথের রূপকমননের একটি পরিণতিচিহ্নের ওপর জোর দিয়েছেন লেখক।

বেশ জোরের সঙ্গেই সরোজবাবু বলেছেন—'যে কবিপুরুষ বাংলা সাহিত্যে টেকনিকের রাজা, জীবনকে খুঁজতে খুঁজতে মৃত্যুসিন্ধুর তীরে এসে তিনি সমস্ত অঙ্গাভরণ পরিহার করেছেন। রিক্ততাই তখন হল বাঙ্ময়। রাজা এতদিনে হলেন ঋষি।'

'রবীন্দ্রনাথের উপন্যাস' এবং 'রবীন্দ্রনাথের ছোটগল্প' প্রবন্ধ দুটিতেও এই ধরনের বিশ্লেষণপ্রধান ভঙ্গিই ফুটেছে। তবে, এ-দুটির শেষেরটিতেই আলোচনার অপেক্ষাকৃত বিস্তার আছে। দুটি প্রবন্ধই আরো কিছু জায়গা পেলে ভালো হোতো।

রবীন্দ্রনাথের ছবি সম্বন্ধে উইলিয়ম আর্চারের মতামতের ত্রুটি দেখিয়ে বিষ্ণুবাবু আরো অনেকের অনেক উদ্ভট মতামতের কথা জানিয়েছেন এবং তাঁর স্বভাবসুলভ বৈঠকী আলাপের ভঙ্গিতেই এই দরকারী কথাটিও নিবেদন করেছেন যে 'আমাদের কৈলাস-ভাবনায় বাস্তব কখনো রীতির বিন্যাসে আসতে ভয় পায়নি, আমাদের রিয়ালিস্‌ম্‌ ও অ্যাবস্ট্রাক্ট রূপ অঙ্গাঙ্গী।' তিনি যামিনী রায় এবং রবীন্দ্রনাথ, উভয়ের নাম একসঙ্গে উচ্চারণ করে বলেছেন যে, এঁরা দুজনেই ভারতীয় ভূমিতে আধুনিক শিল্পীর মন সঞ্চার করেছেন। প্রসঙ্গত, একটি বিন্দু থেকে যাত্রা শুরু করে রেখার অভিযানে এগিয়ে যেতে, রবীন্দ্রনাথের শিল্পিমন কতো যে উৎসাহী ছিল, ক্লে-র জরনাল থেকে একটি উক্তির উল্লেখ করে, তিনি পাঠককে শিল্পী-রবীন্দ্রনাথের সে-প্রবণতা অনুভব করবার সুযোগ দিয়েছেন। রেখা, রঙ, বর্ণপারম্পর্য, স্থানবোধ—সব দিক থেকেই রবীন্দ্রচিত্রাবলী যে প্রশংসার বিষয়, এই মোট-কথাটা তিনি বলেছেন। কিন্তু উদাহরণ দিয়ে,—অর্থাৎ যোগ্য প্রতিলিপি যোগ করেই এ আলোচনা সম্পূর্ণ করে তুলতে হয়। প্রকাশক এদিকটায় সচেতন থাকলে ভালো হোতো।

'রবীন্দ্রনাথ ও লোকসংস্কৃতি' প্রবন্ধের শেষ অনুচ্ছেদে মার্কসবাদী গবেষককে অবহিত হতে বলা হয়েছে। শেষ বাক্যে লেখক বলেছেন, 'মানবতাবাদী ও সত্যনিষ্ঠ দৃষ্টির সাহায্যে তিনি যে পথের সন্ধান পেয়েছিলেন তাকে ঐতিহাসিক বস্তুবাদী দৃষ্টির সাহায্যে আলোকিত করে তোলার দায়িত্ব মার্কসবাদীদেরই পালন করতে হবে।' এবং প্রবন্ধের প্রথম দিকেই তিনি বলে নিয়েছেন—'তিনি বুর্জোয়া-শ্রেণীর দৃষ্টিভঙ্গির গণ্ডীকে অতিক্রম করে অনেকদূর

অগ্রসর হয়েছেন। তিনি লোকসংস্কৃতির প্রবাহে শুধুমাত্র পরিবর্তনশীল ইতিহাস ও যুগমানসের প্রতিফলন লক্ষ্য করেই ক্ষান্ত হননি। সেই প্রতিফলনের ধারার মধ্যে যুগে যুগে সামাজিক অন্যায় এবং অবিচারের বিরুদ্ধে জনসাধারণের সংগ্রামের অভিব্যক্তিগুলিকে সুস্পষ্টভাবে তুলে ধরেছেন। তাঁর বিশ্লেষণে লোকমানসের বিদ্রোহের সুরটি পরিষ্কারভাবে ফুটে উঠেছে।' কিন্তু লোকসংস্কৃতি সম্বন্ধে রবীন্দ্র-সাহিত্যে এই কথাই কি আসল কথা? বুর্জোয়া, মার্কসবাদ, বিদ্রোহ ইত্যাদি শব্দ কারণে-অকারণে দেখা দিয়েছে—সে শুধু এই প্রবন্ধটিতেই নয়, আরো কোনো কোনো লেখাতে। তাছাড়া, সম্পাদক ঠিকই বলেছেন, অনেক দিকেই বিস্তৃত আলোচনার যতোটুকু দরকার ছিল, ততোটা হয়নি। হিরণকুমার সান্যালের রবীন্দ্র-নাট্য প্রসঙ্গের কথাই ধরা যেতে পারে। মাত্র দশ পৃষ্ঠার মধ্যে বিষয়টির নির্ভরযোগ্য আলোচনা সীমিত রাখা সাধারণ কোনো লেখকের পক্ষে সম্ভব নয়, এখানে সেই সীমা মেনেছেন বলেই লেখক সুবিচার করতে পারেননি।

যেমন সরোজবাবুর লেখাটিতে, তেমনি চিন্মোহন সেহানবিশের প্রবন্ধে অনুসন্ধানের সেই স্বকীয়তা আছে যাতে পাঠকের লাভের সুযোগ বেশি। সেহানবিশ মশাই ১৮৭৮-এর "কবিকাহিনী" থেকে 'কি দারুণ অশান্তি এ মনুষ্যজগতে' ইত্যাদি মন্তব্য তুলে বৃহৎ মানব-সমাজে শোষণ আর অত্যাচার সম্পর্কে কিশোর কাল থেকেই রবীন্দ্রনাথের যে পীড়া-বোধ ছিল, সে-কথা মনে করিয়ে দিয়ে, রবীন্দ্র-জীবনের কালানুক্রমিক ঘটনাধারার মধ্য দিয়ে তাঁর আন্তর্জাতিক চিন্তার প্রসঙ্গে এগিয়েছেন। 'ওরাই পারবে, দানবকে ঠেকাতে পারবে'—রবীন্দ্রনাথের এই মন্তব্যের 'ওরা'-তে, আর 'বুদ্ধভক্তি', 'প্রায়শ্চিত্ত' প্রভৃতি কবিতায়,—এবং গল্পসল্পের 'ধ্বংস' ইত্যাদি শেষ পর্বের কয়েকটি রচনার ওপর জোর দিয়ে, শ্রেণীসংগ্রামে রবীন্দ্রনাথের আনুকূল্য সম্বন্ধে লেখক যে-সিদ্ধান্ত দিয়েছেন, তাতে রাজনীতির পক্ষ-প্রতিপক্ষের মধ্যে মনকষাকষি ঘটতে পারে, কিন্তু পাঠকের তাতে ক্ষতি নেই, বরং লাভই,—কারণ এরকম লেখায় ভাববার তাগিদ আছে।

শ্রীযুক্ত সুশোভন সরকার একালের বাংলায় বহুলব্যবহৃত 'রেনেসাঁস' কথাটির অপ-প্রয়োগ সম্বন্ধে ইঙ্গিতমাত্র করে বলেছেন যে, রবীন্দ্রনাথ একদিকে যেমন 'উনিশ শতকের উত্তাল তরঙ্গের শীর্ষমণি', অন্যদিকে তেমনি সে-যুগের সমস্ত পরস্পরবিরোধী ভাবধারায় তাঁর মন আলোড়িত হয়েছে। একদিকে 'পশ্চিমী দৃষ্টি', অন্যদিকে 'প্রাচ্যাভিমান'—westernism আর orientalism দুই-ই প্রতিধ্বনিত হয়েছিল তাঁর মনে। সুশোভন-বাবু সতর্ক করে দিয়েছেন এই বলে যে, উনিশ শতকের এই দুই অভিমুখিতা 'দুটি অমূর্ত বা অ্যাবস্ট্রাক্ট ধারণা, দুটি স্বতন্ত্র গোষ্ঠী নয়।' তীব্র পশ্চিমী ভাব অথবা দেশের হিন্দু-সমাজের অভ্যস্ত সংস্কারানুগত্য—প্রথম থেকেই রবীন্দ্রনাথ এ দুয়ের কোনোটিরই একান্ত বশীভূত ছিলেন না। তাঁর জীবনে প্রাচ্যাভিমানের প্রথম ঢেউয়ের চিহ্ন আছে তাঁর ১৮৮২-৮৫ সালের লেখাতে। ১৮৮৬-১৮৯৮ সালের লেখায় পশ্চিমী প্রভাবের উল্লেখযোগ্য তীব্রতা লক্ষ্য করেছেন সুশোভনবাবু—এবং সমুচিত দৃষ্টান্ত, উদ্ধৃতি, ঐতিহাসিক কালক্রম ইত্যাদি বজায় রেখে মাত্র তিরিশ পৃষ্ঠার এই প্রবন্ধটিতে তিনি আশ্চর্য দক্ষতার সঙ্গে রামমোহন থেকে আধুনিক কাল পর্যন্ত সুবিস্তীর্ণ, শতাধিক বছরের বঙ্গসংস্কৃতির নবজাগরণের কথা বলেছেন—যে নিত্য-আবিষ্কারের শীর্ষমণি ছিলেন রবীন্দ্রনাথ। আর, সম্পাদক হালদার মশাই ঠিকই বলেছেন—'রবীন্দ্রনাথের স্বাদেশিকতা রবীন্দ্রনাথের জীবনদর্শনের অঙ্গ।' তাঁর 'রবীন্দ্রনাথের স্বাদেশিকতা' প্রবন্ধে হিন্দুমেলার আমল থেকে শুরু করে তাঁর জীবনের শেষ

অধ্যায় পর্যন্ত প্রসারিত—স্বাদেশিকতা-চিন্তার বিচিত্র স্তরগুলির ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ আছে। তিনি সংগত প্রশ্নই প্রকাশ করেছেন—'যে স্বাদেশিকতা তাঁর আদর্শ—যাতে দেশপ্রেম ও বিশ্বপ্রেমের সমন্বয়,—তা কি প্রোলেটেরিয়ান পেট্রিয়টিজ্‌ম-এর স্বগোত্র?'

**হরপ্রসাদ মিত্র**

**রবীন্দ্রবিতান**—অরুণকুমার মুখোপাধ্যায়। এ মুখার্জি এণ্ড কোং। মূল্য পাঁচ টাকা।
**প্রকৃতির কবি রবীন্দ্রনাথ**—অমিয়কুমার সেন। বিশ্বভারতী। মূল্য পাঁচ টাকা।
**রবীন্দ্রনাথের উত্তরকাব্য**—শিশিরকুমার ঘোষ। মিত্রালয়। মূল্য আট টাকা।
**রবীন্দ্রপ্রতিভা**—কানাই সামন্ত। ইণ্ডিয়ান এসোসিয়েটেড পাবলিশিং কোং। মূল্য দশ টাকা।

সার্থক সাহিত্যের একটা লক্ষণ এই যে সেই সাহিত্য যুগে যুগে নতুন নতুন জিজ্ঞাসার সূত্রপাত করে। এই নতুন জিজ্ঞাসা থেকেই নতুন সমালোচনারীতিও দেখা দেয়। ভালো সমালোচনার পূর্বে তাই ভালো এবং মহৎ সাহিত্যসৃষ্টির প্রয়োজন। অ্যারিস্টটলের সমালোচনার সামনে এক মহৎ গ্রীক সাহিত্যের আদর্শ ছিল যদিও সেই সাহিত্য পরিধিতে তেমন বিপুল ছিল না। ইংলণ্ডে শেকসপীয়রকে এবং পরে রোমানটিক সাহিত্যকে অবলম্বন করে সাহিত্যসমালোচনার এক সমৃদ্ধ ঐতিহ্যের সৃষ্টি হয়েছে। নতুন কবি যখন নতুন সৃষ্টি করেন তখন স্বভাবতই পূর্বাভ্যস্ত রুচি স্বাদগ্রহণে বাধা পায় কিন্তু সেই প্রতিরোধকে নিষ্ফল প্রমাণিত করেই সাহিত্যের মহত্ত্ব উজ্জ্বলতর হয়ে ওঠে।

আমাদের সাহিত্যে মধুসূদন ও রবীন্দ্রনাথ—দুজনের সাহিত্যেই এই প্রাণশক্তির লক্ষণ আছে। তাই বোধহয় এই দুজনই তাঁদের রচনাকালের আরম্ভ থেকেই আজ পর্যন্ত নানা বিচিত্র সমালোচনার বিষয়ীভূত হয়েছেন। আমরা নিঃসংশয় হতে পারি অনাগত কালেও তার বিরাম ঘটবে না। বিশেষ করে রবীন্দ্রনাথ সম্বন্ধে সম্ভাবনার সীমা নেই। কারণ বৈচিত্র্যে রবীন্দ্রনাথের তুলনা নেই। শুধু তাই নয়, রবীন্দ্রনাথের দীর্ঘকালব্যাপী সাহিত্য-সাধনা ভাষাভঙ্গিগত এবং কখনও কখনও মতবাদগত পরিবর্তনের মধ্যে দিয়ে এসেছে বলেই নানা বিভিন্ন রুচির সম্মুখীন হয়েছে। ইতিমধ্যে নানা চিন্তা নানা প্রভাব নানা পরিবর্তিত মূল্যবোধ জীবন ও সাহিত্য সম্বন্ধে আমাদের প্রশ্নাতুর করেছে। রবীন্দ্রসাহিত্যসমালোচনা সেই কারণেই বিভিন্ন আদর্শ ও পরীক্ষার মধ্যে দিয়ে গিয়েছে। আমাদের সাহিত্যের ক্ষুদ্র পরিসরে রবীন্দ্রসাহিত্যসমালোচনা থেকেই বেশ বুঝতে পারা যায় যে সমালোচনাবস্তুটিরও কোনো অপরিবর্তনীয় সূত্র নেই। অন্তত প্রথম মহাযুদ্ধের পূর্ব পর্যন্ত রবীন্দ্রসাহিত্যকে যে সূত্র দিয়ে বিচার করা হত, সেই সূত্রের প্রয়োগ পরে চলে নি। সেইজন্যে সমালোচনা পড়ে রবীন্দ্রনাথকে বোঝা যতই সহজ হোক, এই বিচারপদ্ধতি বাঙালির মানসিক বিবর্তনের ইতিহাসকেও ব্যক্ত করে। কোন যুগের পাঠক রবীন্দ্রসাহিত্যে কোন্ বস্তু প্রত্যাশা করে, তাই দিয়ে আমাদের সাংস্কৃতিক জীবনের ধারাবাহিক বৈশিষ্ট্যও উপলব্ধি করা যায়। বাংলা সাহিত্যে রবীন্দ্রনাথের অভ্যুদয় ঊনবিংশ শতাব্দীর অষ্টম দশক থেকে। কেউ তাঁকে স্বীকার করেছেন, কেউ করেননি; কেউ তাঁকে বঙ্কিমযুগের মূল্য দিয়ে যাচাই করতে গিয়েছেন; কেউ খাপ খাওয়াতে পারেননি। তখন থেকেই রবীন্দ্রসাহিত্যসমালোচনার ধারা আমাদের

চিন্তাধারারই বৈশিষ্ট্যবাচক হয়ে আছে।

শ্রীযুক্ত অরুণকুমার মুখোপাধ্যায়-সম্পাদিত "রবীন্দ্রবিতান" বইখানি এই দিক দিয়ে একটি উল্লেখযোগ্য বই। এই বইতে "কবিকাহিনী"র সমালোচনা ('বান্ধব' ১২৮৫) থেকে রবীন্দ্রনাথকে সমর্থন উপলক্ষে প্রমথ চৌধুরীর দ্বিজেন্দ্রলাল রায়কে সমালোচনা পর্যন্ত ছাব্বিশটি প্রবন্ধ সংকলিত হয়েছে। এই ছাব্বিশটি প্রবন্ধে রবীন্দ্রনাথকে সমর্থন ও বিরোধিতা দু' রকমই আছে। এই দুটি মনোভাবই আজ আমাদের কাছে যথেষ্ট কৌতূহলের বিষয়। এককালে বাঙালি পাঠক যে রবীন্দ্রনাথকে বুঝতে পারেনি বা বুঝতে চায়নি সে জন্যে আজ আমরা তাদের দোষ দেব না। তারা একরকম ভাবনায় ও রুচিতে অভ্যস্ত ছিল, সেদিক থেকে তাদের রবীন্দ্রনাথকে বিনা দ্বিধায় গ্রহণ করে নেবার বাধা ছিল। তারা ছিল বঙ্কিমী যুগের মানুষ যখন শুদ্ধশিল্পবাদ বলতে গেলে আবিষ্কৃতই হয়নি। সাহিত্যকে নীতিমুক্তরূপে দেখা তখন সম্ভব ছিল না। এ নীতি অর্থ শুধু চরিত্রনীতি নয়, এ নীতি বলতে সমাজনীতিকেও বোঝাত। হেমচন্দ্র-নবীনচন্দ্র যুগের কাব্য সার্থক কাব্যই হত না যদি না তার মধ্যে স্পষ্ট কিছু বক্তব্য থাকত। প্রমথ চৌধুরীও তাঁর আত্মকথায় বলেছেন, তাঁর বাল্যকালে রবীন্দ্রনাথকে নাকি 'কি-জানি-কি'র কবি বলা হত। শুধু হৃদয়ের একটা অস্পষ্ট বেদনাবিহ্বলতা মাত্র, যা যুক্তি দিয়ে বোঝানো যায় না, শব্দের অর্থ দিয়ে যাকে সব সময় নির্দিষ্ট করে বলা যায় না, তারই কবি ছিলেন রবীন্দ্রনাথ। বেশ বোঝা যায় এরকম অনুভবের মর্মে আছে প্রখর আত্মচেতনা। এই আত্মভাব যখন আর সব চিন্তাভাবনাকে আচ্ছন্ন করল, তখন কবি কাব্যে ভাষা না দিয়ে পারলেন না। রবীন্দ্রনাথ প্রথম যৌবনে "বিবিধপ্রসঙ্গ" নাম দিয়ে আত্মভাবমূলক রচনা লিখেছিলেন, তাও স্মরণীয়।

এই কল্পনাপদ্ধতি সেকালে খুবই অভিনব ছিল। কালীপ্রসন্ন ঘোষ বা ভূদেব মুখোপাধ্যায়ের মতো দু'-একজন রবীন্দ্রনাথের কবিতার প্রশংসা করলেও মানতেই হবে তাঁরা এই কবিত্বরীতির মর্মমূলে প্রবেশ করেন নি। তাঁদের প্রশংসা নেহাতই সাধুবাদ মাত্র। আজ আমরা হয়তো কিঞ্চিৎ বিস্ময়বোধ করি এই কথা ভেবে যে রবীন্দ্রনাথের কৈশোর রচনাও সেই পরিবেশে এমন অকুণ্ঠ প্রশংসা লাভ করেছিল। কিন্তু সত্যই তাতে এমন বিস্ময়ের কিছু নেই। সেকালের দিনে যা ছিল কাব্যের রীতি তাকে তাঁরা বর্জন করে রবীন্দ্রনাথকে মেনে নিয়েছিলেন একথা বলা চলে না। প্রচলিত কাব্যরীতি ছিল হেমচন্দ্রীয়। হেমচন্দ্রীয় ও রবীন্দ্রীয় রীতির মধ্যে ব্যবধান যে কতো গভীর তার প্রত্যক্ষ প্রমাণ অন্যত্র আছে। হেমচন্দ্র রবীন্দ্রনাথের কবিতা বুঝতেই পারতেন না। হেমচন্দ্রের এই স্বীকারোক্তি মন্মথনাথ ঘোষ সংকলিত করেছেন হেমচন্দ্রের জীবনীতে। শুধু তাই নয়, কামিনী রায়ের "আলো ও ছায়া" নামক কাব্যগ্রন্থের ভূমিকা লিখেছিলেন হেমচন্দ্র। তাতে তিনি কামিনী রায়ের কবিতায় 'আজকালকার ছাঁচ' দেখতে পেয়েছিলেন। হেমচন্দ্রের এই মন্তব্য কামিনী রায় সম্পর্কে আংশিক সত্য হলেও পরমমূল্যবান্। বাংলা কাব্যের যে ঋতুবদল ঘটতে আরম্ভ করেছে—হেমচন্দ্রের মন্তব্য তারই অভ্রান্ত নিদর্শন। হেমচন্দ্রীয় ও রবীন্দ্রীয় রীতির অত্যন্ত সুষ্ঠু তুলনা করেছেন যদুনাথ সরকার আলোচ্য গ্রন্থের একটি প্রবন্ধে।

পাঠকসমাজে রুচিভেদ দীর্ঘকাল চলে এলেও ঊনবিংশ শতাব্দীর শেষ দশক থেকেই রবীন্দ্রকাব্যের প্রতি সাধুবাদ সত্যকার যুক্তি ও প্রত্যয়ের উপর প্রতিষ্ঠিত হচ্ছিল। আজ প্রিয়নাথ সেনের সমালোচনা উচ্ছ্বাসপূর্ণ বলে মনে হয় সত্য, তবু তাঁর লেখাতেই রবীন্দ্রকাব্য-সমালোচনার দুটি মৌলিক রীতি প্রবর্তিত হয়েছিল। রবীন্দ্রকবিমানসের একটা তত্ত্ব

(poetic theory) তিনি নির্দেশ করবার চেষ্টা করেছিলেন। এই তত্ত্ব নির্দিষ্ট হওয়াতে রবীন্দ্রকাব্যের একটা ভিত্তি পাওয়া গিয়েছিল। "মানসী" কাব্যের আলোচনা করতে গিয়ে প্রিয়নাথ সেন রবীন্দ্রনাথের সৌন্দর্যবাদের উল্লেখ করেছিলেন। বলা বাহুল্য এ রকম কোনো সৌন্দর্যচেতনা রবীন্দ্রনাথের পূর্বে এক বিহারীলাল ছাড়া আর কোথাও নেই। সমাজ নয়, নীতি নয়, কল্যাণবোধ নয়—একটা অপূর্ব সৌন্দর্যবোধ যে রবীন্দ্রকবিমানসকে আলোকিত করেছে, প্রিয়নাথ সেনের এই উক্তি রবীন্দ্রসমালোচনার দিগ্‌দর্শন করিয়েছিল। এই সৌন্দর্যবাদের তুলনা আমাদের দেশে নেই পরন্তু এই সৌন্দর্যবাদ দিয়েই ইংরেজিতে উৎকৃষ্ট কাব্যসাহিত্য রচিত হয়েছে। তাছাড়া প্রিয়নাথ সেন ইংরেজি কাব্যের সঙ্গে রবীন্দ্র-কাব্যের তুলনা করেছিলেন। এই তুলনা রবীন্দ্রনাথের কাব্যের আদর্শকেই যে প্রতিষ্ঠিত করল তা' নয়, বাঙালি পাঠকের প্রত্যয় ফিরিয়ে আনল এবং নতুন যুগের রুচি তৈরি হয়ে উঠতে সাহায্য করল। "রবীন্দ্রবিতানে"র অষ্টম প্রবন্ধ মোহিতচন্দ্র সেনের রবীন্দ্রকাব্যগ্রন্থাবলীর ভূমিকা। মোহিতচন্দ্র রবীন্দ্রনাথের কাব্যগ্রন্থ সম্পাদন করতে গিয়ে একটি উৎকৃষ্ট ভূমিকা লিখেছিলেন। তাতে রবীন্দ্রকাব্যসমালোচনা অধিকতর পরিণত। রবীন্দ্রনাথের কবিতার চিত্ররীতি এবং সঙ্গীতরীতির আভাস তিনিই দিলেন। কবিতার শ্রেণীভাগ করে রবীন্দ্র-কাব্যের বৈচিত্র্যও তিনি দেখিয়ে দিলেন। এই শ্রেণীভাগের দ্বারা এটাও বোঝা গেল যে উৎকৃষ্ট কাব্যের রীতিপদ্ধতি কত আলাদা। তিনি বলেছিলেন, 'তাঁহার অনেকগুলি কবিতা দেবনিশ্বসিতের ন্যায় অহৈতুকী বৃন্তহীন পুষ্পসম আপনাতে আপনি বিকশিত হইয়া উঠিয়াছে। বুদ্ধি দ্বারা তাহাদের অর্থ ছাঁকিয়া বাহির করা একপ্রকার দুঃসাধ্য।' এই উক্তির দুটি ফল হয়েছিল। পরবর্তীকালে দ্বিজেন্দ্রলাল-প্রমুখ কয়েকজন কাব্যের অস্পষ্টতা নিয়ে রবীন্দ্রনাথকে আক্রমণ করেন। আবার তার উত্তরে অজিত চক্রবর্তী রবীন্দ্রসমালোচনার আর-এক নতুন রীতির ইঙ্গিত দিলেন।

দ্বিজেন্দ্রলাল রবীন্দ্রনাথকে প্রধানত দুটি কারণে সমালোচনা করেছিলেন, কাব্যে দুর্নীতি ও কাব্যে অস্পষ্টতা। দুটি অভিযোগই বাংলা সাহিত্যের ঊনবিংশ শতাব্দীর রুচির সঙ্গে যুক্ত। 'দুর্নীতি' বলে কোনো কিছু যদি রবীন্দ্রকাব্যে থেকেও থাকে, তবে সেটার উৎস নিশ্চয়ই বাস্তবভাবনামুক্ত সৌন্দর্যবাদে। ফরাসি সাহিত্যে এবং প্রিরাফায়েলাইট ইংরেজি সাহিত্যেও বিশুদ্ধ সৌন্দর্যচর্চার ফলে অনৈতিক রুচি প্রশ্রয় পেয়েছিল। আমাদের ঊনবিংশ শতাব্দীর সাহিত্যেও বস্তুগত চিন্তা ও নীতির প্রাধান্য স্বীকৃত হয়েছিল বলে এবং বিশুদ্ধ সৌন্দর্যবাদ তখনও আদৃত হয়নি বলে রবীন্দ্রনাথের নতুন কাব্য অনেক দ্বিধার সৃষ্টি করেছিল। দ্বিজেন্দ্রলাল এই মনোভাবেরই প্রতিনিধিত্ব করেছিলেন। অস্পষ্টতার অভিযোগও এর সঙ্গে সম্পর্কিত। যেটা অনুভূতির বিষয় মাত্র, ঠিক বুদ্ধিগ্রাহ্য বা চিন্তাগত নয়, সেটাতে কিছু অস্পষ্টতা আসবেই। নানা ভাবে ভঙ্গিতে ব্যঞ্জনায় ইশারায় সেই অনুভূতিকে ফোটাতে হয়। রবীন্দ্রনাথ নিজেও নানা উপলক্ষে বিশেষত "সাহিত্যে"র প্রবন্ধগুলিতে এটাই বোঝাবার চেষ্টা করেছিলেন। পূর্ববর্তী যুগের স্পষ্ট বুদ্ধিগ্রাহ্য বক্তব্যসর্বস্ব কাব্যরীতির তুলনায় এর পার্থক্যও সহজেই দেখা যায়। কেউ কেউ অনুমান করেন দ্বিজেন্দ্রলালের অস্পষ্টতার অভিযোগ নাকি তাঁর নিজের কাব্যের অতিস্পষ্টতার পরোক্ষ সমর্থন ছাড়া কিছু নয়। একথা সত্য বলে মেনে নেওয়া কঠিন। কারণ দ্বিজেন্দ্র-লালের কাব্য একটা বিচ্ছিন্ন কিছু নয়, ঊনবিংশ শতাব্দীর স্পষ্ট কাব্যরীতিরই একটা পরিণতি মাত্র।

কিন্তু দ্বিজেন্দ্রলালের অভিযোগ সৃষ্টি করে তুলল আর এক শিল্পনিরীক্ষা। অজিত চক্রবর্তী দেখালেন যা উৎকৃষ্ট এবং অকৃত্রিম অনুভূতি মাত্র তাকে নির্দিষ্ট করে বলা যায় না। উৎকৃষ্ট কাব্য অনুভব করায় মাত্র—ব্যাখ্যা করে না। অজিত চক্রবর্তীই কাব্যের মধ্যে কবি-মানস সন্ধানের প্রবৃত্তি জাগালেন। কবির কবিমানসের অকৃত্রিম আত্মপ্রকাশে আস্থা রেখে নতুন করে এক সমালোচনাবিধি গড়ে দিলেন। এ কবিমানস নিঃসঙ্গ। এই কবিমনটি রসসংগ্রহ করেছে প্রকৃতি এবং জীবন থেকে এবং গড়ে তুলেছে এক আত্মসৃষ্ট অতুল ভাবস্বর্গলোক, তেমনি প্রয়োজনপীড়িত কোলাহলমুখর জীবন ও সমাজের প্রতি কঠিন দায়িত্বের কোনো বন্ধনকেও স্বীকার করেনি। এই ব্যাখ্যার পথ নির্মাণ করেছিলেন রবীন্দ্রনাথ নিজেই তাঁর 'আত্মপরিচয়ে' জীবনদেবতার প্রসঙ্গ উত্থাপন করে। অজিত চক্রবর্তীর এই ব্যাখ্যারীতি যথেষ্ট ফলপ্রসূ হয়েছে এবং আজ পর্যন্ত রবীন্দ্রকাব্যব্যাখ্যায় এই রীতিই অনেকখানি প্রভাব বিস্তার করে রয়েছে। "রবীন্দ্রবিতান"-এর প্রবন্ধ এই যুগ পর্যন্তই সংকলিত হয়েছে। কেননা যথার্থই পরবর্তী কালে আসলে অজিত চক্রবর্তী-প্রবর্তিত রীতিরই কর্ষণ চলেছে মাত্র।

কবিমানসবিচারই যখন সাহিত্যে সমালোচনার নিকষ হয়ে উঠল, তখন তার থেকে বিপিনচন্দ্র পাল যে নতুন প্রশ্ন উত্থাপন করেছিলেন, সেই প্রশ্ন কম জোরালো ছিল না। পরবর্তী রবীন্দ্রপ্রশস্তির যুগকে উত্তীর্ণ হয়েও সেই প্রশ্নটি এখনও প্রবল। বিপিনচন্দ্র পালের তীক্ষ্ম মনীষাকে অবহেলা করা কঠিন যদিও রবীন্দ্রজীবনীকার বিদ্রূপ করে বলেছেন,

'বিপিনচন্দ্র এই প্রবন্ধে ইহাই প্রমাণ করিতে চাহিয়াছিলেন যে রবীন্দ্রনাথের কাব্য, ধর্মবোধ, স্বদেশসেবা প্রভৃতি সমস্তই বস্তুতন্ত্রহীন অর্থাৎ বাংলা ভাষায় বলিতে হয় আজগুবি ও ফাঁকিবাজি। বিপিনচন্দ্র কিভাবে বাক্‌চাতুর্য দ্বারা মহৎ বিষয় ও বস্তুকে হীন প্রতিপন্ন করিবার চেষ্টা করিয়াছেন এই রচনা তাহার সর্বশ্রেষ্ঠ নিদর্শন।

বিপিনচন্দ্র সাহিত্যের দিক দিয়া রবীন্দ্রনাথকে দেখেন নাই, তিনি তাঁহার জীবনকে ও সাহিত্যকে মিলাইয়া পড়িতে গিয়াছিলেন।'

—রবীন্দ্রজীবনী, ২য় খণ্ড (১৩৫৫) পৃ. ৩২৮

বিপিনচন্দ্র পালের এই প্রবন্ধটি "চরিতচিত্রে"র অন্তর্ভুক্ত এবং "রবীন্দ্রবিতানে"ও সংকলিত। এই প্রবন্ধটির উত্তর দিয়েছিলেন অজিত চক্রবর্তী। সুতরাং সেই সব যুক্তি-তর্কের মধ্যে যাওয়ার আমাদের প্রয়োজন নেই। আমরা শুধু এইটুকুই বলছি যে বাস্তবতার অভাবের কথা এ যুগেও উত্থাপিত হয়েছে যদিও নতুন ভঙ্গিতে নতুন ভাবে।

অজিত চক্রবর্তী প্রবর্তিত সমালোচনারীতির একটি উৎকৃষ্ট ফল অমিয়কুমার সেনের "প্রকৃতির কবি রবীন্দ্রনাথ"। এই বইটি প্রথম বেরিয়েছিল ১৩৫৪ সালে; সম্প্রতি তার দ্বিতীয় সংস্করণ প্রকাশিত হয়েছে। অজিতকুমার যেমন কবিমানস অবলম্বন করে কাব্য বিচার করেছেন তেমনি আনুষঙ্গিক কারণে সে-বিচার হয়েছে একটু তত্ত্বঘেঁষা। অবশ্য এককালে সাংখ্য ও বেদান্তের সূত্র ধরে কাব্যের তত্ত্বনির্ণয়ের যে চেষ্টা হয়েছিল, অজিতকুমার সে রকম কিছু করেননি। তিনি রবীন্দ্রমানসেরই একটা তত্ত্ব স্থির করে নিয়েছেন। সীমা-অসীমের তত্ত্ব নামে সেটা পরবর্তী কালে বহুপ্রযুক্ত হয়েছে। কিন্তু কোনোরকম তাত্ত্বিক জটিলতার মধ্যে প্রবেশ না করে কাব্যরসাস্বাদনের আনন্দে কবিতা আলোচনা করেছেন শ্রীযুক্ত অমিয়কুমার সেন। তিনি মনে করেন রবীন্দ্রকবিমানসের সবচেয়ে বড়ো লক্ষণ প্রকৃতিপ্রীতি।

এই প্রকৃতিপ্রীতির লক্ষণ দিয়ে রবীন্দ্রনাথের মনটিকে যেমন চিনে নিতে পারি তেমনি কাব্যের পরিপূর্ণ মাধুর্যের আস্বাদও পেতে পারি। কথাটা এক হিসাবে ঠিক, কারণ প্রকৃতি রবীন্দ্রনাথের কাছে কেবল তরুতৃণ নদীগিরি আকাশমৃত্তিকা নয়। মানুষের নৈসর্গিক জীবনটাও এর অন্তর্ভুক্ত। প্রকৃতির শান্ত স্বাভাবিক বিকাশের মতোই মানুষের জীবনকে যতক্ষণ বিকাশ পেতে দেখি, ততক্ষণ সে প্রকৃতিরই অঙ্গ এবং সুন্দর। রবীন্দ্রনাথের সৌন্দর্যবোধ অবাস্তব নয়, প্রকৃতি থেকেই সেই চেতনা আহৃত। সৌন্দর্যের একটা কল্পিত রূপ দিয়ে জীবনকে তিনি দেখেননি। ১২৯৮-৯৯ সালে লোকেন্দ্রনাথ পালিতকে লেখা একটি চিঠিতে রবীন্দ্রনাথ বলেন,

'গোটিয়ের সহিত ওয়ার্ডসওয়ার্থের তুলনা করা যেতে পারে। ওয়ার্ডসওয়ার্থের কবিতার মধ্যে যে সৌন্দর্যসত্য প্রকাশিত হয়েছে, তা পূর্বোক্ত ফরাসি সৌন্দর্যসত্য অপেক্ষা বিস্তৃত। তাঁর কাছে পুষ্পপল্লব নদীনির্ঝর পর্বতপ্রান্তর সর্বত্রই নব নব সৌন্দর্য উদ্ভাসিত হয়ে উঠছে। কেবল তাই নয়, তার মধ্যে তিনি একটা আধ্যাত্মিক বিকাশ দেখতে পাচ্ছেন—তাতে করে সৌন্দর্য অনন্ত বিস্তার এবং অনন্ত গভীরতা লাভ করেছে।'

সুতরাং রবীন্দ্রকাব্যে সৌন্দর্য জগৎ ও প্রকৃতিরই একটা দীপ্তি ছাড়া কিছু নয়। বলাই বাহুল্য প্রকৃতি কথাটি গ্রন্থকার ব্যাপক অর্থে নিয়েছেন। রবীন্দ্রনাথের কাব্যের প্রথম থেকে শেষ পর্যন্ত সবই তাঁর আলোচনার গণ্ডীর মধ্যে এসেছে। রবীন্দ্রকাব্যের বিভিন্ন যুগে প্রায় সব রকম বিষয় এবং সমস্যাই তিনি বিচার করেছেন। যেখানে মানুষের প্রবৃত্তি-বেগ এবং দ্বন্দ্বসংঘাত প্রবল, সেখানে অবশ্য সে প্রকৃতির সান্নিধ্য থেকে সরে এসেছে—প্রকৃতির শান্তি ও সংযম তাতে পীড়িত হয়েছে, সৌন্দর্যও খণ্ডিত হয়েছে। প্রকৃতির এই ব্যাপক চেতনাকে লেখক স্নিগ্ধ অনাড়ম্বর মাধুর্যপূর্ণ অথচ স্পষ্ট ভাষায় রবীন্দ্রনাথের কাব্যের থেকে প্রচুর উদ্ধৃতি সহযোগে বুঝিয়েছেন। ভাষা অনাড়ম্বর বলে হঠাৎ মনে হয় আলোচনায় বুঝি তেমন গভীরতা নেই। কিন্তু বিস্মিত আনন্দের সঙ্গে দেখি রবীন্দ্রকাব্যের ভাব এবং প্রকাশরীতির কোনো জটিল বৈশিষ্ট্যকেই তিনি এড়িয়ে যান নি। প্রকৃতি-চেতনায় ঊনবিংশ শতাব্দীর কবিদের থেকে রবীন্দ্রনাথের প্রভেদ, বৈষ্ণব কবি ও কালিদাসের সঙ্গে তাঁর সাদৃশ্য ও বৈসাদৃশ্য, সন্ধ্যাসঙ্গীতে বিষাদবোধ ও ভাষার নবীনরীতি, চিত্ররীতি ও সঙ্গীতরীতি, চেতনার ইন্দ্রিয়ান্তরণ, মৃত্যুচেতনা, নারীসৌন্দর্য বর্ণনায় প্রকৃতির সহযোগিতা, সোনার তরী-চিত্রার যুগে সৌন্দর্যবোধের বিশিষ্ট প্রকৃতি, গীতাঞ্জলিতে বর্ষা, গীতিমাল্যে বসন্ত, গীতালিতে শরৎ ঋতুর প্রাধান্য, বলাকায় প্রকৃতির স্বল্প উপস্থিতি, উত্তরজীবনে প্রকৃতির ভিন্ন পরিবেশ 'আমি-বোধ' 'মানবসচেতনতা', মনের নানা অধ্যাত্মসংকট—সবই চমৎকার নিরলংকার ঋজুতায় বর্ণিত হয়েছে।

রবীন্দ্রনাথের কবিতা সম্পর্কে লেখকের গভীর শ্রদ্ধা প্রশস্তিবাচক বিশেষণ মাত্রে পর্যবসিত হয় নি তেমনি আবার ভাষাও মনোরম ভারসাম্য হারায় নি। কোনো মুদ্রাদোষ কোনো অতিশয়োক্তি কোনো আবেগবন্যা কোথাও যে দেখা যায় নি এটা লেখকের সঙ্গতি-বোধেরই ফল। বরং কোনো কোনো সময় মনে হয়েছে সংযম রক্ষা করে আলোচনার ফলে বক্তব্যবিস্তারে বরং কার্পণ্যই এসেছে। রবীন্দ্রকাব্যের একাধিক ব্যাসকূট তিনি অবলীলা-ক্রমে উত্তীর্ণ হয়ে গিয়েছেন। পড়তে পড়তে মনে হয় সত্যকার রসিকের মতোই তিনি 'অন্তরঙ্গসহ রসাস্বাদন' করছেন,—পণ্ডিতের মতো বিশ্লেষণে ব্যাপৃত হন নি। অজিত চক্রবর্তীর সঙ্গে এই দিক দিয়ে তাঁর মিল আছে। আজকের মননাভিমানী পাঠকের কাছে

এই বিশুদ্ধ রসালাপ পরম তৃপ্তিদায়কও বটে, কেননা মননের আড়ম্বর না থাকলেও মননের বিষয়গুলিকে লেখক কখনোই বাদ দেন নি।

কিন্তু এখনকার সমালোচনার সাধারণ প্রবণতা হচ্ছে বিশ্লেষণের দিকে। বিংশ শতাব্দীর গোড়ার দিকে যাঁরা বিশ্লেষণের আড়ম্বর করে শেষ পর্যন্ত এই সিদ্ধান্তে পোঁছেছিলেন যে রবীন্দ্রকাব্যে সত্য নেই সত্যাভাস মাত্র আছে, তাঁদের বিশ্লেষণের মানদণ্ড ছিল সমাজনীতি। তাদের বিশ্লেষণে সত্য নেই এ কথা বলব না, কেননা তাঁরা যে ভূমি থেকে এই কথা বলেছিলেন, সে-ভূমিতে এই কথার যৌক্তিকতা আছে কিন্তু আজ আমরা বুঝি রবীন্দ্রনাথের কাব্য সে ভূমির সৃষ্টিই নয়। অজিত চক্রবর্তী এই নূতন ভূমিটির সন্ধান দিয়েছিলেন। এই নতুন পদ্ধতিতে আবার নতুন বিশ্লেষণ-প্রয়াস দেখা দিয়েছে। অর্থাৎ রবীন্দ্রমানসের কতকগুলি স্বতঃসিদ্ধ অভিনবত্বকে মেনে নিয়ে নিখিল কাব্যসৃষ্টির মানদণ্ড দিয়ে এ কাব্য বিশ্লেষণ করা হচ্ছে। এই পদ্ধতির প্রয়োগ প্রথম করেন শশাঙ্কমোহন সেন ও পরে মোহিতলাল মজুমদার। মোহিতলালের মধ্যে পূর্বযুগের প্রভাব কিছুটা থেকে গিয়েছে আবার রবীন্দ্র-প্রতিভার মহত্ত্ব-স্বীকারে এবং রসাস্বাদনেও তিনি অসাধারণ। তাঁর 'সাহিত্যে অশ্লীলতা' প্রবন্ধটি পড়লে দেখা যায় চিত্রাঙ্গদা সম্পর্কে দ্বিজেন্দ্রলালের সেই অভিযোগ তিনি মানেন যদিও দ্বিজেন্দ্রলালের পদ্ধতিতে একেবারেই নয়। সমাজসত্যের দিক দিয়ে তিনি চিত্রাঙ্গদা কাব্যের বিচার করেননি করেছেন সামগ্রিক জীবনসত্যের দিক দিয়ে। মোহিতলালের এই পদ্ধতির আভাস "জয়ন্তীউৎসর্গ" গ্রন্থের 'রবীন্দ্রনাথ ও আধুনিক বাংলা সাহিত্য' প্রবন্ধেই দেখা গিয়েছিল। পরে বাংলা রবীন্দ্র-সমালোচনার একটি শক্তিশালী ধারা এই পথেই গড়ে উঠেছে। এর মধ্যেও অবশ্য নানা রীতিভেদ আছে। সম্প্রতি-প্রকাশিত শ্রীযুক্ত শিশিরকুমার ঘোষের "রবীন্দ্রনাথের উত্তরকাব্য" বইখানি এই পদ্ধতির একটি দৃষ্টান্ত বলে গ্রহণ করতে পারি। কি মনোভাব নিয়ে লেখক সমালোচনায় প্রবৃত্ত হয়েছেন, তা তাঁর মন্তব্যেই বোঝা যায়—

'আমরা যেন রবীন্দ্রকাব্যবিচারে পাতঞ্জল যোগসূত্র, মার্কসীয় দ্বান্দ্বিক জড়বাদ বা ফ্রয়েডীয় মনোবিকলনের আবর্তে না পড়ি।

বৈপরীত্যের বীজ প্রকৃতিতে নিহিত, বস্তুজগতের অবচেতন পৃথকীকরণে, প্রাণলোকের উদ্‌ভ্রান্ত সংঘর্ষে, চিত্তবৃত্তি ও ব্যবহারিক জীবনের বিভিন্ন প্ররোচনায়। আধ্যাত্মিক ব্যাখ্যায় কাল ও ইতিহাস উপেক্ষিত, ঐতিহাসিক বা দ্বান্দ্বিক জড়বাদের বিচারে শাশ্বত সত্য অস্বীকৃত, ঈশ্বর নিখোঁজ। চেতনা বা ইতিহাসের কোন্ স্তরে এ বিরোধের অবসান ও কোন্ পূর্ণ সত্যের অক্ষুব্ধ দৃষ্টিতে কাব্য ও জীবনের জন্মলাভ?' (পৃ ২০)

এই বিরোধের মীমাংসার সন্ধান করতে গিয়ে নতুন বিশ্লেষণাত্মক সমালোচনার উদ্‌ভব হয়েছে। অধ্যাত্মবাদী বা জড়বাদী উভয়েই তাদের নিজের নিজের দৃষ্টিভঙ্গি দিয়ে রবীন্দ্র-মানসের ব্যাখ্যা করতে গিয়েছেন। নিজেদের মূল্যবোধে অত্যাসক্তির ফলে বিপরীত প্রমাণ-গুলিকে তাঁরা হয় অস্বীকার করেছেন নয় তুচ্ছ করেছেন। কিন্তু যাঁরা আসক্ত নন তাঁরা কি করবেন? তাঁরা বিচার করবেন—

'রবীন্দ্রকাব্যালোচনায় এ ধরনের প্রসঙ্গের অবতারণাকে 'তত্ত্বকথার কচকচি' বলে উড়িয়ে দিলে চলবে না, কেননা ব্যষ্টি ও সমষ্টির অভিব্যক্তি তার নানাবিধ সম্ভাবনা, শাশ্বত ঐতিহ্যের অস্তিত্ব রবীন্দ্ররচনা স্বীকার করে এবং ঐতিহ্যের অভিব্যক্তির বেদনা ও মহৈশ্বর্য রবীন্দ্রকাব্যের প্রাণস্বরূপ। রবীন্দ্রকাব্য জীবনের প্রায় সব দিক স্পর্শ করেছে।' (পৃ ২০-২১)

তাই শেষ পর্যন্ত রবীন্দ্রনাথের উত্তরজীবনে "প্রান্তিক" ও "প্রান্তিক"-পরবর্তী বিভিন্ন কাব্য আলোচনা করে তিনি কোনো নির্দ্বন্দ্ব সমাধানে উপনীত হতে পারেন নি। তিনি দেখিয়েছেন রবীন্দ্রনাথ জীবনের বিচিত্র দিকগুলি কাব্যে গ্রহণ করে নিয়েছেন কিন্তু সবগুলিকে মেলাতে পারেন নি, বোধহয় মেলানো যায় না বলেই। "প্রান্তিক" কাব্যের অপূর্ব আলোচনায় তিনি দেখিয়েছেন,

'রবীন্দ্রনাথের এ সময়কার লেখায় সমন্বয় বা দ্বন্দ্ব-খণ্ডনের চেয়ে দ্বন্দ্বের প্রাখর্যই প্রকাশ পেয়েছে বেশি। তাতে তার কাব্যরস কমেনি বরং বেড়েছে। অন্তরাকাশের ছায়াপথ পার হয়ে নবচৈতন্যের আলোকতীর্থে মানবযাত্রার গতি, কিন্তু আকাশপথ আলো-আঁধারে মেশা, মৃত্যু ও মায়ার নিপুণ শিল্প বিকীর্ণ সেই অন্তরীক্ষলোকে। আশ্চর্য তটস্থ সেই জগতে রবীন্দ্রনাথ প্রবেশ করেছেন, অথচ তার সম্পূর্ণ মানচিত্র তাঁর করায়ত্ত হয়নি। আত্মিক ও বৌদ্ধিক উভয়সঙ্কটে দোলায়িত রবীন্দ্রনাথ এই দ্বন্দ্বের পথ অতিক্রম করেই আমাদের নিকটাত্মীয়। দুঃখের রাত্রেই তিনি আমাদের অন্তরতম, যদি তাঁকে চিনে নিতে পারি।' (পৃ ৮২-৮৩)

এই দ্বন্দ্বের তীক্ষ্ণতম কাব্যরূপ ফুটেছে "প্রান্তিকে"। মৃত্যুর দ্বারপ্রান্তে দাঁড়িয়ে তিনি মহাশূন্যে জ্যোতির সন্ধানে দৃষ্টি মেলে দিয়েছেন, কিন্তু—

> বাজিল না রুদ্রবীণা নিঃশব্দ ভৈরব নবরাগে
> জাগিল না মর্মতলে ভীষণের প্রসন্ন মূরতি
> তাই ফিরাইয়া দিলে।

রবীন্দ্রনাথের শেষ কবিতায় পর্যন্ত এই অজ্ঞেয়তার ছায়া প্রসারিত।

সম্ভবত এই কারণেই শ্রীযুক্ত ঘোষ রবীন্দ্রনাথের উত্তরকাব্যের বিচার আরম্ভ করেছেন "প্রান্তিক" থেকেই যদিও "পুনশ্চ"র গদ্যকবিতা নিয়ে নাতিদীর্ঘ আলোচনা করে নিয়েছেন ভূমিকায়। সত্যই, প্রান্তিক থেকে রবীন্দ্রকাব্যের বিষয় বলতে গেলে রবীন্দ্রনাথ নিজেই। তাই তাঁর রচনায় 'আমি' বা 'আমার' শব্দের ছড়াছড়ি—এটা শ্রীযুক্ত ঘোষ লক্ষ্য করেছেন। এর আগে কাব্যে অনেকটা আমি-নিরপেক্ষভাবে জীবনের কথা এসেছে যদিও রবীন্দ্রমানস চিরদিনই মন্ময়। এখন কবি যেন সচেতনভাবে নিজের চিন্তাভাবনার জাল বুনে চলেছেন। এ কথা সত্য, "পুনশ্চ" কাব্য থেকেই কবিমানসের মোড় ফিরতে আরম্ভ করেছে। কিন্তু লেখকের দিক থেকে বলা যায় যে "পুনশ্চ" কাব্যে আসলে সে রকম কোনো দ্বন্দ্ব ফুটে ওঠে নি, যে দ্বন্দ্বকে তিনি উত্তরকাব্যের বিশেষত্ব বলে নির্দিষ্ট করতে চান। "পুনশ্চ"র গদ্যছন্দ সম্বন্ধেও তার মন্তব্য প্রণিধানযোগ্য। লোকজীবনের প্রতি আগ্রহ থাকলেও রবীন্দ্রনাথ লোকজীবনে মিশে যেতে পারেন না, তাই গদ্যছন্দে লোকভাষার চিহ্ন নেই। মোটের উপর পুনশ্চ কাব্য কবিমানসের সাফল্যের জয়চিহ্ন বহন করে না। "পুনশ্চ", "নবজাতক", "সানাই" প্রভৃতি কয়েকটি কাব্যে সাময়িক বা বাস্তবধর্মী বিষয়ের প্রাধান্যও দেখা যায়। রবীন্দ্রনাথ তাঁর সমসাময়িক জীবনকে ভোলেননি কিন্তু লেখকের মতে 'রবীন্দ্রনাথ যতক্ষণ অনৈতিহাসিক ততক্ষণই তিনি রবীন্দ্রনাথ। ইতিহাসের সামনাসামনি হলেই তিনি বিভ্রান্ত; নৈতিকতা, অলৌকিকতা অবৌক্তিকতার আড়ালে আশ্রয়প্রার্থী।' (পৃ ১৩০)

শ্রীযুক্ত ঘোষ এই বইয়ে অনেক বলিষ্ঠ উক্তি করেছেন। পূর্বকাব্যে রবীন্দ্রনাথ অন্তরতম তর্পণ নিবেদন করেছেন আনন্দপুরুষের পাদপীঠতলে; কিন্তু উত্তরকাব্যে প্রকৃতিদর্শনের আনন্দগাথার পরিবর্তে পাচ্ছি মানবদর্শন। এ কথা সত্য। ব্রাত্য বা অন্ত্যজ মানুষ শুধু

নয় সাধারণভাবে মানবজাতি নতুন আকারে কবিচেতনাকে অধিকার করেছে। এই জন্যে বহু কবিতায় নানাপ্রসঙ্গে মানুষ বা মনের মানুষের উল্লেখ করেছেন কবি। কিন্তু 'মনের মানুষ' কি বাউলের ঈশ্বর? বিস্মিত হলাম লেখক রবীন্দ্রোক্ত 'মহামানব' শব্দটির অর্থ ধরেছেন 'সুপারম্যান' বা মানবত্রাতা। এই সূত্র ধরে তিনি রবীন্দ্রচিন্তার সমালোচনাও করেছেন—

'কবিচিত্তের নিঃসঙ্গতা মহামানব বা নবজাতক কল্পনায় রূপান্তরিত হয়ে দেখা দিয়েছে। অপরের সাহায্যে মুক্তি, এ চিন্তা কতদূরে ভারতীয় তা বিচার্য। রাবীন্দ্রিক মহামানব কবির স্বভাব বা স্বধর্মানুযায়ী গড়ে উঠেছে।' (পৃ ২২৩)

কিন্তু সত্যই রবীন্দ্রনাথ 'মহামানব' বলতে 'সুপারম্যান' বোঝেন না। তিনি বোঝেন মহামানবজাতিকে। 'ঐ মহামানব আসে' গানটিতে তিনি তাঁর স্বপ্নে-দেখা ঐক্যবন্ধ, সংস্কার-মুক্ত ব্যক্তিত্ব-বিকশিত মানবজাতিরই জয়গান করেছেন। *Religion of Man* গ্রন্থে সেই মহামানবধর্মই তিনি ব্যাখ্যা করেছেন। "শিশুতীর্থে"র নবজাতককেও শ্রীযুক্ত ঘোষ ধরে নিয়েছেন কোনো অতিমানবের কল্পনা। উনবিংশ শতাব্দীর ফরাসি দার্শনিক কোমং জননীক্রোড়ে শিশুমূর্তি কল্পনা করে যে মানবতার রূপ এঁকেছিলেন, শিশুতীর্থের শিশু সে ছাড়া আর কেউ নয়।

আশ্বস্ত হলাম এই দেখে আমাদের পূর্ব-আলোচিত "প্রকৃতির কবি রবীন্দ্রনাথ" বইতে প্রসঙ্গত আমাদের ব্যাখ্যাই স্বীকৃত হয়েছে।—

'এই নবজাতক কোনো একটি বিশেষ মানবত্রাতা নন। জগদ্ব্যাপী অত্যাচার ও অনাচারের রক্তপ্লাবনের পঙ্কিল পথে নূতন যুগের গণদেবতারূপে তাঁর আবির্ভাব ঘটবে।' (পৃ ২০২)

শ্রীযুক্ত শিশিরকুমার ঘোষের বইটিতে যেসব অপূর্ণতা আছে, তিনি নিজেই তার উল্লেখ করেছেন। অতএব তার পুনরুক্তি অনেকখানি নিরর্থক।

শ্রীযুক্ত কানাই সামন্তের "রবীন্দ্রপ্রতিভা" প্রথম দর্শনেই দৃষ্টি আকর্ষণ করে। অতি সুন্দর ছাপা বাঁধাই কাগজ। রবীন্দ্রনাথের একটি পাণ্ডুলিপির প্রতিলিপি প্রচ্ছদপটে মুদ্রিত হওয়ায় বৈশিষ্ট্যমণ্ডিত হয়েছে। তা ছাড়া লেখক সযত্নে গ্রন্থের টীকা সম্পাদনা করেছেন। "রবীন্দ্রপ্রতিভা" বইটি যেমন নিছক গবেষণামূলক নয়, তেমনি কোনো সাহিত্যসূত্র আবিষ্কারের বা ব্যাখ্যার চেষ্টাও নয়। বইটি বিভিন্ন ধরনের রচনার সংগ্রহ। রবীন্দ্রনাথের কবিতা সম্পর্কে সাধারণ আলোচনা যেমন আছে, তেমনি আছে রবীন্দ্রসাহিত্যের কয়েকটি চরিত্রের আলোচনা। চিত্রকলা ও সঙ্গীত নিয়ে যেমন দুটি অধ্যায় আছে, তেমনি আছে 'রবীন্দ্র-কাব্যের নেপথ্যবর্তিনী' অর্থাৎ রবীন্দ্ররচনার প্রেরণারূপিণী কাদম্বরী দেবী, 'রবীন্দ্রপ্রতিভার নেপথ্যভূমি' অর্থাৎ রবীন্দ্রনাথের বিখ্যাত পাণ্ডুলিপি, মালতী পুঁথি এবং মজুমদার পুঁথি, 'রূপসৃষ্টি : মায়ার খেলার রূপান্তর'। এগুলিতে পাই অবচেতন রবীন্দ্রমানসের ব্যাখ্যা।

শ্রীযুক্ত সামন্তের সমালোচনাকে রবীন্দ্রসমালোচনার কোন্ ধারার অন্তর্ভুক্ত করব জানি না। তাঁর লেখা সমান নয়। কখনো তিনি রসমগ্ন, কখনো বিশ্লেষণপরায়ণ, কখনো গবেষক, কখনো রম্যতাধর্মী। তাঁর লেখায় মাঝে মাঝে চমৎকার দীপ্তির সাক্ষাৎ পাই, আবার কখনো ভাবোচ্ছ্বাসে আপ্লুত হয়ে যাই। লেখকের 'আবেগমিশ্রিত ভক্তি' যদি পাঠককে অভিভূত না করে, তবে সত্য সত্যই তাঁর 'রবীন্দ্রকাব্যের নেপথ্যবর্তিনী' 'ছিন্নপত্রাবলী' বা 'শিশু' প্রবন্ধে নতুন চিন্তার খোরাক পাই। শ্রীযুক্ত সামন্তের সমালোচনাপদ্ধতি মোটের উপর

বিবরণধর্মী। তিনি নিজে যেভাবে রবীন্দ্রসাহিত্য আস্বাদন করেছেন, ঠিক সেই ভাবেই আমাদের কাছেও উপস্থাপিত করতে চেয়েছেন। এইজন্যই "রবীন্দ্রপ্রতিভা"য় প্রায়শঃই স্বগতভাষণের সম্মুখীন হই। ভাষাও অলংকৃত, বাক্যগঠন জটিল। এগুলি লেখকের মুদ্রাদোষ মাত্র। লেখকের শক্তি অন্যত্র এবং সে শক্তি অত্র ভাবৈকরসং মনঃ স্থিতম্।

**ভবতোষ দত্ত**

**শতবার্ষিক জয়ন্তী উৎসর্গ**—চারুচন্দ্র ভট্টাচার্য সম্পাদিত। রবীন্দ্র শতাব্দী জয়ন্তী সমিতি। কলিকাতা। মূল্য পাঁচ টাকা।

রবীন্দ্রনাথ সম্বন্ধে আমাদের বিস্ময়ের অন্ত নেই, আমাদের জিজ্ঞাসারও অন্ত নেই। কিন্তু তাই বলে শুধু বিস্ময়ের বশবর্তী হয়েই আমরা রবীন্দ্রসমীক্ষায় প্রবৃত্ত নই। ভারতবাসীর আত্মজিজ্ঞাসার ক্রমবর্ধমান তীব্রতাও এ বিষয়ে বর্তমানে যথেষ্ট প্রেরণাদায়ক বটে। এই আত্ম-জিজ্ঞাসা বর্তমানে ঊনবিংশ শতাব্দীর আত্মজিজ্ঞাসা থেকে গভীরতর তাৎপর্য বহন করছে। ঊনিশের শতকের আত্মজিজ্ঞাসার মূলে প্রধানত আত্মরক্ষার চেতনাই মুখ্য ছিল। ভারতবর্ষের বিশাল বটবৃক্ষকে আশ্রয়রূপে ব্যবহার করতে করতে ভারতবর্ষ তার সমগ্রতা নিয়ে জিজ্ঞাসুদের মনে স্পষ্ট হতে থাকে। আলবেরুণী থেকে সুরু করে ভারতীয়দের যে অবিভাজ্যতার কথা আমরা শুনে আসছি, ঊনিশের শতকেই সেই অবিভাজ্যতার মূল কোথায় তা অনুধাবনের কাজ আরম্ভ হয়েছিল। বাংলাদেশে বঙ্কিম বিবেকানন্দ থেকে গিরিশচন্দ্র পর্যন্ত ভারতবর্ষের জীবন সম্বন্ধে আগ্রহী যে কোনো ব্যক্তিই ধর্মকে এই অবিভাজ্যতার নিধান বলে নির্দেশ করেছেন। কিন্তু রবীন্দ্রনাথের ভারতবোধেও বারে বারে ধর্মকে খুঁজে পাওয়া গেলেও, তিনি ধর্ম বলতে যা বুঝেছেন তা পূর্ববর্তীদের থেকে গভীরার্থবোধক। এই বোধের গভীরতার জন্য রবীন্দ্রনাথ গোটা ভারতবর্ষের চেহারা দেখতে পেয়েছিলেন। ভারতবর্ষ যে শুধু ত্যাগের কথাই বলেনি, নিষ্কাম সাধনার কথাই বলেনি, আনন্দের কথাও বলেছে, তার বৈরাগ্য যে দুর্বলের বিরক্তি নয়, সেখানে যে রাজা এবং ঋষি অভেদে বর্তমান ছিল, রবীন্দ্রনাথ তার পূর্ণ তাৎপর্যকে বুঝেছিলেন। বুঝেছিলেন বলেই, বৈষ্ণব কবিদের আবেগনির্ভর জীবনদৃষ্টির প্রকৃত রহস্য হৃদয়ঙ্গম করেও, তার প্রভাবকে নানাভাবে অঙ্গীকার করেও, রবীন্দ্রকল্পনা বারে বারে যে রূপকের প্রতি পক্ষপাত প্রকাশ করেছে তা হল হর-পার্বতীর রূপক। এই রূপকেই রবীন্দ্রনাথ জীবনের দ্বন্দ্বময় সমগ্রতাকে বারে বারে উদ্ভাসিত করেছেন। এই দ্বান্দ্বিক সমগ্রতা অবশ্য কবির বিশ্ববীক্ষাসম্ভূত—কিন্তু অনেকাংশে তা ভারতবর্ষের প্রকৃতির দান। তাই রূপকের এই ক্লাসিক আধারে কবির ভারতবর্ষ সংক্রান্ত অভিজ্ঞতা ব্যক্ত হয়েছে। তিনি দেখেছেন ভারতবর্ষের ধর্ম, জীবনের এই দুই দিককেই ধারণ করে রেখেছে। রবীন্দ্রনাথের এই সমগ্রতাসন্ধান আরো স্পষ্ট হয় যখন বঙ্কিমচন্দ্রের ভারত-জিজ্ঞাসার সঙ্গে রবীন্দ্রনাথের ভারত-জিজ্ঞাসার প্রতি তুলনা করা যায়। বঙ্কিমচন্দ্রের ভারত-জাগরণ মানে হিন্দুইজমের পুনরুদয়। রবীন্দ্রনাথের ভারতবর্ষ মানে ভারত-সমাজ; সে শুধু হিন্দু বৌদ্ধ জৈনদের মর্মের ভারতবর্ষই নয়, তার পাশে পাশে প্রবহমান লোকসাধনার হার্দ্য ভারতবর্ষও। আবার, তাঁর বিশ্ব আবিষ্কার প্রতিবারেই ভারত আবিষ্কারও বটে।

বিশ্বে তিনি যেমন বয়ে নিয়ে যেতে চেয়েছেন তাঁর ভারতবর্ষকে, ভারতবর্ষেও তেমনি বারে বারে বয়ে এনেছেন বিশ্বকে। কেন না সমগ্র না হলে মুক্তি নেই। যে কারণে তিনি রবীন্দ্রনাথ—তাঁর সেই বিশাল অসামান্য কবিত্ব এই বোধির ওপরে প্রতিষ্ঠিত। তাই বঙ্কিম যেমন ব্যক্তির মুখ তাকিয়ে অনুশীলনাদর্শ রচনা করেন, রবীন্দ্রনাথ তেমনি ব্যক্তিত্বের মুখ তাকিয়ে মানুষের ধর্মের কথা ভাবেন। রবীন্দ্রনাথের ব্যক্তি সকল সময়েই বিশ্বসাপেক্ষ—তাঁর বিশাল কবিত্বের মূল কথাও এইখানে।

সুতরাং রবীন্দ্রনাথ সংক্রান্ত যে কোনো আলোচনায়, তা সে তাঁর ভারতবোধবিষয়ক আলোচনাই হোক, অথবা তাঁর শিল্পরীতি সংক্রান্ত আলোচনাই হোক,—তা রবীন্দ্রচেতনার সমগ্রের পটে হওয়াই বাঞ্ছনীয়। অন্ধের হস্তীদর্শনের কিম্বদন্তী প্রয়োগ করে রবীন্দ্র জিজ্ঞাসার খণ্ডীভবন অনিবার্য বলে মেনে নেওয়া উচিত নয়। বর্তমান সংকলনের কতকগুলি রচনার বিষয়-নিহিত তাৎপর্য সত্ত্বেও এই খণ্ডীভবনের দুর্ভোগের হাত থেকে তারা বাঁচে নি। সেক্ষেত্রে শ্রীযুক্ত শশিভূষণ দাশগুপ্তের ও শ্রীযুক্ত ভবতোষ দত্তের রবীন্দ্রনাথের মানবতাবোধ ও মতানুধ্যান সংক্রান্ত আলোচনা দুটি এই গ্রন্থের দুটি অন্যতম আলোচনা যেখানে তাঁদের বক্তব্য প্রতিপাদনে গোটা রবীন্দ্রনাথের কথা ভেবেছেন। শ্রীযুক্ত দাশগুপ্ত তাঁর আলোচনায় রবীন্দ্রনাথের অন্বয়বোধকে প্রচলিত প্রধানুযায়ী উপনিষদের জের বলে মেনে নেন নি। আবার তা থেকে সম্পূর্ণ পৃথক পথগামী কিছু একটা বলেও স্বীকার করেন নি। রবীন্দ্রনাথের অন্বয়বোধের মধ্যে অখণ্ড জীবনের যে অনুভূতি বিদ্যমান, সে অখণ্ড জীবনের তিনটি দিক। তিনটি দিক মিলে সেই অন্বয়বোধ। এই তিনটি দিক হল—ব্যক্তিজীবন, মহামানবতা ও বিশ্বপ্রবাহ। বিশ্বপ্রবাহের সঙ্গে মানবজীবনের অখণ্ডতার যোগের বিষয়টি উপনিষদ-ধৃত। কিন্তু মহামানবতাসংক্রান্ত অখণ্ডতা-বোধ রবীন্দ্রনাথের নিজস্ব। শ্রীযুক্ত দাশগুপ্ত বর্তমান প্রবন্ধটিতে রবীন্দ্রনাথের এই নিজস্ব বোধের বিবর্তন ও পরিণতি আলোচনা করেছেন। তিনি প্রবন্ধটিকে তত্ত্বালোচনায় পর্যবসিত করেন নি। বরঞ্চ কবির কাব্যের রশ্মিতেই বিষয়টির গম্ভীর গহনকে আলোকিত করেছেন। অবশ্যই হিবার্ট লেকচারের তত্ত্বগত আলোচনায় শ্রীযুক্ত দাশগুপ্ত আজো অক্লান্ত, কিন্তু কবি-জীবনের সমগ্রের প্রেক্ষাপটে সেই তত্ত্বের সার্থকতা সন্ধান এই প্রবন্ধের অন্যতম বৈশিষ্ট্য। একথা তাই এ প্রবন্ধের উপযুক্ত উপসংহার যে—'উপনিষদ হইতে বচন তুলিয়া তুলিয়া বা পাশ্চাত্ত্য হিউম্যানিস্টগণের লেখা হইতে বচন তুলিয়া তুলিয়া গোটা রবীন্দ্রনাথকে ব্যাখ্যা করা চলে না।' রবীন্দ্রনাথের শেষের দিকের লেখা পড়ে তাঁকে পশ্চিমী হিউম্যানিস্টদের সঙ্গে মিলিয়ে নেবার যে ঝোঁক তার বিরুদ্ধে শ্রীযুক্ত দাশগুপ্ত সাবধান বাণী উচ্চারণ করেছেন। রবীন্দ্রনাথের শেষের দিকের চিন্তায়, মানুষের মূল্যেই পৃথিবী মূল্যবান এই যে-বোধ আধ্যাত্মিকতাবিমুক্ত হয়ে দেখা দিয়েছিল তার ব্যাখ্যায় অবশ্যই পশ্চিমী হিউম্যানিস্টদের ডাকার দরকার নেই। কিন্তু, মিলের শিষ্য হয়েও বঙ্কিমচন্দ্রকে শেষ পর্যন্ত ঈশ্বরময় উপসংহার খুঁজতে হয়েছে[১]—পশ্চিমী হিউম্যানিস্টদের প্রদত্ত শিক্ষার স্বক্ষেত্রেই যখন নানা Imperfect

[১] মিলের উপসংহারে যে ধর্মের সম্বন্ধে দ্বিধাযুক্ত মনোভাব দেখা দিয়েছিল ধর্মতত্ত্বে বঙ্কিমচন্দ্রই সে কথা প্রথম জানান। তাতে বোঝা যায় মিলকে বঙ্কিম কী রূপে দেখতে পেলে খুশি হতেন।

Synthesisএর পরবর্তী পরিণতি দেখা দিল, বঙ্কিমের ঈশ্বরময় উপসংহার তখন বিস্ময়কর নয়। সে স্থলে রবীন্দ্রনাথ কেন পরিশেষে আধ্যাত্মিকতার 'আবরণ' মুক্ত হবার চেষ্টা করলেন শ্রীযুক্ত দাশগুপ্তের প্রবন্ধটিতে সেই কারণটি সতথ্য আলোচিত হয়নি। ধর্মীয় গোষ্ঠীবিমুক্ত পরেশবাবুতে, চরঘোষপুরের নাপিতের মধ্যে এই সর্বপ্রকার আবরণ থেকে মুক্তির পূর্বাধ্যায় রচিত হয়েছে। অবশ্যই ধর্মীয় আবরণ-বিমুক্তি ও আধ্যাত্মিকতার আবরণ-বিমুক্তি এক কথা নয়। কিন্তু আবরণগুলো এক এক করে খসেছে। তারই প্রথমস্তর পরেশবাবুতে। তার দ্বিতীয় স্তরের ইঙ্গিতও গোরাতেই বিদ্যমান—তিনি আনন্দময়ী। উপসংহারের রবীন্দ্রনাথের মানব-বোধ, মানব-মুক্ত আধ্যাত্মিকতা নয়, আধ্যাত্মিকতা-সমৃদ্ধ মানবতাও নয়। এই হল রবীন্দ্রনাথের সর্বগ্রাসী বিশুদ্ধ মানববোধ—যার যাত্রা নিঃসন্দেহে সদর স্ট্রীটের সূর্যালোক থেকে। রূপনারাণের কূলে যে জগৎ-বোধ অবশেষে সংগৃহীত, তা জগৎ জীবনের মূল্যেই মূল্যবান। মহামানবের ধারাকে উপলব্ধির পথে ধর্ম এবং আধ্যাত্মিকতা একটা স্তরে রবীন্দ্রনাথের অগ্রগতির পথে বিপুল সহায়ক হয়েছিল। কিন্তু কবির মধ্যে মানববোধ যত নিজস্ব পরিণতি লাভ করতে থাকে ততই সেই সাহায্যের প্রত্যক্ষ ভূমিকা শেষ হয়েছে। ভারতবর্ষের লোকসাধনাতেই হয়ত তার ইঙ্গিত ছিল। শ্রীযুক্ত দাশগুপ্ত তার ইঙ্গিতটিকে ধরেছেন কিন্তু পরিণতির বিশালতাকে স্বীকার করতে কুণ্ঠিত হয়েছেন।

শ্রীযুক্ত ভবতোষ দত্তের রবীন্দ্রনাথের সত্যানুধ্যান প্রবন্ধটির কথা শ্রীযুক্ত দাশগুপ্তের লেখাটির সঙ্গেই আলোচ্য। শ্রীযুক্ত দত্তও একথা বিশ্বাস করেন যে সমগ্রতা ছাড়া রবীন্দ্র বিচার সদাই খণ্ডিত। সুতরাং রবীন্দ্রনাথের সত্যের স্বরূপ সন্ধানের দীর্ঘ ইতিহাসের পর্যালোচনায় শ্রীযুক্ত দাশগুপ্তের মত তিনিও অনলস। এ বিষয়ে তথ্যময় রবীন্দ্রজীবন থেকে নানা আলোকসম্পাতী তথ্য ও উদ্ধৃতি ব্যবহার করেছেন। রবীন্দ্রনাথের মানবিক ঐক্যানুভূতির তত্ত্ব, তাঁর জীবন সংক্রান্ত সত্যবোধের সঙ্গে সম্পৃক্ত। এই সত্যের বিভিন্ন প্রকাশমান রূপকে তিনি সাগ্রহ জিজ্ঞাসায় জানতে চাওয়ার ফলে বৈদান্তিক চিন্তার সঙ্গে তাঁর পার্থক্য এসেছে। গতিশীল সত্যের বৈচিত্র্যকে নানাভাবে জানতে জানতে বিশ্বসাপেক্ষ রবীন্দ্রব্যক্তিত্ব 'জীবনের অখণ্ড চঞ্চল রূপপ্রবাহের সমগ্রতাকে ধারণ করতে সক্ষম হয়েছে'। শ্রীদাশগুপ্তের ন্যায় তিনিও উপনিষদের সঙ্গে রবীন্দ্রনাথের মিল-অমিলের প্রসঙ্গ উত্থাপন করেছেন, হির্বাট লেকচার প্রভৃতির তত্ত্ব আলোচনা করেছেন, এবং তিনিও কবিকীর্তির সঙ্গে তাঁর সত্যজিজ্ঞাসার নানামুখী আলোকরশ্মির যোগ কোথায় তা দেখিয়েছেন। শ্রীযুক্ত দত্ত তাঁর প্রবন্ধটির শেষে রবীন্দ্রনাথের উপসংহারক 'সর্বজনীন মানবত্ববোধের অবর্ণ যুগান্তর' বলে আখ্যাত করেছেন। তিনি রবীন্দ্রনাথকে পশ্চিমী মানবতাবাদের সঙ্গে মিলিয়ে দেখার প্রবণতা না দেখিয়েও এই সিদ্ধান্তের স্বাভাবিকতাকে স্বীকার করেছেন। শ্রীযুক্ত দাশগুপ্ত এবং শ্রীযুক্ত দত্ত উভয়েই রবীন্দ্রনাথের সত্যবোধের বা মানবতাবোধের ক্রমপরিণামকে তাঁর অন্তরের দিক থেকে আলোচনা করেছেন। এই ক্রমপরিণাম রচনায় বাইরের যে ঘটনা এবং শক্তির প্রতিক্রিয়া কার্যকরী ছিল তাদের কথা প্রায় বলেন নি। নেশনতন্ত্রের সঙ্কট, প্রথম মহাযুদ্ধ, ফ্যাসিবাদ প্রভৃতি সম্বন্ধে কবির প্রতিক্রিয়া শুধু তাঁর আন্তর্জাতিকতাবাদকেই রচনা করেনি, 'চিন্ময় মানবসত্তার ধ্যান' কবি এই সমস্ত ভূমিতে বসেই করেছিলেন বলে, সেই ধ্যানাসনের প্রসঙ্গে এরাও আলোচ্য। এই সকল প্রসঙ্গের অনুপস্থিতির জন্য ভবতোষ দত্তের প্রবন্ধের মূল্যবান উপসংহার আকস্মিক বলে ভ্রম হয়।

বস্তুতঃ গোটা রবীন্দ্রনাথের যে ইঙ্গিত শ্রীদাশগুপ্ত ও শ্রীযুক্ত দত্তের প্রবন্ধে উপস্থিত যে কোনো পন্থায় রবীন্দ্রোপলব্ধির জন্য তা বিশেষ মূল্যবান। অন্যথা রবীন্দ্রনাথ কখনো হয়ে পড়েন প্রাচ্য-পাশ্চাত্ত্য কাটাকুটি খেলার আশ্চর্য সামগ্রী, অথবা তত্ত্বের ফিতে দিয়ে সৌন্দর্য পরিমাপের ব্যর্থ প্রয়াস। রবীন্দ্রনাথ সংক্রান্ত সমুদয় আলোচনাকেই শেষ বিচার পেতে হবে তাঁর কবিত্ব প্রসঙ্গের সঙ্গে বন্ধ হয়ে। তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়ের রবীন্দ্রনাথ ও ভারতধর্ম, শিবপ্রসাদ ভট্টাচার্যের রবীন্দ্রসাহিত্যে ভারতের মর্মবাণী, নন্দগোপাল সেনগুপ্তের রবীন্দ্রমনের দার্শনিক ভিত্তি এবং সোমনাথ মৈত্রের রবীন্দ্র সাহিত্যের একটি মূল সুর আন্তরিকতায় আবেগময় হলেও সমগ্র রবীন্দ্রনাথে সন্নিবিষ্ট কোনো প্রসঙ্গালোচনা নয়। ফলে রবীন্দ্রনাথের বিশেষ এবং নির্বিশেষ কোনো রূপই আলোচিত হয়নি। মনে হল সম্পাদকমণ্ডলী লেখক নির্বাচনে যে নিষ্ঠার পরিচয় দিয়েছেন বিষয়-সূচী রচনায় সে পরিমাণ মনঃসংযোগ করেন নি। অবশ্যম্ভাবী পরিণতি হয়েছে এই যে বহু পুরাতন কথা একই সঙ্গে অনেকে আবৃত্তি করেছেন। এতে রবীন্দ্রনাথ সম্বন্ধে তাঁদের শ্রদ্ধার পরিচয় পাওয়া যায় বটে, কিন্তু এরকম একটা সংকলনে আমরা তদতিরিক্ত কিছু আশা করি।

সেদিক থেকে শ্রীরমেশচন্দ্র মজুমদার মহাশয়ের রবীন্দ্রনাথের জাতীয়তাবাদ শীর্ষক প্রবন্ধটিতে কিছু বস্তুপূর্ণ কথা শোনা গেছে। প্রবন্ধকারের বক্তব্য এককথায় এই, 'রবীন্দ্রনাথ ভারতবর্ষের ইতিহাসের ধারা সম্বন্ধে যে মত পোষণ করিতেন তাহা বাস্তব সত্যের উপর প্রতিষ্ঠিত নহে'। শিবাজী এবং রণজিৎ সিংহ সম্বধে রবীন্দ্রনাথের মন্তব্যকে লেখক রাষ্ট্রনৈতিক ইতিহাসবেত্তার দৃষ্টিতে খণ্ডন করতে চেয়েছেন। তিনি রবীন্দ্রনাথ আরোপিত, বিশেষ বলভিত্তিক ঐক্যকে সাময়িক বলে মনে করেন। এই জন্যই নানক ও রণজিৎ সিংহের প্রসঙ্গ তিনি আলোচনা করেছেন। এ প্রসঙ্গে শ্রীযুক্ত মজুমদার বলছেন, 'শিখ সম্প্রদায় যুদ্ধ বিদ্যায় বিশারদ না হইলে প্রবল মুঘল রাজশক্তি খুব সম্ভবতঃ ইহাকে পিষিয়া ফেলিত। যদি তর্কচ্ছলে ধরিয়া লওয়া যায় যে মুঘলশক্তি শিখদের প্রতি উদাসীন থাকিত, তাহাদের যাত্রাপথে কোনো বাধা দিত না—তাহা হইলেই কেবল বাবা নানকের পাথেয়ের সাহায্যে তাহারা ভারতের সমাজে ও ধর্মে বিশেষ কোনো পরিবর্তন আনিতে পারিত? নানকের ন্যায় রামানন্দ কবীর দাদু প্রভৃতি মধ্যযুগের বহু সাধক তাঁহাদের শিষ্যদিগকে অনেক পাথেয় দিয়া গিয়াছিলেন, কিন্তু আজ কেবলমাত্র কবীরপন্থী প্রভৃতি কয়েকটি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র নগণ্য সম্প্রদায়ই তাঁহাদের স্মৃতিরক্ষা করিতেছে।' গুরু গোবিন্দ, রণজিৎ সিংহ প্রমুখের সামরিক নায়কত্ব ব্যতীত নানকের বাণী ভারতবর্ষকে স্পর্শ করতে পারত না—একথা বলতে হলে ভারতবর্ষের সামাজিক ইতিহাসের একটা অধ্যায় সম্বন্ধে চূড়ান্ত অন্ধতা অবলম্বন করতে হয়। চৈতন্যদেব তাঁর কালেই প্রাদেশিক সীমা অতিক্রম করে ভারতবর্ষের বৃহদংশকে স্পর্শ করেছিলেন—নিশ্চয় সাময়িক নেতৃত্বের সহায়তায় নয়। বাংলাদেশ নিজেকে অন্তর দিয়ে উপলব্ধি করেছিল বৈষ্ণবযুগে, এবং সে সময় সে তার অনুভবের গৌরবকে, গৌরবের অসামান্যতাকে অন্যত্রও বিস্তারিত করেছিল, রবীন্দ্রনাথই একথা আমাদের ধরিয়ে দিয়ে গেছেন। স্বভাবতঃই এই চিত্ত-সম্প্রসারণ বলভিত্তিক না হয়েও কালজয়ী হতে পেরেছিল। বস্তুতঃ শ্রীযুক্ত মজুমদারের সঙ্গে রবীন্দ্রনাথের মূলগত তফাৎ এইখানে যে শ্রীযুক্ত মজুমদারের চোখে অখণ্ড বা গোটা ভারতবর্ষের বিষয়টি কখনো নেই। হিন্দুজাতি, শিখজাতি, মারাঠিজাতি—ভাবনাগুলো যদি এই পদ্ধতিতে চলে তাহলে শ্রীযুক্ত মজুমদারের কথাই ঠিক। কিন্তু রবীন্দ্রনাথ সমগ্র ভারতবর্ষের কথাই বারে বারে ভেবেছেন। আর সমগ্রের কথা ভাবতে গেলে ঐক্যসূত্র আবিষ্কারের

কথাও ওঠে। তারই সন্ধানে রবীন্দ্রনাথ ভারতবর্ষের সমাজের কথা ভেবেছেন—রাজলক্ষ্মীর সাধনা অপেক্ষা সমাজলক্ষ্মীর সাধনার কথা বলেছেন[২]। ভারতবর্ষের ইতিহাসের দিকে তাঁর দৃষ্টিপাত বরঞ্চ ভারত-ইতিহাসের সমাজভিত্তিক আলোচনা। 'তাঁর এই মত যে দেশ গ্রহণ করেনি' তাতে এদেশের রাষ্ট্রনৈতিক নেতৃবৃন্দের অন্তর্দৃষ্টির স্বল্পতার পরিচয়ই পাওয়া যায়। আমাদের বহু দুর্ভাগ্যের মূল কোথায় তাও বোঝা যায়।

শ্রীযুক্ত মজুমদারের প্রবন্ধটিতে যে আংশিকতা তা দূর হতে পারত রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে ঊনবিংশ শতাব্দীর সম্পর্ক সংক্রান্ত কোনো সার্থক আলোচনায়। ঊনিশের শতকের ভারত-বোধের পটভূমিকায় রবীন্দ্রনাথের ভারতস্বরূপ সন্ধান শুরু হয়েছে। সে কারণে ঊনিশের শতকের বাংলাদেশে এ বিষয়ের প্রস্তুতি পর্বের বৈশিষ্ট্য রবীন্দ্রনাথের প্রসঙ্গে বিশেষ তাৎপর্যপূর্ণ। শ্রীঅসিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়ের রবীন্দ্রনাথ ও ঊনবিংশ শতাব্দী নামক প্রবন্ধে এই তাৎপর্যকে হৃদয়ঙ্গম করার জন্য কোনো আগ্রহ নেই। বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়ের গদ্যভঙ্গিতে এমন একটা অস্থির, শততরঙ্গ ভঙ্গপ্রবণতা বিদ্যমান যার তুলনা বুঝি ঊনবিংশ শতাব্দীর জীবনের অস্থিরতার মধ্যেই শুধু মেলে। ঊনবিংশ শতক সংক্রান্ত জ্ঞাতব্য সব কথাই এই প্রবন্ধে আছে এবং কতকগুলি কথা পূর্বজ্ঞাতও বটে। এই পূর্বজ্ঞাত কথা-গুলির পুনরাবৃত্তিতে আমাদের কোনো আপত্তি ছিল না, যদি দেশকালে ধৃত রবীন্দ্রমানসের পরবর্তী বিবর্তন সম্ভাবনা সতথ্য আলোচিত হত। সমস্তটা হয়েছে রবীন্দ্রনাথ যা ছিলেন তার বিবরণ। যা ছিলেন তার ব্যাখ্যা নয়। প্রকৃত ইতিহাস কার্যকারণ সূত্রের ব্যাখ্যা ও পরিণতির কথা বলে।

এবং সঙ্গে সঙ্গে, রবীন্দ্রনাথের সৃষ্টি প্রতিভার কোনো বিশেষ দিক নিয়ে আমরা যখন আলোচনা করি তখন আমরা যদি সেই বিশেষ দিক বা অধ্যায় কবির সমগ্র সৃষ্টির সঙ্গে কোন্ নিগূঢ় যোগে বিশিষ্ট সে কথা আলোচনা না করি তবে সে আলোচনা নিঃসন্দেহে আংশিকতা-দুষ্ট। তিনি কবি হয়েও ঔপন্যাসিকের কলম তুলে নিয়েছিলেন, অথবা লেখক হয়েও ছবি আঁকতে বসেছিলেন—এ সমস্ত মন্তব্যে স্পষ্টই বোঝা যায় যে কবির সৃজনী ব্যক্তিত্বের সঙ্গে মন্তব্যকারদের পরিচয় একান্তই আপাত। রবীন্দ্রনাথের কোনো কিছুই একটা কিছু হয়েও, আর একটা কিছু হয়ে ওঠা নয়। শিল্পের সর্বাঙ্গলে পর্যটন করেছিলেন তিনি সৌখীন রীতি বিলাসের তাগিদে নয়, বারে বারে শিল্পের আলোয় জগৎ-জীবনের স্বরূপের সন্ধান এর মূলে। সে কারণে রবীন্দ্রনাথের শিল্পাধারগুলির বিভিন্ন বৈপরীত্যের মাঝে ঐক্যবিষয়ক সূত্র আবিষ্কার-বাসনায় আমরা যেমন অতি সরলীকরণের আশ্রয় নেব না,

[২] When we remember that Indians had more of Society than of the State, that her religious have penetrated into the inmost recesses of living, that Hinduism is more of a culture than of a religion or a philosophy in the European sense, that Buddhism, Jainism, Islam, Sikhism other religions have survived more by diffusion than by political prestige then this absence of sociological approach is not only a criminal conduct but a blunder of the first magnitude.

—*On Indian History* (A Study of Method)—Dhurjati Prasad Mukherji

তেমনি এক-একটি শিল্পরাজ্যের স্বরাজ-সাধনাকে সার্বভৌম বলেও মেনে নেব না। ছিন্নপত্র ও রবীন্দ্রদর্শন সংক্রান্ত মনোজ্ঞ আলোচনায় শ্রীমৈত্রেয়ী দেবী কবির সে সময়ের চিন্তাজগতের নানা টানাপোড়েনের কথা কিছুই বলেননি। নবপ্রকাশিত ছিন্নপত্রাবলীর ১৫২ নং ও ১৫৩ নং চিঠি দুটির কথাই শুধু বলা হচ্ছে না, পৃথিবীর ও প্রকৃতির অন্তর্নিহিত ঔদাস্য সম্বন্ধে রবীন্দ্রনাথের এক একান্ত সাময়িক ধারণা এযুগে জন্মলাভ করেছিল। নানা কারণে রবীন্দ্রনাথের প্রকৃতিচেতনার একটা নতুন ব্যাখ্যা এখানে মেলে। ছিন্নপত্রকে তৎকালীন কবিজীবনের সমগ্রের সঙ্গে মিলিয়ে না দেখার জন্যই লেখিকা এটিকে হারিয়েছেন। তেমনি শ্রীউপেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্যের রবীন্দ্রনাথের অতিপ্রাকৃত বা ভূতের গল্প শীর্ষক আলোচনায় শিক্ষাপ্রদ ভূমিকা রচনা করেছেন বটে, কিন্তু বলি-বলি করেও একটা কথা বলে উঠতে পারেননি যে রবীন্দ্রনাথের ভূতের গল্প ব্যর্থ মানুষের গল্প বলেই এত আবেদন-ময়। এই মানুষদের কথা রবীন্দ্রনাথের কবিতায় কম। সে কারণে কবিতায় রবীন্দ্রনাথ অতিপ্রাকৃত-রস সৃষ্টি করতে ব্যর্থ হয়েছেন —শ্রীযুক্ত ভট্টাচার্য এ সম্বন্ধে কোনো ইঙ্গিতই করেননি। সেই বিচারেই বলা যায়, কাজি আবদুল ওদুদের পঞ্চভূত, শ্রীবিভূতিভূষণ মুখোপাধ্যায়ের রবীন্দ্রকাব্যে বর্ষা এবং শ্রীক্ষিতীশ রায়ের অস্তগামী রবি অথবা শ্রীশান্তা দেবীর রবীন্দ্রনাথের ছোটগল্প নিঃসন্দেহেই হৃদয়গ্রাহী আলোচনা মাত্র। মন্ময় আলোচনা এ সমস্ত ক্ষেত্রে লেখকদের লক্ষ্য ছিল তাঁরা তাতে সিদ্ধিলাভ করেছেন। পাঠ এবং ব্যাখ্যার সমাবেশে এরা প্রথাবদ্ধ আলোচনার অন্তর্গত। বরঞ্চ হরপ্রসাদ মিত্রের রবীন্দ্রনাথ ও সাহিত্য ইন্দ্রিয় সাহিত্যের ছাত্রদের কাছে নূতন আলোক-সম্পাতী প্রয়োজনীয় আলোচনা। যদি শ্রীযুক্ত মিত্র বোদলেয়র-এ্যালান পো-প্রমুখ অনাবশ্যক আলোচনার ভার কমাতেন—তাহলে সংক্ষিপ্তির জন্য বক্তব্যের সৌন্দর্য বাড়ত। নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়ের 'প্রচ্ছন্ন দাক্ষিণ্যভারে'-রচনায় লেখকের প্রকৃত রসিক মনের যথার্থ আত্মপ্রকাশ ঘটেছে। কিন্তু তিনিও কি রবীন্দ্রনাথের নারীচরিত্রগুলির একটি বিশেষ স্বরূপ আলোচনায় এদের ব্যক্তিত্ব সম্বন্ধে রবীন্দ্রনাথ কোন্ বিশিষ্ট ধারণায় স্বতন্ত্র সে কথা বলবেন না? কাব্য এবং কথাসাহিত্য মিলিয়ে চরিত্রগুলির বহিরঙ্গের রেখাপরিচিতি গ্রহণের পথনির্দেশে শ্রীযুক্ত গঙ্গোপাধ্যায় অভ্রান্ত। কিন্তু এ জাতীয় চরিত্রকল্পনার পটভূমি বিশ্লেষিত হয়নি। সে কারণেই দাক্ষিণ্যের অন্তরালবর্তিনী যে দৃঢ়তা তার স্বরূপ ব্যাখ্যাও যথাযথ হল না। মেজবৌ নোরা হয়ে উঠল না কেন সে ইঙ্গিত তিনি নির্ভুলভাবে আমাদের দিয়েছেন, কিন্তু সে কৃতজ্ঞতা ঘন হতে পারে না যখন দেখি হৈমন্তীর আত্মমর্যাদার শেষ-পরিচয়প্রসঙ্গ তিনি প্রায় উত্থাপনই করলেন না।

অনুরূপভাবেই রবীন্দ্রনাথের গদ্যরীতি সংক্রান্ত শ্রীযুক্ত রথীন্দ্রনাথ রায়ের আলোচনাটির জন্য লেখকের শ্রম এবং নিষ্ঠাকে অভিনন্দন জানিয়েও, অভিযোগকে স্তিমিত করে আনতে পারি না। রবীন্দ্রনাথের গদ্যরীতি সংক্রান্ত বিবর্তনের পর্যায়গুলিকে রথীন্দ্রবাবু নিপুণ-ভাবে সন্নিবেশিত করেছেন এবং আলোচনা করেছেন। বঙ্কিমচন্দ্রের প্রভাব অতিক্রম কেন অবলীলাক্রমে ঘটেনি সে সম্বন্ধে তাৎপর্যপূর্ণ মন্তব্যও শ্রীযুক্ত রায় করেছেন। কিন্তু বোঝা গেল না কেন রবীন্দ্রনাথের চিত্রকল্পময় গদ্য—(প্রবন্ধের গদ্য) বঙ্কিমের প্রবন্ধের গদ্যের চেয়ে মন্থরগতি। শ্রীযুক্ত রায় সম্ভবতঃ সজ্ঞানে এই বিশেষ প্রশ্নটির পাশ কাটিয়েছেন যে রবীন্দ্র-নাথ লোকসাহিত্যের অভিনিবিষ্ট ছাত্র হয়েও কেন চলতি বাংলার বিশাল ইডিয়ম-সম্পদকে তাঁর গদ্যে প্রায় অপাংক্তেয় করে রেখেছেন? এই প্রশ্নটিকে পাশ কাটানোর জন্যই রবীন্দ্রনাথ কেমন করে চলতি বাংলার ইডিয়ম-সম্পদকে অগ্রাহ্য করেও "সবুজপত্রে"র পরে বাংলা কথা-

ভঙ্গিকে স্বাধিকার দিলেন, তাকে ভিন্ন শক্তিতে জোরালো করে তুললেন সে আলোচনা বাদ গেছে। আর দৃষ্টিভঙ্গির এই একপেশে ব্যবহারের জন্যই গদ্যে 'চলতিভাষার প্রতিষ্ঠা'-ব্যাপারটি যে সাধুভাষা থেকে 'চলতিভাষা বেরিয়ে পড়ার' ব্যাপার নয়, ক্রমবর্ধমান বিষয়োপলব্ধির অনিবার্য তাগিদ এর পশ্চাতেও ছিল, যেমন ছিল "পুনশ্চে"র গদ্য-ছন্দের প্রবর্তনের পশ্চাতে—সে কথা বলতেই ভুল হয়ে গেছে। রবীন্দ্রনাথের চিন্তার গহনতার প্রসঙ্গে ছাড়া তাঁর গদ্যরীতির সমস্যা আলোচিত হয়েছে বলেই এই সীমাবদ্ধতা দেখা দিয়েছে।°

শ্রীযুক্ত আশুতোষ ভট্টাচার্যের রবীন্দ্রনাথ ও বাংলার লোকসাহিত্য প্রবন্ধটি সংকলনের আর একটি উজ্জ্বল রচনা যেখানে আমরা রবীন্দ্রনাথের একটি পৃথক চেহারার দেখা পাই। লোকসাহিত্য গবেষণার সূত্রপাতের জন্য বাংলার সাহিত্য সাধকেরা রবীন্দ্রনাথের কাছেই কৃতজ্ঞতা জানাবেন। রবীন্দ্রনাথ যে পদ্ধতি-প্রকরণ ব্যবহার করেছেন, শ্রীযুক্ত ভট্টাচার্য তার যোগ্য আলোচনা করেছেন এবং এই পদ্ধতি-প্রকরণই যে আধুনিকতম গবেষণার ভিত্তি হতে পারে তা জানিয়েছেন। শ্রীযুক্ত ভট্টাচার্য রবীন্দ্রনাথের লোকসাহিত্য-ভাণ্ডারে প্রবেশাধিকারের ছাড়পত্র হিসাবে তাঁর কবিত্বরস পিপাসাকে নির্দেশ করেছেন। তিনি নিজে জ্ঞানতপস্বী অধ্যাপক। সেই স্নিগ্ধতায় রচনাটি সমুজ্জ্বল। রবীন্দ্রনাথের কাব্যে ও গল্পে লোক-সাহিত্যের প্রভাব কোন্ পর্যায়ে কতখানি এ আলোচনা একেবারেই শ্রীযুক্ত ভট্টাচার্য এ আলোচনায় বাদ দিয়েছেন। সমস্তটি পড়ে মনে হল সেটা তাঁর বর্তমান প্রবন্ধের লক্ষ্য নির্দিষ্ট ছিল না। সে হিসাবে প্রবন্ধের নামকরণ ঈষৎ ত্রুটিগ্রস্ত হয়েছে বলে মনে হল। রবীন্দ্রনাথের লোকসাহিত্য আলোচনার পদ্ধতি প্রকরণ যখন তাঁর আলোচনার বিষয় তখন নামকরণেও সেই ইঙ্গিত বাঞ্ছনীয় ছিল।

এই সংকলনে দিনেন্দ্রনাথ ঠাকুরের রবীন্দ্রসংগীত, শ্রীসুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়ের বিশ্বমনা : বাক্‌পতি, শ্রীসুকুমার সেনের রবীন্দ্রনাথের গল্পে রূপক ও রূপকথা, শ্রীঅহীন্দ্র চৌধুরীর রবীন্দ্রনাথের অভিনয়, শ্রীপ্রবোধচন্দ্র সেনের ভোরের পাখী ও শ্রীশচীন সেনের রবীন্দ্রসাহিত্যে গণআন্দোলন সেই জাতীয় প্রবন্ধ যাকে বলা যায় তথ্য-সমৃদ্ধ প্রবন্ধ। শ্রীযুক্ত চট্টোপাধ্যায়ের প্রবন্ধটি শেষ পর্যন্ত স্মৃতিকথায় পর্যবসিত হলেও তা তাঁর মত জ্ঞান-প্রবীণের স্মৃতি বলেই আমাদের কাছে শ্রদ্ধেয়। রবীন্দ্রনাথকে নানা বিশেষণে নানা সময়ে আমরা ভূষিত করেছি, কিন্তু বিশ্বমনাঃ কথাটি কবির যথার্থ পরিচয়-বাচক। ভোরের পাখী প্রবন্ধটিতে রবীন্দ্র-চিত্তের প্রত্যুষলগ্নের কথা বিস্তৃত তথ্যভারে সমৃদ্ধ। শ্রীযুক্ত সেন অবশ্যই মাত্র তথ্যের স্তূপে বদ্ধ থাকেননি। তখনকার অস্ফুট কবিকীর্তির সাহায্যে রবীন্দ্রমানসের নেপথ্যলোককেও

°J. Middleton Murry তাঁর সুবিখ্যাত The Central Problem of Style নামক নিবন্ধে স্তাঁদালের প্রদত্ত styleএর একটি সংজ্ঞাকে খুব তারিফ করেছেন। স্তাঁদালের দেওয়া সংজ্ঞাটি এই, 'Style is this: to add to a given thought all the circumstances fitted to produce the whole effect that the thought ought to produce.'

Murry সাহেব এই সংজ্ঞা আলোচনা করতে গিয়ে বলেছেন... 'thought' does not really mean 'thought'; it is a general term to cover intuitions, convictions, perceptions and their accompanying emotions before they have undergone the process of artistic expression or ejection.

উদ্ভাসিত করে তোলার চেষ্টা করেছেন। ছিন্নপত্রাবলীতে সেক্সপীয়রের গুথেলো সম্বন্ধে রবীন্দ্রনাথের প্রতিক্রিয়ার কথা কবিই আমাদের জানিয়েছেন। কবি-জীবনের উষা-লগ্নেই যে রক্তাঙ্কিত বিয়োগনাট্য সম্বন্ধে কবির বিরূপতা গড়ে উঠেছিল—শ্রীযুক্ত সেন তা আমাদের কাছে প্রকাশ করলেন। বঙ্কিমচন্দ্রের উচ্চাভিলাষের উদ্দীপনের প্রয়াসের সঙ্গে রবীন্দ্রনাথের পার্থক্যটা মাত্র ইঙ্গিত না দিয়ে যদি শ্রীযুক্ত সেন আর একটু ব্যাখ্যা করতেন, তাহলে পরবর্তী কালের বঙ্কিম-রবীন্দ্র সম্পর্কটির উৎস বোঝার কাজে সহায়তা পাওয়া যেত। রবীন্দ্রনাথের গল্পে রূপক ও রূপকথা এবং রবীন্দ্রসংগীত প্রবন্ধ দুটি উদ্দিষ্ট বিষয়ের কালানুক্রমিক বিবর্তনের বিবরণ। যোগ্য হাতে লেখা বলে পরবর্তী আলোচনায় সাহায্য করবে। সেদিক থেকে শ্রীযুক্তবিজনবিহারী ভট্টাচার্যের ইংরাজীশিক্ষক রবীন্দ্রনাথ রবীন্দ্রনাথের ইংরাজী-পাঠন সম্বন্ধে একটি সংবাদ-জ্ঞাপক প্রবন্ধমাত্র। শতবার্ষিকী বৎসরে এ আশা করা অন্যায় হবে না যে রবীন্দ্রচর্চা ক্রমশই ব্যাপক আকার ধারণ করবে। এবং এ ব্যাপারে আমরা কেবল যে পুনঃপুনঃ দলিত পন্থাতেই পা ফেলছি তা নয়। জিজ্ঞাসার অভিনবত্ব এবং গভীরতার প্রমাণও মিলছে। তার কারণ শতবার্ষিকের বৎসরে আমাদের যেটি পরম লাভ বলে মনে হয়, সেটি হল, আমাদের মধ্যে আংশিক-দৃষ্টি পরিহারের একটা শক্তিশালী প্রেরণা দেখা দিয়েছে। 'তাঁর প্রাণময় রহস্য যে আমাদের কাছে শেষ হয় না'—আমরা সেই অশেষকে কবির সমগ্র প্রাণলীলার সঙ্গে মিলিয়ে সন্ধান করেছি। এই পথেই রবীন্দ্রনাথ অনুসন্ধেয়।

সরোজ বন্দ্যোপাধ্যায়

**রবিচ্ছবি**—প্রভাতচন্দ্র গুপ্ত। গীতবিতান। কলিকাতা ২৬। মূল্য ছয় টাকা।

'বইখানিকে প্রধানত ঘটনা ও তথ্যমূলকভাবে রচনা করার চেষ্টা করা হয়েছে। রবীন্দ্র-পরিচয়কে খানিকটা ঘনিষ্ঠতর করে তুলতে ও রবীন্দ্রজীবনীর উপকরণ সংগ্রহের কাজে বইখানির কিছু মূল্য থাকতে পারে মনে করেই এই কাজে উদ্যোগী হয়েছি'—"রবিচ্ছবি" গ্রন্থের লেখক শ্রীপ্রভাতচন্দ্র গুপ্ত 'নিবেদন' অংশে এই মনোভাব বিবৃত করে গ্রন্থের প্রথম অধ্যায়ে [ মা নিষাদ ] লেখক জানিয়েছেন 'তাঁর সাহিত্য এবং তাঁর জীবন উভয়ই আমাদের অবশ্য পাঠ্য। কাব্যের মায়াজালের অন্তরালবর্তী রূপকারকে আমাদের চিনতে হবে শুধু তাঁর রচনাসৃষ্টির আলোকপাতে নয়, তাঁর জীবনালোকের রশ্মিপাতেও'। (পৃঃ ১৪)

লেখকের উদ্দেশ্য অভিনন্দনযোগ্য এবং আনন্দের কথা তিনি তাঁর এই প্রয়াসে সিদ্ধকাম হয়েছেন। তাই রবীন্দ্রনাথের শতবর্ষপূর্তি উপলক্ষে প্রকাশিত পত্র-পত্রিকা-গ্রন্থের বিপুল সমারোহের মধ্যেও "রবিচ্ছবি" গ্রন্থখানি বিদগ্ধ পাঠকের-দৃষ্টি আকর্ষণ করে। লেখক প্রায় ছ'বছর বিশ্বভারতীর অধ্যাপকরূপে শান্তিনিকেতনে রবীন্দ্র-সান্নিধ্যে কাটিয়েছেন এবং পরেও তাঁর যোগ ছিন্ন হয়নি। তিনি রবীন্দ্রনাথের সাহচর্য লাভ করেছেন, কবির স্বজীবনের পর্যালোচনা শুনেছেন, "অরূপরতন" নাট্যাভিনয়ে কবির সঙ্গে অভিনয়ে নেমেছেন, দিনের পর দিন নানা রূপে দেখেছেন গুরুদেবকে। শুধু কবির সাহিত্যকর্মের আস্বাদন নয়, কবির ব্যক্তিজীবনের বিশেষ-বিশেষ ঘটনাকে জানা, তাঁর নেপথ্য কর্ম তথা অন্তরঙ্গরূপের পরিচয় লাভ করা পরম সৌভাগ্য। সেইজন্যই কবির দীর্ঘজীবন পথ পরিক্রমার বিভিন্ন পর্বে যাঁরা

পথনির্দেশী ছিলেন তাঁদের স্মৃতিচারণ কবির চরিতগ্রন্থে রচনার দিক থেকে মূল্যবান পাথেয়। শ্রীযুক্ত প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায় "রবীন্দ্রজীবনী" চার খণ্ডে প্রকাশ করেছেন—সে এক ঐতিহাসিক প্রচেষ্টা! তিনি তাঁর গ্রন্থ রচনায় চিঠিপত্র, মৌখিকভাষণ, স্মৃতিকথা, দিনলিপি, সংবাদপত্রের তথ্য ও মন্তব্য সকলকিছুর যথাসাধ্য সদ্ব্যবহার করেছেন। "রবিচ্ছবি" গ্রন্থে বিবৃত ও উপস্থাপিত বিভিন্ন তথ্য কবিকে ও কবিকৃত নানা কর্মকে আমাদের কাছে আরও সুপরিচিত করে তুলেছে। কাজেই তাঁর উদ্দেশ্য সিদ্ধ হয়েছে একথা দ্বিধাহীন চিত্তে স্বীকার্য।

চোদ্দটি প্রসঙ্গে সজ্জিত "রবিচ্ছবি"র প্রথমটির নামকরণ লেখক করেছেন 'মা নিষাদ'। এই নামকরণে লেখকের রুচির পরিচয় মেলে। রবীন্দ্রনাথ চিরদিনই জীবহত্যার বিরোধী ছিলেন। এই বিরোধিতার বীজ বুঝি রয়েছে রবীন্দ্রনাথের বাল্য-কৈশোরের সন্ধিস্থলের একটি ঘটনায়। শান্তিনিকেতনের হরিশমালী সুরুলের কুঠির জঙ্গলে যে চঞ্চল-সুন্দর খরগোসটিকে মেরেছিল তার 'নিদারুণতা চিরকালের মতো আমার মনে মুদ্রিত হয়ে আছে' (৪.৪.৩৭-এ কবির পত্রের অংশ)। শিলাইদহ অঞ্চলে রবীন্দ্রনাথের জমিদারিতে চরে পাখী মারা যে কবি নিষিদ্ধ করে দিয়েছিলেন সে তথ্য লেখক আমাদের জানিয়েছেন আর কবি নিজে উল্লেখ করেছেন—"যোগাযোগ" উপন্যাসে বিপ্রদাসের জমিদারিতে মধুসূদনের সাহেব বন্ধুদের পাখী হত্যা নিয়ে যে-আলোচনা আছে সেটা এই প্রসঙ্গে স্মরণযোগ্য'। (পৃঃ ১০)। এই ধরনের বহু তথ্য লেখক আমাদের জ্ঞাপন করেছেন। 'প্রভাত-রবি' রচনাটির বক্তব্য শ্রীযুক্ত প্রভাতচন্দ্র গুপ্তের অনুলিখিত এবং পরে রবীন্দ্রনাথ কর্তৃক পরিমার্জিত হয়েছিল বলে কবি ঐ নাম দিয়েছিলেন। এই রচনাটি বিশেষ মূল্যবান এই কারণে যে এখানে কবি নিজে স্বজীবনের পর্যালোচনা করেছেন। সেই অপূর্ব (অনেকটা যেন স্বগত) ভাষণ পড়তে পড়তে আমরা কবিকে যেন নতুন করে দেখতে পাই। পদ্মা-বিধৌত শিলাইদহ অঞ্চলের প্রতি কবির যে কী গভীর আকর্ষণ ছিল তার পরিচয় পাই কবির ১৯৩৬ সালের (অর্থাৎ মৃত্যুর পাঁচ বছর আগে) উক্তিতে।

'আজ জীবনের সায়াহ্নে বসে বসে ভাবি, আর একবার পদ্মার বুকে সেই নির্জনচারী জীবনে ফিরে যাব। ঠিক সেই স্পর্শ হয়ত পাব না, কিন্তু জীবনের চক্রগতি পূর্ণ হবে, গ্রামের স্নেহচ্ছায়ায়, প্রকৃতির উন্মুক্ত সৌন্দর্যের মধ্যে নদীতীরে একদা যে জীবনের সূত্রপাত হয়েছিল, আজ তারই অবসানবেলায় আবার ফিরে যাব সেই নদীরই কোলে।'

আবার আমাদের এ তথ্যও জানা হল যে একদা রবীন্দ্রনাথ "রাজর্ষি" উপন্যাসের শেষ ভাগের সঙ্গে 'দালিয়া'-র গল্পাংশ জুড়ে একখানি পূর্ণাঙ্গ নাট্যরচনার পরিকল্পনা করেছিলেন (প্রমাণস্বরূপ লেখক কবিরচিত পাণ্ডুলিপির প্রতিলিপি দাখিল করেছেন)—এই সূত্রে 'নাট্যপ্রসঙ্গ' ও 'অভিনয় উৎসব' রচনাদুটি উল্লেখযোগ্য। প্রথমটিতে "বাল্মীকি-প্রতিভা"র অভিনয় থেকে (১৮৮১) নৃত্যনাট্য "শ্যামা"র অনুষ্ঠান (২২শে শ্রাবণ, ১৯৪০) অবধি রবীন্দ্রকৃত নাট্যাভিনয়ের স্থান-কাল নির্দেশিত হবার সঙ্গে রবীন্দ্রনাথ কখন কি ভূমিকায় অবতীর্ণ হয়েছিলেন তার উল্লেখ আছে।

পরেরটিতে 'বৃক্ষরোপণ' উৎসবের বর্ণনার চিত্ররূপ সুন্দর হয়েছে। 'রবীন্দ্র পরিচয় সভা' রচনাটির তথ্যগত মূল্য আছে। দুঃখের বিষয় এই সভার মুখপত্রস্বরূপ প্রকাশিত পত্রিকাখানির মোট তিন সংখ্যার দুটি সংখ্যাই লুপ্ত বা অপ্রাপ্য। 'স্বাক্ষর লেখন', 'নামকরণের বৈশিষ্ট্য' রচনা দুটি রবীন্দ্রানুরাগীদের দৃষ্টি অবশ্যই আকর্ষণ করবে। আর একটি

অনবদ্যরচনা 'দিনেন্দ্রনাথ'। "রবিচ্ছবি" গ্রন্থে 'দিনেন্দ্রনাথ' প্রবন্ধ প্রক্ষিপ্ত নয় বরং অনিবার্যভাবে সংবদ্ধ। রবীন্দ্রনাথ যাঁকে 'সকল গানের ভাণ্ডারী' বলে ঘোষণা করেছেন, তাঁর প্রসঙ্গ উত্থাপন এ-গ্রন্থে সর্বতোভাবে সঙ্গত হয়েছে। দিনেন্দ্রনাথের ব্যক্তি-রূপ ও শিল্পী-রূপ দুটি দিকই লেখক নিখুঁতভাবে এঁকেছেন এজন্য তিনি প্রশংসার্হ। এই গ্রন্থের আর একটি স্মরণীয় বস্তু রবীন্দ্রনাথের মৌখিক ভাষণগুলির অনুলেখনের সুবিন্যস্ত তথ্যপঞ্জী। এটি করে দিয়েছেন রবীন্দ্রসদনের কর্মী ও 'রবীন্দ্ররচনাকোষ' সংকলয়িতা শ্রীচিত্তরঞ্জন দেব —তিনি এজন্য আমাদের সাধুবাদ অর্জন করেছেন।

ভালো লাগাই সাহিত্য-আলোচনার প্রথম ও শেষ কথা। "রবিচ্ছবি" গ্রন্থখানি পড়া শেষ করে বলতে পারি, ভালো লাগল। ঝরঝরে গদ্য ও সুচারু বাক্‌ভঙ্গি গ্রন্থখানির আকর্ষণ বাড়িয়ে দিয়েছে। লেখক তাঁর কথা দিয়ে রবীন্দ্রনাথের একটি অপরূপ চিত্র এঁকেছেন, সেটি উৎকলন করে এ-গ্রন্থের আলোচনা শেষ করি—

শ্যামলীর ছোট্ট আঙিনায় একটা চেয়ারের উপর বসে আছেন ধ্যানমগ্ন কবি। মাথা ঈষৎ ঝুঁকে পড়েছে সামনের দিকে, চোখের দৃষ্টি মুদিত, এক হাতের উপর আর এক হাত কোলে ন্যস্ত। সমস্ত মুখমণ্ডলে এক আনন্দোজ্জ্বল প্রশান্ত জ্যোতি। মনে হল, দেহের সমস্ত শিরা-উপশিরা দিয়ে যেন তিনি প্রভাতের মাধুর্যরস শুষে পান করে নিচ্ছেন।

দেবীপদ ভট্টাচার্য

**কবি-প্রণাম**—বিশু মুখোপাধ্যায় সম্পাদিত। ইণ্ডিয়ান অ্যাসোসিয়েটেড পাবলিশিং কোং প্রাঃ লি। কলিকাতা ৭। মূল্য পাঁচ টাকা।

রবীন্দ্র-জন্মশতবার্ষিক উপলক্ষে প্রকাশিত বহু সংকলন গ্রন্থের মধ্যে "কবি-প্রণাম" অন্যতম। রবীন্দ্রনাথের বিস্ময়কর প্রতিভা অবলম্বন করে বাংলাদেশের কবিসমাজ স্বরচিত কবিতায় তাঁদের হৃদয়ানুভূতি ব্যক্ত করেছেন। অর্ধশতাব্দীর অধিককালব্যাপী রবীন্দ্রবরণের এই ছন্দোময় অভিব্যক্তি আলোচ্য গ্রন্থে সংকলিত হয়েছে। রবীন্দ্রনাথকে কেন্দ্র করে বাঙালির সারস্বত সাধনা বিচিত্র লীলায় উৎসারিত হয়েছে। রবীন্দ্রনাথ সম্পর্কিত কবিতাগুলিও তার একটি বিশেষ দিক। এর যেমন ঐতিহাসিক মূল্য আছে, তেমনি আছে কাব্যপ্রত্যয়গত মূল্য। লিরিক ও সংগীত ব্যক্তিহৃদয়ের স্বতস্ফূর্ত অভিব্যক্তি হলেও, রবীন্দ্রপ্রতিভা সম্পর্কে এগুলিকে একজাতীয় কাব্যভাষ্যও বলা যায়।

রবীন্দ্রনাথ সম্পর্কে এমন কয়েকটি কবিতা এখানে সংকলিত হয়েছে, যাদের পুনর্মুদ্রণের প্রয়োজনীয়তা ছিল। রবীন্দ্রনাথের বয়োজ্যেষ্ঠ কবিরা কিভাবে তাঁকে সম্মানিত করেছেন, তার পরিচয় এ সংকলনে মিলবে। সবচেয়ে কৌতূহলোদ্দীপক কবিতা কবির জ্যেষ্ঠভ্রাতা দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুরের। এই আপনভোলা মানুষটি কনিষ্ঠভ্রাতার গৌরবে হৃদয়ের অকুণ্ঠিত আশীর্বাদ জানিয়েছেন। ছন্দের অভিনবত্ব, অবলীলাকৃত অন্ত্যমিল ও সরস কথোপকথনের অন্তরঙ্গ ভঙ্গি 'স্বপ্নপ্রয়াণ'-এর কবির সম্পূর্ণ উপযুক্ত। দ্বিজেন্দ্রনাথের এই কবিতাটি সংকলনটির একটি বিশিষ্ট সংযোজন। "বাল্মীকি প্রতিভা"র অভিনয়দর্শন করে গুরুদাস বন্দ্যোপাধ্যায় একদা যে সংগীত রচনা করেছিলেন, আলোচ্য গ্রন্থে তা

সংকলিত হয়েছে। বিদ্বজ্জন-সমাগম সভার বার্ষিক অধিবেশন উপলক্ষে জোড়াসাঁকোর বাড়ির তেতালার ছাদে স্টেজ বেঁধে অভিনয় হয়। রবীন্দ্রনাথ সাধারণের সম্মুখে সেইদিন প্রথম অভিনয় করেন। দর্শকদের মধ্যে বঙ্কিমচন্দ্র, গুরুদাস বন্দ্যোপাধ্যায়, হরপ্রসাদ শাস্ত্রী, রাজকৃষ্ণ রায় প্রমুখ সাহিত্যিক উপস্থিত ছিলেন। রাজকৃষ্ণ রায়ও এই উপলক্ষে যে কবিতা রচনা করেছিলেন, সেটিও সংকলিত হয়েছে। কবিতা দুটির ঐতিহাসিক মূল্য অনস্বীকার্য। তবে রাজকৃষ্ণ রায়ের কবিতাটির কাব্যমূল্যও আছে।—তিনি তাঁর মুগ্ধ মনের পিপাসাকে বাণীবন্ধ করেছেন—

নিখিল ব্রহ্মাণ্ড ভুলি'
একদৃষ্টে আঁখি মেলি'
চেয়ে আছি ওরই পানে স্বপ্নময়ী পিপাসায়।

দ্বিজেন্দ্রনাথের কবিতাটি কবির পঞ্চষষ্ঠী জন্মদিনে রচিত। সুতরাং রচনার কালক্রমের দিক থেকে গুরুদাস বন্দ্যোপাধ্যায় ও রাজকৃষ্ণ রায়ের কবিতা দুটিকেই সর্বাগ্রে স্থান দেওয়া উচিত। কবিতা দুটি রবীন্দ্রজীবনের একটি তাৎপর্যমণ্ডিত ঐতিহাসিক ঘটনাকেই রূপ দিয়েছে। এই দুইটি কবিতা সংযোজন করে সম্পাদক ঐতিহাসিক দৃষ্টির পরিচয় দিয়েছেন।

অমৃতলাল বসুর কবিতাটিও এই প্রসঙ্গে উল্লেখযোগ্য। একদা তিনি রবীন্দ্রনাথের কবিতা অবলম্বন করে প্যারোডি রচনা করেছিলেন। অমৃতলালের প্রহসনে উচ্চশিক্ষিতা নারীচরিত্রের বিকৃতি দেখানো হয়েছে, ব্রাহ্মসমাজও তাঁর বিদ্রূপশরাঘাত থেকে রেহাই পায়নি। পুরাতন মূল্যবোধকেই তিনি আঁকড়ে রাখতে চেয়েছেন। কিন্তু রবীন্দ্রপ্রতিভার অসামান্যতাকে তিনিও অস্বীকার করতে পারেননি। তাঁর কবিতায় রবীন্দ্রপ্রতিভার দুটি মূলসূত্র উদ্ভাসিত হয়েছে। প্রেম ও সৌন্দর্যানুভূতির যুগ্মলীলারস রবীন্দ্রমানসকে সুষমামণ্ডিত করেছে। অমৃতলাল রবীন্দ্রনাথের সৌন্দর্যদৃষ্টির স্বরূপ সম্পর্কে যে মন্তব্য করেছেন তা প্রণিধানযোগ্য : 'সৌন্দর্য সনেতে নাই পশুর ব্যাভার॥'

রবীন্দ্রসমকালীন কবিদের বরণ ও বন্দনা সংকলনটির উল্লেখযোগ্য অংশ। দেবেন্দ্রনাথ সেন, অক্ষয়কুমার বড়াল, মানকুমারী বসু, কামিনী রায়, প্রিয়নাথ সেন, প্রিয়ম্বদা দেবী প্রমুখ কবি কখনো সচেতনভাবে আবার কখনো বা অজ্ঞাতসারেই রবীন্দ্রনাথের দ্বারা প্রভাবিত হয়েছেন। রবীন্দ্রনাথের বর্ষীয়ান সমকালীন কবিদের মধ্যে দেবেন্দ্রনাথ সেনের ভূমিকা সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য। রবীন্দ্রনাথ তাঁকে কবি-ভ্রাতা সম্বোধন করে "সোনার তরী" কাব্যগ্রন্থটি উৎসর্গ করেছিলেন। দেবেন্দ্রনাথও রবীন্দ্রনাথকে সম্বোধন করে একাধিক কবিতা লিখেছিলেন। সংকলিত কবিতাটির মধ্যে রবীন্দ্রবরণের রূপবৈচিত্র্য নানা ভাবানুষঙ্গ ও উপমার মাধ্যমে রূপপরিগ্রহ করেছে। "কড়ি ও কোমল" পড়ে বিমুগ্ধচিত্ত দেবেন্দ্রনাথ রবীন্দ্রনাথের উদ্দেশ্যে যে কবিতা লিখেছিলেন ('হে রবীন্দ্র তোমার ও সুন্দর সনেট') সেটি তাঁর এইজাতীয় কবিতার মধ্যে শ্রেষ্ঠ। আলোচ্য সংকলনে সেই কবিতাটি গৃহীত হলে আরো ভালো হতো। রবীন্দ্রসমকালীন কবিদের রবীন্দ্রনাথ সম্পর্কিত কবিতার মধ্যে কাব্যধর্মের দিক থেকে অক্ষয়কুমারের কবিতাটি সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য। অক্ষয়কুমারের কবিজীবনের সঙ্গে রবীন্দ্রকাব্যের একটি আত্মিক সম্পর্ক লক্ষ্য করা যায়। বিহারীলালের ভাবশিষ্য হিসাবে এই সগোত্রীয়তা অসম্ভব ছিল না। রবীন্দ্রনাথের আবির্ভাবের সঙ্গে সূর্যোদয়ের চিত্রকে প্রকৃতির স্নিগ্ধ সুকুমার পটভূমিকায় ফুটিয়ে তোলা

হয়েছে। অক্ষয়কুমারের রোমান্টিক কবিকল্পনা রবির আবির্ভাবকে পরমরমণীয় করে তুলেছে।

অর্ধ-নিদ্রা- জাগরণে ধরা স্বর্গচ্ছবি—
জীবনে স্বপন-ভ্রম, ফুটে রবি—কবি!

পরবর্তীকালের কবিদের কণ্ঠে শ্রদ্ধার্ঘ্য নিবেদনের নম্র ভঙ্গিটি আরো সহজ হয়ে উঠেছিল। কবি এর মধ্যে নোবেল প্রাইজ পেয়ে বিশ্ববন্দিত হয়েছেন। রবীন্দ্রনাথের বয়ঃকনিষ্ঠ সমকালীনদের কবিতায় রবীন্দ্রকাব্যের সুর ও টেক্‌নিকের সুস্পষ্ট প্রভাব পড়েছে। এইকালের কবিদের মনোভাব রবীন্দ্রস্নেহধন্য সত্যেন্দ্রনাথের কণ্ঠে উচ্চারিত হয়েছে—

গান গেয়ে তুমি গানের রাজারে
গঙ্গারে পূজি গঙ্গাজলে;
পঞ্চাশতের পান্থশালায়
সাজাই তোমারে পুষ্পদলে।

এ যুগের কবিরা যথার্থই গঙ্গাজলে গঙ্গাপূজা করেছেন। রবীন্দ্রনাথের ভাব-ভাবনা ও প্রকাশরীতি অবলম্বন করেই তাঁরা রবীন্দ্রবন্দনাসংগীত রচনা করেছেন। রবীন্দ্রনাথের সর্বগ্রাসী প্রভাব যে কিভাবে বাংলা কাব্যে বিস্তৃত হচ্ছিল, এ যুগের কবিদের রচনা থেকে তার প্রমাণ পাওয়া যায়—

(ক) ফুকারিয়া দিকে দিকে তৃষার্তের তপ্ত-বিভীষিকা
প্রলয়-পিনাক,
উজ্জ্বল পিঙ্গল জটা নেমে আসে রুদ্র-রৌদ্র শিখা
ধূসর বৈশাখ।
(রবীন্দ্র-বন্দনা : হেমেন্দ্রলাল রায়)

(খ) রূপ-সায়রে ডুব দিয়ে কী তুলে অরূপ রতন
শোভার সার গাঁথিলে হার নিখিল চিত্ত-হরণ!
(রবীন্দ্রনাথ : দ্বিজেন্দ্রনাথ ভাদুড়ী)

রবীন্দ্রকাব্যের প্রভাব এ যুগের বাংলা কবিতায় যে কতখানি সক্রিয়, তা উদ্ধৃত দুটি কাব্যাংশ থেকেই প্রমাণিত হবে। সুগঠিত ছন্দোবন্ধ, শব্দচয়ন ও সমাসবদ্ধ বাগবিন্যাসের গূঢ়তা রবীন্দ্রনাথের দক্ষিণপাণির আশীর্বাদে সার্থক হয়ে উঠেছে। কবির আইডিয়ার সূক্ষ্মরস আহরণ করেই কবিবন্দনাকে রূপবান করা হয়েছে। তারাশঙ্করের কবিতায় শুনি—

মেঘ-স্বপ্ন উত্তরীয় সম
শোভিত বিশাল বক্ষে ইন্দ্রধনু বর্ণসুষমায়;
অম্বরচুম্বিত ভাল, উদাসীন অনন্ত সন্ধানী,
হিমানীচন্দন লিপ্ত, শোন নিত্য প্রভাত সন্ধ্যায়
আকাশগঙ্গার পারে সূর্য চন্দ্র তারকার বাণী;

রবীন্দ্রনাথের অজস্র দাক্ষিণ্যে বাংলার কাব্যকুঞ্জে বসন্ত সঞ্চারিত হয়েছে, পুষ্পস্তবকের বর্ণগরিমায় বাংলা কাব্যে যৌবনের বিচিত্র অঙ্গরাগ শিল্পিত হয়েছে। মনের পরিধি যেমন বেড়েছে, তেমনি ভাবের সূক্ষ্ম সংবেদন কাব্যপ্রত্যয়কে ক্রমশ অন্তর্মুখী করেছে। রবীন্দ্রকাব্য আস্বাদনের মধ্যেও বহুমুখী বৈচিত্র্য এসেছে। রোমান্টিক মনের সহজ আস্বাদন

মনোজ বসুর কবিতায় রূপ পেয়েছে—

—আজি নও আর কারো,
সারা মনে মোর তোমার কবিতা—পালাও কেমন পারো।

রবীন্দ্রনাথ সারাজীবনব্যাপী যে হিরণ্ময় পূষণ্ বন্দনা করেছেন, পরবর্তীকালে সেই সুরের সঙ্গেই কণ্ঠ মিলিয়ে রবীন্দ্রানুসারী কবিরা তাঁদের আদিত্যবন্দনা করেছেন—

হে পূষণ্
উজ্জ্বলন জ্যোতির্লোকে করো উদ্‌ঘাটন
হিরণ্ময় দ্বার।
স্বপ্নশেষ যাত্রাশেষ হয়েছে আমার।
সে পুরুষ হেরিতেছি আমি
আমারই অন্তরে, যিনি তব অন্তর্যামী। (স্বপ্নশেষ: কানাই সামন্ত)

রবীন্দ্রনাথ একালের কাছে মানবমহিমার চূড়ান্ত পরিণাম। তাই তাঁকে ঘিরে নানা সমুচ্চ আইডিয়া উৎসারিত হয়েছে। রবীন্দ্রনাথ আধুনিক কবিদের কাছে এক প্রদীপ্ত প্রেরণায় পরিণত হয়েছেন—

(ক) যাঁর মাঝে মূর্ত হ'ল মানুষের অমৃত পিপাসা
তাঁহারে প্রণাম। (প্রণাম : প্রেমেন্দ্র মিত্র)

(খ) বড় ছোট, পুরাতন এ পৃথিবী—আমরা যে মহাপক্ষ পাখি,
কে চিনাইলে কবি, ছিনু ভাল ছিনু বন্দী নষ্টনীড়ে থাকি।
(কবি : অজয় ভট্টাচার্য)

(গ) অন্ধকার শিহরিয়া দূরান্তরে সভয়ে মিলায়,
জীবন চঞ্চলি ওঠে নৃত্যশীল আনন্দলীলায়,
কুঞ্জে ফোটে পুষ্প রাশি রাশি।
(রবীন্দ্রনাথ : হুমায়ুন কবির)

(ঘ) তুমি যে রয়েছ কবি, পৃথিবীতে তাই
ভালোবাসা মরেনি আজিও॥
(সঞ্চয়িতা : প্রণব রায়)

একালের তরুণতর কবিরা যুগের যন্ত্রণার মধ্যেও রবীন্দ্রনাথের উজ্জ্বল প্রত্যয় থেকে প্রেরণা লাভ করেছেন—রবীন্দ্রনাথ অনন্ত পরমায়ুর কবি, মানব-মুক্তির শ্রেষ্ঠ উদ্‌গাতা। জীবনের ব্যথাদীর্ণ রক্তাক্ত মুহূর্তেও তাই রবীন্দ্রসংগীতের নূতন তাৎপর্য—

বৈশাখের শুভ্র স্বপ্ন যত
প্রত্যহ রক্তাক্ত হবে, জানি আমি; এই ত্রস্ত প্রাণে
আবার নামবে রাত্রি, তা-ও জানি; সবুজ ময়দানে
ছিঁড়ে যাবে ঘাসের জাজিম, তীব্র বেদনার শীতে
হৃদয় হলুদ হবে।
—তবু এই মুহূর্তে অন্তত
স্মৃতির বিবর্ণ ঝাঁপি ভরে রাখি রবীন্দ্রসঙ্গীতে।
(সঙ্গী সঙ্গীত : নীরেন্দ্রনাথ চক্রবর্তী)

সংকলন গ্রন্থটিকে তিনভাগে ভাগ করা হয়েছে : বন্দনা, সংগীত ও বিলাপ।

'সংগীত' অংশে অতুলপ্রসাদ সেন, যতীন্দ্রমোহন বাগ্‌চী, হেমেন্দ্রকুমার রায়, দিলীপকুমার রায় প্রমুখ খ্যাতনামা কবি ও গীতিকারদের সংগীত সন্নিবেশিত হয়েছে। রবীন্দ্রনাথ গানের রাজা, তাই তাঁকে ঘিরে একটি সুরের জগৎ রচিত হয়েছে। সুরের ইন্দ্রজালে তিনি আমাদের হৃদয়ের গোপন উৎস মুক্ত করেছেন—'সুরের গোপন কথা পাঁপড়ি মেলায়।'

বাইশে শ্রাবণকে ঘিরেও বাংলা কাব্যের একটি অধ্যায় রচিত হয়েছে। কবির মৃত্যুদিন জাতীয় জীবনে যে শূন্যতার সৃষ্টি করেছিল, তাকে কবিরা বেদনার অশ্রু অর্ঘ্যে আরতি করেছেন—

শুচিশুভ্র মেঘমালা ঘনীভূত হবে যেথা মোদের অন্তরে,
অমল তুষার পুঞ্জে বিরচিবে হে সুন্দর তব মুখচ্ছবি।
(রবীন্দ্রস্মৃতি : সুরেন্দ্রনাথ মৈত্র)

যতীন্দ্রনাথ সেনগুপ্তের '২২শে শ্রাবণ, ১৩৪৮' ও মোহিতলালের 'তর্পণ'—কবিতা দুটি সংকলিত হয়ে 'বিলাপ' অংশটির গৌরব বৃদ্ধি করেছে। যতীন্দ্রনাথ সেনগুপ্তের কবিতাটির আঙ্গিক চাতুর্য ও সুরবৈচিত্র্য লক্ষণীয়। রবীন্দ্রকাব্যের বাক্যাংশগুলি নিয়ে গদ্যাত্মক ভঙ্গিতে কবিতাটি রচিত হয়েছে। মোহিতলালের কবিতায় দীর্ঘবিতানিত ছন্দ, শব্দগাঢ় পদবিন্যাসের মন্থরতা এক দার্শনিক মননশীলতায় মণ্ডিত হয়েছে। কবিতাটি রবীন্দ্রমানসের কাব্যভাষ্যও বটে। উমা দেবী ও শশিভূষণ দাশগুপ্তের কবিতায়ও রবীন্দ্র-কাব্যের রূপময় ব্যাখ্যা উদ্ভাসিত হয়েছে। রবীন্দ্রশতবার্ষিক উৎসবের ব্যর্থমূর্তি কোনো কোনো তরুণ কবিকে পীড়িত করেছে—তবুও তীক্ষ্ণ জিজ্ঞাসায় বিশ্বাস রেখেছেন আধুনিক কবি—

তবু আসবে তুমি ভাবি অন্য মনে
এই পোড়ো জমি ভেঙে অন্যতর সকাল বেলায়
ঘরভরা শূন্যতা সরিয়ে দীপ্তপূর্ণ;
কিন্তু কবে?
দ্বিতীয় ভারতবর্ষে দ্বিশতবার্ষিক উৎসবে॥
(শতবর্ষ পরে : কল্যাণকুমার দাশগুপ্ত)

সংকলনের কয়েকটি কবিতা সুরস্বাতন্ত্র্যের জন্য বিশেষ উল্লেখের দাবি রাখে। তার মধ্যে হলো : ২২শে শ্রাবণ স্মরণে (পরিমল গোস্বামী) ও বাইশে শ্রাবণ (সজনীকান্ত দাশ)। পরিমল গোস্বামী 'আমি যদি জন্ম নিতাম কালিদাসের কালে' কবিতার একটি চমৎকার প্যারোডি করেছেন। সজনীকান্ত দাশের কবিতার বাগ্‌বৈদগ্ধ্য ও আপাতবিরোধী তির্যক মন্তব্যটি যেমন তীক্ষ্ণ, তেমনি লক্ষ্যভেদী—

যাঁহারে হনন করি তুমি হবে চিরজীবী, অনাদৃত বাইশে শ্রাবণ,
তাঁহার বিয়োগ ব্যথা যতদিন বাজে বুকে ততদিন তোমারে ধিক্কার—
কৃষ্ণের চরণমূলে যে ব্যাধ হানিল বাণ সে লভিল অমর জীবন,
মহৎ জীবনে এক টানিলে সমাপ্তি রেখা, সাহসী, তোমারে নমস্কার।

"কবি-প্রণাম" সংকলনটি থেকে বাংলা কাব্যের গতিপ্রকৃতির পরিচয় পাওয়া যাবে। সম্পাদক তাঁর ভূমিকায় যা বলেছেন তার যাথার্থ্য অনস্বীকার্য : 'জীবনযাত্রা ও প্রতিবেশ দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের পরে বহুলাংশে পরিবর্তিত হয়েছে, দেশ ও কালের এই পরিবর্তনের সঙ্গে কবিতাগুলির ভাব, ধ্বনি ও বাচনভঙ্গী বহুল পরিবর্তিত হয়েছে সন্দেহ নেই, কিন্তু

সূক্ষ্মভাবে বিচার করলে দেখা যাবে যে অধিকাংশ কবিতারই অন্তর্নিহিত প্রভাব রাবীন্দ্রিক।'

রথীন্দ্রনাথ রায়

**রবীন্দ্রনাথ**—দেবীপদ ভট্টাচার্য সম্পাদিত। ইস্টলাইট বুক হাউস। মূল্য দশ টাকা।

রবীন্দ্রজন্মশতবর্ষ পূর্তি উপলক্ষে অজস্র রচনা চোখে পড়েছে, খ্যাত অখ্যাত নবীন প্রবীণ বহু লেখকই কবির প্রতিভার পরিমাপে নিযুক্ত হয়েছেন, কখনো আত্মনিযুক্ত কখনো বা প্রকাশক-নিযুক্ত। যে সমস্ত লেখা পড়েছি, তাদের অধিকাংশ হয় লেখকের পূর্বতন বক্তব্যের পুনরাবৃত্তি (কোন কোন ক্ষেত্রে পুনর্মুদ্রণ) কিংবা নতুন কিছু বলবার মোহে ন্যায়সূত্র-ছিন্ন কতকগুলি বাক্যের সমাহার। কিছু উল্লেখযোগ্য রচনা যে পড়িনি, তা নয়, তবে তাদের সংখ্যা নগণ্য।

"রবীন্দ্রনাথ" নামধেয় এই সংকলনগ্রন্থ 'পশ্চিমবঙ্গ কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয় অধ্যাপক সমিতি'র উদ্যোগে প্রকাশিত। এবং অধ্যাপক দেবীপদ ভট্টাচার্য সম্পাদিত এই গ্রন্থে যাঁদের রচনা সঙ্কলিত হয়েছে, তাঁদের অনেকেই "রবীন্দ্রায়ণ" ও অন্যান্য সংকলন-গ্রন্থেও অংশগ্রহণ করেছেন। স্বভাবতঃই তাঁরা তথাকথিত লব্ধপ্রতিষ্ঠ অধ্যাপক কিংবা সাহিত্যিক (সংখ্যায় অধ্যাপকই বেশি)। বর্তমান সংকলনে অবশ্য এমন কয়েকজন উপস্থিত, যাঁদের রচনা আগে বিশেষ পড়িনি। কিন্তু বলতে ভালো লাগছে তাঁদের কারো কারো রচনায় আন্তরিকতার, আত্মবিশ্বাসের ও সর্বাঙ্গীণ রচনাসৌষ্ঠবের পরিচয় পেয়েছি।

সংকলনের দুই প্রান্তে দু জন প্রথিতযশা অধ্যাপক—সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় এবং সরোজকুমার দাস, প্রথমজন লিখেছেন 'বাক্‌পতি রবীন্দ্রনাথ', দ্বিতীয়জন 'রবীন্দ্রনাথের জীবনদর্শন'। শ্রীযুক্ত চট্টোপাধ্যায়ের মতে রবীন্দ্রনাথের ভাষাবিষয়ক সাধনা 'পেশাদার ভাষা-তাত্ত্বিকের মত ছিল না' কিন্তু তা যে 'অনন্যসাধারণ' ছিল 'তাহার পরিচয় তাঁহার বাঙ্গালা ভাষা এবং বাঙ্গালা ছন্দ বিষয়ে আলোচনায় ভূরি ভূরি আছে।' তাঁর মতে, 'রবীন্দ্রনাথের ভাষার উপর অধিকার এবং ভাষার প্রকৃতি সম্বন্ধে অন্তর্দৃষ্টি বিবেচনা করিলে, সত্যই তাঁহাকে বাক্‌পতি বলিয়া সংবর্ধনা করিতে হয়।'

রবীন্দ্রপ্রতিভা যে কতখানি সর্বস্ধর কত বিচিত্রপথগামী ছিল পাঠক তার কিছুটা পরিচয় যেমন পাবেন প্রবীণ ভাষাচার্য সুনীতিকুমারের লেখায়, তেমনি পাবেন নবীন অধ্যাপক দীপংকর চট্টোপাধ্যায়ের নিবন্ধে। 'রবীন্দ্রনাথের বিজ্ঞান-চেতনা'র লেখকও 'রবীন্দ্রনাথ বিজ্ঞানের ছাত্র ছিলেন না...তিনি ভালভাবেই জানতেন, এ পথের সাধনা স্বতন্ত্র এবং সিদ্ধিও ভিন্ন ধরনের' উক্তি সত্ত্বেও কবির "বিশ্বপরিচয়"গ্রন্থকে বিশিষ্ট রচনার মর্যাদা দিয়েছেন; বলেছেন 'বিশ্বপরিচয়ের মত একটি চটি বইয়ের রচয়িতা হিসেবে নিজের পরিচয় দিতে অনেক কৃতী বিজ্ঞানীও লজ্জিত হতেন না।' অর্থাৎ রবীন্দ্রনাথ মূলত সাহিত্যস্রষ্টা হলেও বিজ্ঞানমনস্ক ছিলেন, 'বৈজ্ঞানিক অনুশীলনপদ্ধতি সম্বন্ধে' বিশেষ আস্থাবান ছিলেন এবং "বিশ্বপরিচয়" রচনাতেই শুধু নয়, শান্তিনিকেতনের শিক্ষাব্যবস্থাতেও বিজ্ঞানকে উপযুক্ত স্থান দিয়ে তাঁর বিজ্ঞানচেতনার প্রমাণ দিয়ে গেছেন।

কি সম্পর্কে না ভেবেছেন রবীন্দ্রনাথ? সঙ্গীততত্ত্ব, ইতিহাস, শিক্ষাতত্ত্ব এমন কি সমবায়-নীতি পর্যন্ত। মনে পড়ে সম্রাট সমুদ্রগুপ্তকে তাঁর সভাকবি হরিষেণ 'নিশিত-বিদগ্ধমতি' বিশেষণে ভূষিত করেছিলেন, এই বিশেষণ একালে রবীন্দ্রনাথ ছাড়া আর কাকে সার্থকভাবে প্রযোজ্য? রবীন্দ্র-চিন্তার বিভিন্ন দিক সম্পর্কে আরও কয়েকটি রচনার উল্লেখ করতে হয়; যেমন, সুধীরচন্দ্র রায়ের 'রবীন্দ্রনাথের শিক্ষাতত্ত্ব ও শিক্ষাদর্শ,' এবং প্রিয়তোষ মৈত্রেয়র 'রবীন্দ্রনাথের আর্থনীতিক চিন্তা'। দুটি প্রবন্ধই তথ্যনিষ্ঠ ও সুলিখিত। প্রথম-জনের 'রবীন্দ্রনাথের শিক্ষাতত্ত্ব ও আদর্শ রবীন্দ্রনাথেরই মানসিকতার সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ' উক্তিটি যতখানি সত্য ঠিক ততখানিই সত্যগর্ভ দ্বিতীয় জনের মন্তব্য যে রবীন্দ্রনাথের অর্থনীতি-প্রাসঙ্গিক রচনায় 'ঔপনিষদিক মানবতাবাদ ও প্রগতিশীল অর্থনৈতিক চিন্তার সমাহৃত রূপ' পরিদৃশ্যমান।

সঙ্গীতের ক্ষেত্রে রবীন্দ্রনাথের পদচারণার ইতিহাস এতই সুবিদিত যে সে সম্পর্কে নতুন কোন কথা বলা সহজ নয়। তবে রবীন্দ্রনাথের সংগীত-চিন্তা সম্পর্কে কিছু জানবার কৌতূহল হয়। ঠিক এই বিষয় অবলম্বী কোন নিবন্ধ আলোচ্য সংকলনে অনুপস্থিত। তবে কাজী মোতাহার হোসেনের 'রবীন্দ্রসঙ্গীত' এবং অমিয়রঞ্জন বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'উচ্চাঙ্গ সঙ্গীতে রবীন্দ্রনাথ' একত্রে মিলিয়ে পড়লে সাধারণভাবে রবীন্দ্রসঙ্গীত সম্পর্কে উল্লেখ্য তথ্য ও তত্ত্বগুলি জানা যায়। বিশেষ করে শেষোক্ত প্রবন্ধ অর্থাৎ 'উচ্চাঙ্গ সঙ্গীতে রবীন্দ্রনাথ' প্রাসঙ্গিক তথ্য ও তথ্যের সার্থক সমন্বয়ে বিশিষ্ট রচনা বলে দাবি করতে পারে।

রবীন্দ্রচিত্রকলা সম্পর্কে প্রবন্ধ আছে। নাম 'দস্তুর সভ্যতার শিল্পী রবীন্দ্রনাথ', লিখেছেন সুমন্ত বন্দ্যোপাধ্যায়। লেখাটিতে চিত্রকর রবীন্দ্রনাথকে নতুনভাবে বিচার করার যে-চেষ্টা আভাসিত সেটা ভালোই। তাঁর মতে '১৯৩০ পর্যন্ত সুপরিচিত কবি রবীন্দ্র-নাথের সাহিত্যজগতে যে ভূমিকা, তার সঙ্গে পরবর্তী দশকের চিত্রশিল্পী রবীন্দ্রনাথের আত্মীয়তাটা দূর সম্পর্কের' এবং এই মতের সমর্থনে তিনি ১৯৩০-এর পরবর্তী কবিতা থেকে ইতঃস্ততভাবে অংশ উদ্ধৃত করে দেখাবার চেষ্টা করেছেন যে 'এ যুগের কবিতা ও ছবিতে ব্যবহৃত চিত্রকল্পগুলি আত্মীয়তাসূত্রে পরস্পরাবদ্ধ।' তাঁর এ মন্তব্য অর্থহীন এমন কথা বলছি না, কিন্তু জ্যামিতির উপপাদ্যের মত স্বীয় বক্তব্যকে প্রতিষ্ঠা করবার যে-প্রয়াস তাঁর নিবন্ধে বিদ্যমান, তা সমর্থনীয় নয়। দুটি প্রশ্ন তাঁকে করি : প্রথম, রবীন্দ্রচিত্র-ধৃত যে ফ্যান্টাস্টিক জন্তুর বা বীভৎসরসের কিংবা অবচেতনলোকের যে নিঃশব্দ প্ররোচনার কথা তিনি বলেছেন, তাদের সাহিত্যগত সমান্তর কি শুধু ১৯৩০-পরবর্তী কবিতাবলীতেই অনুসন্ধেয়? ১৯১৬ সালে প্রকাশিত "চতুরঙ্গ" উপন্যাসে পাঠক যে 'আদিমকালের প্রথম সৃষ্টির প্রথম জন্তু'র (কবির বর্ণনায় : 'তার চোখ নাই, কান নাই, কেবল তার মস্ত একটা ক্ষুধা আছে'; শচীশের ডায়েরির অন্তর্গত) সাক্ষাৎ পায়, সেই জন্তুই ১৯৩০-পরবর্তী রবীন্দ্রচিত্রে কি বিভিন্নভাবে প্রকাশ করে নি? দ্বিতীয়, "বলাকা" বা বলাকাপর্বেই কি কঠোর, পরুষ, অনেক সময় ভয়ঙ্কর রূপক বা চিত্র (চিত্রকল্প কথাটি আমার কাছে অর্থহীন বোধ হয়) আত্মপ্রকাশ লাভ করে নি (যেমন, কালো রাতের কালি-ঢালা ভয়ের বিষম বিষে আকাশ যেন মূর্ছি পড়ে সাগরসাথে মিশে : বলাকা ৫; সন্ধ্যাবেলা এসেছিলে যেন মৃত্যুদূত জ্বালায়ে মশাল-আলো : বলাকা ৪২; পক্ষান্তরে, ১৯৩০-পরবর্তী কবিতাবলীতে কি এমন উদাহরণ নেই যা 'পুরোন কাব্যের চেনা রূপক ও প্রতীকের সুকুমার মার্জিত জগত'-এর (উদ্ধৃতি চিহ্নান্তর্গত অংশ সুমন্ত বন্দ্যোপাধ্যায়ের)? "পুনশ্চ" গ্রন্থের 'সুন্দর' বা

"আরোগ্য" গ্রন্থের 'মধুময় পৃথিবীর ধূলি' ইত্যাদি কি চিরন্তন মানবিক মূল্যবোধ এবং সত্য ও সুন্দরের ধ্রুপদী ঐশ্বর্যে কবির আস্থানির্ভরতার পরিচয়বাহী নয়? সারত, রবীন্দ্রনাথের মত প্রতিভাদের ক্ষেত্রে ঘটনামাত্রই দুয়ে দুয়ে চার হয়ে দেখা দেয় না। তাঁদের ক্ষেত্রে বিচার করতে হবে তাঁদের সার্বিক ও সামগ্রিক ব্যক্তিত্বের পরিপ্রেক্ষিতে। অবশ্য শ্রীবন্দ্যোপাধ্যায়ের সিদ্ধান্ত যে-প্রেমিস থেকে জাত তা হল সাহিত্যিক ও চিত্রকর রবীন্দ্রনাথ সম্পূর্ণ বিভিন্ন দুই ব্যক্তিত্ব এবং এ ধরনের ভ্রান্ত ধারণার সৃষ্টির জন্যে কবি নিজেই মুখ্যত দায়ী (তাঁর উক্তি: কবিতার রবীন্দ্রনাথ আর ছবির রবীন্দ্রনাথ এক নয়)। তবে আগেই বলেছি, চিত্রী রবীন্দ্রনাথকে নতুনভাবে বিচার করার চেষ্টার জন্যে লেখক প্রশংসা পেতে পারেন এবং রবীন্দ্রজীবনের শেষ দশ বছরের সাহিত্য-ও চিত্র-ফসলের মধ্যে সম্পর্ক লক্ষণীয় রকমের।

"রবীন্দ্রনাথ" সংকলনে রবীন্দ্রনাথের ইতিহাস-চিন্তা সম্পর্কে কোন রচনা নেই। রবীন্দ্রনাথের ইতিহাস প্রাসঙ্গিক রচনাগুলি কি মনোযোগের যোগ্য নয়? না কি 'পশ্চিমবঙ্গ কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয় অধ্যাপক সমিতি'তে সাহিত্যমনা কোন ইতিহাসের অধ্যাপক নেই? তেমনি নেই রবীন্দ্রনাথের উপন্যাসগুলি সম্বন্ধে সামগ্রিক কোন আলোচনা। শিশির চট্টোপাধ্যায়ের 'রবীন্দ্রনাথের দুখানি উপন্যাস' প্রবন্ধটি "চতুরঙ্গ" ও "ঘরে বাইরে"-কে কেন্দ্র করে গড়ে উঠেছে। স্বভাবতঃই ঐ প্রবন্ধ রবীন্দ্রনাথের উপন্যাসের প্রতিপ্রকৃতি, মানবচরিত্রায়ণ, জীবনের বিভিন্ন সমস্যার রূপায়ণ ইত্যাদি বিষয়ে সামগ্রিক কোন ধারণা পেতে সাহায্য করে না। এ জন্য অবশ্য লেখক দায়ী নন। প্রবন্ধটি পড়ে ভালো লাগার কারণ তাতে আমি আমার একটি ব্যক্তিগত মতের সমর্থন পেয়েছি। সেটি "চতুরঙ্গ" বিষয়ে। "চতুরঙ্গ" আমার মতে বাংলা সাহিত্যের একটি অবিস্মরণীয় উপন্যাস, তথাকথিত মনস্তত্ত্বপ্রধান বাংলা উপন্যাসে একটি অপরিহার্য দিকস্তম্ভ। উপন্যাস রচনার রীতিবিচারে যাঁরা "চতুরঙ্গ"কে আংশিকত্বের লক্ষণাক্রান্ত বলেছেন, তাঁদের স্মরণ করিয়ে দিতে চাই একটি বিশিষ্ট রচনারীতি সর্বত্র প্রযোজ্য হতে পারে না, বিষয়ভেদে উপন্যাসের মাধ্যমভেদ হয়, "গোরা"র আদর্শে "চতুরঙ্গ" রচনা সম্ভব হয় না।

আলোচ্য সংকলন-গ্রন্থে রবীন্দ্রসাহিত্য-বিষয়ক অন্যান্য রচনার মধ্যে উল্লেখযোগ্য অমলেন্দু বসুর 'হৃদয়ের অসংখ্য পত্রপুট'। সাম্প্রতিক বাংলা প্রবন্ধ-সাহিত্যের বিশিষ্ট ব্যক্তিত্ব অধ্যাপক বসু কবির রচনাবলীর বিভিন্ন অংশ উদ্ধৃত করে প্রমাণ করতে প্রয়াস পেয়েছেন যে 'রবীন্দ্রনাথের সৃজনীচিত্ত বিষয়মগ্ন ও আত্মমগ্ন।' বিভিন্ন সংকলনে ও পত্রপত্রিকায় রবীন্দ্রনাথ সম্পর্কে অধ্যাপক বসুর প্রবন্ধ পড়ে মনে হয়েছে রবীন্দ্রশতবর্ষপূর্তি-উৎসবে বাংলা প্রকাশনজগত আর কিছুর জন্যে না হোক একজন সমর্থ রবীন্দ্রসাহিত্য-ব্যাখ্যাতাকে উপস্থিত করার জন্যে ধন্যবাদ পেতে পারেন। অপর উল্লেখ্য রচনা সম্পাদক দেবীপদ ভট্টাচার্যের 'চরিতসাহিত্য ও রবীন্দ্রনাথ', যার প্রতিপাদ্য 'তাঁর জীবনীমূলক প্রবন্ধগুলি subjective বা ভাবগত-সত্যদৃষ্টি মণ্ডিত।' নীহাররঞ্জন রায়ের 'রবীন্দ্রনাথের মানবিকতা' এবং সরোজকুমার দাসের 'রবীন্দ্রনাথের জীবনদর্শন' প্রবন্ধদ্বয়ও আলোচ্য সংকলনের সমৃদ্ধি এনে দিয়েছে।

পরিশেষে, "রবীন্দ্রনাথ" নামীয় সংকলন-গ্রন্থটি রবীন্দ্রজন্মশতবর্ষপূর্তি উপলক্ষে প্রকাশিত ঐ জাতীয় অজস্র সংকলন-গ্রন্থের মধ্যে বিশিষ্ট উল্লেখের দাবি রাখে।

**কল্যাণকুমার দাশগুপ্ত**

**মহামানবের সাগর তীরে।** জ্যোতিষচন্দ্র ঘোষ সম্পাদিত। নিখিল ভারত বঙ্গভাষা প্রসার সমিতি, কলিকাতা ২০। মূল্য চার টাকা।

রবীন্দ্রনাথের জন্মশতবার্ষিকী উপলক্ষে এদেশের প্রাত্যহিকতা যেন নির্ভার হয়েছে, দিন-রজনীর রং কিছু বদলেছে—এমন মনে হওয়া স্বাভাবিক। মনে হওয়া স্বাভাবিক, কয়েক দশক আগে যেমন দেখা গেছে তেমন রবীন্দ্রগতপ্রাণ এখন হয়ত ক্রমেই বিরলদৃষ্টান্ত, তবু রবীন্দ্রপ্রতিভার সহৃদয়বিদগ্ধ অথচ নির্মোহ সত্যানুসন্ধানে এই কালও সানন্দে মগ্ন। গত কয়েক মাসে প্রকাশিত অজস্র সংকলনগ্রন্থ তার প্রমাণ। এই সব সংকলনগ্রন্থ যাঁরা সাগ্রহে পড়েছেন তাঁরা নিশ্চয়ই লক্ষ্য করেছেন যে, একটিমাত্র সংকলনগ্রন্থে রবীন্দ্রচারিত্র্য উন্মোচন বাতুল কল্পনা। এর ফলে যেসব সংকলনের অন্তর্গত প্রবন্ধে এযাবৎ অনালোচিত অথবা অগভীর আলোচনায় অপূর্ণ বিভিন্ন রবীন্দ্রপ্রসঙ্গ গভীর ও ব্যাপক সত্যাশ্রয়ী বিশ্লেষণে পূর্ণাঙ্গ হয়েছে শুধু সেই সংকলনগুলি সঙ্গত কারণেই সশ্রদ্ধ স্বীকৃতি পেয়েছে।

নিখিল ভারত বঙ্গভাষা প্রসার সমিতি কর্তৃক প্রকাশিত এই সংকলন গ্রন্থটির বিশেষ মূল্য নির্দ্ধিধায় স্বীকার্য। অ-বঙ্গভাষী ভারতীয় ও বিদেশীদের বাঙলা ভাষায় রচিত রবীন্দ্র-প্রশস্তি গ্রন্থখানিতে সংকলিত। অ-বাঙলাভাষী ভারতীয় ও বিদেশীদের যে সব গদ্য ও পদ্য রচনা এই গ্রন্থে স্থান পেয়েছে তার মধ্যে কিছু কিশোরোচিত হলেও কয়েকটি প্রবন্ধ বৈদগ্ধ্যের লক্ষণাক্রান্ত। অন্তত সেই ক'টি প্রবন্ধকে শুধু সস্নেহে গ্রহণ করার কোন কারণ নেই। দেবপ্রিয় বলিসিনহার 'বুদ্ধপ্রেমী রবীন্দ্রনাথ', পিয়ের ফালোঁর 'একটি নমস্কারে', এস কৃষ্ণমূর্তির 'জীবনস্মৃতির ছেলেবেলা', এন রুক্মিণী স্বামীর 'গীতাঞ্জলির মর্মকথা', উমাশঙ্কর যোশীর 'কুমু একটি পাখি' এবং আরও দু'একটি প্রবন্ধে প্রসঙ্গ-বিশ্লেষণ গভীর। কয়েকজন প্রবন্ধকারের বাক্যগঠন ও শব্দবাছাই নিপুণ। কুমারী তান ওয়েনের 'রবীন্দ্রনাথ ও চীন' তার একটি উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত। সামগ্রিকভাবে প্রত্যেকটি প্রবন্ধে এই প্রত্যয় প্রকাশিত যে, রবীন্দ্র-নাথের প্রসারিত দৃষ্টি ভৌগোলিক সীমানিরপেক্ষ।

অধ্যাপক হুমায়ুন কবির ও শ্রীজ্যোতিষচন্দ্র ঘোষ লিখিত ভূমিকা দুটি বইটির সম্পদ।

**সুধাংশু ঘোষ**

ত্রয়োবিংশতিতম বর্ষ চতুর্থ সংখ্যা

মাঘ-চৈত্র ১৩৬৮

# সাহিত্য ও আধুনিক জীবন

## অলড্যুস হক্সলি

সাহিত্য জীবনকে আর জীবনই বা সাহিত্যকে কিভাবে, কতখানি স্পর্শ করে—এ প্রশ্নের জবাব দেবার আগে এই বাক্যগুলির সংজ্ঞা নিরূপণের চেষ্টা করা যাক। সাহিত্য বলতে এই প্রসঙ্গে কি বোঝায় আর যে জীবন সাহিত্যকে স্পর্শ করে আবার সাহিত্য স্বারা নিয়ন্ত্রিত হয়, সেই জীবনটা ঠিক কাদের, এইটাই আসল জিজ্ঞাস্য।

ইতিহাসের গতিনির্ধারণ করে অনেকগুলি জিনিস, যার মধ্যে মুখ্য হল যন্ত্র-শিল্পবিজ্ঞান, আর্থিক বিধিব্যবস্থা, যাঁরা গুরুত্বপূর্ণ পদ অধিকার করে আছেন সেই সব বড় বড় ব্যক্তির কার্যকলাপ, এবং ভাব-সমষ্টি। সমস্ত চিন্তা ও ধারণাকেই সাহিত্য নামে চিহ্নিত করা যেতে পারে, যখন লেখায় বা স্মরণীয় ভাষায় তাদের একটা বিধিবন্ধ প্রকাশরূপ দেওয়া যায়। তবে 'শব্দরূপী ভাব-বস্তু'—সাহিত্যের এই সংজ্ঞা এতই ব্যাপক ও বৃহৎ যে আমাদের সাধারণ প্রয়োজনে সেটা তেমন কাজে লাগার মতো নয়। লক্, হেগেল, মার্ক্স ও লেনিনের রচনাবলী ইতিহাসের মোড় ঘুরিয়েছে, এবং সরাসরি লক্ষ লক্ষ মানুষের জীবনকেও সেই সূত্রে প্রভাবিত করেছে। কিন্তু ধরা যাক্, মানুষের সঙ্গে মানুষের সম্পর্ক সম্বন্ধে শেক্সপীয়রের যা ধারণা ও মনোভাব কিংবা প্রকৃতি সম্পর্কে ওয়ার্ডসওয়ার্থের যে অনুভূতি ও জল্পনা, তাদের প্রকাশ-রূপকে আমরা যে নাম ও সংজ্ঞা দিয়ে থাকি, অধ্যাত্মবিদ্যা বা অতি-বিজ্ঞান-বিষয়ক ভাবনার ও রাষ্ট্রদর্শনের ভাষা বা বাক্যরূপগুলিকে যদি আমরা সেই অভিধায় চিহ্নিত করি, তা হলে সেটা নিতান্তই অচল হয়ে দাঁড়ায়। এর পরে যা বলব, সেখানে 'সাহিত্য'কে শব্দটির ঐ শেক্‌সপীয়রের ও ওয়ার্ডসওয়ার্থের অর্থেই প্রয়োগ করব।

এই সীমিত অর্থে, সাহিত্যকর্মের ভিতর থাকতে পারে, অন্যান্য বিষয়ের মধ্যে দার্শনিক ও রাষ্ট্রিক চিন্তার অতি উজ্জ্বল প্রকাশ, অর্থাৎ সেই সব ভাবধারা যা ইতিহাস-নির্মাণে সাহায্য করেছে, মানুষের সামাজিক পরিবেশে পরিবর্তন ঘটিয়ে ব্যক্তিজীবনকে স্পৃষ্ট ও প্রভাবিত করেছে। বহুকাল ধরেই নানা কবি, নাট্যকার, ঔপন্যাসিক ও প্রবন্ধ-লেখক এই সব চিন্তা ও ভাবনার প্রবর্তনে আপনাদের বিশিষ্ট ক্ষমতা নিযুক্ত করেছেন। কোনও কোনও ক্ষেত্রে তাঁদের প্রচেষ্টা সার্থক হয়েছে, কখনও বা সম্পূর্ণভাবেই ব্যর্থ হয়েছে। যেমন রুশোর

রাষ্ট্রিক চিন্তা ইতিহাসে দাগ রেখে গেছে, কিন্তু দান্তের ক্ষেত্রে সে কথা বলা যায় না। কিংবা আর একটি সাম্প্রতিক উদাহরণ দেওয়া যাক। এইচ্. জি. ওয়েল্‌স তাঁর সময়-কালে বোধ হয় সব চেয়ে প্রশংসিত লেখক ছিলেন এবং তাঁর লেখাও খুব ব্যাপকভাবে অনূদিত হয়েছিল। পৃথিবীর সর্বত্র বহু লোক তাঁর অনেক বই পড়েছেন। কিন্তু যে মানবিকতা যে স্বাধীন চিন্তা ও যুক্তিনিষ্ঠ আন্তর্জাতিকতাবাদ তিনি নিপুণভাবে নিয়ত প্রচার করে গেছেন, তা আমাদের এই শতকের ইতিহাসে তেমন কোনও উল্লেখযোগ্য ফল রেখে যায় নি—প্রসঙ্গতঃ যে ইতিহাসকে বলা যায়, জাতীয়তাবাদের উগ্র উপাসনা এবং একনায়কত্বের ক্রমিক বৃদ্ধিরই ইতিহাস। 'ফ্যান্টাসি'-লেখক হিসাবে ওয়েলসের যেমন পরম সাফল্য, বিশ্বজনীনতার পুরোধা আর উদার বুদ্ধিবাদের অক্লান্ত সমর্থক ও কর্মী হিসাবে তেমনই তাঁর চরম ব্যর্থতা।

সমস্ত কিছু বিবেচনা করে আমরা এই সিদ্ধান্তে আসতে পারি যে সাহিত্যিক ক্ষমতা আর প্রচারকর্মের সফলতা, এ দুয়ের মধ্যে সমানুপাত সম্পর্ক নেই। প্রতিভা যত বড়ই হোক, ইতিহাসের পরিবর্তন-ক্ষম কোনও মত বা চিন্তাকে সর্বজনগ্রাহ্য করে তোলার অংগীকার দিতে সে অপারগ। বস্তুতঃ প্রতিভার স্পর্শই সে চিন্তার সাধারণ স্বীকৃতির বিপক্ষে বাধা সৃষ্টি করতে পারে। ধর্মীয়, রাষ্ট্রীয় কিংবা ব্যবসায়িক প্রচারকর্মের বেলায় সুন্দর ভাষা, সুকুমার বোধশক্তি, ভাবের গভীরতা বা সূক্ষ্মতা, কিছুরই প্রয়োজন হয় না। যা দরকার তা হচ্ছে, যে ভাবটা মনের মধ্যে ঢোকাতে হবে, তারই মূল ও স্থূল কথাগুলোকে কয়েকটা বাঁধা বুলির মাধ্যমে বারবার বলে যাওয়া। এই পুনরাবৃত্তি ও অতি-সরল কথনেও অনেক সময় ফল পাওয়া যায় না। তার সংগে চাই অনুকূল অবস্থা এবং যাদের সহজে বোঝানো যায় না, তাদের মত ঘোরানোর জন্য অনেক ক্ষেত্রে দরকার হয় কখনও ইংগিতে কখনও প্রকাশ্যে বল-প্রয়োগের ভয় দেখানো। আর প্রতিভাধর ব্যক্তিদের যে সব চিন্তা ও ভাব শেষ পর্যন্ত সাধারণ লোকের কাছে গ্রাহ্য হয় এবং ইতিহাসের গতিপথ বদলে দেওয়ার মত ক্ষমতা অর্জন করে, তাদের অধিকাংশই হল দ্বিতীয় বা তৃতীয় হাত-ফেরৎ এবং ব্যাখ্যাকারীদের মুখে মূল ধারণাবস্তুর বিকৃত ব্যংগ-রূপ ছাড়া বেশি কিছু নয়।

ল্যাটিন ভাষায় Vates কথাটি কবি ও ভবিষ্য-দ্রষ্টা উভয়কেই বোঝায়। ঐতিহাসিক সত্য হিসাবে বলা চলে যে একাধিক মহৎ কবি উচ্চ আদর্শের স্রষ্টা, বলিষ্ঠ প্রত্যয় ও বিশ্বাসের সমর্থক, পাপের অমংগলের নির্মম সমালোচক, কল্যাণের সদ্ধর্মের মহান্ উদ্‌গাতা হিসাবেও স্মরণীয় হয়ে আছেন। তবু এ কথাও মানতে হবে যে প্রফেটের কাজ আর কবি-কর্ম মূলতঃ সম্পূর্ণ পৃথক্। বিজ্ঞদর্শনের ভিত্তি ঔচিত্যজ্ঞানে, তার কারবার ধর্মভাব ও বোধগম্যতার সংগে। ভূয়োদর্শীকে জোর গলায় বলতে হয়, আপাতদৃষ্টিতে বিপরীত মনে হলেও, সব-কিছুর মধ্যে একটা ঐশ্বরিক পরিকল্পনা, বিশ্বসৃষ্টির এক পরম উদ্দেশ্য রয়েছে। আর কাব্য এবং সাধারণতঃ সব ভাল সাহিত্যই যা সৎ অর্থাৎ বিদ্যমান তাকে নিয়েই জড়িত, যা হওয়া উচিত তার সংগে নয়। তার বিষয়বস্তু হল শুধু জীবনের, অস্তিত্বের অবর্ণনীয় রহস্য। নিখিলের নর-নারীর মধ্যে যে অপার সম্ভাবনা আছে, যত রকম দোষ ও গুণ, উজ্জ্বল বুদ্ধি-শক্তি আবার তমোময় আত্মঘাতী নির্বুদ্ধিতা, মরমী অন্তর্দৃষ্টি আর অতিকায় কুসংস্কারের ঘৃণ্য প্রীতি—সেই সব বিচিত্র শক্তি ও সম্ভাবনাই তার স্বক্ষেত্র। অধ্যাত্মজীবনের সকল গুরুর উপদেশ হল 'আত্মানং বিদ্ধি'। এই অপরিহার্য অত্যাবশ্যক স্বজ্ঞান বা আত্ম-বোধের দিকে আমাদের এগিয়ে নিয়ে যাওয়াই হচ্ছে সাহিত্যের উদ্দেশ্য এবং প্রধান কাজ। যাঁরা Vates তাঁরা প্রসংগতঃ কিছু ভবিষ্য-দর্শন করান—হয় ঈশ্বরের নামে, নয়তো সমাজ-

বিজ্ঞান বা ইতিহাসের দোহাই দিয়ে। কিন্তু যতক্ষণ পর্যন্ত তিনি মুখ্যতঃ আত্মসন্ধিৎসু না হচ্ছেন, মানব-অভিজ্ঞতার বিচিত্র বৈষম্যের মধ্যে তাঁর দৃষ্টিপ্রবেশকে অপর হৃদয়ে সঞ্চারিত করতে না পারছেন, ততক্ষণ পর্যন্ত তিনি কেবল আলংকারিক শুধু প্রচারবিৎ থেকে যান। প্রকৃত কবি তাঁকে বলা যাবে না।

একটি ভালো কবিতা, বলতে গেলে ভালো সাহিত্যের যে কোনো নমুনা সব সময়েই একটি বিবৃতি—ডাঃ জনসনের ভাষায় যা আপাতসরল না হলেও প্রথম প্রকাশেই অকৃত্রিম সত্য বলে স্বীকৃতি পায়। আর যারা এর সন্ধান পায়নি, তারাও আশ্চর্য হয় ভেবে, এ জিনিস কেমন করে তাদের নজর এড়িয়ে গেছে। কিন্তু হায়, এতদিন যে দৃষ্টিগোচর হয়নি, তার কারণগুলি তো খুব সোজা! বেশির ভাগ লোক নিজেদের সম্বন্ধে খুব কম কথাই জানে। অনন্যসাধারণ নারী ও পুরুষেরা আত্মবীক্ষার ফলে জানতে ও বুঝতে পারেন—তাঁরা কি দেখেন ভাবেন ও অনুভব করেন, তাঁদের আচরণের পিছনে কি যুক্তি আছে—তাঁদের দেহ-মন-সত্তার বিচিত্র বাস্তব সত্য থেকে তাঁদের স্বনির্বাচিত অথবা পরিবেশ-নির্ধারিত জীবনের সুনির্দিষ্ট ছকটা কতখানি তফাত। গভীর ব্যঞ্জনা-উদ্রেকী ভাষায় সৎসাহিত্য পরিস্ফুট করে তোলে ঐ সব আত্মবীক্ষার ফলাফল, অভিজ্ঞতার উত্তরণ। যাঁরা এই জাতের সাহিত্যের সংস্পর্শে আসেন, তাঁরা অনেকটা ঐ লেখকের মতই আত্মসন্ধান-ক্রিয়ায় উদ্দীপিত হন। আত্মার সঙ্গে দেহের, চেতন সত্তার সঙ্গে অবচেতন মনের, নিজের সঙ্গে অপরের,—প্রকৃতির, সমাজ-প্রতিষ্ঠানের ও সাংস্কৃতিক পরিবেশের যে সব সম্পর্ক লেখক খুঁজে বার করেছেন, তার অন্ততঃ কিছুটা বাদ-সাদ দিয়েও পাঠকের কাছে সত্য বলেই গ্রাহ্য।

নিজেকে বোঝার এ শিক্ষা পাওয়া যায় সৎ সাহিত্য থেকে। আর খারাপ সাহিত্য শেখায় (যে কথা পরে বলার দরকার হবে) নিজেকে ভুল বোঝা। ভবিষ্যদ্রষ্টা ঋষিরা অন্যায়কে নিন্দা করেন, মানুষকে সৎপথে চালিত হবার নির্দেশ দেন। যাঁরা কবি, যতক্ষণ তাঁরা সত্যিকারের কবি, তাঁরা সৎ ও অসতের গোপন উৎসগুলি সম্বন্ধে আমাদের সচেতন করে তোলেন। এই চৈতন্য এক মস্ত জিনিস,—এর উৎকর্ষ কোনও কিছুর ওপর নির্ভর করে না, প্রমাণের অপেক্ষাও রাখে না। এই আত্মজ্ঞান যদিও এক চূড়ান্ত সত্য, যাকে নিরপেক্ষভাবে অনুসরণ করা যায়, তবু নৈতিক বিচারেও তা সমর্থনযোগ্য। সব ভালো সাহিত্যেরই যা লক্ষ্য, অর্থাৎ সত্যচেতনার বর্ধিত দীপ্তি, তা শুধু নিজগুণেই মঙ্গল নয়, সত্তার গভীরে সূক্ষ্মরূপী পরিবর্তন ঘটাতে পারে বলেও তার পরম মূল্য। যে আত্মজ্ঞান এই রূপান্তর সাধন করছে, তার ফলে হয় তো কিছু কিছু অদৃশ্য দুর্বলতা, অজ্ঞাত পাপ ও নির্বুদ্ধিতা দৃষ্টিগোচর হয়, কিন্তু পরিবর্তনটা দৈব ক্রিয়ার মতো ভালোর দিকেও নিয়ে যেতে পারে।

সৎ সাহিত্য হল উদার সূর্যের মতো—ভালো-মন্দ, জড়-প্রতিভা সবার উপর তার অপক্ষপাত আলোকবৃষ্টি। "ট্রয়লাস ও ক্রেসিডা"য় শেক্সপীয়র কোথাও বলেন নি—বহু-বিচিত্র পাত্রপাত্রীর মধ্যে, মানবপ্রকৃতি সমাজ ও নিখিল-সম্পর্কে কার মতামতটা খাঁটি। রোমান্টিক ও মূলতঃ নিষ্পাপ ট্রয়লাস অথবা বীর্যশালী হেক্টর কিংবা স্থির-বুদ্ধি বিজ্ঞ ইউলিসিস—কার ধারণাটা ঠিক? না কি ক্যাসন্ড্রার—যার মতে এই নিষ্ঠুর পৃথিবীটা দেবতাদের দ্বারা নয়, এক দুর্জ্ঞেয় নির্মম নিয়তির দ্বারাই পরিচালিত হচ্ছে? কিংবা পুষ্পিতযৌবনা হেলেনের ও ক্রেসিডার ধারণাটাই অভ্রান্ত—যাদের কাছে শরীরসর্বস্ব প্রেমের চেয়ে পৃথিবীতে বৃহত্তর সত্য আর নেই? না কি থেরসাইটিস—যার নির্মম সমালোচনায় যত সব বড় বড়

কথা আর মহান ভঙ্গিমা ধূলিসাৎ হয়ে যায়, যার বলায় ক্লান্তি নেই যে মহত্তম প্রাণ এমন দেহাশ্রয়ী—যার মর্যাদাহীন পরিণাম রোগভোগে, জরায়, শরীর-যন্ত্রণায়, অনিবার্য ধ্বংসে? সে কি সত্যিই সত্যকে জেনেছে, ধরতে পেরেছে? শেক্‌সপীয়র কারুর দিকেই টেনে কথা বলেন নি, কোনো মন্তব্যই পেশ করেন নি। এখানে তিনি Vates অর্থে প্রফেট হতে চান নি, যে ভূমিকায় সম্মানের সহজতর অধিকার। তিনি থেকে গেলেন Vates অর্থে কবি। যা হওয়া উচিত কিংবা অন্য রকম হলে পৃথিবীটা কি হতে পারত, তার দার্শনিক বিচার ও নৈতিক সমর্থন তাঁর কর্ম নয়। তিনি কবি—অর্থাৎ যা আছে, যা হয়ে থাকে তারই সন্ধান ও নিরপেক্ষ প্রকাশ হল তাঁর কর্মের আয়তি। এক দফা বিশ্বাস কিংবা এক বিশেষ ধরনের কর্মপদ্ধতির মধ্যে পাঠককে তিনি জোর করে টেনে এনে ফেলতে চান নি। তিনি তাঁর কাহিনী রচনা করে গেছেন—যা পড়লে মন খুব প্রফুল্ল না হতে পারে, মস্ত আদর্শের দেখা নাও মিলতে পারে। তিনি পর্যবেক্ষণ আর আত্ম-বিশ্লেষণের ফলাফলগুলো ধরে দিয়েছেন। সত্য-জ্ঞানের এই কাব্যিক দীক্ষা গ্রহণ পাঠকের ইচ্ছাধীন, তাকে বর্জন করাতেও তার পূর্ণ স্বাধীনতা।

আত্মজ্ঞান হচ্ছে প্রথম শ্রেণীর অভিজ্ঞতা সম্পর্কে বোধশক্তি। অর্থাৎ শব্দস্তরের নীচে যে সব অনুভূতি, একটা বৃহৎ বোধগম্যতায় রূপান্তরিত হবার আগে অস্তিত্বের অস্ফুট রহস্য সম্বন্ধে যে সব ধারণা, তারই প্রত্যয়-বোধ। কিন্তু তাই যদি হয়, তাহলে সাহিত্য নিয়ে মাথা ঘামানোর দরকারটা কি? উপযুক্ত ভাষা, একেবারে নিখুঁত বাক্যরূপ খুঁজে মরার অসীম যন্ত্রণার সার্থকতা কোথায়? এ প্রশ্নের বিপরীত-মন্য উত্তর হচ্ছে যে বাক্যের মাধ্যমেই ভাষাহীন সূক্ষ্মতর অনুভূতি সম্বন্ধে আমাদের চেতনা জন্মায়। দন্তশূল কি পদার্থ কিংবা ব্যাঘ্র-ভীতির রকমটা কি, তা বলার জন্য ঔপন্যাসিক অথবা গীতি-কবির দরকার হয় না। কিন্তু যেখানে অভিজ্ঞতা তেমন সহজ নয়, প্রত্যক্ষ নয় কিংবা আরও জটিল, সেখানে ভালো কবি, ভালো কথা-সাহিত্যিক যথেষ্ট সাহায্য করতে পারেন। আমরা যখন ভালোবাসি, তাঁরাই বলতে পারেন প্রেমে পড়লে কি হয়, কেমন লাগে। লজ্জায় পাপে আমরা যখন সঙ্কুচিত হই, তখন তাঁরাই সেই লজ্জা বা পাপবোধের প্রকৃতি সম্পর্কে আমাদের সচেতন করে তোলেন। অনুকম্পা আর ঘৃণা, প্রশংসা এবং হিংসা, অনুরাগ ও বিরাগ—এই ধরনের জটিল ও বিরোধী ভাবের যুগপৎ ক্রিয়ায় আমরা কিভাবে চালিত হই, সে সম্বন্ধে আলোকপাত করেন তাঁরাই। এ সব অনুভবের সাহিত্যিক রূপায়ণ থেকে, পাঠক বুঝতে সাহায্য পান নিজের মধ্যে নানা সূক্ষ্ম ও অনুরূপ বোধগুলিকে—যে সব বোধ ও অনুভব ভাষার অন্তরালে বিধৃত ধারণা থেকে পৃথক হয়ে বিরাজ করে কিন্তু যাদের কথা উপন্যাসে কবিতায় না পড়লে অভিজ্ঞতা অসম্পূর্ণ থেকে যেত, তাদের সম্বন্ধে কোনো পরিষ্কার ধারণা অর্জন করাই সম্ভব হত না। আমাদের সত্তার চেতনার যেটা মূল জমি, সেই নির্ভাষ চিন্তার অ-ভাবের দিকে পথনির্দেশ করছে ঐ ভাব-বস্তুরই শব্দ-রূপ। এই ভাষাহীন ভূমি-চেতনাই আত্মজ্ঞান। কিন্তু নির্বাক্‌ সে জগতে পৌঁছুবার রাস্তাটা গিয়েছে শব্দের রাজ্যের বুক চিরে।

তা হলে দেখা যাচ্ছে নিজে নিজ অভিজ্ঞতার স্বরূপ জানতে ও বুঝতে সাহিত্য আমাদের সাহায্য করে। ব্যক্তিবিশেষের অভিজ্ঞতা খানিকটা নির্ভর করে জন্মসূত্রে প্রাপ্ত দেহ ও মনের গঠনের ওপর আর খানিকটা পরিবেশ-প্রকৃতির ওপর। ফল্‌স্টাফের মতো যার শারীরিক গঠন আর হট্‌স্পারের মতো যার স্বাস্থ্যের অবস্থা—জগৎ সম্পর্কে উভয়ের দৃষ্টি

বা অভিজ্ঞতা সমান হয় না। মিঃ পিকউইকের দেহের মধ্যে ক্যাসিয়াসের সত্তা—এটা প্রায় সম্ভাবনার বাইরে। জীবন সাহিত্যকে স্পর্শ করার আগে সেই সব ব্যক্তিকে প্রভাবিত করে যাঁরা ঐ সাহিত্য সৃষ্টি করছেন। আর তাঁদের বিচিত্র দেহমনের গঠন অনুযায়ী পরিবেশের চাপ ও প্রভাব নানাভাবে সক্রিয় হয়ে ওঠে। এই কারণেই আধুনিক সাহিত্য ও আধুনিক জীবন সম্পর্কে কোনো সাধারণ মন্তব্য, ব্যাপক উক্তি পুরোপুরি গ্রহণ করা চলে না। আদিম কৌম যুগের সংস্কৃতি-স্তরের ঊর্ধ্বে এমন কোনো সমাজ নেই যাকে একক ও সমগোত্র বলা চলে। অতএব এই বিচিত্রধর্মী সমাজ-পরিবেশে লালিত লেখকেরা দেহ-মনের বিকাশে পরস্পর থেকে সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র বিপরীত হতে পারেন। সহজবোধ্য এই কথাগুলি মনে রেখে এখন কি ভাবে আমাদের দ্রুত ও আমূল পরিবর্তনশীল সমাজ আধুনিক জীবন ও সাম্প্রতিক সাহিত্যকে নিয়ন্ত্রিত করছে, তারই আলোচনায় সতর্কভাবে অগ্রসর হওয়া যাক্। বর্তমানে আমরা যে অ-ভূতপূর্ব পরিবেশে বাস করছি, তার প্রতিক্রিয়ায় কি ধরনের নতুন অভিজ্ঞতা সৃষ্টি হচ্ছে? অষ্টাদশ শতকের বদলে এই বিংশ শতাব্দীতে যে আমরা বেঁচে আছি, তার দরুন আমাদের মনোজগতে কি সব পরিবর্তন ঘটছে, তার কয়েকটি বিবেচনা করে দেখি।

প্রথমেই আসছে হাইড্রোজেন বোমা আর ঠাণ্ডা লড়াইয়ের যুগে বাস করার ফলে আমাদের মানসিক বিপর্যয়। অনেকের মনেই এটা এক দীর্ঘস্থায়ী অর্ধস্ফুট দুশ্চিন্তার মতো লেগে আছে। পৃথিবী যে অনায়াসে যে কোনো মুহূর্তে বিনা দ্বিধায়, বিনা বিবেচনায় বা চেষ্টায় ধ্বংস হয়ে যেতে পারে, সেই চিন্তার সঙ্গে যুক্ত হয়ে আছে একটা নিরুদ্দেশ্য অর্থহীন জীবনের ব্যর্থতাবোধ।

তারপর, উৎপাদন ও বণ্টনের আধুনিক উপায়পদ্ধতির সঙ্গে প্রত্যক্ষ পরিচয়ের ফলে আমাদের মানসিক প্রতিক্রিয়ার কথা। যন্ত্রশিল্পের প্রতিটি উন্নতির সঙ্গে সমান পদক্ষেপে সমাজের অগ্রগতি হওয়া দরকার। ক্রমশই বেশি লোক দেখতে পাচ্ছে, শিল্পসংস্থার স্বার্থ কিংবা আমলাতন্ত্রের শৃঙ্খলা ও সুবিধার জন্যই যে সংগঠনগুলির অস্তিত্ব এবং যাদের পরিচালনায় তাদের কোনো হাত নেই, সেই সব প্রতিষ্ঠানের কাছে তারা ক্রমশঃ পুরোপুরি অধীন হয়ে পড়ছে। সেই কারণেই মানুষের মনে একটা অসহায় ভাব ক্রমে বিস্তৃত ও গভীর হয়ে উঠছে। নিজের ভাগ্য-নির্ণয়ে কোনো অধিকার নেই বলেই এই নৈরাশ্যবোধ। ক্রমাগ্রসর যন্ত্রশিল্প-বিজ্ঞান একটু একটু করে স্বল্পসংখ্যক লোকের হাতে ক্ষমতা পুঞ্জীভূত করে দেয়। আমরা তিনশ' কোটি মানুষ এখন দু চার কুড়ি সেনাপতি, শাসক আর রাজনৈতিক নেতার হাতের পুতুল মাত্র। তাঁদের কেউই হয়তো তেমন বিশেষ সাধু বা বিজ্ঞপুরুষ নন। তাঁরা এমন এক কঠোর রাজনৈতিক ব্যবস্থায় বন্দী যার ভিত্তি হল জাতীয়তাবাদী রাষ্ট্র-প্রতিমাপূজা, যার নিশ্চিত পরিণতি নিশ্চিহ্নকারী বিপর্যয়ে। তাই এই পুরোপুরি অসহায় ভাবের সঙ্গে একটা তিক্ত গভীর অনাস্থার মনোভঙ্গী যে প্রায়ই যুক্ত হয়ে থাকে, তা বিচিত্র নয়।

বর্তমান সময়ে জনসংখ্যার আকস্মিক বিপুল বৃদ্ধি ঐ ক্রমাগ্রসর যন্ত্রশিল্পের একটি আনুষঙ্গিক ফল বলে গণ্য করা যায়। যীশুখৃস্টের জন্মকালে পৃথিবীর লোকসংখ্যা প্রায় সাড়ে পঁচিশ কোটি ছিল বলে ধরা হয়। এই সংখ্যা দ্বিগুণিত হতে লেগেছিল ষোলশ' বছর। আর আমাদের এখনকার প্রায় তিনশ' কোটি জনসংখ্যা ছয়শ' কোটিতে পরিণত হতে সময় লাগবে মাত্র চল্লিশ বছর। পৃথিবীর লোক-সমাবেশের এই অভূতপূর্ব বিস্ফারের একটা ফল হয়েছে—বড় বড় শহরের বিস্ময়কর বৃদ্ধি। আগের চেয়ে অনেক অনেক বেশি লোক

এখন সম্পূর্ণভাবে মানুষের তৈরী আবহাওয়ার মধ্যে বাস করছে। আমাদের লক্ষ লক্ষ ছেলেমেয়ে জীবনে গোরু দেখে নি, ফলের গাছ কিংবা শস্যক্ষেত কি বস্তু, তা জানল না। এই পরিপার্শ্বে মানসিক প্রতিক্রিয়া কি ধরনের হতে পারে? প্রথমতঃ আসছে—বঞ্চনাবোধ, অভিজ্ঞতার সংকীর্ণতা। আধুনিক বড় শহরের বাসিন্দারা অবিমিশ্র কদর্যতার মধ্যে বাস করে, প্রকৃতি-জগতের যে রহস্য, যে সজীব অনন্যতা তার সঙ্গে তাদের কোনও প্রত্যক্ষ যোগাযোগ নেই। ফলে, ওয়ার্ডসওয়ার্থ যাকে natural piety বলেছেন, সে জিনিসটা ওদের মধ্যে একেবারেই পাওয়া যায় না। এই প্রসঙ্গে এটা উল্লেখযোগ্য যে যদিও আধুনিক কবিরা নিসর্গ নিয়ে খুব কমই কবিতা লিখে থাকেন, পশু-পক্ষী কীট-পতঙ্গদের জীবন নিয়ে লেখা অ-সাহিত্যিক কিংবা আধা-সাহিত্যিক বই আজকাল খুব জনপ্রিয় হয়ে উঠেছে। নগরবাসীর বঞ্চনা ও অভাব-বোধটাই যেন সাহিত্যে কেবল প্রতিফলিত হচ্ছে আর ঐ সব অভাবের ফলে আত্মার যে ক্ষুধা জাগছে, প্রকৃতি-বিজ্ঞান এবং নৃতত্ত্ব-বিদদের ওপর এখন সেই ক্ষুধা মেটানোর ভার। এ ছাড়া, পৃথিবীর এক বিশাল নগরপ্রধান অঞ্চলে শুধু নাগরিক জীবন যাপনের ফলাফলের কথাও ভাবতে হয়। সমাজবিজ্ঞানীরা লক্ষ্য করেছেন, সাহিত্যিকরাও সন্ধানী দৃষ্টি দিয়ে সেটা প্রকাশ করেছেন, যে নগরবাসীদের মনে একটা নিঃসম্পৃক্ত ভাব জাগে—তারা সমাজের একটি অচ্ছেদ্য অঙ্গ নয়, তারা সব সময়ে জনতার মধ্যে বাস করেও চিরটাকাল সঙ্গহীন।

আধুনিক প্রয়োগ-বিজ্ঞানের আর একটি ফল জন্মনিরোধ। মনের ওপর তার কি প্রতিক্রিয়া, সে কথা এখন বিবেচনা করা যাক। যন্ত্রশিল্পের বিস্তার এখন পৃথিবীর যে সব দেশকে উন্নত করেছে, কেবল সেখানেই জন্মনিরোধের উপায়গুলি প্রায় নিয়মিতভাবে অনুসৃত হচ্ছে। এ সব জায়গার নারী ও পুরুষদের পক্ষে এখন সন্তান-উৎপাদন থেকে যৌন জীবনকে স্বতন্ত্র করা সম্ভব হয়েছে। লোকসংখ্যা-বৃদ্ধির দিক থেকে বিচার করলে, এ দুটি জিনিসকে তফাত রাখাই প্রায় সর্বতোভাবে বাঞ্ছনীয় বলতে হবে। কিন্তু এই পৃথক্করণের মানসিক ফলাফলটা কি? সেটাও একরকম ভালো, বলতে পারি। পারস্পরিক প্রীতির বন্ধন বজায় রাখতে হলে, জৈব সত্তা থেকে প্রেমকে যদি বিচ্ছিন্ন করা যায়, তা হলে পুরুষ ও নারীর মধ্যে এক খাঁটি মানবিক সম্পর্ক গড়ে উঠতে পারে। আবার হৃদয়ের কোমল বৃত্তির কথা ছেড়ে দিলে বলা যায় যে জৈব আনুষঙ্গিক থেকে যৌনতাকে মুক্ত করে নিলে, একটা মস্ত বড় অনুভূতি বা অভিজ্ঞতাকে সস্তা ও খেলো করে ফেলা হয়। বিনা যন্ত্রণার যৌনজীবন, সরলীকৃত এবং সকলের আয়ত্তের মধ্যে যে যৌনজীবন, সেটা যদি প্রেমসম্পর্করহিত যান্ত্রিকতায় পরিণত হয়, তা হলে আবার সেটা বন্ধ্যা ভূমিতে আত্মারই অবক্ষয় ছাড়া কিছু নয়। অবশ্য এটা এখন আর লজ্জাকর বস্তু নয়। কারণ জন্মদান থেকে যৌনবোধকে পৃথক করতে গিয়ে জন্মনিরোধের কার্যকরী উপায়গুলো এখন আর পাপ বলে গণ্য হয় না, যৌনসম্পর্ককে পাপবোধ থেকেও মুক্ত করেছে। তবু হৃদয়বৃত্তি থেকে বিচ্ছিন্ন করে নিলে, ঐ অতি-সহজ যৌনজীবন অর্থহীন এবং যথেচ্ছ ব্যবহারে মূল্যহীন হয়ে দাঁড়ায়।

আমাদের সমাজ-পরিবেশে সাম্প্রতিক পরিবর্তনের ফলে যে সব নতুন অভিজ্ঞতার জন্ম হয়েছে, তাদের সন্ধান ও বিশ্লেষণ করতে হয়েছে, এক একটি অভিধায় চিহ্নিত করে সাহিত্যের বিষয়ীভূত করতে হয়েছে। আধুনিক জীবন সেই হিসাবে আধুনিক সাহিত্য-স্রষ্টাদের প্রভাবিত করছে। আবার যারা বর্তমান জীবনের সম্মুখীন হয়ে তার চিন্তাভার, তার ব্যর্থতা ও অসহায়তা, তার তিক্ততা নিঃসম্পর্কতা এবং নির্জনতাকে বুঝতে চাইছে,—বলা যেতে

পারে, যে অতি-বদ্ধ জনবাহুল্যময় ভীতিপ্রদ অতি-নাগরিক জীবন-পরিবেশ ঐ সব অভিজ্ঞতা অনুভব বা অর্জন করতে তাদের বাধ্য করেছে—তারাও আধুনিক সাহিত্যের কাছ থেকে সাহায্য পাচ্ছে।

এতক্ষণ আমি সৎ সাহিত্যের কথাই কেবল বলেছি। কিন্তু অন্যান্য শিল্পের বেলায় যা, সাহিত্যের ব্যাপারেও তেমনি ভালো লেখকের চেয়ে খারাপ ও দায়ীত্বহীন লেখকের সংখ্যাই বেশি। এ কথাও ঠিক যে যারা ভালো সাহিত্য পড়ে উপভোগ করে, তাদের চাইতে কু-সাহিত্য অথবা যথেচ্ছ-লিখিত সাহিত্যের পাঠকসংখ্যাই বেশি। খারাপ সাহিত্যও অলংকারবহুল, নীতিবাগীশ হতে পারে, কিংবা ভালো সাহিত্যের মতোই সত্যের সন্ধান করে যা হওয়া উচিত তা ছেড়ে, যা আছে তাকে প্রকাশ করতে চেষ্টা করতে পারে। কিন্তু সে প্রচেষ্টা কখনো সার্থক হয় না। খারাপ সাহিত্য খারাপই, কারণ এর লেখকরা সত্য-অন্বেষণে কখনো বেশি দূর যান না। তাঁদের কাছে যেটা পাওয়া যায়, সেটা হল—যা বিদ্যমান সে সম্পর্কে খাঁটি কথা নয়। যা গতানুগতিক যা ছক-মাফিক তারই ছবি। ফ্লবেয়ারের নায়িকা মাদাম বোভারির বিপদ ঘটল এই কারণে, যে বাজে সাহিত্য পড়ে পড়ে সে ক্রমাগত কল্পনা করেছে—সে যা, তা থেকে সে অন্য জাতের মানুষ। তারই নাম থেকে ফরাসী দার্শনিক জুল দ্য গতিয়ে একটা ভাবার্থবাচক বাক্য সৃষ্টি করেছেন—'বোভারিজম'। তার অর্থ—নিজের সত্তা বা চরিত্র থেকে ভিন্ন এক চরিত্রের অভিনয়, আমি যেন অন্য ব্যক্তি এই রকম একটা ভাণ করার অতি স্বাভাবিক প্রবৃত্তি। কখনো কখনো অভিনীত চরিত্রের সঙ্গে অভিনেতার মিল থাকে; সে ক্ষেত্রে 'বোভারিক' কোণটা হ্রস্ব। অন্যত্র দুয়ের মধ্যে ঘোরতর বৈষম্য থাকতে পারে। এই বোভারিক কোণগুলো ষাট নব্বুই, এমন কি একশ' আশী ডিগ্রীরও হতে পারে। ভালো আর মন্দ সাহিত্যের মধ্যে এই যে পার্থক্য, সেটা ঐ বোভারিক শব্দার্থ দিয়ে বোঝানো যেতে পারে। যে সাহিত্য বাজে, তা পাঠকের সামনে বাঁধা ছকে গতানুগতিক চরিত্র উপস্থাপিত করে, তাকে এমন এক পার্টের অভিনয়ে উৎসাহিত করে যা তার নিজস্ব প্রকৃতি থেকে ভিন্ন। আর ভালো সাহিত্য বস্তু-সত্য সম্পর্কে সৎ ও আন্তরিক সন্ধানের ফলগুলি পাঠকের সামনে তুলে ধরে। তাতে করে কৃত্রিম জীবনের অভিনয় থেকে পাঠক বেরিয়ে আসতে শেখে। যে মুখোস সে পরে আছে, যা তাকে গ্রাস করেছে,—তার আড়ালে দৃষ্টি চিন্তা ও অনুভূতির যে সব গভীর সত্য রয়েছে—সেগুলো সে নিজেই আবিষ্কার করে।

অনুবাদ : বিমলাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়
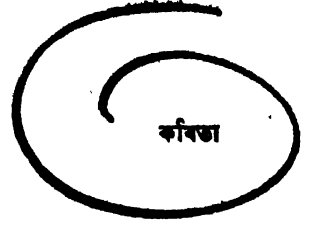
# উপসংহার

আনন্দ বাগচী

প্রেমের ভনিতা রাখো, হে যুবক, মূর্খ পলাতক,
প্রমিথিউসের মত চূর্ণমুষ্টি কান্না ছোঁড়ো শিল্পের আগুনে
চারদেওয়ালে ফিরে আসে প্রবঞ্চক ছায়ার ঘাতক
নিষাদকলায় দক্ষ, অশরীরী, বিকৃত ফাল্গুনে
শূন্যচারণের নেশা, গ্রহমুখী আকর্ষণ, আর
সমস্ত ভূগোল জুড়ে রাজনীতি-বাণিজ্যের জাল
সোনার মৃগয়া, রুদ্ধ নিঃশ্বাসের মাঝখানে নগর পত্তন
কাষ্ঠ ও প্রস্তরে ঘেরা, লৌহলোষ্ট্রে; রাষ্ট্রের গণিত
একাঙ্কিকা গড়ে তোলে, সর্বঅঙ্গে আত্মার প্রহার,
যুগল সুখের সিঁড়ি বৃথা খোঁজ বন্যঅন্তরাল
হে যুবক, হে যুবতী, প্রেমের ভণিতা রাখো, হাতের কঙ্কন;
দেওয়ালে শিল্পের ছায়া, আত্মরতি লুব্ধ অন্ধকারে মনোনীত
বহ্নিমান চতুর্দিক, অগ্নিজ্বলে খবর-কাগজে
কলঙ্কিত সহবাস গড্ডলিকা কাগজে কলমে
সমস্ত নগরে গ্রামে মুদ্রারাক্ষসের অধিকার॥

# ✓ হৃদয়ের পাপ

**চিত্ত ঘোষ**

টেলিফোনে কথা হয়। মাঝে মাঝে দূরভাষী ছবি
পড়ন্ত রোদ্দুরে পোড়ে মুখ। নীরায় এস্‌প্রেসো কফি
ক্কচিৎ কখনো। তারপর নিরাশ্রিত। উলঙ্গ ভিখিরী
প্রমত্ত কি অপ্রমত্ত, চতুর্দিকে ব্যবহৃত সিঁড়ি
কোলাহল, কলরব, ম্যাণ্ডোলীন, বাঁশী। কী বিরক্ত বুকের নিঃশ্বাস!
অন্ধকারই অন্বেষণ। কেননা সেখানে যার বাস
চিরকাল সে আত্মীয় শুভানুধ্যায়ীর মত
আশ্রয় দিয়েছে যত্নে। বৃক্ষগুলি প্রহরী সতত।
হৃদয়ে আকীর্ণ উক্তি। প্রবৃত্তির নিম্ন মধ্য চাপ
পদ্ধতি প্রয়োগ বিনা অর্থহীন নিভৃত সংলাপ।
কেন কেন? কিবা অর্থ, বারবার কী?
কৈশোর প্রান্তর পটে একঝাঁক উজ্জ্বল জোনাকী।
আমাদের দ্বৈত ছায়া, স্পৃহা, সঙ্গ, দীর্ঘ অধিকার
ঘুরে ঘুরে থামা, চলা, দেখা আর সর্বত্র যাবার
পরিশ্রম আবর্তিত; কখনো দিয়েছ সেই ক্লেদজন্ম সুখ
বিস্মিত কী বিজয়িনী ক্ষণ-কল্প প্রতিচ্ছায়া মুখ
আমি তুমি অন্ধকার দগ্ধ দিবা তাপ
তোমাকে পেরেছি দিতে হৃদয়ের সর্বাধিক পরিণত পাপ।

# অনাবিষ্কৃত

**সমরেন্দ্র সেনগুপ্ত**

এমন অনেক ফুল, নাম জানি, কখনো দেখিনি
অনেক কবির মুখ প্রাচীন আকাশ কিংবা নক্ষত্রের শিবিরে অচেনা,
রক্তে এসে ঘুরে গেছে শব্দের প্রচণ্ড ক্ষোভ, যৌবনের চতুর্দিক গানে;
এবং ঐতিহ্য এক দক্ষ দাবী আজন্ম প্রবীণ,
আমি কত দ্রুত যাবো সন্ধানী একা একা...
পৃথিবীর এত পাখি, পুষ্পদল, অনায়াস উচ্চতায় গাছের সংসার,
যাদের কখনো আমি জীবনে জানবোনা।

কে যে এই মানবিক স্পন্দনের সব প্রশ্ন একা ছুঁতে পারে!
অথচ মানুষ তবু, বিরক্ত রূপসী লিপ্সা কিছুক্ষণ ভুলে
শতাব্দীর অবিশ্বাস যেন শেষ প্রাচীন চেয়ারে ফেলে একা উঠে এলে
বাতাস, বাতাস এলো, নড়ে উঠল দেয়ালের চতুষ্কোণ দৃশ্যের জড়তা:
বড় চেনা লাগে ঘর জ্ঞানের প্রচণ্ড দৈন্য যতক্ষণ ঢেকে রাখে ক্লান্ত আলমারি
—যুদ্ধ অবশ্যম্ভাবী কিনা, আজকাল বার্ট্রাণ্ড রাসেল
নতুন কি ভাবছেন মানুষের ভবিষ্যৎ নিয়ে:
পাস্তেরনাক মারা গেলেন, কারা যেন খুব কুয়াসায়
শবাধার কাঁধে নিয়ে হেঁটে যাচ্ছে পৃথিবীর শুদ্ধতম বিশ্বাসের দিকে—

কোন কোন বুক থেকে দুঃখ বড় শব্দ করে আর্তনাদ করে।

আমি কি তখনো ঋণী কোন প্রত্ন পুরুষ নারীর
অপ্রয়োজনীয় যৌন আবৃত্তির অপ্রেমের কাছে!
যে আমি সংশয়বিদ্ধ এখনো প্রধান পথ সুস্পষ্ট দেখিনা,
দেখিনা নীড়ের শোভা আরক্ত সিঁথি'র প্রান্তে সূর্য কার অসম্ভব জ্বালা
ক্রমে নেমে আসে বুকে, কামক্ষেত্রে, অভীক একাকী ধ্বনিরত...
যার অর্থ এই নয় কোনদিন গভীর নিশীথে
আমার জন্মের প্রশ্নে অকস্মাৎ দুটি চোখ জলে ভরে এলে
আকাশের দিকে চেয়ে জননী জননী বলে ডাকিনি, ডাকিনা।
আমার মায়ের মুখে কত দগ্ধ বছরের রৌদ্র লেগে ছিল
আমার পিতার দেহে অন্ধকার কতবার উৎস উদাসীন
সুখে থাকবো, ভাল থাকবো, এর চেয়ে ভয়ঙ্কর অশ্লীল চীৎকার জানা নেই।

জানা নেই যে পাখিটি এইমাত্র মেঘের ওপারে উড়ে গেল
তার কোন দুঃখ ছিল কিনা। আজো কি জেনেছি কেন
একাকী মাতাল গন্ধে গভীর গভীরতর অরণ্যগহনে
কবিতার কোন স্মৃতি খুঁজতে এসে ভুলে যাই; তীব্র কতবার
রক্তাক্ত ঝরেছি আমি চিহ্নহীন অক্ষরে লজ্জিত।
এত ফুল পৃথিবীতে; এত গান কণ্ঠের অচেনা
প্রার্থনার মত ঘোরে জন্ম, মৃত্যু, বসন্তের ব্যগ্র পিপাসায়

যাদের কখনো আমি জীবনে জানবোনা॥

# একটি মৃত্যুবার্ষিকী

**শামসুর রহমান**

হয়নি খুঁজতে বেশি, সেই অতদিনের অভ্যাস
কী ক'রে সহজে ভুলি? এখনো গলির মোড়ে একা
গাছ সাক্ষী অনেকদিনের লঘুগুরু ঘটনার,
আর এই কামারশালায় আগুনের ফুল্কি ওড়ে
রাত্রিদিন হাপরের টানে। কে জানতো স্মৃতি এত
অন্তরঙ্গ চিরদিন? জানতাম তুমি নেই, তবু

আঠারোর সাতে কড়া নেড়ে দাঁড়ালাম
দরজার পাশে। মনে হলো, হয়তো আসবে তুমি,
মৃদু হেসে তাকাবে আমার চোখে, মসৃণ কপালে
ছোঁয়াবে আলতো হাত, বলবে 'কী ভাগ্যি আরে
আপনি? আসুন। কী আশ্চর্য! ভেতরে আসুন।' দেখি

অন্ধকারে বন্ধ দরোজায় দু'টি চোখ আজো দেখি
উঠ্লো জ্ব'লে। কতদিনকার সেই চেনা মৃদু স্বর
আমার সত্তাকে ছুঁয়ে বাতাসে ছড়ালো
স্মৃতির আতর।

শূন্য ঘরে সোফাটার নিষ্প্রাণ হাতল
কী ক'রে জাগলো এই ক্ষণে? একটি হাতের নড়া
দেখলাম যেন, চা খেলাম যথারীতি
পুরানো সোনালি কাপে, ধরালাম সিগারেট, তবু
সবই ঘটলো যেন অলৌকিক
যুক্তি-অনুসারে।

মেঝের কার্পেটে দেখি পশমের চটি
চুপচাপ, তোমার পায়ের ছাপ খুঁজি
সবখানে, কৌচে শুনি আলস্যের মধুর রাগিণী
নিঃশব্দ সুরের ধ্যানে শিল্পিত তন্দ্রায়।

জানালায় সিল্ক নড়ে, ভাবি, কত সহজেই তারা
তোমাকে কীটের উপজীব্য করেছিলো,
সারাক্ষণ তোমার সান্নিধ্যে পেত যারা
অনন্তের স্বাদ।

বারান্দায় এলাম কী ভেবে অন্যমনে, পারবোনা
বল্‌তে আজ। জানতাম তুমি নেই, তবু

# একটি চতুর্দশপদী

**মোহিত চট্টোপাধ্যায়**

পৃথিবীর অস্ত্রগুলি সব থেকে হাস্যকর, ওদের ঘূর্ণনে
স্পর্ধায় গর্জনে দম্ভে হাসি পায় এমন কি শেফালি ফুলের!
অনেকেই অস্ত্র ভালবাসে; নম্র কোকিলের কণ্ঠস্বরে প্রীত
প্রেম, সে-ও চিরকাল ভাবে দৃঢ় হাতে সব কেড়ে নেয়া চলে...
একটি পলাশ মৃদু হাস্য করে বাতাসের গায়ে ভর দিয়ে!
অনেক বয়স হ'ল, মানুষের থেকে বেশি বয়স যাদের
সে সব বৃক্ষেরা জানে, রোদ্দুরের দেহে লক্ষ ঘা দিয়েও তবু
এক বিন্দু রক্ত তাও আজ অবধি কোন ক্রুদ্ধ ঝরাতে পারেনি!

বাহু প্রসারিত রেখে জেগে থাক জ্যোৎস্নায়, দিবসে।
যার পদধ্বনি মৃদু সে এসে তোমাকে ডেকে নিয়ে যাবে ঘরে।
আস্তে হেঁটো, রূঢ় পদক্ষেপে ক্ষোভে পিষ্ট ক'রে যেওনা শিশির
পাহাড়েও হেরে গেছে বহুবার ওর কাছে, সিক্ত পদতলে।
পৃথিবীর অস্ত্রগুলি সব থেকে হাস্যকর, ওদের ঘূর্ণনে
স্পর্ধায় গর্জনে দম্ভে হাসি পায় এমনকি শেফালি ফুলের!

# ফানুসের উপমা

**সুধাংশু ঘোষ**

শেয়ালটা অকারণ ক্ষিপ্রতায় দৌড়ে পালাল। যেন দৌড়ের কসরত দেখিয়ে মুগ্ধ করার জন্যে ছুটে পালাল। একটু আগেই একটা পেয়ারাগাছের গভীরতর ছায়ার বৃত্তে এদিকেই মুখ তুলে দাঁড়িয়েছিল, আশঙ্কা ছিল না, বিস্ময় ছিল না, যেন আত্মপ্রত্যয়ের একটি নিপুণ মুদ্রা। অথচ কী যে হল, আচমকা এক পাক খেয়ে নিজের ছায়ার সঙ্গে পাল্লা দিয়ে ছুটে পালাল। কোন দুর্নিরীক্ষ্য দূরে যায় নি, কাছেই কোন কাঁটার জঙ্গলে শরীর ঢেকেছে, চোখ তুলে রেখেছে এই দিকে। শেয়াল আর হরিণের প্রায় সব ছবির, সব দৃশ্যের অনুষঙ্গ পলায়ন। কিন্তু শেয়াল সুন্দর নয়, হরিণের মত তীক্ষ্ণ সুন্দর নয়, পালাবার সময় হরিণের মত ঢেউ হতে শেখে নি।

আমি কি পালিয়েছিলাম,—হরিণের সঙ্গে নয়, শেয়ালের সঙ্গে আমার তুলনা কি নিখুঁত হবে। ট্রেনের জানলায় বসে বিভাসের মনে হল, শেয়ালটার সঙ্গে তার উপমা কি নিখুঁত হবে।

ট্রেনের দুপাশের উধাও মাঠে ঝাঁঝাঁ দুপুর রাতের ঈষৎ স্বচ্ছ অন্ধকার। নিরক্ত মুখের রঙের মত আলোয় সযত্নলালিত পেয়ারা বাগানটার ছায়ার সুডোল বৃত্তগুলো অনেক পিছনে পড়ে রইল। সামনের স্টেশন নিশ্চয়ই এখনও দূর, নাহলে ট্রেনের গতি এত তীব্র হত না।

শেয়ালটা হয়ত আবার কাঁটা ঝোপের আব্রু থেকে বেরিয়ে এসেছে। দুটো কঠিন ধাতব সমান্তরাল সরলরেখায় চোখ রেখে দাঁড়িয়েছে, নিজের ছায়ার দিকে দৃষ্টি নেই।

কয়েক শ' গজ দূরের উঁচু মাটির রাস্তায় দুটো উট যেন মরে ফোত হয়ে যাওয়ার পরও হাঁটছে। দুটোর পিঠেই বিপুল ভার, তাছাড়াও একটার পিঠে মানুষ একটি, বোধহয় এইমাত্র ট্রেনের গমকে ঘুম ভাঙল। সব মিলে বিভাসের নেহাত পরিচিত নিসর্গ।

সেই রাত্রেও এমন ধুলোরঙ জ্যোৎস্না অথবা তারার আলো ছিল। দীর্ঘ স্ট্রেচ রোড ধরে তারা শঙ্কিত ছায়া ফেলে ফেলে সেই একরত্তি অপরিণত নরম রক্তাক্ত শরীর তেলকাগজ আর কাপড়ে জড়িয়ে বয়ে নিয়ে গিয়েছিল। ডাইনে যমুনার দিকে যায় নি, বাঁয়ে গিয়েছিল, গঙ্গায়। তীরের বালি খুঁড়ে সেই একরত্তি রক্তাক্ত শরীর কবর দেওয়ার সময় এমনই ধুলোরঙ জ্যোৎস্না অথবা তারার আলো ছিল। অনেক বালি খুঁড়েছিল, অনেকক্ষণ ধরে বালি খুঁড়েছিল। তবু তারা গঙ্গার তীর থেকে সরে আসার পর কি কোন গভীরতর অন্ধকারের আব্রু ডিঙিয়ে একদল শেয়াল আসে নি, কিছু নিয়ে কি কাড়াকাড়ি ছেঁড়াছিঁড়ি হয় নি তাদের মধ্যে।

পাঁচটা কাঠি লাগল একটা সিগারেট ধরাতে। বিভাসের খুব হাত কাঁপছিল। অন্তত দুঘণ্টা আগে কোন্ এক স্টেশনে এক কুল্হাড় বিস্বাদ চা মিলেছিল। ভোরের আগে আর হয়ত চা পাওয়া যাবে না। সামনের স্টেশনে হয়ত শুধু সিগারেট পান বিড়ি, মোমফলি, গরম দুধ ক্লান্ত গলায় হেঁকে যাবে, চা মিলবে না।

মাঝের বেঞ্চে একটি বছর দশেকের ছেলে এক মহিলার মেদস্ফীত আধ-শোওয়া শরীরে কাত হয়ে ঘুমোচ্ছে। সেই একরত্তি নরম শরীরকে পূর্ণ হবার সুযোগ দিলে, বেঁচে বেড়ে

ওঠার অবকাশ দিলে আজ কি ওই ছেলেটার মত এত বড় হত,—না কি সে ছেলেই ছিল না, মেয়ে ছিল।

জ্বলন্ত সিগারেটটা পায়ের কাছে পড়ে গেল। তাড়াতাড়ি কুড়িয়ে নিল বিভাস। আমার হাত এত কাঁপছে কেন।

কামরাটার এপাশ থেকে ওপাশ পর্যন্ত অগুনতি যাত্রী কী কূটকৌশলে ঘুমের মহড়ায় মগ্ন! পাশের লোকটি ঘুমের মধ্যে একটু একটু করে পুরো দেহটাকে টানটান করে পাতছে। নোংরা জুতোপরা পা দুটো প্রায় উঠে এসেছে তার কোলের ওপর। বাঁ দিকে মাঝের বেঞ্চে একটি বয়স্ক ভদ্রলোক যেখানে মাথা রেখেছেন ঠিক সেখানে তাঁর কান ছুঁয়ে আর এক বেঞ্চ থেকে একজন তাঁর ড্যাক্রনের ট্রাউজারে ঢাকা একটি পা তুলে দিলেন। বিরক্ত গলায় বয়স্ক ভদ্রলোক আপত্তি জানালেন, 'এটা কী হচ্ছে?'

নিখাদ নির্লিপ্ত জবাব এল, 'ট্রেনে এমন হয়।'

বাইরে পাতলা অন্ধকার। শীর্ণ রুগ্ন নিরক্ত মুখের রঙের মত আলো মেশান অন্ধকার। গভীর নয়। কারও সারা পিঠ ঢাকা একরাশ কাল চুলের সঙ্গে—যেমন, ভাবা যায়, অন্তত পাঁচ বছর আগের ইন্দ্রাণীর চুলের সঙ্গে—এই অন্ধকারের তুলনা চলে না। এখন, এতদিন পরে, এই পানসে অন্ধকারের তেমন বনেদী উপমা হাস্যকর।

যদি একটু ঘুমোতে পারি, যদি জানলায় মাথা রেখে একটু ঘুম আসে, ভোরবেলা চাওয়ালার হাঁকে হঠাৎ ঘুম ভেঙে চোখে আলো মেখে মনে হবে, এই পানসে অন্ধকার পেয়ারা-গাছের ছায়ার বৃত্ত থেকে দৌড়ে পালান শেয়ালটার নিপুণ উপমা। শেয়ালটার মত পালাবে, কোন দুর্নিরীক্ষ্য দূরে যাবে না, ফাটলে ফাটলে, কূপে কূপে, মাতৃজঠরের অন্ধকার থেকে উত্তরাধিকার সূত্রে পাওয়া অন্ধকারে মিশে আত্মগোপন করবে। ক্লান্ত ফতুর হয়ে সূর্য ডুবলে গ্রাস করবে আবার।

ধ্যেৎ! আর একটা সিগারেট ধরাল বিভাস। এবার তিনটে কাঠি লাগল একটা সিগারেট ধরাতে। একটু নড়েচড়ে আরাম পাবার চেষ্টা করল। উত্তর তিরিশের ট্রেন সব কামরার দরজা খুলে স্টেশনে দাঁড়িয়ে আছে। আর এক পা এগোলেই অবলীলায় উঠতে পারবে। পিছিয়ে থাকবার আশঙ্কা নেই, উপায় নেই। এখন একটু আরাম ছাড়া আর কিছু চাই না। আর কিছু চাই না?

মাঝের বেঞ্চের বছর দশেকের ছেলেটি কাশল কয়েকবার। মেদের ভারে কাহিল মহিলাটি ছেলেটার আড়াল থেকে তাকে তির্যক একটি খোঁচা দিলেন, 'জানলাটা হাট করে খুলে রেখেছে। বল্ না জানলাটা বন্ধ করতে।'

উধাও মাঠ থেকে আসা ঝাঁঝাঁ রাতদুপুরের হাওয়ায় শেষ হেমন্তের হিম। বিভাস দুহাতে দুকোণ চেপে রেখে জানলার কাচের পাল্লাটা নামিয়ে দিল। আর সঙ্গে সঙ্গে একেবারে বদলে গেল তার একান্ত পরিচিত নিসর্গ। কাচটা যথেষ্ট স্বচ্ছ নয়, অনেক জলের দাগের ঢেউ এবং বড় অপরিচ্ছন্ন। জানলার বাইরে প্রাগৈতিহাসিক জানোয়ারের পিঠের মত অসমতল মাঠ, সযত্নলালিত ফলের বাগান, ছড়ান ছিটোন জঙ্গল, কাঁটাঝোপ সব গলে গলে পরস্পরের অঙ্গে অঙ্গে মিশে একাকার হয়ে গেল। জানলার ফ্রেমে মাথা রেখে চোখ বন্ধ করল বিভাস, উথালপাতাল অন্ধকারে ডুবল, কৈশোর যৌবন, দৃশ্য দৃশ্যান্তর সব গলে গলে পরস্পরের অঙ্গে অঙ্গে মিশে একাকার হল। ট্রেনের গমকের সঙ্গে মিলিয়ে বলতে ইচ্ছে হল, ইন্দ্রাণী ইন্দ্রাণী ইন্দ্রাণী, মিল খুঁজে পেল না।

সেই কালের সিভিল লাইন্সেও বিভাসদের বাড়িটা বেমানান ছিল। সারা শহরে মুঘল স্থাপত্যের যে অজস্র উদ্ধত নিদর্শন ছড়িয়ে আছে, তার বিনীত অনুকৃতি ছিল বাড়িটা। নোনাধরা একতলা বাড়ির ন্যাড়া ছাতে চারটি স্তম্ভের চূড়োয় ছিল এক বিচিত্র গম্বুজ। কেন ছিল তার ব্যাখ্যা মেলে নি। সেই বয়েসে মনে হত অনেক অনেক উঁচু। তার প্রায় আকাশছোঁয়া কোটরে কোটরে এক ঝাঁক অস্থির আবাবীল বাসা বেঁধেছিল। বাড়িটার ভিত নিশ্চয়ই অসাধারণ দৃঢ়, না হলে সব একদিন ধ্বসে পড়ত। তীরের ফলার মত তীক্ষ্ণ ডানায় বাতাস কেটে পাখিগুলো এত তীব্র বেগে উড়ত যে মনে হত শূন্যে তাদের গায়ের রঙের রেখা পড়েই মিলিয়ে যাচ্ছে। ঠিক কোন বয়েস থেকে মনে নেই, তাদের দিকে তাকিয়ে তাকিয়ে দীর্ঘ সময় কেটেছে বিভাসের। উঁচু কোটরে পাখিগুলোর বাসায় ফেরা দেখতে দেখতে ঘাড় টনটন করে উঠেছে, চোখে মুখে এসে পড়েছে খড়কুটোর চূর্ণ অংশ।

সিংরা যেদিন সকালে ওপাড়ায় এল তার পরদিনের বিকেলটা মনে পড়ছে। ছোটবেলার কথা, কৈশোরের প্রায় কোন কথাই আমি ভুলতে পারি না কেন। এমন অনেকে আছে যাদের মনের বয়েস এক একটি পর্যায়ে এসে থেমে যায়, আর বাড়ে না। আমি কি তাদের জাতের।

একতলা বাড়ির ন্যাড়া ছাতের শ্যাওলাধরা কার্নিসে একটা কৃষ্ণচূড়ার ডাল লুটোচ্ছিল। ডালটায় একটা হাত রেখে কার্নিসে বসেছিল বিভাস, ঊর্ধ্বমুখ। নিস্তেজ বিষন্ন রোদ মাখছিল পাখিগুলোর ডানা, গম্বুজের ফাটলের আগাছার পাতা।

নবাব খানের বাংলোর বাগানে ফলন্ত ডালিম গাছটার তলা থেকে ইন্দ্রাণী চড়া গলায় ডাকল, 'বিভাস।'

ঘাড় নিচু করে চোখ নামিয়ে বিভাস দেখল, অনেক কাঁচা ডালিম ছোট ছোট ঘণ্টার মত হাওয়ায় দুলছে, তার তলায় ইন্দ্রাণীর খুশীখুশী মুখ। বেল্‌স্‌ অ্যান্ড পমগ্রানেট্‌স্‌, কার যেন কবিতার বই। শুধু একটু হাসল। জানা ছিল, কিছু বলতে হবে না।

বাগানের ফটক খুলে এবাড়িতে ঢুকে ইন্দ্রাণী দুদ্দাড় করে সিঁড়ি ভেঙে ছাতে উঠে এল। কার্নিসে বসে তর্জনী সংকেত করে বলল, 'ও বাড়িতে কাল সকালে যারা এসেছে তারা কারা জান?'

'কারা?'

'বাগানের ফটকে দাঁড়িয়ে বাবার সঙ্গে কথা বলছিলেন, আমি শুনতে পেলাম। ভদ্রলোকের নাম উদয়প্রতাপ সিং। ফরেস্ট অফিসার, রিটায়ার করেছেন, পেন্সন পান। ওই বাড়িটা কিনেছেন।'

কাল একটু বেলায় দুখানা টাঙা যখন ও বাড়ির সামনে এসে দাঁড়িয়েছিল, এই কার্নিসে বসে দেখছিল বিভাস। জিনিসপত্র খুব বেশি কিছু দেখতে পায় নি। একটি স্বাস্থ্যবান বৃদ্ধ আর একটি ছেলে। ছেলেটির তাদের বয়েস হবে। একটা বন্দুক হাতে করে উদয়-প্রতাপ সিং টাঙা থেকে নেমেছিলেন। মনে হয়েছিল, সেটাই তাঁর সব থেকে প্রিয়।

নবাব খান, সিং আর বিভাসদের বাড়ির ফটক থেকে তিনটি সরলরেখা টানলে একটি ত্রুটিহীন ত্রিভুজ হবে। এখন ভাবলে আমার হাসি পায়, যেন জলো গল্পের প্রাঞ্জল জ্যামিতি। নবাব খানের বাড়িটা বাংলো ধরনের। বিবর্ণ ইটের দেওয়ালের ওপর লাল টালি, সামনে অনেকটা জায়গায় ফুলের ফলের বাগান। সিংদের বাড়ির সামনে বাগান করবার প্রচুর জায়গা, বুনো লতা ঝোপে ভরতি। বিভাসদের বাড়ির সামনে বাগান নেই, রাস্তা ছাড়লেই

দালানে ওঠার সিঁড়ির চওড়া ধাপ। বাগান একটা আছে, বাড়ির পিছনে, সবাইকে দেখাবার মত নয়।

সেদিন বিকেলেই, সিংরা ওপাড়ায় আসার পরদিন, উদয়প্রতাপ সিংয়ের ছেলে বিজয়প্রতাপের সঙ্গে আলাপ হয়েছিল। অপরিচিতের সঙ্গে আলাপ করতে, অল্প সময়ের আলাপে ঘনিষ্ঠ হতে বিজয়প্রতাপের বিন্দুমাত্র দ্বিধা ছিল না।

গম্বুজের চূড়োয় শেষ রুদ্দুরের রঙ দেখছিল বিভাস, ইন্দ্রাণী কৃষ্ণচূড়ার চিকন পাতা নখ দিয়ে কুচিকুচি করে কাটছিল। সিংদের একতলা বাড়ির ছাতে মাউথ অর্গানের বাজনা শুনে দুজনে ফিরে তাকাল। তাদের দিকেই তাকিয়ে ছিল বিজয়প্রতাপ সিং, অর্গানটা মুখ থেকে নামিয়ে পরিপাটি করে হাসল, সাগ্রহে চিৎকার করল, 'হ্যালো!

তিনজন পরস্পরকে পর্যবেক্ষণ করল একটুক্ষণ। বিজয়প্রতাপই আবার বলল, 'আসতে পারি?' বিভাসের মনে হয়নি হ্যাংলা, ইন্দ্রাণী কী ভেবেছিল জানে না।

বিভাসকে নিচে নেমে বিজয়প্রতাপকে পথ দেখিয়ে ছাতে নিয়ে আসতে হল। সিঁড়ি দিয়ে উঠতে উঠতে দেখল, ঠিক তখনই তার দাদা ওষুধের কারখানা থেকে ফিরছে।

রীতিমত আনুষ্ঠানিকভাবে পরিচয় হল। ইন্দ্রাণী রায়, এবারে স্কুলের শেষ পরীক্ষা দিয়েছিল, সুবিধে হয় নি, আগামী বছরে হবে। বিভাসকুমার চট্টোপাধ্যায়, আগের বছর সগৌরবে কলেজে ঢুকেছে। বিজয়প্রতাপ সিং, এবারে আর হল না, সামনের বছরে লক্ষ্ণৌয়ে মেডিকেল কলেজে প্রবেশের পরিকল্পনা রয়েছে।

আসন্ন সন্ধ্যেয় কার্নিসে বসে ইন্দ্রাণীর মুখে শরীরে নিবদ্ধ বিজয়প্রতাপের এক বিচিত্র দৃষ্টি কয়েকবার নিরীক্ষণ করে সেই প্রথম, এতদিনে সেই প্রথম, বিভাসের চোখে জীবন যৌবনের কী সব দুর্জ্ঞেয় রহস্য যেন উন্মোচিত হল। সেই রহস্যের সংজ্ঞা পেল না, অবয়ব না, শুধু মনে হল অপরিমেয়। সেই প্রথম বুঝলাম, আমাদের বয়েস বাড়ছে। ইন্দ্রাণী নিজের শাড়িতে, ধার করা নয়, সুপ্রতিষ্ঠিত; আমার আর বিজয়প্রতাপের চিবুকে, নাকের ছায়ায় রেশমের রোঁয়া।

রুমাল বিছিয়ে বিজয়প্রতাপ ট্রাউজারের পকেট থেকে মুঠোমুঠো আখরোট কিসমিস স্তূপ করে রাখল। নিয়মিত ব্যবধানে হাত বাড়িয়ে তুলে নিয়ে সেগুলো কাঠবেড়ালীর মত চিবোতে শুরু করল তিনজন। ইন্দ্রাণীর হাত যে আমাদের খাবার মত হাত থেকে এত আলাদা, আগে জানতাম না। ইন্দ্রাণীর হাতের রঙ যে এমন, আগে জানতাম না। আমাদের লজ্জা ছিল না; ইন্দ্রাণী কাঠবেড়ালীর মত আখরোট কিসমিস চিবোতে চিবোতে এমন লাজুক লাজুক হাসতে পারে, আগে জানতাম না।

তখন কোথাও আর রোদের চিহ্ন ছিল না। কখন যেন কৃষ্ণচূড়ার জালিকাটা চিকন পাতার মধ্য দিয়ে হাওয়ায়-ওড়া বরফের কুচির মত রোঁয়ারোঁয়া অন্ধকার ছাতে এসেছে। ঠিক কখন আসে দেখতে পাই না, তবু যেন ইন্দ্রিয়সংবেদ্য। গম্বুজের কোটরে কোটরে পাখিগুলোর বাসা অন্ধকার, নবাব খানের বাগানে ছোট ছোট ঘণ্টার মত ডালিম হারিয়ে গেছে। অবশ্য কোথাও, অন্য কোথাও, হয়ত রোদ ছিল। দূর দক্ষিণে যমুনা ব্রিজের সাদা শরীরে তখনও হয়ত শেষ রুদ্দুরের রঙ ছিল।

আর নয়, ছাত থেকে সিঁড়ি বেয়ে তিনজন নিচে নেমে এল। সৌজন্যে ত্রুটি থাকে কেন। বারান্দা পার হয়ে বিভাস ওদের নিয়ে এল নিজের ছোট ঘরে, বাড়ির মধ্যে সব থেকে ছোট ঘরে। বই বোঝাই শেল্‌ফ্‌ নয়, বই উপচেপড়া টেবিল নয়, অপরূপ টেবিল ল্যাম্পটা

নয়, বিজয়প্রতাপ দেওয়ালে ঝোলান একটা জিনিসের দিকে তর্জনী তুলে দেখাল, 'তুমি বাজাও?'

সাদা ফুলতোলা নীল কাপড়ে ঢাকা বিরাট সেতারটা ঝুলছিল, কত বছর থেকে ঝুলছে। 'আমার মা বাজাতেন।'

'এখন বাজান না?'

'মা ত নেই। ছ'বছর হল মৃত্যু হয়েছে।'

'আমার মা মরেছেন আমার দু'বছর বয়সে।' বিজয়প্রতাপ সেতারটায় একটা টোকা দিয়ে সাদা ফুলতোলা নীল কাপড়ের ঢাকনা থেকে একটু ধুলো ওড়াল। 'প্রাচীন ভারতের বাজনা।'

'তার মানে?' বিভাস আর ইন্দ্রাণীর চোখ গোলগোল হয়ে এল।

আগের মতই ঠাণ্ডা গলায় বিজয়প্রতাপ বলল, 'প্রায় প্রাগৈতিহাসিক বাদ্যযন্ত্র।'

'ও, একালের বাদ্যযন্ত্র বুঝি মাউথ অর্গান?' কথায় একটু উত্তাপ মেশাতে চেয়েছিল বিভাস, তেমন জমল না।

'কথাটা মিথ্যে নয়, আমি মাউথ অর্গান বাজাই বলেই কথাটা মিথ্যে না।' একফালি ভুয়োদর্শীর হাসি উপহার দিল বিজয়প্রতাপ। 'তখন ছাতে দাঁড়িয়ে কী বাজাচ্ছিলাম বল ত?'

বিভাস বলতে পারল না, ইন্দ্রাণীও না।

ওদের মাথার ওপর দিয়ে পিছনের দেওয়ালের দিকে তাকিয়ে বিজয়প্রতাপ টেনেটেনে বলল, 'দি লং হট্ সামার।'

বিভাস কিছু বুঝতে পারল না, ইন্দ্রাণীও না।

আর ঠিক তখন বিভাসের একটু হিংসে হওয়া বোধহয় স্বাভাবিক ছিল। রবীন্দ্রনাথের কবিতায় পড়েছে ঈর্ষা মহতী। তবু সেই মহতী অনুভব তেমন তীব্র হল না। অথচ বিজয়প্রতাপ ঘরের প্রায় সব কিছু উপেক্ষা করে বারে বারে দুরন্ত পিঙ্গল চোখ রাখছিল ইন্দ্রাণীর মুখে এবং ইন্দ্রাণীর শরীরে। তার দৃষ্টি অনুসরণ করে, ইন্দ্রাণীর মৃদু অস্বস্তি দেখে, সেদিন প্রথম বুঝেছিলাম, কৈশোর আর নেই, থাকবে না। আমাদের বয়েসের তখন এক নতুন ঋতু।

বেরিয়ে সামনের সরু রাস্তাটা পার হয়ে সিংদের বাড়ি যেতে হল। বিজয়প্রতাপের ঘরখানা একটু বড়, বাড়ির বাইরের দিকে, প্রায় রাস্তার পাশে। বিছানায় দু-তিনখানা হিন্দী ইংরেজী সিনেমার পত্রিকা ছড়ান। এসব এমন প্রকাশ্যে পড়া যায়, নাড়াচাড়া করা যায়, জানতাম না।

ভিতরের দিকে গিয়ে বিজয়প্রতাপ চায়ের জন্যে হাঁক দিল। এ কাজটা আমিও করতে পারতাম, আমিও ত চা খাওয়াতে পারতাম। তখন ঠিক মনে হয়নি। কেন যে মনে হয়নি!

ঘরের মধ্যে বেশি কিছু নেই, যা আছে তাও গুছোন হয়নি, এলোমেলো ছড়ান। একটা টেবিল ঘরের প্রায় মাঝখানে দাঁড়িয়েছিল; সেটাকে এককোণে জানলার পাশে টেনে এনে বিজয়প্রতাপ অন্য কোন ঘর থেকে দুখানা চেয়ার আনল, একখানা চেয়ার সেই ঘরেই ছিল। টেবিলটা যেখানে টেনে আনা হল তার কাছেই মেঝেয় চার-পাঁচখানা বাঁধান ছবি পরপর সাজান ছিল, এখনও দেওয়ালে টাঙান হয়নি। ওপরের উজ্জ্বল রঙের ছবিখানা দেখে উৎসাহিত হল বিভাস। এ ছবি আগে কয়েকবার দেখেছে তার বাবার ঘনিষ্ঠ বন্ধু রেভারেণ্ড আর্মারের ঘরে। চড়া মৃদু রঙে আঁকা যীশুর হাতে একটি আলো, পথের পাশে আপেল

ছড়ান, ডান হাত বন্ধ দ্বার-লগ্ন। ছবিখানা বিভাস টেবিলের ওপর নিয়ে এল। চিত্রকলার সমঝদারের মেজাজে বলল, 'জান কার আঁকা?'

বিজয়প্রতাপ বলতে পারল না, ইন্দ্রাণীও না।

'হলম্যান হান্ট। অজস্র প্রতীকের ব্যবহার ছবিখানার বৈশিষ্ট্য। এই বন্ধদ্বার হৃদয়ের প্রতীক।' রেভারেন্ড আয়ারের কথা নিজের মত করে নিয়ে বিভাস একটা চমকপ্রদ বক্তৃতা ফাঁদছিল গাল ফুলিয়ে। কিন্তু বিজয়প্রতাপ এমন একটা ভাব দেখাল যেন বিষয়টি নেহাত অপ্রাসঙ্গিক। আর তখনই চা এল। নামিয়ে রেখে আসতে হল ছবিখানা।

উদয়প্রতাপ সিং একবার কী কারণে যেন এই ঘরে এসে তাদের দেখে বেরিয়ে গেলেন। তিনি ঘরে এলে বিভাস উঠে দাঁড়াতে যাচ্ছিল, কিন্তু আর দুজন তেমন কিছু করছে না দেখে বসেই রইল।

চায়ে প্রথম চুমুক দিয়ে ইন্দ্রাণীর দিকে তাকিয়ে বিজয়প্রতাপ বলল, 'এই শহরে কোনদিন বাস করিনি, শুধু কয়েকবার বেড়াতে এসেছি। আমার তেমন আগ্রহ ছিল না। তবে এখন খুব ভাল লাগছে। তোমাদের সঙ্গে আলাপ হওয়ায় এত আনন্দ পেলাম, তোমাদের এত ভাল লাগছে!'

দুটো পিঙ্গল চোখ দুঃসহ হওয়ায় বোধহয় ইন্দ্রাণী মুখ নিচু করে চায়ের গরম কাপে ঠোঁট চেপে রইল। এসব কথা এমন করে বলতে হয় বিভাস জানত না। কাউকে খুব ভাল লাগলে এমন স্পষ্ট করে গুছিয়ে বলতে হয়, বলা যায়, জানত না।

চা শেষ করে সবার আগে ইন্দ্রাণী উঠে দাঁড়াল। 'এবার যেতে হবে। চলি।' বিজয়-প্রতাপের দিকে একবার তাকিয়ে বিভাসের দিকে ফিরল। 'চল বিভাস।'

অন্ধকার বারান্দা পার হয়ে রাস্তার মাঝখানে এসে একটু দাঁড়াল তিনজন। একটি-দুটি হাসি কথার পর বিজয়প্রতাপ ফিরে গেলে, ইন্দ্রাণী ডালিম গাছের তলায় অন্ধকারে ডুবলে, বিভাস নিজের ঘরে এসে আলো না জেবলেই বিছানায় গড়িয়ে পড়ল। কেন যেন ইচ্ছে হল, সকালবেলার আলোয় নবাব খানের বাগানে ডালিমগুলোকে নতুন করে দেখবে। আমি কি কখনও সকালের আলোয় ডালিমগাছটার দিকে তাকাইনি, তাকাতে শিখিনি বিজয়-প্রতাপের মত। সকালটা তাড়াতাড়ি আসুক।

## দুই

সিভিল লাইন্সের সদর মহল্লায় এসে দাঁড়াল তিনজন, তখনও সন্ধ্যে হতে অনেক দেরি। রাস্তার দু'পাশে চওড়া পেভমেন্টে ছড়ানো শুকনো হলুদ পাতা, অজস্র নয়, তবে মাত্র একটি-দুটিও নয়। গাড়ির চাকায় চাকায় প্রচুর ধুলো উড়ছে, একটু পরে নাক জ্বালা করবে। একটা সাইকেলরিক্স মেরামতির দোকানে কয়েকটা তীক্ষ্ণ কর্কশ মিশ্র শব্দ, কানে লাগছে। দোকানটার সামনে থেকে অনেক সরে দাঁড়াল।

একটা মৃত ঘোড়ার টানা একায় আস্ত তিনটে অ্যামেরিকান সৈন্য প্রচণ্ড উল্লাসে ঢলে ঢলে পড়ছে পরস্পরের গায়। ঘোড়াটা অবশ্যই মরে গেছে, না হলে ক্রমাগত চাবুকের ঘায়ে এমন নির্লিপ্ত থাকা অসম্ভব। একবার এমন একটা ঘোড়ার টানা এক টাঙার উঠেছিল বিভাস বাবার সঙ্গে। টাঙার মালিককে জিজ্ঞেস করেছিল, ঘোড়াটা আর কতদিন বাঁচবে? লোকটা বলেছিল, দানাপানি পেলে আরও পাঁচ বছর। তার কথা শুনে স্বস্তির নিশ্বাস

ফেলেছিল। বুঝেছিল, সেই লোকটা পাঁচ বছরের আগেই মরবে। সেই লোকটা নির্ঘাৎ পাঁচ বছরের আগেই মরেছে। কিন্তু তার মৃত্যুর পর ঘোড়াটা কি শেষ দিন পর্যন্ত দানাপানি পেয়েছিল।

এই শহরে প্রাইভেট মোটরের সংখ্যা নগণ্য। তবে এখন ফাফামাও এয়ার স্ট্রিপ থেকে কার্জন ব্রিজ পার হয়ে, ক্যান্টনমেন্ট থেকে ম্যাক্‌ফার্সন লেক ছুঁয়ে মিলিটারি ট্রাক আর জীপ প্রায় অবিরাম আসছে। সিভিল লাইন্সে সব সময় বৃটিশ আর অ্যামেরিকান সৈন্যদের ভিড়।

তাদের পাশ দিয়ে একখানা জীপ গেল। পিছনের সিটে দুটো সৈন্যের মাঝখানে বসে সামরিক পোশাক পরা একটি ভারতীয় মেয়ে যেন স্যান্ডউইচের পুর হয়ে হাসছে। বিজয়-প্রতাপ দাঁতে দাঁত চেপে বলল, 'লাকি ডগ!' কথাটা শোনাল বিলাপের মত।

ইন্দ্রাণীকে নিয়ে এর আগে সদরমহল্লায় এসেছে বিভাস। আজ প্রথম ইন্দ্রাণীর দিকে তাকিয়ে ভাবল, সৈন্যদের থেকে দূরে থাকাই ভাল, বিশেষ করে ইন্দ্রাণীকে নিয়ে সন্ধ্যের মুখে এখান থেকে দূরে থাকাই ভাল। অথচ, লক্ষ্য করল, বিজয়প্রতাপ উৎসাহে অস্থির।

একঝাঁক গ্যাসবেলুনের সুতো ধরে একটি লোক হাঁটছিল। একটা ট্রাক যেতে যেতে হঠাৎ থামল তার কাছে। ছ'-সাতটি উল্লসিত সৈন্য লাফিয়ে নামল, ঘিরে ধরল তাকে। জ্বলন্ত সিগারেট চেপে চেপে প্রত্যেকটি বেলুন ফাটাল, প্রায় যুদ্ধজয়ের জিগির তুলে আবার লাফিয়ে উঠল ট্রাকে। লোকটি প্রার্থনার ভঙ্গীতে দু'হাত জুড়ে হাঁ করে দাঁড়িয়ে রইল, কেঁদে ওঠার অবকাশ পায়নি। চলন্ত ট্রাক থেকে একখানা নোট উড়ে এল, দশটাকার নোট হবে। আর তাই নিয়ে কাড়াকাড়ি। একজন নোটখানা লুফে নিয়ে পকেটে রেখেছিল, হয়ত একটুক্ষণের জন্যে সরে পড়ার অসম্ভব আশাকে প্রশ্রয় দিয়েছিল। অন্য সবাই ঘিরে ধরল তাকে। যার ক্ষতি হয়েছে, যার প্রাপ্য, নোটখানা তাকেই দিতে হবে। দেখা গেল, কারও নীতিবোধে কমতি নেই।

ক্যাথিড্রাল পর্যন্ত যাবার ইচ্ছে ছিল, যাওয়া হল না। একটা মোড় ঘুরল তিনজন। সামনেই বড় বড় হরফে লেখা 'রামাজ বার অ্যান্ড রেস্টরান্ট।' সেদিকে একবার তাকিয়েই প্রায় দৌড়ে রাস্তার ওপারে যেতে হল। ভারী কিছু ছুঁড়ে কেউ রেস্টরান্টের ঘষা কাচের দেওয়াল ভাঙল খানিকটা। চার-পাঁচটি খাকি শাড়ি পরা মেয়ে নিয়ে একদল সৈন্য ধ্বস্তা-ধ্বস্তি করতে করতে বেরিয়ে এল রেস্টরান্ট থেকে। মদ গিলে সবাই বেসামাল। মনে হল, কিছু ইংরেজ, কিছু ইয়াংকী। বাইরে এসে দুটো দল থাবা উঁচিয়ে আক্রমণ করল পরস্পরকে। পেটে লাথি খেয়ে একজন পড়ে গেল। সঙ্গে সঙ্গে তীক্ষ্ণ কর্কশ চিৎকার করে উঠল মেয়ে ক'টি। কয়েক মিনিটের মধ্যে নিরাপদ দূরত্বে কয়েক শ' লোকের ভিড় জমে গেল। ঘেঁষাঘেঁষি করে দাঁড়িয়ে রইল তিনজন। খেয়োখেয়ি জমল না, কান সিরসির করা বাঁশি বাজিয়ে মিলিটারি পুলিস এসে গেল।

ইন্দ্রাণী আর বিভাস প্রায় একসঙ্গে বলল, 'ফিরি চল।'

'কেন?' বিজয়প্রতাপ যেন আকাশ থেকে পড়ল।

'সন্ধ্যে হয়ে এল। আলোগুলোয় ত কাল রঙ লেপেছে। এখন ফিরে যাওয়াই ভাল।' বিভাস এখনই ফেরার সঙ্গত কারণ দেখাতে চাইল।

'ভয় করছে?' বিভাসের মুখে চোখ রেখে পরিপাটি করে হাসল বিজয়প্রতাপ।

না, ঠিক ভয় না। আতঙ্ক নয়। কেমন যেন গা ঘিনঘিন করে। বিভাস শুধু বলল, 'ভাল লাগছে না।'

'চল।' একটু করুণার হাসি লেগে রইল বিজয়প্রতাপের ঠোঁটে।

সন্ধ্যে হল, আলো জ্বলল, রাস্তা আলোকিত হল না।

ফেরার পথে একটা গলির মুখে আবার লালমুখ। অন্তত পনেরটি। আট দশখানা সাইকেলরিক্সয় ছড়িয়ে বসে গলিতে ঢুকছে।

বিজয়প্রতাপ ফিসফিস করে বিভাসকে বলল, 'কোথায় সব যাচ্ছে জান?'

বিভাস ঠিক জানে না, হয়ত জানে, পরিচ্ছন্ন ধারণা নেই। কিছু বলল না। নোংরা গলিটার দিকে তাকাতে ইচ্ছে হল না। ভাবল, বাড়ি ফিরে নিজের ঘরে গিয়ে সেই বইখানা, সেই কবিতার বইখানা, যার প্রায় কিছুই বোঝে না, আবার পড়বে। যদি আবার পড়ি, অনেকক্ষণ ধরে পড়ি, তাহলে মনের এই তেতো তেতো স্বাদ হয়ত মরবে।

## তিন

সেই যুদ্ধ। বিভাসের মনে আজ শুধু তিক্ত স্মৃতি। বিজয়প্রতাপ তাকে ছেলেমানুষ বলত। সেই ছেলেমানুষ আর নেই, মরে বেঁচেছে। বয়েস বেড়েছে, একটি একটি করে মরেছে ছেলেমানুষি ইচ্ছেগুলো। হয়ত চতুর কুটিল হয়েছে। ঠিক ঠিক বুঝেছে, শুদ্ধতা সুরুচি বেদনাবোধ—এইসব অশ্লীল কথা শুনলে যে-কোন মানুষের কান লজ্জায় লাল হবে, যুক্তিসঙ্গত কারণেই হবে। একেবারে মুক্তপুরুষ হতে পারত, যদি শূন্যতায় মন ভরে যেত। এখানেই মুশকিল। শুধু সেই যুদ্ধের নয়, আরও অনেকগুলো বছরের দিনরাত্রির শীত গ্রীষ্মের স্মৃতির, ভাবনার ভার মনে।

নবাব খানকে দেখেছে, তাঁর বেগমকে দেখেছে, আজন্ম। এতকাল তাঁদের যে ওপরের চেহারা দেখেছে সেটাই যথেষ্ট নোংরা। বস্তুত ওবাড়ির আবহাওয়া তার পক্ষে দুঃসহ ছিল বলেই বাগানটা পার হয়ে বাড়ির মধ্যে খুব কমই গিয়েছে। একটু বড় হবার পর কখনও ঘরে গিয়ে বসেছে মনে পড়ে না। ফলে ইন্দ্রাণীই আসত, তার ঘরে, ছাতে গম্বুজের ছায়ায়।

নবাব খান আর তাঁর বেগমের ছেঁড়া ফুটো আভিজাত্যের নোংরা আস্তরণের তলায় আরও যে এত বিষ সঞ্চিত ছিল, বিজয়প্রতাপ না এলে বোধহয় কোনদিন জানতে পারত না। বিজয়প্রতাপ না এলে সেই বিষ এমন করে উৎসারিত হত না।

বিভাস জানত, ইন্দ্রাণীর বাবা নবাব খানের নাম নবাব খান নয়, কীর্তীশচন্দ্র রায়। সিভিল লাইন্স থেকে অনেকটা দূরে অন্য পাড়ায় এক নবাব খান ছিল, তার এক বেগম ছিল, তাদের একটি মেয়ে ছিল। আফগানিস্থানের রাজপরিবারভুক্ত ছিল তারা। প্রাসাদ-বিপ্লবে রাজত্ব হারিয়ে তারা এদেশে এসে আশ্রয় নিয়েছিল, ইংরেজ সরকারের কাছ থেকে মাসোহারা পেত। তাদের সঙ্গে কী করে যেন মিল খুঁজে পেয়ে কীর্তীশ রায়কে পাড়ার লোক নবাব খান বলত, তাঁর স্ত্রীকে বলত বেগম।

বিভাস শুনেছিল, কীর্তীশ রায় আসলে কীর্তিনাশা। রায়দের এই শহরে, শহরতলীতে অনেক বাড়ি জমি ছিল। মিঅরাবাদে রসুলাবাদে বাড়ি ছিল, টেগোর টাউনে জমি ছিল অনেক। কীর্তীশ রায় সব বেচে দিয়ে এখন ফতুর। অথচ নবাবী দম্ভটি আছে। ঢোলা পাজামার ওপর চিকনের সূক্ষ্ম কাজ করা মিহি আদ্দির পাঞ্জাবী পরেন। সোল্লাসে বেসামাল পান করেন এবং প্রায় অবিরাম পান খাওয়ার ফলে এখন পানের লাল রসে ঠোঁট আর দাঁতের রঙ ঘন কাল। ভদ্রলোকের দুটো চোখ ঘিরে অনেকখানি করে গভীর অন্ধকার।

গায়ের রঙ মাখনের মত। বিভাসের চিরকাল মনে হয়েছে, সোনা রঙ আর কাল রঙের এমন বিচিত্র ঘনিষ্ঠতা আর কোথাও কোনদিন দেখবে না।

বেগমের আসল নাম বিভাস কখনও শোনেনি, শুনবার বাসনাও কখনও হয়নি। তাঁর তেলহীন চুলের চতুর বিন্যাসে, তীক্ষ্ণাগ্র রক্ত রঙ নখে, আচ্ছাদনের স্বল্পতায় আর ঠোঁট গাল ভুরুর রঙের প্রাচুর্যে এমন কিছু ছিল যার ফলে তাঁকে মাতৃস্থানীয়া ভাববার অবকাশ মেলে নি।

সেই বাড়ির মেয়ে ইন্দ্রাণী। বিভাসের বিস্ময়ের অন্ত থাকত না। অবশ্য তখন তার বিস্ময়বোধের বয়েস।

সেই বাড়ির প্লানিকীর্ণ বাইরের চেহারায়ই বিভাস যথেষ্ট আহত হত, সুতরাং ইদানীং তার আন্তরালের প্রতি কোনই আগ্রহ ছিল না। আর মাত্র ছ'মাসের মধ্যে বিজয়-প্রতাপ সেই বাড়ির অন্তঃপুরে সুপ্রতিষ্ঠিত হল, স্বীকৃত হল সানন্দে। ছুটির দিন দুপুরে এবং অন্য সব দিন বিকেলে তাকে নবাব খানের বাড়ি আনাগোনা করতে দেখেছে। দুপুরে ছাতে গম্বুজের ছায়ায়, বিকেলে রোদ পড়লে খোলা কার্নিসে বসে দেখেছে।

নবাববাড়ির অন্তঃপুর মাড়াত না, কিন্তু সেখানকার হাওয়ার বিষ নিশ্বাসে টেনে নিয়েছিল। আগে আগে কথা বলার কেউ না থাকলে এক-একখানি বই কোলে নিয়ে ছাতে বসে থাকত দীর্ঘ সময়, সিভিল লাইন্সের চৌহদ্দি ছাড়িয়ে লক্ষ মাইল দূরে কোথায় উধাও হত, রোদ মুছে গিয়ে ছায়া প্রসারিত হত, এক সময় চোখের অস্বস্তিতে বই থেকে মুখ তুলে আশপাশের কিছুই আর চিনতে পারত না একটুক্ষণ। নিশ্বাসে বিষ টেনে নিয়ে সেই ছেলেমানুষটিকে মেরেছিল বিভাস। তখন বারে বারে নবাববাড়ির দিকে, বিশেষ করে নবাব-বাড়ির বাগানটার দিকে চোখ পড়েছিল। মনে হত, দুর্লক্ষ্য অন্ধকারে বসে কে যেন সুতো টানছে, আর নানা রঙের পুতুলের বিচিত্র নৃত্যভঙ্গিমায় তার বিস্ময়ের অন্ত নেই।

বিজয়প্রতাপ এক-একটা বেলা কাটিয়ে দিত নবাববাড়ির অন্তঃপুরে। অথচ নিশ্চয়ই ইন্দ্রাণীর সঙ্গে কথা বলতে যেত না। ইন্দ্রাণী তো সেই সব সময় বিভাসদের বাড়িতে কাটাত। এতক্ষণ ধরে বিজয়প্রতাপ কার সঙ্গে গল্প করে জানতে চাইলে, ইন্দ্রাণী শুধু বলত, সে কিছু জানে না। এবং এ প্রসঙ্গ তুললেই ইন্দ্রাণীর মুখের রঙ কেমন অবিশ্বাস্য-ভাবে বদলে যেত। কপাল, নাসাগ্র স্বেদাক্ত হত, এমনকি কী এক কঠোর সংকল্পে চাপা ঠোঁট যেন কাঁপত তিরতির করে।

ইন্দ্রাণীকে নতুন করে দেখতে চেয়েছিল বিভাস। হয়ত দেখেছিল, তবে নিজের মত করেই, বিজয়প্রতাপের চোখে নয়। 'এইখানটা জোরে জোরে পড়ছি শোন,'—'আর এক মাস পরে কৃষ্ণচূড়ার ডালগুলো লাল হয়ে যাবে,'—'চল না নিচে যাই, সেই রেকর্ডটা বাজাব', অথবা খুব বেশি হলে 'শাড়িটা নতুন বুঝি, তোমাকে মানায়'—এই ধরনের কথাই বলত বিভাস, এতকাল যেমন বলত। আর এসব কথা যখন বলত তখনও হয়ত ভাবত, আকাশে মেঘ যে বারে বারে নতুন নতুন মূর্তি গড়ে ভেঙে ফেলে তার ওপর একখানা বিখ্যাত বই আছে, বইখানা পেলে একবার পড়ে দেখবার চেষ্টা করতে হবে।

বিজয়প্রতাপ তাদের এড়িয়ে চলছিল। ছাতে আসত না, বিভাসদের ছাতে না, সিংদের না। কোন কোন দিন সারা দুপুর নবাববাড়িতে কাটিয়ে বিকেলে যখন মাতালের মত বাগানটা পার হয়ে যেত, একবারের জন্যও ওপরে ছাতের দিকে তাকাত না পর্যন্ত।

বিভাস বরং ব্যস্ত থাকত, তার কলেজ ছিল, ইন্দ্রাণী আর বিজয়প্রতাপের কোন কাজ

ছিল না, তবু ভাবত সিংদের বাড়ি গিয়ে বিজয়প্রতাপের সঙ্গে কথা বলবে, তাদের এড়িয়ে চলার কারণ জিজ্ঞেস করবে। কিন্তু যেতে পারে নি, একদিনও বিজয়প্রতাপের সামনে যেতে পারে নি। না যেতে পারার কারণ তার কাছে স্পষ্ট ছিল না, তবু তখন সিংদের বাড়ি যেতে মন সায় দেয় নি। শুধু কেন যেন ভেবেছে, এর মধ্যে ক্লিন্ন রহস্য কিছু আছে, যা উন্মোচিত হলে তার মন আরও তেতো হবে।

একটা ছুটির দিন দুপুর একটু গড়িয়ে গেলে নবাব খানের বাংলোর বারান্দায় যে নাটক হল তা দেখে বিভাস ভাবল, তার পিঠে ক্রমাগত চাবুক পড়ছে, তাকে একটা এক্কার সঙ্গে যুতে দেওয়া হয়েছে যার ওপর তিনটে আস্ত অ্যামেরিকান সৈন্য উল্লাসে ঢলে-ঢলে পড়ছে পরস্পরের গায়। আগে বিজয়প্রতাপ, পিছনে নবাব খান আর তাঁর বেগম ঘর থেকে বারান্দায় এলেন। তিনজনকেই মনে হল, হিংস্র জানোয়ার। বিজয়প্রতাপ মাতালের মত কিন্তু দ্রুত পায়ে বাগানটা পার হয়ে ফুসতে ফুসতে চলে গেল। তখন নবাব খান তাঁর বেগমের চুল মুঠো করে ধরলেন, বেগম আক্রোশে হন্যে হয়ে নবাব খানের বুকের কাছ থেকে পাঞ্জাবী টেনে ছিঁড়ে ফালা করে দিলেন। জড়াজড়ি করতে করতে তাঁরা বারান্দা থেকে ঘরে চলে গেলেন। ঘরে ঢোকার সময় দরজার দুটো কপাট দেওয়ালে আছড়ে পড়ার শব্দ হল। পরস্পরের উদ্দেশে যে সব কথা তাঁরা বলছিলেন তার প্রায় সবই অশ্রাব্য।

ইন্দ্রাণী গম্বুজের ছায়া থেকে উঠে সিঁড়ি বেয়ে তরতর করে নীচে নেমে গেল। একটু পরে বিভাস নিচে এসে দেখল, তার ঘরে ইন্দ্রাণী মুখ নামিয়ে বসে আছে। কোন কথা বলল না, তার দিকে তাকাল না। কপাল আর নাসাগ্র স্বেদাক্ত, কী এক কঠোর প্রত্যয়ে চাপা ঠোঁট তিরতির করে কাঁপছে।

সবকিছু বড় জটিল মনে হল বিভাসের। জটিল সন্দেহ নেই, তবে ঠিক দুর্বোধ্য নয়। তার বিস্ময়বোধ তীব্রতার একটা পর্যায়ে উঠে যেন শিথিল হয়ে গেল। চুপচাপ একটুক্ষণ ঘরের মধ্যে দাঁড়িয়ে থেকে বাইরে এল পায়ে পায়ে। রাস্তায় নেমে বাঁয়ে নবাব খানের আর ডাইনে সিংদের বাড়ি রেখে সোজা হাঁটতে শুরু করল।

নিজের মাকে বিভাস কখনও সুস্থ দেখে নি। শেষের দিকে তাঁর একটা চাকা-লাগান চেয়ার ছিল। দিনের বেশির ভাগ সময় আর খানিকটা রাত পর্যন্ত সেই চেয়ারে বসে থাকতেন। তারা চেয়ারখানাকে ঠেলে ঠেলে এঘরে-ওঘরে নিয়ে যেত। সুর করে কবিতা পড়ার অভ্যেস ছিল। কম বয়েসে কাকে কবিতা পড়ে শোনাতেন বিভাস আন্দাজ করতে পারে। শেষের দিকে শ্রোতা ছিল বিভাস, মাঝে মাঝে ইন্দ্রাণী। রোগের যন্ত্রণা ছিল, তবু প্যাতলা ঠোঁটে শুধু হাসতেন। বিভাস তাঁকে কখনও রেগে চিৎকার করতে শোনে নি, কখনও যন্ত্রণায় বিকৃত দেখেনি মুখ। বারান্দায় চাকা-লাগান চেয়ারে বসে সুর করে কবিতা পড়তে পড়তে, ঘড়ির দিকে না তাকিয়েও নির্ভুলভাবে বুঝতে পারতেন ঠিক কখন বিভাসের বাবা ডিসপেনসারী থেকে ফিরবেন। বইখানা তার হাতে দিয়ে বলতেন, 'পরে আবার পড়ব। তোমরা ঘরে যাও। আমি এখানে একটু বসি।'

শেষ কয়েক মাস যখন বুঝলেন, সব রেখে চলে যেতে হবে, পাতলা ঠোঁটে একটু হাসি জড়িয়ে থাকত, কিন্তু দৃষ্টি কী দুঃসহ করুণ হয়েছিল! তাঁর মৃত্যুর পর বিভাসের বাবা, জিতেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়, বেঁচে রইলেন, বেঁচে আছেন। কিন্তু সব ছাড়লেন, নিজেকে প্রায় নির্বাসন দিলেন বাড়ির পিছনের দিকের একটা ঘরে আর সেই ঘর সংলগ্ন বাগানে। এখন বাইরের কেউ তাঁকে দেখলে বিশ্বাস করবে না ইনি ডাঃ জিতেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়। টেনিস

র‍্যাকেট হাতে মেডিকেল কলেজের এক তরুণ ছাত্রের যে ছবি দেওয়ালে টাঙান আছে তার সঙ্গে তাঁকে মেলান অসম্ভব। বলা যায়, এই বয়েসেও একজনের মৃত্যুতে আর একজনের জীবন্মৃত্যু নিতান্ত যুক্তিহীন। কিন্তু এমন কঠোর যুক্তি দিয়ে বিচার করতে বিভাস তখনও শেখেনি। বরং মা'র মুখ মনে এলে, বাবাকে পিছনের নির্জন বাগানে বসে থাকতে দেখলে, স্বর্গের বৈভবে আস্থা না থাকলেও, রেভারেন্ড আয়ারের একটা কথা কানে বাজত, 'বিভাস, ঈশ্বরের, জিসাস ক্রাইস্টের আর এক নাম ভালবাসা!'

আজ বাংলোর বারান্দায় ইন্দ্রাণীর মা-বাবাকে দেখার পর থেকে মনে হচ্ছিল, হাওয়ায় শুধু বিষ।

একটা শুকনো হলুদ ইউক্যালিপ্টাসের পাতা কুড়িয়ে নিয়ে হাতের মুঠোয় ঘষে ঘষে গুঁড়ো করল, নিশ্বাসে গন্ধ টেনে নিল। পাতার কুচি নাকের মধ্যে ঢুকে যাওয়ায় হাঁচল কয়েকবার।

রাস্তায় বিজয়প্রতাপের সঙ্গে মুখোমুখি। পরিপাটি করে হেসে বিজয়প্রতাপ বলল, 'হাঁ করে দেখছিস কী?'

'কিছু না। গিয়েছিলি কোথায়?'

'বেড়াচ্ছিলাম সদর মহল্লায়। বাড়ি ফিরছি।' একটু থেমে বিজয়প্রতাপ বলল, 'তখন দেখেছিস কিছু? কিছু শুনেছিস?'

বিভাস চুপ।

'নবাব খান আমাকে অপমান করতে চেয়েছিল। চেয়ার তুলেছিল মারবে বলে। আমার দিকে, আমার চোখের দিকে তাকিয়ে আর এগোল না, চেয়ার নামিয়ে রেখে দিল। শুধু অক্ষম গর্জন।'

দুজনেই চুপ করে রইল কিছুক্ষণ। তবে মনে হল, প্রশ্ন না করলেও বিজয়প্রতাপ আরও কথা বলবে। বস্তুত কথা বলার জন্যে সে উৎসুক। তার অভিজ্ঞতার রসরঞ্জিত বিবরণ দেবার জন্যে সে ফানুসের মত ফেঁপে উঠেছে। অথচ, মুশকিল এই, বিভাস উপযুক্ত শ্রোতা নয়।

বিভাস প্রায় নিজের মনে ফিসফিস করে বলল, 'এন্‌জিবিশনিস্ট।'

'কী বললি?'

'কিছু না।'

ক্ষুব্ধ উত্তেজিত দেখাল বিজয়প্রতাপকে। 'আমি কী করব? আমি তো ইন্দ্রাণীর কাছে যেতাম। ইন্দ্রাণীর সঙ্গে গল্প করব বলে যেতাম। কিন্তু বেগম, দ্যাট হাঙরি উইচ, ফাঁদ পেতে আমাকে আটকাল। যাক্, তোকে বলে কী হবে, তুই বুঝবি না, তুই ছেলেমানুষ।'

ট্রাউজারের পকেটে হাত ঢুকিয়ে একটি আনকোরা যুবকের ভঙ্গীতে দাঁড়িয়ে বিজয়প্রতাপ আবার বলল, 'তবে এই শেষ নয়। এ শুধু শুরু। নবাব খান একদিন আমার হাত জড়িয়ে ধরে কাঁদবে।'

বিভাস নিজের মনের প্রত্যন্ত পর্যন্ত খুঁজছিল। ঘৃণা খুঁজছিল, বিজয়প্রতাপের প্রতি ঘৃণা। অথচ এই মুহূর্তে তার ঘৃণার অনুভব তীব্র হল না। আমি ওকে দারুণ ঘৃণা করতে পারছি না কেন, কেন? বিভাসের বিস্ময়বোধ শিথিল হয়ে গিয়েছিল। অথচ তখন নিজের মনের দিকে তাকিয়ে, বিজয়প্রতাপের প্রতি তীব্র ঘৃণা খুঁজে না পেয়ে, তার বিস্ময়ের অন্ত রইল না।

চার

সেবার বৃষ্টির কয়েকটা মাস বড় বিষণ্ণ কেটেছিল। সবুজ শ্যাওলায় ছেয়ে গিয়েছিল পুরনো ন্যাড়া ছাত। রোদ দেখা যেত না, আকাশ ঢেকে থাকত শেয়ালের গায়ের রঙের মেঘে। গম্বুজের ফাটলে আগাছার পাতাগুলো তেজী আর বড় হয়ে উঠেছিল। বিভাসের তবু একটা আশ্রয় ছিল। তার বই ছিল, অজস্র। এমনকি অ্যালফ্রেড পার্কের কতকালের পুরনো লাইব্রেরীটা থেকে পর্যন্ত বৃষ্টিতে ভিজেও বই আনত।

ইন্দ্রাণী বাড়ি থেকে প্রায় বেরোত না। বিজয়প্রতাপ সপ্তাহে একবার দুবার মাত্র এসেছে। ওদের সময় কেমন করে কাটত বিভাস জানে না।

বিজয়প্রতাপ মাঝে মাঝে আসত নিজের তাগিদে। তার অভিজ্ঞতার বিবরণ দিতে আসত, বিভাস উপযুক্ত শ্রোতা নয় জেনেও। কারণ এসব কথা বলার মত আর কেউ ছিল না। কতবার কত কূটকৌশলে বেগম তাকে ডেকেছে আর সে কতবার ঘৃণায় মুখ ফিরিয়ে নিয়েছে, তার বিবরণ। ট্রাউজারের পকেটে হাত দিয়ে ছাতে অথবা ঘরের মধ্যে দাঁড়িয়ে বেশ জোর গলায় এসব কথা বলত। ঘরের মধ্যে হলেও বসত না, দাঁড়িয়ে থাকত, পায়চারি করত উত্তেজনায়। চিৎকার করতে ভয় পেত না, জানত এ বাড়িতে শুনবার মত কেউ নেই। বিভাসের কেমিস্ট দাদা সকাল থেকে প্রায় সন্ধ্যে পর্যন্ত ওষুধের কারখানায় কাটাত, আর তার বাবা সবকিছু থেকে নির্বাসিত ছিলেন, তাঁর ঘরখানাও ছিল একেবারে বাড়ির পিছনে অনেকটা দূরে।

বৃষ্টির কয়েকটা মাস যতবার বিজয়প্রতাপ এসেছে, যাবার সময় তার একটি অনিবার্য প্রশ্ন ছিল, 'তোর এখানে ইন্দ্রাণী আসে না কেন? কোথায় যায়, বাড়ির মধ্যে কী করে?'

'আমার বুকে ইন্দ্রাণীর গতিবিধির নক্‌শা আঁকা নেই।' বিভাস বিরক্তি দেখাতে চাইত।

'আসবে, আসবে, ঠিক আসবে দেখিস।' পরিপাটি করে হাসত বিজয়প্রতাপ। যেন কবে ইন্দ্রাণী আসবে তার নির্ভুল হিসেব রেখেছে আর সেই দিনটির উৎকণ্ঠিত প্রতীক্ষায় আছে। কিছু একটা ঘটবে যেন সেই দিন, এমন একটা ইঙ্গিত ছিল বিজয়প্রতাপের হাসির রহস্যময়তায়।

ইন্দ্রাণী একেবারেই আসত না ঠিক নয়। খুব কম আসত। সেও যেন এই উপলব্ধিতে প্রায় নিথর হয়ে গিয়েছিল যে তার কৈশোর আর নেই। তার আসা-যাওয়ায়, কথায়, আচরণে সেই স্বচ্ছন্দবিহার আর ছিল না। আগের থেকে তাকে এত আলাদা মনে হত যে বিভাস ভাবত, বাড়ি থেকে খোলস থেকে সে প্রায় বেরোয় না। তখন যদি নিজের খোলস ছিঁড়ে, দ্বিধার পরিশীলিত রুচির জঞ্জাল সরিয়ে, বেরিয়ে আসতে পারতাম, বেরিয়ে এসে ইন্দ্রাণীর সামনে দাঁড়াতে পারতাম!

অথচ বৃষ্টির কয়েকটা মাস কেটে গেলে, পরিচ্ছন্ন আকাশে যখন অনেক দলছুট মেঘ, ইন্দ্রাণীর আসাযাওয়া আবার প্রায় স্বাভাবিক হল। এবং দেখা গেল, বিভাসের ঘরে, ন্যাড়া ছাতে বিজয়প্রতাপ তাদের প্রতিদিনের সঙ্গী। একটু একটু করে সব যেন সয়ে গেল। যেন কোন বিষাক্ত স্মৃতি নেই, সবার মন যেন আশ্বিনের আকাশ।

বিজয়প্রতাপ একদিন বলল, 'চল একটু অ্যালফ্রেড পার্ক থেকে বেড়িয়ে আসি।'

ইন্দ্রাণী বলল, 'না।' তখনও হয়ত একটা চোরকাঁটা ছিল তার মনে।

আবার একদিন বিজয়প্রতাপ প্রস্তাব করল, 'চল একটু বেড়িয়ে আসি। আজ বিকেলটা সুন্দর।'

ইন্দ্রাণী বলল, 'না।'

'তাহলে আমাদের বাড়ি, আমার ঘরে এস। তোমাদের চায়ের নেমন্তন্ন।'

'বেশ তো আছি এখানে, এই ছাতে।'

'এখানে আবার না হয় ফিরে আসব। আমার ওপর তোমাদের এই ঘৃণা অসহ্য। বিভাসকে আমি কান ধরে নিয়ে যেতে পারি, কিন্তু ইন্দ্রাণী, তুমি একবার এস আমার ঘরে!'

বিজয়প্রতাপ কথায় এমন আবেগ মেশাতে পারে কেউ জানত না।

বিভাস ভাবল—হয়ত ইন্দ্রাণীও—এরপরও 'না' বললে মনে হবে আমাদের ব্যক্তিত্ব নেই। মনে হবে, বিজয়প্রতাপ এক নিপুণ শিকারী আর আমরা হরিণশিশু, ভয়ে কাঁপছি।

'চা খেয়ে চলে আসব, শুধু চা।' বলে ইন্দ্রাণী উঠে দাঁড়াল।

সিঁড়ি দিয়ে নেমে, বারান্দা, বিভাসের ঘর, দালান পার হয়ে, রাস্তায় নেমে নবাব খানের বাগানের ফটকের সামনে আসতেই ডালিম গাছের ছায়া থেকে বেগম ডাকলেন, 'ইন্দ্রাণী।'

থামল তিনজন।

কয়েক পা এগিয়ে এসে রঙ-করা ভুরু কুঁচকে বেগম বললেন, 'তুমি ওর সঙ্গে কথা বলবে না, মিশবে না, ওর সঙ্গে কোথাও যাবে না।' আঙুল তুলে বিজয়প্রতাপকে দেখালেন।

গম্ভীর গলায় ইন্দ্রাণী বলল, 'তুমি ঘরে যাও মা।'

'তুমিও বাড়ি এস। যখন-তখন বাড়ি থেকে বেরোবে না। আমার অনুমতি না নিয়ে কোথাও যাবে না।'

'কী পাগলের মত আজেবাজে বকছ! ঘরে যাও।'

'যা মুখে আসে তাই বলতে শিখেছ!' বেগম ক্ষিপ্ত হয়ে ইন্দ্রাণীর চুল টেনে ধরতে হাত বাড়িয়েছিলেন, কিন্তু ইন্দ্রাণী ছিটকে কয়েক পা সরে গেল।

'আমাকে শাসন করতে এসেছেন, লজ্জা হয় না!' হাঁপাতে হাঁপাতে বলল।

বিভাসের মনে হল, সে আর বিজয়প্রতাপ সার্কাসের দুটি ক্লাউন। এই দৃশ্য চুপচাপ দাঁড়িয়ে দেখতে হল। তার কিছু করবার নেই। শুধু অস্বস্তিতে মন ভরে গেল।

তাদের হাত ধরে প্রায় টানতে টানতে ইন্দ্রাণী সিংদের বাগানে ঢুকল। উত্তেজিত গলায় বলল, 'এস।'

নিরুপায় অপমানিত বেগম বিকৃত কর্কশ গলায় মেয়েকে শায়েস্তা করার সংকল্প ঘোষণা করে বাড়ির দিকে ফিরলেন।

বিজয়প্রতাপের ঘরে ইন্দ্রাণী একটিও কথা না বললেও অন্তত আধ ঘণ্টা রইল। কিন্তু চায়ের আসর, বলা বাহুল্য, জমল না। ইন্দ্রাণী যতক্ষণ ছিল বিভাসও একটিও কথা বলেনি। বিজয়প্রতাপ একাই হাসল, সম্পূর্ণ অন্য প্রসঙ্গে অনেক কথা বলল, তার বাবার এক রোমাঞ্চকর শিকারকাহিনী শোনাল, তবু আবহাওয়া সহজ হল না।

চা শেষ করে ইন্দ্রাণী যেতে চাইলে বিভাস জানাল, সে আরও একটু বসবে। ইন্দ্রাণীকে তাদের বাগানের ফটক পর্যন্ত পৌঁছে দিতে গেল বিজয়প্রতাপ। এবং ফিরতে অনেকটা সময় নিল। ইন্দ্রাণীর সঙ্গে তার কী কথা হল, কোন কথা হল কিনা, বিভাস জানে না।

বাগানেও তখন আর রোদ নেই, অন্ধকার হতে সামান্য দেরি। বিজয়প্রতাপ সেই ছায়া

ছায়া ঘরে ফিরে এসে বসলে তার স্বাভাবিক উজ্জ্বল মুখ কী এক দুজ্ঞেয় সফলতার আনন্দে উদ্ভাসিত দেখাল।

'ইন্দ্রাণী তোকে পছন্দ করে না বুঝতে পারছিস। তবু এমন হ্যাংলামি করিস কেন?' একটা চূড়ান্ত বোঝাপড়া করার মেজাজে বলল বিভাস।

বিজয়প্রতাপ এবার শব্দ করে হাসল। 'আমাকে পছন্দ করে না? আমাকে পছন্দ না করে উপায় কী? এই শহরে, নিদেনপক্ষে সিভিল লাইন্সে আমার মত আর ছেলে কোথায়?'

'উন্মাদ আশ্রমে তোর চিকিৎসা হওয়া দরকার।'

'আমার মত উন্মাদদের প্রতিই যে মেয়েদের পক্ষপাতিত্ব! কথাটা মেনে রাখ, আখেরে কাজ দেবে।'

'তোর জিভটা আক্ষরিক অর্থে বড় বেশি লালায়িত। টেনে ছিঁড়ে ফেলতে ইচ্ছে করে।' টেবিলের তলা দিয়ে বিজয়প্রতাপের পায়ে বিভাস একটা লাথি মারল।

প্রায় লাফিয়ে উঠে বিজয়প্রতাপ টেবিল, চেয়ার, বিভাসের চারদিকে ঘুরল কয়েকবার, যেন খুন করবে। আবার মুখোমুখি চেয়ারে বসল, হাসিতে বিকশিত হল দু'সারি সুবিন্যস্ত দাঁত। 'আমাকে ইন্দ্রাণী পছন্দ করে না তোর বিশ্বাস। তোর বিশ্বাস তোর নিজস্ব। কিন্তু আমি যে ইন্দ্রাণীকে পছন্দ করি এটা নিশ্চয়ই ভেবে দেখবার বিষয়।'

বিভাস এক মিনিট চুপ করে থেকে বলল, 'তোর পছন্দ করার অধিকার তোর নিজস্ব। কিন্তু তোর পছন্দের প্রদর্শনীটা বেহায়ার মত। আজ যা ঘটল তার ফলে ইন্দ্রাণীদের বাড়িতে কী অশান্তি হবে জানিস, ওকে কী যন্ত্রণা সহ্য করতে হবে!'

'এমন একটু-আধটু অশান্তি হওয়া ভাল। তোদের মত কাঁচকাচাদের বয়েস বাড়ে, ব্যক্তিত্ব গড়ে ওঠার সুযোগ পায়।'

'অর্থাৎ?'

'অর্থাৎ ইন্দ্রাণী তার মা-বাবাকে আরও ভাল করে চিনবে। কোন্ মাটিতে দাঁড়িয়ে আছে বুঝবে। একটি ব্যক্তি হিসেবে তার অস্তিত্ব, তার পরিবেশ, তার নিজের কাছে স্পষ্ট হবে। তা ছাড়া আজ যা ঘটল তার জন্যে আমি দায়ী নই, তবে এমন একটা দিনের জন্যে, এমন একটা কিছু ঘটবার জন্যে আমি এতগুলো মাস অপেক্ষা করছিলাম।'

'একটু বিশ্লেষণ প্রয়োজন।'

'বেগম আমার প্রতি ক্ষোভে আর ইন্দ্রাণীর ওপর হিংসেয় জ্বলছেন। আজ তাঁর জ্বালা অনেক বাড়ল। আমি আয়ত্তের বাইরে, সুতরাং ইন্দ্রাণীকে শায়েস্তা করতে ক্ষিপ্ত হয়ে উঠবেন। শাস্তি যত কঠোর হবে, ইন্দ্রাণীর বিদ্রোহ তত বেপরোয়া হবে। মা এবং মেয়ের সম্পর্ক তীব্র রেষারেষি, প্রতিদ্বন্দ্বিতার আদল নেবে।'

বিভাস বলার মত কোন কথা খুঁজে পেল না।

'চোখ দুটো লাড্ডুর মত করে আনছিস কেন? কেমন করে তোকে বোঝাই যে মেয়েদের কোন বয়েস নেই, অন্তত বেগমের মত মেয়েদের নেই। আর তুই বোধহয় ভুলে যাচ্ছিস যে ইন্দ্রাণী বেগমেরই কন্যা।'

হয়ত কিছু বলা যায়, তর্ক করা যায়, হয়ত বিজয়প্রতাপকে খুন করা যায়, হঠাৎ ঝাঁপিয়ে পড়ে গলা টিপে ধরা যায়, নখাগ্রে বিদ্ধ করা যায় হাসিতে উজ্জ্বল চোখ। কিন্তু কী হবে। বিভাস শুধু বসে রইল সাদা দেওয়ালের দিকে তাকিয়ে, আর কিছু করল না। কোনদিনই চরম কিছু দর্শনীয় কিছু করেনি।

মনে পড়ল, রঘুরঞ্জন মালব্য—যাকে সবাই মালবিয়াজী বলে ডাকে—একদিন এক আলোচনা বৈঠকে বলেছিলেন, এই এতটুকু শহরেই পরতে পরতে মানুষের সম্পর্কের কী কুৎসিত নোংরা জটিল জাল ছড়ান। চোখ খোলা রাখলে দেখতে পাবে।

আমি কি দেখতে শিখেছি। আমি কি এখনও ছেলেমানুষ, নাকি আমার যৌবনও চলে গিয়ে বার্ধক্য এসেছে।

জওলাপ্রসাদের বাড়ির মধ্যে রোজ রোজ একঝাঁক সৈন্য আসে কেন, পণ্ডিত ঝা-র পনের বছরের মেয়েটা রাতারাতি কোথায় উধাও হল, পাঁচ-ছ'টি ছেলেমেয়ে নিয়ে উপাধ্যায়জী কী বিপদে পড়েছেন যে তার বাবার কাছ থেকে দশটা টাকা পেয়ে অমন হাউ-হাউ করে কেঁদে উঠলেন। বাগচীবাড়ির একটি বিয়ের বয়সী মেয়ে তিন সপ্তাহের অসুখে মারা গেলে তার আত্মীয়স্বজনরা দুদিন মাত্র কেঁদে শান্ত স্বাভাবিক হয়ে গেল কেন, কেন মনে হল—তাদের চোখে মুখে এক বিচিত্র স্বস্তির মুক্তির আভাস।

অবশ্য যদি কিছু করবার না থাকে, যদি তর্কের জন্যে জিভ ঠোঁট নেচে না ওঠে, যদি প্রতিবাদে হাত উদ্যত না হয়, তবে এই ন্যাকা-ন্যাকা ভাবনার সুতো ছেড়ে কী হবে।

ঘরে আলো জ্বলতে বিভাস উঠল।

## পাঁচ

ক্রিসমাসের আগে ক্যারল প্র্যাকটিস হচ্ছিল রেভারেণ্ড আয়ারের ঘরে। কীডগঞ্জে রেভারেণ্ড আয়ারের বাড়ি। তাঁর বাড়ির বারান্দায় বেশ বড় একটি ক্যারল পার্টি অনেকক্ষণ ধরে গান করল। প্র্যাকটিস যখন শেষ হল, বাইরে এসে একে একে বিদায় নিল সবাই, ওরা তিনজন এসে দাঁড়াল চৌরাস্তায়, তখন রাত প্রায় আটটা। বিভাসের মনে হল কনকনে শীত। সবার শীতের পোশাক ছিল, তবু সেই শীতের রাত্রে বিজয়প্রতাপ অ্যালফ্রেড পার্কে যাবার প্রস্তাব করলে বিভাসের ভাল লাগে নি। অথচ ইন্দ্রাণী তেমন আপত্তি করল না।

বিভাস বলল, 'আমি বাড়ি ফিরব। তোমরা বেড়িয়ে আসতে পার।'

'চালাকি রাখ।' বিভাসের কব্জি চেপে ধরে বিজয়প্রতাপ একটা টাঙাওয়ালাকে ডাকল।

টাঙায় বসে আধমরা ঘোড়াটার খুরের শব্দের সঙ্গে তাল রেখে বিজয়প্রতাপ শিস দিল সারা রাস্তা। বিভাস ভাবছিল, আমি না এলে ইন্দ্রাণী কি আসত না, সোজা ফিরে যেত সিভিল লাইন্সে?

পার্ক থেকে অনেকটা দূরেই টাঙা ছেড়ে দিল। এত শব্দ করে পার্কে ঢোকা যাবে না। এত রাত্রে অ্যালফ্রেড পার্কে ঢোকা হয়ত আইনসঙ্গত নয়। তেমনই একটা কিছু শুনেছিল।

পার্কের মধ্যে গ্রীণহাউসে এসে একটা বেঞ্চে বসল তিনজন, মাঝখানে ইন্দ্রাণী। আশেপাশে কোথাও আর কেউ আছে মনে হয় না। ছায়া ছায়া অন্ধকার, মাঝে মাঝে ওপর থেকে কুয়াশার গায় চুইয়ে-পড়া কৃপণ আলো।

ক্যানিং রোডের সি-এ-বি স্কুল সৈন্যরা দখল করায় পার্কের মধ্যে অস্থায়ী ঘর বেঁধে ক্লাস চলছে। সেই ঘরগুলো আর পুরনো লাইব্রেরীটার চার্চের মত বাড়ি ডুবে গেছে অন্ধকারে। রাণী ভিক্টোরিয়ার মূর্তিটা সরিয়ে নেওয়া হয়েছে। বেয়াল্লিশ সালের আন্দোলনের সময় কারা যেন মূর্তিটার নাক ভেঙে দিয়েছিল। ঠিক কোথায় যে ছিল মূর্তিটা এই

অন্ধকারে গ্রীণহাউসে বসে বুঝতে পারা কঠিন। পঞ্চম জর্জেরও একটা মূর্তি ছিল, এখন নেই।

কোথাও একটা বকুলগাছ আছে নাকি, অথবা হয়ত ইন্দ্রাণীর চুলের গন্ধ। কারও মুখ কারও হাত স্পষ্ট দেখা যায় না, শুধু ঢেউয়ের মত মুখের হাতের প্রান্তরেখার ডৌল। কেমন যেন ষড়যন্ত্র করার মত মনে হয়, তবু বিভাস ভাবল, বেশ তো—এখানে এসে ভালই করেছি, না এলে কিছু যেন হারাতাম।

ইন্দ্রাণী হঠাৎ একেবারে অপ্রাসঙ্গিক কথা নিয়ে এল: 'এবারে আশা করছি পাশ করব। কিন্তু লজ্জা করে, আমার থেকে কম বয়েসের মেয়েরা ফার্স্ট ইয়ারে পড়ে।'

বিজয়প্রতাপ পায়ের ওপর পা তুলে বলল, 'লজ্জার কী আছে, কী এমন বয়েস হয়েছে? আর যারা সুন্দর তাদের আবার বয়েস আছে নাকি!'

বিভাসের মনে হল, বেহায়ার মত কথা বলে বিজয়প্রতাপ। কেউ যদি সত্যি সুন্দর হয়, সে কথা কি এমন করে সামনাসামনি কখনও বলা যায়! তা ছাড়া এই এক কথা আজকাল ও বারেবারে বলছে।

বিজয়প্রতাপ আবার বলল, 'আমাকেও বোধহয় বিভাসদের কলেজে ভর্তি হতে হবে। লক্ষ্ণৌ-এর মেডিকেল কলেজের আশা ছাড়তে হবে। বাবার অসুখ।'

গা সিরসির করা হাওয়া। ইন্দ্রাণী শুধু একটা স্কার্ফ জড়িয়েছে, পায়ে স্লিপার। বিজয়প্রতাপ টাই বেঁধেছে, আমার টাই না থাকলেও কোটটা খুব গরম, পায়ে পশমের মোজার ওপর জুতো। ইন্দ্রাণীর শীতের পোশাক এই কনকনে রাতের পক্ষে যথেষ্ট কিনা সন্দেহ হয়। অবশ্য মেয়েদের নাকি শীত কম। আর ইন্দ্রাণী যেন সত্যি খুশী। যেন বাড়িতে দুঃসহ নোংরামি নেই, কয়েক মাস পরেই পরীক্ষার দুশ্চিন্তা নেই। যেন অতীত নেই, কোথাও কিছু রেখে আসে নি, কোথাও কখনও ফিরে যেতে হবে না, যেন এই আবছায়া অন্ধকারে অনন্তকাল বিচিত্রগন্ধী চুলের সুদীর্ঘ বেণীটা এক-একবার অকারণে অস্থির হাতে পিঠের ওপর ছুড়ে দেবে, আবার মাথা ঝেঁকে নিয়ে আসবে বুকের মাঝখানে। তবু, শীতে কাঁপুনি না ধরলেও, ইন্দ্রাণী কি উত্তাপ চায় না, আমরা কি আর একটু ঘন হয়ে বসতে পারি না।

গ্রীণহাউসের মধ্যে বসে আকাশ দেখা যায় না। পত্রহীন লতার জটিল জালের আস্তরণ। সিমেন্ট-করা মেঝেয় জুতো ঠুকে বিজয়প্রতাপ মৃদু শব্দ তুলছে।

ইন্দ্রাণী বলল, 'দিনের বেলায় এখানে কতবার এসেছি। কখনও এমন মনে হয়নি।'

কতকাল থেকে, সেই একেবারে ছোটবেলা থেকে ইন্দ্রাণীকে প্রায় প্রতিদিন দেখছে বিভাস। বাগানে, তার ছোটঘরে, তাদের ন্যাড়া ছাতে অথবা বাইরে রাস্তায় ইন্দ্রাণীর ঘনিষ্ঠ উপস্থিতি কোনদিন কোন বিশেষ ভাবনা, বিশেষ অনুভব আনে নি। আজ এই শীতের হাওয়ায়, কুয়াশা আর কৃপণ আলো-মেশান অন্ধকারে মনে হল, ইন্দ্রাণী যেন অনেক দূরে, প্রাক দুর্লক্ষ্য। তবু ভাল লাগছে। নিষেধ না মেনে এখানে এখন এই অন্ধকারে পাশাপাশি বসে থাকায়, মুহূর্তজীবী কথা আর হাসি থেকে সুখ কুড়িয়ে নেওয়ায় কেমন এক বেপরোয়া দায়িত্ববোধহীন অস্থির বয়েসের স্বাদ আছে।

এতক্ষণ কথা বলতে, হাসতে কেউ উচ্চকণ্ঠ হয়নি। যেন গোপনে ফিসফিস করছিল। এখন হঠাৎ ইন্দ্রাণী প্রায় চেঁচিয়ে উঠল, 'কী হচ্ছে? হাত সরিয়ে নাও।' গলায় যথেষ্ট বিরক্তি আর প্রতিবাদের সুর, অথচ ঠোঁটে হাসি লেপ্টে ছিল বললে মিথ্যে বলা হয় না।

বিভাস মুখ ফিরিয়ে দেখল, বিজয়প্রতাপ একটা হাত ইন্দ্রাণীর পিঠে তুলে দিয়ে কঠিন আঙুলে কাঁধে চাপ দিচ্ছে। বিজয়প্রতাপকে ডান হাত দিয়ে ঠেলে সরিয়ে ইন্দ্রাণী প্রায় বিভাসের গায়ের ওপর এসে বসল। বিজয়প্রতাপ উঠে দাঁড়িয়ে ইন্দ্রাণীর দু'হাত ধরে টেনে তুলল, নিজের দিকে সামান্য একটু টেনে নিয়েই ছেড়ে দিল আবার। চোখে সয়ে-যাওয়া পাতলা অন্ধকারে সোচ্চার হাসির রহস্যময়তায় বিজয়প্রতাপের সুবিন্যস্ত দাঁতের সারি, চোখ, সারা মুখ কেমন আশ্চর্য মনে হল। হয়ত সুন্দরও মনে হল। বলিষ্ঠ, সুন্দর। এবং হয়ত সেই কারণে বিভাস কোন প্রতিবাদের কথা খুঁজে পেল না। আর, কী আশ্চর্য, মনে হল তারও ঠোঁটে এক বিচিত্র মৃদু হাসি জড়িয়ে আছে।

'চল, ফিরে যাই।' ইন্দ্রাণী হাঁটতে শুরু করল।

পার্কের বাইরে এসে টাঙা পাওয়া গেল না। খানিক দূর এগিয়ে সাইকেলরিক্স মিলল দু'খানা। বিজয়প্রতাপ একখানা রিক্সর পাশে দাঁড়িয়ে সাগ্রহে অপেক্ষা করছিল। কিন্তু ইন্দ্রাণী তার দিকে একবার তাকিয়ে বিভাসের রিক্সয় উঠে বসল।

আর এতক্ষণে এবং এই প্রথম রিক্স চলতে শুরু করলে বিভাসের মনে সেই অস্থির বয়েস যেন স্পষ্ট অবয়ব পেল। শরীর, শরীর, শরীরের স্বাদ। তার সঙ্গে এক রিক্সয় চেপে বসা ইন্দ্রাণীর শরীর দুঃসহ, দুঃসহ মনে হল। পায়ে পা ঘষল, আকাশে কুয়াশায় আলোয় অন্ধকারে চোখ রাখল, চোখ ফিরিয়ে নিল। ইচ্ছে হল, ইন্দ্রাণীর কাঁধে একটা হাত তুলে দেয়। কিন্তু দিল না।

সারা রাস্তা চোখে মুখে কুয়াশা মেখে সেই রাত্রের একান্ত ইচ্ছেগুলোকে গলা টিপে টিপে মারল বিভাস।

## ছয়

গতি মন্থর হতে হতে ট্রেনটা এক সময় থেমে গেল। কোন স্টেশন নয়, মাঝপথে থেমেছে। বোধহয় অন্য কোন ট্রেন পথ জুড়ে রয়েছে। রাত দুটো বেজে গেছে বহুক্ষণ। সামনের স্টেশন হাজারিবাগ রোড হবার কথা। সেখানে পেঁছলে হয়ত চা মিলতে পারে, অবশ্য ঠিক করে কিছু বলা যায় না।

ট্রেনটা থামতে কামরার কেউ কেউ নড়েচড়ে সোজা হয়ে বসলেন। সামনের বেঞ্চের বছর দশেকের ছেলেটা চমকে উঠে বসে দু'হাতের উল্টো পিঠ দিয়ে চোখ ঘষে ঘষে আবার কাত হল।

জানলাটা ওপরে ঠেলে তুলে বিভাস মুখ বাড়িয়ে দেখল, ট্রেনের পাশে ঘাসের জঙ্গলে বুনো লতার ঝোপে আলো ছড়িয়ে পড়েছে। বাঁকাচোরা আলোর রেখা, দীর্ঘ, প্রসারিত। জানলা দিয়ে এলেও নিখুঁত চৌকো আলো কোথাও চোখে পড়ে না। ঠান্ডা হাওয়া আসছে, আর পোকা। মুখ ভিতরে টেনে এনে জানলাটা আবার বন্ধ করে দিল।

পোকাগুলো উড়ে এসে, লাফিয়ে এসে আলোকিত জানলার কাচে ঘা খেয়ে খেয়ে পড়ছে। নাম জানা-না-জানা অজস্র পোকা। দেখে দেখে এক ইংরেজ কবির একটা প্রিয় উপমা মনে এল। সেই এক উপমা অনেকবার দেখেছে তাঁর কবিতায়, যখন কবিতা পড়ার অভ্যেস ছিল। ভাবতে হাসি পায়, একসময় কবিতা ভালবাসতাম। তাঁর সেই কবিতাগুলো নিশ্চয়ই কিশোর-কিশোরীদের জন্যে লেখা নয়, অথচ উপমাটি কিশোরোচিত, নিখাদ

ছেলেমানুষি। এমন পাখিদের উপমা যাদের ডানা শক্তিমান, যারা বিলাসী, যারা ঋতুতে ঋতুতে দেশ-মহাদেশ উড়ে পার হয়ে যায়। দূরদেশগামী এমন এক ঝাঁক পাখি সমুদ্রের ঢেউয়ের ওপর দিয়ে অন্ধকারে উড়ছে একটা বাতিঘর লক্ষ্য করে। কাছে এল, অবশেষে তাদের ক্লান্ত ডানা ভাঙল বাতিঘরের আলোকিত কঠিন কাচের দেওয়ালে ঘা খেয়ে। ডানা ভেঙে পড়তেই অব্যর্থ ছোবল মারল সমুদ্রের ঢেউ। বুঝতে হবে—তাদের এক রুগ্ন অধ্যাপক মিথ্যেই ঠোঁটে হাসি টেনে রাখবার চেষ্টা করে বলতেন—এখানে পাখিগুলো কবির নায়িকার হৃদয়ের উপমা। বলা বাহুল্য—বিভাস মনে মনে হাসল, একটিমাত্র কাঠি দিয়ে একটা সিগারেট ধরাল—কবির বিষাদান্তিক প্রেমের কাহিনীর নায়িকার হৃদয় তীব্র আঘাতে বিক্ষত। মনে রাখতে হবে হৃদয়, হৃৎপিণ্ড নয়। বিশেষ বিশেষ অবস্থায় হৃৎপিণ্ড আর হৃৎপিণ্ড থাকে না, হৃদয় হয়ে যায়।

নিজের প্রাক্তন কৈশোরকে খুঁচিয়ে একচোট হাসতে পেরে খুব যেন খুশী হল বিভাস। ইতিমধ্যে ট্রেনটা আবার চলতে শুরু করেছে।

ইন্দ্রাণী কি তেমন কোন কাহিনীর নায়িকা ছিল। তার কি হৃদয় ছিল। ওই দেশান্তরী পাখিরা কেন তার হৃদয়ের নিপুণ উপমা হল না। তার ত তখন মনে মনে উড়ে যাবার বয়েস ছিল। তবু কেন কাছের একটা বাধা ডিঙিয়ে ওই পাখিদের মত উড়তে পারল না। না হয় তার হৃদয় ওই পাখিদের ডানার মত বিক্ষত হত, রক্তাক্ত হত! এত কাছের বাধায় ঘা খেল কেন।

জানলার কাঠে মাথা রাখল। একটু ঝিম ধরল ট্রেনের দুলুনিতে। কয়েক মিনিটের মধ্যে তির্যক হাসি মিলিয়ে গিয়ে আধবোজা চোখ করুণ বিষণ্ণ হয়ে উঠল।

তখন সবে বি-এ ক্লাসে ভর্তি হয়েছে বিভাস। ইন্দ্রাণী আর বিজয়প্রতাপ তার কলেজেই পড়ছিল একটু নিচুতে। বিজয়প্রতাপের লক্ষ্ণৌ যাওয়া হয়নি, ডাক্তার হওয়া হল না। উদয়প্রতাপ সিংয়ের অসুখ দিন দিন বাড়ছিল।

বিজয়প্রতাপ তাকে সগর্বে জানিয়েছিল, তার সঙ্গে ইন্দ্রাণী একবার রামাজ রেস্টরান্টে গিয়েছিল, আর একদিন ম্যাক্‌ফার্সন লেকে। শুনে বিস্ময়বোধ করেছিল বিভাস। বোকা বোকা চোখে তাকিয়ে বলেছিল, 'তোর সঙ্গে একা যেতে রাজী হল? আমার কথা কিছু বলল না?'

বিজয়প্রতাপ শুধু বলেছিল, 'তুই এখনও ছেলেমানুষ, বিভাস।'

তারপর একদিন সন্ধ্যেয় দীর্ঘ পথ হাঁটার পর সেই চূড়ান্ত, অতিনাটকীয় দৃশ্যের সরস বিবরণ দিয়েছিল বিজয়প্রতাপ। বিবরণ না দিয়ে তার উপায় ছিল না, তার বিচিত্র অভিজ্ঞতার ঝাঁজ অন্য কারও মনে সঞ্চারিত না করে নিজের অস্থিরতা থেকে অব্যাহতি পেত না। সে যে সাধারণ ছিল না, একই বয়েসের আর পাঁচটা ছেলের সঙ্গে তার যে মৌল অমিল ছিল—এই তত্ত্ব ব্যাখ্যা না করে সে কেমন করে স্বস্তি পাবে।

সেই সন্ধ্যেয় যমুনা ব্রিজের ধার থেকে হাঁটতে শুরু করেছিল দুজন। নদীর তীর ছুঁয়ে হাঁটছিল পুব দিকে। অনেকক্ষণ হেঁটে ক্লান্তিতে পা ভারী মনে হলে একটা সাইকেল রিক্সায় উঠে পড়েছিল। বাকী পথটা পার হয়ে রিক্স ছেড়ে দিয়ে পাড় থেকে নেমে এসেছিল নরম মাটিতে। সাবধানে পা চেপে-চেপে প্রায় ফোর্টের কাছে এসে, ডাঙায় টেনে-তোলা একখানা ভাঙা পরিত্যক্ত নৌকোয় উঠে বসেছিল দুজন।

তখন বাঁয়ে গঙ্গা আর সামনে যমুনার স্রোত অন্ধকারে অবসিত। তখনই বিভাসের

কাঁধে হাত রেখে বিজয়প্রতাপ শুরু করেছিল আর এক উত্তীর্ণসন্ধ্যার চূড়ান্ত অতিনাটকীয় দৃশ্যের বর্ণনা।

সেই সন্ধ্যেটা বিভাস বাড়ি ছিল না। মালবিয়াজীর আলোচনা বৈঠকে গিয়ে জমেছিল। ইন্দ্রাণী ডালিমগাছের গভীরতর ছায়াটা পার হয়ে আসতেই বিজয়প্রতাপ তাকে ডাকল। সিংদের বাগান বারান্দার পাশ দিয়ে বিজয়প্রতাপের ঘরে এসে বসল দু'জন। বিজয়প্রতাপের চোখের দিকে তাকিয়ে ইন্দ্রাণী শুধু একবার জানতে চেয়েছিল, বিভাস কোথায়। বিভাস বাড়ি নেই শুনে আর একবার বিজয়প্রতাপের দিকে তাকিয়ে চোখ নামিয়ে নিয়েছিল টেবিলের ওপর ছড়ান পত্রিকার ছবিতে।

একটু পরে চা এল, এক রাশ আখরোট কিসমিস এল। চা দিয়ে লোকটা চলে যাবার সঙ্গে সঙ্গে বিজয়প্রতাপ দরজাটা বন্ধ করে দিল।

তীক্ষ্ম প্রশ্ন করল ইন্দ্রাণী, 'দরজা বন্ধ করলে কেন?' কথা বলতে একটু যেন গলা কাঁপল।

'এমনিতেই আমার ঘরে কেউ আসবে না। তবু পুরোপুরি নিরাপদ হলাম।'

'কী পাগলের মত কথা বলছ! দরজা খুলে রাখ।'

'এমন পাগলামি স্বাভাবিক।'

'কেন?'

'কারণ, নির্জনতা আমার ভাল লাগে।'

'কিন্তু আমার ভাল লাগে না।'

'সত্যি কথা বলছ না, অথবা তুমি নিজেকে বুঝতে পার না। তোমাকে আজ অনেক কথা বলব। এর মধ্যে কেউ এসে পড়ুক আমি চাই না। তাই দরজা বন্ধ করেছি।'

একই প্লেট থেকে আখরোট কিসমিস তুলে নিতে গিয়ে ইন্দ্রাণীর হাতের চারটে আঙুল শক্ত মুঠোয় ধরে বিজয়প্রতাপ আবার বলল, 'ইন্দ্রাণী, আমার ভাল লাগা বড় যন্ত্রণা দেয়! তোমাকে অসহ্য ভাল লাগে। এ এমন ভাল লাগা যা গোপন করা যায় না, শুধু মনে মনে লালন করা যায় না।'

চারটি নরম আঙুল এক ঝাঁকানিতে ছাড়িয়ে নিয়ে ইন্দ্রাণী উঠে দাঁড়াল। হাতের ঝাঁকানিতে কয়েকটা আখরোট কিসমিস ছিটকে ছড়িয়ে গেল মেঝেয়।

চোখ দিয়ে যেন ইন্দ্রাণীর চোখ বিদ্ধ করে বিজয়প্রতাপ চেয়ার থেকে উঠল। টেবিলটা ঘুরে এসে ইন্দ্রাণীর দু'টো হাতই ধরে টানল নিজের দিকে। হাত ছাড়িয়ে মুক্ত হতে হাঁপিয়ে উঠল ইন্দ্রাণী, কব্জিতে একটু লাগল, পিছিয়ে গিয়ে দাঁড়াল দেওয়ালে পিঠ দিয়ে। হয়ত চাপা গলায় বলল, 'না!' কথা স্পষ্ট হল না।

বিজয়প্রতাপের কপাল নাসাগ্র স্বেদাক্ত, ধারাল দৃষ্টি আশ্চর্য করুণ, ঈষৎ স্ফীত ঠোঁট একটু একটু কাঁপছে ভেবে নেওয়া যায়। বোধহয় প্রার্থনার মত করে কিছু বলেছিল, হয়ত আবার বলেছিল—'এই অসহ্য ভাল লাগা আমি লুকোতে পারি না'—কথা স্পষ্ট হয় নি।

তারপরই সেই অভাবনীয়, অবিশ্বাস্য—এমনকি এক অর্থে হাস্যকর এবং বীভৎস—অতিনাটকীয় দৃশ্যটি ইন্দ্রাণীকে দেখিয়েছিল বিজয়প্রতাপ।

টেবিলের ওপর কাচের গ্লাস ছিল। একটা গ্লাস বিজয়প্রতাপ মেঝেয় আছড়ে ভাঙল। জলে-ভেজা একটা কাচের টুকরো তুলে নিল হাতে। সেই ধারাল টুকরোটা দিয়ে নিজের বাঁ হাতের কব্জি থেকে কনুইয়ের ভাঁজ পর্যন্ত চামড়ার একটা পরত কেটে কেটে হিংস্র

ক্ষিপ্রতায় অনেকগুলো বাঁকা আর সরল দাগ টানল ঠোঁটের ওপর দাঁত চেপে রেখে। হাতের তালু বেয়ে রক্তের কয়েকটা চিকন ছড় নেমে আঙুলের ডগা থেকে ফোঁটায় ফোঁটায় মেঝেয় পড়ল।

হন্যে হয়ে এত সব করতে বিজয়প্রতাপ খুব সামান্যই সময় নিয়েছিল। সেই সংক্ষিপ্ত সময়টুকু আতঙ্কিত বিস্ময়ে তাকিয়ে থেকে দেওয়ালের গায়ে নিজেকে চেপে মারবার চেষ্টা করছিল ইন্দ্রাণী। কিন্তু যখন বিজয়প্রতাপ কাচের ধারাল টুকরোটা ঘরের এককোণে ছুড়ে ফেলল, রক্তের চিকন ছড় হাতের তালু আর আঙুল বেয়ে ফোঁটায় ফোঁটায় ঝরল, শব্দহীন কান্নার ঢেউ হয়ে ভেঙে পড়ল ইন্দ্রাণী, চোখ নামিয়ে আনল মেঝেয়।

আর ঠিক তখনই, ঠিক সেই মুহূর্তে, বিজয়প্রতাপের প্রসারিত বলিষ্ঠ বাহু সানন্দে গ্রহণ করেছিল ইন্দ্রাণীর পাখির মত শরীর। পাখির মত, পাখির সঙ্গে কি ইন্দ্রাণীর তুলনা চলে? অন্তত নিপুণ উপমা হয় না।

শাড়িতে, জামায় এবং মুখেও রক্তের দাগ লেগেছিল। সেই রাত্রিতে বিজয়প্রতাপের অন্ধকার ঘর থেকে সন্তর্পণে বেরিয়ে, স্বল্পালোকিত বারান্দা পার হয়ে, নবাব খানের বাগানের গভীর অন্ধকারে চোরের মত ডুব দিয়েছিল ইন্দ্রাণী। ঘর থেকে বেরোবার আগে আঁচল দিয়ে মুখ মুছেছিল, শাড়িতে নতুন ভাঁজ দিয়ে রক্তের দাগ ঢেকেছিল। সবার চোখ এড়িয়ে নিজের ঘরে ঢুকে বিছানায় উপুড় হয়ে ছিল অনেক রাত পর্যন্ত।

বিভাসের কাঁধ জোরে নেড়ে দিয়ে বিজয়প্রতাপ বলল, 'তুই যেন কাঁপছিস! কাঁপছিস নাকি?'

বিভাস চুপ।

হাওয়ায় ভিজে মাটির গন্ধ। আকাশে যেন একটিও আলোর বিন্দু নেই। অন্ধকার, অন্ধকার। আকবর বাদশা'র দুর্গের পাথুরে দেওয়ালের গা ঘেঁষে যেন আদিম পৃথিবীর অন্ধকার পায়ে-পায়ে এগিয়ে আসছিল। ক্রমেই আরও ছোট হয়ে আসছিল চারপাশের সঙ্কীর্ণ স্বচ্ছতার বৃত্ত।

বিভাসের কাঁধ জোরে নেড়ে দিয়ে বিজয়প্রতাপ বলল, 'তুই আমাকে কী ভাবিস? পশু ভাবিস আমাকে?'

বিভাস তখনও চুপ।

'আমার আচরণ বীভৎস মনে হচ্ছে? এমন নৃশংসতা ভাবতে পারিস না?'

বিভাস কথা বলল না।

'বড় বেশি নাটুকে মনে হচ্ছে আমাকে? লুকিয়ে হাসছিস না তো?'

বিভাস বলল, 'ওঠ, এখন ফিরতে হবে।'

'বস না একটু। কী এমন করেছি আমি! চোখে দিগন্ত-দৃষ্টি, মনে জ্বলুনি নিয়ে প্রতীক্ষা আমার পোষায় না বলে চামড়ার পাতলা পরতে কয়েকটা আঁচড় কেটেছিলাম। ছড়ে যাওয়ার মত অস্পষ্ট দাগ আছে, কিছুদিন পরে একেবারে মিলিয়ে যাবে। এই নিয়ে [illegible] এত বাহানা করছিস কেন? কথা বলতে যেন তোর জিভের মান যাচ্ছে।'

বিভাস উঠে দাঁড়াল। 'চল, ফিরে যাই। কেমন শীত শীত করছে।'

## সাত

দেওয়ালের সঙ্গে চেপে রাখা একখানা বনেদী অথচ নড়বড়ে চেয়ারে বসেছিলেন ডাঃ জিতেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়। একদিন যে ডাক্তার ছিলেন, তাঁর যে প্রচুর পসার ছিল, এখন বিশ্বাস করা কঠিন। প্রায় বৃদ্ধ, শীর্ণ দীর্ঘ তামাটে শরীর। খাকি ট্রাউজারটা প্রায় হাঁটু পর্যন্ত গুটিয়ে এসেছেন, একটা আধময়লা শার্ট ঝুলছে, গেঞ্জীটা আরও ময়লা, মুখে দাড়ি, কানের পাশে ঘাড়ে আগাছার মত চুল। হাতে কার একখানা চিঠি নিয়ে সামনের আমরুল গাছের একটা ডালে চোখ রেখেছেন, অথচ দৃষ্টি অবশ্যই সেখানে নেই। বিভাস কয়েকবার আশপাশে ঘোরাঘুরি করতে ফিরে তাকালেন। এবং, যা প্রায় অভাবনীয়, বিভাসকে ডাকলেন।

বিভাস অনিশ্চিত পা ফেলে কাছে এসে দাঁড়াল। তার বাবার ডাক শুনবার জন্যে মোটেই প্রস্তুত ছিল না। বস্তুত তিনি আজকাল বিতোষ বিভাস কারও সঙ্গেই বিশেষ কথা বলেন না। শুধু বছরে দু'একবার বেশ সাজগোজ করে গীর্জার কোন উৎসব থেকে ফিরে দুই ছেলেকে জড়িয়ে ধরে চুমু খান। মুখে দাড়ির খোঁচা লাগে। মনে হয়, অবাঞ্ছনীয় অভিজ্ঞতা। আজ এখন, অন্য সব দিনের মত, বাগানের দিকে মুখ করে বসে-ছিলেন। হাতে কার একখানা চিঠি।

এমন বিচিত্র বাগান আর কোথাও দেখেনি বিভাস। সবার চোখের সামনে নয়, বাড়ির পিছনে এবং উঁচু পাঁচিল দিয়ে ঘেরা—সেটাই সান্ত্বনা। দক্ষিণে গোলাপের আর উত্তর প্রান্তে অনেকটা জমিতে ভুট্টার চাষ। গোলাপ আর ভুট্টা—সুন্দর মিল! গোলাপের ঝাড়ের কাছে কিছু রজনীগন্ধা। আমরুল গাছের গোড়ায় লাউকির মাচা। দক্ষিণ-পূব কোণে একটা পেঁপে গাছ আর উত্তর-পশ্চিম প্রত্যন্তে একটি বাবলা। বারান্দা থেকে নামলেই বাগানের খানিকটা জমি সিমেণ্ট করা। সিমেণ্ট করা চত্বরে একসারিতে তিনটে চৌবাচ্চায় নানারঙের মাছ। চৌবাচ্চায় শ্যাওলার চিকন পাতার ফাঁক দিয়ে জলের মৃদু স্রোত বসে যাওয়া দেখলে বোঝা যায়, কোথাও কিছু কিশোরোচিত কূটকৌশল আছে। কিন্তু বিভাস কখনও, এমন কি কৈশোরেও, এসবে হাত দেয় নি। এসবই তার বাবার কীর্তি।

প্রায় সারাদিন দেওয়ালের সঙ্গে চেপে রাখা চেয়ারটায় বসে আছেন। মাথার কাছে পেরেকে একটা শোলার টুপি ঝুলছে। রোদের সময় বাগানে কাজ করতে হলে মাথায় দিতে হয়। টুপির ওপরের খাকি কাপড়ে নিজের হাতে উজ্জ্বল রুপোলী রঙ মাখিয়েছেন।

বিভাসকে বললেন, 'একটা চেয়ার নিয়ে আয়।'

নিজের ঘর থেকে একখানা চেয়ার নিয়ে এসে বিভাস বসল।

হাতের চিঠিখানা এগিয়ে দিয়ে বললেন, 'পড়ে দেখ।'

এই চিঠি যিনি লিখেছেন তাঁর আঙুল কাঁপে। তবে বেশ সাজিয়ে গুছিয়ে লিখেছেন। ওপরে যেখানে তারিখ আর কলকাতার একটা ঠিকানা লেখা, সেখানে পাঁচ আনার ডাকটিকিট আলতো করে লাগান। রীতিমত কৌতূহল নিয়ে বিভাস মনে মনে পড়ল :

প্রিয় জিতেন্দ্র,

জানি আমার এই পত্র পাইয়া তুমি অত্যন্ত বিস্মিত হইবে এবং প্রথমে হয়ত আমাকে চিনিতে পারিবে না। আমার নাম বীরেন্দ্রনাথ বিশ্বাস, আমার দাদার নাম হীরেন্দ্রনাথ বিশ্বাস। আমার ডাক নাম বীরু, আমার দাদার ডাক নাম হীরু। প্রায় পঞ্চাশ বৎসর পূর্বে তালতলায় তোমাদের আর

আমাদের বাড়ি খুব কাছাকাছি ছিল। তোমরা কলিকাতা হইতে চলিয়া যাইবার পর দীর্ঘকাল তোমাদের সহিত আর তেমন যোগাযোগ নাই। অবশ্য তুমি দুই তিনবার কলিকাতায় আসিলে আমার সহিত সাক্ষাৎ হইয়াছিল, তবে তাহাও বহু বৎসর পূর্বের কথা।

আমি কিছুদিন হইল অবসর গ্রহণ করিয়াছি। পৃথিবী হইতেও বিদায় লইবার সময় আসিল। আজ আমার সমগ্র জীবনের সঞ্চয় পরিমাপ করিতে গিয়া দেখিতেছি, আমি যাহা ভাবিতাম তাহা সত্য নয়। আমি সানন্দে ভাবিতাম, জ্ঞাতসারে কোন পাপ করি নাই। এখন দেখিতেছি, আমার পাপের সঞ্চয়ও কিছু নগণ্য নয়। তাই যীশুর কাছে যাইবার পূর্বে পাপের ভার হইতে যতটা সম্ভব মুক্ত হইতে চেষ্টা করিতেছি।

তোমার হয়ত মনে নাই, কিন্তু আমার মনে পড়িতেছে, সেই শৈশবে তোমার নিকট হইতে একখানি বই লইয়াছিলাম। নানা জিনিস নাড়াচাড়া করিতে করিতে সেই বইখানি এতকাল পরে আবার আমার হাতে আসিয়াছে। দেখিলাম, তাহার অবস্থা বড় মলিন। বইখানির দাম ছিল পাঁচ আনা। তোমরা কলিকাতা হইতে চলিয়া গেলে বলিয়াই হয়ত বইখানি ফিরাইয়া দেওয়া হয় নাই। যাহা হউক, এই পত্রের সহিত পাঁচ আনার ডাকটিকিট পাঠাইলাম। তুমি অনুগ্রহপূর্বক তাহা গ্রহণ করিয়া আমাকে ঋণমুক্ত করিও।

কাহার মুখে যেন তোমার পত্নীবিয়োগের সংবাদ শুনিয়াছিলাম। সমবেদনা জানাইয়া একখানি পত্র দিয়াছিলাম, পাইয়া থাকিবে। আশা করি যীশুর কৃপায় তুমি কুশলে আছ এবং তোমার সন্তানেরা তোমার সুখের কারণ হইয়াছে।

আন্তরিক প্রীতি ও শুভেচ্ছা গ্রহণ করিও। ইতি—

তোমার বীরেন্দ্র।

কয়েক মিনিট মুখে কথা এল না বিভাসের। এই চিঠি যিনি লিখেছেন, বাবার শৈশবের বন্ধু বীরেন্দ্রনাথ বিশ্বাস, তাঁকে কোনদিন দেখে নি। তবু তাঁর মুখের আদল যেন চেনা, যেন দেখতে পেল, তাঁর বয়েসের ভারে ক্লান্ত চোখ বিষণ্ণ হাসিতে উদ্ভাসিত।

বিভাসের দিকে মুখ ফিরিয়ে তার বাবা বুঝলেন চিঠি পড়া শেষ। সাগ্রহে বললেন, 'পড়া হয়েছে তো? কী মনে হল, চিঠিখানা পড়ে?'

সত্যি বলতে কি, চিঠি পড়ে বিভাস মুগ্ধ। কেমন লাগল, কেমন ক'রে বোঝাবে। বলল, 'ছোটবেলায় তোমার খুব ঘনিষ্ঠ বন্ধু ছিলেন বুঝি! এমন সরল সৎ লোক আজকাল আছেন বিশ্বাস করা কঠিন।'

'আমার যে একটা সন্দেহ হচ্ছে।' তার বাবা একবার কাশলেন।

'সন্দেহ, কিসের সন্দেহ?'

'জীবনের বাকী ক'টা বছর আমার এখানে এসে থাকবার মতলব করেছে হয়ত।'

বিভাস সঙ্গে সঙ্গে প্রতিবাদ করল : 'না না, চিঠিতে তেমন কোন ইঙ্গিত নেই।'

বিভাসের মন তেতো হয়ে গেল। চারপাশের সবকিছু বড় নোংরা। তার মধ্যে এই চিঠিখানায় যেন অন্য এক সরল গ্লানিহীন জীবনের একটু স্বাদ ছিল। তার বাবার স্বার্থগন্ধী আশঙ্কার কথায় সেই স্বাদ একেবারে তেতো হয়ে গেল। একজন এতকাল পরে শৈশবের প্রিয় বন্ধুকে এক চিঠি লিখেছেন, আর বন্ধুটি মিথ্যে সন্দেহের ভাবনায় মগ্ন। এবং যিনি এই চিঠি লিখেছেন তাঁর মনও কি সত্যিই সরল উদার। এত বছর পরে পাঁচ আনার ডাকটিকিট ফেরত পাঠানর মধ্যে মনের প্রসারতার লক্ষণ কোথায়। কোন্ স্বার্থে বন্ধুর এই সামান্য ঋণ পরিশোধের তাগিদ পেলেন। বস্তুত এ এক ধরনের সঙ্কীর্ণতা। স্বর্গের বৈভবে আস্থা রাখেন, সেখানকার ছাড়পত্র অবশ্যই চাই, তাই এতকাল পরে যে-বই হাতে পেয়ে শুধু একজনের মুখ, একজনের কথা সানন্দে স্মরণ করা স্বাভাবিক, সেই বইয়ের

দাম পাঠিয়ে দিয়ে অনুল্লেখ্য ঋণ থেকে মুক্ত হতে এত উৎসাহী।

বাইরের দিনরজনীর রঙ বদলের পালা চলছিল তখন। ইন্দ্রাণী আর এবাড়িতে আসে না। বাইরে কোথাও দেখা হলে মুখ ফিরিয়ে সরে যায়, থামে না, কথা বলে না। বিভাস সহজ হতে চেয়েছে, ইন্দ্রাণী সহজ হবে না। গম্বুজের আবাবীল পাখির ঝাঁক মিথ্যেই উড়ে উড়ে তীরের ফলার মত ডানার কসরত দেখায়, বিভাসের ঘনপক্ষ্ম চোখ বিস্ময়ে কাঁপে না। আসলে এই সব কারণে, বাইরে কোথাও নোঙর ফেলার মাটি না পেয়ে, বিভাস বাড়ির মধ্যে এখানে ওখানে, বাগানে বারান্দায়, মা'র বন্ধ ঘরের জানলায়, নিজের ছোট ঘরে, কী যেন খুঁজছিল। এখন মনে হল, কিছু নেই, কোথাও কিছু নেই। এই পুরনো একতলা বাড়িটার ঘর, বারান্দা, সিঁড়ি, কুলুঙ্গি, দেওয়ালের ফাটলে শুধু ছিবড়ের মত শুকনো অন্ধকার।

একটা বয়েস ছিল যখন কোন গায়ক রীডের দিকে মোটেই না তাকিয়ে স্বচ্ছন্দে হারমনিঅম বাজিয়ে গান করতে পারলেই তাকে ওস্তাদ শিল্পী মনে হত। আজ তার বাবার সঙ্গে একটু কথা বলে, তাঁর বন্ধুর লেখা চিঠি পড়ে, বুঝল, সেই বয়েসটা আর নেই।

পাশে একটা টিপয় ছিল। তার ওপর দু'কাপ চা রেখে বাঙলা স্কুলের সেঝ দিদিমণি টিপয়টা একটু এগিয়ে দিলেন। এতক্ষণ বিতোষের ঘর থেকে মাঝে মাঝে তাঁর মৃদু কথা ভেসে আসছিল। তাঁর সঙ্গে নাকি বিতোষের বিয়ে হবে। কবে হবে বিভাস জানে না। তবে অনেকদিন থেকে নানাভাবে কথাটা কানে আসছিল।

ইতিমধ্যে বিকেলের আলো আরও কমে গিয়ে বাগানে আমরুল গাছের ছায়াটা দীর্ঘতর হল। তার বাবা যেন পুত্রবধূর তৈরি চা সস্নেহে হাতে তুলে নিলেন।

সেবার তিনমাসের জেল হয়েছিল বিভাসের। উপযুক্ত প্রমাণ না থাকায় মাত্র তিনমাসের জেল হয়েছিল। এর ফলে কিছুই ওলটপালট হয়ে যায় নি, শুধু পড়াশুনোর ক্ষতি হয়েছিল প্রচুর।

তখন যুদ্ধ শেষ। শহরে সৈন্যদের আনাগোনা কমেছে, তবে একেবারে বন্ধ হয় নি। শিবির গুটোতে সময় লাগছিল।

বোম্বাইয়ের সমুদ্র উপকূলে কী সব ঘটে যাবার পরই এই শহরে একটা ট্রাক আগুন দিয়ে পুড়িয়েছিল বিভাসরা।

মালবিল্লাজীর বৈঠকে এই ধরনের কাজে উৎসাহ দেওয়া হত না। তবু তাঁর বৈঠকে গিয়ে একটু বেশি গরম কথা বলত এমন একদল ছেলে বিভাসকে গোপনে ডাকল। সেই দলের সঙ্গে ঘনিষ্ঠ হল বিভাস, যা আগে তার পক্ষে প্রায় অভাবনীয় ছিল।

একদিন সন্ধ্যের একটু পরে সিভিল লাইন্সের সদর মহল্লায় সুবিধে পেয়ে একখানা ট্রাক ঘিরে ফেলল তারা। ড্রাইভার ছাড়া আর কেউ ছিল না সেই ট্রাকে। ড্রাইভারকে নামিয়ে প্রথমেই তার সিটটা ছুরি দিয়ে ফালাফালা করে কেটে পেট্রল ছড়িয়ে আগুন ধরিয়ে দিল। তারপর ট্রাকটার আরও নানা অঙ্গে পেট্রল ছড়িয়ে আগুন লাগাল। দূরে গিয়ে ইট, পাথরের টুকরো ছুড়ে হেডলাইট, গ্লাসস্ক্রীন ভাঙল। আরও নানাবিধ রণনৈতিক কূটকৌশল দেখিয়ে পালাল সেখান থেকে।

পরদিন পুলিস এল, জেল হল, প্রমাণাভাবে মাত্র তিনমাস।

মালবিয়াজী অবশ্যই বিরক্ত হয়েছিলেন। অথচ যেদিন খালাস পেল বিভাস, তিনিই সবার আগে এসে হাত ধরলেন।

রাত জেগে পড়ছিল বিভাস। সেটা তার পরীক্ষার বছর। তার ছোট ঘরে টেবিল ল্যাম্পটার উজ্জ্বল আলোয় খোলা বইয়ের পাতায় একটা পোকা লাফিয়ে এসে বসল। বই থেকে মুখ তুলে একটু এদিক-ওদিক তাকাল বিভাস। দেওয়ালে নানা বিচিত্র ছায়া পড়েছে, যা খুশী মানে করা যায়। যদিও রাত এমন কিছু গভীর হয় নি, এ বাড়ির এবং কাছাকাছি অন্য কোন বাড়ির কেউ আর জেগে নেই। শুনেছে, কলকাতা নাকি সারা রাত জেগে থাকে। এ শহর তেমন না, প্রতিদিন একটু রাত হলেই তার একবার করে মৃত্যু হবে।

জানলা দিয়ে তাকিয়ে দেখল, বাইরে চাপ-চাপ অন্ধকার। ডালিম আর কৃষ্ণচূড়ার চিকন পাতার ফাঁক দিয়ে অন্ধকারের আঁশগুলো হাওয়ায় উড়ে উড়ে আসছে। হায়রে কী সব অতিকাব্যিক ভাবনা! নিজেকে মনে মনে একটা চিমটি কাটল। ঘরের মধ্যে একটু পায়চারি করার জন্যে চেয়ারটা ঠেলে উঠতে যাচ্ছিল, ঠিক সেই সময় বাইরে থেকে এল শব্দটা। বেড়াল। দুটো বেড়ালের কলহের তীক্ষ্ম কর্কশ ধ্বনি একবার উঠেই থেমে গেল। টেবিলের ওপর রাখা বাঁ হাতে দেহের ঊর্ধ্বাংশের ভার দিয়ে, বেঁকে উৎকর্ণ হয়ে দাঁড়িয়ে রইল বিভাস। কিন্তু বাইরে থেকে আর কোন শব্দ এল না। অনেকক্ষণ সেইভাবে দাঁড়িয়ে থেকে আবার বসতে হল, বেড়াল দুটোর ঝগড়া বোধহয় মিটে গেছে।

ডান দিকের ঘরে বিতোষের আর পিছনের একটা ঘরে তার বাবার কোন সাড়া নেই। বাবার কথা ভাবলেই কী এক রহস্যজনক কারণে এই শহরের পরিত্যক্ত গভর্নমেণ্ট হাউসটার জংলা চেহারা তার মনে স্পষ্ট হয়। গভর্নমেণ্ট হাউসের ক্যানিং রোডের দিকের আগাছা আর বুনো লতায় ছাওয়া নিচু পাচিলের পাশের একটা দেড় শতকের পুরনো ইঁদারা পরিচ্ছন্ন অথচ আদুড় গায়ে একেবারে সামনে এসে দাঁড়ায়, কঙ্কালের মত। তখন আর যেন ঘন সবুজ শ্যাওলার আস্তরণ থাকে না, ইটের বিন্যাস দেখা যায়। ছোট পাতলা ইট, বিস্কুটের মত। ঠিক বিস্কুটের মত নয়, বিস্কুটের উপমা নিখুঁত হয় না। ওদিকে কখনও চোখ গেলে —যদিও না যাবার সম্ভাবনাই বেশি—এই শহরের ইংরেজিনবিসরা বলবে, 'বিস্কিট ব্রিক্‌স্'।' আসলে, কথাটা মুখরোচক না হলেও, ইটগুলো ঠিক তাসের প্যাকেটের মত।

আবার হঠাৎ বাইরে থেকে এল সেই শব্দটা। দুটোর মধ্যে একটা নিশ্চয়ই তাদেরই বেড়াল। একটানে দরজা খুলে বিভাস ছুটে বেরিয়ে গেল। তার এমন হয়, বেড়ালের ঝগড়ার তীক্ষ্ম কর্কশ ধ্বনি শুনলে এমন হন্যে হয়ে ছুটতে হয়। খুব ছোটবেলা থেকে তার এই এক আশ্চর্য স্বভাব।

বারান্দা পার হয়ে লাফিয়ে রাস্তায় নামল। আন্দাজে নিজেদের মনে করে ক্ষিপ্র হাতে জাপটে ধরল সাদা বিদ্যুৎ চমকের মত একটা বেড়ালকে। ধরে রাখতে পারল না। হাত আঁচড়ে দিয়ে দুটো বেড়ালই ছুটে পালাল সিংদের বাগানে, অন্ধকারে হারিয়ে গেল।

খানিকটা এগিয়ে ফিরল বিভাস। হাত জ্বলছে, উত্তেজনায় লাফাচ্ছে হৃৎপিণ্ড। আকাশে অজস্র তারা, কেউ কোথাও নেই, সিভিল লাইন্স আজ রাত্রের মত মরে গেছে। এখনই দুটো বেড়ালের কলহের তীব্র তীক্ষ্ম কর্কশ ধ্বনি কুচিকুচি করে অন্ধকারের প্রসারিত শরীর কাটছিল, বিশ্বাস করা মুশকিল।

বাড়ির দিকে আর এক পা এগিয়ে মনে হল, বিজয়প্রতাপের ঘরে কেউ কথা বলছে।

দাঁড়িয়ে শুনল। বিজয়প্রতাপ আর ইন্দ্রাণীর গলা। খুব মৃদুকণ্ঠ, কিছু বোঝা যায় না। এই এখন এত রাত্রে ওই ঘরে ইন্দ্রাণী কেমন করে যেতে পারে, কেমন করে যেতে পারে!

তখনই, ঠিক তখনই, অনেকগুলো মাস আগেকার কয়েকটা কথা যেন কানে এল— 'তুই যেন কাঁপছিস! কাঁপছিস নাকি?' কার যেন থাবার মত হাত তার কাঁধ জোরে নেড়ে দিল। কে যেন কানের সঙ্গে ঠোঁট চেপে ধরে এতগুলো মাস পরে ওই কথা আবার বলল।

## আট

সেদিনও তখন এমন কিছু বেশি রাত হয় নি। তবু মনে হল, কাছাকাছি বাড়িগুলোর সবাই নিথর মরানদীতে ডুব দিয়েছে। তখন বাইরে শীতের হাওয়া। সামনের জানলাটা বন্ধ করে বিভাস টেবিল ল্যাম্পের আলোয় খোলা বই রেখে বসেছিল। বইয়ের পাতায় চোখ ছিল এবং মনও অনেকখানিই ছিল বইয়ের পাতায়। ছোটবেলা থেকে বই সামনে নিয়ে বসার অভ্যেস যথেষ্ট ছিল, সেই কারণে নানাবিধ ভাবনা জমে জমে ভারী হলেও মন আর চোখকে এক পথে নিয়ে যেতে বিশেষ কসরত করতে হত না।

বন্ধ জানলার ওপাশ থেকে কেউ চাপা গলায় ডাকল। বই থেকে মুখ তুলল বিভাস। সঙ্গে সঙ্গে জানলায় দুটো টোকা পড়ল। বিজয়প্রতাপের গলা শোনা গেল: 'বিভাস, আবে মারহুম্!' উত্তেজিত, অস্থির অথচ অনুচ্চ কণ্ঠ।

চাদরটা জড়িয়ে বিভাস বেরিয়ে এল। অন্ধকার বারান্দায় জানলার খড়খড়ির ফাঁক দিয়ে চুইয়ে আসা আলোয় সযত্নে গায়ে শাল জড়িয়ে বিজয়প্রতাপ দাঁড়িয়ে আছে। অন্ধকারে ভাল করে দেখা না গেলেও মনে হল, মুখ গম্ভীর, দাঁড়ানর ভঙ্গি অস্বাভাবিক। তাছাড়া বিজয়প্রতাপকে শাল গায়ে দিতে দেখার সৌভাগ্য এর আগে বিশেষ হয় নি। বিভাস কাছে আসতে বলল, 'তোকে আমার সঙ্গে একটু যেতে হবে।'

'কোথায়?'

'একবার গঙ্গার ধারে যেতে হবে।' বিজয়প্রতাপের গলা কেমন অচেনা মনে হল।

কিছু বুঝতে না পেরে বিভাস বলল, 'এত রাত্তিরে গঙ্গার ধারে কেন?'

'একটু আয় না আমার সঙ্গে। যেতে যেতে বলছি।'

জানলার একটা পাল্লা খুলে ভিতরে হাত বাড়িয়ে টেবিল ল্যাম্পটা নিভিয়ে দিল বিভাস। বারান্দা থেকে রাস্তায় নেমে এল বিজয়প্রতাপের সঙ্গে। স্ট্রীট রোডে এসে পড়তেই রাস্তার কাল অ্যাসফল্টে দুজনের দুটো অস্পষ্ট ছায়া প্রসারিত হল। উত্তর দিকে হাঁটতে হাঁটতে সব বলল বিজয়প্রতাপ। এমন সব বীভৎস কথা অবলীলায় বলল যা সহজে গ্রহণ করার মত কলজের জোর বিভাসের ছিল না। দুঃখ, যন্ত্রণা, ঘৃণা কোনটাই হয়ত না, তবু কী দুঃসহ অনুভব প্রচণ্ড ঘা দিল। শাল দিয়ে বিজয়প্রতাপ শুধু নিজেকেই জড়ায় নি, সযত্নে ঢেকেছে তার আর ইন্দ্রাণীর সেই দুরন্ত ঋতুর অযাচিত বীজাঙ্কুরের বিচ্ছিন্ন রক্তাক্ত সংক্ষিপ্ত শরীর।

বিজয়প্রতাপের মুখটা ভাল করে দেখতে ইচ্ছে হল বিভাসের। ভাল করে দেখা যায় না এই অন্ধকারে, অথবা ঠিক দেখাতে চায় না। মিথ্যেই কয়েকবার একটু একটু জ্বালা-করা চোখ রাখল বিজয়প্রতাপের মুখের আদলে। কাছে কোথাও একটা কুকুর আচমকা ডেকে উঠল। বিভাসের ছায়াটা একটা ঢেউ হয়ে ভেঙে গিয়েই আবার স্বাভাবিক অবয়ব পেয়ে

প্রসারিত হল।

রাজাপুর কবরখানার পাশ ঘেঁষে এসে বাঁ দিকে মিন্টো রোডে বাঁক নিয়ে বিভাস বলল, 'ইন্দ্রাণী কোথায়?'

'ওদের বাড়িতে।'

'কেমন আছে?'

'কেমন আবার থাকবে! ভালই আছে।'

বিভাসের মুখে আর কোন প্রশ্ন এল না। ভাবল, আরও প্রশ্ন মনে ভিড় করে আসাটা হয়ত বাড়াবাড়ি। যা ঘটেছে তা অসহ্য মনে হওয়া হয়ত বোকামি, হয়ত ছেলেমানুষি। চুপ করে রইল।

বিজয়প্রতাপ নিজে থেকেই আবার বলল, 'ডাক্তারটা আমাকে ফতুর করেছে। ঘড়ি বেচেছি, আংটি বেচেছি, বাবার ঘর থেকে চুরি করেছি, তবু নাকি তার পাওনা মেটে নি, পরে আরও দিতে হবে। নবাব খান অল্প কিছুও ধার দিতে রাজী হল না। হয়ত দিত, বেগম দিতে দিল না। একবার ভেবেছিলাম, অন্য ডাক্তারের কাছে না গিয়ে তোর বাবার কাছে যাব, চেষ্টা করব অবস্থাটা বোঝাতে। শেষ পর্যন্ত যেতে পারলাম না।'

বাইরের দিনরজনীর রঙ বদলে যাওয়ায় বিভাস অন্য কোথাও অন্য কিছু খুঁজতে গিয়ে বাবাকে নতুন করে দেখেছে। তাঁর একটা মিথ্যে আশঙ্কার কথা শুনে মনে হয়েছে, জীবন থেকে নির্বাসিত তাঁর ধুলোমাখা ছাইমাখা অনীহার অন্তরালে একটা সত্যির দরজা খুলে গেল। সেই সত্যি তখন কঠোর মনে হয়েছিল, এখন চোখে সয়ে গেছে। অথচ আজ ভাবল, ইন্দ্রাণী বিজয়প্রতাপ বেগম নবাব খান সবাই জাহান্নমে যাক, তবু তার বাবার কাছে যেন এসব কথা না বলা হয়।

একটা খালি সাইকেল রিক্স প্রচুর শব্দ করে সামনে থেকে এসে পিছনে চলে গেল। রাস্তায় লোকজন নেই। ক্লাইভ রোডে নেমে শঙ্কিত ছায়া ফেলে ফেলে উত্তরমুখো হাঁটতে শীত গায়ে কাঁটা দিল। চুপচাপ আরও কতদূর পা চালিয়ে মিঅর রোড পার হয়ে সামনে সব্জিক্ষেত। দুপাশে কপির সারের মধ্য দিয়ে হাঁটতে অস্বস্তি হলে লজ্জা পাবার কারণ নেই। মাঝে মাঝে ওরা রাত্রে ক্ষেত পাহারা দেয়। অবশ্য আশপাশে দেখা গেল না কাউকে।

সব্জিক্ষেত পার হয়ে একটু ঢালে নামলে বালির বিস্তার, তারপর স্রোতস্বতী গঙ্গা। বেশ খানিকটা দূর। স্রোত আছে কি না ভাল করে জানা নেই, এখান থেকে তাকিয়ে ঠিক বোঝা যায় না। শুধু চারদিকে বড় শীত। এখানে, সিভিল লাইন্সে, এই শহরে, আরও সব জায়গায় সব কিছুতে বড় শীত! বিজয়প্রতাপের সঙ্গে উবু হয়ে বসে বালি খুঁড়তে খুঁড়তে আঙুলের ডগা জ্বালা করছে। অনেক বালি খোঁড়া হয়ে গেলে একটা অন্ধকার গুহা তৈরি হল। শালের তলা থেকে ছেঁড়া কাপড়ে জড়ান সেই সামান্য ভার তার মধ্যে নামিয়ে দিল বিজয়প্রতাপ। ছেঁড়া কাপড় এক পাশে একটু সরে গিয়ে রক্তাক্ত তেলকাগজ বেরিয়ে পড়ায় চোখে ধারাল কিছুর খোঁচা খাওয়ার মত যন্ত্রণায় মুখ ফিরিয়ে নিলাম বলতে পারলে খুশী হতাম। এবং আমার দিক থেকে সেটাই শোভন হত। কিন্তু কী যে হল, মুখ ফেরাতে পারি নি।

আবার বালি চাপা দিয়ে সব নিশ্চিহ্ন করে উঠে দাঁড়ালাম, ফিরলাম সিভিল লাইন্সের দিকে। প্রায় নিঃসন্দেহ হলাম, আমরা দুই প্রিয়বন্ধু ছাড়া চরাচরে আর কেউ আর কিছু বেঁচে নেই।

বিজয়প্রতাপ অত্যন্ত বিরক্ত হয়ে বলল, 'তোকে ক্রশ চিহ্ন আঁকতে হবে না! ড্যাম্ ইট। এসব আইনসম্মত হয়ে যাওয়া উচিত।'

কে বলল আমি ক্রশচিহ্ন আঁকছি। আমি শুধু হাত দিয়ে দেখছিলাম, আমার কি দুটো কানই কাটা!

## নয়

আবার পাঁচ মাসের জেল হয়েছিল বিভাসের। পরীক্ষার পরে ব্যাপারটা ঘটেছিল, না হলে খুব ক্ষতি হত। এবারে আগের মত কোন প্রত্যক্ষ কারণ ছিল না, তবু তার জেল হওয়া অযৌক্তিকও ছিল না। নির্ভার প্রাত্যহিকতা থেকে এই নির্বাসন একেবারে অসহ্য লাগে নি, কিন্তু মনে হয়েছে, সাংঘাতিক অসুখে শরীরের প্রতিদিনের ক্ষয়ের মত কী যেন হারিয়ে যাচ্ছে জীবন থেকে, তাদের পুরনো বাড়িটার ঘর বারান্দা সিঁড়ি কুলুঙ্গি দেওয়ালের ফাটলের মত তার মনেও জমছে ছিবড়ের মত শুকনো অন্ধকার।

পাঁচ মাস পরে বাইরে এসে একটা বিকেলে ক্যানিং রোড দিয়ে শুধুশুধুই একলা হাঁটছিল। কোন কাজ ছিল না। পেভমেণ্টে হাওয়ায় উড়ছিল একটা দুটো হলুদ পাতা। বেগমের সঙ্গে হঠাৎ মুখোমুখি দেখা। তেলহীন চুলের চতুর বিন্যাস, তীক্ষ্ণাগ্র রক্তরঙ নখ, আচ্ছাদন স্বল্প, ঠোঁট গাল ভুরুতে রঙের প্রাচুর্য। কোন কথা না বলে পাশ কাটিয়ে যেতে চেয়েছিল বিভাস। বেগম ডাকলেন, 'বিভাস শোন।'

ফিরতে হল, যথেষ্ট অস্বস্তি নিয়ে অনিচ্ছায় ফিরতে হল।

কাছের একটা বনেদী রেস্টরাণ্টে বেগম তাকে নিয়ে গেলেন। একটা ছোট কিউবিক্‌লে বেগমের সামনের চেয়ারটায় বসতে হল। চা দিয়ে গেল দু'কাপ।

পিওনো বাজানর ভঙ্গিতে টেবিলের ওপর বেগমের একহাতের পাঁচটি আঙুলের অস্থির সঞ্চরণ, জিভ ঠোঁট দিয়ে আশ্চর্য কৌশলে এক মুখ হাওয়া নিয়ন্ত্রণ করে ওয়েটারকে চায়ের নির্দেশ দেওয়ার অননুকরণীয় শিল্পকর্ম বিস্ময়ের সঙ্গে লক্ষ্য করল বিভাস। বোঝা গেল—এমন কিছু বক্তব্য আছে বেগমের যা গুছিয়ে বলা তাঁর পক্ষেও সহজ নয়। বেগমের এত কাছে এমন একান্তে আগে কখনও বসে নি। কপাল নাসাগ্র বোধহয় ঘেমে গেছে, কিন্তু ও'র চোখের সামনে বসে এখন পকেট থেকে রুমাল বের করে নাকে ঘষা কি শোভন হবে।

'ইন্দ্রাণী আজকাল তোমাদের বাড়ি যায় না?' আচমকা প্রশ্ন করলেন বেগম।

'না।'

'তোমার সঙ্গে দেখা হয় না।'

'বিশেষ না।' সবটুকু সত্যি বলল না বিভাস। এই দেখা হওয়া মানে দেখা হলে একটু কথাও বলা। ইদানীং ইন্দ্রাণী নেহাত সামনে পড়ে গেলেও মুখ ফিরিয়ে পাশ কাটিয়ে যায়। 'বিশেষ না' বললে বোঝাতে পারে—আগের মত না হলেও, মাঝে মাঝে দেখা হয় এবং সামান্য কথাও হয়।

বেগম আবার বললেন, 'এখন তুমি কী করবে ভাবছ?'

'মালবিয়াজী সেণ্ট জোসেফ্‌স্ কলেজিয়েট স্কুলে আমার জন্যে একটা চাকরির চেষ্টা করছেন। চাকরিটা পাব আশা হচ্ছে। পেলে এম. এ. পরীক্ষাটা প্রাইভেট দেব।'

'ইন্দ্রাণীর সঙ্গে তোমার আগের মত ঘনিষ্ঠতা নেই কেন?'

এই জেরার কোন জবাব বিভাস খ‍ুঁজে পেল না।

একট‍ুক্ষণ চুপ করে থেকে বেগম বললেন, 'আমি জানি তুমি ইন্দ্রাণীকে পছন্দ কর।'

এটা প্রশ্ন নয়, অতএব উত্তর দিতে হবে না। অথচ কিছ‍ু না বললে বেগমের মন্তব্য মেনে নেওয়া হয়। তব‍ু চুপ করেই রইল।

'তোমার সঙ্গেই ইন্দ্রাণীর একটা সম্পর্ক গড়ে ওঠা স্বাভাবিক ছিল।' টেবিলের ওপর বেগমের অস্থির আঙ‍ুলের সঞ্চরণ দ্র‍ুত হল। 'আমি তো ভেবেছিলাম, তুমি এমন করে হার স্বীকার করবে না, একট‍ু বলিষ্ঠতা দেখাবে, অধিকার অর্জনের একট‍ু চেষ্টা করবে।'

এতক্ষণের অস্বস্থি এবার অসহ্য হল। একটানে চেয়ারটা সরিয়ে উঠে দাঁড়াল বিভাস। 'আপনার সঙ্গে আমি এসব বিষয় আলোচনা করতে পারব না, পারছি না। আমাকে যেতে দিন। আমাকে মাপ করবেন।' এক নিশ্বাসে কাঁপা কাঁপা ঠোঁটে কথা ক'টি বলে রেস্টরান্ট থেকে বেরিয়ে রাস্তায় নামল। আর পিছন দিকে একবারও ফিরে তাকাল না। আমার কাপ‍ুর‍ুষতা আমার চোখে আঙ‍ুল দিয়ে দেখাচ্ছেন বেগম। কিন্তু কেন? আমাকে এমন করে জ্বালিয়ে তাঁর কী লাভ হবে!

একটা দ‍ুপ‍ুরে, দ‍ুপ‍ুর গড়িয়ে গেলে, তুম‍ুল চিৎকারে বিভাসের ঘ‍ুম ভেঙে গেল। দ‍ুপ‍ুরে ঘ‍ুমনোর অভ্যেস তার কোনদিন ছিল না, সম্প্রতি একট‍ু চেষ্টা করছে। উঠে বসে জানলা দিয়ে বাইরে তাকাল। পড়ন্ত রোদে সিংদের বাগানে দ‍ু'জন প্রবীণ ব্যক্তি পরস্পরকে ছিঁড়ে খেতে চাইছেন। একজন নবাব খান, আর একজন উদয়প্রতাপ সিং। বিজয়প্রতাপ তার বাবাকে জাপটে ধরেছে, তাঁর হাতে বন্দ‍ুক। ছ‍ুটির দিন নয়, বিতোষ বাড়ি ছিল না। বিভাস ঘর থেকে বেরিয়ে সামনের বারান্দায় এসে দাঁড়াল। দেখল, নবাব খানের বাংলোর বারান্দায় দাঁড়ান বেগম। ইন্দ্রাণী সেখানে কোথাও নেই।

নবাব খান ঢোলা পাজামা আর গিলে-করা পাঞ্জাবীতে মেদের ভার ঢেকে হাত-পা ছ‍ুড়ে শাসাচ্ছেন, এবং, আন্দাজ করা যায়, তাঁর শাসানিতে ক্ষিপ্ত হয়ে উদয়প্রতাপ সিং বন্দ‍ুক হাতে বাগানে নেমে এসেছেন।

এই কলহের উৎস যে ইন্দ্রাণী আর বিজয়প্রতাপ তা ব‍ুঝতে কোন কষ্ট নেই। একবার ইচ্ছে হল এগিয়ে যাবে, আবার তখনই ইচ্ছেটা উবে গেল। কী হবে ওখানে গিয়ে। একট‍ু পরে দ‍ু'জনেই ক্লান্ত হবেন, ঝগড়া থেমে যাবে। ওখানে, সিংদের বাগানে, য‍ুদ্ধ হবে না, কিছ‍ুক্ষণ শ‍ুধ‍ু য‍ুদ্ধের মহড়া হবে। যেট‍ুকু হতে পারত, বিজয়প্রতাপ তা হতে দেবে না। বারান্দায় দাঁড়িয়েই রইল বিভাস।

নবাব খান এবং উদয়প্রতাপ সিংয়ের গর্জন থেকে কয়েকটি কথা বোধগম্য হল। দ‍ুজনেই ব‍ুঝিয়ে দিতে চাইছেন যে, বংশমর্যাদায়, বিত্তে সম্পদে একজনের স্থান অপরের থেকে অনেক উঁচুতে। নবাব খান বলছেন—বিজয়প্রতাপের মত ছেলেকে সিং যদি এখনও না সামলান, যদি ইন্দ্রাণীর সঙ্গে মেলামেশার স‍ুযোগ দেন, তাহলে একটা খ‍ুনোখ‍ুনি হয়ে যাবে। এবং খ‍ুনখরাবি তিনি নিজেই করবেন, কোন পেশাদার খ‍ুনীর দরকার হবে না, কারণ জল্লাদের রক্ত তাঁর শরীরে প্রচুর।

উদয়প্রতাপ সিং বোঝাতে চাইছেন—তাঁর ভবিষ্যতে আস্থা নেই। বন্দ‍ুকের কুঁদোটা বিজয়প্রতাপের হাত থেকে ছাড়াতে পারলে তিনি এখনই নবাব খানকে এক গ‍ুলীতে শেষ

করবেন। তাছাড়া তাঁর ছেলে বিজয়প্রতাপ যদি ভাল শিকারী হয়ে থাকে, সে তো গৌরবের কথা। একটা বুনো হরিণ আর একটা এই বয়েসের মেয়ের মধ্যে কোন পার্থক্য তাঁর কাছে নেই।

উদয়প্রতাপ সিং ঠিক একটি মাংসাশী জীবের মত গর্জাচ্ছেন। অথচ তাঁর নিজের শরীর এতটা দূর থেকেও অত্যন্ত অসুস্থ মনে হয়। এখনই রক্তের চাপে বাগানের মাটিতে মুখ থুবড়ে পড়লে অথবা বিজয়প্রতাপের গায়ে ঢলে পড়লে অবাক হবার কিছু নেই।

আহা, এমন একটি দৃশ্যে ডাক্তার জিতেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায় অনুপস্থিত! এত সব ধ্বনি হয়ত তাঁর কানে যাচ্ছে না। কানে পেঁছিলেও নড়বেন না, দেওয়ালের সঙ্গে চেপে রাখা চেয়ারটা থেকে উঠে বাইরে আসবেন না।

সন্ধ্যের পরে বিজয়প্রতাপ এল। একমুখ হাসি নিয়ে ঘরে এসে বিছানায় বসল, তারপরই শুয়ে পড়ল টানটান হয়ে। দুপুরের পরের দৃশ্যের কোন ছায়া নেই মুখে। একটু পরে উঠে বসে বলল, 'তোর সঙ্গে কথা আছ বিভাস।'

'বল।'

'আমরা বিয়ে করছি।' কোন ভূমিকা নেই বিজয়প্রতাপের।

বিভাস জোর করে ঠোঁটে হাসি টেনে এনে শুধু তাকিয়ে রইল।

'আবার শুরু হল, তোর চোখ লাজুক হয়ে আসছে। শোন, আইনের বিয়ে, তোকে একজন সাক্ষী হতে হবে।'

বিজয়প্রতাপ উঠে ভিতরের দিকের দরজাটা ভেজিয়ে ফিরে এসে বসল। পকেট থেকে প্যাকেট বের করে সিগারেট ধরাল। প্যাকেটটা ছুড়ে দিল বিভাসের টেবিলে। বিভাস তুলে নিল না, তখনও সিগারেট খেতে শেখেনি।

'আমি ব্যাপারটা এত তাড়াতাড়ি চাইনি। কিন্তু ইন্দ্রাণী খুব ব্যস্ত। এতদিন আইনের বিয়ের বয়েসে পেঁছিতে একটু বাকী ছিল, তাই চুপ করে ছিল ইন্দ্রাণী, এখন ক্ষেপে গেছে।' একটু থেমে বিজয়প্রতাপ বলল, 'তাছাড়া আবার সেই ডাক্তারের কাছে যাওয়া সম্ভব না, ইন্দ্রাণীও রাজী না।'

'কেন, আবার সেই ডাক্তারের কাছে যেতে হবে কেন?'

'তোর মত নির্বোধকে কেমন করে বোঝাব! ইন্দ্রাণী এবার তাকে বাঁচাবে। নিজের প্রাণ থাকতে এবার তাকে মারতে দেবে না।'

বিভাসের মনে হল, বুঝতে পারছে, জীবন যৌবনের দুর্জ্ঞেয় রহস্য সরল হয়ে আসছে একটু।

'আমি হয়ত পারতাম না, কিন্তু অন্য পন্থা আছে, ডাক্তারের কাছে না গিয়ে অন্য পথ নেওয়া যায়। উপযুক্ত স্থানে একটি আচমকা আঘাত পেলে সব মিটে যায়। ভয় পাবার মত কিছু না, শুধু সব পরিচ্ছন্ন হয়ে যায়।'

বিভাস চেয়ার ছেড়ে এগিয়ে এসে বিজয়প্রতাপের গালে কঠিন একটি চড় মারল, জ্বালা করে উঠল হাত। সেই হাতটা মুচড়ে দিল বিজয়প্রতাপ, একেবারে ভেঙে দিতে গিয়েও দিল না, ছেড়ে দিল। তারপর সুবিন্যস্ত দু'সারি দাঁত উদ্ভাসিত করে হেসে বলল, 'এমন বাঁদরের মত লাফালাফি করছিস কেন? এই সিভিল লাইন্সেই এমন ঘটেছে, আমার কাছে নজির আছে।'

আবার চেয়ারে এসে বসল বিভাস। মনে হল, দুপুরের পরের দৃশ্য এতটা নাটকীয় হয়নি। সেই প্রথম প্যাকেট থেকে একটা সিগারেট নিয়ে ধরাল। কাশতে কাশতে জল এসে গেল চোখে।

বিছানায় টানটান হয়ে শুয়ে পড়ে বিজয়প্রতাপ বলল, 'বেগমটা বড় জ্বালাচ্ছে ইন্দ্রাণীকে। যখন তখন চুলের মুঠি ধরে মাথা ঠুকে দিচ্ছে দেওয়ালে। নিখাদ ডাইনি।'

'তুই নিজেই তো জানোয়ারের মত নানাবিধ পন্থার কথা বলছিস। এটা হয়ত বেগমের মেয়েকে শাসন করার একটা পন্থা।'

'এটা শাসন নয়। হিংসে, হিংসে। হিংসেয় জ্বলে পুড়ে মরছে বেগম। আমি ছাড়া অন্য কারও সঙ্গে ইন্দ্রাণীর এধরনের কিছু হলে বেগম খুশীই হত।'

বেগমের রেস্টরান্টের কথাগুলো মনে পড়ল বিভাসের। আরও মনে পড়ল, একটা সময় ছিল যখন বেগমের অন্তঃপুরে উধাও হত বিজয়প্রতাপ। কিন্তু সে তো কতকাল আগের কথা। এখনও জ্বলছেন বেগম! এমন হয় নাকি? আর জ্বলে পুড়ে ছাই হতে কতদিন লাগে!

## দশ

একটা স্টেশনে ট্রেন থামল। হাজারিবাগ রোড। রাত তিনটে বাজতে মাত্র মিনিট পনের বাকী। এই স্টেশনে চারপাঁচ মিনিট দাঁড়াবে ট্রেন। বিভাস কামরা থেকে প্ল্যাটফর্মে নেমে পড়ল। মাথার ওপরে, স্টেশনের আলোর পরিধির বাইরে ঝাঁঝাঁ করছে অন্ধকার রাত। হাওয়ায় হেমন্তের হিম। কী আশ্চর্য, একটা চা-ওয়ালা এল, আশীর্বাদের মত।

পাশের কামরাটি প্রথম শ্রেণীর। কলকাতার একটা কলেজের এক ঝাঁক এ্যাংলো-ইণ্ডিয়ান আর বিদেশী মেয়ে এবং তাদের দুজন অধ্যাপিকা আর একজন অধ্যাপকের জন্যে রিজার্ভ করা কামরা। তার পাশের তৃতীয় শ্রেণীর কামরাটায় তাদের দলের ছেলেরা রয়েছে। উত্তরপ্রদেশের কোন শহরে কিছু খেলতে যাচ্ছে তারা। প্রায় প্রত্যেক স্টেশনে মেয়েদের কামরার দরজায় এসে ছেলেরা দাঁড়াচ্ছে আর তাদের হাত ধরে লাফিয়ে লাফিয়ে নামছে মেয়েরা। ছেলেদের এবং অধ্যাপক-অধ্যাপিকাদের অঙ্গে যথেষ্ট পোশাক আছে, কিন্তু এই মেয়েদের প্রত্যেকের জুতোর ওপর থেকে শুরু করে পায়ের ঊর্ধ্ব প্রত্যন্ত পর্যন্ত একেবারে আদুড়। এদের শীত নেই। বস্তুত পনের থেকে পঁচিশ বছরের মেয়েদের মোটেই শীত থাকে না! কিন্তু মুশকিল হচ্ছে তারা প্ল্যাটফর্মে নামলে তাদের হাসি, ঢলেঢলে পড়া এবং আদুড় পা দেখবার জন্যে স্টেশনে স্টেশনে নীল শার্ট-প্যাণ্ট পরা কনিষ্ঠতম রেলকর্মীরা কাজ ফেলেও সার বেঁধে দাঁড়িয়ে পড়ছে। আগের একটা স্টেশনে এক ভদ্রলোক তাদের দিকে চেয়ে ঘৃণার সঙ্গে মন্তব্য করেছিলেন—'কী বেহায়ার মত মেয়েদের দিকে তাকিয়ে আছে!' এখন এই স্টেশনের নীল শার্ট-প্যাণ্ট পরা লোক ক'টিকে দেখে বিভাসের মনে হল, তাদের চোখেমুখে বেহায়াপনা থেকে, হ্যাংলামি থেকে বিস্ময় বেশি। এবং মনে হল, এটা সম্পূর্ণ স্বাভাবিক, এর জন্যে তাদের ঘৃণা করার অধিকার সেই ভদ্রলোকের, যিনি সামনের বেঞ্চের একজনের কানের পাশে পা তুলে দিয়েছেন, ছিল না।

ট্রেন ছাড়বে। ছেলেরা-মেয়েরা তাদের কামরায় উঠে গেছে। বিভাস দেখল, মেয়েদের কামরার গায়ে খড়ি দিয়ে বড়বড় অক্ষরে লিখেছে—'ওন্‌লি ফর্ দি লোন্‌লি।' আর এক

কুল্‌হাড় চা নিয়ে নিজের কামরায় উঠল বিভাস। হঠাৎ মনে পড়ল, জওলাপ্রসাদের ছোট মেয়ে বিনীতাকে একদা এমন সংক্ষিপ্ত পোশাকে দেখেছিল।

এর পর আরও অনেকগুলো স্টেশন—কোডার্মা, গয়া, ডেহরি-অন-সোন, সাসারাম, মোগলসরাই, মীর্জাপুর, তারপর সেই শহর যা তাকে পুড়িয়ে নিঃশেষ করেছে, ছাই করে ছড়িয়ে দিয়েছ হাওয়ায়।

জানলার কাঠে মাথা রেখে আর একটা সিগারেট ধরাল বিভাস।

উদয়প্রতাপ সিং ছেলের বউ ঘরে এনে বেশি দিন বাঁচেন নি, কয়েক সপ্তাহের মধ্যেই মরেছিলেন। তার আগেই কলেজ ছেড়েছিল বিজয়প্রতাপ আর ইন্দ্রাণী। তাঁর মৃত্যুর পরে বাবার যা কিছু ছিল কয়েক মাসে উড়িয়ে দিয়েছিল বিজয়প্রতাপ। তখন সারা শহর তোলপাড় করে খুঁজেছিল যে কোন একটা চাকরি। অবশেষে পেয়েওছিল একটা, ফোর্টের আর্সেনালে। দক্ষিণা কম ছিল, অত্যন্ত কম। অথচ বিজয়প্রতাপ নিজেকে খুব বেশি দামী ভেবেছিল, অসাধারণ ভেবেছিল। এখন দক্ষিণার বহর দেখে প্রচণ্ড ঘা খেয়ে তার ঔদ্ধত্য আরও অনেক বেড়ে গেল।

অনেক টানাটানি ছেঁড়াছিঁড়ি করে এক বছর ছিল চাকরিটা; তারপর আর থাকল না। সেই একটা বছর বিভাস মাঝে মাঝেই ওদের বাড়িতে গিয়েছে, সহজ হতে চেয়েছে ওদের সঙ্গে। ইন্দ্রাণীর দ্বিধার, সঙ্কোচের বালাই দূর করার জন্যে তার সব আচরণে বুঝিয়ে দিতে চেয়েছে—ইন্দ্রাণী, তোমাকে আমি ঘৃণা করি না, এতটুকু ঘৃণা করি না। ওদের সংসারে অসচ্ছলতা চরমে উঠলে তার আচরণে বুঝিয়ে দিতে চেয়েছে—ইন্দ্রাণী, তোমাকে আমি করুণা করি না, এতটুকু করুণা করি না। বিজয়প্রতাপকে লুকিয়ে টাকা দিয়েছে, নানা ছুতোয় নানাবিধ উপহার দিয়েছে প্রতি মাসে। মাঝে মাঝেই চা, আখরোট কিসমিস নিয়ে গেছে। বলেছে, 'এই চা একটা দোকান থেকে একমাত্র আমি পাই। এমন ব্লেণ্ড আর কারও জন্যে করে না। এই আখরোট কিসমিস আমি নিয়ে আসি আমাদের কৈশোর আর প্রথম যৌবনকে সম্মান দেবার জন্যে, হয়ত কিছুক্ষণ বাঁচিয়ে রাখবার জন্যেও।'

সেই এক বছর ইন্দ্রাণীর মুখ প্রায় সব সময় বিষণ্ণ দেখেছে। তার একটা স্পষ্ট কারণ ছিল। উদয়প্রতাপ সিংয়ের মৃত্যুর কয়েক মাস পরে ইন্দ্রাণী ডাফরিন হাসপাতাল থেকে শূন্য হাতে ফিরে এসেছিল। বিভাস এই ভেবে নিশ্চিন্ত ছিল যে, তার শিশুর জন্মের আগের মৃত্যু তার বিষণ্ণতার একমাত্র কারণ। অন্য কারণ থাকা, বস্তুত অন্য কারণ দেখা দেওয়া, অসম্ভব নয় ভেবে এই স্পষ্ট কারণটা পেয়ে গিয়ে বিভাস বরং শান্তিতে ছিল। বিজয়প্রতাপ সরল সংসারে মগ্ন হবে এমন বিশ্বাস দৃঢ় ছিল না বলে অন্য কারণ দেখা দেওয়া অসম্ভব নয় মনে হয়েছে।

সে খুব দামী অথচ উপযুক্ত দাম দেবার মত উপযুক্ত মানুষ নেই—এই অহঙ্কার সেই সময়টায় ক্ষেপিয়ে তুলেছিল বিজয়প্রতাপকে। কিছুতেই স্বাভাবিক হতে পারছিল না। সব কিছুকে তাচ্ছিল্য করার প্রবণতা ক্রমান্বয়ে বাড়ছিল, সব কিছুর নিন্দে করতে তার জিভ প্রতিদিন তীক্ষ্ণতর হচ্ছিল।

তিন মাসের বিস্ময়কর সাধনায় জুটিয়েছিল আর একটা চাকরি। কিন্তু সেই একই কাহিনী, উপযুক্ত দাম না পাওয়ার সেই পুরনো কিস্‌সা। চাকরিটা ছিল রেল স্টেশনে, ডিভিশনাল সুপারিন্টেণ্ডেন্টের অফিসে। মাঝেমাঝেই যেত না, গেলেও ঠিক সময়ে যেত না, নিজের সমান স্তরের কর্মীদের সঙ্গে ঘনিষ্ঠতা অসম্মানজনক মনে করত, নিজেকে

তাদের থেকে অনেক উঁচু স্তরের জীব হিসেবে উপস্থাপনার পদ্ধতিটা স্থূল ছিল, করণীয় কাজ না করার অভিযোগ আনলে মারমুখো হয়ে উঠত। ফলে এক সময় এই চাকরিটাও গেল।

এতদিনে একবার বেঁকে বসল ইন্দ্রাণী, যেন কতকাল পরে খোলস ছিঁড়ে বাইরে এল। একটা সকালে ঝগড়া করে, বিজয়প্রতাপের ক্ষুব্ধ প্রতিবাদ উপেক্ষা করে দেখা করতে গেল ডিভিশনাল সুপারিন্টেন্ডেন্টের সঙ্গে। বলে গেল, বিজয়প্রতাপকে যেমন করে হোক আবার চাকরিতে বহালের ব্যবস্থা করে ফিরবে।

দুপুর পার হয়ে গেলেও ইন্দ্রাণী যখন ফিরল না, বিভাসের খোঁজে এল বিজয়প্রতাপ। বাড়িতে না পেয়ে স্কুলে এসে ধরল। যেন সব অপরাধ বিভাসের এমন একটা ভাব দেখিয়ে জানাল, তাকে একবার স্টেশনে যেতে হবে, ইন্দ্রাণীকে তখনই বাড়ি ফিরিয়ে আনতে হবে। একটা নোংরা চাকরির জন্যে এত অপমান অসহ্য। বিজয়প্রতাপ নিজে সেখানে যেতে পারছে না, কারণ সে তার অফিসারের মুখ দেখতেও নারাজ।

সেদিন স্কুল থেকে বেরিয়ে কুইন্স রোড দিয়ে স্টেশনে বিজয়প্রতাপের অফিসে এসে বিভাস চমকে উঠেছিল। ইন্দ্রাণীকে এমন ভাবে দেখবে কোনদিন কল্পনায় ছিল না। বিজয়-প্রতাপের অফিসারের ঘরের সুইংডোরের সামনে দেওয়ালে পিঠ দিয়ে মেঝেয় বসেছিল ইন্দ্রাণী, একটা স্লিপারের একটি অত্যাবশ্যক স্ট্র্যাপ ছেঁড়া, পায়ে প্রচুর ধুলো, মুখ শুকনো, চোখে দুঃসহ ধার। আশপাশে চার-পাঁচটি বেয়ারা দাঁড়িয়েছিল।

তাকে দেখেই যেন ফণা তুলে উঠে দাঁড়াল ইন্দ্রাণী। বিদ্রুপের হাসিতে মুখের পেশী বিকৃত করে বলল, 'আমাকে অপমান করতে এলে, বিভাস?'

'ছিঃ!' বিভাস সিঁড়ি ভেঙে উঠে এসে মুখোমুখি হল। 'এমন কুৎসিত কথা কেন বলছ?'

শুকনো ঠোঁট একপাশে টেনে রেখে ইন্দ্রাণী বলল, 'আমাকে এখানে এই অবস্থায় দেখতে আসা অপমান করা ছাড়া আর কী?'

আহত গলায় বলল বিভাস—'আমি তোমাকে দেখতে আসিনি। তোমাকে বাড়ি নিয়ে যেতে এসেছি।'

'তুমি এত নির্বোধ নও যে আমাকে করুণা করলে অপমান করা হয় সেটাও বোঝ না।'

'তোমাকে আমি করুণা করি না ইন্দ্রাণী, এতটুকু করুণা করি না! চল, এখনই বাড়ি ফিরে চল আমার সঙ্গে, এভাবে এই চাকরি ফিরে পেতে বিজয়প্রতাপ চায় না।'

'তুমি এখান থেকে যাও বিভাস, আমার সামনে থেকে সরে যাও।' ইন্দ্রাণীর বাগভঙ্গি আরও কঠোর হল। 'তোমার বোঝা উচিত তুমি এখন এখানে থাকলে আমার অপমানবোধ সব থেকে তীব্র হয়।'

'কেন তা হবে? আমি তোমার বন্ধু, ছোটবেলা থেকে তোমার বন্ধু, কষ্টের সময় আমি কাছে এলে তোমার তো একটু স্বস্তি পাবার কথা।'

'তোমাকে বোঝান যাবে না। তুমি বুঝতে না চাইলে আমি কেমন করে তোমাকে বোঝাব? কিন্তু তুমি এখান থেকে যাও বিভাস, আমার সামনে থেকে সরে যাও।'

'আমি তোমাকে নিয়ে যাব।' বিভাস এমন কি হাত বাড়াল ইন্দ্রাণীর হাত ধরে টানবার জন্যে।

'এটা নাটক করবার জায়গা নয়।' এক পা পিছিয়ে গেল ইন্দ্রাণী। 'অফিসের বারান্দা

নাটকের সংলাপের মত করে কথা বলার জায়গা নয়। তুমি এখনই চলে যাও এখান থেকে, না হলে আমি চিৎকার করে লোক জড় করব, বলব—তুমি আমাকে অপমান করছ।'

একটা বড়ঘরের খোলা দরজায় বেশ কয়েকজনকে উঁকি দিতে দেখা গেল। বিবর্ণ মুখে নিচে নামার সিঁড়িতে পা বাড়াল বিভাস। এর পরও জোর করবার অধিকার তার নেই। বিজয়প্রতাপ নিজে আসুক। একটি বেয়ারা তার সঙ্গে সঙ্গে সিঁড়িতে নেমে এল, জানাল—তাদের বড় সাহেব ইন্দ্রাণীর কথা একবার শুনেছেন, আর শুনতে চান না, কিন্তু ইন্দ্রাণী আর একবার তার বক্তব্য পেশ না করে যাবে না, অফিসারটি তাঁর ঘর থেকে বেরিয়ে না আসা পর্যন্ত ওখানে বসে থাকবে।

চাকরিটা বিজয়প্রতাপ আবার পেয়েছিল, কিন্তু পুরো দু'মাসও রইল না। একই অফিসে তার দ্বিতীয়বার কাজ পাওয়াটা বিভাসের বিস্ময়কর মনে হয়েছিল, দ্বিতীয়বার চাকরি যাওয়াটা বিস্ময়কর মনে হয়নি।

ঠিক সেই সময়ে বিজয়প্রতাপকে জওলাপ্রসাদের সঙ্গে ঘনিষ্ঠ হতে দেখেছিল। সেই সময়ে একদিন সন্ধ্যায় জওলাপ্রসাদের ছোটমেয়ে বিনীতাকে অত্যন্ত সংক্ষিপ্ত পোশাকে টেনিস র‍্যাকেট হাতে সিং বাড়ির ফটকে গাড়ি থেকে বিজয়প্রতাপের সঙ্গে নামতে দেখেছিল। বিভাস শুনেছিল, যুদ্ধের শেষের দু'তিন বছরে জওলাপ্রসাদ টাকার পাহাড় করেছে।

জওলাপ্রসাদের সঙ্গে রাস্তা বাড়ি ব্রিজ তৈরির ব্যবসায় নামবার পরিকল্পনা নিয়ে নিজেদের বাড়িটা বেচে দিয়েছিল বিজয়প্রতাপ। তারপর একদিন কৈশোর আর প্রথম যৌবনকে অল্পক্ষণের জন্যও বাঁচিয়ে রাখার সব অনুষঙ্গ হাতছাড়া করে সিভিল লাইন্সের অন্য পাড়ায় উঠে গিয়েছিল একটা ভাড়া-করা ছোট বাড়িতে।

প্রথম বছরটা নাকি নিদারুণ পরিশ্রম করেছিল বিজয়প্রতাপ, একটা ভয়ঙ্কর শক্তিমান জন্তুর মত খেটেছিল। আর পুরোপুরি বছরটা ঘুরে আসবার আগেই সোনার সিন্দুকের রহস্যময় চাবিটা তার হাতে এসে গিয়েছিল। তখন বোধহয় তার নতুন কাজের অলিগলি নখদর্পণে এসে গেলে বিশেষ করে শীতকালে বিকেলের দিকে বিজয়প্রতাপ একটু অবসর করে নিয়েছিল। কারণ বেশ কয়েকবার টেনিস লন্ থেকে বিনীতার সঙ্গে ফেরার পথে বিভাসকে তুলে নিতে এসেছে, নিজের গাড়িতে চেপে এসেছে। মোটরে বসে বিভাসের প্রায় প্রত্যেকটি সাধারণ কথায় বিনীতা হাসিতে ফেটে পড়েছে। এত অকারণে হাসি কেন আসে কেমন করে আসে বিভাস বোঝে নি।

জওলাপ্রসাদের বাড়িতে বিনীতাকে নামিয়ে দিয়ে বিজয়প্রতাপদের বাড়ি যাবার পথে বিভাস একদিন বলেছিল—'ইন্দ্রাণী তোর সঙ্গে যায় না কেন?'

অস্বাভাবিক গম্ভীর গলায় বিজয়প্রতাপ বলেছিল—'বাড়ি থেকে বেরোতেই চায় না। বড় ঘরকুণো।'

বিভাসের মনে হয়েছিল, এমন অবিশ্বাস্য কথা জীবনে কম শুনেছে। যে মেয়ে কয়েক বছর আগেও সারা সিভিল লাইন্সে সংক্রামক গুজবের, সরস গুঞ্জনের উৎস ছিল সে এখন ঘর থেকে বেরোতে চায় না এমন কথা সহজে বিশ্বাস করা মুশকিল। মনে হয়েছিল, তার জানার পরিধির বাইরে এমন গভীর কিছু আছে যা জানবার অধিকার তার সত্যিই নেই। অবশ্য খুব গভীর কিছু রহস্য রয়েছে ভাববারও আসলে বিশেষ যুক্তি ছিল না। বিজয়-

প্রতাপ নিজেক লুকিয়ে রাখতে জানত না। তাকে আর বিনীতাকে ঘিরে একটা সম্ভাবনা যে ক্রমান্বয়ে অবয়ব পাচ্ছিল তা তেমন প্রচ্ছন্ন ছিল না।

বিভাস বুঝেছিল, সবার সুখের চেহারা এক নয়। যে সুখে মদের মত ঝাঁজ নেই তা বিজয়প্রতাপের জন্যে নয়। বেহালার সুর যে সুখের উপমা তা বিজয়প্রতাপকে টানে না। নতুন নতুন সুখের উল্লাসে উন্মাদ হতে না পারলে সে বাঁচবে না।

এইসব বুঝেছিল বিভাস, বুঝতে পেরেছিল—জীবন থেকে বিস্ময়বোধ একেবারেই চলে যাচ্ছে। আর যেন অচেনা কিছু নেই, নতুন কিছু নেই, যা দেখে অবাক হতে পারে। অথচ যুদ্ধ গেছে, দাঙ্গা গেছে, রঙ বদলে গেছে দেশের। তার বয়েসী আর প্রায় সবাই হন্যে হয়ে পোশাকে আচরণে কথায় ছিঁড়েছিঁড়ে খেতে চাইছে ঝাঁজাল সুখের শরীর। প্রতিদিন আরও আরও হন্যে হয়ে উঠছে এই দেখে যে, সব সুখের শরীর প্ল্যাস্টিকের মত। আসলে সব ফুলের সব পাঁপড়ি প্ল্যাস্টিকের। এত সব বুঝেছিল বিভাস, তার নিজের বয়েসটা যেন বেড়ে গিয়েছিল একটু বেশি তাড়াতাড়ি। তাদের শ্যাওলাধরা একতলা বাড়িটার আশপাশে নির্জনতা যত বাড়ছিল তত বেশি ডুবছিল বিস্ময়বোধহীন বিবর্ণ শূন্যতায়।

ইন্দ্রাণী যখন ফিরে এসেছিল নবাব খানের বাঙলোয়, যখন ইন্দ্রাণী আর বিজয়প্রতাপ পরস্পরের সম্মতিতে আইনের সাহায্য প্রার্থনা করেছিল এবং যখন আইন তাদের সব সম্পর্ক চুকিয়ে মুক্ত নির্ভার করে দিয়েছিল, সেই দিনগুলোয় বিভাস তেমন বিস্মিত হয় নি। খুব একটা আকস্মিক তীব্র আঘাত লাগেনি মনে। আসলে মন হয়ত আর তেমন তীক্ষ্ম ছিল না। শুধু ইন্দ্রাণী যখন সব ফেলে আবার ফিরে এল, বেশ একটু বেসামাল হয়েছিলেন নবাব খান। তাঁকে নেশায় চুর হয়ে বেলেল্লাপনা করতে বিভাস এর আগে কখনও দেখেনি।

যে সকালবেলাটায় ইন্দ্রাণী সব ফেলে নবাব খানের বাঙলোয় চলে এসেছিল সেদিন দুপুরে বেগম ডেকে পাঠিয়েছিলেন বিভাসকে। বিভাস যায়নি। নবাব খানের বাঙলোর অন্দরে প্রবেশের অভ্যেস তার ছিল না। ভেবেছিল, কী হবে ওখানে গিয়ে। এবিষয়ে কারও সঙ্গে কোন আলোচনা করার রুচি ছিল না। বেগম হয়ত জানতে চাইবেন, ইন্দ্রাণী আর বিজয়প্রতাপ পরস্পরের কাছে এমন দুঃসহ হল কেন। এই সম্ভাব্য প্রশ্নের কোন সঙ্গত উত্তর দেওয়ার চেষ্টা করার উৎসাহও তখন অবসিত। তাছাড়া এসবের সঙ্গে বিভাসের নিজেকে জড়ানরও কোন যুক্তি ছিল না। এমন হবার আগে এমন যে হবে বিভাস বুঝেছিল, বিজয়প্রতাপের কথায় আচরণে বুঝেছিল, ইন্দ্রাণী তাকে কিছু আন্দাজ করবার অবকাশ দেয়নি। ইন্দ্রাণী তখন তাকে একবারও ডাকেনি, তার যন্ত্রণার দিনগুলোয় ডাকেনি। এখন সব চুকে গেলে নবাব খানের বাঙলোয় গিয়ে বেগমের সঙ্গে বিলাপ করে কী হবে। ইন্দ্রাণীর বিষয়ে উৎসাহিত হবার অধিকার ইন্দ্রাণী তাকে দেয়নি।

শূন্য উধাও মাঠে বৈশাখের কড়া রোদের মত তার ছোটঘরে শূন্যতা কাঁপতে থাকলে বিভাস মাঝে মাঝে ভেবেছে, এত সব তো না-ও হতে পারত। ন্যাড়াছাতের কার্নিসে বসে আবাবীল পাখিদের উড়ে উড়ে খড়কুটো বয়ে আনা দেখার মত জীবনটা সহজ হয় না কেন। অবশ্য নখ দিয়ে বালি খোঁড়ার মত করে নির্জন ঘরে নিজের মনকে খুঁচিয়ে জ্বালা ধরানর বিলাস তেমন প্রশ্রয় পায়নি। এত কিছুর মধ্যেও নিজেকে নিরুত্তাপ রাখার নিপুণ সাধনায় মগ্ন ছিল বিভাস।

কয়েক মাসের মধ্যে জওলাপ্রসাদের ছোটমেয়ে বিনীতা যখন বিজয়প্রতাপের ঘরে

প্রতিষ্ঠিত হল, বিভাস অবাক হয়নি। সব যেন আগে থেকে জানাই ছিল, খড়ি দিয়ে টানাই ছিল সরলরেখা।

## এগার

আগে আগে, যখন প্রতিদিন একাধিকবার ইন্দ্রাণী এবাড়িতে আসত, বাংলো থেকে বেরিয়ে নবাব খানের বাগানের ডালিমগাছের ছায়া দিয়ে আসতে আসতে বিভাসকে জোর গলায় ডাকত একবার-দুবার। বিভাসের সাড়া পাবার জন্যে অপেক্ষা করত না। বাড়ির মধ্যে সব থেকে ছোটঘরে এবং সেখান থেকে ছাতে উঠে আসত। বিভাস বাড়ি থাকলে ইন্দ্রাণী এসে বারান্দায় উঠবার আগেই বুঝতে পারত ইন্দ্রাণী আসছে। কিন্তু সেদিন কখন নিঃশব্দে ইন্দ্রাণী এসেছে বুঝতে পারেনি। ইন্দ্রাণী আবার সহজে নিজে থেকে এবাড়ি আসবে এমন সম্ভাবনা কল্পনায় ছিল না, অন্তত নবাব খানের বাড়ি ফিরে আসবার তিন-চার মাসের মধ্যেই আসবে ভাবতে পারেনি।

একটুও জানতে না দিয়ে বাগান রাস্তা বারান্দা পার হয়ে এসে ছোটঘরের দরজায় একটা হাত রেখে চৌকাঠে দাঁড়িয়ে ইন্দ্রাণী বলেছিল, 'আসব?' ইন্দ্রাণীর কথা এত মৃদু হতে পারে আগে জানত না, একেবারে নতুন লেগেছিল। টেবিলের কাছে রাখা ঘরের একটিমাত্র চেয়ার ছেড়ে দিয়ে তাড়াতাড়ি উঠে দাঁড়িয়েছিল, ইন্দ্রাণীকে সেখানে বসতে বলে সরে গিয়েছিল খাটের দিকে। যেন বিশিষ্ট অতিথি কেউ এসেছেন, যাঁকে সযত্নে আপ্যায়ন করা দরকার।

প্রায় একসঙ্গে ইন্দ্রাণী চেয়ারটায় আর বিভাস খাটের পাশে বসেছিল। যদি একটুক্ষণ চুপ করে থেকে বিষণ্ণ চোখে তাকিয়ে ইন্দ্রাণী বিলম্বিত নিঃশ্বাস ফেলে বলত—'কতকাল পরে এবাড়িতে এলাম! তুমি কেমন আছ, বিভাস?'—এবং বিভাস যদি যৌবনবাউলের গভীর গলায় বলত—'এই আছি, আমার দিন কাটছে, শুধু দিন কাটছে।'—তাহলে বেশ মধুর মধুর হত ঘরের হাওয়া।

ইন্দ্রাণী অবশ্য চেয়ারটায় চুপ করেই বসে রইল, একটু বেশিক্ষণ চুপ করে রইল। ঘরে এসেই একবার তাকিয়েছিল বিভাসের মুখোমুখি, তারপরই চোখ নামিয়ে নিয়েছে। ইন্দ্রাণীকে এমন দেখতে খুব আশ্চর্য লাগে। চোখ তুলে, এমনকি বিভাসের দিকেও চোখ তুলে তাকাতে পারছে না। অথচ এর কোন কারণ নেই, অন্তত বিভাস এর কোন কারণ জানে না।

অনেকটা সময় পার হয়ে গেলে, কোন ভূমিকা না করে ইন্দ্রাণী বলল, 'আমার একটা চাকরির দরকার।'

কিছু না ভেবে অর্থহীন প্রশ্ন করল বিভাস—'কেন?'

আর একবার ইন্দ্রাণী চোখ তুলে তাকাল, হয়ত বুঝতে দিল—এমন নিরর্থক প্রশ্ন করা নিতান্ত বোকামি। টেবিলের ওপর চোখ নামিয়ে নিয়ে বলল, 'কিছু একটা করতে চাই। আমার সময় কাটছে না।'

সময় ঠিক কেটে যায়। দিন যায়, দিন যাবে। এই তো এতগুলো বছরের অগুনতি দিন গেছে। বিভাসের চোখ তীব্র আলোয় ঝলসে দিয়ে গেছে অজস্র দিন। কয়েক বছর আগেও সিভিল লাইন্সে তারাই তরুণ ছিল, ভেবেছিল—এখানে যা আছে, আমরাই তার

সম্রাট। আমাদের জন্যেই কৃষ্ণচূড়া, আমাদের জন্যেই ন্যাড়া কাল ছাত বর্ষায় সবুজ, আমাদের জন্যেই ডালিমের সরু সরু ডাল ফলের ভারে নেমে আসে। অথচ ইতিমধ্যেই তারা পিছনে পড়ে গেছে, ইতিমধ্যেই সব প্রায় বেদখল। আরও দুদিন গেলে তারা একেবারে উচ্ছিষ্ট হয়ে যাবে। যদিও কেউ কিছু কেড়ে নেয়নি, তবু আর কিছুই যেন করলগ্ন নেই।

জানলা দিয়ে একটা হাওয়ার ঝাপটা এল। ইন্দ্রাণীর রুক্ষ চুল কাঁপল একটু। মুখ না তুলেই ইন্দ্রাণী হয়ত বুঝতে পারল, বিভাস তার দিকে তাকিয়ে আছে।

'চাকরি করলেই সব সহজ হয়ে আসবে ভাবছ কেন? বরং এখনই চাকরি না নিয়ে, আবার অন্তত কয়েক বছরের জন্যে পড়াশুনো শুরু করতে পার।'

'হাওয়ায় হাওয়ায় কথা বল না বিভাস, মাস্টারের চোখ দিয়ে সবাইকে দেখ না।' ইন্দ্রাণী সোজা হয়ে বসে বিভাসের দিকে তাকাল। 'আমার কিছুই তো সরলরেখায় চলল না। এমন আঁকাবাঁকা ভাঙাচোরা হয়ে যাবার জন্যে আমি নিজে কতটা দায়ী বুঝতে পারি না। তবে বলার দরকার হয় না যে আবার নতুন করে পড়াশুনো শুরু করবার মত সুন্দর ভাবনার আমার কাছে আর কোন দাম নেই।' একটু থেমে কথায় আরও ধার আনল ইন্দ্রাণী। 'তুমি হয়ত জান না, কিন্তু আমি লতার মত ইচ্ছে করে কিছু জড়াতে যাইনি। দেখলাম, জড়িয়ে গিয়েছি। আমার শিকড় হয়ত তেমন গভীর ছিল না, যেটুকু ছিল তাও দেখলাম গোড়া থেকে ছিঁড়ে গেছে। তবু আমি যতটা সম্ভব পরিচ্ছন্ন জীবনের জন্যে তৈরি হয়েছিলাম, অনেক চেষ্টা করেছিলাম। যাক্‌গে। তোমাকে এসব বলে আর কী হবে! এখন, শোন, আমার মেয়াদ যদি মাত্র পঞ্চাশ বছরও হয়, তাহলে এখনও আমাকে আরও বাইশ-তেইশ বছর বাঁচতে হবে। কিছু একটা করতে চাই। আমার সময় কাটছে না।'

প্রচ্ছন্ন খোঁচাগুলো গায়ে মাখল না বিভাস। ইন্দ্রাণী এখনও এতটুকুও তীক্ষ্ণ হতে পারে দেখে মনে হল, এই এতকাল পরে এই ঘরে বসে থাকার কী এক বিচিত্র স্বাদ আছে। সহজ হয়ে বলল, 'আমাকে কী করতে হবে বল।'

'তোমাদের মালবিয়াজীকে একটু আমার জন্যে বলতে হবে। অনেক সংগঠনে তিনি আছেন। আমাকে কোন একটাতে নিয়ে নেওয়া তাঁর পক্ষে হয়ত কঠিন হবে না। স্কুল, ছোট শিল্প প্রতিষ্ঠান—এইসবের মধ্যে তো তিনি আছেন, তুমি নিশ্চয়ই আমার থেকে বেশি জান।'

'তোমার থেকে হয়ত বেশি জানি, তবে সব জানিনে। চল না একবার মালবিয়াজীর বাড়ি; তিনি তো তোমাকে চেনেন। আজই যাবে? আজ তো ছুটির দিন। আজই দুপুরের পরে আমরা যেতে পারি।'

'আজই যাব।' ইন্দ্রাণীর কথা আবার মৃদু হল। 'জান, শেষের দিকে বিজয়প্রতাপ প্রায়ই বলত—তুমি তো বেগমেরই কন্যা! সত্যি, ভেবে দেখ, আমার মা'র সঙ্গে এখন আমার প্রচুর মিল, অন্তত বাইরে থেকে তাই মনে হবে। তুমি জান আমি জানি মাকে কোনদিন শ্রদ্ধা করতে পারলাম না। কিন্তু তুমি জান না যাঁরা শ্রদ্ধাস্পদ তাঁদের শ্রদ্ধা করতে না পারা কী ভীষণ কষ্ট!'

বিভাস ভাবল, আমার মাকে কি আমি শ্রদ্ধা করতাম। আমার যে বাঙলা বই পড়ার অভ্যেস সে কি মা'র কাছ থেকে পেয়েছি। না হলে এই অভ্যেস কেন হল। ছোটবেলা থেকে তো শুধু ইংরেজি পড়ার সুযোগ এসেছে। গম্বুজের ছায়ায় বসে উনিশ শতকের এক ইংরেজ কবির জীবনাশ্রয়ী এক উপন্যাস পড়ে একবার তো প্রায় পাগল হয়ে গিয়েছিলাম।

আমার মা তো বিয়ের আগে ব্রহ্মদেশপ্রবাসী বাঙালী মেয়ে ছিলেন; তিনি কি অন্য কারও সান্নিধ্য থেকে পেয়েছিলেন বাঙলা পড়ার অভ্যেস। কী মুশকিল, এসব কেন ভাবছি। ইন্দ্রাণী এখানেই বসে আছে, এখন কি শুধু সে-ই ভাবনা জুড়ে থাকবার কথা নয়। বিছানায় একখানা বাঙলা বই পড়ে আছে বলেই কি এইসব ভাবছি। ভাবনাগুলো বড় এলোমেলো।

মালবিয়াজীর বাড়ির সামনে এসে দাঁড়াল দু'জন। খুব ছোট একটা ফলকে লেখা রঘুরঞ্জন মালব্য। অন্তত এক মাস এখানে আসেনি বিভাস। মালবিয়াজী শহরের বাইরে কোথাও গেছেন কিনা তাও জানে না। এখানে থাকলেও হয়ত এখন বাড়ি নেই। তাহলে আবার আসতে হবে। ইন্দ্রাণীর চাকরির জন্যে আসাটা তিনি কেমন চোখে দেখবেন জানা নেই। হয়ত খুশীই হবেন, সহজেই হয়ত চাকরি একটা মিলবে।

এক মিনিটের দ্বিধার পর ফটক পার হয়ে বাগানে দু'পা এগোতেই পিছনে সাইকেলের ঘণ্টি বাজল। লাফিয়ে সাইকেল থেকে নেমে এক মুখ হাসি ছড়ালেন মালবিয়াজী। পিছন ফিরে ভাল করে দেখল, সেই এক মূর্তি। খাকি ট্রাউজারের ওপর সাদা শার্টটা বেশ ময়লা, কাঁচাপাকা দাড়ি অন্তত তিন দিন ধরে বাড়ছে। সাইকেলটা দেওয়ালের গায়ে রেখে কাছে এলেন, তখন মালবিয়াজীর মুখ দেখতে হলে আকাশের দিকে তাকাতে হবে; শীর্ণ কিন্তু ঋজু। বললেন, 'এস, এস। ইন্দ্রাণী এসেছ, আমার কী সৌভাগ্য!'

বিভাস অনেকবার ভেবেছে, সারা শহরে একমাত্র মালবিয়াজীর সান্নিধ্যে এলে মনে হয় আমরা এখনও তরুণ।

বাইরের দিকের ঘরটায় বসে অনেকক্ষণ গল্প হল। চা এল দু'দফায়। এখানে ইন্দ্রাণীকে নিয়ে আসার কারণটা বিভাস জানাল। ইন্দ্রাণীর গত কয়েক বছরের প্রায় সব খবর মালবিয়াজী নিশ্চয়ই জানেন, তবু সে বিষয়ে কোন প্রশ্ন না করে সোচ্চার হাসিতে কথায় এমন ভাব দেখালেন যেন আজ এখন ইন্দ্রাণীর এই উদ্দেশ্যে এখানে আসাটা পুরো-পুরি স্বাভাবিক। দু'এক মাসের মধ্যে ইন্দ্রাণীর কিছু একটা হবে আশ্বাস দিলেন। তাঁর স্ত্রী চুপচাপ দরজার পাশে বসে কথা হাসি শুনছিলেন, শুধু মাঝে মাঝে একটু যোগ দিচ্ছিলেন হাসিতে। তিনি ইন্দ্রাণীকে নিয়ে একবার ভিতরে গেলেন, তাকে অন্দরমহলটা দেখাবেন। মালবিয়াজীও সঙ্গে গেলেন এবং বিভাসকেও ডাকলেন। বিভাস গেল না, একা বসে রইল বাইরের দিকের ঘরটায়। বিভাসের কাছে সারা শহরের মধ্যে এই একটি মাত্র জায়গা যেখানে মনে হয়, হাওয়ায় বিষ নেই। তবু ভিতরে গেল না। কারও ভিতরের মহল, কারও অন্তরাল, এমনকি মালবিয়াজীরও, দেখবার আগ্রহ বিভাসের আর নেই। এখানেও যদি অন্তরালের পর্দা সরালে বিষাক্ত দাঁত বেরিয়ে পড়ে তাহলে আর কোথাও কোন আশ্রয় থাকবে না। বস্তুত, বিভাস ভাবল, তার নিজের মনেই বিষ।

ঘণ্টা তিনেক পরে বাগান ফটক পার হয়ে রাস্তায় এসে যখন নামল, ইন্দ্রাণীর হাতে একরাশ ফুল। সিভিল লাইন্স এখান থেকে অনেক দূর। তবু ইন্দ্রাণী খুশী খুশী গলায় বলল, 'হেঁটে যাব।' যেন কয়েক বছর আগের ইন্দ্রাণী। অথবা যেন কয়েকটা বছর আগেকার দিনগুলো এইমাত্র ফিরে পেল।

আজ আবার অনেক দিন পরে বিভাসের মনে পড়ল, একদা বড় লাজুক ছিলাম। এক-রাশ ফুল বুকের সঙ্গে চেপে রাস্তা দিয়ে এমন সগৌরবে হাঁটতে ইন্দ্রাণীর একটুও লজ্জা

করছে না, আশ্চর্য! রাস্তার সবাই পাশ দিয়ে চলে গিয়েও ঘাড় ফিরিয়ে তাকাচ্ছে। নিজেদের দর্শনীয় করতে বিভাসের আপত্তি।

'সত্যি হেঁটে যাবে? তোমার কষ্ট হবে না?'

'বলেছি তো, হেঁটে যাব।' ইন্দ্রাণী কয়েক বছর আগেকার মত হাসল।

রাস্তার দুপাশে মাঝে মাঝে বাংলো। প্রত্যেকটি বাংলোর সামনে বাগান। ঘেঁষাঘেঁষি না, টেগোর টাউনের মত না, এমনকি সিভিল লাইন্সের মতও না। এই সেই পুরনো শুকনো শহর। জন্ম থেকে দেখছে। তাদের চোখের সামনেই কত বদলে গেল। বৃদ্ধদের মুখে যে শহরের কথা শুনেছে তার তো বিক্ষিপ্ত চিহ্ন মাত্র এখন নজরে পড়বে। আমরাও কত বদলেছি। ইন্দ্রাণী হাঁটছে পাশে পাশে, অথচ কথা বলতে গিয়ে পিঠ থেকে বুকে আর বুক থেকে পিঠে বেণী আছড়াচ্ছে না। আমি আর দীর্ঘ পথ হেঁটে পার হতে চাই না। সত্যি কি চাই না। ফুলের বোঝার অজুহাত মিথ্যে। সত্যিই মিথ্যে কি না বুঝি না: আজও কি ইন্দ্রাণীর বুকের সঙ্গে চেপে ধরা একরাশ ফুলের রঙ চোখে মেখেও মনে হয়, সব ফুলের সব পাঁপড়ি প্ল্যাস্টিকের।

সামনে সেই হাজার ডালের বট, যে নাকি কখনও মরবে না। তার পিছনে শীতশীত অন্ধকার জমান সেনেট হল। কাঠের কারুকাজ, অজস্র মৃদু উজ্জ্বল রঙের কাচের জানলা। বিরাট ঘড়িটা সন্ধ্যেয় বাজে, তার ধ্বনি ক্রমবিলীয়মান তরঙ্গে হাওয়ায় মিশে যায়। অনেকক্ষণ শুধু কানের মধ্যের পরিমিত হাওয়ায় একটুখানি লেগে থাকে। কয়েক বছর আগেও এখানে বিশিষ্ট নেতাদের বক্তৃতা শুনেছে। তখন বক্তৃতার সময় মনে হত, বাতাস অস্থির, দেওয়ালগুলো কাঁপছে। এখানে এক সময় গানের আসর বসত, শাস্ত্রীয় সঙ্গীত। একটা সকালবেলার জলসার স্মৃতি তার বাবার মনে এখনও বেঁচে আছে। মা বেঁচে থাকলে তাঁর মনেও কি সেই স্মৃতি বেঁচে থাকত। মা কি এসেছিলেন জলসায় বাবার সঙ্গে। মাকে নিয়ে কি তিনি বেরোতেন, যখন তখন। কতবার চোখ বুজে বিলাপের মত করে সেদিন সকালবেলার জলসার বিবরণ দিয়েছেন ডাক্তার জিতেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়। এনায়েৎ খাঁর সেতারে ভৈরবী গৎ নিয়ে সেদিন সকালবেলার শুরু। নাসিরুদ্দীন দগর উচ্ছ্বসিত হয়ে সেই রাগেই দীর্ঘক্ষণ এমন আলাপ করলেন যা নাকি এখনও এই শহরের কয়েকজন বৃদ্ধ ভুলতে পারেনি। তারপর এলেন হাফিজ আলি। স্বরোদে সেই ভৈরবী বাজালেন। শ্রোতাদের অন্য সব চেতনা লুপ্ত হল। অবশেষে ফৈয়াজ খাঁর কণ্ঠ। সে নাকি সুন্দরের সারাৎসার। তার স্বাদ নাকি এখনও এই শহরের কয়েকজন বুড়োর মনে লেগে আছে।

কাছেই কোথায় যেন মাইক্রোফোনে সিনেমার একটা বাজিমাত করা গান বাজছিল। 'চাঁদ তুম্হারা, যোবন হামারা।' যৌবনকে যোবন বললে বেশ কড়া বেশ জমজমাট শোনায়। যাঁর রেকর্ড তিনি কোকিলকণ্ঠী, অর্থাৎ গলাটি কোন মসৃণ ধাতু দিয়ে তৈরি। দুহাত দূরে থেকে তিনটি ছেলের মধ্যে একজন তাদের লক্ষ্য করে, বিশেষত ইন্দ্রাণীর উদ্দেশে, সেই গানের থেকেও কড়া একটি শিস দিল, যাকে একালে বলা হয়—আওয়াজ দিল। সত্যি বলতে কি, খুশীই হল বিভাস। কী সব আজেবাজে এলোমেলো ভাবছিল। কত বছর পরে পাশে-পাশে হাঁটছে ইন্দ্রাণী। এখন তো শুধু ইন্দ্রাণীই ভাবনা জুড়ে থাকার কথা। ছেলেটার আওয়াজ ইন্দ্রাণীর দিকে বিভাসের চোখ ফিরিয়ে দিল।

ইন্দ্রাণীর মুখে ক্ষুব্ধ বিরক্তি। যতটা রেগেছে, জোর করে দেখাতে চাইছে তার থেকে বেশি।

বিভাস একটু শব্দ করে হেসে বলল, 'যেতে দাও। এবয়েসের ছেলেরা এসব একটু করেই।'

'কোথাও আর একবার চা খাওয়া যায় না?' বিভাস আবার বলল।

'এটা কি কলকাতা?' পাল্টা প্রশ্ন করল ইন্দ্রাণী।

'তার মানে?'

'তার মানে এখানে কি কলকাতার মত সব জায়গায় চা-খানা কফি-খানা ছড়িয়ে আছে? এখানকার ছেলেমেয়েদের দিনরজনী চায়ের দোকানে কাটে না।'

'কলকাতার আবহাওয়া বিষয়ে তুমি নিজেকে বিশারদ মনে কর?'

'অন্তত তোমার তুলনায়। আমি দু'বার সেখানে গিয়ে বেশ কিছুদিন করে থেকেছি।'

'বুঝলাম। তবে এখানেও চায়ের দোকানের সংখ্যা বাড়ছে। একটু হাঁটলে যেমন-তেমন একটা পেয়েই যাব।'

পাওয়া গেল। খুব অপরিচ্ছন্ন নয়, কারণ দোকানটা নতুন। কিউবিক্‌লে ঢুকতেই বেয়ারা এসে পর্দা টেনে দিল। বিরক্তি লাগল বিভাসের। পর্দা টেনে দেবার কী দরকার। আপত্তি জানাতে যাচ্ছিল, জানান হল না। টেবিলের ওপর একটা ফুলদানিতে কাগজের ঋতুপুষ্প। জানলার নতুন রঙ-করা কাঠে চুনের দাগ। পায়ের কাছে একটা বেড়াল, সাদা আর বাদামী, সুন্দর। যথেষ্ট চেষ্টা করেও কোলে তোলা গেল না।

'ইন্দ্রাণী তো চাকরি পেয়ে গেলে মনে হচ্ছে।' চায়ের কাপে চামচে নাড়তে নাড়তে বিভাস হঠাৎ বলল।

শুধু একটু হাসল ইন্দ্রাণী। কিছু বলল না। বিভাসের মনে হল, আরও কিছু বলা দরকার। অকারণে কথা বলা দরকার। কথা না হলে বাতাস কেমন ভারী হয়ে ওঠে। আগে এমন হত না। আজ এতক্ষণ পরে ভাবল, ইন্দ্রাণীর চুল থেকে কি কোন গন্ধ আসছে। টেবিলের ওপর রাখা একরাশ ফুলে তো এমন গন্ধ নেই। হয়ত ইন্দ্রাণীর চুল থেকে এই কাঠের ঘরের স্বল্প পরিসরে কিছু তীব্র হয়েছে কোন মৃদু সুবাস। শরীর, শরীরের স্বাদ! না, শরীরের আবার স্বাদ কোথায়। শরীরের কোন স্বাদ থাকে না। নিজের হাতের আঙুলগুলো কী রুক্ষ! কড়ে আঙুলটা একটা বিরাট তালার মস্ত চাবির মত ঝুলছে।

ইন্দ্রাণী বলল, 'তুমি তো কোনরকম চাকরি একটা জুটিয়েছ। এবার কী করবে ভাবছ, বিভাস?'

বিভাস দারুণ চমকে উঠল, যেন অন্ধকারে দৌড়তে গিয়ে একটা রুগ্ন ঘুমন্ত কুকুরের পাঁজরায় পা রেখেছে। ঠিক এই কথা একদিন চায়ের দোকানে বসে বেগম তাকে বলেছিলেন। বিভাস বলতে যাচ্ছিল—তুমি ঠিক বেগমের মত কথা বলছ, ইন্দ্রাণী—বলল না। কী হবে বলে।

'আমার চাকরিটা তোমার কাছে হাস্যকর, কিন্তু আমার দৌড় এই পর্যন্তই।' বিভাস নিজেই একটু হাসল।

'একেবারে ভুল বুঝলে। তুমি তো সব সময় খুব চাপা। সব কথা নিজের মনে চেপে রাখা স্বভাব। হয়ত অন্য কিছু, বড় কিছু করার আশা লুকিয়ে রেখেছ। হয়ত সিভিল লাইন্স, এমনকি এই শহর ছেড়ে অন্য কোথাও চলে যাবে। তাই ওকথা বললাম। আমি তো জানি তুমি আমার গত কয়েকটা বছর ভুলতে পার না। তুমি যে খুব ভাল, তাই কথায়

আচরণে ঘৃণা প্রকাশ কর না।'

বিভাস চেয়ারটা সরিয়ে উঠে দাঁড়াল। 'বিশ্রী সব কথা বলে মন তেতো করে দিও না। এস, বাইরে এস। এখানে দম আটকে আসছে।'

রাস্তায় নেমে দেখল, শুধু সেই ছোট কাঠের ঘরে নয়, বাইরেও কখন সন্ধ্যে হয়ে গেছে। আলো জ্বলছে রাস্তায়। ভিড় আরও বাড়ছে। সবাই তাকাচ্ছে তাদের দিকে। চলে গিয়েও ঘাড় ফিরিয়ে দেখছে। এত কী দেখার আছে। তাদের পোশাক সাধারণ, অন্য সবার মত, তাদের ছড়িয়ে ছিটিয়ে দেবার বয়েস নেই। তবে এত কী দেখার আছে। শুধু একরাশ ফুল। ফুল কি দেখার জিনিস, ফুল দেখে রাস্তার একজনও কি খুশী। নাকি ইন্দ্রাণীর হাতে ফুল দেখে সবাই দাঁত চেপে ব্যঙ্গের হাসি লুকোচ্ছে। ভাবছে, আমরা দুটো শিশু, আমাদের গায়ে এখনও নখের আঁচড় লাগেনি।

আসলে হয়ত আমার ভুল। সবাই হয়ত বিশেষভাবে তাকাচ্ছে না আমাদের দিকে। বস্তুত তেমন করে তাকাবার কোন কারণ নেই। এমনিই হয়ত চোখ পড়ছে, যেমন রাস্তায় বেরোলে লোকজনের দিকে এমনিই চোখ পড়ে। আমি এত আত্মসচেতন তাই এই সব ভাবছি। আমি নিজেকে দর্শনীয় করতে চাই না বলা ঠিক নয়, বলা উচিত আমি নিজেকে ঢেকে রাখতে চাই, অন্ধকারে ডুবিয়ে রাখতে চাই।

ইন্দ্রাণী বলল, 'তুমি তো আজ কাল দু'দিনই ছুটি পেলে?'

'হ্যাঁ, কালও স্কুলে যেতে হবে না।'

'দুপুরের পর বেরোবে?'

'না।'

'আমি আসব।'

বিভাস মনে মনে বলল, এস। কথাটা উচ্চারিত হল না। গলায় প্রচুর উৎসাহের ঝাঁজ এনে বলা উচিত ছিল, এস, নিশ্চয়ই আসবে, আমি ঘরেই থাকব। কিন্তু কিছু বলা হল না। গলার ঝাঁজ মরে গেছে। কোনদিন ছিল কি না অনিশ্চিত। মুশকিল হয়েছে সবই কেমন জলের মত, বড় তাড়াতাড়ি দাগ শুকোয়। আজই সকালে মনে হয়েছিল, তার ছোটঘরে ইন্দ্রাণীর সামান্য দূরে বসে থাকার কী এক বিচিত্র স্বাদ আছে।

বাড়ি ফেরার একটু পরে বিভাস খেতে বসে শুনল, বাঙলা স্কুলের সেঝ দিদিমণি তাদের বাড়ি বউ হয়ে আসছেন। সব ঠিক হয়ে গেছে, আর মাত্র দু'মাস বাকী। এ খবর শোনার জন্য প্রস্তুত ছিল, কিছু নতুন মনে হল না। বিতোষ, বলা বাহুল্য, বাবার সামনে তার মনোভাব প্রকাশ করবে না। তাহলে বাড়ির মধ্যে একমাত্র বিভাসের এই খবরে উল্লসিত হওয়ার কথা। বিভাস হাসিহাসি মুখে নানাবিধ ছেলেমানুষি কথা বলেও বুঝল, ঠিক জমছে না, যেন দলবেঁধে বেড়াতে বেরিয়ে পা কেটেছে নতুন জুতোয়, হাঁটতে পারছে না। তাছাড়া আরও যে একটি খবর শুনল সেটাই আসলে নতুন। বিতোষ কলকাতায় কোথায় যেন কেমিস্টের চাকরি পেয়েছে। বিয়ের পরই এখান থেকে চলে যাবে। এতদিনের মরানদীর পর তার আর বাঙলা স্কুলের সেঝ দিদিমণির ব্যাপারটায় যে হঠাৎ এই স্রোত এসেছে, কলকাতার চাকরিই তার কারণ।

সুতরাং স্বল্পকালের মধ্যে এই পুরনো একতলা বাড়িটায় একবার রঙচঙ হবে,

কাগজের মালা আর বেলুন ঝুলবে, নানা রঙের আলো জ্বলবে-নিভবে, সন্ধ্যেয় নিমন্ত্রিতরা যে আনন্দ অনুষ্ঠানে আসবেন তার একটা ইংরেজি নাম দেবেন সবাই, বলবেন—রিসেপসন। বিতোষ আর বাঙলা স্কুলের সেঝ দিদিমণি একসঙ্গে একটা মস্ত কেক কেটে বিলোবে। আগেই বিভাসকে এই মর্মে শক্ত কাগজে নির্দেশ লিখে ভাঙা স্নানঘর ইত্যাদির দরজায় ঝোলাতে হবে যে, বিভিন্ন কার্য সমাপনান্তে দয়া করে জলটল ঢালবেন। কারণ সেদিন সন্ধ্যের অনুষ্ঠানের আগেই তো অনেকে এসে এবাড়িতে দু'তিন দিন থাকবেন।

বিতোষ চলে যাবে এবং তারপর এই ছায়া ছায়া ঠাণ্ডা পুরনো একতলা বাড়ি আরও শূন্য মনে হবে। বিভাস থাকবে আর থাকবেন ডাক্তার জিতেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়। দুজনের মধ্যে হয়ত সারা দিনে একটাও কথা হবে না। বিভাস বাড়ির পিছনটায় না গেলে হয়ত দেখাই হবে না। বিতোষের সঙ্গেও বাবা বিশেষ কথা বলতেন না। যেটুকু সামান্য গল্প তিনি করতেন তা বাঙলা স্কুলের সেঝ দিদিমণির সঙ্গে। বিকেলে মাঝে মাঝে সামনে চা নিয়ে বসে গল্প হত। অবশ্য কয়েক বছর আগে বিভাস বাবার বেশ ঘনিষ্ঠ ছিল। এখন কি আবার তেমন হয় না। দেওয়ালে ঝোলান সেতারের সাদা ফুল তোলা নীল ঢাকনাটার দিকে বিভাস তাকিয়েছিল। বিতোষ এখান থেকে চলে গেলে আবার কি আগেকার মত বাবার সঙ্গে ঘনিষ্ঠ হওয়া যায় না।

বার

বাইরে বৃষ্টি। বেরোবার উপায় নেই। উপায় হয়ত আছে, ইচ্ছে নেই। সকাল থেকে এমন বৃষ্টি হতে থাকলে বাইরে যাবার ইচ্ছে হয় না। বই নিয়ে চুপচাপ পড়ে থাকার দিন গেছে। ঘুমিয়ে ঘুমিয়ে চোখ ফোলানর অভ্যেস গেছে, ইদানীং দিনের বেলা ঘুম আসতে চায় না। এই ছোট ঘর, বাড়ির মধ্যে এই সব থেকে ছোট ঘর, আর বাইরে বৃষ্টি। পনের দিনে ন্যাড়া কাল ছাত শ্যাওলায় সবুজ, পিছন দিকের বাগান খুব তেজী হয়ে উঠেছে।

উকিলবাবুর মেয়েটা একঘণ্টা হল এই ছোট ঘরে একখানা বইয়ের ওপর মুখ থুবড়ে পড়ে আছে। উঠবার নাম নেই। এই বৃষ্টিতে চলে যেতেও বলা যায় না। এই কম বয়েসী মেয়েটা, যার নাম জবা, বড় জ্বালায়। কেমন করে ওকে বোঝাব ইতিমধ্যেই আমি উচ্ছিষ্ট হয়ে গিয়েছি, রস-নিংড়ে-নেওয়া আখের সাদা ছিবড়ের স্তূপের মধ্যে আমার ছিবড়েটাও ছুড়ে ফেলে দেওয়া যায়। মেয়েটা নিশ্চয়ই আয়নার সামনে দাঁড়িয়ে মক্‌শ করে দেখেছে ঠিক কোন্ মুখভঙ্গীতে ওকে সব থেকে ভাল দেখায়। যখন তখন আসবে, চোখে ঠোঁটে অবিশ্বাস্য মোচড় দিয়ে বলবে—'আজ আবার আপনার একটা বই নেব।' যেন আমি গ্রন্থাগারিক আর আমার এই ঘরে থরে থরে মুখরোচক বই সাজান আছে।

বিজয়প্রতাপ জবার বাবা উকিলবাবুর কাছে তাদের বাড়িটা বেচে দিয়েছিল। তখন থেকেই উকিলবাবু সপরিবারে ওবাড়িতে রয়েছেন। জবারা আসার পর ওবাড়িতে বিভাস কখনও গিয়েছে মনে পড়ে না। অথচ ওরা প্রায়ই এখানে আসবে, এমনকি বাড়ির পিছন দিকে বাবার এলাকায়ও হানা দেবে। আর জবা সবে সেই দুঃসহ বয়েসে পেঁছে এমনভাবে বিভাসের ঘরে এসে দাঁড়াবে যেন বিভাস তার ক্রীতদাস। এই মেয়ে কয়েকমাস আগে কোন্ এক দাদার সঙ্গে লুকিয়ে বোম্বাই চলে গিয়েছিল। অভিনেত্রী হবে ভেবেছিল। দিন দশেক পরে আবার ফিরে এসেছিল। একদিন এই নিয়ে সোরগোল হয়েছিল সত্যি,

তারপর চাপা পড়ে গেছে। এসব নিয়ে একালে কারও আর বেশি মাথা ঘামাবার অবকাশ নেই। জবার বয়েসে ইন্দ্রাণী কি এমন ছিল। দেখে মনে হয়, জবা কখনও ভুলতে পারে না, এমনকি ঘুমিয়েও ভুলতে পারে না, তার নিজের দুঃসহ শরীরের দাম। এই বয়েসে ইন্দ্রাণী কি এমন ছিল। সেই সব দিনে বিভাসের কখনও তেমন কিছু মনে হয়নি।

জবা বইয়ের খোলা পাতায় চোখ রেখে পড়ে আছে। একবার ভুল করেও মুখ তুলছে না। অর্থাৎ ইচ্ছে করে মুখ থুবড়ে পড়ে আছে। ভাবছে, বিভাস তার শরীরের ডৌল দেখছে। হায়রে, কী ভেবেছে আমাকে! কিন্তু সত্যি এতক্ষণ কোথায় তাকিয়ে আছি। কেন মনে হল, জবার এই বয়েসের শরীর ঢেউয়ের মত, ঢেউয়ের মত। কেন ইন্দ্রাণীর এই বয়েসটা মনে এল। জানলা দিয়ে বাইরে তাকিয়ে নিজের হাতের একটা আঙুলের ওপর দুসারি দাঁত জোরে চেপে ধরল বিভাস। কেমন অস্পষ্ট ঘৃণা হল নিজের ওপর।

বৃষ্টি থামলে জবাকে তাদের বাড়ি পাঠিয়ে দিল। যেন অনিচ্ছায় চলে গেল জবা। যাবার সময় বইটা নিয়ে গেল। বাড়ির পিছনে এসে বিভাস দেখল, বাবা বাগানে নেই। হয়ত ঘরে শুয়ে আছেন। বিভাস বাগান থেকে একগোছা রজনীগন্ধা তুলে নিয়ে বাইরে রাস্তায় এল। জবারা তাদের বাগানটা সংস্কার করেছে। দেখে মনে হতে পারে, সেই বিবর্ণ সিংবাড়িটা এখন কোন বিত্তবানের বাসস্থান। তার উলটো দিকে নবাব খানের বাগানটায় এখন আর যত্নের লক্ষণ নেই। তবু বৃষ্টির ঋতুতে বাংলো পর্যন্ত ঘন সবুজ।

স্ট্রেচি রোডের কাল অ্যাসফলট বৃষ্টিতে ভিজে আরও কাল। রাস্তায় একটিও লোক নেই। একরাশ রজনীগন্ধা হাতে নিয়ে হাঁটিতে অস্বস্তি হল না, ফুলগুলো গায়ের বর্ষাতির মধ্যে লুকোতে হল না।

রাজাপুর কবরখানায় যখন পেঁাছল, আবার টিপটিপ বৃষ্টি পড়ছে। তার সঙ্গে শীত-শীত দমকা হাওয়া। এই ছোট বিনীত কবরখানায় আজ এখন কেউ নেই। বৃষ্টি আর হাওয়ার গমক থাকলেও ইট-সাজান সরু পথে বিভাসের ভারী জুতোর শব্দ খুব স্পষ্ট। তার মা'র কবর বাঁ দিকের এক প্রান্তে। নিজের পায়ের জুতোর শব্দে নির্জনতা আরও বেশি করে ইন্দ্রিয়সংবেদ্য হল।

মা'র কবরের পাশে উবু হয়ে বসল। বর্ষাতিটার দুপাশের ঝুলন্ত কোণ জোরে টেনে গুঁজে দিল কোলের মধ্যে। ফুল রাখার পাত্রটা কাত হয়ে পড়ে আছে। ওপরের পাতলা অংশ ভেঙে গেছে খানিকটা। ফুলদানিটা সোজা করে কিছু জল ফেলে দিয়ে রজনীগন্ধার গোছা ভিতরে বসিয়ে দিল। হাত সরিয়ে নিতেই হাওয়ার ঝাপটায় পড়ে গেল কাত হয়ে। আবার সোজা করে রাখল, পড়ে গেল আবার। তখন রজনীগন্ধার লম্বা ডাঁটিগুলো দাঁত দিয়ে কেটে কেটে খুব ছোট করে দিল। আর কাত হয়ে পড়ল না ফুলদানিটা। হাঁটু কোমর টনটন করছিল। উঠে সোজা হয়ে দাঁড়াল। বৃষ্টির বড় বড় ফোটা পড়ছে, হাওয়া যেন আরও ক্ষেপে গেল।

মা কতকাল আগে এই শহরে ক্রিশ্চিয়ানদের কী এক সম্মেলনে প্রতিনিধি হয়ে এসেছিলেন ব্রহ্মদেশ থেকে। সদ্য ডাক্তারি পাশ করে আসা জিতেন্দ্রনাথের সঙ্গে সেখানে তাঁর প্রথম দেখা হয়েছিল। মা বোধহয় একটু লাজুক ছিলেন। এসব গল্প বলার সময় মুখের দিকে তাকিয়ে থাকতে পারতেন না।

জুতোর ওপর একটা বুনো পোকা উঠেছে। বিভাস শুধু দেখল, একটুও নড়ল না। আমি এখনই তো বাড়ি ফিরে যাব। আমার কাজ শেষ হল। শেষ হল? আরও কত বছর

এই কবরখানা থেকে এমন বাড়ি ফিরে যেতে পারব?

আমাকে এখানে বৃষ্টিতে দাঁড়িয়ে থাকতে কেউ তো আর দেখছে না। দেখলে ঠোঁট মুচড়ে বলতে পারত—ছেলেমানুষি, বলতে পারত—ন্যাকামি। একটা গাছের মত এখানে দাঁড়িয়ে থাকলে কেমন হয়। পা ধরে যাওয়ার, টনটন করার কোন মানে হয় না। সেনেট হলের সামনের বিপুল বটগাছটা নাকি কোনদিন মরবে না। তাহলে তো বলতে হয়—বটগাছটার সেই অনিবার্য বন্ধু নেই যে চিরকালের সঙ্গী। আমার বর্তমান মোটেই স্বচ্ছ না, তবে অতীত আর ভবিষ্যতের পরিচ্ছন্ন চেহারা দেখতে পাই। যখন জন্মেছিলাম তখনই মৃত্যুর কাছে বিক্রি হয়ে গিয়েছি। জানি, ভবিষ্যতে সেই চিরকালের সঙ্গীই থাকবে, একমাত্র যার আন্তরিকতা নিখাদ।

আমি বুঝেছি, ভাল চাকরি আমার জন্যে না। চেষ্টা করি না পাব না বলে। পাশটাশ করেছি সত্যি, কিন্তু কখনও অসাধারণ ছাত্র ছিলাম না। এক সময় বই আমার আশ্রয় ছিল। এখন বই ভালবাসি না। আমার উচ্চাশা নেই, আমার ভালবাসা নেই। আমি কি পরগাছা। পরগাছারও তো আশ্রয় থাকে। আমার বর্তমানের চেহারা আমি দেখতে পাই না। অন্য কেউও আমাকে স্পষ্ট করে দেখাতে পারে না। আমার মনে বিষ। আমার মনে শুধু বিকৃতি। আমার বিকৃতি কি অনন্য। বৃষ্টি পড়ছে। এখনই কি বাড়ি ফিরে যাব।

কে যেন বিভাসকে ডাকল। ফিরে দেখল, ইন্দ্রাণী। কবরখানার ফটকের ওপরের গীর্জার চূড়োর মত কারুকাজ করা কাঠের সংক্ষিপ্ত ছাউনির তলায় ইন্দ্রাণী দাঁড়িয়ে আছে। চোখের সামনে সব যেন পাক খেয়ে ঘুরে গেল। ইন্দ্রাণী এখানে কেন। এত দূরে এই রাজাপুর কবরখানার ফটকে ইন্দ্রাণীর দাঁড়িয়ে থাকা অভাবনীয়।

এগিয়ে এসে বিভাস বলল, 'তুমি এখানে!'

'এলাম।'

'এলাম মানে?'

'তোমাকে কৈফিয়ত দিতে হবে নাকি?'

'মনে হচ্ছে গোয়েন্দার মত আমার পিছু নিয়েছ। ভাবলে হাসি পাচ্ছে।'

'তোমাকে একরাশ ফুল নিয়ে বেরোতে দেখে তাড়াতাড়ি বেরিয়ে এসেছিলাম। তুমি কোথায় যাবে বুঝেছিলাম। ভেবেছিলাম রাস্তায় তোমাকে ধরব, ধরতে পারলাম না; তুমি এত জোরে হাঁটছিলে।'

'আমাকে রাস্তায় ধরার কী দরকার? আমার ঘরে আস না কেন?'

'ক'দিন তো তোমাকে বাড়িতে দেখছি না। আজ সকাল থেকে কিছুতেই সময় কাটছিল না। যতবার দূরে থেকে তাকিয়েছি, জানলা দিয়ে দেখি তোমার ঘরে জবা। ওই খুকিটা এমন জমে গেল কেন তোমার ঘরে?'

বিভাস বলতে যাচ্ছিল—'তোমার হিংসে হচ্ছে নাকি'—বলা হল না। এমন কথা ইন্দ্রাণীকে বলা যায় না। এমন কাঁচা রসিকতা ইন্দ্রাণী সহ্য করবে না।

ইন্দ্রাণী আবার বলল, 'এই পর্যন্ত এসে দেখি তুমি তোমার মা'র কবরের পাশে। আর এগোই নি। তোমাকে একা থাকতে দিলাম।'

'ইন্দ্রাণী জান, মরে যাওয়া মা'র জন্যে এই ঝড়বৃষ্টিতে এমন উৎসাহ দেখালে লোকে আমাকে ন্যাকা বলবে?'

'কে বলবে? বিজয়প্রতাপ?'

'শুধু বিজয়প্রতাপ কেন? আরও অনেকেই বলবে। আসলে কিন্তু উৎসাহটা মা'র জন্যে না, আমার নিজের জন্যেই। আমারও কিছুতেই সময় কাটছিল না। সবাই সব কিছু একমাত্র নিজের জন্যেই করে।'

'বুঝলাম। এখন ফিরবে তো?'

'ভাবছি, এখন ফিরব কী করে?'

ইন্দ্রাণীর গায়ে বর্ষাতি নেই। একটু ভিজেছে। বৃষ্টি থামে নি, হাওয়া গর্জাচ্ছে। এতটুকু জায়গায় দাঁড়িয়েছি, মাথার ওপর কৃপণ ছাউনি আছে, যদিও ছাঁট আসছে বৃষ্টির। এতক্ষণ আর কেউ এদিকে আসে নি। সিভিল লাইন্স যথেষ্ট দূরে। আবহাওয়া রীতিমত নাটকীয়। দৃশ্যটা বেশ রসঘন।—কত তাড়াতাড়ি বদলে গেলাম। ক'বছর আগেও যমুনা ব্রীজে শেষ রুদ্দুরের রঙ দেখে চোখে দিগন্তদৃষ্টি আসত। আজ এখন যমুনাব্রীজ বৃষ্টিতে ভিজছে। বর্ষাতিটা খুলে কপাটে ঝুলিয়ে রাখল বিভাস।

ইন্দ্রাণী শাড়ির কোণ দিয়ে মুখ মুছল। আঙুলের ঘা দিয়ে দিয়ে ঝেড়ে ফেলল রুক্ষ চুল থেকে বৃষ্টির বিন্দু। শীতে কাঁপছে নাকি। আমি কী করতে পারি। বর্ষাতিটা কি ওকে দেব। নেবে না, ঠিক জানি নেবে না। ইন্দ্রাণীর এখানে আসার কোন মানে হয় না। বৃষ্টি মাথায় করে কেন এল। এখন ফিরে যেতে হবে। ইন্দ্রাণীকেও ফিরে যেতে হবে। আরও কতকাল কবরখানা থেকে বাড়ি ফিরে যেতে পারব?

ইন্দ্রাণী রাস্তায় নামবার কোন লক্ষণ দেখাল না। বলল, 'মালবিয়াজীকে বলেছি আমাকে অন্য কোথাও একটা চাকরি দিতে। আমি এখান থেকে চলে যেতে চাই।'

'কেন?'

'এখানে আমি থাকতে পারছি না।'

'কেন থাকতে পারছ না?'

'পারা যায় না, বিভাস। সবার করুণা, সবার ঘৃণা কুড়িয়ে থাকা যায় না।'

'তুমি রাগের কথা বলছ। মা আমি যুদ্ধে যাব-র মত কথা বলছ।'

'হেসো না।' ইন্দ্রাণীর স্বর তীব্র হল। 'আমার ধারণা আমাকে নিয়ে হাসা অন্তত তোমার মানায় না।'

'কী সব বলছ, ইন্দ্রাণী। আমি হাসি নি, বিশ্বাস কর, হাসি নি।'

'তুমি মনে মনে হাসছ। তুমি ভাব আমি যে এমন হয়ে গেলাম এর জন্যে তোমার কোন দায় নেই? তুমি কিছু করনি আমার? তোমার দেখা পাই না। তুমি আমাকে এড়িয়ে যাও। এত ঘৃণা কর তুমি আমাকে!'

'বারে বারে এই মিথ্যে তুমি কেন বল? তোমাকে ঘৃণা করি না। তোমাকে কেন ঘৃণা করব?'

একটুক্ষণ চুপ করে থেকে রেলিংয়ের গায়ে ইন্দ্রাণীর জলে ভেজা ঠাণ্ডা হাতের ওপর বিভাস হাত রাখল। তার নিজের হাতও কাঁপছিল। কোনদিন একটি মেয়ের হাত ছোঁয় নি। এত সরল সাধারণ কাজ এত কঠিন কেন। চাপা চাপা গলায় বলল, 'কখনও তোমাকে ঘৃণা করি নি, কোনদিন না!'

'আমি পারব না!' ইন্দ্রাণীর চোখ চিকচিক করে উঠল। 'একটা চাকরি নিয়ে এতগুলো বছর কাটিয়ে দিতে আমি পারব না।'

বিভাস কী বলতে পারে। যদি বলি—আমি এই ক'বছরে একেবারে বদলে গিয়েছি,

আমার বর্তমানের চেহারা আমি দেখতে পাই না, কেউ আমাকে স্পষ্ট করে দেখতেও পারে না, জন্মানর সঙ্গে সঙ্গে মৃত্যুর কাছে বিক্রি হয়ে গিয়েছি, আমার ভবিষ্যৎ সেই চিরকালের বন্ধুর জন্যে এক দীর্ঘ প্রতীক্ষা ছাড়া আর কিছু না, আমার কোন আশা নেই, আমার ভালবাসা নেই, তাহলে কি ইন্দ্রাণী স্বস্তি পাবে। আমি ওকে আশ্বস্ত করতে চাই কেন। আমি কি ওকে খুশী করতে চাই।

'আমার আর কিছু নেই।' ইন্দ্রাণীর গলায় কান্নার স্বর। 'আমি পুড়ে ছাই! ছোটবেলা থেকে আমি তোমাকে দেখেছি, সারা জীবন তোমাকেই দেখার কথা। কিন্তু আমাকে সময় দেওয়া হল না, নিজেকে বুঝবার অবকাশ দেওয়া হল না। যখন বুঝলাম, দেখলাম বড় বেশি দেরি হয়ে গেছে। এখন আমি কী করব! শুধু একটা চাকরি নিয়ে এতগুলো বছর কাটিয়ে দিতে আমি পারব না।'

বিভাস যেন না জেনে, হয়ত বা জেনে, ইন্দ্রাণীর হাতে কঠিন চাপ দিচ্ছিল। জলে ভেজা ঠাণ্ডা নিরক্ত হাত। ইন্দ্রাণী আরও কাছে ঘন হয়ে এসে দাঁড়াল। এমন যে হতে পারে, এমন যে হবে, বিভাস ভাবে নি। অথচ শরীর, শরীর, শরীরের স্বাদ। এই বয়েসে এই মনেও কি শরীরের স্বাদ থাকে, এমন অসহ্য জ্বালা করা যন্ত্রণার স্বাদ! বৃষ্টি কমছে, এখন অনেক কম। ইচ্ছে করলে বেরিয়ে পড়া যায়, ফিরে যাওয়া যায় পুরনো একতলা বাড়িটায় যার কাল ন্যাড়া ছাত শ্যাওলায় সবুজ। ইন্দ্রাণীও ফিরে যেতে পারে নবাব খানের গুহায়। ফিরেই তো যাব; এখনও আরও কিছুকাল কবরখানা থেকে বাড়ি ফিরে যাব। কিন্তু শরীর, শরীর কি আমার মত পরগাছার, আমার মত উচ্ছিষ্টেরও আশ্রয়। শরীরে কি নিজেকে ঢাকা যায়, শরীর কি অন্ধকার।

## তের

পকেটে এক গাদা নিমন্ত্রণপত্র। পকেটটা বেশ ভারী হয়েছে। তবু তো প্রায় তিরিশ খানা ফেলে এসেছে ডাকবাক্সে। এখন একটু হালকা হবার কথা। আর এক পকেটে সিগারেটের প্যাকেট। ইদানীং সিগারেট ধরেছে বিভাস। কার্ডখানা বেশ ছাপা হয়েছে। একপাশে বাংলা, একপাশে ইংরেজি। বিভাস বাংলা আর ইংরেজি দু'রকমের নিমন্ত্রণপত্র ছাপাতে চেয়েছিল। বিতোষ রাজী হল না। বলল, 'বেশি বাহানায় কাজ নেই।' আহা, ভাঙা বাড়িতে তো খুব রঙটঙ লাগান হল। অবশ্য বিতোষ তো এবাড়ি ছেড়ে চলে যাবে। কার্ডটার দু'পাশেই বাবার নামের সঙ্গে মা'র নাম ছাপা হয়েছে। কেমন বিচিত্র লাগে। কতকাল পরে মা'র নামটা চোখের সামনে দেখতে পেল।

এখনই কাছের কয়েকটা বাড়ি ঘুরে আসতে হবে। নিমন্ত্রণপত্র দিয়ে আসতে হবে।

সিংবাড়ির পরিচ্ছন্ন বাগানের পাশ দিয়ে বিভাস বারান্দায় উঠল। সামনে উকিলবাবুর চেম্বার। উকিলবাবু বসেই ছিলেন, তবে আরও লোক ছিল ঘরে। বিভাস এক কোণের একটা চেয়ারে সবিনয়ে বসল, তার আগমনের উদ্দেশ্য জানাল, একখানা চিঠি বাড়িয়ে দিল উকিলবাবুর হাতে। একটু বসতেই, একটা দুটো কথা হতেই, উকিলবাবু জবার মা'কে ডাকলেন। জবার মা দরজা পর্যন্ত এসে বিভাসকে ভিতরে নিয়ে গেলেন। বিভাস ভিতরে যেতে চায়নি, বরং বেশ তীব্র অনিচ্ছা ছিল, তবু যেতে হল।

ভিতরে আসতেই জবা তাকে প্রায় লুফে নিল। তার মা'কে পাঠাল রান্নাঘরে, চায়ের

ব্যবস্থা করতে। সকাল থেকে বিভাসের চারবার চা হয়ে গেছে। তখন আর চায়ে রুচি ছিল না, বরং বেশ তীব্র অনিচ্ছা ছিল, তবু খেতে হবে। সেই ঘরে তাকে নিয়ে এল জবা, বিজয়-প্রতাপের ঘরে।

জবা বলল, 'একটা বইয়ের বিষয়ে আপনার সঙ্গে আলোচনা করব, সেই বইখানা যার নাম—অশ্রুর ঋতু।' খুব মুরুব্বির মেজাজ জবার। 'বইখানা ভালই লাগল, তবে শেষটায় আমার আপত্তি। শেষ পরিচ্ছেদটা নিয়ে আপনার সঙ্গে আলোচনা করতে চাই। আপনার সব মনে আছে তো? আপনারই তো বই।'

'আলোচনা আর একদিন হবে। আজ আমি কত ব্যস্ত নিশ্চয়ই বুঝতে পারছ?'

জবা ঠোঁটে চোখে মোচড় দিল। 'কী এমন রাজকার্য পড়ে আছে আপনার! দু'এক জায়গায় কার্ড দিতে যাবেন, এই তো?'

'এখন সত্যি আর মাত্র দু'জায়গায় যাব।' বিভাস শিশুর মত হাসতে চেষ্টা করল। 'কিন্তু দুপুরের পর থেকে অনেকের বাড়ি যেতে হবে। রেভারেন্ড আয়ার, পণ্ডিত ঝা, মালবিয়াজী, বিজয়প্রতাপ, আমার স্কুলের তিনজন সহকর্মী—সবার বাড়ি যেতে হবে।'

জবা রাগ দেখিয়ে অস্থির পায়ে একবার সারা ঘর ঘুরে এল। বেরিয়ে গিয়ে তখনই ফিরে এল এক কাপ চা নিয়ে। শুধু চা, বিভাস দেখল, আখরোট কিসমিস নেই। আখরোট কিসমিস এই ঘরের অনিবার্য অনুষঙ্গ। জবা মেয়েটি বেশ, যেন চর্বির বড়া, কিন্তু কী হবে, আমাকে এমন করে দেহের ঢেউ দেখিয়ে কী হবে। আমি আরও ভুলে যাব, এই মুহূর্তে একেবারে ভুলে যাব। আমি হয়ত এই ঘরের মেঝেয় ভাঙা কাচের গ্লাসের ধারাল টুকরো খুঁজে দেখব। এই সেই ঘর যেখানে বিজয়প্রতাপ আর ইন্দ্রাণী প্রথম ডুব দিয়েছিল অন্ধকারে।

চায়ে একবার দু'বার মুখ দিয়ে জিভ পুড়িয়ে বিভাস তাড়াতাড়ি বাইরে এল, বারান্দা বাগান পার হয়ে রাস্তায় নামল।

এর পর সব থেকে কাছের বাড়িটা উপাধ্যায়জীর। পাঁচ মিনিট হেঁটে পেঁছে গেল। বারান্দার গায় গোলাপের ঝাড়, তার পাশেই একটা দড়ির খাটিয়া উলটে রেখেছে রোদ্দুরে। উপাধ্যায়জীর একটা ছেলে একখানা সাইকেল সম্পূর্ণ খুলে ফেলে তেল মাখাচ্ছে, খটাং খটাং করে হাতুড়ি পিটছে মাঝে মাঝে। বাইরের দিকের ঘরটায় এসে বসে সেই দিকে তাকিয়ে রইল বিভাস। মুখ ফিরিয়ে দেখল, মাথার ওপর টালির ছাতের তলায় চুন-কাজ করা মোটা কাপড়ের আস্তর, কয়েক জায়গায় ছিঁড়ে গিয়ে টালি দেখা যাচ্ছে। ইতিমধ্যে একটি বাচ্চা তাকে দেখেই দৌড়ে ভিতরে গেছে, কলকণ্ঠে ঘোষণা করছে তার আগমনবার্তা, এখান থেকেও স্পষ্ট শোনা যাচ্ছে। এই শহরের ভাষায় এই বাড়ি উপাধ্যায়জীর দৌলৎখানা। বিভাসের প্রায়ই মনে হয়েছে, এই শহরের অনেক বাদশাহী কথায় বিদ্রূপ মেশান। এই ঘর, যার মেঝেয় সিমেন্ট নেই, যার ঠিক মাঝখানে একটা নড়বড়ে চেয়ার আর পাশে একখানা ছোট নিচু সরু বেঞ্চ আর এক কোণে একটা দড়ির খাটিয়া, এই শহরের ভাষায় উপাধ্যায়জীর দরবার।

উপাধ্যায়জী এলেন, সঙ্গে এল তিনটি নোংরা ছেলেমেয়ে, তাদের মা দরজার আড়ালে এসে দাঁড়ালেন। বিভাস উপাধ্যায়জীর নাম লেখা চিঠিটা বেছে রেখেছিল, এখন এগিয়ে দিল। বাড়ির সবাইকে নিয়ে যাবার অনুরোধ জানাল। খুশীতে রঙ বদলে গেল উপাধ্যায়জীর মুখের। আবোল তাবোল অনেক কিছু বললেন। তাঁর সব কথার একটিই মানে—ডাক্তারবাবুর বাড়িতে উৎসব, এর থেকে আনন্দের খবর আর কী আছে!

বিভাস উঠল। উপাধ্যায়জী তাকে বারান্দায় এক কোণে টেনে নিয়ে এলেন। মনে হল,

বিশেষ কিছু বলবেন। কিন্তু শুধুই একটা হাত ধরে মাথা নিচু করে দাঁড়িয়ে রইলেন চুপচাপ।

'কিছু বলবেন?' বিভাসকে জিজ্ঞেস করতে হল।

'বলব, বলতে হবে। বড় লজ্জা করে। দু'দিন পরেই তো যেতে হবে ডাক্তারবাবুর ওখানে। কিন্তু আমি কেমন করে যাব? আমার হাতে একটিও টাকা নেই।'

'আমাদের বাড়ি যাবেন তার জন্যে টাকার কী দরকার?'

'তুমি বুঝতে পারছ না, বিভাস। একটা কিছু হাতে করে তো যেতে হবে।'

'কিছু নিয়ে যেতে হবে না আপনাকে। আপনি শুধু বাড়ির সবাইকে সঙ্গে করে আসবেন।'

'ছিঃ, তা কখনও হয়!—তুমি আমাকে দশটা টাকা ধার দাও বিভাস। এখন তো চাকরি করছ। আমি দু'মাসে ফিরিয়ে দেব।'

কী মুশকিল! বড় বিশ্রী লাগে। এমন আবহাওয়ায় দম আটকে আসে। আজকাল তো এই শহরে সব সময় ডলারের গন্ধ, হাওয়ায় ডলার উড়ছে। উপাধ্যায়জী কুড়িয়ে নিতে পারেন না? যমুনার ওপারে একটা বিরাট কৃষি বিদ্যালয় আছে, সেখানে থরে থরে ডলার সাজান। উপাধ্যায়জী তুলে আনতে পারেন না? পাড়ায় পাড়ায় ক্লাব, লাইব্রেরী, সংস্কৃতির খাসমহল গজিয়ে উঠেছে, সেখানে নাচ গান ঢালাও ইয়াঙ্কি আদবকায়দা। সেই সব জায়গায় নাক গলালে উপাধ্যায়জীর পকেটে কিছু আসে না?—নিজের নির্বোধের মত বেতাল ভাবনায় বিভাসের হাসি পেল। রোদ্দুরে ঘুরে ঘুরে সব গুলিয়ে গেছে। কোথায় ডলার আর কোথায় উপাধ্যায়জী!

'পাঁচটা টাকা রাখুন।'

'না বিভাস, পাঁচ টাকায় হবে না। উপহার কেনা ছাড়া আরও দরকার আছে।'

দশ টাকাই দিতে হল। একটা ময়লা ফ্রকপরা মেয়ে প্লেটে দুটো বরফি নিয়ে দাঁড়িয়েছিল। উপাধ্যায়জীর আচরণে রাগ হয়ে যাবার কথা। তবু একটা বরফি তুলে নিল। মেয়েটার দৃষ্টি আশ্চর্য করুণ। জল না খেয়েই বেরিয়ে পড়ল। বরফিটা দাঁতে জিভে জড়িয়ে গেছে। বড় বেশি মিষ্টি, চিনি চিনি শুধু চিনি, উপাধ্যায়জীর কাঁচাপাকা দাড়িতে ছাওয়া লজ্জিত মুখের মত!

খুব কাজের লোকের মত হন্‌হন্‌ করে হেঁটেও বাগচীবাড়ি পৌঁছতে আরও সাত আট মিনিট লাগল। তখন অনেক বেলা হয়ে গেছে। তাড়াতাড়ি কাজ সেরে ফেরা দরকার। বিকেলে আবার কতকগুলো জায়গায় যেতে হবে, বিশেষ করে বিজয়প্রতাপের বাড়ি। বিনীতাকে ভাল করে না বললে হয়ত আসবে না।

বাগচী বাড়িটার দিকে তাকালে দেওয়ালের ফাটলে চোখ আটকে যায়, কেমন গা সির-সির করে, মনে হয় এখনই ভেঙে পড়বে। অথচ বাড়িটার আদলে এককালের ঐশ্বর্যের ছাপ আছে। সেই এককাল অবশ্য দুর্লক্ষ্য দূর। এই বাড়িতে একটা মেয়ে ছিল, বিভাসের বয়সী। তার নাম ছিল অমিতা। ছোটবেলায় অমিতার খুব অস্থির স্বভাব ছিল। যখন তার বিয়ের বয়েস হল, হয়ে প্রায় পার হয়ে গেল, তখন একেবারে স্থানুর মত হয়ে গেল মেয়েটা। তিন সপ্তাহের টাইফয়েডে যখন মরল অমিতা, বিভাসের মনে হয়েছিল—বাগচী বাড়ির দেওয়ালের অজস্র ফাটল দিয়ে বিলম্বিত স্বস্তির নিঃশ্বাস বেরিয়ে এল, সবাই যেন হাঁপ ছেড়ে বাঁচল। মনে হয়েছিল, মেয়ের বিয়ে দিতে হল না, বাগচীমশাই কয়েক বছর বেশি বাঁচবেন। সবাই

যখন কাঁদছে, তখনই এমন নোংরা ভাবনাকে প্রশ্রয় দিয়েছিল বিভাস। পরে এই ভেবে সান্ত্বনা পেয়েছে যে তার ভুল হয়েছিল, অমার্জনীয় ভুল হয়েছিল।

অনেক দিন পরে সেই বাড়িতে এল। বেশিক্ষণ বসবার সময় ছিল না। নাম লেখা নিমন্ত্রণপত্রখানা বাগচীমশাইয়ের হাতে দিয়ে বিভাস চলে আসছিল, কিন্তু তিনি তাকে উপাধ্যায়জীর মত একপাশে টেনে নিয়ে গেলেন। ছোট ছেলের মত আব্দেরে গলায় বললেন, 'আমি কেমন করে যাব, বিভাস?'

'কেন?'

'আমার যে একটাও উপযুক্ত পোষাক নেই।'

'যা আছে তাই পরে যাবেন।' বিভাস হেসে ফেলল। 'আমাদের বাড়ি যাবেন তার আবার উপযুক্ত পোষাক!'

'ছিঃ, তা কখনও হয়! আমার একটা সম্মান আছে। তাছাড়া আমার যে বেরোবার মত প্রায় কিছুই নেই।'

বিভাস তখনই বলার মত কথা খুঁজে পেল না।

বাগচীমশাই আবার বললেন, 'শোন, তোমার বাবার একটা পুরনো স্যুট লুকিয়ে আমাকে এনে দেবে একদিনের জন্যে?'

'বাবার পুরনো স্যুট আমি কোথায় পাই বলুন? সম্ভবত নেই, থাকলেও মা'র ঘরে আছে। সে ঘরে আমরা ঢুকি না, সব সময় তালা বন্ধ থাকে, চাবি বাবার কাছে।'

'তা হলে এখন কী করি? দু'দিনের মধ্যে কী ব্যবস্থা করি আমি? না গেলেও তোমার বাবা দুঃখ পাবেন।'

বেলা বাড়ছিল। হাতের ঘড়িটার দিকে তাকিয়ে বিভাস বলল, 'একটু বেশি রাত্তিরে একবার আসবেন। দেখি কিছু করা যায় কিনা।'

নবাব খান, উকিলবাবু আর বিভাসদের বাড়ি নিয়ে যে প্রাঞ্জল জ্যামিতিক ত্রিকোণ তার সবটাই সেদিন সন্ধ্যেয় নতুনের মত হয়েছিল। সন্দেহ নেই ছিবড়ের মত অন্ধকার ছড়িয়ে ছিল শ্যাওলাধরা পাঁচিলের গায়, কৃষ্ণচূড়া আর ডালিমের পাতার ফাঁকে, তবু অনেক বেশি আলো ছিল, কেমন এক উত্তাপ ছিল হাওয়ায়।

বিভাসকে ক'দিন ধরেই প্রচুর কাজ করতে হচ্ছিল। রীতিমত মেহনত। এত ব্যস্ত কোন দিন হয় নি। সত্যি বলতে কি, ভালই লাগছিল। পারিবারিক ব্যাপারে তার যে এত দাম, এর আগে কখনও বুঝতে পারে নি। কয়েকজন আত্মীয় দু'দিন আগে থেকেই এসে এ বাড়িতে ছিলেন। ইন্দ্রাণী যে এ বাড়ির কেউ নয় তাও বুঝতে পারা সহজ ছিল না। এমনকি বেগম সেদিন সকালেও একবার এসেছিলেন।

পুরনো বাড়িটার রঙটঙ করা হয়েছিল। গম্বুজটা ছোঁয়া হয়নি। আগের মতই ছিল, সবুজ রোঁয়ারোঁয়া উদ্ভিদে ছাওয়া। গম্বুজটা যেন বাড়ি থেকে আলাদা, বাড়ির অংশ না। অথচ গম্বুজ বাদ দিয়ে শুধু ন্যাড়া ছাতটাকে বিভাসের একেবারে ফোঁত হয়ে যাবার মত লাগে। সেদিন সন্ধ্যের পর গম্বুজটার অস্তিত্ব অস্বীকার করা হয়েছিল। পাতলা রঙিন কাগজের মালা টাঙান হয়েছিল, অজস্র বেলুন ঝোলান হয়েছিল, ছোটছোট আলো জ্বলছিল-নিভছিল ন্যাড়া ছাতের এপাশ থেকে ওপাশ পর্যন্ত একটি সরলরেখায়। এছাড়া জোরাল

আলো জ্বলছিল অনেকগুলো।

বিকেলে একবার সামনে থেকে চোখ বুলিয়ে ইন্দ্রাণী বলেছিল—'বাড়িটাকে আজ সুন্দর দেখাচ্ছে।' বিভাসের অবশ্য মোটেই তা মনে হয়নি। বরং চড়া রঙের ছদ্মবেশে তার প্রচ্ছন্ন জীর্ণতা আরও যেন বেশি করে ধরা পড়েছিল। তাড়াতাড়িতে এবং অন্য নানা কারণে দরজা-জানলায় রঙ করা সম্ভব হয় নি। দেওয়ালের নতুন রঙের পাশে বিশ্রী বেমানান লাগছিল। দেওয়ালেও সব জায়গায় সমান রঙ ধরেনি। ইন্দ্রাণী বলেছিল—'তবু সব মিলিয়ে সুন্দর দেখাচ্ছে।'

মা'র ঘর ধুয়ে মুছে প্রায় ঝকঝকে করা হয়েছিল। সকাল থেকে খুলে রাখা হয়েছিল ঘরটা। মা'র সব থেকে বড় ছবিখানায় ফুল দেওয়া হয়েছিল, একটি মালা আর দু'পাশে সুতো দিয়ে বাঁধা রজনীগন্ধা। ছবিতে মা'র মুখ হাসি হাসি। রাজাপুর কবরখানায় মা'র কবরে ফুল রাখার পাত্রটার কানা ভেঙে গেছে। ছবির পাশে সুতো দিয়ে রজনীগন্ধা বেঁধে দিয়েছিল ইন্দ্রাণী। দরজার দিকে সরে এসে একটু দূর থেকে চোখ বুলিয়ে বলেছিল, 'বেশ সুন্দর দেখাচ্ছে। তোমার মা খুব সুন্দর ছিলেন।' বিভাস বলেছিল—'এ যে-সময়ের ছবি তখন আমি আসি নি।'

অনেক দিন পরে মা'র ঘর এমন খুলে রাখা হয়েছিল। ঘরটা প্রায় সবসময় বন্ধই থাকে। মাঝে মাঝে শুধু পরিষ্কার করবার জন্যে খোলা হয়। বোঝা যায় বাড়ির বেড়ালটা কোন ফাঁক দিয়ে যেন এই ঘরে ঢোকে, এটাই তার আস্তানা। আমার ঘর থেকে মা'র সেতারটা এই ঘরে এনে রাখতে হবে। আমার ঘরে সেতারটার সাদা ফুলতোলা নীল ঢাকনাটায় বড় বেশি ধুলো পড়ে। আমার অবশ্য ধুলো ঝেড়ে ফেলতে ইচ্ছে করে, কিন্তু ঝাড়া হয় না। কেন যে হয় না! মা'র সেতারে ধুলো জমে থাকা দেখতে খারাপ লাগে। ধুলোর প্রাচুর্য এই শহরে। এই ঘরে এনে রাখলেও ঢাকনাটায় ধুলো জমবে। তবু চোখের সামনে থাকবে না। সেদিন রাজাপুর কবরখানায় ঝড়ো হাওয়াতেও ধুলো উড়ছিল না। অন্য সময় ধুলো ওড়ে। সেদিন বৃষ্টিতে মাটি নরম হয়েছিল, ধুলো বসে গিয়েছিল। আমার মন কি এক বৃষ্টিতেই নরম কাদা হয়ে যায়।

সেদিন সন্ধ্যের উৎসব এই ছোট বাড়িতে হওয়া স্বাভাবিক ছিল না। অন্য কোথাও হতে পারত। এ বাড়িতে একখানাও খুব বড় ঘর নেই। তবু বাবা চাইলেন, এ বাড়িতেই হোক। এবং দেখা গেল, বিতোষেরও তাই ইচ্ছে। এর ফলে সেদিন অভ্যাগতরা দু'খানা ঘর, বারান্দা আর বাগানে ছড়িয়ে গিয়েছিলেন। নিমন্ত্রিতরা সবাই দীর্ঘ সময় ছিলেন এ বাড়িতে। কেউ তাড়াতাড়ি খাওয়া সেরে চলে যান নি। সন্ধ্যের দিকে প্রথম দফায় চায়ের সঙ্গে কেক, পেস্ট্রি, চিজ স্ট্র ইত্যাদি দেওয়া হয়েছিল। খাবার হাতে নিয়ে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে জটলা করছিলেন সবাই। ঘরে বারান্দায় বাগানে জোর আলোয় নানা বিচিত্র ছায়া পড়ছিল, ভেঙে যাচ্ছিল। নবাব খান আর বেগম এবং বিজয়প্রতাপকে নিয়ে বিভাসের অস্বস্তি ছিল। ভেবেছিল, নবাব খান অথবা বেগম কেউ-ই বিজয়প্রতাপের সামনে স্বাভাবিক বোধ করবেন না। দেখা গেল, তাঁরা বিজয়প্রতাপকে এড়িয়ে চলছেন এবং বিজয়প্রতাপ তাঁদের থেকে সযত্নে দূরে থাকছে। প্রথমে অনেকক্ষণ বিজয়প্রতাপকে দেখতেই পায় নি, ভেবেছিল—তখনও আসে নি; একটু পরে তাকে প্রায় আবিষ্কার করেছিল। এক কোণে একটা চেয়ার দখল করে বসেছিল বিজয়প্রতাপ, তাকে ঘিরে বসেছিল আরও কয়েকজন। অনেকেই দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে জটলা করছিলেন বলে প্রথমে বিজয়প্রতাপকে দেখতে পায় নি।

বিভাস কাছে গিয়ে বলেছিল, 'তোকে তো খুঁজেই পাচ্ছি না। বিনীতা আসে নি?'

'না, শরীরটা একটু খারাপ।' বিজয়প্রতাপের বলার ভঙ্গিতে বোঝা গিয়েছিল, কথাটা সত্যি না। বিভাসের মনে হয়েছিল, বিনীতা সহজেই আসতে পারত। শরীর খারাপের মিথ্যে অজুহাত দেবার দরকার ছিল না। এ বরং ছেলেমানুষি।

বিজয়প্রতাপ যেন খোঁচা দিয়ে বলেছিল, 'তোকে বড় উল্লসিত মনে হচ্ছে, বিভাস।'

'অবশ্যই। আমার তো আজ খুশী থাকবারই কথা।'

'না, অন্য কোন গূঢ় কারণ আছে মনে হচ্ছে।' কথা বলার সময় বিজয়প্রতাপ চোখ দুটোকে খুব ছোট করে আনছিল। বিজয়প্রতাপের কথার যে কোন বিশেষ মানে ছিল, বিভাস ভাবে নি। বোকার মত একটু হেসে চলে গিয়েছিল অন্য দিকে।

সেদিনের পুরো উৎসবটাই একটা বাড়তি ব্যাপার ছিল। এই ধরনের রিসেপশনের রেওয়াজ এই শহরে ছিল না। কিন্তু বিতোষ চেয়েছিল এমন একটা কিছু করতে। তার ছাত্রজীবন কলকাতায় কেটেছে, তাই তার ইচ্ছেয় কলকাতার এই প্রথা এই শহরে আমদানী করা হয়েছিল।

বাগচীমশাইকে বিভাস কোন পোষাক দিতে পারে নি। তিনি এমন একজনের একটি দামী স্যুট পরে এসেছিলেন যাঁর দেহ মেদস্ফীত এবং উচ্চতা তাঁর থেকে কম। বেমানান লাগছিল। তবে তিনি নিজে এ বিষয়ে মোটেই সচেতন ছিলেন না।

বিতোষ তার অফিসের বন্ধুদের নিয়ে ব্যস্ত ছিল। বাঙলা স্কুলের সেজ দিদিমণি, মানে নতুন বউ যে এত সাজতে জানেন, সেদিন না দেখলে বিশ্বাস হত না। জবা কী করে যেন ইতিমধ্যেই তাঁর সঙ্গে খুব জমিয়ে নিয়েছিল। চুলে ফুল গুঁজেছিল জবা, তার শাড়ির আর জামার রঙ যেন চিৎকার করছিল। উপাধ্যায়জীকে মনে হচ্ছিল খুশীতে বেসামাল। ঠিক মত দাড়ি কামান থাকলে তাঁকে এই বয়েসেও আশ্চর্য সুন্দর দেখায়। বড় অল্পে খুশী হন উপাধ্যায়জী।

সেদিনের অনুষ্ঠানের এত কিছু মনে ছিল বিভাসের, দীর্ঘকাল। হয়ত অন্য দুটো গভীরতর দৃশ্যের সঙ্গে জড়িয়ে ছিল বলে এত কিছু মনে ছিল।

প্রচুর আলো আর অভ্যাগতদের ভিড়ের মধ্যে ইন্দ্রাণী একসময় সন্তর্পণে বলেছিল, 'চল একটু ছাতে যাই।'

এমন কৈশোরোচিত প্রস্তাবের জন্যে বিভাস প্রস্তুত ছিল না। বিস্ময় লুকোবার চেষ্টা না করে বলেছিল, 'কেন?'

'চল না একবার!'

ইন্দ্রাণীর মুখের দিকে তাকিয়ে অন্য সবার দৃষ্টি এড়িয়ে বিভাস সিঁড়ি বেয়ে ছাতে উঠে এসেছিল, পিছনে ইন্দ্রাণী। ছাতে নির্জন অন্ধকার ছিল, নিচের নিমন্ত্রিতদের কলকণ্ঠ। গম্বজটার রঙটঙ পড়ে নি, রোঁয়ারোঁয়া উদ্ভিদে ছাওয়া। তার পাশে দাঁড়িয়ে অনেকক্ষণ চুপ করে থেকে ইন্দ্রাণী বলেছিল, 'কেন যেন ভিড় ভাল লাগছে না। ইচ্ছে করছে এখানে বসে থাকি এবং তুমিও এখানে থাক। অবশ্য এখন তা সম্ভব না। চল নিচে যাই।'

বিভাসের মনে হয়েছিল, কিছু বলা দরকার। কিন্তু কিছুই বলা হল না। চিকন সুতোয় বাঁধা পুতুলের মত ইন্দ্রাণীর পিছনে সিঁড়ি বেয়ে নেমে এসেছিল। নামতে নামতে ভেবেছিল, আমি কেন যে কখনও দর্শনীয় কিছু করতে পারি না!

ছাত থেকে নেমে এসে একটু সময় অনিশ্চিত পায়ে এঘর-ওঘর করতে হয়েছিল। মনে

হয়েছিল, বড় বেশি আলো। চোখে লাগে। এক ফাঁকে বিতোষ খাবার টেবিল সাজানর বিষয়ে দরকারী কয়েকটা কথা বলেই অন্য দিকে চলে গিয়েছিল। এবং বিতোষ চলে যেতেই সন্দেহ হয়েছিল তার কথা শুনেছে কিনা। অবশ্য খাবার টেবিল ঠিকই সাজান হয়েছিল। দুই ঘরে দু'সারি আর বারান্দায় এক। মাঝে মাঝে ভাড়া করে আনা পাত্রে ফুল রাখা হয়েছিল, নানা রঙের ঋতুপুষ্প।

পরিবেশনের সময় অন্য কয়েকজনের সঙ্গে ইন্দ্রাণীও সাহায্য করছিল। এই সব বিভাস কোনদিন করেনি। তবু মনে হচ্ছিল, এই কাজে সে যথেষ্ট দক্ষ। সযত্নে অভ্যেস করলে রীতিমত কৃতিত্ব দেখাতে পারে। কেন যেন হঠাৎ মনে পড়ে গিয়েছিল, বিজয়প্রতাপ হ্যাংলার মত রায়তা খেতে ভালবাসে। একটা প্লেটে করে অনেকটা রায়তা নিয়ে এসে কোন কথা না বলে বিজয়প্রতাপের সামনে টেবিলে রেখেছিল। বিজয়প্রতাপ খাওয়া বন্ধ করে মুখ তুলে তাকিয়েছিল। কী আশ্চর্য, তাকে এতটুকু খুশী মনে হয় নি।

'এসব কাজে তো তোর এত উৎসাহ ছিল না, বিভাস!' কথা বলার সময় বিজয়প্রতাপ চোখ দুটোকে খুব ছোট করে এনেছিল। কেন যেন তার দু'সারি সুবিন্যস্ত দাঁত পরস্পরকে পিষছিল। সামান্য দূরে আর একটা টেবিলের সামনে অন্য কোন খাদ্য নিয়ে দাঁড়ান ইন্দ্রাণীকে এবং এক হাতের মধ্যে দাঁড়ান বিভাসকে চোখ ছোট করে একসঙ্গে দেখছিল বিজয়প্রতাপ।

ছাতের নির্জন অন্ধকার আর বিজয়প্রতাপের চোখের সঙ্গে জড়িয়ে যাওয়ায় সেই রাত্রের অনেক দৃশ্য মনে ছিল বিভাসের, দীর্ঘকাল।

### চোদ্দ

সিভিল লাইন্সের সদর মহল্লায় রাস্তার মাঝখানে একটা দ্বীপ তৈরি হয়েছে, একটা ট্র্যাফিক আইল্যান্ড। এখনও একটু কাজ বাকী। ইট সুরকি সিমেন্টের একটা বিরাট সুন্দর বৃত্ত। কেন্দ্রবিন্দুতে একটি উজ্জ্বল রঙের আলোকস্তম্ভ। যুদ্ধের বছরগুলোতে এখানেও ছায়াছায়া অন্ধকার ছিল। দিনরাত মিলিটারী ট্রাক আর জীপ গর্জাত। ফাফামাও বিমান-ঘাঁটী আর কার্জন ব্রীজ এবং ক্যান্টনমেণ্ট আর ম্যাক্‌ফার্সন লেক যেন দুই দীর্ঘবাহু বাড়িয়ে দিত এই বিন্দুতে। কত বছর হল যুদ্ধ শেষ হয়েছে, সেই প্রসারিত বাহু গুটিয়ে নিয়েছে সন্দেহ নেই, তবু এখনও মিলিটারী ট্রাক দেখা যায় মাঝে মাঝে। হয়ত ক্যান্টনমেণ্টের দিক থেকে আসে অথবা কেল্লা থেকে। বিভাস জানে না, স্পষ্ট করে কিছু জানে না। জন্ম থেকে এই শহর দেখছে, তবু তার ভূগোল বিভাসের মনে পরিচ্ছন্ন নয়। এই শহরের প্রাঞ্জল নক্‌শা মোটেই তার নখদর্পণে নেই। বিতোষের মত কোনদিন এখান থেকে চলে গেলে হয়ত এই শহরের অঙ্গের কয়েকটি ভগ্নাংশের আদল শুধু মনে থাকবে। হয়ত মনে হবে, মুঘল স্থাপত্যের উদ্ধত চূড়োগুলোয় বর্ষার ধোঁয়া রঙ মেঘ নেমে আসে। পাতলা অন্ধকারেও যমুনা ব্রীজের সাদা শরীরে যেন একটু রোদ লেগে থাকে। পরিত্যক্ত গভর্নমেণ্ট হাউসের আগাছা আর বুনো লতায় ছাওয়া নিচু পাচিলের পাশে একটা দেড়শ' বছরের পুরনো ইঁদারার আদুড় গা কঙ্কালের মত। তার ইটগুলো ঠিক তাসের প্যাকেটের মত। ম্যাক্‌ফার্সন লেক ছাড়িয়ে গেলে আরও একটা ইঁদারা, যার গভীর প্রত্যন্তে কাল দুর্গন্ধ জল আছে। তার মধ্যে পাথরের টুকরো ফেললে কেমন অদ্ভুত শব্দ ওঠে আর অসংখ্য চামচিকে উড়ে আসে। সাপের জিভের মত ক্ষিপ্র ডানার কসরত দেখিয়ে ঝাঁক ঝাঁক চামচিকে সেই ইঁদারার গভীর

দেওয়াল থেকে উড়ে এলে উন্মত্ততার সেই সংজ্ঞাটা অবশ্যই মনে আসে যা এক সময় একটা ইংরেজি উপন্যাসে পড়েছিল—'বয়লিং আপ অব দি কয়েটিক ডীপ।'

স্টেশনে গিয়েছিল। সন্ধ্যেটা সেখানে কেটেছে। চুপচাপ এক কোণে দাঁড়িয়ে থেকে, পায়চারি করে, পাথরের বেঞ্চে বসে ব্যস্ততা দেখছিল। সময় কাটে না, অথচ হিসেব করলে দেখা যাবে পাত্র উপচে পড়া জলের মত বছরগুলো গড়িয়ে যাচ্ছে। এবং আরও তলিয়ে দেখলে বোঝা যাবে পাত্র ভরে নি। একেবারে শূন্য না হলেও জল উপচে পড়ার মত নয়। বিতোষ বউ নিয়ে কলকাতায় চলে গেছে। চলে গিয়ে হয়ত ভালই করল। এখানে সে প্রবাসীর মত থাকত। কৈশোর আর প্রথম যৌবনে বিতোষ কলকাতায় ছিল। এই শহর তার ভাল লাগত না। কিন্তু বিভাসের তো তা নয়। এই শহরে সে প্রবাসী না। বিতোষের চলে যাওয়ার পর দেওয়ালে নতুন রঙ সত্ত্বেও সেই একতলা বাড়িটা যেন হঠাৎ আরও পুরনো হয়ে গেছে। ঘর, বারান্দা, সিঁড়ি, কুলুঙ্গি, দেওয়ালের ফাটলে শুধু শীত শীত অন্ধকার।

পুরো সন্ধ্যেটা স্টেশনে কাটিয়ে এখন কুইন্স রোড ধরে ফিরছিল। সিভিল লাইন্সের সদর মহল্লায় রাস্তার মাঝখানে ইট সুরকি সিমেন্টের দ্বীপটা সম্পূর্ণ হতে এখনও বাকী। সন্ধ্যের পরও কাজ হচ্ছে। ক্যানিং রোডের কাছে এসে বিভাস একটু দাঁড়াল। আশপাশের বাড়িগুলোর কপালে অনেক নিয়নালোকিত বিজ্ঞাপন। ক্রমেই বাড়ছে। একটা টাঙাওয়ালার পায়ের তলায় ঘোড়ার জন্যে কিনে-আনা তেজী সবুজ ঘাস। এইমাত্র ঘাসমণ্ডি থেকে এল। তাদের আর নবাব খানের বাগানে এখন প্রচুর ঘাস। উকিলবাবুর বাগান সযত্নরক্ষিত, অমন বেপরোয়া তেজী ঘাস হয় না। কিছুদিন আগে দেখেছিল, বৃষ্টি আর বাতাসের ঝাপটায় রাজাপুর কবরখানার দেওয়ালের গায় ঘাসের জঙ্গল দুলছে। কবরখানার রেলিংয়ের ওপর ইন্দ্রাণীর জলেভেজা হাত আশ্চর্য ঠাণ্ডা ছিল, নিরক্ত মনে হয়েছিল আঙুলগুলো। সেই রাত্রে ছাতে নির্জন অন্ধকার ছিল, নিচে নিমন্ত্রিতদের কলকণ্ঠ। কিছু বলতে পারি নি, তীব্র কিছু বলতে পারি না, দর্শনীয় কিছু করতে পারি না।

একটা মোটর প্রায় বিভাসের গায়ের ওপর এসে থামল। হঠাৎ ব্রেক করার কর্কশ শব্দে ফিরে তাকাতে হল।

'বিভাস, আবে মারহুম!' স্টিয়ারিংয়ে হাত রেখে বিজয়প্রতাপ হাসছে। গাড়িতে আর কেউ নেই।

বাঁ পাশের দরজাটা খুলে দিয়ে বিজয়প্রতাপ বলল, 'উঠে আয়।'

'কোথায় যাবি?' বিভাস সঙ্গে সঙ্গে গাড়িতে উঠল না।

'নরকে যাব, তোকে নিয়ে যাব।' বিজয়প্রতাপ বেশ মেজাজে আছে মনে হল।

'আমাকে যে এখন ফিরতে হবে। সকালে বেরিয়েছি। স্কুল থেকে বাড়ি যাই নি।'

'তাহলে এখানে হাঁ করে দাঁড়িয়ে কী করছিলি?'

'কিছু না। এমনি দাঁড়িয়ে ছিলাম।'

'বাজে বকিসনে। উঠে আয়।'

উঠতে হল। অনিচ্ছায় উঠে বিজয়প্রতাপের পাশে বসল। সেই পুরনো গাড়িটা। খুব ছোট। নতুন গাড়ি এর মধ্যে আর কেনে নি বিজয়প্রতাপ। হয়ত শিগগিরই কিনবে। স্টিয়ারিংয়ে একটা হাত, আর একটা হাত বাইরে, হাওয়া লেগে সিগারেট তাড়াতাড়ি পুড়ছে। হাওয়ায় ছাই উড়ে যাচ্ছে, তবু অসহিষ্ণু আঙুলে ঘা দিয়ে দিয়ে ছাই ঝাড়ছে। ক্যানিং রোড ধরে খানিকটা এগিয়ে বাঁয়ে স্ট্যানলি রোডে মোড় নিল গাড়িটা।

আগে আগে তিনজন এইসব রাস্তা দিয়ে হে'টে যেত, কখনও সাইকেল রিক্সায়, কখনও টাঙায়। অ্যাসফল্‌টের রাস্তায় অথবা সিমেণ্টের পেভমেণ্টে শুকনো হলুদ পাতা কখনও একটা দুটো, কখনও অজস্র চোখে পড়ত। মোটর থেকে, বিশেষ করে রাত্রে, হলুদ পাতা দেখা যায় না। তিনজন কখনও একসঙ্গে মোটরে বেড়ায় নি। এখন আর তা সম্ভব না। বিজয়প্রতাপের একটা মাউথ অর্গান ছিল। সেটা এতদিনে নিশ্চয়ই ফেলে দিয়েছে, অথবা বাড়ির মধ্যেই কোথাও হারিয়ে গেছে। দেওয়ালে ঝোলান সেতারটার সাদা ফুলতোলা নীল ঢাকনাটায় ধুলো জমছে। মা'র ঘরে সরিয়ে রাখবার কথা ছিল, রাখা হয়নি। এই মুহূর্তে ছোটবেলার এই সব খুঁটিনাটি কেন মনে আসছে। আমার কি আর বয়েস বাড়েনি। এমন হয়, কারও কারও এমন হয়। এক জায়গায় এসে বয়েসটা থেমে থাকে, আর বাড়ে না। আমার তেমনি হয়নি। আমার বয়েস যদি সেই সময়ে এসে থেমে যেত, তাহলে তো তখনকার ইচ্ছেগুলো এখনও আমাকে জ্বালাত। আমার তো সেই বয়েসের ইচ্ছেগুলো নেই। বস্তুত আমার সব ইচ্ছেই যেন মরে গেছে।

বিজয়প্রতাপ এতক্ষণ কথা বলেনি। এমন হয় না। এতক্ষণ চুপ করে বসে থাকা তার স্বভাব নয়। হয়ত গভীর কিছু বলবে। ইন্দ্রাণীর বিষয়ে কিছু বলবে কি। সোজা সামনে রাস্তার দিকে তাকিয়ে আছে। ভ্রূসন্ধি ঈষৎ কুঞ্চিত। চেহারাটা নতুন। মনে পড়ল, সেদিন রাত্রে তার সঙ্গে কথা বলার সময় বিজয়প্রতাপ চোখ দুটো খুব ছোট করে এনেছিল। কেমন বিশ্রী জ্বালা ছিল সেই চোখে। তারপর এই প্রথম দেখা হল।

'তোর জিভ খসে গেছে নাকি? না কি আমার গায়ে মদের গন্ধ পেয়েছিস? আমার সঙ্গে কথা বলতে ঘেন্না করে?' বাঁ পাশে এক ঝলক তাকিয়ে প্রায় খে'কিয়ে উঠল বিজয়প্রতাপ। তার কথা বলার আকস্মিকতা চমকে দেবার মত। এত কর্কশ গলায় বিজয়প্রতাপ কথা বলে না। গলাটা নতুন।

'তোর জিভে তো সব সময় সুড়সুড়ি। তুই চুপ করে আছিস কেন?' একটু থেমে বিভাস আবার বলল, 'প্রায়ই ভাবি তোদের বাড়ি একবার যাব। তোর সঙ্গে আজকাল বিশেষ দেখাই হয় না। বিনীতার কী খবর?'

'ভাল।' বিজয়প্রতাপ মুখ ফরাল না, সোজা সামনে রাস্তার দিকে তাকিয়ে রইল। গলাটা এখনও নতুন।

বাঁয়ে সিভিল লাইন্স শেষ হয়ে গেছে, ডাইনে অ্যালফ্রেড পার্ক অনেক দূর, সামনে মিয়রাবাদ। গাড়িটাকে একবার থামতে হয়েছিল। তখন খুব বেশি কাঁপছিল গাড়িখানা। একটা প্লাগ বোধহয় ফায়ার করছে না। এখন আবার তীব্র গতি। স্পীডমিটারের কাঁটা থরথর করে কে'পে লাফিয়ে পার হয়ে গেল চল্লিশের ঘর। মনে হল, বাইরে কোথাও কেউ নেই, আলো অত্যন্ত কৃপণ। বিজয়প্রতাপ কোথায় যেতে চায়। রাত বাড়ছে।

গাড়িতে উঠতে বিভাসের অনিচ্ছা ছিল। শুধু জোরে আপত্তি করার উৎসাহ ছিল না বলে উঠে বসেছিল বিজয়প্রতাপের পাশে। অথচ এখন ভাল লাগছে, খুব ভাল লাগছে, নেশার মত। এখন রগরগে কিছু ঘটলে হয়ত আরও ভাল লাগত। বিজয়প্রতাপ সত্যি নেশা করেছে নাকি। কিসের যেন গন্ধ। জোর বাতাসে গন্ধটা উড়ছে। বিভাসের হাতের সিগারেট থেকে একটা আগুনের ফুলকি উড়ে এসে ঠোঁটে লেগেই নিভে গেল। একটু জ্বলে উঠেই আবার ঠাণ্ডা। জবা মেয়েটা চর্বির বড়ার মত। একটু আগে দেখা টাঙাওয়ালার ঘোড়াটা হয়ত এখন তেজী ঘাসে মুখ ডুবিয়েছে।

দু'জনেই চুপ, কারও মুখে কথা নেই। চোখ ঘুরিয়ে দেখল, বিজয়প্রতাপের চোয়ালের হাড় পরস্পরকে কঠিন চাপ দিচ্ছে, ঠোঁটের তলায় দু'সারি দাঁত পিষছে পরস্পরকে। নতুন চেহারা। খুব ভাল লাগছে। স্পীডমিটারের কাঁটা আর এক লাফ দিয়ে পঞ্চাশের দাগ ছুঁয়ে ফেলল। এখন একটা দুর্ঘটনা হলে বেশ জমে, বেশ একটা জমজমাট নাটক হয়। ইন্দ্রাণী আজ সন্ধ্যেয় আমার সঙ্গে বেরোবে বলেছিল। স্কুল থেকে ফেরাই হল না। কখনও দর্শনীয় কিছু করতে পারি না। এখন দর্শনীয় কিছু ঘটলে বেশ নাটক জমে যায়। আমি যদি সঙ্গে সঙ্গে থেঁতলে ফোঁত হয়ে যাই আর বিজয়প্রতাপের যদি দু'টো আঁচড় মাত্র লাগে, তাহলে চমৎকার!

মিয়রাবাদ কত পিছনে পড়ে রইল। সামনে একটা কালভার্ট। এক ঝাঁকানি দিয়ে পুরনো ছোট গাড়িখানা কালভার্টটা পার হয়ে গেল। বাঁ দিকে গল্‌ফ্‌ লিংকস, ডাইনে যুদ্ধের সময় সৈন্যদের তাঁবু ছিল। ডান দিকে মোড় নিয়ে আরও এগোলে কার্জন ব্রীজ। আরও কত দূর ফাফামাও বিমানঘাঁটী।

ডান দিকে মোড় নেবার সময় অস্পষ্ট দুর্বোধ্য কী যেন বলে বিজয়প্রতাপ হিংস্র চাপ দিয়েছিল অ্যাক্‌সিলারেটরে, সামনে ঝুঁকে দু'হাতে স্টিয়ারিংটা ঘুরিয়ে দিয়েছিল বাঁয়ে। খাদের তলায় গড়িয়ে যাবার আগে গাড়িখানা একটা গাছের গুঁড়িতে প্রচণ্ড ঘা খেয়েছিল, দুটো দরজা খুলে গিয়েছিল একসঙ্গে, বিভাস আর বিজয়প্রতাপ ছিটকে পড়েছিল বাইরে। প্রায় বিভাসকে ছুঁয়ে গাড়িটা গড়িয়ে গিয়েছিল। অন্ধকারে গাছগুলোকে চেনা যায়নি। পিপুল অথবা বট অথবা তেঁতুল অথবা নিম। অন্ধকার, অন্ধকারের গন্ধ। গাছ চেনা যায়নি, নাটক এমন ঠিক ঠিক জমলে গাছ চেনা যায় না।

দু'জনে প্রচুর কসরত করে উঠে রাস্তায় এসে দাঁড়াল। বিভাস ভাবছিল, এখন একটা অট্টহাসি খুব ভাল। কিন্তু বিজয়প্রতাপ বাঁ হাতের কব্জি চেপে ধরে ঠোঁট কামড়াচ্ছে। জখম হাতটাই আবার ভাঙল নাকি! বিভাস প্রায় হাসি হাসি মুখে বলল, 'কিরে, ভেঙেছে নাকি?'

'মনে হচ্ছে। তোর কিছু হয়নি?'

'আঁচড়টাচড় লেগেছে বোধহয় দু'পাঁচটা। বুঝতে পারছি না।'

'তোর দেখছি শক্ত হাড়। বেঁচে গেলি!'

হাঁটু কনুই ইত্যাদি মোক্ষম জায়গাগুলো জ্বলছে। জ্বলুক। গাড়িটা দেখা যাচ্ছে না। খাদের তলায় গড়িয়ে গেছে, তার ওপরে অন্ধকার অরণ্য। কাল বৃষ্টি হয়েছিল। যেখানে ছিটকে পড়েছিল সেখানকার মাটি বোধহয় নরম ছিল। নরম মাটির গন্ধ। তার সঙ্গে যেন অন্ধকারের গন্ধ মিশেছে। অন্ধকারের কি কোন আদিম গন্ধ আছে। বিজয়প্রতাপের কব্জির হাড় ভেঙে গিয়ে থাকলে কিছু একটা করা দরকার। এখান থেকে ফিরে যাওয়া দরকার। যুদ্ধের সময় হলে সামনের সৈন্যদের তাঁবুতে যাওয়া যেত। কিন্তু সেই তাঁবুগুলো তো এখন আর নেই। এমন একটা দর্শনীয় ব্যাপার ঘটল, তবু আমার কিছু হল না। আমার শক্ত হাড়।

স্ট্যানলি রোড ধরে দু'জন শহরের দিকে হাঁটতে শুরু করল। বিভাসের পকেটের সিগারেট দেশলাইয়ের বাক্স চিপটে গেছে। বিজয়প্রতাপের পকেটে মোটামুটি আস্ত ছিল। একটা দেশলাইয়ের কাঠি দিয়ে দু'জন সিগারেট ধরাল। বিজয়প্রতাপের ঠোঁটে সিগারেট ঝুলছে, ডান হাত দিয়ে চেপে ধরে রেখেছে বাঁ হাতের কব্জি।

খানিক দূরে হেঁটে সাইকেল রিক্সা পাওয়া গেল একখানা। সেখান থেকে সিভিল হসপিটাল। অল্প সময়ে পৌঁছে গেল। ওষুধটষুধ দিয়ে দুজনেরই আঁচড়গুলো জীবাণু-মুক্ত করা হল। বিজয়প্রতাপের ভাঙা কব্জি প্লাস্টার করতে সময় লাগল অন্তত আধঘণ্টা।

হাসপাতাল থেকে বেরিয়ে বিভাস বলল, 'দুটো রিক্স ডাক। তুই বাড়ি যা, আমি বাড়ি যাই।'

'বাজে বকিস নে। এখন বাড়ি যাব না।'

'তবে এখন কী করবি? তোর হাতে যন্ত্রণা হচ্ছে না?'

'হাতে যন্ত্রণা হচ্ছে না! ন্যাকা!' বিজয়প্রতাপ একটা রিক্সায় উঠে বসে বলল, 'উঠে আয়।' মোটর থেকে তখন ঠিক এইভাবে বিভাসকে ডেকেছিল।

সাইকেল রিক্স চলতে শুরু করলে বিজয়প্রতাপ আবার বলল, 'তুই কোন কৈফিয়ত চাস না?'

'কিসের?'

'আজকের ঘটনার জন্যে তুই কোন কৈফিয়ত চাস না?'

'না।'

'ও, তুই বুঝি ক্রোধ ঘৃণা বিদ্বেষ এসবের অনেক ঊর্ধ্বে উঠে গেছিস! তোর ধ্যানস্থ ভাব দেখলে তাই মনে হয়। কিন্তু আজ তোকে আমি কৈফিয়ত দেব, তুই না চাইলেও দেব।'

বিভাস বলার মত কিছু কথা পেল না। গল্‌ফ্‌ লিঙ্কসের পরে ডান দিকে মোড় নেবার সময় বিজয়প্রতাপ গাড়ির গতি একটু কমাবার জন্যে ব্রেকে চাপ না দিয়ে অ্যাক্‌সিলা-রেটরই চেপে রেখেছিল, সামনে ঝুঁকে দু'হাতে স্টিয়ারিং ঘুরিয়ে দিয়েছিল বাঁয়ে। একটা গাছের গুঁড়িতে ঘা মেরে গাড়িটা খাদের তলায় গড়িয়ে গেছে। এর মধ্যে অসরল কিছু নেই। এর জন্যে কৈফিয়ত চেয়ে কী হবে। বরং বিজয়প্রতাপ এখনই একটা নতুন গাড়ি কিনবার কৈফিয়ত পেল।

রাস্তা ফাঁকা হয়ে এসেছে। এই শহর বড় তাড়াতাড়ি ঘুমোয়। দুর্ঘটনায় সব সময় মোটরে আগুন ধরে যায় না কেন। গাছের গুঁড়িতে ঘা মারার পর গাড়িটায় আগুন ধরে গেলে আরও জমত। অন্ধকার খাদের তলায় রাত্রে আলো পৌঁছয় না। আজ জ্বলন্ত গাড়ি গড়িয়ে গেলে খাদের তলাটা আলোকিত হত। বাইরে ছিটকে না পড়লে ছাই হত শক্ত হাড়। সিভিল লাইন্সের সদর মহল্লায় আবার এমন ফিরে আসা যেত না। আরও কি অনেক কাল এমন ফিরে ফিরে আসব।

রিক্স থেকে নেমে রামাজ বার অ্যান্ড রেস্টরাণ্টে ঢুকল দুজন। একটা নির্জন কোণের টেবিলে বিজয়প্রতাপের জন্যে হুইস্কি এল আর বিভাসের জন্যে চা। কয়েকবার ঠোঁটে পাত্র ছুঁইয়ে বিজয়প্রতাপ প্রশান্ত হল। নির্বিষ শিশুর মত একমুখ হেসে বলল, 'বিশ্বাস কর, বিভাস, এর মধ্যে কোন পূর্বপরিকল্পনা ছিল না। যখন তোকে গাড়িতে উঠতে ডেকে-ছিলাম, তখন এমনিই ডেকেছিলাম। স্ট্যানলি রোড নির্জন হয়ে এলে সেই প্রথম আমার মনে হল, তোকে শেষ করে দিই। নিশ্চয়ই বুঝতে পেরেছিস তোকে থেঁতলে মারতে চেয়েছিলাম।'

'কিন্তু তুই নিজেও তো ছিলি গাড়িতে।'

'প্রথমে সে হিসেব মাথায় আসেনি। পরে ভাবলাম, গাড়িটা বাঁ দিকে ঘুরিয়ে দিয়ে

ডাইনে লাফ মারব, আর তুই চাপা পড়ে মরবি।'

'নিখুঁত পরিকল্পনা এবং তার সিদ্ধি তোর বাঁ হাতের কাজ।'

'কিন্তু বিশ্বাস কর, সবটাই খুব অল্প সময়ের ভাবনা। সত্যিকার কোন পূর্ব-পরিকল্পনা ছিল না।'

এর পর আর পুরনো বন্ধুদের কী কথা থাকতে পারে। সব তো পরিচ্ছন্ন হয়ে গেল। এবার পাত্র শেষ করে উঠলেই হয়। অথচ বিজয়প্রতাপ উঠবার কোন লক্ষণ দেখাচ্ছে না। পাত্রটি ধরেছে ডান হাতে, কপাল নাসাগ্র স্বেদাক্ত।

'আজ তোকে একটা কথা বলব, বিভাস।' বিজয়প্রতাপের গলায় বেশ উত্তাপ। 'আমি আর ইন্দ্রাণী যে পরস্পরের কাছে এমন দুঃসহ হলাম তার জন্যে আমি একা সবটুকু দায়ী না। অনেক কাল আগে আমি ইন্দ্রাণীকে প্রায় খুবলে নিয়েছিলাম, আর তুই আমাকে অনেকগুলো বছর ধরে নিঃশব্দে অদৃশ্য ছোবল মেরেছিস। আমাদের ঘরের বাতাসে তুই বিষ ছড়িয়েছিলি। আমার আর ইন্দ্রাণীর মাঝখানে, অন্তত শেষের দিকে, তুই সব সময় দাঁড়িয়েছিলি।'

বিভাসের একটু সুড়সুড়ি লাগল সন্দেহ নেই। তবু বলল, 'এসব সত্যি না। তোর আসলে নিজের ওপর আস্থা কম, তাই এসব ভেবেছিস। নিজের ওপর বিশ্বাস গভীর না, তাই এই মিথ্যেকে প্রশ্রয় দিয়েছিস। এবং এই কারণেই নিজেকে এমন বেশি করে জাহির করিস।'

'এসব সত্যি না হলে আমাকে ঝাঁজাল সুখের পিছনে এমন হন্যে হয়ে ছুটতে হত না।' বিজয়প্রতাপ একটু থেমে বলল, 'তুই আছিস বলে ইন্দ্রাণী আর আমি পরস্পরের কাছে দুঃসহ হলাম। তুই হয়ত বুঝতে পারিসনি, অথচ, বিভাস, আমার আর ইন্দ্রাণীর ঘরে তুই-ই বিষ ছড়িয়েছিস। দিনের পর দিন যন্ত্রণায় জ্বলেছি, তাই আমার আর সহ্য হল না। সেদিন রাত্রে তোদের বাড়িতে যখন দেখলাম তুই আবার ইন্দ্রাণীর খুব কাছে এসেছিস, তখন আর আমার সহ্য হল না।' শূন্য পাত্রটা বিজয়প্রতাপ শব্দ করে টেবিলে রাখল। দুসারি সুবিন্যস্ত দাঁত হাসিতে উজ্জ্বল হল। 'সুতরাং আজ স্ট্যানলি রোড ফাঁকা হয়ে এলে আবার হন্যে হয়ে গেলাম। ভাবলাম, তোকে শেষ করে দিই। তোকে থেঁতলে মারতে চেয়েছিলাম।'

'আমাকে শেষ করতে এত মেহনত করলি, হাত ভাঙলি, এর জন্যে কৃতজ্ঞ রইলাম। তোর এমন একটা প্রেরণা না এলে আমার আজকের এই অভিজ্ঞতাটা হত না।'

'বিভাস, যদি আমার ওপর রাগে ক্ষিপ্ত হতে না পারিস, আমাকে ঘৃণা কর। আমাকে ঘৃণা কর। আমাকে ঘৃণা করার তোর সঙ্গত কারণ আছে।'

বিভাস একবার নড়েচড়ে বসল। আমার কি দুটো কানই কাটা। আমি কেন বিজয়-প্রতাপকে ঘৃণা করতে পারি না। রাগে জ্বলে যাই না কেন আমি। আমি এতদিন, এখনও, কেমন করে তার বন্ধু আছি। আমি কি ভাল করে জানি আমি কত বড় বেহায়া। আমার কি শিরদাঁড়া আছে, কোনদিন কি ছিল। রুগ্ন দুর্বল ল্যাজগোটান জানোয়ারের মত তার সঙ্গে গিয়ে গঙ্গার বালি নখ দিয়ে খুঁড়েছি, আবার তার সঙ্গে ছায়ার মত ফিরে এসেছি। এবং এতকাল তার সঙ্গে স্বাভাবিক সম্পর্ক রেখেছি। আজ আমাকে থেঁতলে মারতে চেয়েছিল বিজয়প্রতাপ। তবু কেন আমি রাগে জ্বলে উঠলাম না। কেন তাকে ঘৃণা করতে পারছি না।

দাঁত দিয়ে থেকে থেকে ঠোঁট কামড়াচ্ছে বিজয়প্রতাপ। যন্ত্রণা, ভাঙা কব্জির যন্ত্রণা। অথচ হাসি লেপ্‌টে আছে ঠোঁটে, যেন দু'জনের একটা মধুর মধুর সন্ধ্যে কাটল, এবং এখন রাত বেড়েছে বলেই শুধু একটু ক্লান্ত। স্বেদাক্ত কপাল আর তীক্ষ্ম নাসাগ্রে বনেদী সরাইখানার বিচ্ছুরিত আলো, বিশাল শরীরে অঢেল স্বাস্থ্য, ছড়িয়ে ছিটিয়ে দিলেও কোনদিন নিঃশেষ হবে না। হঠাৎ ভয়ঙ্কর চমকে উঠল বিভাস। এই প্রথম, যেদিন উদয়-প্রতাপ সিং ছেলেকে নিয়ে ওপাড়ায় এসেছিলেন তারপর এই প্রথম বিভাস এমন কিছু আবিষ্কার করল যা তার ফুসফুসে যেন আচমকা ছুরি বসিয়ে দিল। তাহলে কি এতদিন ধরে আমি নিজেকেও লুকিয়ে বিজয়প্রতাপকে প্রশংসা করে এসেছি। আমার মনের গভীর অন্ধকারে কি তার এত কীর্তির প্রতি গোপন সমর্থন আছে। আমি যা পারি না বিজয়প্রতাপ তা অবলীলায় পারে বলে কি তার মধ্যে আমি নিজেকে পূর্ণ করার স্বাদ পাই। আমি এক অক্ষম বিজয়প্রতাপ! ওপরে যে পাখাটা ঘুরছিল সেটা যেন ক্ল্যাম্প রড আর্মেচার ব্লেড সবসুদ্ধ বিভাসের মাথায় ছিঁড়ে পড়ল।

ঘুম জড়ান চোখে তাকিয়ে বিজয়প্রতাপ বলল, 'তুই যেন কাঁপছিস! কাঁপছিস নাকি?'

গল্‌ফ্ লিঙ্কসের পর ডানদিকে মোড় নেবার সময় গাড়িটা বাঁয়ে ঘুরে গিয়ে একটা গাছের গুঁড়িতে ঘা মারলে বেশ দূরেই নরম মাটিতে ছিটকে পড়েছিল বিভাস! অথচ তখন সেখান থেকে উঠে রাস্তায় এসে দাঁড়াতে গায়ে কাঁপুনি ধরেনি। এখন এই নরম চেয়ারে এলিয়ে বসে মনে হল, কিসের যেন কঠিন চাপে পুরো শরীরটা থেঁতলে যাচ্ছে। টেবিলের ওপর রাখা নিজের আঙুলগুলোকে মনে হল, একগোছা বড় বড় চাবি। হাতের শিরা যেন ঠেলে উঠেছে, আর তার মধ্যে অনেক বিকৃত ইচ্ছের বিষাক্ত রক্ত। নিজেকে কখনও অত্যন্ত দামী মনে না করলেও, এতদিন মনের কোথায় যেন এমন একটা প্রচ্ছন্ন বিশ্বাস ছিল যে আমি ভাল, একটা পোশাকী শব্দ ব্যবহার করলে বলা যায়—বিজয়প্রতাপের তুলনায় আমি পরিশীলিত; বিজয়প্রতাপ বড় বেশি চড়া রঙ, বড় বেশি মোটা দাগ, স্থূল, প্রায় হিংস্র জন্তু। কিন্তু আজ এখন বুঝতে পারছি, আমিও জানোয়ার, শুধু বিজয়প্রতাপের মত আমার আদিম হিংস্রতা নেই। আমি দুর্বল, রুগ্ন। তাই আরও বেশি করুণার পাত্র। আমার মধ্যেও একই ক্লিন্ন বাসনা লিকলিকে সাপের মত কিলবিল করে। শুধু অব্যর্থ ছোবল মারতে পারি না। আমি এক অক্ষম বিজয়প্রতাপ!

দাম মিটিয়ে দিয়ে বিজয়প্রতাপ বলল, 'ওঠ। তুই বাড়ি যা, আমিও বাড়ি ফিরে যাই।'

দু'জন বাইরে এল। কাছে ডেকে আনল দুটো সাইকেল রিক্স। বিজয়প্রতাপ কষ্ট করে জিভটাকে আয়ত্তে এনে বলল, 'বিভাস, আবে মারহুম, তোকে আজ খুন করতে চেয়েছিলাম। হিংসে, বুঝলি, হিংসে। তবে বিশ্বাস কর, তোকে আমি ভালবাসি, চিরকাল।'

দুটো রিক্স দু'দিকে চলতে শুরু করেছিল। এক মিনিটের মধ্যে বিজয়প্রতাপের রিক্সটা আবার ঘুরে পাশে এল। গলা বাড়িয়ে বিজয়প্রতাপ বলল, 'বিভাস, তুই ইন্দ্রাণীকে বিয়ে কর।'

বিভাস কিছু বলল না, বলতে পারল না। বিজয়প্রতাপকে নিয়ে রিক্সটা অন্য দিকে মোড় নিল।

রিক্সর পিছনের কাঠটা পিঠে লাগছিল। বাঁ কনুইটা টনটন করছে। পকেটে সিগারেট নেই। রাস্তায় লোক নেই। এই শহর বড় তাড়াতাড়ি ঘুমোয়। এই শহর আমাকে পুড়িয়ে

মারল। বাবার কথা ভাবলেই পরিত্যক্ত গবর্ণমেন্ট হাউসের নিচু পাঁচিলের পাশের দেড়শ' বছরের পুরনো ইঁদারাটার চেহারা মনে আসত, যার পাতলা ইটের দেওয়াল কঙ্কালের মত। এখন নিজের কথা ভেবেও সেই ইঁদারাটার আদল মনে আসছে। পাতলা ইটের দেওয়ালে শ্যাওলা নেই, যেন দাঁত বের করে হাসছে। এই শহর এখন থেকে আমার ভিতরের অক্ষম জানোয়ারটাকে দেখে ফেলে হাসবে। এই শহরে আমি আর থাকব না। এখানে থেকে কী হবে।

আজ বুঝতে পারছি, কেন বিজয়প্রতাপের সঙ্গে গঙ্গার বালি খুঁড়ে আবার তার সঙ্গেই ছায়ার মত ফিরে এসেছিলাম, কেন ঘৃণায় মুখ ফিরিয়ে নিই নি, রাগে জ্বলে উঠি নি, কেন এতদিন তার সঙ্গে স্বাভাবিক সম্পর্ক রেখেছি। তার সব কীর্তির প্রতি আমার গোপন সমর্থন ছিল। নিজেকেও লুকিয়ে তাকে প্রশংসা করেছি। আমি যা পারি না, বিজয়প্রতাপ তা অবলীলায় পারে। তার মধ্যে আমি নিজেকে পূর্ণ করার স্বাদ পাই। এখন বুঝতে পারছি, কেন বিজয়প্রতাপ আজ আমাকে খুন করতে চাইলেও তার সঙ্গেই ছায়ার মত সিভিল লাইন্সের সদর মহল্লায় ফিরে এসেছি। গল্‌ফ্‌ লিঙ্কস থেকে ফিরে বনেদী সরাইখানার বিচ্ছুরিত আলোয় উদ্ভাসিত বিজয়প্রতাপের বিশাল শরীর কেন সুন্দর মনে হয়েছে, আজ বুঝতে পারছি।

আকবর ফোর্টের পাথুরে দেওয়াল থেকে খানিক দূরে নরম মাটিতে টেনে তোলা নৌকোয় বসে বিজয়প্রতাপ যেদিন প্রথম তার অভিজ্ঞতা বলল, সেদিন থেকেই, বরং তার কিছু আগে থেকেই, আমার দু'কান কাটা। সিংবাড়ির নির্জন ঘরে ইন্দ্রাণীর হাত ধরে অন্ধকারে ডুব দেওয়ার স্বাদ আমিও পেয়েছিলাম, বিজয়প্রতাপের উল্লসিত বর্ণনা থেকে নিজেকেও না জানিয়ে স্বাদ নিয়েছিলাম। গল্‌ফ্‌ লিঙ্কসের পরে ডানদিকে মোড় নেবার সময় বিজয়প্রতাপের স্টিয়ারিং-ধরা বলিষ্ঠ হাতের ওপর আমার দুর্বল হাত রেখে লুকিয়ে মোচড় দিয়েছিলাম বাঁয়ে, অ্যাক্‌সিলারেটরে তার পায়ের ওপরে আমার পা চেপে ধরেছিলাম। তার আদিম হিংস্রতায় মুগ্ধ হয়ে মনের কোন দুর্লক্ষ্য অতলে এইসব করেছিলাম। অন্তত নরম চেয়ারে বসে বিচ্ছুরিত আলোর তলায় বিজয়প্রতাপের বিশাল সুন্দর শরীরের দিকে তাকিয়ে এইসব করেছিলাম। এইসব করে, এইভাবে আমাকে মারতে গিয়ে, তার মধ্যে নিজেকে পূর্ণ করার স্বাদ নিয়েছিলাম। আমি এক দুর্বল, রুগ্ন, অক্ষম বিজয়প্রতাপ!

ইন্দ্রাণী একদিন বলেছিল, সে নাকি পুড়ে ছাই। এখন আমিও পুড়ছি। একটু পরেই ছাই হয়ে যাব।

রিক্সা থেকে নেমে বিভাস নবাব খানের বাগানে ঢুকল। জঙ্গল হয়ে আছে। ভাল করে কিছু দেখা যায় না। ডালিম গাছটার তলায় গভীরতর অন্ধকার। তার এবাড়ির অন্দরে প্রবেশের অভ্যেস নেই। এখন অনেক রাত হয়েছে। সবাই হয়ত ঘুমিয়ে পড়েছে। এসময়ে তার এ বাড়িতে আসা অত্যন্ত অস্বাভাবিক। কিন্তু এখনই ইন্দ্রাণীর সঙ্গে কয়েকটা কথা বলা দরকার। কাল হয়ত এই অস্থিরতা থাকবে না, যথেষ্ট জোর দিয়ে কিছু বলতে পারবে না।

বারান্দায় উঠে দেখল, ইন্দ্রাণীর ঘরের জানলা খোলা, আলো জ্বলছে। হয়ত আজকাল দেরিতে ঘুমোতে যায়, হয়ত কিছু পড়ছে। ইন্দ্রাণী হয়ত জানে আমি এখনও ফিরি নি। হয়ত সেই কারণেই ঘুমোতে পারে নি। আমার জন্যেই ঘুমোতে পারে নি? অবশ্য এসব ভেবে আর কী হবে। এসবের এখন আর কোন দাম নেই।

বিভাস ভূতের মত জানলায় আলোর সামনে এসে দাঁড়াতে তার সুদীর্ঘ ছায়া বাগান পর্যন্ত প্রসারিত হল। পায়ের শব্দে একবার মুখ তুলে তাকিয়ে ইন্দ্রাণী ভিতরের বারান্দা ঘুরে বাইরে এল। বিভাসের সর্বাঙ্গে চোখ বুলিয়ে বলল, 'এত রাত্তির পর্যন্ত কোথায় ছিলে?'

'বাইরে একটু আটকে গিয়েছিলাম। সন্ধ্যেয় তোমার সঙ্গে বেরোবার কথা ছিল, সময়মত ফিরতে পারি নি, দুঃখিত।'

'এমন মেপে মেপে কথা বলছ কেন? ঘরে এস।'

'না, এখানে একটু দাঁড়াও। তোমাকে কয়েকটা কথা বলব।'

বিভাস ভেবেছিল, ইন্দ্রাণীর ঘরে যাবে না। বড় হয়ে কোনদিন যায় নি। আজ এখন আর ইন্দ্রাণীর ঘরে যাবে না। অথচ যেতে হল। ইন্দ্রাণী চাপা গলায় এমন জোর দিয়ে ডাকল যে তার ঘরে যেতে হল।

ঘরে ঢুকে একটা চেয়ারে বসেই কোন ভূমিকা না করে বিভাস বলল, 'আমি কাল বিতোষের ওখানে চলে যাব। এখানে এই শহরে আর থাকা সম্ভব হল না।'

ইন্দ্রাণী চুপ করে কিছুক্ষণ শুধু বিভাসকে দেখল।

'আমি পালিয়ে যাচ্ছি, এই পরিচিত শহর থেকে পালিয়ে যাচ্ছি। এতদিন বোধহয় আমার প্রচ্ছন্ন অহমিকা ছিল। নিজেকে এত ঘৃণ্য কখনও মনে হয় নি। আজ বুঝতে পারছি সব মিথ্যে। আজ বুঝতে পারছি আমার মধ্যে একটা জানোয়ার আছে। সেই জানোয়ারটা আজ হঠাৎ বেরিয়ে পড়েছে।' বিভাস প্রথমে মেপে মেপেই কথা শুরু করেছিল। এখন সব এলোমেলো হয়ে গেল।

'এতক্ষণ কোথায় ছিলে বল তো?'

বলতে হল, আজকের রগরগে অভিজ্ঞতার টুকরো ছিঁড়ে ছিঁড়ে দিতে হল ইন্দ্রাণীকে।

'আমার এতদিনের আচরণের ব্যাখ্যা আজ পেলাম। এখনও বিজয়প্রতাপের সঙ্গে আমার ঘনিষ্ঠতার কারণ আজ বুঝলাম। আমি তীব্র কঠিন কিছু বলতে পারি না, দর্শনীয় কিছু করতে পারি না। আমার গোপন ইচ্ছেগুলো বিজয়প্রতাপকে আশ্রয় করে বেঁচেছিল। তার মধ্যে আমি নিজেকে পূর্ণ করে বেঁচে আছি। এতকাল নিজেকেও না জানিয়ে তাকে প্রশংসা করে এসেছি। আজ সে আমাকে মারতে চেয়েছিল। অথচ গল্‌ফ্‌লিঙ্কস থেকে ফিরে এসে জোরাল আলোর তলায় তার দিকে তাকিয়ে বুঝলাম, আমার চোখে ঘৃণা নেই, তার ওপর আমার রাগ নেই। বরং মনের কোথায় যেন তার প্রতি সমর্থন লুকোন আছে। আমি এক রুগ্ন বিজয়প্রতাপ! আমি তার থেকেও ঘৃণার, করুণার পাত্র।' বিভাস পাশের টেবিলের ওপর রাখা খোলা বইখানার কয়েকটা পাতার কোণ আঙুল দিয়ে ঘষতে ঘষতে ছিঁড়ে ফেলল।

ইন্দ্রাণী বিছানার পাশে বসে শুনছিল। এখন উঠে দাঁড়িয়ে সোজাসুজি বিভাসের চোখের দিকে তাকিয়ে কঠিন গলায় বলল, 'নিজেকে এমন ব্যবচ্ছেদ করার চেষ্টাও অহমিকা। নিজেকে ছোট করে দেখানর মধ্যে একটা বাহাদুরি আছে। কিন্তু সে বয়েস তুমি পার হয়ে এসেছ, বিভাস। এখন অকারণে যন্ত্রণা ডেকে এনো না, আমাকেও শুধু শুধু যন্ত্রণা দিও না। বিজয়প্রতাপকে আমি চিনি, তোমাকেও। তার সঙ্গে তোমার নিজেকে জড়ানর কোন মানে হয় না। বিজয়প্রতাপ একটা দুর্ঘটনা, শুরু থেকে এপর্যন্ত একটা পুরো নিখাদ দুর্ঘটনা।'

ইন্দ্রাণী একটু থেমে আবার কিছু বলতে যাচ্ছিল, তখনই দেওয়াল ঘড়িতে এগারটা বাজল। এবং ঠিক তখন বেগম খোলা দরজায় এসে দাঁড়ালেন। চৌকাঠ ডিঙিয়ে ভিতরে এসে বললেন, 'বিভাস কি বাড়ি থেকে এলে, না বাইরে থেকে?'

'বাইরে থেকে এলাম। আমি এখনও বাড়ি যাইনি। আজ খুব দেরি হয়ে গেল।'

'তাহলে এখন বাড়ি যাও। তোমাদের বাড়িতে যে লোকটা কাজ করে সে এখানে এসেছিল তোমার খোঁজে। তোমার বাবা হয়ত ভাবছেন।'

বিভাসের ইচ্ছে হল বলে—বাবা এসব ভাবেন না। কিন্তু কী হবে। এখন বসে বসে বেগমের সঙ্গে কথা বলা অর্থহীন। বিভাস একবার দেখে নিল, বেগম তার দিকে তাকিয়ে হাসছেন কিনা। কিছু বুঝতে পারল না। বেগমের ঠোঁটে ব্যঙ্গের হাসিটা লেপ্‌টে নেই। হয়ত বেগম এই মুহূর্তে হাসিটা লুকিয়েছেন। প্রায়ই লক্ষ্য করেছে, বেগম তার দিকে তাকিয়ে কেমন ঠোঁট চেপে হাসেন, যেন বিভাসের সর্বকিছু তিনি জেনে ফেলেছেন।

বিভাস উঠল, ইন্দ্রাণী তাকে এগিয়ে দিতে এল বাগান পর্যন্ত। অন্ধকারে বিভাসের হাতে চাপ দিয়ে বলল, 'কাল তোমার সঙ্গে কথা বলব। এখন চুপ করে থেকে আবার আমি নিজেকে পুড়িয়ে মারব না।'

বিভাসের হাতটা টনটন করে উঠল। আঙুলগুলো কি মচকে গেছে। বাগান থেকে বেরিয়ে এল। আমি ইন্দ্রাণীর ঘরে কেন এসেছিলাম। আমি কি চেয়েছিলাম ইন্দ্রাণী কাঁপা-কাঁপা গলায় বলবে—'না, তুমি যেও না!'

নিজের ঘরে এসে হঠাৎ মনে হল, বেগমের সঙ্গে এই শহরের আশ্চর্য মিল। রাজ্যপাট গেছে, তবু নানাবিধ চড়ারঙের বিচিত্র মুখোশ। মুখ কখনও দেখা যায় না। বেগম দুঃসহ হলে এই শহরও অসহ্য।

## পনের

ট্রেনের জানলার কাচ আর কাঠের ফ্রেমের ফাঁকে কয়েকটা পোকা মরে পড়ে আছে। কাল রাত্রে আলো দেখে অজস্র পোকা এসেছিল। তার কয়েকটা কেমন করে যেন আটকে গিয়েছিল কাচ আর কাঠের ফ্রেমের ফাঁকে। ট্রেন ডেহরি-অন-শোন থেকে ছাড়লে প্রথম সকালবেলার নরম রোদ পড়েছিল মরা পোকাগুলোর মসৃণ চিকন ডানায়। আর একটু পরে হয়ত পিঁপড়ে আসবে, কুরেকুরে খাবে মরা পোকাগুলোকে। ট্রেনের কামরায় কি পিঁপড়ে আসে।

সাসারাম জংশন থেকে এইমাত্র ট্রেন ছাড়ল। সকাল সাতটা বাজতে মিনিট পনের বাকী। এখনও জানলা খুলতে সামনের বেঞ্চের মহিলাটির আপত্তি। বাইরে ঠাণ্ডা হাওয়া। সাসারামে চা পেয়েছিল। শূন্য কুল্‌হাড় এখনও বিভাসের হাতে। কোথায় ফেলবে ভাবছিল। আঙুলের ফাঁকে আর চায়ের তলানীতে কয়লার গুঁড়ো। সারা রাত জানলা বন্ধ ছিল, তবু অনেক কয়লার গুঁড়ো এসেছে। একটি মাত্র রাত্রে এই যাত্রীরা কামরাটাকে কী বিশ্রী নোংরা করেছে। দেশলাইয়ের পোড়া কাঠি, সিগারেটের টুকরো আর ছাই, চায়ের কুল্‌হাড় ইত্যাদি ফেলে বিভাসও অন্য সবাইকে যথেষ্ট সাহায্য করেছে।

মাত্র একমাস আগে ঠিক এই পথে বিভাস তার আজন্ম চেনা শহর থেকে পালিয়েছিল। আজ আবার ঠিক সেই পথে তার আজন্ম পরিচিত শহরে ফিরে যাচ্ছে। পালিয়ে যাওয়ার

কোন মানে হয় না। ফিরে আসারও কোন অর্থ নেই। বস্তুত এখন কোন কিছুরই আর যেন কোন মানে খুঁজে পাওয়া যায় না। মিথ্যের মুখোশটা ছিঁড়ে আসল চেহারাটা দেখে ফেলার পর আর কোথাও গিয়ে কিছু হবে না। বেগমের মত বিচিত্রবর্ণ না হলেও এতদিন একটা মুখোশ ছিল। সেই মুখোশ ছিঁড়ে গেছে। নিজের হাতে বিভাস ছেঁড়েনি, এমনিতেই ছিঁড়েছে। বিভাস কখনও দর্শনীয় কিছু করতে পারে না।

কাল রাত্রে যে শেয়ালটাকে দেখেছিলাম সে আমার নিখুঁত উপমা। অকারণ ক্ষিপ্রতায় শেয়ালটা দৌড়ে পালিয়েছিল। যেন দৌড়ের কসরত দেখিয়ে মুগ্ধ করার জন্যে ছুটে পালিয়েছিল। একটা পেয়ারাগাছের ছায়ায় ট্রেনের দিকে মুখ করে দাঁড়িয়েছিল, আশঙ্কা ছিল না, বিস্ময় ছিল না, যেন আত্মপ্রত্যয়ের একটি নিপুণ মুদ্রা। অথচ কী যে হল, আচমকা এক পাক খেয়ে নিজের ছায়ার সঙ্গে পাল্লা দিয়ে ছুটে পালিয়েছিল। কোন দুর্নিরীক্ষ্য দূরে যায়নি, একটা কাঁটার জঙ্গলে শরীর ঢেকেছিল। ট্রেন চলে গেলে কাঁটাঝোপের আব্রু থেকে বেরিয়ে এসেছিল আবার। কিন্তু শুধু এই পর্যন্ত। এর পর আর মিল নেই। বরং কাল রাত্রে যে দুটো উট দেখেছিলাম এখন আমি তাদের মত। উট দুটো যেন মরে ফোত হয়ে যাওয়ার পরও পিঠে বিপুল ভার নিয়ে হাঁটছিল। অবশ্য এসব ভেবেও আর কিছু হবে না। এসব ভাবনাও হয়ত প্রচ্ছন্ন অহমিকা থেকে আসে। অন্তত ইন্দ্রাণী তাই বলবে। হয়ত বলবে—এসব উপমার রীতি পচে গেছে।

গল্‌ফ্‌ লিঙ্কস্‌ থেকে ফেরার পরদিনই তার আজন্ম চেনা শহর ছেড়ে যেতে চেয়েছিল, পারেনি। আরও দু'দিন দেরি হয়েছিল ট্রেনে উঠতে। ইন্দ্রাণীর অনেক ধারাল কথা শুনতে হয়েছিল পরদিন। ইন্দ্রাণী কথা বলতে শিখেছে। অবশ্য বিভাস ভাল করে কিছু শোনে নি। শুধু ভেবেছিল, তার আসল চেহারাটা দেখে ফেলতে আর কারও বাকী নেই। তবু শেষ পর্যন্ত হয়ত থেকেই যেত, লুকিয়ে কলকাতার ট্রেনে উঠে পড়তে পারত না, যদি না উকিলবাবুর মেয়ে জবা নতুন করে খুঁচিয়ে জ্বালা ধরাত। আজ আবার মাত্র একমাস পরে সেই ট্রেনে তার আজন্ম চেনা শহরে ফিরে যাবে। পালিয়ে যাওয়ার কোন মানে হয় না, ফিরে আসারও কোন অর্থ নেই। তবু ফিরে যাবে।

ইন্দ্রাণী বলেছিল—'বুঝলাম, কোন দুর্বোধ্য কারণে তোমার নিজের ওপর ঘৃণা হচ্ছে, অন্য কারও ওপর না। কিন্তু এখান থেকে চলে গেলে কি নিজের কাছ থেকে পালান যায়? নিজেকে তো পিছনে রেখে কোথাও যেতে পারছ না।'

ইন্দ্রাণী ঠিক বলেছিল সন্দেহ নেই। নিজেকে পিছনে রেখে কোথাও যেতে পারবে না। মনে হয়েছিল, তার আসল চেহারাটা দেখে ফেলতে কারও আর বাকী নেই, তবু ইন্দ্রাণী যেন সবটুকু বুঝতে পারছে না, তার যন্ত্রণার চেহারাটা দেখতে পারছে না। এক মাস আগে সেদিন জবাকে ঘরের মধ্যে রেখে অমন করে দাঁতে দাঁত চেপে বেরিয়ে না গেলে ইন্দ্রাণী হয়ত আমাকে ঠিক চিনতে পারত।

ট্রেনে উঠবার আগের দিন বিভাস ইন্দ্রাণীকে বলেছিল, 'আমি চেষ্টা করেও হাসতে পারি না। আমি আর কোনদিন হাসতে পারব না। কারণ আমি লুকিয়ে হাসতে শিখেছি।'

'কান্না আসার মত তীব্র বোধও তো তোমার আছে মনে হয় না।' ইন্দ্রাণীর কথায় সেদিন খুব ধার ছিল। 'তাছাড়া ওদু'টোর কোনটাই অত্যাবশ্যক না। ওদু'টোর কোনটাই না থাকলেও এখান থেকে চলে যাবার প্রশ্ন ওঠে না।'

ইন্দ্রাণী ইদানীং বেশ কথা বলতে শিখেছে।

আগে থেকে কোন খবর না দিয়ে হুট্ করে হাজির হওয়ায় বিতোষরা অবশ্যই অবাক হয়েছিল। তাদের আশ্চর্য লাগা খুব স্বাভাবিক ছিল। তবে তারা একটির পর একটি জেরা করে বিভাসকে বিব্রত করে নি। তারা কী ভেবেছিল, তারা নিজেদের মধ্যে কী কথা বলেছিল, বিভাস জানে না। তারা বিভাসের সঙ্গে আচরণে বুঝতে দেয়নি, অস্বাভাবিক কিছু হয়েছে। বাবাকে রেখে হঠাৎ এমন চলে আসা যেন খুব স্বাভাবিক। বাঙলা স্কুলের সেজ দিদিমণির সঙ্গে বিভাসের কখনও ঘনিষ্ঠতা ছিল না, এখনও হয় নি। বিতোষ তার নতুন চাকরি নিয়ে ব্যস্ত। বিভাসেরও হয়ত একটা চাকরি পেয়ে যাওয়া সম্ভব ছিল। তিন মাস, ছ'মাস, এক বছর অপেক্ষা করলে হয়ত একটা চাকরি পেয়ে যাওয়া অসম্ভব ছিল না। এত দীর্ঘ সময় বেকার বসে থাকলেও বিতোষ তাকে খোঁচাত না আশা হয়। বিতোষকে মনে হয় বেশ সচ্ছল। বিতোষদের ফ্ল্যাটে তার থাকবারও অসুবিধে ছিল না। দু'ঘরের ফ্ল্যাট। ওই শহরের অবিশ্বাস্য ভিড়ে তিনজনের জন্যে দু'খানা ঘর অবশ্যই সৌভাগ্য। অসুবিধে সত্যি বিশেষ ছিল না। তবু এক মাস পরে আবার ট্রেনে উঠে পড়ল। ফিরে যাবে। কোন কিছুরই যখন আর কোন মানে খুঁজে পাওয়া যায় না, তখন ফিরে না যাওয়াও অর্থহীন।

এমন ভয়ঙ্কর ভিড় বিভাস আগে কোথাও দেখেনি। মানুষ এমন পরস্পরের গায়ে ঠেসাঠেসি করে থাকতে পারে, না দেখলে বিশ্বাস হত না। রাস্তায় একটু অসাবধান হলে অন্যের সঙ্গে ধাক্কা লাগবে। সবার শরীরে যেন জ্বরের উত্তাপ, সবাই অস্থির। যে কোন মুহূর্তে নাটকের শেষ দৃশ্যের মত গুরুতর কিছু ঘটতে পারে। কী এক উত্তেজনায় সবাই যেন কাঁপছে। পুরো এক মাস বিভাস বাইরে বাইরে ঘুরেছে, ওই শহরের অন্দরে ঢোকার দরজা একবারও খুঁজে পায় নি। পুরো এক মাস শুধু বাইরে বাইরে ঘুরেছে, মনে হয়েছে, যে শহরে ঋতু বদলায় দোকানের জানলায় তার কোথায় যেন বিচিত্র তীক্ষ্ন কঠিন সুন্দর এক প্রাণ আছে, যার খোঁজ বিভাস একবারও পায় নি।

প্রথমে চমকে গিয়েছিল, তারপর বরং উৎসাহিত হয়েছিল বিভাস। ভেবেছিল, ওই ভিড়ে জড়িয়ে যাবে। নিজের দিকে তাকিয়ে তাকিয়ে মন তেতো হয়ে যাবে না, কারণ নিজের দিকে তাকাবার অবকাশ মিলবে না। পরে বুঝেছিল, ইন্দ্রাণী ঠিকই বলেছিল। নিজেকে পিছনে রেখে কোথাও যেতে পারবে না।

কতকাল আগে ওই শহরেই তার বাবা ছিলেন ছোটবেলায়। বিতোষের কৈশোর আর প্রথম যৌবন ওই শহরে কেটেছে। অন্য কোথাও গেলে বিতোষ প্রবাসীর মত থাকে। এখন আবার ওখানে ফিরে গিয়ে বেঁচেছে। অথচ বিভাস ওখানে হাত বাড়িয়ে ধরবার মত কিছু পেল না। নিজেকে ধরে ফেলে, নিজের আসল চেহারাটা ধরা পড়ে যাওয়ায়, শুধু আরও বেশি করে লুকিয়ে হাসতে শিখেছে। পুরো এক মাসে বিতোষরা ছাড়া আর একজনের সঙ্গেও ভাল করে আলাপই হল না। দু'একজনের সঙ্গে একআধটু কথা বলে দেখেছে, খুব মসৃণ আচরণ। এক টুকরো স্নিগ্ধ অথচ মাপা হাসি উপহার দিয়েই শেষ। আসলে ওখানে ব্যস্ততা অনেক বেশি। দরবারী মেজাজ, ঢিলেঢালা ভাবও নিশ্চয়ই আছে। কিন্তু বিভাস এক মাসে তার খোঁজ পায় নি।

বিতোষদের ঘর দু'খানা যেন কারও দিনরাত থাকবার জন্যে না, শুধু দু'খানা ঘরের একটা নক্‌শা। কোথাও এতটুকু খুঁত নেই, একবিন্দু বাড়তি নেই। যেন পরে কখনও ঘর তৈরি হবে, এখন শুধু নক্‌শা। ঘর দু'খানার সঙ্গে তাদের পুরনো একতলা ন্যাড়া

ছাতের বাড়িটার তুলনা করলে চোখ গোল গোল হয়ে আসে। বাবাকে বলে এসেছিল—এমনিই বিতোষের ওখানে বেড়াতে যাচ্ছে। আবার সেই ছায়াছায়া ঠাণ্ডা বাড়িতে ফিরে যাবে। তিনি কিছু বুঝতে পারবেন না। বিভাস যে সত্যিই শেয়ালের মত পালাবে, গল্‌ফ্‌ লিঙ্কস্‌ থেকে ফেরার দু'দিন পরে লুকিয়ে ট্রেনে উঠে পড়বে, ইন্দ্রাণী ভাবেনি। ইন্দ্রাণী আমার যন্ত্রণার চেহারাটা সবটুকু দেখতে পারছে না।

কারও প্রিয় নাম ট্রেনের শব্দের সঙ্গে মিলিয়ে দেবার খেলাটা আর সবার মত বিভাসও ছোটবেলা থেকে জানত। তখন সকালবেলার রোদে ভিজে ঘাসে ঢাকা উধাও মাঠের ঢেউয়ের দিকে তাকিয়ে মনে মনে ইন্দ্রাণীর নাম উচ্চারণ করে দেখল, মোটেই মিলছে না। নামটাতে বড় বেশি ধ্বনির ভার। ছেলেমানুষি খেলাটা এখন আবার কেন মনে এল। তার এমন করে চলে আসা এবং এক মাস পরে আবার ফিরে যাওয়াই যথেষ্ট হাস্যকর ছেলেমানুষি।

জানলার কাচটা ঠিক স্বচ্ছ না, অনেক জলের দাগ এবং খুব অপরিচ্ছন্ন। কাল রাত্রে এই কাচের জানলার মধ্য দিয়ে প্রাগৈতিহাসিক জানোয়ারের পিঠের মত অসমতল মাঠ, সযত্ন-লালিত ফলের বাগান, ছড়ান ছিটোন জঙ্গল, কাঁটাঝোপ—সব গলে গলে পরস্পরের অঙ্গে অঙ্গে মিশে একাকার হয়ে গিয়েছিল। জানলার ফ্রেমে মাথা রেখে চোখ বন্ধ করেছিল বিভাস, উথালপাতাল অন্ধকারে ডুব দিয়েছিল। কৈশোর যৌবন, দৃশ্য দৃশ্যান্তর সব গলে গলে পরস্পরের অঙ্গে অঙ্গে মিশে একাকার হয়েছিল। কাল ট্রেনের কামরার বাইরে ঝাঁঝাঁ রাত দুপুরের হাওয়ায় শেষ হেমন্তের হিম ছিল। এখন সকালবেলার নরম রোদ। সামনের বেঞ্চের বছর দশেকের ছেলেটা উঠে বসেছে এই মাত্র। মেদের ভারে কাহিল মহিলাটি বেঞ্চে পিঠ রাখবার জায়গাটায় মাথা ঠেকিয়ে এতক্ষণে বুঝেছেন, আর ঘুমের চেষ্টা করা চলে না। ড্যাক্রনের ট্রাউজার পরা লোকটি ক্রমাগত চুলে চিরুনি চালাচ্ছেন। বিভাস জানলার কাচের পাল্লাটা তুলে দিল। মনে হল, এখন আর কারও অসম্মতি নেই।

কয়েকটা পিঁপড়ে সত্যিই এসেছে। কেমন করে এল, ভাবলে আশ্চর্য লাগে। মরা পোকাগুলোর শুকনো চিকন ডানা কুচি কুচি করে কাটছে। দেশলাইয়ের কাঠি জেবলে কাঠের ফাঁকে ফেলে দিলে হয়। মরা পোকাগুলোর শুকনো চিকন ডানা আর হাভাতে পিঁপড়েগুলো পুড়বে। অবশ্য কাজটা বেআইনী এবং বিপজ্জনক। সামনের মহিলাটি নিশ্চয়ই খেঁকিয়ে উঠবেন। এমন একটা কাজ করার মত নিষ্ঠুরতা শিশুদের থাকে। কৈশোরেও কারও কারও থাকে। বিভাসের শৈশব এবং কৈশোর অনেক দূর। উত্তর তিরিশের ট্রেন সব দরজা খুলে স্টেশনে দাঁড়িয়ে আছে। অবলীলায় উঠে পড়া যায়। এবং উঠে পড়তে আর তেমন বাকী নেই। একবার ন্যাড়া ছাতে গম্বুজের ছায়ায় এক ঝাঁক পিঁপড়ে দেখেছিল। অত তাড়াতাড়ি অত পিঁপড়ে যে কেমন করে এল, ভাবলে আশ্চর্য লাগে। উড়তে শেখার আগে একটা আবাবীল উঁচু থেকে পড়ে ফেটে গলে গিয়েছিল। সঙ্গে সঙ্গে একটা অন্য কোন বড় পাখি ছোঁ মেরে নিয়ে গিয়েছিল সেটাকে। তবু ছাতের কাল রঙে জলের মত কী যেন লেগেছিল। সেখানে এসে জমেছিল এক ঝাঁক পিঁপড়ে। রাজাপুর কবরখানায় মা'র কবরে ফুল রাখার সময় পিঁপড়ের একটা ঘন মোটা সার দেখেছিল। বৃষ্টি জোরে নামলে কি কয়েকটা পিঁপড়ের গলা ছিঁড়ে যায়নি। একটা বুনো পোকা পায়ের ওপর উঠেছিল। এসব কেন যে এখন মনে পড়ছে!

ভেবে দেখল, খুব ছোটবেলায় বিভাসের এমন নিষ্ঠুরতা ছিল না। অথচ শিশুদের অনেকেরই থাকে। এখন এই বয়েসে ইচ্ছে হল দেশলাইয়ের কাঠি জেবলে কাঠের ফাঁকে

ফেলে দেবে। অবশ্য ফেলে দেওয়া হল না। ইচ্ছেটাকে মনে মনে প্রশ্রয় দিল কিছুক্ষণ। শুধু সিগারেট ধরাতে গিয়ে ডান হাতের একটা আঙুলে একটু বেশি তাপ লেগে গেল।

ট্রেনটা থামল। মোগলসরাই। এই স্টেশনের নামটার পুরনো অনুষঙ্গ কৈশোরে বিভাসকে টানত। এখানে ট্রেন প্রায় আধঘণ্টা দাঁড়াবে। ট্রেন প্রায় খালি করে সবাই লাফিয়ে লাফিয়ে নামছে। আবার ট্রেনে ওঠার আগে শরীর থেকে সারা রাতের ক্লান্তি আধঘণ্টায় ঝেড়ে ফেলবে। প্ল্যাটফর্ম থেকে এই সংক্ষিপ্ত অবসরে যতটুকু পারে সুখ কুড়িয়ে নেবে।

পাশের কামরার মেয়েরা তাদের দলের ছেলেদের প্রসারিত বাহু আশ্রয় করে ঝাঁপিয়ে ঝাঁপিয়ে নামল। এক ঝাঁক সাদা আর বাদামী বুনো হাঁস জঙ্গলের আব্রু থেকে বেরিয়ে এসে এইমাত্র জলে নামল। তারা কী করে যেন বুঝতে পেরেছে, আশপাশের সবাই চোখ রেখেছে তাদের ওপর। তারা ঠিক বুঝতে পারে, আশৈশব অভিজ্ঞতা থেকে বুঝতে পারে। কী করে যেন বুঝেছে, সেই সব চোখের সুখের জন্যে সব সময় দর্শনীয় কিছু করার দায়িত্ব একমাত্র তাদের। ছেলেদের এবং দুজন অধ্যাপিকা আর একজন অধ্যাপকের অঙ্গে যথেষ্ট পোশাক। শুধু মেয়েদের প্রত্যেকের জুতোর ওপর থেকে শুরু করে পায়ের ঊর্ধ্ব প্রত্যন্ত পর্যন্ত একেবারে আদুড়। কাল রাত্রে যখন এদের দেখেছিল, অনেক কুয়াশার পরত ডিঙিয়ে আসা নীলাভ আলো ছিল। এখন সকালবেলার রোদ। বেলা বাড়ছে। রোদ আর বেশিক্ষণ নরম থাকবে না। গালের আর জানুর অবারিত ঊর্ধ্বভাগ মোমের মত গলে যাবে।

কয়েকজন নীল শার্ট-প্যান্ট পরা কনিষ্ঠতম রেলকর্মী আর অন্য যারা এই পরস্পরের গায়ে ঢলঢলে পড়া মেয়েদের হাঁ করে দেখছে তাদের চোখেমুখে বেহায়াপনা থেকে, হ্যাংলামি থেকে বিস্ময় বেশি। আরও অনেকে এই মেয়েদের দেখছে, বিভাসও। তবে অমন হাঁ করে দেখছে না। এখন কারও সঙ্গে তর্ক করার মেজাজ থাকলে বিভাস বলত—ওই লোকগুলোকে ঘেন্না করার কোন মানে হয় না। এই বুনো হাঁসের মত অস্থির উদম এবং সুন্দর মেয়েরা ওদের প্রাত্যহিকতায় প্রচণ্ড আঘাত। এই মেয়েদের সঙ্গে ওদের দুস্তর ফারাক মাপতে গিয়ে ওদের ঠোঁট ফাঁক হয়ে দাঁত বেরিয়ে এসেছে। এমন হাঁ করে দেখা খুব স্বাভাবিক।

এই মেয়েদের এই ছেলেদের দেখলে বুঝতে পারি আমার বয়েসটা ওইখানে এসে থেমে যায়নি। মাঝে মাঝে একটা মিথ্যে ভয় হয়। ওই বয়েসেও অমন অস্থির ছিলাম না। অমন দর্শনীয় হবার বাসনা কোন দিন ছিল না। ইন্দ্রাণীও ওই বয়েসে অমন ছিল না। বিজয়-প্রতাপ হয়ত ছিল। তা হলে কি বাসনাটা আমারও ছিল, শুধু সাধ্য ছিল না। আমার বয়েস সত্যিই বেড়েছে। এক জায়গায় এসে থেমে যাওয়ার ভয়টা মিথ্যে। তা না হলে এই প্রায় আধঘণ্টায় একবারও প্ল্যাটফর্মে নামবার ইচ্ছে হল না কেন। হাতপায়ে খিল ধরে গেছে। একবার প্ল্যাটফর্মে নামলে একটু ভাল লাগত সন্দেহ নেই।

চা বিস্বাদ মনে হল। কুলহাড়ে পোড়ামাটির গন্ধ। চায়ের সঙ্গে অন্য কিছু নিলে হত। অথবা সাদা উর্দিপরা যে লোকগুলো কাঁধের ট্রেতে সাদা পেয়ালা পিরিচ নিয়ে ছুটছে তাদের একজনকে চা দিতে বললে হত। কিন্তু এখন আর সময় নেই। কাল সন্ধ্যেয় বিতোষদের বাড়ি থেকে বেরোবার পর চা ছাড়া আর কিছু খায়নি।

ট্রেন ছাড়ল। আর ঘণ্টা তিনেক। তারপর সেই শহর যা তাকে পুড়িয়ে ছাই করেছে। ফিরে যাবার কোন অর্থ নেই। তবু ফিরে যাবে। এখন থেকে সেই শহর তাকে দেখে দেখে

শুধু হাসবে। তবু ফিরে না যাওয়াও হাস্যকর ছেলেমানুষি।

কামরার মধ্যে চোখেমুখে জল দেওয়া সম্ভব না। এই ভিড় ঠেলে এগোনোর উৎসাহ নেই। আগের স্টেশনের প্ল্যাটফর্মে নামা উচিত ছিল। চুলের মধ্যে কয়লার গুঁড়ো, হাত-মুখ চিটচিট করছে। থুতনির কর্কশ দাড়িতে বাঁ হাতের উল্টো পিঠ ঘষল। আর পাঁচ বছরে সামনের বেঞ্চের ছেলেটার চিবুকে রেশমের রোঁয়া উঠবে। সিগারেট ধরাতে গিয়ে একটা আঙুলে একটু বেশি তাপ লেগেছিল। এখনও জ্বলছে। নখ দিয়ে অনেক বালি খুঁড়লে অবশেষে আঙুলের ডগা জ্বালা করে।

হয়ত শেষ পর্যন্ত ইন্দ্রাণীকে এড়িয়ে ট্রেনে উঠে পড়তে পারত না, যদি না জবা নতুন করে খুঁচিয়ে জ্বালা ধরাত। এক মাস আগে সেদিন দুপুরটা দুঃসহ ছিল। ভাবছিল, যে কোন মুহূর্তে ইন্দ্রাণী আসবে। ইন্দ্রাণী এল না। তার বদলে এল জবা। বেড়ালের মত নিঃশব্দে তার নির্জন ঘরে এল। জবার হাতে তার ঘর থেকে নেওয়া একখানা বই ছিল। ঘরের একমাত্র চেয়ারটায় বিভাস নিজে বসেছিল। তাকে উঠবার সময় না দিয়ে বিছানার পাশে পা ঝুলিয়ে বসল জবা।

মেয়েটা নিশ্চয়ই আয়নার সামনে দাঁড়িয়ে মক্‌শ করে দেখেছে, ঠিক কোন্ ভঙ্গীতে তার শরীর সব থেকে তীক্ষ্ণ হয়। শিয়রের দিকে একটু সরে গিয়ে হাত বাড়িয়ে জবা শেলফ থেকে আর একটা বই টেনে নিল। আগের বইখানা রেখে দিল শেলফে। চোখে ঠোঁটে অবিশ্বাস্য মোচড় দিয়ে হাসল। বলল, 'আজ এই বইটা নেব।' যেন বিভাস গ্রন্থাগারিক আর এই ঘরে থরে থরে মুখরোচক বই সাজান আছে।

বই হাতে নিয়ে আজ খোলা পাতায় চোখ আটকে রাখল না জবা। বারেবারে চোখের কোণ দিয়ে বিভাসের দিকে ফিরে ফিরে তাকাল। অথচ অন্যদিন জবা এমন করে না। খোলা পাতায় মুখ থুবড়ে পড়ে থাকে। ভাবে, বিভাস তার শরীরের ডৌল দেখছে। অন্য দিন বিভাসের বলতে ইচ্ছে করে—আমার কাছে কিছু চেও না। ইতিমধ্যে আমি উচ্ছিষ্ট হয়ে গিয়েছি, রস নিংড়ে নেওয়া আখের সাদা ছিবড়ের স্তূপের মধ্যে আমার ছিবড়েটাও ছুড়ে ফেলে দেওয়া যায়।

সেদিন খোলাপাতায় চোখ আটকে রাখতে পারল না জবা। সেদিন দুপুরে তার সেই বয়েসের ভার অসহ্য হয়েছিল। যেন নিজের শাড়ি সামলাতে নাজেহাল হয়ে বিভাসকে ডাকল—'এখানে একটু আসুন তো।' এমনভাবে ডাকল যেন বিভাস তার ক্রীতদাস। অথচ ঠিক সই সময় জবার গলায় বিচিত্র প্রার্থনা, তার চোখ আশ্চর্য বিষণ্ণ।

বিভাস চেয়ার থেকে উঠে দু'পা এগিয়ে এসে দাঁড়াল।

'এ কী! আপনার হাতে কী হয়েছে?' কথায় প্রচুর বিস্ময়, অথচ জবা মোটেই গলা চড়াল না।

'ও একটু ছড়ে গেছে।' বিভাস অন্য দিকে মুখ ফেরাল।

ঠিক তখন জবা উঠে গিয়ে দরজাটা বন্ধ করে ফিরে এসে বসল।

ভুরু কুঁচকে বিভাস বলল, 'দরজা বন্ধ করলে কেন?'

'এমনি।' জবা কেমন করে যেন হাসল। কেঁপে কেঁপে দুটো পুরু ঠোঁট সরে গেলে দাঁত দেখা গেল। বিছানায় গা এলিয়ে দিল জবা। সেই দুঃসহ দুপুরে তার সেই বয়েসের শরীর ঢেউ হল।

দাঁতে দাঁত চেপে ঘর থেকে বেরিয়ে গেল বিভাস। দরজা খুলে বেরোবার সময়

পিঠের ওপর কী একটা এসে পড়ল। বিছানা থেকে জবা বইটা ছ‍ুড়েছে, ব‍ুঝতে পারল।

বারান্দা থেকে লাফিয়ে নেমে স্ট্রেচি রোড ধরে জোরে হাঁটছিল। অকারণে জোরে হাঁটছিল। অনেক দ‍ূর এসে হঠাৎ মনে হয়েছিল, জবা মেয়েটা বেশ, চর্বির বড়ার মত। আর ঠিক সেই সময় ব‍ুঝেছিল, তার মধ্যে যে র‍ুগ্ন দ‍ুর্বল জানোয়ারটা আছে সেটা আবার বেরিয়ে এসেছে। আমি বন্ধ দরজা খ‍ুলে বাইরে এলাম। অথচ ভাবছি, জবা ঢেউ হতে জানে। বিজয়প্রতাপ হলে বন্ধ দরজা খ‍ুলে বাইরে আসত না, অনেক দ‍ূর এসে ভাবত না জবার শরীর ঢেউয়ের মত, বরং নিজে দরজা বন্ধ করত। আমি যদি বন্ধ দরজা খ‍ুলে বাইরে না আসতাম, যদি বিজয়প্রতাপের মত নিজের হাতে দরজা বন্ধ করে দিতে পারতাম, তাহলে হয়ত আমাকে ঠিক চিনতে পারত ইন্দ্রাণী। অথবা যদি কাল রাত্রে দেখা শেয়ালটার মত পালিয়ে না গিয়ে, জবাকে সঙ্গে নিয়ে পালাতে পারতাম, তাহলে হয়ত আমাকে চিনতে পারত ইন্দ্রাণী। আমি বিজয়প্রতাপ হতে পারি না। তব‍ু আমি এক র‍ুগ্ন দ‍ুর্বল অক্ষম বিজয়প্রতাপ! ইন্দ্রাণী আমাকে ঠিক চিনতে পারছে না।

বিকেলের দিকে একবার বাড়ি ফিরে, ইন্দ্রাণীকে এড়িয়ে সন্ধ্যোয় ট্রেনে উঠে পড়েছিল বিভাস।

চুলের মধ্যে অজস্র কয়লার গ‍ুঁড়ো। হাতম‍ুখ চিটচিট করছে। বিভাস ভেবেছিল, প্ল্যাটফর্মে নেমে চোখে ম‍ুখে জল দেবে। কিন্তু কোন্ স্টেশন গেল হিসেব রাখেনি। মীর্জাপ‍ুর নিশ্চয়ই পিছনে ফেলে এসেছে।

ট্রেন ঢিমেতালে চলছে। এখন আর গতি বাড়বে না। সামনে সেই জংশন। সামনে সেই শহর যা তাকে প‍ুড়িয়ে ছাই করে হাওয়ায় উড়িয়ে দিয়েছিল। আবার সেই আজন্ম চেনা শহরে ফিরে যাচ্ছি। অকারণে একমাস দৌড়ের কসরত দেখিয়ে ফিরে আসতে আমার লজ্জা নেই, আমার ফিরে আসার আনন্দও নেই। আসলে আমার অন‍ুভবের ধার মরে গেছে। এখন আর কোনদিন কেউ আমার দিকে একবার তাকিয়ে চমকে উঠে বলবে না—'তুই যেন কাঁপছিস! কাঁপছিস নাকি?' অন‍ুভব আর কোনদিন এত তীব্র হবে না যে সারা গায় কাঁপ‍ুনি ধরবে।

জানলা দিয়ে বিভাস বাইরে তাকাল। একান্ত পরিচিত নিসর্গ। তাহলে সত্যি ফিরে এলাম! রোদ আর নরম নেই। প্রায় মধ্যাদিন। সামনে তার আজন্ম চেনা শহরের উদ্ধত চ‍ূড়োগ‍ুলো ঝলসাচ্ছে। পাথরের ট‍ুকরো ছড়ান মাটিতে পাঁজরার হাড়ের মত অগ‍ুনতি ধাতব সরলরেখা।

বিতোষের বাড়ি ছাড়বার কয়েক দিন আগে মালবিয়াজীকে একখানা চিঠি লিখেছিল। জানিয়েছিল, আজ ফিরবে। এই এক মাসে আমি কি কখনও ভেবেছি, ইন্দ্রাণীর চিঠি আসতে পারে। ইন্দ্রাণী আমার ঠিকানা জানত। অন্তত জেনে নেওয়া কঠিন ছিল না। ইন্দ্রাণী চিঠি লেখেনি।

প্রচুর ভূমিকা করে অবশেষে ট্রেন থামল। সঙ্গে সঙ্গে দশ বার জন কুলী আক্রমণ করল কামরাটা। বিভাসের কাছে ভারী কিছ‍ু নেই। বেঞ্চের ওপর পা গ‍ুটিয়ে বসল। যাদের নামবার নেমে যাক। ভিড় পাতলা হোক। এখানে ট্রেন প‍ুরো আধঘণ্টা থেমে থাকবে।

দশ মিনিটে কামরাটা খালি হয়ে গেল। বিভাস নেমে এল প্ল্যাটফর্মে। প্রায় শ‍ূন্য প্ল্যাটফর্ম। খানিক দ‍ূরে মালবিয়াজী দাঁড়িয়েছিলেন। তাঁর পাশে ইন্দ্রাণী। মালবিয়াজী

এগিয়ে এসে বিভাসের হাত ধরলেন। হেসে বললেন, 'আমি ভাবছিলাম তুমি বুঝি আজ আর এলে না।' আহা, আমি যেন বীর সেনাপতি, রাজ্য জয় করে এলাম।

মালবিয়াজীর হাতে জোরে চাপ দিয়ে বিভাস ইন্দ্রাণীকে বলল, 'তুমি কী করে জানলে আমি আজ ফিরছি?'

ইন্দ্রাণী কিছু বলল না, শুধু ইঙ্গিতে মালবিয়াজীকে দেখাল। অর্থাৎ তাঁর কাছ থেকে জেনেছে। ইন্দ্রাণীর রুক্ষ্ম চুল উড়ছে, তার শাদা চিকন কাজ করা শাড়িটার কোথাও সামান্য মৃদু রঙও নেই।

স্টেশন বাড়িটা একেবারে নতুন। পুরনো বাড়ি ভেঙ্গে দিয়ে নতুন অ্যামেরিকান নক্‌শায় তৈরি করা হয়েছে। বাড়িটার সর্বাঙ্গে উজ্জ্বল রঙ। সেই ডলারের গন্ধটা যেন নাকে লাগছে। এখানেও কয়েকটা আবাবীল এসে জুটেছে। খড়কুটো এনে জমিয়েছে অনেক উঁচু কোটরে। এইমাত্র একটা মাথার ওপর দিয়ে হাওয়া কেটে উড়ে গেল। এই পাখিগুলোর নাম আবাবীল হল কেন। হয়ত আসল নাম হাওয়া-বিল। আবাবীল তার আটপৌরে সংস্করণ।

বাইরে এসে মালবিয়াজী তাঁর নিজের সাইকেলে চেপে চলে গেলেন। সাইকেলে চাপবার সময় বলে গেলেন, 'তোমরা কাল পরশু একবার এস আমার বাড়ি।'

ইন্দ্রাণী আর বিভাস একটা টাঙায় উঠে বসল। বসেই ইন্দ্রাণী বলল, 'তোমার মেজাজটা বেশ নাটুকে!'

'তার মানে?'

'তার মানে বুঝতে পারছ না? আমাকে জানিয়ে গেলে কী ক্ষতি হত?' ইন্দ্রাণী হাসছে।

এখন আমারও একটু হাসতে পারা উচিত। বিভাস টাঙার রুগ্ন ঘোড়াটার দিকে তাকিয়ে হাসল। হাসিটা দেখাল কান্নার মত। হাসতে গিয়ে গালের পেশীতে একটু টান লাগল।

# বাংলার শিক্ষাচিন্তা

**ভবতোষ দত্ত**

অষ্টাদশ শতাব্দীতে যে ইংরেজ আমাদের দেশে এসেছিল, নবযুগের বাণী আমরা তার কাছ থেকে পাইনি। আমাদের জীবনের সঙ্গে সে ঘনিষ্ঠ হয়ে উঠতে পারেনি, তাদের সভ্যতার মানসসম্পদকে আমাদের মধ্যে ছড়িয়ে দেবার কোনো উপায় সে উদ্ভাবন করতে পারেনি—এ বিষয়ে তাদের যোগ্যতাও ছিল কিনা সন্দেহ। যেটুকু সংঘাত তারা সৃষ্টি করেছিল, সে ছিল বাইরের জীবনে—অর্থনীতি বা রাজনীতির ক্ষেত্রে। যে নবযুগ আমাদের গৌরবের বস্তু, তার সূচনা হয়েছে উনবিংশ শতাব্দীতে এবং এটা সম্ভব হয়েছিল নতুন ধরনের শিক্ষানীতিতেই। ইংরেজ আমাদের দেশে বাণিজ্যবিস্তার করে অর্থ আকর্ষণ করে নিয়েছে কিন্তু সেকালে এর জন্যে ক্ষোভ তীব্র হয়ে ওঠেনি কারণ তাদের সংসর্গের একটি অভাবিতপূর্ব মহৎ ফল আমাদের করায়ত্ত হল। ইংরেজ শাসনের ফলস্বরূপ শিক্ষার সাহায্যে আমরা যদি এই সম্পদ না পেতাম তবে বিশুদ্ধ ব্যবসায়ী এবং শাসক ইংরেজকে সহ্য করা কঠিন হত।

যুগান্তরের অমোঘ উপায় ছিল শিক্ষা। শিক্ষাই হচ্ছে সেই উপায় যার সাহায্যে নতুন রুচি এবং সংস্কারকে দৈনন্দিন জীবনের সঙ্গে এক করে নেওয়া চলতে পারে। রাজকীয় নির্দেশ দ্বারা জীবনের মূল্যবোধ তৈরি করা যায় না। সে কেবল বাইরের কর্তব্য হবে মাত্র। প্রথম যুগে শাসক সম্প্রদায় এ দেশের জীবনাদর্শে এতটুকু হস্তক্ষেপ করতে চায়নি বরং প্রচলিত রাজনীতিকে অক্ষুণ্ণ ও উৎসাহিত করতে চেয়েছিল। কাশীতে সংস্কৃত কলেজ প্রতিষ্ঠা (১৭৯২) এবং কলিকাতায় মাদ্রাসা প্রতিষ্ঠা (১৭৮১) করে তারা প্রাচীন ধারাকে রক্ষা করবার চেষ্টা করেছিল। ফোর্ট উইলিয়ম কলেজ (১৮০০) স্থাপিত হয়েছিল দেশী ভাষা শিক্ষার দ্বারা শাসন পরিচালনার সুবিধার জন্যই। বস্তুত ১৮৩৫ খ্রীস্টাব্দের পূর্বে ইংরেজ শাসক শিক্ষানীতিতে কোনো সুস্পষ্ট পন্থা অবলম্বন করেনি। পাশ্চাত্ত্য শিক্ষার উৎকর্ষ সম্বন্ধে তাদের সন্দেহ না থাকলেও সেই শিক্ষার প্রত্যক্ষ আনুকূল্য করতে তাদের দ্বিধার সীমা ছিল না।

যে পাশ্চাত্ত্য শিক্ষার সাহায্যে আমাদের মনোজগতে নবযুগ এসেছে বলে আমরা মনে করি, সে সম্বন্ধে নীতি কিভাবে স্থিরীকৃত হয়েছে, সেটা জানা বিশেষ কৌতূহলের বিষয়ই হবে। এই নবযুগকে কে কিভাবে সার্থক হতে দেখতে চান, তারই উপর আমাদের কর্মকীর্তির সাফল্য নির্ভর করছে। রবীন্দ্রনাথকে বাংলার নবযুগের পরিণততম ফলরূপে গ্রহণ করা হয়। নবযুগের শিক্ষানীতির কল্পনাই বা তাঁর কি ছিল ঐতিহাসিক পটভূমিতে তার পর্যালোচনা বিশেষ অর্থপূর্ণ। শাসক সম্প্রদায়ের শিক্ষানীতি এবং চিন্তানায়কদের শিক্ষানীতি সর্বাংশে যে মিলবে, তা নাও হতে পারে। যাঁরা সত্যকার চিন্তাশীল মনীষী, দেশের সমাজপ্রকৃতির দিকে তাকিয়ে যাঁরা জাতির ভবিষ্যৎ চিন্তা করেছেন তাঁদের আদর্শই আমাদের বিবেচ্য। নবযুগের বাণীকে তাঁরাই গ্রহণ করেছেন, বুঝতে চেষ্টা করেছেন, তাঁদের স্বপ্ন ও সাধনার সঙ্গে শাসনকর্তৃপক্ষের উদ্দেশ্য স্বভাবতই মেলেনি।

উনবিংশ শতাব্দীর গোড়ার দিকে যে সব নতুন শিক্ষাদান প্রচেষ্টা হয়েছে, তার সংবাদ

কিছু কিছু আমাদের জানা থাকলেও শিক্ষার উদ্দেশ্য সম্পর্কে সুস্পষ্ট ধারণা তখনও গড়ে ওঠে নি। আজ আমরা বুঝতে পারি আধুনিক-পূর্ব যুগে এবং আধুনিক যুগে শিক্ষার উদ্দেশ্যই ছিল ভিন্ন। প্রাচীনকালে শিক্ষা দুটি পর্যায়ে বিভক্ত ছিল। সাধারণ পাঠশালায় শিক্ষা দেওয়া হত অক্ষরজ্ঞান, রামায়ণ-মহাভারত বা মঙ্গলকাব্য পড়া বা নকল করার মতো বিদ্যা। ব্রাহ্মণ ইত্যাদি উচ্চতর বর্ণ পড়ত সংস্কৃত—কাব্যসাহিত্য ন্যায় স্মৃতি ইত্যাদি। তাদের শিক্ষা সম্পূর্ণ হত শাস্ত্রজ্ঞান লাভের যোগ্যতা-অর্জনে। জীবনের উচ্চতর আদর্শ বা মূল্যবোধ এইভাবেই তারা লাভ করত। কিন্তু এই শিক্ষা আসলে বন্ধ্যা—বুদ্ধিবৃত্তিকে শাণিত করলেও উন্মুক্ত করে না, কেননা পরিবর্তনশীল জীবনধারার সঙ্গে তার কোনো যোগ নেই। সাধারণ মানুষ জীবনাচরণের আদর্শ পেত রামায়ণ মহাভারত পাঁচালী ইত্যাদি থেকে। বলা বাহুল্য এ শিক্ষার লক্ষ্যও সীমাবদ্ধ। কেননা প্রত্যক্ষ জীবনের সমস্যা কৌতূহল এবং জিজ্ঞাসার সঙ্গে তারও কোনো যোগ নেই। মুসলমান রাজত্বকালে হিন্দুরাও রাজকার্যে নিযুক্ত হত, সেজন্য ফারসী জানা আবশ্যক ছিল। কিন্তু ফারসী সংস্কৃতি থেকে কোনো নতুন চেতনা তাদের মধ্যে দেখা দিয়েছিল কিনা সন্দেহ। এ ছিল বাইরের ব্যবহার্য বস্তু, অন্দরমহলে তার স্থান ছিল না। তার কারণ বোধহয় ধর্ম ও নীতি-বোধে দুই সম্প্রদায়ের আদর্শই ছিল অটল। তাদের সামনে আর কোনো মান ছিল না যা দিয়ে আপন আপন ধর্মসর্বস্বতার শেষ সার্থকতা নির্ণয় করে নিতে পারত। এই নতুন মানটি আমরা পেয়েছি আধুনিক কালে। একে আয়ত্ত করার শিক্ষাই আধুনিক শিক্ষা। নতুন মানটি যে কি, সেটা ব্যাখ্যা করতে গেলে আমাদের অনেকটাই প্রসঙ্গ ত্যাগ করতে হয়। সংক্ষেপে বলতে গেলে ইহজগৎ সম্বন্ধে বিস্ময় কৌতূহল, বিশ্বের ধর্ম ও সম্প্রদায়-নিরপেক্ষ নীতিনিয়মের আবিষ্কারই হচ্ছে আধুনিক প্রবণতা। রবীন্দ্রনাথের ভাষায় বলতে গেলে—'য়ুরোপের সংস্রব একদিকে আমাদের সামনে এনেছে বিশ্বপ্রকৃতিতে কার্যকারণ-বিধির সার্বভৌমিকতা; আর একদিকে ন্যায়-অন্যায়ের সেই বিশুদ্ধ আদর্শ যা কোনো শাস্ত্রবাক্যের নির্দেশে, কোনো চিরপ্রচলিত প্রথার সীমাবেষ্টনে কোনো বিশেষ শ্রেণীর বিশেষ বিধিতে খণ্ডিত হতে পারে না।'

যে নীতি বিশেষ একটা সমাজের নয়, যে সত্য বিশেষ এক ভৌগোলিক সীমাখণ্ডের নয়, তাকে জানতে গিয়ে নতুন করেই আরম্ভ করতে হল। কিন্তু শিক্ষা বলতে গেলে যে এই জানাকেই বোঝায়, সেকথা সচেতনভাবে প্রথমেই যে কারও মনে উদিত হয়েছিল তা নয়। খ্রীস্টান মিশনারীরা তাদের সংকীর্ণ প্রয়োজন সাধনের উদ্দেশ্য দিয়ে পরোক্ষে এর সূচনা করেছিল। এ দেশে এসে তারা একটা নতুন নৈতিক বুদ্ধিকে জাগাতে চেষ্টা করেছিল। যদিও সেটা খ্রীস্টীয় নীতিবোধ তবু এর মধ্যেই ছিল এমন মানবতার বাণী যা রেনাশাঁসের পর য়ুরোপে পরীক্ষিত হয়েছে। বিদেশী ধর্মপ্রচারকেরা আমাদের সামাজিক আচার-অনুষ্ঠানের অর্থহীনতা প্রতিপন্ন করবার জন্যই শিক্ষাবিস্তারের আয়োজন করেছিল। মনে রাখতে হবে সর্বদাই এটা নিছক 'খ্রীস্টানি' শিক্ষা ছিল না। তাহলে পাদ্রীদের প্রভাব একেবারেই অগ্রাহ্য হত। সেই য়ুরোপীয় নীতিবোধ যার পেছনে এক ধরনের সর্বমানবিক যুক্তির ভিত্তি আছে, পাদ্রীরা তাকে প্রচলিত করতে চেয়েছিল। এইজন্যই রামমোহনকেও তারা প্রথমে বন্ধুরূপেই পেয়েছিল।

খ্রীস্টান নীতিবোধের সঙ্গে আধুনিক শিক্ষানীতির এই নিগূঢ় যোগ ছিল বলেই শিক্ষাতত্ত্ব সম্বন্ধে আলোচনার সূত্রপাত পাদ্রীদের মধ্যেই প্রথম হয়েছিল। ১৮১৭ খ্রীস্টাব্দে

শ্রীরামপুরের ডাক্তার জশুয়া মার্শম্যান *Hints Relative to Native Schools* নামে একটি মূল্যবান্ গ্রন্থ প্রকাশ করেন। তাতে তিনি জাতীয় শিক্ষার আদর্শ প্রথম উপস্থাপিত করলেন। তাতে তিনি বলেছিলেন—

A peasant, or an artificer, thus rendered capable of writing as well as reading his own language with propriety and made acquinted with the principles of arithmetic, would be less liable to become a prey to fraud among his own countrymen, and far better able to claim for himself that protection from oppression which it is the desire of every enlightened government to grant.[১]

যদিও সাধারণভাবে স্বাক্ষর করে তোলাই ছিল তাদের মুখ্য উদ্দেশ্য, কিন্তু পরোক্ষ উদ্দেশ্য ছিল নতুন ধরনের নীতিবোধের উন্মেষসাধন। এদেশের আচার-আচরণ পাদ্রীদের কাছে অনেকটাই অর্থহীন। এই অর্থহীনতাটুকু বুঝতে দেওয়াই ছিল তাদের শিক্ষানীতির লক্ষ্য।

মনে রাখতে হবে পাদ্রীরা এদেশে নবযুগ নিয়ে আসবার সচেতন উদ্দেশ্য নিয়ে আসেনি। সর্বব্যাপী পুনরুজ্জীবন ঘটানো তাদের লক্ষ্য ছিল না। তারা এসেছে খ্রীস্টের বাণী প্রচার করতে এবং এজন্য জনসাধারণের মধ্যেই তাদের কাজ করতে হবে। যে পদ্ধতি দীর্ঘকাল যাবৎ এদেশে শিক্ষাবিধানের উপায় হিসাবে গৃহীত হয়ে এসেছে, তারা সেই পদ্ধতিই অবলম্বন করেছিল। দেশীয় পাঠশালার রীতিতে দেশীয় ভাষাতে ছাড়া আর কোনোভাবেই সাধারণের অন্তরকে স্পর্শ করা যাবে না। উল্লেখযোগ্য, ডাক্তার মার্শম্যানই সর্বপ্রথম মাতৃভাষার সাহায্যে আধুনিক শিক্ষাদানের প্রয়োজনীয়তার কথা বলেন। পাদ্রী অ্যাডাম ১৮৩৫ এ লর্ড উইলিয়ম বেন্টিঙ্ককে তাঁর পরিকল্পনা পেশ করার উপলক্ষে সুস্পষ্টভাবেই বলেন—

All schemes for the improvement of education, therefore, to be efficient and permanent, should be based upon the existing institutions of the country, transmitted from time immemorial, familiar to the conceptions of the people and inspiring them with respect and veneration. To labour successfully *for* them, we must labour *with* them, and to labour successfully *with them* we must get them to labour willingly and intelligently with us.[২]

জনশিক্ষার জন্য অ্যাডামের প্রয়াস আমাদের দেশে চিরস্মরণীয় হয়ে আছে। তাঁর পরিকল্পিত শিক্ষার লক্ষ্য ছিল নীতি এবং বিচারবোধ জাগ্রত করে চারিত্রিক উন্নতিসাধন। অবশ্য সেই সঙ্গে সাধু সরকারী উদ্যোগকে সর্বান্তঃকরণে গ্রহণ করে নেবার মতো নৈতিক সামর্থ্য অর্জন। এই দুই উদ্দেশ্যই সেকালের উপযুক্ত। উনবিংশ শতাব্দীর প্রথমার্ধে 'নীতিবোধ'ই সকলের একমাত্র আলোচ্য বিষয় হয়ে উঠেছিল। খ্রীস্টান পাদ্রীরা তো বটেই, রামমোহন এবং নব্যবঙ্গ—সকলেরই লক্ষ্য ছিল নতুন নৈতিক চেতনার জাগরণ। অ্যাডাম

[১] William Adam: *Reports on the State of Education in Bengal* (Calcutta University, 1941) p. 474-এ লঙের ভূমিকায় উদ্ধৃত।

[২] পূর্বোক্ত গ্রন্থ

ভেবেছিলেন তখনকার পাঠশালার শিক্ষণীয় বিষয়গুলি তো থাকবেই তবে তার সঙ্গে নীতি-শিক্ষার আরও ব্যাপক ব্যবস্থা হওয়ার দরকার। এইজন্য অ্যাডাম বাংলা ভাষাকে বাঙালির শিক্ষার বাহন করার পক্ষপাতী ছিলেন।

অ্যাডামের এই মত তাঁর নিজের তো বটেই, এই মতই মোটামুটি ছিল সেকালের খ্রীস্টান ধর্মযাজকদের। কিন্তু এই সম্প্রদায়ের বাইরে আর যাঁরা ছিলেন তখনকার সমাজ ও রাষ্ট্রের কর্তৃস্থানীয় তাঁদের মধ্যে নানা রকম অভিমত চলিত ছিল। শাসকদের দ্বিধার কথা পূর্বেই উল্লেখ করেছি। শেষ পর্যন্ত যদি বা তাঁরা এদেশে নবশিক্ষার কথা কিছু কিছু ভাবতে শুরু করলেন, অনেক দিন পর্যন্ত তাঁদের পরিকল্পনা ছিল সংস্কৃতের সাহায্যেই জ্ঞানবিজ্ঞানের প্রসার। এদিকে এদেশে ইংরেজি শিক্ষার স্বাদ যাঁরা পেয়েছেন, তাঁরা চাচ্ছিলেন ইংরেজি শিক্ষার প্রসার। হিন্দু কলেজ দেশীয় উদ্যোগে স্থাপিত হয়েছিল। রামমোহন ১৮২৩-এর শিক্ষাবিষয়ক পত্রে ইংরেজি শিক্ষার সাহায্যে আধুনিক জ্ঞানবিজ্ঞানের প্রচারের প্রয়োজনীয়তার কথা বলেছিলেন। তিনি নিজে স্থাপন করেছিলেন এ্যাংলো-হিন্দু স্কুল। এখানে বাংলা ভাষার সাহায্যেই আধুনিক বিদ্যা বিতরণ করা হত। কিন্তু আসলে তখন প্রাচ্যপন্থী এবং পাশ্চাত্যপন্থী নামে যে দুটি দল দেখা দিল, তারা বিবাদ করেছে ইংরেজি অথবা সংস্কৃত ভাষার প্রাধান্য নিয়ে। বাংলা ভাষার প্রবক্তারা এই বিতর্কে কোনো স্থান পায়নি যদিও ১৮৩৫ খ্রীস্টাব্দে পাশ্চাত্যপন্থীদের বিজয় সংস্কৃতের সঙ্গে বাংলা ভাষাকেও পর্যুদস্ত করে ফেলল। কেউ লক্ষ্য করল না অ্যাডামের যুক্তিকে—বাংলায় শিক্ষা না দিলে শিক্ষার উদ্দেশ্যই ব্যর্থ হবে—যদি সে উদ্দেশ্য হয় নৈতিক উন্নয়ন। এইসঙ্গে আর একটি তথ্য যোগ করা যায়। শোনা যায় হিতবাদ দর্শন তখনকার ভারতীয় শাসনব্যবস্থাকে কিছু কিছু প্রভাবিত করবার চেষ্টা করেছিল। হিতবাদীদের মত ছিল বাংলা ভাষাকেই সর্ববিধ সুযোগ দেওয়া কারণ মাতৃভাষা ছাড়া হিতকর চিন্তাকে কিছুতেই ফলপ্রসূ করা যাবে না।[৩] হিতবাদীদের প্রত্যাশা ব্যর্থ হল। মেকলে ইংরেজি শিক্ষার প্রবর্তনের ব্যবস্থা করে এই আশা করেছিলেন—

The effect of this education on the Hindoos is prodigious. No Hindoo, who has received an English education, ever remains sincerely attached to his religion. It is my firm belief that if our plans of education are followed up, there will not be a single idolator among the respectable classes in Bengal thirty year hence.[৪]

মেকলের এই প্রত্যাশা সংগত না অসংগত সে বিচার না করে একথা নিঃসন্দেহেই বলতে পারি যে দীর্ঘকালের ইংরেজি শিক্ষা আমাদের মূল ধর্মীয় বিশ্বাসে সামানাই পরিবর্তন আনতে পেরেছে। সেদিক থেকে পাদ্রীরা এবং হিতবাদীরা আরও পাকাপাকিভাবে কাজ করতে চেয়েছিলেন।

---

[৩] "James Mill was no Anglicist. He was convinced that the vernacular languages were far better vehicles of instruction."—Erich Stokes. *The English Utilitarians and India* (1959) p. 57.

[৪] George Trevelyan: *Life and Letters of Lord Macaulay, Vol. I* p. 464. যোগেশচন্দ্র বাগলের "বাংলার উচ্চশিক্ষা" (১৩৬০) পৃঃ ২৫-এ উদ্ধৃত।

ঊনবিংশ শতাব্দীর শিক্ষাবিষয়ক আন্দোলনগুলির বিস্তৃত ইতিহাস রচনা আমাদের বর্তমান উদ্দেশ্য নয়। নবযুগ কিভাবে তার লক্ষ্যকে চরিতার্থ করছে আমরা তারই আলোচনা করছি। দুটো সূত্র আমাদের চোখে পড়ছে। ঊনবিংশ শতাব্দীর প্রথম দিকে একটি প্রাণচাঞ্চল্য দেখা দিয়েছে সত্য কিন্তু তার স্বরূপ কম লোকের কাছেই ধরা দিয়েছিল। কতকগুলি নৈতিক সংস্কারই যেন নবযুগকে সার্থক করার উপায়। এইজন্যেই নীতির উপর এত ঝোঁক। পাদ্রীরা তো চেয়েছেই, হিন্দু কলেজের শিক্ষার্থী নব্যবঙ্গেরা চেয়েছে, রামমোহন এবং তদনুবর্তীরাও তাই চেয়েছেন। নীতির প্রতি আসক্তি ঊনবিংশ শতাব্দীর শেষের দিকে বঙ্কিমচন্দ্রের যুগ পর্যন্ত প্রবল ছিল। প্রথম দিকের শিক্ষানীতি তাই ছিল নীতিনির্ভর। কিন্তু ভেবে দেখলে দেখা যাবে, নীতি তো কতকগুলি যান্ত্রিক অভ্যাস মাত্র। মূল কথা হচ্ছে একটা মনোভঙ্গি (attitude) তৈরি করা। রেনাশাঁস অর্থ কতকগুলি আন্দোলন মাত্র নয়; রেনাশাঁস মানে বিশিষ্ট জীবনদর্শন, যার থেকে আমাদের আচরণ নৈতিক হয়ে ওঠে। প্রথম যুগের চাঞ্চল্য বিদ্রোহ নৈতিক সংস্কার ইত্যাদির ভিতর দিয়ে নবযুগ-চেতনার লক্ষণ দেখা দিচ্ছিল মাত্র কিন্তু নবযুগ তখনও রূপ পায়নি।

যাঁরা ইংরেজ রাজত্বকে প্রার্থনীয় মনে করেছিলেন, তাঁরা ইংরেজ রাজত্বের সঙ্গে চেয়েছিলেন নতুন মূল্যবোধ। তাঁরা শুধু বই-পড়া বিদ্যার প্রসার চান নি, তাঁরা চেয়েছেন আধুনিক মনোভাব সৃষ্টি করতে। এই মনোভাবটা যে কেবল মুষ্টিমেয় কয়েকজনই অর্জন করবে, এমন কথা তাঁরা চিন্তা করেন নি। আধুনিক ইংরেজি শিক্ষা যাঁরা প্রথম পেয়েছিলেন সেই নব্যবঙ্গেরা এ বিষয়ে অনবহিত ছিলেন না। তাঁরা ভালো ইংরেজি বলতেন এবং অত্যধিক ইংরেজিভাবাপন্ন ছিলেন একথাই আমরা জানি কিন্তু একথা আমরা বিশ্বাস করি না যে তাঁরা নিছক আত্মকেন্দ্রিক ছিলেন না। নীতিশিক্ষাদানের পথে তাঁরা স্বদেশের উন্নতি চেয়েছেন। পাদ্রীদের সঙ্গে তাঁদের পার্থক্য এখানেই যে পাদ্রীদের নীতিবোধ কতকগুলি অনুশাসনের উপর প্রতিষ্ঠিত ছিল মাত্র, নব্যবঙ্গেরা নীতিবোধকে যুক্তি দিয়ে প্রতিষ্ঠিত করতে চেয়েছেন। নব্যবঙ্গের পত্রিকায় এ যুগের শিক্ষানীতি সম্বন্ধে লেখা হয়েছিল—

The importance and necessity of the joint cultivation of the intellect and the feelings cannot be too strongly urged. The influence of the heart upon the understanding is inculcable.[৫]

হৃদয়বৃত্তি আমাদের মধ্যে জাগায় কল্যাণবোধ এবং বুদ্ধিবৃত্তি জাগায় সত্যনির্ধারণ-শক্তি। নীতিবর্জিত সত্যসন্ধানের কোনো অর্থ নেই, এ কথাও একজন বলেছেন—

In the state of society in which we live and in which every man is to be the architect of his own fortune, we could not commit a greater error than to teach the rising generation to seek knowledge on its own account.[৬]

তাঁরা শিক্ষার যে উদ্দেশ্য স্থির করেছেন ঊনবিংশ শতাব্দীর প্রথমার্ধে এর চেয়ে বেশি অগ্রসর হওয়া সম্ভব ছিল না। তাঁদের বিশ্বাসের আন্তরিকতায় যদি সন্দেহ না করি তবে

[৫] *The Bengal Spectator,* July 1842, p. 19.
[৬] *The Bengal Spectator,* September 1, 1842, p. 57.

সন্ধান করতে হয় সত্যি সত্যি তাঁরা এর প্রসার কতখানি কামনা করেছেন। এই নীতিবোধ কি কেবল ইংরেজিশিক্ষিত সমাজের জন্য, অথবা, তাঁরা কি ভেবেছিলেন কেবল ইংরেজি ভাষায় পারদর্শী হয়েই এই মূল্যমানকে দেশের মানুষ আয়ত্ত করবে। মনে রাখতে হবে নব্যবঙ্গের মুখপত্র *The Bengal Spectator* পত্রিকা ছিল দ্বৈভাষিক। রামগোপাল ঘোষ তত্ত্ববোধিনী পত্রিকায় গভীর ভাবের রচনা দেখে আনন্দে অধীর হয়েছিলেন। এঁদেরই উদ্যমে বেরিয়েছিল সর্বজনবোধ্য লোকভাষার "মাসিক পত্রিকা" এবং অন্যান্য বই। এই সময়ের যুগন্ধর শিক্ষানায়ক ছিলেন ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর। তিনি ইংরেজির উপর তো নির্ভর করলেনই না সংস্কৃতের মহাপণ্ডিত হয়েও সংস্কৃত শিক্ষাকেই চরম বলে মানলেন না। তিনি বঙ্গবিদ্যালয় স্থাপন করে বাংলা ভাষার সাহায্যে আধুনিক শিক্ষার ব্যাপ্তি ঘটাতে চাইলেন।[৭] লক্ষ্য করবার বিষয়, বিদ্যাসাগরের শিক্ষাচিন্তায় ধর্ম বা নীতিশিক্ষাদানের উদ্দেশ্য গৌণ হয়ে এসেছে। তিনি বিশেষভাবে লক্ষ্য রাখলেন সচেতন জাগ্রত বুদ্ধিকে গড়ে তোলবার দিকে। তিনি সংস্কৃত কলেজে মিলের লজিক পড়াতে চেয়েছিলেন। 'ভ্রান্ত সাংখ্য ও বেদান্ত' দর্শনের প্রতিষেধক হিসাবে পাশ্চাত্ত্য দর্শন প্রবর্তন করতে চেয়েছেন। বিদ্যাসাগর বঙ্গ-বিদ্যালয়ের শিক্ষক তৈরি করবার জন্যে নর্মাল স্কুল স্থাপন করেছিলেন। রবীন্দ্রনাথ বাল্যকালে সেই স্কুলেই ভর্তি হয়েছিলেন। সে কথা তিনি গর্বের সঙ্গেই বলতেন।

বঙ্কিমের যুগে দেখা গেল শিক্ষার উদ্দেশ্য আরও পরিষ্কার হয়ে এসেছে। শিক্ষার উদ্দেশ্য শুধু নীতিবোধ সৃষ্টি করা নয় কিংবা কতকগুলি বৈজ্ঞানিক ও সমাজতাত্ত্বিক নীতিনিয়মকেই জানা নয়—শিক্ষার উদ্দেশ্য একটি মার্জিত মনুষ্যত্বকে গড়ে তোলা। বঙ্কিমচন্দ্র নীতিসচেতন ছিলেন; এই নীতিচেতনা আধুনিক যুগসাধনারই একটি ফল কিন্তু তিনি নীতিসর্বস্ব ছিলেন না। মনুষ্যত্বরূপ শিক্ষার নীতি একটি রশ্মি মাত্র। নীতিই প্রধান লক্ষ্য নয়, প্রধান লক্ষ্য মনুষ্যত্ব। আর মনুষ্যত্ব হচ্ছে সর্বাঙ্গীণ বৃত্তির সমঞ্জস বিকাশ। প্রথম যুগে নীতির একটা স্থূল অভ্যাসই ছিল শিক্ষা। দ্বিতীয় যুগে নীতির চর্চার সঙ্গে বুদ্ধির অনুশীলন হল যুক্ত। বিদ্যাসাগরের চিন্তায় নীতিবাদের প্রত্যক্ষ উদ্দেশ্য গৌণ হয়ে মার্জিত বুদ্ধিপ্রকর্ষের সঙ্গে সমাজকল্যাণবোধ মিশ্রিত হয়ে শিক্ষার উদ্দেশ্য আরও সুস্পষ্ট হয়ে উঠল। বঙ্কিমচন্দ্রের বঙ্গদর্শন সম্পাদনাকাল থেকেই লক্ষ্য করি আধুনিক বিজ্ঞান ও ইতিহাসের পরিপূর্ণ অনুশীলনের সঙ্গে সঙ্গে মানুষের বৃত্তিগুলিকে উজ্জ্বলতর করে তোলবার শিক্ষাদর্শ। এই আদর্শই বঙ্কিমজীবনের দ্বিতীয় যুগে পূর্ণাঙ্গ অনুশীলনতত্ত্বে পরিণত হয়েছিল। ধর্মতত্ত্বে গুরুশিষ্যের সংলাপে দেবী চৌধুরাণীতে তার রূপরচনায় এই শিক্ষাতত্ত্বই প্রতিফলিত হয়েছে। বঙ্কিমচন্দ্রের এই শিক্ষাতত্ত্বের আভাস অক্ষয়কুমার দত্তের রচনাতেই প্রথম পাই।[৮] তাঁর 'বাহ্যবস্তুর সহিত মানবপ্রকৃতির সম্বন্ধবিচার' গ্রন্থে ভৌতিক শারীরিক এবং মানসিক নিয়মগুলিকে জানাই প্রধান শিক্ষণীয় বলে নির্দিষ্ট হয়েছিল। মানুষ যে নীতিপালন করবে সেই নীতিপালনের ভিত্তি কি, অক্ষয়কুমার তাই যুক্তি দিয়ে বোঝাতে চেয়েছিলেন। বিচ্ছিন্নভাবে মানুষের কর্তব্যকে মাত্র নির্দেশ না করে মানুষের মনুষ্যত্বকে তিনি জানতে বলেছেন। নবযুগের কেন্দ্রীয় মূল্যমান ছিল এই মনুষ্যত্ববোধ। আমাদের উনবিংশ শতাব্দীর দীর্ঘকাল কেটে গিয়েছে এই মূল্যমানটিকে খুঁজে বের করতে।

---

[৭] বিদ্যাসাগরের শিক্ষাচিন্তা সম্পর্কে দ্রষ্টব্য বিনয় ঘোষ "বিদ্যাসাগর ও বাঙালী সমাজ" ৩য় খণ্ড।

[৮] এ সম্পর্কে বিস্তৃততর আলোচনার জন্য দ্রষ্টব্য ভবতোষ দত্ত, "চিন্তানায়ক বঙ্কিমচন্দ্র" (১৯৬১) 'বঙ্কিমযুগের মননসাধনা'—অধ্যায়।

অবশেষে স্বামী বিবেকানন্দ বলেছিলেন মানুষের অন্তর্নিহিত পূর্ণতাকে উদ্‌ঘাটনই হচ্ছে শিক্ষার উদ্দেশ্য।

ঊনবিংশ শতাব্দীর দ্বিতীয়ার্ধে আবিষ্কৃত শিক্ষার এই উদ্দেশ্য নবযুগের সাধনাকে যেমন পূর্ণতা দিয়েছে, তেমনি দীর্ঘকাল শিক্ষানায়কদের মনোভাবকে নিয়ন্ত্রিত করেছে। রামেন্দ্রসুন্দর বঙ্কিমের মতোই বলেছেন—

'কালের কুটিল চক্রে শিক্ষা আজকাল বিজ্ঞানশিক্ষা সাহিত্যশিক্ষা, ধর্মশিক্ষা, নীতি-শিক্ষা, ইতিহাসশিক্ষা, হাতেকলমে শিক্ষা বা টেকনিক্যাল শিক্ষা ইত্যাদি নানা উপাধিতে অলঙ্কৃত হইয়া সহস্র সহস্র শ্রেণীতে বিভক্ত হইয়াছে; এবং কোন্ শিক্ষা ভাল আর কোন্ শিক্ষা মন্দ এই তর্কের কোলাহলে দিগন্ত প্রতিধ্বনিত হইতেছে। কিন্তু আমাদের দুর্ভাগ্য, আমরা এই কোলাহলের অর্থ সম্যক উপলব্ধি করিতে একেবারেই অক্ষম। শিক্ষা বলিলে আমরা কেবল একটা মাত্র শিক্ষাই বুঝিয়া থাকি; সেই শিক্ষার অর্থ মনুষ্যত্বের বৃদ্ধি স্ফূর্তি ও পরিপুষ্টি। যাহাতে অপুষ্ট মনুষ্যত্ব পুষ্টিলাভ করে, প্রচ্ছন্ন মনুষ্যত্ব বিকাশ পায়, হীন মনুষ্যত্ব স্ফূর্তিলাভ করিয়া জাগ্রত ও চেতন হইয়া উঠে, তাহাকেই আমরা শিক্ষা নামে অভিহিত করিয়া থাকি।'[৯]

লক্ষ্য করলে দেখা যাবে মনুষ্যত্বের এই আদর্শের সঙ্গে নীতিবোধও জড়িত। কারণ এই মনুষ্যত্বের লক্ষ্য হচ্ছে মানবকল্যাণ। সুতরাং প্রত্যক্ষভাবে নীতিকে শিক্ষার উদ্দেশ্য বলা না হলেও এই শিক্ষার ফল সুস্থ জীবনবোধ। রবীন্দ্রনাথ এই আদর্শে বিশ্বাস অটুট রেখেছিলেন। তাঁর শিক্ষাদর্শে বুদ্ধিবৃত্তির বিকাশ কখনই বন্ধ হতে পারে নি। কিন্তু একথা কে অস্বীকার করতে পারে যে তাঁর কল্পিত বুদ্ধির অনুশীলন কখনই মানবকল্যাণ-বিরোধী নয়। অর্থাৎ এই বুদ্ধির চর্চা নীতিবোধের সঙ্গে অঙ্গাঙ্গী জড়িত। একথা বিশেষভাবে উল্লেখ করবার তাৎপর্য এই যে বিংশ শতাব্দীতে শিক্ষার আদর্শ হয় নীতি-নিরপেক্ষ জ্ঞানের সাধনায় না হয় একটা নাগরিক রুচি ও ভদ্রতার অনুশীলনেই পর্যবসিত। বঙ্কিমী শিক্ষাদর্শ সবুজপত্রের যুগেই প্রতিহত হয়েছে।—

'তত্ত্বজ্ঞেরা যাহাই বলুন না কেন শিক্ষার উদ্দেশ্য আদর্শ মানুষ গড়াও নয়, অতিমানুষ তৈরীও নয়। বিদ্যাশিক্ষাই কার্যত শিক্ষার লক্ষ্য হইয়া আছে।'[১০]

এতেই বোঝা যাবে রবীন্দ্রনাথ ঊনবিংশ শতাব্দীর মনুষ্যত্ব সন্ধানকেই শিক্ষার লক্ষ্য হিসাবে গ্রহণ করেছিলেন, শিক্ষার নতুন সংজ্ঞা তাঁকে লক্ষ্যভ্রষ্ট করেনি।

১৮৩৫ খ্রীস্টাব্দে ইংরেজি শিক্ষার নীতি স্বীকৃত হলে প্রগতিবাদীরা উল্লসিত হল। সেই উল্লাস এখনও অক্ষুন্ন। আমাদের এখনও ধারণা ইংরেজি শিক্ষার নীতি আমাদের পক্ষে অত্যন্ত কল্যাণকর হয়েছে। দেশের যা কিছু উন্নতি দেখছি, ইংরেজি শিক্ষার জন্যেই তা সম্ভব হয়েছে। কিন্তু এই শিক্ষানীতি যে আর-একদিক থেকে নবযুগকে অসার্থক করে ফেলল, সে হিসাব আমরা করলাম না। ইংরেজি শিক্ষা আমাদের সমগ্র সমাজকে দ্বিধাবিভক্ত

৯ "নানাকথা", শিক্ষাপ্রণালী
১০ অতুলচন্দ্র গুপ্ত 'শিক্ষার লক্ষ্য', সবুজপত্র ১৩২৩ ফাল্গুন

করে ফেলল। যারা ইংরেজি শিক্ষা করল তারা যে শুধু জীবিকার ক্ষেত্রেই বিশেষ সুবিধা ভোগ করল তা' নয়, মনের দিক থেকেও তারা বিচ্ছিন্ন হয়ে থাকল। দেশের এক অতিবৃহৎ অংশ তাদের চিন্তাভাবনা প্রয়োজন-অপ্রয়োজন নিয়ে পড়ে রইল, আর এক অংশ ইংরেজির সাহায্যে বিশ্বসংস্কৃতির সুধা পান করে তৃপ্ত হয়ে রইল। আবার ইংরেজিশিক্ষিতদের মধ্যে কম ব্যক্তিই শিক্ষা ও মনের মধ্যে সামঞ্জস্য আনতে পেরেছেন। যাকে মূল্যবোধ বলে, সেই অ্যাটিচুড-এ তেমন কোনো পরিবর্তন এই শিক্ষা আনতে পেরেছে কি? ইতিহাসবিধাতার ইচ্ছায় প্রাচ্য-পাশ্চাত্ত্যের মহৎ যোগাযোগ ঘটে গেল, কিন্তু এল না তার ব্যাপ্তি কিংবা গভীরতা।

মেকলে যে এর অপূর্ণতা বুঝতে পারেন নি তা নয়। তিনি এর একটা ব্যবস্থা কল্পনা করেছিলেন। মেকলের সেই তত্ত্ব 'অভিসেচন-তত্ত্ব' বা filtration theory নামে পরিচিত। তিনি ভেবেছিলেন সাধারণ মানুষের জন্য শিক্ষার ভাবনা ভাববার দরকার নেই। উচ্চস্তরের মধ্যে ইংরেজি শিক্ষা ছড়িয়ে পড়লে সেই শিক্ষার ফল গড়িয়ে যাবে সমাজের নীচের স্তরেও। অ্যাডাম চেয়েছিলেন ঠিক এর উল্‌টো—নীচের স্তরটিকেই শিক্ষিত করে তুলবার জন্য প্রত্যক্ষ চেষ্টা করতে। অ্যাডামের শিক্ষা পরিকল্পনা গৃহীত হলে সমগ্র সমাজ দুই ভাগে বিভক্ত হয়ে পড়ত না। দেশের অগ্রগতি বা পশ্চাদ্‌গতির ফল সমাজ একসঙ্গেই ভোগ করত। এতে একটা অসুবিধা ছিল এই যে সমগ্র সমাজকে নিয়ে একসঙ্গে চলতে হলে যাত্রা স্বভাবতই হত মন্থর। কিন্তু আমাদের দেশে জনশিক্ষা এবং উচ্চশিক্ষা স্বতন্ত্র। জনশিক্ষায় উচ্চশিক্ষা চলবে না আর উচ্চশিক্ষা মুষ্টিমেয়র মধ্যে সীমাবদ্ধ না রেখে উপায় নেই। উচ্চশিক্ষাতে নবযুগের বাণী সঞ্চারিত হয়েছিল। আমাদের দেশে জনশিক্ষা কি আগে ছিল না? তার নিজস্ব পদ্ধতি ছিল। সমস্ত দেশের চিত্তকে স্পর্শ করার এর চেয়ে উৎকৃষ্ট উপায় আর নেই। জনশিক্ষার সঙ্গে উচ্চশিক্ষার মিলন ঘটানোই হতে পারত নবযুগের শিক্ষানীতি। কিন্তু তা হয়নি। মেকলের যে শিক্ষাদর্শ আজ পর্যন্ত গৃহীত হয়ে এসেছে, বাংলার নব-যুগের চিন্তানায়কেরা ঠিক এমনি করেই তা চেয়েছিলেন কিনা সন্দেহ।

But this was hardly western civilization as appreciated by Ram Mohun Roy, Dwarkanath Tagore and the small band of reforming Hindus that had joined Macaulay to fight the Orientalists. To them it was essentially a means of combating existing moral and social evils. If in subsequent generations this ethical aim became dulled and materialised, if the prospect of Government employment gradually prevailed as an educational stimulus, it cannot be said that the Indian outlook on life or conception of values ever became unmistakably and aggressively victorian.[১১]

অ্যাডাম তাঁর শিক্ষাবিষয়ক অনুসন্ধান শেষ করে রিপোর্ট পেশ করবার প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই সম্পূর্ণ বিপরীত শিক্ষানীতি গৃহীত হল এবং সেই শিক্ষানীতি জোরালো হল কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রতিষ্ঠার দ্বারা। সমস্ত দেশে স্থাপিত হল ইংরেজি শিক্ষার জন্য কয়েকটি কলেজ। ফলে সমাজের বিচ্ছিন্নতাকে আরও স্থায়িত্ব দেওয়া হল মাত্র।

১১ Arthur Mayhew, *The Education of India* (1928) p. 28.

বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপনের ফলে এই বিশ্বাস ক্রমেই দৃঢ়বদ্ধ হতে লাগল যে শিক্ষাকে সত্য সত্যই উপর থেকে গড়িয়ে আসতে হবে।

In truth the efforts to improve the indigenous village schools had failed and the few schools established by Government as models of good vernacular education to a limited number of pupils of a higher social grade had no effect whatever in raising the level of the indigeneous schools below them. It was probably the apparent hopelessness of really advancing popular education by direct means that kept alive the theory that education must filter downwards and that it was impossible to reach the lower strata of the people at all until the upper strata had been dealt with.[১২]

১৮৬৮ খ্রীস্টাব্দে ব্রিটিশ ইণ্ডিয়ান এসোসিয়েশনের এক অধিবেশনে ফিলট্রেশন-থিয়রির সমর্থনে কিশোরীচাঁদ মিত্র বলেন—

The lower strata of the social fabric must be permeated through the higher strata. Educate the upper and middle classes and the lower classes will be instructed and elevated.[১৩]

কিশোরীচাঁদের এই বক্তৃতার উত্তরে পাদ্রী লালবিহারী দে বিদ্রূপ করে বলেছিলেন—

While a Brahmin Dives is faring sumptuously every day and luxuriating on logic, metaphysics and theology, the Sudra Lazarus is positively dying of starvation in vain expecting a few crumbs to fall from the lord's table.

ভিন্ন রূপক দিয়ে রবীন্দ্রনাথও দেশব্যাপী অশিক্ষা এবং অভিমানী শিক্ষিতসমাজের এই ক্লিষ্ট রূপ এঁকেছেন—

'বিপুল সংখ্যক গ্রাম নিয়ে আমাদের যে দেশ, সেই দেশের মনোভূমিতেও রসের জোগান আজ অবসিত। যে রস অনেককাল থেকে নিম্নস্তরে ব্যাপ্ত হয়ে আছে, তাও দিনে দিনে শুষ্ক বাতাসের উষ্ণ নিঃশ্বাসে উবে যাবে, অবশেষে প্রাণনাশা মরু অগ্রসর হয়ে তৃষ্ণার অজগর সাপের মতো পাকে পাকে গ্রাস করতে থাকবে আমাদের এই গ্রামে-গাঁথা দেশকে। এই মরুর আক্রমণটা আমাদের চোখে পড়ছে না, কেননা বিশেষ শিক্ষার গতিকেই দেশদেখা চোখ আমরা হারিয়েছি; গবাক্ষলণ্ঠনের আলোর মতো আমাদের সমস্ত লক্ষ্য কেন্দ্রীভূত শিক্ষিত সমাজের দিকে।' ('শিক্ষার বিকিরণ', শিক্ষা)

লালবিহারী দে যে যুগে দেশের রসরিক্ত রূপ দেখেছিলেন, সে যুগ থেকে রবীন্দ্রনাথের যুগেও বিশেষ কোনো পার্থক্য ঘটেনি। কেননা শিক্ষার পদ্ধতির সেই ধারাই অব্যাহত, যাকে বিদ্রূপ করেছিলেন লালবিহারী এবং যার প্রতিবাদেই বঙ্কিমচন্দ্র প্রকাশ করেছিলেন বঙ্গদর্শন। ১৮৭২ খ্রীস্টাব্দে বঙ্গদর্শনের পত্রসূচনাতেই তিনি লিখলেন—

'এক্ষণে একটা কথা উঠিয়াছে, এডুকেশন 'ফিল্‌টর্‌ ডোন' করিবে। একথার তাৎপর্য

১২ H. A. Stark, *Vernacular Education in Bengal from 1813 to 1912* (1916) p. 88.

১৩ পূর্বোক্ত গ্রন্থ পৃঃ ৮৯

এই যে কেবল উচ্চশ্রেণীর লোকেরা সুশিক্ষিত হইলেই হইল, অধঃশ্রেণীর লোকদিগের পৃথক শিখাইবার প্রয়োজন নাই; তাহারা কাজে কাজেই বিদ্বান্ হইয়া উঠিবে। যেমন শোষক পদার্থের উপরিভাগে জলসেক করিলেই নিম্নস্তর পর্যন্ত সিক্ত হয় তেমনি বিদ্যারূপ জল, বাঙ্গালী জাতি রূপ শোষক-মৃত্তিকার উপরিস্তরে ঢালিলে নিম্নস্তর অর্থাৎ ইতরলোক পর্যন্ত ভিজিয়া উঠিবে।

আমাদিগের দেশের লোকের এই জলময় বিদ্যা যে এতদূর গড়াইবে এমত ভরসা আমরা করি না। বিদ্যা জল বা দুগ্ধ নহে যে উপরে ঢালিলে নীচে শোষিবে। তবে কোন জাতির একাংশ কৃতবিদ্য হইলে তাহাদিগের সংসর্গগুণে অন্যাংশেরও শ্রীবৃদ্ধি হয় বটে। কিন্তু যদি ঐ দুই অংশের ভাষার এরূপ ভেদ থাকে যে বিদ্বানের ভাষা মূর্খে বুঝিতে পারে না, তবে সংসর্গের ফল ফলিবে কি প্রকারে?'

এই শিক্ষাপদ্ধতি সম্বন্ধে রবীন্দ্রনাথের অভিমত আমরা যথাস্থানে উল্লেখ করব।[১৪]

১২৯৯ সালের পৌষ মাসের সাধনা পত্রিকায় রবীন্দ্রনাথের বিখ্যাত প্রবন্ধ 'শিক্ষার হেরফের' প্রকাশিত হল। ঊনবিংশ শতাব্দীর শিক্ষাচিন্তার সঙ্গে রবীন্দ্রনাথের শিক্ষা-চিন্তার যোগ এই প্রবন্ধটিই রক্ষা করেছে। এই প্রবন্ধটি পড়ে বঙ্কিমচন্দ্র, গুরুদাস বন্দ্যোপাধ্যায়[১৫] এবং আনন্দমোহন বসু যে সমর্থন এবং প্রগাঢ় ঐক্যমত জানিয়েছিলেন[১৫ক], তাতেই বুঝতে পারা যায় সেযুগের শিক্ষাভাবনাই রবীন্দ্রনাথের ভাষায় নতুন করে প্রকাশিত হয়েছে। শিক্ষা সম্বন্ধে যে মত রবীন্দ্রনাথ এতে ব্যক্ত করেছিলেন সারা জীবনে বারবারই তিনি তা আবৃত্তি করে গিয়েছেন। যে আধুনিক মনন ও বিদ্যা আমাদের দেশে ইংরেজ শাসনের সঙ্গে এসেছে, সেই বিদ্যাকে পুরোপুরি গ্রহণ এবং স্বীকরণের মধ্যেই আছে মনুষ্যত্বের মুক্তি। সেই মননশিক্ষা যেন দেশের অন্তঃস্থলে পৌঁছতে পারে এবং তা যেন মাতৃদুগ্ধের মতো সমস্ত দেশকেই পুষ্ট করে তুলতে পারে। 'শিক্ষার হেরফের' প্রবন্ধে রবীন্দ্রনাথ প্রধানত দুটি কথা বলেছিলেন—

'আমাদের এই শিক্ষার সহিত জীবনের সামঞ্জস্য সাধনই এখনকার দিনের সর্বপ্রধান

১৪ রবীন্দ্রনাথের শিক্ষাচিন্তার মূল কথাগুলির বিশদ আলোচনা করেছেন শ্রীযুক্ত প্রবোধচন্দ্র সেন "রবীন্দ্রনাথের শিক্ষাচিন্তা" (১৯৬১) গ্রন্থে।

১৫ I firmly believe that we cannot have any thorough and extensive culture as a nation, unless knowledge is diseminated through our own vernacular, consider the lesson that the past teaches. The darkness of the Middle Ages of Europe was not completely dispelled until the light of knowledge shone through the medium of the numerous modern languages. So in India, not withstanding the benign radiance of knowledge that has shone on the higher levels of our society through one of the clearest media that exist, the dark depths of ignorance all around will never be illuminated until the light knowledge reaches the masses through the medium of their own vernacular. —১৮৯১ খ্রীস্টাব্দে প্রদত্ত গুরুদাস বন্দ্যোপাধ্যায়ের কনভোকেশন বক্তৃতা। *Gooroodas Centenary Commemoration Volume*. Ed. Anathnath Basu. Calcutta University (1948) p. 49.

১৫ক রবীন্দ্ররচনাবলী ১২, পৃঃ ৬১৭

মনোযোগের বিষয় হইয়া দাঁড়াইয়াছে।

কিন্তু এ মিলন কে সাধন করিতে পারে? বাংলা ভাষা বাংলা সাহিত্য। যখন প্রথম বঙ্কিমবাবুর বঙ্গদর্শন একটি নূতন প্রভাতের মতো আমাদের বঙ্গদেশে উদিত হইয়াছিল তখন দেশের সমস্ত শিক্ষিত অন্তর্জগৎ কেন এমন একটি অপূর্ব আনন্দে জাগ্রত হইয়া উঠিয়াছিল?...বঙ্গদর্শনকে অবলম্বন করিয়া একটি প্রবল প্রতিভা আমাদের ইংরেজি শিক্ষা ও আমাদের অন্তঃকরণের মধ্যবর্তী ব্যবধান ভাঙিয়া দিয়াছিল, বহুকাল পরে প্রাণের সহিত ভাবের একটি আনন্দসম্মিলন সংঘটন করিয়াছিল, প্রবাসীকে গৃহের মধ্যে আনিয়া আমাদের গৃহকে উৎসবে উজ্জ্বল করিয়া তুলিয়াছিল।'[১৬]

'ইংরেজি শিক্ষা ও আমাদের অন্তঃকরণের মধ্যবর্তী ব্যবধানে'র কথাই বঙ্কিমচন্দ্র বিশেষভাবে উল্লেখ করেছেন বঙ্গদর্শনের পত্রসূচনায়। এই ব্যবধানই যে আমাদের নবযুগের সাধনাকে খণ্ডিত করেছে, আমাদের নবযুগের চিন্তানায়কদের সেটাই উদ্‌বিগ্ন করেছিল। রবীন্দ্রনাথ যে বঙ্কিমচন্দ্র ও বঙ্গদর্শনকে এই প্রসঙ্গে উল্লেখ করেছেন, তা যথাযোগ্য হয়েছে। বঙ্কিমচন্দ্র ও অন্যান্য ভাবনেতাদের সঙ্গে রবীন্দ্রনাথের কতখানি সাদৃশ্য আছে, তার অন্য প্রমাণও আছে। রবীন্দ্রনাথও ফিলট্রেশন-তত্ত্বকে দোষারোপ করেছেন—

'শিক্ষার অভিসেচনক্রিয়া সমাজের উপরের স্তরকেই দুই-এক ইঞ্চিমাত্র ভিজিয়ে দেবে আর নিচের স্তরপরম্পরা নিত্যনীরস কাঠিন্যে সুদূরপ্রসারিত মরুময়তাকে ক্ষীণ আবরণে ঢাকা দিয়ে রাখবে, এমন চিত্তঘাতী সুগভীর মূর্খতাকে কোনো সভ্যসমাজ অলসভাবে মেনে নেয়নি। ভারতবর্ষকে মানতে বাধ্য করেছে আমাদের যে নির্মম ভাগ্য তাকে শতবার ধিক্কার দেই।'[১৭]

এই অভিসেচন-ক্রিয়ার প্রধান প্রতীক বিশ্ববিদ্যালয়। আমাদের বিশ্ববিদ্যালয়গুলি উচ্চশিক্ষার কেন্দ্র। এখান থেকেই শিক্ষিত সম্প্রদায়ের উদ্‌ভব যারা আর কিছুতেই দেশের সঙ্গে যোগ রক্ষা করতে পারে না। তাই রবীন্দ্রনাথ আমাদের বিশ্ববিদ্যালয়কেও স্বাভাবিক বলে ভাবতে পারেননি। তাঁর মতে বিশ্ববিদ্যালয় দেশের অন্তর্নিহিত আকাঙ্ক্ষারই বিকাশ-রূপে দেখা দেবে তবেই সে সত্য হবে। যথার্থ বিদ্যাতরু সেটাই, যেটা দেশের ভিতর থেকে স্বাভাবিকভাবেই অঙ্কুরিত হয়ে বিকাশ লাভ করে। কিন্তু আমাদের বিশ্ববিদ্যালয়ের আদর্শ পাশ্চাত্ত্য থেকে গৃহীত এবং আমাদের সমাজে আরোপিত।[১৮] সেইজন্যেই দেশের অন্তরের সঙ্গে এর যোগ কিছুতেই স্থাপিত হতে পারছে না। এর বিজাতীয় ভাষামাধ্যমই একে দেশের অন্তঃপুরের কাছে অপরিচিত ও সংকোচের বিষয় করে রেখে দিয়েছে। পরবর্তী কালে 'বাংলা বিশ্ববিদ্যালয়'[১৯] নামে তাঁর শিক্ষাস্বপ্নের বর্ণনা তিনি করেছেন এবং এর প্রথম অঙ্কুর দেখা গিয়েছিল তাঁর জাতীয় বিদ্যালয়ের কল্পনায় (১৩১৩)। 'ছাত্রদের প্রতি সম্ভাষণ' (১৩১২) প্রবন্ধে তিনি ছাত্রদের আহ্বান করলেন দেশের সঙ্গে প্রত্যক্ষ যোগস্থাপন করতে এবং শিক্ষাকে পুঁথিগত না করতে।

নবযুগের সাধনার বিষয় ছিল নিজেকে জানা, মানুষকেই অনুসন্ধের করে তোলা। আধুনিক শিক্ষা সেই জ্ঞানের নানা সূত্র আমাদের হাতে পেঁৗছে দিয়েছে। অর্থনীতি

---

[১৬] শিক্ষার হেরফের

[১৭] 'শিক্ষার স্বাঙ্গীকরণ' (১৩৪২)

[১৮] 'বিশ্ববিদ্যালয়ের রূপ' (১৯৩২) শিক্ষা (১৯৬০) পৃঃ ২৬৪

[১৯] এ বিষয়ে বিস্তৃত আলোচনার জন্য দ্রষ্টব্য প্রবোধচন্দ্র সেন "রবীন্দ্রনাথের শিক্ষাচিন্তা" (১৯৬১)

সমাজনীতি ইতিহাস বিজ্ঞান প্রভৃতি বিদ্যা আমাদের হাতে এসেছে কিন্তু মহাভারতের কচের মতো আমরা সেই বিদ্যার ভার বহন করছি মাত্র, প্রয়োগ করতে পারছি না। তার কারণ এই বিদ্যা আমাদের জীবনে সত্য হয়ে উঠছে না প্রধানত ভাষার ব্যবধানের জন্য। নবযুগ সার্থক হবে তখন যখন সেই বিদ্যা আমাদের নিজেদের সমাজ ও জীবন সম্বন্ধে যথার্থ অনুসন্ধিৎসা ও প্রয়োগবুদ্ধি জাগাতে পারবে। তবেই আধুনিক শিক্ষাকে আমরা অভি-শাপমুক্ত করতে পারব। রবীন্দ্রনাথ সেদিকেই আমাদের আকর্ষণ করবার চেষ্টা করেছেন। এখন মানুষ আর অলৌকিকের ব্যর্থ সন্ধান করে না। আপন অস্তিত্বকে বুদ্ধি দিয়ে বিচার করে এবং কিভাবে সুষ্ঠুভাবে বাঁচা যায় সেই তত্ত্বই সে বের করতে চায়। একদিকে যেমন নেই অতীন্দ্রিয়তার সন্ধান, অন্যদিকে তেমনি নেই সমাজবিচ্ছিন্ন আত্মপর জীবনযাপনের আদর্শ। ঊনবিংশ শতাব্দীর কোমতীয় আদর্শের সঙ্গে রবীন্দ্রনাথের মানবধর্মবাদের যোগ নেহাৎ দুর্লক্ষ্য হবে না। কোমতের মানবতাবাদকে রবীন্দ্রনাথ নিজের মতো করে গ্রহণ করেছিলেন। রবীন্দ্রনাথ যে "মানুষের ধর্ম" লিখলেন, সেখানে তিনি মানুষকে কোমতের মতোই সমাজবিবর্তনের মধ্যে স্থাপিত করেছেন। মানুষ বৃহতের অভিমুখী, এখানেই মানুষের মনুষ্যত্ব। যে শিক্ষা মানুষকে বন্ধ করে, সম্প্রদায়সংকীর্ণ করে এবং শেষ পর্যন্ত সমাজবিমুখ করে সেই শিক্ষাই মিথ্যা। রবীন্দ্রনাথ ধর্মগত অর্থে সমাজকে মানেননি, তিনি মেনেছেন মানুষের সমাজকে। নানা পার্থক্য সত্ত্বেও বঙ্কিমচন্দ্রের কল্পিত শিক্ষার লক্ষ্যের সঙ্গে রবীন্দ্রনাথের মিল এই দিক দিয়েই যে বিশ্বের সঙ্গে সামঞ্জস্য স্থাপন শেষ পর্যন্ত দুজনেরই ভাবনার বিষয়। মধ্যযুগ তাকেই বলে যখন আমরা বিশ্ব থেকে বিচ্ছিন্ন, অকিঞ্চিৎকর চরিতার্থতায় তৃপ্ত। আচারধর্মের সীমাবদ্ধতা, জ্ঞানের সংকীর্ণতা, বুদ্ধির অনুপযোগিতা—এ সব ছিল বিশেষ একযুগের কালধর্ম। রবীন্দ্রনাথ 'পূর্ব ও পশ্চিম' প্রবন্ধে আলোচনা করে দেখিয়েছেন নবযুগে মানুষ নিজেকে অনেক বৃহৎরূপে উপলব্ধি করেছে। পূর্বদেশের মানুষ আজ আর শুধু পূর্বেই বদ্ধ নয়, পশ্চিমের জ্ঞানকেও সে আপনার বলে গ্রহণ করতে ব্যগ্র। আমাদের দেশের জাতীয় আন্দোলনের তীব্রতার দিনে রবীন্দ্রনাথ তাঁর এই নবযুগ-ধারণা থেকে বিচলিত হননি। 'শিক্ষার মিলন' প্রবন্ধে তিনি বলিষ্ঠভাবে বলেছেন—

'আমাদের দেশের বিদ্যানিকেতনকে পূর্বপশ্চিমের মিলন নিকেতন করে তুলতে হবে, এই আমার অন্তরের কামনা। বিষয়লাভের ক্ষেত্রে মানুষের বিরোধ মেটে নি, সহজে মিটতেও চায় না। সত্যলাভের ক্ষেত্রে মিলনের বাধা নেই।'

বাংলা ভাষার মাধ্যম আঞ্চলিকতাকে প্রশ্রয় দেবে, এরকম যুক্তি যে রবীন্দ্রনাথ স্বীকার করেননি, তা বলাই বাহুল্য। 'শিক্ষার মিলনে'র মধ্যেই তিনি বলেছেন—

'এই ঐক্যতত্ত্ব সম্বন্ধে আমার কথা ভুল বোঝবার আশঙ্কা আছে। তাই যে কথাটা একবার আভাসে বলেছি সেইটে আর একবার স্পষ্ট বলা ভালো। একাকার হওয়া এক হওয়া নয়। যারা স্বতন্ত্র তারাই এক হতে পারে। পৃথিবীতে যারা পরজাতির স্বাতন্ত্র্য লোপ করে তারাই সর্বজাতির ঐক্য লোপ করে।...যারা নবযুগের সাধক ঐক্যের সাধনার জন্যেই তাদের স্বাতন্ত্র্যের সাধনা করতে হবে আর তাদের মনে রাখতে হবে, এই সাধনায় জাতি-বিশেষের মুক্তি নয়, নিখিল মানবের মুক্তি।'

নবযুগের শিক্ষাচিন্তায় ছিল নিখিল মানবের এই মুক্তির স্বপ্ন।

# আধুনিক সাহিত্য

সৈয়দ মুজতবা আলির গল্পে পরিতুষ্ট হন না এমন পাঠক অতি বিরল। যাকে চিত্ত বিনোদন বলে সে গুণ আলি সাহেবের লেখায় বর্তমান। আমরা যারা আলি সাহেবের গল্প কিছুতেই বাদ দিই না, তারা প্রধানতঃ ঐ গুণের জন্যই তাঁর লেখার প্রতি আসক্ত। আলি সাহেবের মত লেখা বাংলাদেশে সহজে চট করে কেউ লেখেন না। লিখতে পারেন না বলে নয়, লিখতে চান না বলে লেখেন না। না চাওয়ার কারণ আছে। আমরা অধিকাংশই আলি সাহেবের মত বহু ভ্রমণে এবং বহু ভাষায় অভিজ্ঞ নই। অভিজ্ঞ নই অথচ যদি সরলতম গল্প লিখি তাহলে ন্যায্যতঃ লোকে আমাদের এলেমে সন্দেহ করবে। সম্ভবতঃ সেই কারণেই আমরা সরল গল্প লেখা ছেড়ে দিচ্ছি। অথচ "ঘোষালের ত্রিকথা"র লেখকের হাত দিয়ে নীল লোহিতের নানা লীলার কাহিনী বাংলা সাহিত্যকে ইতোপূর্বেই সমৃদ্ধ করে রয়েছে। উপেন বন্দ্যোপাধ্যায়ের "উনপঞ্চাশী" বইখানার কথা আজকাল আর শোনাই যায় না। তাতেই আমরা পড়েছিলাম—একটা শেয়ালের একটা ল্যাজ হলে পঞ্চাশটা শেয়ালের কটা ল্যাজ?—এ প্রশ্নের জবাবে পুত্র ত্বরিৎ উত্তর ছেড়েছিল যে মণকষা ও সেরকষা অবধি পাঠশালে হয়েছে, ল্যাজকষা এখনও হয়নি। বাবা পুত্রকে প্রহারোদ্যত হলে ঠাকুমা পিতাকে আশ্বস্ত করেছিলেন—যাকগে বামুনের ছেলে মুখ্যু হয়তো পণ্ডিতী করে খাবে'খন। এ ধরনের সরস বাকনৈপুণ্য আজকাল সচরাচর দেখতে পাই না। আলি সাহেবের লেখায় চৌধুরী মশায়ের wit আছে, এবং উপেন বন্দ্যোপাধ্যায় মশায় যে ধারার প্রতিভূ সেই ধারালো satire-এরও অভাব নেই—শুধু তাঁর মধ্যে প্রথমোক্তের সংযম নেই, নেই দ্বিতীয়োক্তের সামাজিক অন্তর্দৃষ্টি। আলি সাহেব নিখুঁত মজলিসী মানুষ। এবং কাবুলী মজলিস থেকে খাটিয়া পেতে সরাইখানার ইরাণী মজলিস, আর, ওদিকে ফরাসী মজলিস থেকে জর্মন মজলিস পর্যন্ত নানা অভিজ্ঞতায় সিদ্ধ হলেও আসলে তিনি বাঙালী আড্ডার মানুষ। ও. হেনরীর সেই বিখ্যাত গল্পের নায়ক কসমোপলিট মিঃ কগ্‌ল্যান, দি আর্থ, সোলার সিস্টেম, যাঁর ঠিকানা, তিনি যেমন শেষ পর্যন্ত নিজের গ্রামের নিন্দে সহ্য করতে না পেরে ক্ষিপ্ত—আলি সাহেব সে ধরনের বিশ্বনাগরিক অবশ্যই নন। তিনি বরঞ্চ বিরাজ করেন এর বিপরীতে। সারা বিশ্বেই তিনি খুঁজে পান বাংলাদেশকে। তিনি যে শুধু ছড়িয়ে থাকা প্রবাসী বাঙালীদেরই সর্বত্র কুড়িয়ে পান তা নয়, তিনি বিদেশেরও যা কিছু দেখেন তার রূপকের মধ্যে বাংলাদেশের চেনা জীবন যাত্রারই ছায়া পড়ে। তাই "দেশে বিদেশে"র আবদুর রহমানের মধ্যে পুরাতন ভৃত্যের দেখা পাওয়া যায় অক্লেশে। বেঁচে থাকো সর্দি কাশি গল্পের নায়িকা যেন আমাদের প্রেম-ভীরু বাঙালিনী। এইখানেই মুজতবা সাহেবের গল্পের বৈশিষ্ট্য। তিনি সংস্কৃতিবিশারদ কতখানি আমি তার যোগ্য বিচারক নই, তাঁর ভাষাতত্ত্বও আমার অধিকারের মধ্যে পড়ে না—কিন্তু তিনি খাঁটি বাঙালী ভদ্রলোক—বাংলাদেশ যাঁর প্রধান আবেগ, তাই তাঁর মানবপ্রেমের মধ্যে কোথাও খাদ নেই।

চৌধুরী মশায়ের মজলিস-সম্ভব গল্পের প্রধান বৈশিষ্ট্য হল তাদের সরলতা। কিন্তু সেই সরলতা অন্তর্গভীর। গভীরতা আছে বলেই তির্যক দৃষ্টির কিরণসম্পাতে সেখানে

যে বিচিত্র আলোক লীলা ফুটে ওঠে তা অনবদ্য। হাসির রৌদ্রছটা গভীর সরোবরের উপরিতলে যে মাধুর্য সৃষ্টি করে তা গাম্ভীর্যের বন্ধনে পরিমিত বলেই স্ফটিক ঝরনার রৌদ্রলীলা থেকে স্বতন্ত্র। উপরন্তু চৌধুরীমশাই যে আড্ডার কথা নীল লোহিত প্রমুখকে কেন্দ্র করে বলেন সে আড্ডা কলিকাতা-বন্ধ। দেশের মাটিতেই সে আড্ডার শিকড় বলে তার মধ্যে একটা ধীরতা এবং স্থিরতা আছে। চূড়ান্ত প্রলোভনের সময়েও আছে একটা নাতিদুর্লক্ষ্য বাঁধন। চণ্ডীমণ্ডপী মন্থরতাকে কাটানো চৌধুরী মশায়ের গদ্যের লক্ষ্য, বক্তব্যে ভাবালুতা পরিহৃত বলেই গদ্যে নেই মেদভার। বলা যায় কলকাতার একশ বছরের নাগরিক ইতিহাসে যে আলাপী আসর-ভব্যতা গড়ে উঠল তার ট্র্যাডিশনকে রীতিমত পরিশীলিত করে সাহিত্য-সাৎ করলেন প্রমথ চৌধুরী। এই পরিশীলনেরও একটা চিন্তোদ্দীপক আদি ইতিহাস আছে। রবীন্দ্রনাথের আত্মজীবন বিবৃতির শেষাধ্যায়ে তার ইঙ্গিত বিদ্যমান। কলকাতাই অপভ্রংশের বিপরীত কূলে যে ঠাকুরবাড়ির ভাষা বলে খ্যাত একটা আলাপী আসর-ভব্যতার মান গড়ে উঠছে তার ইঙ্গিত রবীন্দ্রনাথ দিয়েছেন। তাকে নিঃসন্দেহে আমরা মার্জিত নাগরিকতার প্রথম বিকাশের নিদর্শনগুলির অন্যতম বলে মনে করতে পারি।

আড্ডার বিবর্তনে রাজসভা > জমিদার-কাছারি, চণ্ডীমণ্ডপ ও বৈঠকখানার যে ভূমিকা ছিল তার কথা অনেকে বলেছেন। যতদূর স্মরণ হয় "চতুরঙ্গে"ই বুদ্ধদেব বসুর একটি মনোজ্ঞ দীর্ঘ লেখা প্রকাশিত হয়েছিল--আড্ডা ছিল তার বিষয়। কিন্তু আমাদের নাগরিকতা গঠনে আড্ডার ভূমিকা এখনো বিস্তৃত আলোচনাসাপেক্ষ। আমাদের সমাজ বিবর্তনে ইউরোপের চাল আমরা কেউ খুঁজি না। এবং এখানে সম্পর্কগুলির হেরফের স্পষ্টতঃই পশ্চিমের রীতিতে হয়নি। কিন্তু উনিশের ও বিশের শতকে কলকাতার আড্ডার মধ্যে পুরনো সামাজিক আর্থিক, পারমার্থিক সম্পর্কগুলির জের ছিল না বললেই হয়। এর একটা প্রধান প্রমাণ হিসাবে উনিশের শতকের দুই ঠাকুর বাড়িরই উল্লেখ করা চলে। দক্ষিণেশ্বরের ঠাকুরবাড়ি ও জোড়াসাঁকোর ঠাকুরবাড়িতে আলাপী আসরগুলির প্রধান বিকাশ। কিন্তু পরমহংসদেব উচ্চাসনে বসে ধর্ম বিতরণ না করে, যাকে সাদাভাষায় বলে লোকজনদের সঙ্গে গল্প করতে ভালবাসতেন। এবং সেই ধর্মীয় আড্ডায় রামকৃষ্ণের আচরণের লক্ষ্যণীয় বৈশিষ্ট্য হল এই যে তিনি উপদেশামৃত বিতরণ না করে কথামৃত বিতরণ করতেন। আর তাঁর কথার প্রাচীন বৈশিষ্ট্য হল, যে তিনি সচেতনভাবেই নিজেকে উহ্য রেখে কথা বলতে পারতেন। সে কথার প্রাণবস্তু ছিল সাধারণ মানুষের মুখের ভাষার বহতা স্রোত। জোড়াসাঁকোর ঠাকুরবাড়ির আড্ডাতেও প্রসঙ্গের ব্যাপকতা ও বিভিন্নতা থাকলেও, প্রকরণের মিল দুর্লভ নয়। আড্ডার মূল কথা হল এই যে সে উপস্থিত ব্যক্তিদের পাত্তা দেয় না—তার যত কথাবিলাস তা শুধু অনুপস্থিত ব্যক্তিদের নিয়ে।

আড্ডা সম্বন্ধে এ ভূমিকাটুকু আলি সাহেবের গল্প প্রসঙ্গে এই কারণেই প্রাসঙ্গিক যে আড্ডাই আলি সাহেবের গল্পের প্রাণ-ধর্ম এবং রস-ধর্ম। একমাত্র 'পাদটীকা' ছাড়া "সৈয়দ মুজতবা আলির শ্রেষ্ঠ গল্পে"র সমস্ত গল্পই পরিকল্পিত হয়েছে এমনভাবে যেন তা আড্ডা থেকে কুড়ুনো। পাদটীকা-গল্পটি প্রত্যক্ষভাবে গল্পলেখকের বলা গল্প। যদিও মজলিসী গল্পের ধাঁচ বা আদল এখানেও অনুপস্থিত নয়। সুতরাং মজলিসী গল্পের দৃষ্টিতেই আলি সাহেবের গল্পের বিচার হওয়া উচিত। মজলিসের বা আড্ডার গল্পের কতকগুলি লক্ষণ আছে; আপাত লঘুতা, সরস বাগ্‌ভঙ্গী ও সংক্ষিপ্ত কিন্তু দীপ্ত উক্তি প্রত্যুক্তি।

গাল্পিক কাঠামোরও একটা ন্যূনতম আদর্শ বিদ্যমান। কয়েকজন সদস্য-বিশিষ্ট আড্ডার কোনো এক মজলিসী পরিবেশ থেকে প্রতি গল্পের শুরু। কথোপকথনের ভিতর দিয়ে একজন একটি গল্পের দরজায় গিয়ে দাঁড়ান। গল্প বলা শুরু হয়। মাঝে মাঝে লঘু মুহূর্তে সমবেত হাস্যপরিহাসে আড্ডার বিস্মৃত পরিবেশ জেগে ওঠে। কিন্তু গল্প যখন ঘনীভূত, তখন শ্রোতৃবৃন্দের মধ্যে রসিক স্তব্ধতা ছাড়া আর কিছু নেই। সঙ্গে সঙ্গে স্মরণীয় যে চরিত্র পাত্রের লঘুতা এসব গল্পে কখনো আতিশয্যে পৌঁছয় না। সার্কাসের ক্লাউন যেমন সব থেকে ওস্তাদ খেলোয়াড় এ গল্পের মজলিসের চ্যাংড়া-সদস্যরাও প্রায় তাই। এই পাত্রগুলির ভঙ্গিতে বাহিরের হাসির ছটা শুধু ভিতরের চোখের জলকে অধিকতর ঝিকমিকিয়ে তোলে।

মুজতবা আলির গল্প তখনই সুন্দর হতে পেরেছে যখনই করুণকে তিনি ব্যবহার করেছেন স্থায়ী রস হিসেবে, এবং সঞ্চারীতে রেখেছেন কখনো শৃঙ্গারকে, কখনো হাস্যকে। প্রসঙ্গতঃ 'নোনাজল' এবং 'পাদটীকা' গল্প দুটির কথাই ধরা যাক। ছোট গল্পের রসোত্তীর্ণতা অবশ্য 'নোনাজলে'ই সার্থক হয়ে উঠেছে, কিন্তু ব্যক্তিগতভাবে আমি 'পাদটীকা' গল্পটিকে বেশী ভালবাসি। গুরু-পণ্ডিত-শিক্ষক স্থানীয় চরিত্রগুলিকে আলি সাহেব অতি পরিমিত রেখায় প্রাণবন্ত করে তুলতে পারেন। চাচাকাহিনীর সেই বর্ণ-সঙ্কর-বিরোধী প্রুসিয়ান ভদ্রলোক হের ওবের্স্টের কথা যেমন স্মরণীয় তেমন স্মরণীয় 'পাদটীকা' গল্পের পণ্ডিতমশাই। বিদেশী শাসনের ধাক্কায় ভেঙেপড়া প্রাচীন সংস্কৃত বিদ্যা সম্বন্ধে বহু বক্তৃতা অপেক্ষা এই একটি গল্প যথেষ্ট লক্ষ্যভেদী। পণ্ডিতমশাইয়ের পাণ্ডিত্যের বোঝা এবং ব্যর্থতা দুই-ই সকরুণ শ্রদ্ধায় রূপায়িত হয়েছে এই গল্পটিতে। পণ্ডিতী রসিকতার উজ্জ্বল নিদর্শনও অমর হয়ে রয়েছে দুটি একটি উক্তিতে (তার মধ্যে একটি—মর্কট এবং সারমেয় কদাচ এক গৃহে অবস্থান করে না)। 'নোনাজল' গল্পটিতে দূর সমুদ্রগামী জাহাজের বাঙালী খালাসী-জীবনের এক অধ্যায় বর্ণিত হয়েছে। সমিরুদ্দির প্রবাসী জীবন কোনোদিন নিজবাসে গৃহস্থ হতে পারল না—এই সামান্য বক্তব্যকে লেখক বলবার গুণে অসামান্য করেছেন। নোনাজল চোখের জলের, মাথার ঘাম পায়ে ফেলার, এবং সমুদ্রের সার্থক ইঙ্গিত।

বিস্তৃত পর্যটন আলি সাহেবকে বিস্তৃত অভিজ্ঞতার সুযোগ দিয়েছে। নানা ধরনের মানুষের সান্নিধ্য এবং সংস্পর্শে তাঁর মতই তাঁর গল্পের মেজাজ সব সময় শুভ্র এবং উদার। চাচাকাহিনীতে যে আড্ডার বিবরণ রয়েছে তার অভিনবত্বটুকুও এই প্রসঙ্গেই অনুধাবনীয়। চৌধুরীমশায়ের গল্পের কল্পিত আসরে মার্জিত কলকাতাই মন্থরতা স্বাভাবিক। ঈষৎ হুল্লোড়ের পরিবেশ আলি সাহেবের গল্পের কল্পিত মজলিসে তেমনি সঙ্গত। বিয়ারে যতটুকু মাদকতা (আমার শোনা কথা) এই হুল্লোড়েও ততটুকু চপলতা। মানসিকভাবে শঙ্কাসঙ্কোচমুক্ত একদল যুবকের কথা দেশ-গাঁয়ের বাইরের পটভূমিতে আলি সাহেব স্থাপন করেছেন বলেই আড্ডার ঈষৎ উন্মাদতা ও চপলতা মানিয়ে গেছে। মানব রসই শেষ পর্যন্ত এই সব মজলিসী কাহিনীর উপজীব্য। 'কর্ণেল' গল্পে সিবিল্লার কাহিনীতে সেই শুভ্র মানবিকতার অশ্রুসিক্ত মাধুর্যের পরম পরিচয় লাভ করা যায়। 'নোনামিঠা' গল্পটির কথাও এই সঙ্গেই স্মর্তব্য। আলি সাহেব মানবিক আবেগের এবং সম্পর্কের কাছে আমি শতবার কুর্ণিশ ঠুকতে প্রস্তুত। এটাই, তাঁর ত্রুটিগুলোর কথা আমাদের ভুলিয়ে দেয়।

আলি সাহেবের গল্পের ভাষা অবশ্যই অন্তরঙ্গ ভাষা। তাঁর গদ্যে প্রমথ চৌধুরীর

সংযম নেই, মিত বাচনের মহিমা সম্বন্ধেও আলি সাহেব ওয়াকিবহাল কিনা বোঝা যায় না। কিন্তু গদ্যে একটা সতেজ সঙ্কোচহীনতা আছে—যার মূল্য নিশ্চয় স্বীকার্য। এই গদ্যে গুরু-বিষয়ক কিছু করা যাবে কিনা সে কথা বলতে পারি না। তবে গুরুচণ্ডালীর প্রকৃত মাধুর্য তিনি আয়ত্ত করেছেন এই কারণে যে, সংস্কৃত ও প্রাকৃত সব ভাষারই এই দুই চাল সম্বন্ধে তিনি সমান আগ্রহী। বিশেষ করে সয়াজি রাওয়ের সিংহের গল্পের কথক মৌলবী যখন গল্প বলেন তখন চলতি ভাষার খরস্রোতকে তিনি যেমন কলমে ধরতে পারেন তা বিস্ময়কর। (প্রসঙ্গত দুটো কথা বলি। এই গল্পটি এবং অনুরূপ আরো কতকগুলি গল্প শ্রেষ্ঠগল্পে নেই, এবং এমন দু-একটি গল্প শ্রেষ্ঠগল্পে রয়েছে যা শ্রেষ্ঠগল্পে না থাকলেও চলত। আর, মৌলবী সাহেবের আজগুবি গল্প আলি সাহেব এখনো আরো কতকগুলি বলুন। এগুলি স্বতন্ত্র রসের গল্প।) যে সতেজ এবং সজীব সঙ্কোচহীনতা মুজতবা আলির গদ্যের প্রাণধর্ম তা পরবর্তী কোনো কোনো লেখককেও প্রভাবিত করেছে। এই সঙ্কোচহীনতার জন্য আলি সাহেব মাঝে মাঝে বাংলা উর্দু আরবী ফারসী জর্মন ফরাসির মৃদুমন্দ খিচুড়ি পাকান এবং ভাষাবিদ মুজতবা আলিও হয়তো আত্মপ্রকাশের জন্য উদগ্রীব হয়ে পড়েন, কিন্তু এই গদ্যরীতি যখন উপযুক্ত বিষয়ের টানে স্রোতঃস্বিনী হয়ে ওঠে তখন চমৎকৃত হতেই হয়। ফারসী মিশেল আমরা অবন ঠাকুরের ভাষায়, নজরুলের ভাষায় পাইনি যে তা নয়। আলি সাহেবের মিশেলের মধ্যে একপোঁচ হিউমার থাকে বলেই এটাকে তাঁদের থেকে স্বতন্ত্র বলে মনে হয়।

এই ধরনের লেখার একটা ত্রুটি থাকে। সে ত্রুটি থেকে মুজতবা সাহেবও মুক্ত নন। শ্রেষ্ঠগল্প সংকলনটির প্রথম গল্প থেকে শেষ গল্প পর্যন্ত গল্পলেখকের কোনো বিবর্তন বা পরিবর্তন লক্ষ্যণীয় নয়। গল্প লেখার প্রথম দিনেও আলি সাহেব যা লিখতেন আজো তাই লিখছেন। বলার বিষয় বদলায়নি, কাজেই বলবার কৌশলেরও হেরফের ঘটানো দরকার হয়নি। ফলে অনেক সময় একই বক্তব্যের রকমফের, একই প্রকাশভঙ্গির পুনরাবৃত্তি দেখা দিচ্ছে। মানুষ সুন্দর, মানুষ মহৎ, মানুষ বিচিত্র এ কথাগুলো একজন লেখকের অবশ্যই প্রিয়-বিষয় হতে পারে। কিন্তু বিষয়টিকে যদি বারে বারে একই আধারে পরিবেশিত হতে দেখা যায় তাহলে তা লেখকের পক্ষে গৌরবের কথা নয়। নিজের বিষয় এবং বক্তব্যের জাল থেকে আলি সাহেবকে বেরিয়ে আসার পথ নিজেকে উদ্ভাবন করতে হবে, অথচ দেখতে হবে যে বেরিয়ে আসতে গিয়ে ভেতরে নিজের খাঁটি রসবোধটুকু ফেলে না আসেন। নইলে শুধু বিচিত্র মানুষকে দেখেছি এই অহঙ্কার ছাড়া আর কিছু থাকবে না। অভিজ্ঞতার কারবারী বলেই আলি সাহেবকে একটা কথা তাঁর অনুরাগী পাঠক হিসাবে বলছি : অভিজ্ঞতা অনাদি এবং অনন্ত। কেউ বলতে পারে না তার সীমা কোথায়। মানসোৎকর্ষই প্রধান কথা। সে উৎকর্ষ জাগিয়ে রাখা অনলস শ্রমসাপেক্ষ ব্যাপার। তাঁর উল্লেখযোগ্য পুস্তক "দেশে-বিদেশে"র পর তিনি যা লিখেছেন তা সবই যেন "দেশে বিদেশে"র ছায়ায় লিখিত। তিনি এই অলসতা পরিহাস করুন। এর জন্যে মনে হয় তাঁর গল্প বলার টেকনিক পাল্টাতে হবে। তাঁর অধিকাংশ গল্পই অপরের মুখে বলানো গল্প। এ ধরনের গল্পের বৈশিষ্ট্য এই যে এখানে গল্পরস জমাট হয়—কিন্তু চরিত্র সৃজনের পক্ষে এ আঙ্গিক-রীতি ততটা ফলপ্রসূ নয়। একজন কথক একজনকে বা একদলকে গল্প শোনাচ্ছে বলেই তার লক্ষ্য থাকে গল্পরসে শ্রোতাকে বুঁদ করে দেবার দিকে। সুতরাং এ ধরনের গল্পে কথককেই চরিত্র হয়ে উঠতে হয়। সে ক্ষেত্রে মুজতবা আলির এখনো দৌর্বল্য রয়েছে। নীললোহিত

একটা চরিত্র হয়ে উঠতে পেরেছে, বিভূতিভূষণ মুখোপাধ্যায়ের স্বরূপ সর্দার একটা চরিত্র—কিন্তু চাচা একটা চরিত্র হিসাবে সার্থক নয়। সে শুধু গল্পের ভাঁড়ারী। সয়াজি রাওয়ের সিংহের গল্পের মৌলবীর সেদিক দিয়ে সম্ভাবনা প্রচুর। কিন্তু লেখক তাকে ভাল করে ব্যবহার করেন নি।*

সরোজ বন্দ্যোপাধ্যায়

* সৈয়দ মুজতবা আলির শ্রেষ্ঠ গল্প। বাক্-সাহিত্য। মূল্য চার টাকা।

# সমালোচনা

**ভারতের শক্তি-সাধনা ও শাক্ত-সাহিত্য**—শশিভূষণ দাশগুপ্ত। সাহিত্য সংসদ। কলিকাতা-৯। মূল্য পনর টাকা।

ডক্টর শশিভূষণ দাশগুপ্ত দীর্ঘকাল যাবৎ ইংরেজী ও বাংলায় বিভিন্ন গ্রন্থ ও প্রবন্ধের মধ্য দিয়া আমাদের দেশের খ্যাত, অখ্যাত ও স্বল্পখ্যাত নানারূপ ধর্মানুষ্ঠান এবং দেবদেবীর ইতিবৃত্ত ও তাৎপর্য সম্পর্কে আলোচনা করিতেছেন। পূর্বে তিনি শ্রীরাধার বর্ণনাপ্রসঙ্গে শক্তিতত্ত্বের দার্শনিক স্বরূপ বিচার করিয়াছিলেন, আলোচ্য গ্রন্থে সেই বিচারের ধারা অনুসরণ করিয়া ভারতীয় সাধন ক্ষেত্রে এক সর্বাত্মিকা মহাদেবীর ঐতিহাসিক বিকাশ ও আধ্যাত্মিক পরিণতির গতি-প্রকৃতি নির্ধারণ করিয়াছেন। তাহা ছাড়া, তিনি সংস্কৃত ও দেশীয় ভাষায় লিখিত বিভিন্ন গ্রন্থ অবলম্বনে দেবীকথার সাহিত্যিক বিন্যাসের একটা সুসম্বন্ধ বিবরণ লিপিবন্ধ করিয়াছেন।

শক্তি-সাধনা ও শাক্ত সাহিত্য বলিলে প্রথমেই তান্ত্রিক পূজাচার ও তন্ত্রশাস্ত্রের কথা মনে পড়ে, কিন্তু এই গ্রন্থে তন্ত্রপদ্ধতি বা তান্ত্রিক বিবরণ মুখ্যরূপে আলোচিত হয় নাই। শক্তির প্রতিষ্ঠা কেবল তন্ত্রেই নিবন্ধ নয়, বেদে পুরাণে কাব্যে—সর্বত্র তাঁহার প্রভাব বিস্তৃত হইয়া আছে। যুগে যুগে সাধকের মননে ও ভাবকের বর্ণনে মহাশক্তির মহিমা নানা ধারায় প্রবাহিত হইয়া এক সমৃদ্ধ সৌষ্ঠবে ভারতীয় সংস্কৃতির মহাসমুদ্রে মিলিত হইয়াছে। দেবীর নানা রূপ; তিনি ব্রহ্মস্বরূপিণী হইয়াও আদরিণী বালিকা, চঞ্চলা কিশোরী, সুন্দরী যুবতি, তাপসী সাধিকা, লজ্জাবতী নববধূ, স্নেহশীলা জননী, দৈন্যার্তা ভিক্ষুকপত্নী, ঐশ্বর্যময়ী অন্নদা এবং উগ্রা অসুরসংহারিণীরূপে ভারতবাসীর চিত্তে ও সাহিত্যে এক বিশিষ্ট স্থান অধিকার করিয়া আছেন। দেবীরূপের এই বিচিত্র বিবরণই "ভারতের শক্তি-সাধনা ও শাক্ত-সাহিত্যে" চৌদ্দটি অধ্যায়ের প্রতিপাদ্য বিষয়বস্তু। সংস্কৃত সাহিত্য, বৌদ্ধ সাহিত্য, বৈষ্ণব সাহিত্য, রামায়ণ সাহিত্য, বাংলা মঙ্গলকাব্য, বাংলা শাক্ত ও বৈষ্ণব পদাবলী, পরবর্তী কালের বাংলা কাব্য ও সঙ্গীত এবং ওড়িয়া, মৈথিলী, অসমীয়া ও হিন্দী ভাষার শাক্ত সাহিত্য হইতে রচনা তুলিয়া গ্রন্থকার অধ্যায়ে অধ্যায়ে দেবীমহিমার বৈচিত্র্য ফুটাইয়া তুলিয়াছেন। তিনি 'উপক্রমণিকা' অধ্যায়ে শক্তি-সাধনার মূল উৎসের সন্ধান করিয়াছেন। আর্যেতর জাতিগোষ্ঠীর মাতৃতান্ত্রিক সমাজব্যবস্থার আদর্শ হইতে মূলে মাতৃপূজার উদ্ভব হইয়াছিল এই প্রচলিত মতের সমর্থনে যেসব যুক্তি আছে, ডক্টর দাশগুপ্ত তাহার উল্লেখ করিয়াছেন; কিন্তু যজুর্বেদ, অথর্ববেদ, ব্রাহ্মণ আরণ্যক উপনিষৎ প্রভৃতি সুপ্রাচীন বৈদিক গ্রন্থের মধ্যেও যে দেবীতত্ত্বের বীজ নিহিত আছে, সে কথাও তিনি বিশদভাবেই আলোচনা করিয়াছেন। এই সম্পর্কে তিনি সর্বাধুনিক মতবাদও অনুল্লিখিত রাখেন নাই। নূতন নূতন তথ্য প্রমাণ সংগ্রহের ফলে সম্প্রতি নৃবিদ্যার পণ্ডিতগণ অনুমান করিতেছেন যে, অতি প্রাচীন কালে 'ভূমধ্যসাগরীয় অঞ্চলে আদিম জাতিগুলির মধ্যে মাতৃপূজার প্রচলন ছিল'। মাতৃপূজার ইতিহাসের মত একটা সমস্যাবহুল বিষয়ের আলোচনা করিতে হইলে যেরূপ

নিরপেক্ষ মনন আবশ্যক, তাহা পরিপূর্ণভাবে কাজে লাগাইয়া গ্রন্থকার সকল দিকে দৃষ্টি প্রসারিত করিয়াছেন।

তিনি শক্তিতত্ত্বের আলোচনায় বলিয়াছেন যে, বহু স্পষ্ট ও অস্পষ্ট ছোট ও বড় নানা প্রকারের ও নানা স্থানের দেবীগণ ক্রমে এক হইয়া শাক্তরাজ্যের অধিষ্ঠাত্রী মহাশক্তিরূপে প্রতিষ্ঠা লাভ করিয়াছেন। তিনি বলিয়াছেন (পৃঃ ২)—'যে স্থানে যেকালে যত দেবী ছিলেন, সকলকে মিলাইয়া গড়িয়া উঠিয়াছেন এক মহাদেবী'। তিনি আরও দেখাইয়াছেন (পৃঃ ৭)—'ভারতীয় সাহিত্যে আমরা যে শক্তি বা দেবীর উল্লেখ পাই, তাঁহার মধ্যে বিভিন্ন ধারা পরম কৌতূহলজনকভাবে মিশিয়া গিয়াছে'। ইহাই ত আমাদের বৈদিক দৈবতবিদ্যার মূল তত্ত্ব—'মাহাভাগ্যাদেকৈব দেবতা'। বহুর মধ্যে ঐক্য বুদ্ধি দিয়া দেবতাগণের একীকরণ প্রক্রিয়া ভারতবর্ষের অধ্যাত্মদৃষ্টির চিরন্তন বৈশিষ্ট্য। 'এক সত্যকে বিপ্রেরা বহুরূপে বর্ণনা করেন' ইহা ঋগ্বেদের কথা। একের নানারূপে উপাসনা, বিরাটের ক্ষুদ্ররূপে ধারণা শাক্ত শাস্ত্রেও স্বীকৃত হইয়াছে। পুরাণে পিতা ও পুত্রীর কথোপকথনে স্বয়ং পার্বতী হিমালয়কে বলিয়াছেন—

> অশক্তো যদি মাং ধ্যাতুমৈশ্বরং রূপমব্যয়ম্।
> যদেব রূপং মে তাত মনসো গোচরং তব।
> তন্নিষ্ঠতৎপরো ভূত্বা তদর্চনপরো ভব॥

'তাত, যদি তুমি আমার ঐশ্বর্যময় অব্যয় রূপের ধ্যান করিতে অসমর্থ হও, তবে যে রূপ তোমার মনের ধারণযোগ্য, তৎপর হইয়া তাহারই অর্চনা করিও'।

বাংলার শাক্ত সমাজ আজও এই উপদেশ পালন করেন। বহু বাঙালী হিন্দুর গৃহে প্রতিবৎসর 'নিস্তারিণী' দেবীর পূজা হইয়া থাকে। এই দেবী হয়তো মূলে পূর্ববঙ্গের বনবাসীদের স্থানীয় দেবতামাত্র। ইঁহার এক নাম বনদুর্গা। ইঁহার সঙ্গে বারজন পরিকরও পূজা গ্রহণ করেন। তাঁহারা সকলেই গ্রাম্য বীরপুরুষ ছিলেন বলিয়া মনে হয়। দুইজনের নাম গাভূরডলন ও মোচরাসিংহ—এই দুই ব্যক্তি ছিলেন যশোহরের রাজা সীতারামের বিশ্বস্ত সেনানী। ইঁহারা নিশ্চিতই স্বীয় বিক্রমের বলে দেবত্ব লাভ করিয়াছেন। এই সমস্ত বৃত্তান্ত জানিয়াও জ্ঞানী গৃহস্থ বন্যজাতিপূজিতা নিস্তারিণী দেবীর কিংবা তাঁহার বাগ্‌দীজাতীয় পরিকরগণের পূজা ত্যাগ করেন নাই। কারণ, বিশ্বব্রহ্মাণ্ড যে এক অখণ্ড অমিতশক্তির প্রকাশ এই তত্ত্বকথা, জ্ঞানে হউক, অজ্ঞানে হউক, ভারতবাসীর অন্তরে গাঁথিয়া গিয়াছে। দেবী স্বয়ং বলিয়াছেন—'একৈবাহং জাগত্যত্র দ্বিতীয়া কা মমাপরা'—এই জগতে এক আমি বর্তমান, আর দ্বিতীয় কে আছে?

ডক্টর দাশগুপ্ত প্রধানত উত্তরভারতের শাক্ত সাহিত্যেই তাঁহার আলোচনা নিবদ্ধ রাখিয়াছেন। সৌরাষ্ট্র, মহারাষ্ট্র, রাজস্থান, কর্ণাটক, অন্ধ্র, দ্রাবিড় ও কেরল দেশের শাক্ত বিবরণ তাঁহার গ্রন্থে প্রায় বাদই পড়িয়াছে। দক্ষিণ দেশে তন্ত্রালোচনা ও কালীপূজার প্রচলন আছে, সেকথার উল্লেখ করিয়া তিনি বলিয়াছেন—'দক্ষিণ দেশের এই শক্তি-সাধনা ও শাক্ত সাহিত্যের একটা পরিচয় দিতে পারিলে আমার আলোচনা অনেকখানি পূর্ণাঙ্গ হইতে পারিত।' আমরা আশা করিয়া থাকিব যে, গ্রন্থকার ভাষার বাধা অতিক্রম করিয়া শক্তি-সাধনা সম্পর্কে সকল প্রান্তীয় তথ্যগুলি সংগ্রহ করিতে পারিবেন এবং গ্রন্থের অপর এক খণ্ডে সে সকল তথ্য পরিবেষণ করিয়া তাঁহার আলোচনা পূর্ণাঙ্গ করিবেন।

ডক্টর দাশগুপ্ত কালী, দুর্গা, চণ্ডী প্রভৃতি দেবীর বিস্তৃত বিবরণ দিয়াছেন, কিন্তু

ললিতা দেবীর কথা কিছুই বলেন নাই। এই দেবী বাংলা দেশে তেমন পরিচিত না হইলেও ইঁহার খ্যাতিবিস্তৃতি কম নয়। পদ্মপুরাণোক্ত দেবীনামের তালিকায় ললিতার উল্লেখ আছে, চণ্ডীকবচে ও 'হৃদয়ে ললিতা দেবী' স্থান পাইয়াছেন। মার্কণ্ডেয় পুরাণের পর্বতবাসিনী চণ্ডিকার মত ব্রহ্মাণ্ড পুরাণের পার্বতী ললিতাও অসুর নিধন করিয়া দেবগণের 'কার্যসিদ্ধি' করিয়াছিলেন। ব্রহ্মাণ্ড পুরাণের চল্লিশটি অধ্যায়ে (৪র্থ খণ্ড, ৫-৪৪ অধ্যায়) বর্ণিত ললিতোপাখ্যান, ললিতাত্রিশতী বা ললিতা-সহস্রনাম ভারতের বিভিন্ন প্রান্তে ভক্তির সহিত পঠিত হইয়া থাকে। এইরূপ প্রসিদ্ধি আছে যে, ললিতা ত্রিশতীর উপর শঙ্করাচার্য ভাষ্য রচনা করিয়াছিলেন। তন্ত্রাচার্য ভাস্কর রায়ের ললিতা-সহস্রনামভাষ্য ছাপা হইয়াছে। শারদীয়া দশহরা উপলক্ষে এখনও নানা স্থানে ললিতাদেবীর বিশেষ পূজা অনুষ্ঠিত হয়। অসুরঘাতিনী হইলেও ললিতাদেবীর নামে ও রূপে স্নিগ্ধতা আছে। ব্রহ্মাণ্ড পুরাণের ভাষায় তিনি 'ইচ্ছাশক্তি-জ্ঞানশক্তি-ক্রিয়াশক্তি-স্বরূপিণী'।

স্কন্দ পুরাণের নাগর খণ্ডে আর এক প্রসিদ্ধ দেবীর প্রচারকথা পাওয়া যায়। এক সময়ে ভয়ঙ্কর ভূমিকম্পের ফলে হাটকেশ্বর প্রদেশ ধ্বংসস্তূপে পরিণত হয়। তখন জনগণ রক্তশৃঙ্গে (আবু পাহাড়ে?) অম্বাদেবীকে রক্ষয়িত্রীরূপে সুপ্রতিষ্ঠ করেন। এই পুরাণ-বার্তা নিশ্চিতই প্রান্তীয় শাক্ত ধর্মের প্রসার কাহিনী।

ডক্টর দাশগুপ্ত সিদ্ধান্ত করিয়াছেন—'মাতৃপূজা এবং শক্তি-সাধনার প্রচলন বাঙলা দেশে অনেক পূর্ব হইতে প্রচলিত থাকিলেও খ্রীস্টীয় সপ্তদশ শতক হইতে আরম্ভ করিয়া ইহা এখানে একটা নবরূপ লাভ করিয়াছে।' এই নবরূপটি কি তন্ত্রোক্ত ক্রিয়াবিশেষের প্রবর্তনের ফলে লাভ হইয়াছে?

হ্রীং ক্রীং প্রভৃতি সাঙ্কেতিক বীজমন্ত্র দ্বারা দেবীর পূজা, দেহস্থ ষট্‌চক্রে ধ্যানধারণার অনুষ্ঠান, মারণ, বশীকরণ প্রভৃতি আভিচারিক ষট্‌কর্মের প্রয়োগ এবং সাধনায় পঞ্চ মকারের প্রবর্তন—তন্ত্রোক্ত সাধনার বৈশিষ্ট্য। প্রথম তিনটি বৈশিষ্ট্যের মূল অথর্ববেদে পাওয়া যায়। এই বেদে বীজমন্ত্রের মত সাঙ্কেতিক দুর্বোধ শব্দের প্রয়োগ আছে। দেহমধ্যে 'অষ্টাচক্রা নবদ্বারা' পুরীর কল্পনা এই বেদেই প্রথম দেখা যায়। আভিচারিক ক্রিয়া ত অথর্ববেদের একটা মুখ্য বিষয়। সুতরাং বীজমন্ত্র, দেহপূজা ও অভিচারকর্মের জন্য তন্ত্রাগম অথর্ব-বেদের নিকট ঋণী কি না তাহা বিচার্য। অপর কারণেও তন্ত্রের সহিত অথর্ববেদের সম্পর্ক অনুমান করা যায়। তান্ত্রিক ও আথর্বণিক উভয় পক্ষই তাঁহাদের পরস্পর সম্পর্ক স্বীকার করিয়া লইয়াছেন। এক দিকে শক্তিসঙ্গমতন্ত্রে আছে—

অথর্ববেদাধিষ্ঠাত্রী শ্রীমহাকালিকা পরা।
বিনা কালীং বিনা তারাং নাথর্বণো বিধিঃ ক্বচিৎ॥

—'শ্রীমহাকালী অথর্ববেদের অধিষ্ঠাত্রী দেবতা; কালী ও তারা ভিন্ন কখনও আথর্বণিক ক্রিয়া সম্পন্ন হইতে পারে না'। অপর দিকে অথর্ববেদের আঙ্গিরসকল্পে (অপ্রকাশিত) আথর্বণিক দেবতা প্রত্যঙ্গিরার সঙ্গে পৌরাণিক দুর্গা ও তান্ত্রিক ভদ্রকালীর অভেদ ঘোষিত হইয়াছে—

যা দুর্গা সা ভদ্রকালী সৈব প্রত্যঙ্গিরা মতা।

এই অথর্ববেদ বিশেষত এই বেদের পৈপ্পলাদ শাখা প্রাচীনকালে পূর্ব ভারতে চলিত ছিল। দক্ষিণ বাংলা ও উড়িষ্যায় এই শাখার হাজার হাজার অনুগামী এখনও বাস করেন। এই শাখার মূল সংহিতার সহিত কয়েকখানা কল্প ও পদ্ধতি গ্রন্থ সম্প্রতি পাওয়া গিয়াছে।

পদ্ধতির সহায়তায় অথর্ববেদীয় পুরোহিতগণ রাজাদের উপকারার্থ অভিচারকর্মের অনুষ্ঠান করিতেন। আভিচারিক ক্রিয়া অথর্ববেদে ও তন্ত্রে একেবারে একরূপ। আথর্বণ পদ্ধতির কোন কোন পুথিতে প্রদত্ত দিনাঙ্ক হইতে জানা যায় যে, এইগুলি চারিশত বৎসর পূর্বে লিখিত হইয়াছিল। আভিচারিক প্রয়োগের প্রচলন অবশ্যই সপ্তদশ শতক অপেক্ষা আরও প্রাচীন।

অথর্ববেদের প্রয়োগে ও তান্ত্রিক ষট্‌কর্মে কোন কোন অংশে সাদৃশ্য থাকিলেও বেদে তন্ত্রোক্ত পঞ্চ মকারের দেখা পাওয়া যায় না। 'যামলী সিদ্ধি' কিংবা 'যত্র রুচিস্তত্র বিধিঃ' এইরূপ সহজিয়া ভাবের ত কোন ইঙ্গিতই উহাতে নাই। এই সহজিয়া ভাব এবং পঞ্চ মকার-ই কি চীনাচার বা বামাচার? ইহাই কি চীনাঞ্চল হইতে আসিয়াছে? অর্বাচীন যুগের বৌদ্ধাচারও কি ইহারই নাম? তারাতন্ত্রের সাক্ষ্য অনুসারে বশিষ্ঠ এদেশে চীনাচারের প্রবর্তন করিয়াছিলেন। ডক্টর সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় অনুমান করেন যে, পরবর্তী কালের চৈনিক তাও-ধর্ম হইতে সহজিয়া অনুষ্ঠান তান্ত্রিক আচারের মধ্যে প্রবেশ করিয়াছে।

শাক্ত বামাচারের ইতিহাস বড়ই রহস্যময়। ডক্টর দাশগুপ্ত তাঁহার নিষ্পক্ষপাত ঐতিহাসিক দৃষ্টি ও শ্রদ্ধালু সাংবেদনিক মন লইয়া তন্ত্রশাস্ত্রের এই দিকের একখানা ইতিহাস রচনায় হাত দিলে তান্ত্রিক শাক্তবিদ্যার বহু সমস্যার সমাধান হইতে পারে।

দুর্গামোহন ভট্টাচার্য

Memoirs of a Bengal Civilian. *By* John Beams. Chatto & Windus. London. 30*s*.

রাজনারায়ণ বসু তাঁহার আত্মচরিতে লিখিয়াছেন 'এক্ষণে (ইংরেজী আগস্ট ১৮৮৯) সিভিলিয়ান বীম্‌স সাহেবের নাম প্রায় সকলেই অবগত আছেন।' এই কথার পুনরুক্তি করিলে বলিতে হয় বর্তমানে প্রায় কেহই বীম্‌স সাহেবের নাম অবগত নহেন।

ঊনবিংশ শতাব্দীর শেষভাগে বাংলাদেশে বীম্‌স-এর নাম ছড়াইয়া পড়ার কারণ ছিল। ১৮৮৭ খৃস্টাব্দে হঠাৎ ভারত সরকারের নির্দেশে তাঁহাকে বোর্ড অব রেভিনিউর মেম্বার পদ হইতে সরাইয়া লইয়া একটি নিম্নপদে নিযুক্ত করা হয়। এই শাস্তির কারণ সম্বন্ধে মতদ্বৈধতা রহিয়াছে। রাজনারায়ণ বসু বলেন বীম্‌সকে দেনার অপরাধে পদাবনত করা হয়। ইহা সত্য যে বীমস্‌ বারম্বার অর্থকষ্টে পড়িয়া ঋণগ্রস্ত হইয়াছেন। তথাপি দেনার দায় সম্যক কারণ বলিয়া মনে হয় না। ১৮৮৭ সালে ২২শে আগস্ট তারিখে বীম্‌স কলিকাতায় একটি শিক্ষা কমিশনে সাক্ষ্য দেওয়ার জন্য আহূত হন। পরে দেখা যায় তাঁহার রোজনামচায় ঐ তারিখে তিনি লেখেন 'আজ আমি কমিশনে সাক্ষ্য দিয়াছি এবং নিজের অজ্ঞাতসারে নিজের গলায় ছুরি বসাইয়াছি।' তিনি তাঁহার সাক্ষ্যে কি বিবৃতি দেন তাহা আজও সঠিক জানা যায় নাই। তবে ইহা অনুমান করা অমূলক নহে যে বীম্‌স তাঁহার স্বভাবসুলভ স্পষ্টভাবে এমন কথা বলিয়াছেন যাহা কর্তৃপক্ষ অবজ্ঞাসূচক বলিয়া মনে করিয়াছিলেন। বীম্‌স-এর ভীতি মিথ্যা হয় নাই। পদাবনতির পর ভারতীয় পত্রিকাগুলিতেও তাঁহাকে

বিষম গালিগালাজ করা হয়। ইহার দুই বৎসর পরে তিনি পুনর্বার বোর্ড অব রেভিনিউর মেম্বর পদে উন্নীত হন।

বীম্‌সকে লইয়া রাজনীতিক কোলাহল কবে বিস্মৃতির গর্ভে তলাইয়া গিয়াছে। কিন্তু স্বীয় কীর্তির বলে তিনি আজও সগৌরবে বাঁচিয়া রহিয়াছেন। ইহার কারণ বীম্‌স তৎকালীন 'কোই হাই'দের ন্যায় চাকুরী ও মদ্যসর্বস্ব ছিলেন না। কঠিন কর্মজীবনের মধ্যেও তিনি ভাষাতত্ত্ব লইয়া যে কাজ করিয়া গিয়াছেন কাল তাহার জ্যোতি ম্লান করিতে পারিবে না। সুবিখ্যাত ভাষাতত্ত্ববিদ গ্রিয়ারসন বীম্‌সকে গুরুজ্ঞান করিতেন। ১৯০২ সালে বীম্‌স-এর মৃত্যুর পর গ্রিয়ারসনের শ্রদ্ধাঞ্জলি তাঁহার অকপট ও গভীর ভক্তির পরিচায়ক। এই লেখাটিতে দেখা যায় যে ১৮৭৯।৮০ সালে বীম্‌সের একটি পত্র যুবক গ্রিয়ারসনকে ভাষাতত্ত্বের আলোচনা আজীবন সাধনা হিসাবে গ্রহণ করিতে উদ্বুদ্ধ করে। ডঃ সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় বীম্‌সকে আর্য-ভারতীয় ভাষাতত্ত্বের প্রতিষ্ঠাতা হিসাবে অভিহিত করিয়াছেন। আজিকালিকার এই ভাষাবিজ্ঞানকে একটি বিরাট প্রবহমান নদীর সহিত তুলনা করিয়া তিনি বলেন যে ইহার উৎস হইল ১৮৬৭ সালে কলিকাতা হইতে প্রকাশিত *Outlines of Indian Philology* নামক বীম্‌স-এর প্রণীত একটি চটি গ্রন্থ। বীম্‌স-এর সর্বশ্রেষ্ঠ কার্য অবশ্য তাঁহার *Comparative Grammar of the Aryan Languages of India*। ইহা ব্যতিরেকে বীম্‌স একটি অতি উৎকৃষ্ট বাংলা ব্যাকরণ প্রণয়ন করেন যাহা ১৯২২ সাল অবধি বাংলাদেশের সিভিলিয়ানগণের অবশ্য পাঠ্য গ্রন্থ ছিল। মৃত্যুকালে বীম্‌স বাবরের আত্মজীবনীর অনুবাদে ব্যাপৃত ছিলেন।

উপরোক্ত গ্রন্থগুলি আমাদের ন্যায় পাঠকের অধিকার বহির্ভূত। বীম্‌স-এর *Memoirs of a Bengal Civilian* অবশেষে সাধারণ পাঠকবর্গকে তাঁহার সহিত পরিচিত হইবার উপায় করিয়া দিল। এই আত্মজীবনীটির ইতিহাস কৌতূহলোদ্দীপক। ইহার অস্তিত্ব সম্বন্ধে কেহই অবগত ছিলেন না। তাঁহার দৌহিত্র ক্রিস্টোফার কুক-এর উদ্যোগে ইহা প্রকাশিত হইয়াছে। ১৯৪৭ সালে কুক ভারত হইতে কার্যে ইস্তফা দিয়া স্বদেশে প্রত্যাবর্তন করেন। একদিন তিনি তাঁহার মাতার বাক্সের পারিবারিক কাগজ-পত্র ঘাঁটিতে ঘাঁটিতে এই অমূল্য আত্মজীবনীর পাণ্ডুলিপিটি আবিষ্কার করেন। পুস্তকা-কারে প্রকাশিত হইবার পূর্বে ইহার কিয়দংশ ফিলিপ মেস্‌ন তাঁহার *The Men Who Ruled India* নামক গ্রন্থে ব্যবহার করিয়াছেন।

জন বীম্‌স ১৮৩৭ সালে লণ্ডনে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁহার পিতা পাদ্রী ছিলেন। ইস্কুল কলেজের শিক্ষা শেষ করিয়া বীম্‌স বিশ বৎসর বয়সে ভারতীয় সিভিল সার্ভিসে যোগদান করেন। তৎকালে নবনিযুক্ত সিভিলিয়ানগণকে ভারতে পাঠাইবার পূর্বে হালিবারী কলেজে তালিম লইবার জন্য পাঠানো হইত। বীম্‌স্ হালিবারী কলেজে ফার্সী ও সংস্কৃত ভাষায় ব্যুৎপত্তির জন্য পারিতোষিক লাভ করেন। ১৮৫৮ সালে অন্যান্য 'কম্পিটিশানওয়ালাদের' ন্যায় তাঁহাকেও ভারতে আসিয়া ফার্সী ও হিন্দী ভাষায় পরীক্ষা দিবার জন্য বৎসরাধিক কাল থাকিতে হয়।

বীম্‌স-এর কলিকাতা বিষয়ক নাতিদীর্ঘ পরিচ্ছেদটি এই পুস্তকটির একটি উপভোগ্য অংশ। অনুসন্ধিৎসু পাঠক যাঁহারা মিসেস ফে, বিশপ হেবর, এমিলি এডেন, ফ্যানি পার্কস, কোলস্‌ওয়ার্দী গ্র্যান্ট, এম্মা রবার্টস, ভিক্টর জাকমো, জনসন, ক্যাপটেন্ বেলিউ, ক্যাপটেন্ উইলিয়ামসন ইত্যাদির লেখার সহিত পরিচিত তাঁহারাও 'তাজা বিলাইতি' যুবক

বীম্‌স-এর কলিকাতার প্রথম অভিজ্ঞতা পড়িয়া আহ্লাদিত হইবেন। ফার্সী মুন্সী হরিপ্রসাদ দত্ত, মিডল্‌টন স্ট্রীটের হোটেলওয়ালীর সুন্দরী কন্যা লুলুর সহিত সাময়িক আশনাই ও সেই প্রসঙ্গে টমাস নামক স্থূলকায় নীল ও অহিফেন ব্যবসায়ীর দৌরাত্ম্য—এই সকল কাহিনী গুরুগম্ভীর ও ভীতিপ্রদ ভাষাবিদ পণ্ডিত বীম্‌স-এর লঘু রসজ্ঞানের পরিচয় দিয়া সাধারণ পাঠকের সহিত তাঁহার সৌহার্দ্য স্থাপন করিতে সাহায্য করিবে।

ইহার পরের পরিচ্ছেদটিতে বীম্‌স তাঁহার কলিকাতা হইতে কার্যে যোগদানের জন্য পাঞ্জাব যাত্রা ও চাকুরী জীবনের প্রথম অভিজ্ঞতার কথা বলিয়াছেন। রেললাইন পাতার পূর্বে সাহেববিবি ও দেশীয় বড়লোকগণকে কার্যব্যপদেশে ভ্রমণ করিতে হইলে হয় নৌকাকে, নাহয় ঘোড়ার ডাকগাড়ি নতুবা পাল্‌কির আশ্রয় লইতে হইত। তদানীন্তন ভ্রমণবৃত্তান্তগুলি পড়িলে এইরূপে যাতায়াত করা কিরূপ শ্রমসাধ্য, বিপদসঙ্কুল এবং বিচিত্র অভিজ্ঞতাপূর্ণ ছিল তাহা জানা যায়। বীমস্‌-এর সময়ে সবে রেলগাড়ির পত্তন হইয়াছে। বীম্‌স কলিকাতা হইতে রানীগঞ্জ অবধি রেলপথে যান। তথা হইতে বজরা, রেলগাড়ি ও ঘোড়ার ডাকগাড়ি চড়িয়া এলাহাবাদ, কানপুর ও দিল্লী হইয়া বীম্‌স লাহোরে পৌঁছান। লাহোরে উপরওয়ালাদের নিকট হাজির হইলে হুকুম হইল : তুমি গুজরাট শহরে গিয়া কাজে নিযুক্ত হও। এই সংক্ষিপ্ত হুকুম তামিল করিতে গিয়া বীম্‌স কিছুটা বিপদে পড়িলেন কারণ গুজরাট নামক স্থানটির অবস্থান সম্পর্কে তাঁহার বিন্দুমাত্র জ্ঞান ছিল না। খবর লইয়া জানিলেন স্থানটি উত্তর পশ্চিমাভিমুখে পেশোয়ারের পথে পেশোয়ার হইতে ৭০ মাইল পূর্বে অবস্থিত। অবশেষে কলিকাতা ছাড়িবার ২৬ দিন গতে এক শীতের প্রাতঃকালে চারি ঘটিকায় বীম্‌স তাঁহার অভিষ্ট গুজরাট নামক গণ্ডগ্রামে পৌঁছিলেন। পরদিবস যুবক ডেপুটি কমিশনার এডামস্‌ তাঁহাকে দেখিয়া কিছুটা ক্ষুন্ন হইলেন কারণ তিনি নিজে কাজে জেয়াদা লায়েক না হওয়ার জন্য একজন অভিজ্ঞ সহকারীর অপেক্ষায় ছিলেন। এডাম্‌স নবাগত বীম্‌সকে নিজের কাছারী দেখাইয়া অপর একটি কামরায় লইয়া গিয়া বলিলেন—এই লও তোমার দপ্তর, এই লও তোমার আমলা, এবার কোমর বাঁধিয়া কাজে লাগিয়া পড়। এডাম্‌সের কাণ্ড দেখিয়া বীম্‌স আকাশ হইতে পড়িলেন, কারণ তিনি না জানেন ভাষা, না জানেন আইনকানুন, না জানেন কোনো কিছু।

However, no time was to be lost; the people were already staring at me rather wonderingly as I hesitated for a minute, so I took my seat at a plain and rather dirty table separated from the rest of the room by a plainer and dirtier railing. The amla took their seats, some on a form beside the table, others on carpets on the floor, and the head man of them a young, slight Musulman named Mushtak Ali, who I afterwards learnt was my sarishta-dar, rose and pointing to a pile of papers covered with writing in the Persian character, said in beautiful Delhi Hindustani with many courteous periphrases, 'These are the cases on your Honour's file for trial—what is your order?' I said as by instinct, 'Call up the first case', though what I was to do with it I knew as little as the man in the moon. Mushtak Ali smiled and looked round at his fellows as who should say, 'Guessed

right the first time'. Then he mentioned some names to a six-foot-high Sikh with a turban as big as a bandbox, armed with sword and shield, who went out into the veranda and bawled loudly for some minutes. Then entered a dirty, greasy shopkeeper, the plaintiff, who was sworn by the tall Sikh, and had a wooden tablet given him with the words of the oath written on which he held tight all the while he was making his statement. I was furnished with a printed form and requested to fill in what the greasy man said in a certain column, other columns being intended for the statements of the defendant and witnesses. The defendant was next sworn and deposed. He was a big, powerful zemindar, i.e. peasant with a long black beard. Both these people spoke Panjabi, of which I could not understand one word, but the sarishtadar translated it into Hindustani as they spoke, so I got on wonderfully well. By four o'clock I had disposed of all my cases. বীম্‌স পাঞ্জাব-গুজরাটের পর ক্রমান্বয়ে আম্বালা, লুধিয়ানা, সাহাবাদ, পুর্ণিয়া, চম্পারণ, বালেশ্বর, কটক ও চট্টগ্রামে কর্ম গ্রহণ করিয়া পেনশন গ্রহণ করেন।

বীম্‌সের চাকুরী জীবনের অভিজ্ঞতার কাহিনী যেরূপ চিত্তাকর্ষক সেইরূপ মূল্যবান। এই সমালোচনার স্বল্প পরিসরের মধ্যে অবশ্য আমরা তাহার মাত্র দুই একটি প্রসঙ্গের উল্লেখ করিতে পারিব।

বীমস্‌ যখন ১৮৬৬ সালে চম্পারণ জিলায় বদলি হন তখন সেই স্থানে নীলকর সাহেবগণের বড়ই জুলুম, বড়ই দৌরাত্ম্য ছিল। অসহায় রায়তগণের উপর এই কুঠিয়ালগণ যে অমানুষিক অত্যাচার চালাইত তাহার কোন চারা ছিল না। কারণ শুধু চম্পারণ নহে বিহার ও বঙ্গদেশের সর্বত্র দণ্ডমুণ্ডের কর্তা ম্যাজিস্ট্রেটগণ তাহাদের 'ভাই বেরাদর'ও সহায়ক ছিল। ১২৬৫ সালের ১লা (ইংরাজী ১৮৫৮) মাঘের সংবাদ প্রভাকরের সম্পাদকীয় স্তম্ভে গুপ্তকবির নিম্নোক্ত উক্তিটি প্রণিধানযোগ্য :

'নীলকর সাহেবরা ম্যাজিস্ট্রেটদিগের নিকট প্রতিবাদীরূপে উপস্থিত হইলেও অতি সম্ভ্রমের সহিত গৃহীত হয়েন, হরিহর মূর্তির ন্যায় একাঙ্গ হইয়া হাস্যবদনে 'সেকহেন' করেন, ইংরাজী ভাষায় কথা কহিয়া যাহা বুঝাইয়া দেন তাহাই বুঝেন। কোনো কুটিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট সাহেবের শালা, কেহ ভাই, কেহ ভগিনীপতি, কেহ পিসে, কেহ জ্ঞাতি, কেহ কুটুম্ব, কেহ গ্রামস্থ, কেহ সমাধ্যায়ী, এই প্রকার পরস্পর সম্বন্ধে এক একটা সংযোগ আছে, এবং তাহা না থাকিলেও সকলেই 'এক সানকীর-ইয়ার' কোনোমতে ছাড়াছাড়ি হইবার জোটি নাই...

'কিন্তু কোন-কোন সাহেব এমত ধার্মিক আছেন, যে তাঁহারা যুধিষ্ঠির তুল্য। তন্মধ্যে কেহ কেহ মনের বিনা সংকল্পে সঙ্গদোষে কলঙ্কি হয়েন। আমরা নিশ্চিতরূপে কহিতে পারি শাদা হাকিমের দ্বারা শাদা নীলকরেরা কোন মতেই শাসিত হইবেন না।'*

কিন্তু আশ্চর্যের বিষয় বীম্‌স 'সঙ্গদোষে কলঙ্কি' হন নাই। তিনি চম্পারণ জেলায় কুঠিয়াল নীলকরদিগের প্রসঙ্গে লিখিয়াছেন :

* বিনয় ঘোষ সম্পাদিত "সাময়িক পত্রে বাংলার সমাজচিত্র" (১ম খণ্ড)।

The planters' policy was to get rid as much as possible of the authority of the magistrate because it interfered with the despotic control which they consider it essential to use over their ryots. This control often degenerated into cruel oppression. কিন্তু বীম্‌স নিজের ক্ষমতাকে এতটুকুও হ্রাস হইতে দেন নাই। কারণ :

It was not, as some of my detractors alleged, from mere lust of power that I insisted on being master of my own district and having my own way in all things, but because the district was a sacred trust delivered to me by the Government, and I was bound to be faithful to that charge. I should have been very base had I from love of ease or wish for popularity sat idly by and let others usurp my place and duties. Ruling men is not a task that can be performed by *le premier venu* and though I was young at it, still I had five years' training and experience prefaced by a liberal education, while these ex-mates of merchant ships and *ci devant* clerks in counting-houses had had neither। ইহা যে বীম্‌সের মিথ্যা আস্ফালন নহে তাহা তিনি কার্যে দেখাইয়াছিলেন। যখন চম্পারণ জিলার দোর্দণ্ড প্রতাপ কুঠিয়াল বলডুইন এক গরিব রায়তকে নীল চাষ করিতে নারাজ হওয়ার জন্য তাহার ক্ষেতখামার হইতে উৎখাত করিবার চেষ্টা করে তখন বীম্‌স সমন জারী করিয়া তাহাকে ও তাহার লোকজনকে নিরস্ত করেন। শুধু তাহাই নহে বলডুইন মোটা টাকা দিয়া চাষীটির সহিত আপোষ-মীমাংসা করিয়া লইতে বাধ্য হয়। ইহার অল্পদিন পরে বলডুইনের সহকারী এডওয়ার্ড্‌স নামক কুঠিয়াল যখন কয়েকজন লোককে জোর জুলুম ও মারধোর করিয়া বেগার খাটাইতে বাধ্য করে তখন বীম্‌স তাহাকে পাঁচশত টাকা জরিমানা করেন এবং আবার এইরূপ করিলে ছয়মাস কয়েদ করিবার ভয় দেখাইয়া শায়েস্তা করেন। ফলে বীম্‌সের সময়ে চম্পারণ জিলা কিছুদিনের জন্য নীলকরদিগের অত্যাচার হইতে অনেকটা মুক্ত হয় যেরূপ ইহার ৭।৮ বৎসর পূর্বে দেশী হাকিম চন্দ্রমোহন চট্টোপাধ্যায়ের অধীনে মুর্শিদাবাদের চাষীরা কিছুদিনের জন্য নীলকরদিগের অত্যাচার হইতে অব্যাহতি পাইয়াছিল।

বীম্‌স-এর চাকুরী জীবনের সবচেয়ে সুসময় উড়িষ্যায় কাটে। ১৮৬৯-৭৩ সালে বালেশ্বরে থাকাকালীন তিনি তাঁহার *Comparative Grammar* রচনা শুরু করেন এবং প্রথম খণ্ডটি প্রকাশ করেন। এই দুঃসাধ্য কর্ম তিনি কি প্রতিকূল অবস্থার মধ্যে সম্পাদন করেন নিম্নলিখিত উদ্ধৃতি হইতে তাহার কিছুটা আভাষ পাওয়া যাইবে।

It was difficult to find time for linguistic work, not so much because official work was heavy, as because of the constant interruptions to which one in my position is subjected. Still, I managed to devote some time nearly every day to my *Grammar,* and to extend my slight knowledge of European languages. I used to take up one language at a time and stick to it for a month or two, after which I went on to another. One cold weather I read *Don Quixote* through

in the original Spanish and a great part of Ercilla's long and rather tedious poem, *La Arancana,* with which, after the flowing description of it in Humboldt's *Cosmos,* I was rather disappointed. Another time I had a spell of Goethe, or Tasso, or Balzac, a strange farrago! I was, however, more in need of German, because in writing my *Comparative Grammar* it was necessary to consult so many German authorities. Much painful wading through Bopp, and Grimm and Pott had to be done. It was a relief to turn from them to the grand old Spanish ballads of Rey Don Sancho, or el Cid Campeador, though both had often to be laid aside to settle some knotty point about the collection of revenue or detection of crime. It was a curiously mixed life as regards the mind and its workings that I led in those days.

বালেশ্বরে থাকাকালীন সুবিখ্যাত ডবলিউ. ডবলিউ. হান্টার তাঁহার গৃহে কয়েকদিন আতিথ্য গ্রহণ করেন। হান্টার সাহেবকে বাঙ্গালী পাঠকের নিকট পরিচয় করা নিষ্প্রয়োজন। হান্টার সম্বন্ধে বীম্স-এর পরিহাসপূর্ণ মন্তব্যটির উদ্ধৃতি করিবার লোভ আমরা সম্বরণ করিতে পারিলাম না :

About this time we received a visit from that vivacious but not very accurate writer, Dr. W. W. Hunter, who during a stay of seven days subjected me to such an unceasing fire of questions that on his departure I solemnly forbade anyone to ask me any more questions for a month. He was then a small, lean, hatchet-faced man with a newspaper-correspondent's gift of facile, flashy writing, and a passion for collecting facts and figures of which he made fearful and wonderful use afterwards. The light-hearted subalterns of the regiment at Cuttack had amused themselves by inventing for his benefit wonderful yarns, all of which he duly entered in his note-book and reproduced in his book on Orissa. He was rather a troublesome guest as he was not contented with our simple food.

বীম্সকে রাজনারায়ণ বসু বাঙ্গালী বিদ্বেষী বলিয়াছেন। এই অভিযোগের মধ্যে সত্য থাকিতে পারে কারণ বর্তমান পুস্তকটির একটি ফুটনোটে কোন একটি মর্মান্তিক ঘটনা প্রসঙ্গে বীম্স বাঙ্গালীদের পৃথিবীর মধ্যে সবচেয়ে ভীরু জাতি বলিয়া কটু মন্তব্য করিয়াছেন। কিন্তু গরিবের প্রতি সহানুভূতি, এবং তাহাদিগের দুঃখ বুঝিবার ক্ষমতা বীম্সের চরিত্রের একটি মহত্তম গুণ ছিল। নীলকরদিগের অত্যাচার বন্ধ করা ছাড়া, বালেশ্বরে তৎকালীন লবণ শুল্ককে তিনি অমানুষিক বলিয়া বর্ণনা করিয়াছেন এবং তাহা রদ করিতে প্রচেষ্টিত হন। বীম্স লিখিয়াছেন তখনকার দিনে পুলিশগণ নিমকের আড়ং হইতে পেশাদার শুল্কাপহারক দল 'পুকুরচুরি' করিলেও কিছু করিতে পারিত না কিম্বা চোখের মাথা খাইয়া দেখিত না। কিন্তু গরিব লোক একহাঁড়ি সমুদ্রের জল লইয়া নুন তৈরি করিলে

পুলিশ তাহাদিগকে 'ঘাটদান' না দিবার অপরাধে মারপিট করিয়া বেলিগারদে চালান দিত।

বীম্‌স একটি বৃদ্ধার উপর এইরূপ অত্যাচার করার কথা অত্যন্ত বেদনার সহিত উল্লেখ করিয়াছেন। এই বৃদ্ধা এক কলসী জল লইয়া পান্তাভাতের সহিত খাইবার জন্য নুন তৈরি করিতে গেলে পুলিশ তাহাকে শুল্ক ফাঁকি দিবার অভিযোগে গ্রেফ্‌তার করিয়া নড়া ধরিয়া টানিয়া পঁচিশ-ত্রিশ ক্রোশ দূরে বালেশ্বরের আদালতে লইয়া যায়। অবশ্য "ধর্মভীরু" হাকিম বৃদ্ধাকে আইনসম্মতভাবে জরিমানা করিয়া মড়ার উপর খাঁড়ার ঘা দিতে কুণ্ঠা করেন নাই। বীম্‌স কিন্তু এইরূপ মামলায় গরিব আসামীগণকে সর্বদা বেকসুর খালাস দিতেন। এই ধরনের উল্টা বিচারের ফলে সরকারী মহলে প্রথমে হুলুস্থুলু পড়িয়া যায়। অবশেষে বীম্‌স-এর 'ফতে' হয়। ফাইল ও পত্র মারফৎ বহু লড়ালড়ির ফলে সরকার বাহাদুর অবশেষে গরিব লোকদিগকে নিজেদের ব্যবহারের জন্য লবণ করিবার অনুমতি দেন।*

বীম্‌স-এর সাহস ও তেজস্বিতা তাঁহার ব্যক্তিত্বকে দীপ্তিশালী করিয়াছিল। তিনি তাঁহার সদ্বুদ্ধি ও বিবেক-প্রণোদিত কার্য সর্বদা নিভীকরূপে করিয়া যাওয়া কর্তব্যজ্ঞান করিতেন। অন্যায় ও মূর্খতার নির্মম বিরোধিতা ও স্পষ্ট সমালোচনা করার জন্য বীম্‌সকে চাকুরী জীবনে বড়লাট হইতে সকল উপরওয়ালাদের কোপে পড়িয়া যে বারম্বার নাজেহাল হইতে হইয়াছে তাহার একটি উদাহরণ আমরা প্রথমেই দিয়াছি। কিন্তু বীম্‌স কদাচ ওপরওয়ালাদের তোষামোদ করেন নাই। পরন্তু সময়ে সময়ে তাঁহাদিগকে অহেতুক অবজ্ঞার চোখে দেখিয়াছেন যাহার মধ্যে আত্মম্ভরিতার আভাষ দেখিতে পাওয়া যায়। ফিলিপ মেস্‌ন লিখিয়াছেন যে বীম্‌স 'did not really care for lieutenant Governors as a class'. বাংলার তদানীন্তন সুবিখ্যাত ছোট লাট তীক্ষ্ণধী স্যার রিচার্ড টেম্পল সম্পর্কে তিনি নানা চোখা চোখা মন্তব্য করিয়াছেন এবং একস্থানে লিখিয়াছেন 'No flattery was too gross for him'. সরকারী হৃদয়হীনতা ও নির্বুদ্ধিতার ওপর তিনি পুস্তকটিতে শতবার কষাঘাত করিয়াছেন। আজিকালিকার ন্যায় তখনকার দিনেও সরকারী হোমরা-চোমরার কোন স্থান পরিদর্শন করিতে গেলে চতুর্দিকে সাজ সাজ রব পড়িয়া যাইত। এবং স্থানীয় রাজকর্মচারী ও খয়েরখাঁগণ চূড়ান্ত ধূমধামের ব্যবস্থা ও ঘটা করিতেন। এই জাতীয় জাঁকজমকের অর্থহীনতা বীম্‌স-এর নিম্নোক্ত কথাগুলির মধ্যে যেরূপ ফুটিয়া উঠিয়াছে তাহার তুলনা বিরল এবং কথাগুলি আজিকার 'সত্য সেলুকাস কি বিচিত্র' এই স্বাধীন ভারতেও মর্মান্তিকভাবে সত্য।

'But the idea that by a hurried tour—and all tours in so vast a country as India must be more or less hurried, because there is so much ground to be got over in a limited time—a Governor can make himself really acquainted with a province as big as England is a delusion. The place does not look itself to begin with, because it is dressed up for his reception and looks as unlike itself as a workman in his

*সিট্‌ন-কারের *Selections from the Calcutta Gazette (1789 to 1797)* হইতে জানা যায় যে ১৭৮৯ খৃষ্টাব্দে ইংরাজ সরকার আইনজারী করিয়া জনসাধারণের লবণ প্রস্তুত করা বন্ধ করেন এবং মণ প্রতি ৩।০ শুল্ক ধার্য করেন। যে বৎসর এই আইন হয়, সেই বৎসর আনুমানিক ৭০ লক্ষ টাকা আয় হইয়াছিল বলিয়া প্রকাশ।

Sunday clothes. All the natural everyday dirt and misery is bundled out of sight. 'Eye-wash', as it is called in India, prevails everywhere, even if everyone does not go to the length attributed by a well-known story to the Collector who had the trunks of the trees on all the station-roads white-washed. So the great man does not see the real place, and unless he is an exceptionally keen-sighted man he takes his superficial, hastily-formed impression for real knowledge, which does more harm than good.

If also we set against the problematical benefit of the great man's seeing things, or thinking he sees them, with his own eyes, the real and undoubted mischief he does by disorganizing the whole administration for a week or more, closing the courts, delaying the disposal of cases, putting a stop to business of all sorts, leading Municipalities and other public bodies to spend more money than they can afford in decorations, fireworks, illuminations and triumphal arches, it will be seen that the net gain for these tours is infinitesimal, if not absolutely nil.' এই পর্যন্ত লিখিয়া মনে হইতেছে যদিও আমরা ইতিপূর্বে বলিয়াছি যে বীম্‌স সাহেব শুধু সুপণ্ডিত নহেন সুরসিকও বটেন তবুও যেন আমরা বইটির গুরুত্ব সম্বন্ধে একটি বেশি ঠেশ দিয়াছি। গ্রীয়ারসন বীম্‌স এর *Comparative Grammar* এর প্রসঙ্গে বলিয়াছেন যে তিনি পুস্তকটির পাণ্ডিত্য না চিন্তা ও লিখনভঙ্গীর স্বচ্ছতা কোনটির বেশি তারিফ করিবেন তাহা ভাবিয়া পাইতেন না। *Memoirs of a Bengal Civilian*- এ শাণিত বুদ্ধি ও সূক্ষ্ম রসজ্ঞানের পরিচয় পত্রে পত্রে, ছত্রে ছত্রে আছে। আমরা যে বীম্‌স-এর উদ্ধৃতিগুলি ইতিপূর্বে দিয়াছি তাহা হইতে বীমস্‌-এর সহজ, সুন্দর রচনা ক্ষমতার কিছুটা পরিচয় পাওয়া যাইবে। ফিলিপ মেসন্‌ তাঁহার ক্ষুদ্র মুখবন্ধে লিখিয়াছেন যে কারলাইল ও রাস্কিনের যুগে এরূপ সরল ও প্রাঞ্জল ইংরাজী বড় বেশি লোকে লিখিতেন না। আমরা এই স্থলে বীম্‌স কয়েকটি আঁচড়ে চট্টগ্রামের বাবু রামকিনু দত্তর যে চিত্রটি অঙ্কিত করিয়াছেন তাহার উল্লেখ করিতে চাই। দত্তজা মহাশয়ের ইংরাজী ভাষায় পদ্য লিখিবার বড়ই বাতিক ছিল এবং তাঁহাকে তাঁহার বন্ধু-বান্ধবগণের মধ্যে কেহ কেহ 'Byron of Bengal' আখ্যা দিয়াছিলেন। রামকিনুবাবুরও নিজের কবিত্ব শক্তি সম্বন্ধে অগাধ বিশ্বাস ছিল। তিনি বড়লাটকে পর্যন্ত তাহার কবিতা পাঠাইতে পিছপাও হইতেন না কারণ তিনি ভাবিতেন যে তিনি যাহা লিখিতেন তাহাই পাকা সোণা। চট্টগ্রামের মেডিকেল সার্ভিস হইতে পেনশন গ্রহণ করিবার পর, তিনি বীম্‌সকে যে 'কবিতা'গুচ্ছ পাঠাইয়াছিলেন সেই প্রসঙ্গে বীম্‌স লিখিয়াছেন :

The poems he sent me on this occasion were written in a beautiful copperplate hand on large sheets of paper, with an elaborately drawn and coloured border which it must have taken him a long time to do. The following are the only scraps of his immortal work which I can now find. As he had all his poetry printed for him by a

friendly Bengali printer, posterity will not be deprived of them. I copy literatim and verbatim.

*Old Year!*

*Sir* (*me—not the old year*).

*Our friend old year gasping his last*
*Neither he tastes supper nor break-fast,*
*Not inclines sago, not a drop of tea,*
*Never feels well even in the land or sea;*
*His declining health now never gives him hopes,*
*Shudders at the face, and senselessly mopes.*

(then a hundred lines ending with):

*He is sorry for a look about Cabul prepotency*
*is to assume the beauty of a decadency—Adieu!*

R. K. D.

কর্মজীবন ছাড়া বীম্‌স তাঁহার স্মৃতিকথায় বংশপরিচয়, বাল্যজীবন ও পারিবারিক জীবনের কথাও চিত্তগ্রাহীরূপে বর্ণনা করিয়াছেন। বীম্‌স তাঁহার আত্মজীবনী ছাপাইবার উদ্দেশ্যে লেখেন নাই। একথাও অবশ্য ঠিক যে ছাপাইবার উদ্দেশ্যে লিখিলেও যে ইহার চেহারার খুব হেরফের হইত তাহা মনে হয় না। তিনি বইটিতে সকল কথা সোজাসুজি-ভাবে বলিয়াছেন এবং সাজপোষাক পরিয়া নিজেকে 'স্টেজে' নামাইবার চেষ্টা করেন নাই। যাহা তিনি নন তাহা সাজা বীম্‌স-এর ধাত-বিরুদ্ধ ছিল। এই অকপটতা বীম্‌স-এর আত্মজীবনীর মোহনীয় আকর্ষণ।

পরিশেষে আমরা বলিতে চাই পুস্তকটি শুধু মহারাণী ভিক্টোরিয়ার আমলের ভারতশাসন প্রণালী ও অন্যান্য ঐতিহাসিক ও সামাজিক তথ্যের আকরই নহে, ইহা একটি অসাধারণ ব্যক্তির জীবন্ত চিত্র। আমাদিগের বিশ্বাস সকল রসিক ও বুদ্ধিমান পাঠকই ইহা পড়িয়া মুগ্ধ হইবেন।

রাধাপ্রসাদ গুপ্ত

Has Capitalism Changed? An International Symposium. Edited by Shigeto Tsuru. Iwanami Shoten. Tokyo.
Beyond the Welfare State. *By* Gunnar Myrdal. Gerald Duckworth. London. 21*s*.
The Waste Makers. *By* Vance Packard. Longmans. London. 21*s*.

গত কয়েক দশকে সমাজবিজ্ঞান প্রভূত উন্নতিলাভ করেছে, শাখা-প্রশাখায় এর পরিধি ব্যাপ্ত হয়েছে, বিশ্লেষণের কৌশল তীক্ষ্ণ হয়েছে, আলোচনা নিঃসন্দেহে আরও উজ্জ্বল হয়েছে। কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে একথা বলা যায় যে সমাজবিজ্ঞানের আধুনিক অনুশীলনে প্রাক্তন বীক্ষার

বিস্তার খুঁজে পাওয়া দুষ্কর। আলোচনার পটভূমি অধিকাংশ সময়ই সমাজজীবনের অংশবিশেষে সীমাবদ্ধ থাকে, বিশ্লেষণের প্রখর অনুবীক্ষণ প্রায়শ ক্ষুদ্রগণ্ডীর মধ্যেই আবদ্ধ থাকে, সমাজব্যবস্থার সামগ্রিক রূপ নিয়ে আলোচনা অপেক্ষাকৃত কম হয়। আমাদের ক্যানভাস অনেক ছোট, আমাদের গবেষণায় ঐতিহাসিক দর্শন বা Historic Vision-এর ব্যাপ্তি দুর্লভ। হয়ত আধুনিককালের প্রকৃতিই এই, বিরাট উদার সৃষ্টির পরিপন্থী এর আবহাওয়া, তাই আধুনিক সাহিত্যে এপিকের সৃষ্টি প্রায় অসম্ভব, আধুনিক দর্শনে পজিটিভিস্ট কচকচিতে আমরা জীবনের গভীর সমস্যাগুলি নিয়ে ভাবতে ভুলে যাই, আধুনিক সমাজবিজ্ঞানে সমাজজীবনের ঐতিহাসিক প্রবাহের বিরাটত্ব খুঁজে পাই না। মাঝে মাঝে যদি আমরা আমাদের বিক্ষিপ্ত সঙ্কীর্ণ গবেষণা থেকে মুখ তুলে সমগ্র সমাজব্যবস্থাটিকে একটু ঐতিহাসিক পরিপ্রেক্ষিতে দেখি তাহলে সম্ভবত সমাজবিজ্ঞানের প্রগতি আরও একটু সুষম হতে পারে।

পৃথিবীর যে বিরাট ভূখণ্ডে ধনতান্ত্রিক সমাজব্যবস্থা আজও সগৌরবে অব্যাহত, সেখানে এই সমাজব্যবস্থার ভগ্নাংশিক রূপ বিশ্লেষণের যে চেষ্টা হয় তার তুলনায় সামগ্রিক গতিপ্রকৃতি নির্ণয়ের চেষ্টা নিতান্তই পরিমিত। চেষ্টা যদিও বা হয়, তাও অধিকাংশই হয় অবিমৃশ্য স্তাবকতায় পঙ্কিল নয় বিনাশক পক্ষপাতিত্বে জর্জর। অথচ গত কয়েক দশকে ধনতান্ত্রিক সমাজব্যবস্থায় প্রচুর পরিবর্তন এসেছে। এই পরিবর্তনের মৌলিকত্ব বা স্থায়িত্ব এবং ঐতিহাসিক বিবর্তনে এর তাৎপর্য সম্পর্কে প্রাজ্ঞ গবেষণার অবকাশ আছে। যদিও বর্তমান প্রবন্ধকার ইত্যাকার উচ্চাভিলাষে উদ্বাহু নন, তথাপি উল্লিখিত পুস্তকত্রয়ের মূল্যবান্ সহায়তায় আলোচনার সূত্রপাত করলে তা কিঞ্চিৎ কার্যকরী হলেও হতে পারে। অবশ্য প্রারম্ভেই বলা প্রয়োজন যে ধনতন্ত্রের সাম্প্রতিক গতিপ্রকৃতির বাঞ্ছনীয়তা সম্পর্কে কোন অভিমত প্রকাশে আমরা যথাসম্ভব নিরস্ত থাকব, এই পথে বিবাদ-বিতর্কের যে অতল ঘূর্ণাবর্ত তা থেকে দূরে থাকাই সমীচীন। আরও বলা প্রয়োজন যে যেহেতু ধনতন্ত্রের চূড়ান্ত বিকাশ আজ যুক্তরাষ্ট্রে, আমরা আমাদের আলোচনায় ঐ দেশের সামাজিক ও আর্থিক জীবন থেকেই তথ্যসংগ্রহে মনোনিবেশ করব।

গত দুই দশকে ধনতান্ত্রিক দেশগুলি ধনে-ধান্যে-পুষ্পে যথেষ্ট সমৃদ্ধিলাভ করেছে, জীবনযাত্রার মান উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পেয়েছে, বিশেষ করে জাপান ও পশ্চিম জার্মানীর আর্থিক বৃদ্ধির হার অন্য দেশগুলির বৃদ্ধির হারকে ছাড়িয়ে গেছে। তবে যুদ্ধোত্তর যুক্তরাষ্ট্রে আর্থিক বৃদ্ধির হার এমন কিছু চমকপ্রদ নয়; ১৯৪৫ থেকে ১৯৫৬ সালের মধ্যে মোট জাতীয় উৎপাদনের বৃদ্ধির বার্ষিক গড়পড়তা হার ছিল শতকরা ২·২, অথচ প্রথম মহাযুদ্ধের পরে ১৯১৮ থেকে ১৯২৯ সাল পর্যন্ত ঐ হার ছিল শতকরা ২·৯। তবে লক্ষ্যণীয় বিষয় হচ্ছে যে যুক্তরাষ্ট্রের সাম্প্রতিক সমৃদ্ধি পূর্বের তুলনায় অনেক সুস্থিত, উত্থানপতনের মাত্রা অনেক কম, ছোটখাট মন্দা যে একেবারেই অনুপস্থিত ছিল তা নয়; ১৯৪৮-৪৯, ১৯৫৩-৫৪, ১৯৫৭-৫৮ এবং ১৯৬০-৬১তে ব্যবসা-বাণিজ্যের নিম্নগতি যথেষ্ট চিন্তার কারণ হয়েছে। কিন্তু ১৯২০-২১, ১৯২৩-২৪ এবং ১৯৩৭-৩৮এর মন্দার তুলনায় এদের প্রকোপ অপেক্ষাকৃত কম ছিল, সবচেয়ে বড় কথা ১৯৩০এর সর্বনাশা মন্বন্তরের এখনও পর্যন্ত পুনরাবৃত্তি হয়নি। ধনতন্ত্রের অন্যতম প্রধান শত্রু অর্থনৈতিক জীবনের এই উত্থানপতন। এই সমস্যা নিরাকরণের সামর্থ্যই অনেক সময় ধনতন্ত্রের ভবিষ্যৎ সাফল্যের কষ্টিপাথর বলে বিবেচিত হয়। তাই ধনতন্ত্রের সাম্প্রতিক ইতিহাসের গভীরতর পর্যালোচনায় আগ্রহান্বিত

হবার কারণ আছে।

ধনতান্ত্রিক অর্থনৈতিক জীবনের দোলাচলবৃত্তি সম্পর্কে সম্যক্ আলোচনা করতে গেলে প্রথমেই মোট চাহিদার পরিমাণ ও প্রকৃতি বিশ্লেষণ করা প্রয়োজন। কারণ, একথা আজ অনস্বীকার্য যে চাহিদার অপ্রাচুর্য ধনতন্ত্রের সমৃদ্ধির পথে একটি প্রধান অন্তরায়।

প্রথমেই ধরা যাক ভোগ্যপণ্যের চাহিদার কথা। ভোগ্যপণ্যের ব্যক্তিগত ব্যয় ১৯৩৭-৩৯ সালে গড়ে ছিল মোট চাহিদার ৭৫ শতাংশ, ১৯৫৪-৫৬ সালে তা কমে গিয়ে দাঁড়িয়েছে ৬৫ শতাংশে। ভোগ্যপণ্য আবার দুই প্রকারের, স্থায়ী এবং অস্থায়ী। বিংশ শতাব্দীর প্রারম্ভে মোট খাদনের ৬০ শতাংশেরও বেশী ছিল খাদ্যদ্রব্য, পানীয়, পরিধেয় ইত্যাদি অস্থায়ী ভোগ্যপণ্যে। ১৯৫৭ সালে তা নেমে এসেছে ৪৫ শতাংশে। সঙ্গে সঙ্গে স্থায়ী ভোগ্যপণ্যের অংশ বৃদ্ধি পেয়েছে। মোটর গাড়ী, রেফ্রিজারেটার, টেলিভিসান, শীতাতপ নিয়ন্ত্রণ যন্ত্র, প্রক্ষালন যন্ত্র ইত্যাদি স্থায়ী ভোগ্যপণ্য আজ মার্কিন জীবনযাত্রার অপরিহার্য অঙ্গ। হিসেব করে দেখা গেছে যে ১৯৫৩-৫৭ সালে প্রধান স্থায়ী ভোগ্যপণ্যগুলি এবং বসতবাড়ির উপর মোট ব্যয় শিল্প-বাণিজ্যে মোট বিনিয়োগের চেয়েও ২০ শতাংশ বেশী ছিল। স্পষ্টই প্রতীয়মান হয় যে, দেশের অর্থনৈতিক জীবনে স্থায়ী ভোগ্যপণ্য অভূতপূর্ব গুরুত্বলাভ করেছে। অনেকে মনে করেন যে স্থায়ী ভোগ্যপণ্যের এই গুরুত্ববৃদ্ধি ধনতন্ত্রের সুস্থিত সমৃদ্ধির পক্ষে কল্যাণসূচক। কারণ, যখনই বিনিয়োগ বাড়ন্ত হবে, সঞ্চয়ের একটা বড় অংশ স্থায়ী ভোগ্যপণ্যের উপর গার্হস্থ্য ব্যয়ের মাত্রাবৃদ্ধিতে নিয়োগ করে সঙ্কটের হাত থেকে নিষ্কৃতি পাওয়া যেতে পারে। এখানে উল্লেখ করা যেতে পারে যে গত কয়েকটি মন্দার সময়ে মোটরগাড়ী এবং বসতবাড়ির উপর ব্যয়বৃদ্ধিই প্রধান ত্রাণকর্তার ভূমিকায় অবতীর্ণ হয়েছে।

ধনতন্ত্রের সঙ্কটনিরোধে স্থায়ী ভোগ্যপণ্যের ভূমিকা সম্পর্কে অবশ্য কয়েকটি প্রশ্ন তোলা যায়। প্রথমত, প্রাথমিক ব্যয়ের বিপুলতা, ভোগ্যসামগ্রীর অবিভাজ্যতা, বাজার মূল্যের উত্থানপতন, খাদকের প্রত্যাশা এবং রুচির অস্থৈর্য ইত্যাদি কারণে ভোগ্যপণ্যের উপর ব্যয় বাণিজ্যচক্র নিরসনে সাহায্য না করে এবং কখনও কখনও বাড়তি চিন্তার কারণ হতে পারে। তাছাড়া ভোগ্যপণ্যের উপর ব্যয়ের একটা বড় অংশই ঋণের উপর নির্ভর করে। সহজ কিস্তিতে মূল্যশোধের লোভনীয় সুযোগ এমন অনেক ভোগ্যপণ্যকে ক্রেতার নাগালে এনেছে যা পূর্বে তার ক্রয়ক্ষমতার সম্পূর্ণ বাইরে ছিল। গত দশকে ব্যক্তিগত আয় যে হারে বৃদ্ধি পেয়েছে খাদকঋণের বৃদ্ধির হার ছিল তার তিনগুণ। কিন্তু সমস্যা এইখানেই। ভোগ্যপণ্যের উপর ঋণনির্ভর ব্যয় যে শিল্পবাণিজ্যে ঋণনির্ভর বিনিয়োগের মতই চপল এবং অনিশ্চিত থাকবে না সে সম্বন্ধে নিঃসন্দেহ হওয়া যায় না। যুক্তরাষ্ট্রের কয়েকটি জীবনবীমা প্রতিষ্ঠানের অনুসন্ধানে দেখা গেছে যে একটি সাধারণ মার্কিন পরিবার তিন মাসের আয়ের অভাবেই সম্পূর্ণ দেউলিয়া হয়ে যেতে পারে। এই অবস্থায় আর্থিক জীবনে সামান্য বিপর্যয়েই ঋণনির্ভর ভোগ্যব্যবস্থার এই বিরাট সৌধ ভেঙে পড়তে পারে। এসব ছাড়াও ভবিষ্যৎকে বন্ধক দিয়ে তাৎক্ষণিক সঙ্কটত্রাণের এই প্রয়াস কতদূর দূরদর্শিতার পরিচায়ক বা অদূর ভবিষ্যতে স্থায়ী ভোগ্যপণ্যের চাহিদার মাত্রাবৃদ্ধির অবকাশ অপরিমিত কিনা সেই সম্পর্কেও প্রশ্নাতীত নিশ্চয়তা নেই।

মোট চাহিদার আর একটি বড় অংশ হচ্ছে শিল্পবাণিজ্যে বিনিয়োগ। এই বস্তুটি চিরকালই কিঞ্চিৎ চঞ্চল, যদিও সাম্প্রতিকালের কয়েকটি অর্থনৈতিক সংস্কার এবং বাণিজ্যচক্র

সম্পর্কে শিল্পপতিদের অধিকতর সচেতনতার ফলে এই চঞ্চলতা হ্রাস পাওয়ার কথা। তবে ধনতান্ত্রিক শিল্পবাণিজ্যের ইতিহাসে চিরকালই সাফল্য ও সমৃদ্ধির দূত হয়ে এসেছে বিজ্ঞানের সহায়তায় উৎপাদনপ্রথায় মৌলিক পরিবর্তন। উনিশ শতকের বাষ্পচালিত যান, বিদ্যুৎ, মোটর এবং রসায়নের মাধ্যমে উৎপাদনব্যবস্থায় বৈপ্লবিক পরিবর্তন হয়েছে। যুদ্ধোত্তর ধনতন্ত্রেও আণবিক শক্তি, ইলেকট্রন, সংশ্লিষ্ট (synthetic) দ্রব্যাদি প্রভৃতির ব্যবহারে উৎপাদনশক্তি বহুগুণে বৃদ্ধি পেয়েছে এবং নতুন নতুন শিল্পের উদ্ভব হয়েছে। অনেকের ধারণা বৈজ্ঞানিক আবিষ্কারের সঙ্গে সঙ্গে যদি এইভাবে ছোটখাট শিল্পবিপ্লব প্রায়শই সংঘটিত হয়, তবে ধনতন্ত্রের পৌনঃপুনিক সঙ্কটত্রাণের একটা সুরাহা হয়। কিন্তু এখানে বলা যেতে পারে যে উৎপাদনব্যবস্থার নবীকরণ মাত্রই বর্ধিত হারে বিনিয়োগের পথ প্রশস্ত করে না। উদাহরণস্বরূপ বলা যেতে পারে, বিশাল জলবিদ্যুৎ উৎপাদন ব্যবস্থার পরিবর্তে যদি আণবিক শক্তি ব্যবহার করা যায় তবে মূলধনের প্রয়োজন অপেক্ষাকৃত কম হয় এবং সেই সঙ্গে বিনিয়োগে ব্যয় তথৈব কম হয়। এছাড়াও উৎপাদন ব্যবস্থার পরিবর্তন-সাধনের অর্থ বহুলাংশেই আসে আধুনিক শিল্পপ্রতিষ্ঠানের ক্ষয়ক্ষতি বাবদ স্ফীতকায় সংস্থান থেকে। তাই নূতন নীট বিনিয়োগের প্রয়োজন অনেক কম হয়। বিনিয়োগের অপ্রাচুর্যের চিরন্তন উদ্বেগ থেকে ধনতন্ত্রের নিষ্কৃতি নেই।

এরপর শিল্পবাণিজ্যের মোট ব্যয়ের যে অংশ নানাপ্রকার অপচয়মূলক কার্যে নিঃশেষিত হয়, তা নিয়ে কিছু আলোচনা করা যেতে পারে। ভোগ্যপণ্য সম্পর্কে তথ্যপরিবেশনে এককালে বিজ্ঞাপনের প্রয়োজনীয় ভূমিকা ছিল। কিন্তু আজ সাধারণ ক্রেতা ম্যাডিসন এভিনিউর হাতে ক্রীড়নক মাত্র। নানাপ্রকার ছলাকৌশলে ক্রেতার অবচেতনমনের অন্ধকারেও বিজ্ঞাপনের পরিক্রমা। ক্রেতার ভোগবাসনার কৃত্রিম উদ্দীপনে এবং সৌখীনতার চটুল মান নিয়ন্ত্রণে বিজ্ঞাপন আজ সর্বশক্তিমান। গত কয়েক দশকে বিজ্ঞাপনের ব্যয় অস্বাভাবিক বৃদ্ধি পেয়েছে; ১৯২৯ সালে এই খাতে খরচ হত ১১২ কোটি ডলার, আর এখন ১২০০ কোটি ডলারের কাছাকাছি। পাকার্ড লিখছেন যে সমস্ত মার্কিন জীবনযাত্রা আজ এই অপচয়ের নেশায় আচ্ছন্ন। এর নৈতিক ফলাফলের কথা ছেড়ে দিলেও অর্থনৈতিক জীবনে এই অপচয়প্রবণতা উৎপাদনের গুণগত উৎকর্ষবৃদ্ধির পরিপন্থী এবং সেইহেতু আন্তর্জাতিক বাজারে পণ্যের বিক্রয়যোগ্যতার পক্ষে ক্ষতিকর।

সর্বশেষে সরকারী ব্যয়। মার্কিন অর্থনৈতিক জীবনে সরকারী ব্যয় এবং অন্যান্য আর্থিক নীতির গুরুত্ব উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পাচ্ছে। পঞ্চাশ বছর আগে মোট সরকারী ব্যয় ছিল জাতীয় আয়ের ৭ শতাংশ, ১৯৫৭ সালে তা গিয়ে দাঁড়িয়েছে ২৬ শতাংশে। মোট জাতীয় ব্যয়ের এক-চতুর্থাংশেরও বেশী সরকারের আয়ত্তে থাকায় চাহিদার নিয়ন্ত্রণের মাধ্যমে সরকার অর্থনৈতিক স্থৈর্যসাধনে প্রয়োজনীয় ভূমিকা গ্রহণ করতে পারে।

সরকারী ব্যয়ের মধ্যে প্রতিরক্ষা খাতে ব্যয়ের অংশই বৃহত্তম। ১৯২৬-৩০ সালে এই ব্যয় ছিল মোট জাতীয় আয়ের মাত্র ০·৮ শতাংশ, বর্তমানে তা ১০ শতাংশের কাছাকাছি। তবে অনুমান করা যেতে পারে যে বর্তমানে জাতীয় আয়ের যে বৃহৎ অনুপাত প্রতিরক্ষায় ব্যয় হয় সেই অনুপাতে হয়ত অদূর ভবিষ্যতে খুব বেশী বৃদ্ধি পাবে না। সরকারী ব্যয়ের আর এক অংশ যায় অন্যান্য দেশকে সামরিক এবং অর্থনৈতিক কারণে সাহায্যদানে। তবে এর মাত্রা নির্ভর করে দেশের রাজনৈতিক আবহাওয়া এবং আন্তর্জাতিক শীতল সমরের তাপমাত্রার উপর। অনুন্নত দেশগুলিকে সাহায্যদানের ব্যাপারে মীরজাল পশ্চিমের ধনী

দেশগুলির জাতীয়তাবাদী সঙ্কীর্ণতার কথা উল্লেখ করেছেন। সামাজিক নিরাপত্তা (social security) সাধনের উদ্দেশ্যে কিছু সরকারী অর্থ ব্যক্তিগত আয় বৃদ্ধি করে। এই ব্যয় নীট ব্যক্তিগত আয়ের ১ শতাংশ ছিল ১৯২৯ সালে, আর ১৯৫৮ সালে ৬·৫ শতাংশ। এই ব্যয় বিস্তারের এখনও প্রভূত অবকাশ আছে। তারপর স্কুলকলেজ, ঘরবাড়ি, রাস্তাঘাট ও হাসপাতাল নির্মাণ ইত্যাদি জনহিতকর কার্যেও সরকারী ব্যয়ের ক্ষেত্র বিস্তৃত। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে ব্যক্তিগত ঐশ্বর্যের পাশাপাশি জনকল্যাণমূলক প্রতিষ্ঠানগুলির দুরবস্থা নিয়ে অনেকেই আক্ষেপ করেছেন। মুনাফার প্রত্যাশা যেখানে কম, বেসরকারী উদ্যোগের সেখানে স্বাভাবিক শৈথিল্য। প্রসঙ্গত দ্বিতীয় মহাযুদ্ধকালে এক মার্কিন ট্যাঙ্কচালক সরল মনে যে একটি প্রশ্ন করেছিল তা এখানে উল্লেখ করা যেতে পারে। সে জিজ্ঞাসা করেছিল যে যদি মৃত্যুর উপকরণে ('instruments of death') অজস্র ব্যয় করে যুক্তরাষ্ট্র তার সমৃদ্ধি বজায় রাখতে পারে তবে বাঁচবার উপকরণে ('instruments of life') ব্যয় করেও সেই উদ্দেশ্য কেন সাধিত হবে না। এই প্রশ্নের উত্তরে এক রাজনৈতিক সমস্যা নিহিত আছে যা আমরা একটু পরেই আলোচনা করছি। কিন্তু তা ছাড়াও জীবনের উপকরণের চেয়ে মৃত্যুর উপকরণ নির্মাণ অনেক বেশী মহার্ঘ, অর্থাৎ চাহিদার ঘাটতিপূরণে মারণাস্ত্রের কার্যকারিতা অনেক বেশী। (উদাহরণ : একটি আধুনিক বোমারু বিমানের যা মূল্য তাতে ত্রিশটি শহরে একটি করে আধুনিক বিদ্যালয় নির্মাণের খরচ চালানো যেতে পারে বলে হিসেব করা গেছে।)

আমরা দেখলাম যে সাম্প্রতিক কালে যদিও ধনতন্ত্রে মন্দা-প্রতিরোধশক্তি অনেক বৃদ্ধি পেয়েছে, তথাপি মন্দার সম্ভাবনা সম্পূর্ণ অপসৃত হয়েছে এমন নিশ্চয় করে বলা যায় না। এখনও এবং গত বেশ কয়েক বৎসর ধরেই কর্মহীন শ্রমিকের বার্ষিক গড়পড়তা হার ৪ শতাংশেরও বেশী। তবে আর কিছু না হক সামাজিক নিরাপত্তা এবং নানা জনহিতকর কার্যে সরকারী ব্যয়ের মাত্রাবৃদ্ধি ভবিষ্যতে সঙ্কটত্রাণের একটি গুরুত্বপূর্ণ উপায় হতে পারে।

এখানে মার্ক্সবাদীদের একটি প্রশ্ন আছে। প্রশ্নটি সরকারের ব্যয়বৃদ্ধির সম্ভাব্যতা সম্পর্কিত। মার্ক্সবাদীদের মতে ধনতান্ত্রিক দেশে রাষ্ট্র ধনিকসম্প্রদায়ের হাতে তাদের শ্রেণীগত স্বার্থসিদ্ধির একটি উপকরণ মাত্র। সরকারী ব্যয়ের প্রসার এবং অর্থনৈতিক জীবনে সরকারের হস্তক্ষেপ যদি ব্যক্তিগত মালিকানার সামান্যতম স্বার্থবিরোধী হয় তবে ধনিকসম্প্রদায় তা কিছুতেই বরদাস্ত করবে না। ইতিহাসে নাকি এর সাক্ষ্য মেলে। এই প্রসঙ্গে বলা যায় যে ধনতান্ত্রিক দেশে রাষ্ট্রনীতি নির্ধারণে ধনিকস্বার্থের প্রভাব অনস্বীকার্য। কিন্তু বিংশ শতাব্দীর মাঝামাঝি ধনিকশ্রেণীর এই প্রভাব সম্পূর্ণ অপ্রতিহত নয়, শ্রমিক, কৃষক এবং অন্যান্য শ্রেণীও সঙ্ঘবদ্ধভাবে নিজ নিজ স্বার্থরক্ষায় সচেষ্ট এবং যদিও ধনিক-সম্প্রদায় প্রায়শই আর্থিক এবং সাংগঠনিক দিক দিয়ে সবচেয়ে শক্তিশালী, অন্যান্য স্বার্থকে সম্পূর্ণ উপেক্ষা করা আজ কোন রাষ্ট্রের পক্ষেই সম্ভব নয়। এছাড়াও শ্রেণীস্বার্থসংঘাত যার উপর মার্ক্সবাদীরা নাটকীয় গুরুত্ব আরোপ করেন তা' আজকের সমৃদ্ধ ধনতান্ত্রিক দেশগুলির পটভূমিকায় কতদূর প্রকট সেই সম্বন্ধে সন্দেহের অবকাশ আছে। যেভাবে বিভিন্ন দেশে রক্ষণশীল দলগুলি সরকারী হস্তক্ষেপের মাত্রাবৃদ্ধি স্বীকার করে নিচ্ছে এবং যেভাবে শিল্পজাতীয়করণ ইত্যাদি কয়েকটি প্রধান বিষয়ে বামপন্থীদের প্রাক্তন উগ্রতা স্তিমিত হয়ে এসেছে, তাতে মনে হয় রাষ্ট্রনৈতিক স্তরে শ্রেণীসংঘাতের প্রখরতা অনেক কমে এসেছে। মীরডালের মতে :

'We are now witnessing a fundamental convergence in our thoughts and aims . . . The internal political debate in these countries is becoming increasingly technical in character ever more concerned with detailed arrangements, and less involved with broad issues, since these are slowly disappearing.'

তবে প্রশ্ন করা যেতে পারে যে সরকারী ব্যয় এবং আর্থিকনীতির উপর বহুল পরিমাণে নির্ভরশীল যে সমাজব্যবস্থা তা' সত্যিকারের ধনতন্ত্র বলা চলে কিনা। যেখানে প্রায়শই সঙ্কটত্রাণের জন্য বিনিয়োগের একটা বড় অংশ সরকারের কুক্ষিগত হয় (কেইন্‌সের ভাষায় 'a somewhat comprehensive socialisation of investment') এবং যেখানে সরকারের বিভিন্ন নীতি আর্থিক জীবনকে নানাদিক দিয়ে নিয়ন্ত্রণ করে সেখানে বেসরকারী প্রয়াসের নিরবচ্ছিন্ন স্বাধীনতা ক্ষুণ্ণ হতে বাধ্য। মীরডালের ভাষায় :

It will, as time goes on, be less and less possible to maintain that ours is a 'free' or a 'free enterprise' economy, with exceptions for a certain number of acts of state intervention. The exceptions are gradually becoming the rule. As a matter of fact, ours is a rather closely regulated society, leaving a certain amount of free enterprise to move within a frame set by a fine-spun system of controls, which are all ultimately under the authority of the democratic state.

অনেকে বলেন যে সাম্প্রতিক কালে ধনতন্ত্রে আয়বণ্টনব্যবস্থা আগের তুলনায় অনেক বেশী সুষম হয়েছে এবং সেই হিসেবে মার্ক্সীয় ভবিষ্যদ্বাণী অনেকাংশেই ব্যর্থ প্রমাণিত হয়েছে। পরিসংখ্যানের সাক্ষ্য নিলে দেখা যায় যে ১৯২৯ সাল থেকে ১৯৫৬ সালের মধ্যে মোট লোকসংখ্যার নিম্নতর দুই-পঞ্চমাংশ মোট ব্যক্তিগত আয়ের যে অংশ পেত, তা' ১৩ শতাংশ থেকে বৃদ্ধি পেয়ে ১৬ শতাংশ হয়েছে, এবং ঊর্ধ্বতম এক-পঞ্চমাংশের আয় ৫৪ শতাংশ থেকে কমে ৪৫ শতাংশ হয়েছে। কিন্তু মনে রাখতে হবে এই পরিসংখ্যানে কেবলমাত্র ব্যক্তিগত আয়ের হিসেব আছে, জাতীয় আয়ের যে বর্ধিষ্ণু অংশ কোম্পানীর সঞ্চয়, অলব্ধ মূলধন মুনাফা (unrealised capital gains), এক্সপেন্স অ্যাকাউণ্ট ইত্যাদি নানা প্রতিষ্ঠানিক আকারে ধনিকসম্প্রদায় আত্মসাৎ করেন তার কোন হিসেব সেখানে থাকে না। মোট একথা বলা যায় যে যদিও কিছু কিছু পরিবর্তন হয়েছে, আয়বণ্টনব্যবস্থার এমন কোন চূড়ান্ত রদবদল হয় নি।

অনেকে আবার বলেন যে বর্তমানে কোম্পানীগুলির শেয়ারের মালিকানা জনসাধারণের মধ্যে বহুবিস্তৃত এবং স্বভাবতই এই বারোয়ারী ধনতন্ত্রে (People's capitalism) ধনবন্টনের অসাম্য অনেক কম। এই মর্মে ধনতান্ত্রিক সমাজব্যবস্থায় যদি কোন আমূল পরিবর্তনের কথা কেউ কল্পনা করেন তবে তথ্যের ভিত্তিতে বলা যেতে পারে যে এই ধারণা সম্পূর্ণই অলীক। কোম্পানীগুলির অংশীদার মোট লোকসংখ্যার যে অংশ, ১৯৩০ সালের তুলনায় ১৯৫৬ সালে তা' কমে গেছে, সকল শ্রমিক পরিবার মিলে মোট শেয়ারের ০·৩ শতাংশ মাত্রের স্বত্ব ভোগ করেন এবং ১৯৫২ সালে সকল অংশীদারের ৮ শতাংশ (অর্থাৎ মোট লোকসংখ্যার ১ শতাংশের কম) মোট শেয়ারের ৮০ শতাংশেরও অধিকের মালিকানা ভোগ করেন। স্পষ্টতই কোম্পানীগুলির স্বত্বের প্রধান অংশ এখনও স্বল্প লোকের আয়ত্তে।

কোম্পানীগুলির স্বত্বের প্রশ্নের সঙ্গে জড়িত রয়েছে নিয়ন্ত্রণের প্রশ্ন। একথা প্রায়শই শুনতে পাওয়া যায় যে আধুনিক ধনতন্ত্রে কোম্পানীর মালিকানা এবং পরিচালনা পৃথক্। পরিচালনার ভার যে বেতনভুক্ ম্যানেজারদের হাতে তাদের কোম্পানীতে কোন স্বত্বস্বার্থ নেই। কিছুকাল আগে জেম্স বার্নহাম ম্যানেজারীয় বিপ্লবের দুর্নিবার আসন্নতার কথা উল্লেখ করে এই ঘটনার প্রতি আমাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করেন। তবে সম্প্রতি একাধিক অনুসন্ধানে দেখা গেছে যে নিয়ন্ত্রণক্ষমতা এখনও প্রধানত অংশীদারদের হাতেই এবং পরিচালক শ্রেণীর হাতে ক্ষমতা হস্তান্তরের কথা বহুলাংশেই অতিরঞ্জিত।

এর পর আসা যাক আর্থিক ক্ষমতার কেন্দ্রায়নের প্রশ্নে। অ্যাডাম স্মিথ ও বেঞ্জামিন ফ্রাঙ্কলিনের সময় ধনতন্ত্র ছিল ক্ষুদ্র ব্যবসায়ী ও শিল্পপতির সমাজ। রঙ্গমঞ্চ এখন সম্পূর্ণ অন্যরূপ। শিল্পবাণিজ্য এখন মুষ্টিমেয় শিল্পপ্রতিষ্ঠানের কায়েমী নিয়ন্ত্রণাধীন। আদি ধনতন্ত্রের প্রতিযোগিতামূলক উৎপাদনব্যবস্থা এখন ইতিহাসের ভগ্নস্তূপে। উনবিংশ শতাব্দীর শেষ থেকে এই পরিবর্তনের শুরু এবং আজ পর্যন্ত এর অব্যাহত জয়যাত্রা পরিসংখ্যানগত প্রমাণের অপেক্ষা রাখে না।

একচেটিয়া ধনতন্ত্রে আদি ধনতন্ত্রের স্বয়ংক্রিয় অর্থনীতি অচল হয়ে পড়ে, সমস্ত উৎপাদনব্যবস্থা পূর্বের তুলনায় অনেক বেশী অনমনীয় এবং আড়ষ্ট হয়ে পড়ে, অর্থনৈতিক ব্যবস্থার প্রাণশক্তির স্বচ্ছন্দতা কমে আসে। একথা ঠিক যে বর্তমানে উৎপাদনপ্রযুক্তির নবীকরণে যে বিপুল সঞ্চয়, ব্যাপক গবেষণা এবং নিরাপদ বাজারের প্রয়োজন তা' কেবল একচেটিয়া প্রতিষ্ঠানের পক্ষেই সংগ্রহ করা সম্ভব। তবে একই কারণে নতুন শিল্পপ্রতিষ্ঠানের পথ প্রায়শই রুদ্ধ থাকে।

এখানে উল্লেখযোগ্য যে আধুনিক যুদ্ধবিদ্যার মত আধুনিক উৎপাদনপ্রযুক্তির প্রগতিতেও ব্যক্তির ভূমিকা সংকীর্ণ, নৈর্ব্যক্তিক সঙ্ঘবদ্ধতারই প্রাধান্য। আধুনিক শিল্পপ্রতিষ্ঠানে তাই দেখতে পাই শুম্পীটারিয়ান entrepreneur এর উদ্যোগী নেতৃত্বের পরিবর্তে বিশেষজ্ঞদের দলীয় প্রয়াসের যান্ত্রিকতা, শিল্পবাণিজ্যে ব্যক্তিগত উৎকর্ষ—যা' ছিল এককালে বুর্জোয়া সভ্যতার প্রাণশক্তি—তা' আজ দ্রুত অবলুপ্তির পথে।

এই প্রসঙ্গে আধুনিক সমাজে ব্যক্তির মূল্যায়নের বৃহত্তর প্রশ্নের অবতারণা করা অযৌক্তিক হবে না। উনবিংশ শতাব্দীর ধনতন্ত্র ছিল নিতান্তই অন্তর্মুখী (inner-directed) ব্যক্তির ব্যক্তিগত দুঃসাহসিকতা ও কৃতিত্বের ইতিহাস, কিন্তু আধুনিক মানুষ সমাজের বিশাল উৎপাদনের ক্ষুদ্র এক যান্ত্রিক উপকরণমাত্র। আধুনিক সংগঠনের বিশালতায় ব্যক্তি হারিয়ে যায়, ব্যক্তিগত প্রয়াস, ব্যক্তিগত উদ্যোগ আর ব্যক্তিগত স্বার্থ, যা' থেকে আদি ধনতন্ত্রের উৎসার, সব যায় তলিয়ে।

মার্ক্সবাদীরা বলেন যে ধনতান্ত্রিক সমাজব্যবস্থায় গত কয়েক দশকে এমন কিছু মৌলিক প্রকৃতিগত পরিবর্তন হয় নি। ইতিহাসে বিভিন্ন সমাজব্যবস্থার শ্রেণীবিভাগ তাঁরা করেন উদ্বৃত্ত মূল্যের মালিকানার উপর ভিত্তি করে; এই মালিকানা সামন্ততন্ত্রে ছিল জমিদারশ্রেণীর হাতে, ধনতন্ত্রে ধনিকশ্রেণীর হাতে, এবং সমাজতন্ত্রে সার্বিক সমাজের হাতে। এই দৃষ্টিকোণ থেকে বিচার করলে ধনতন্ত্রের মৌলিক পরিবর্তন হয়েছে সামান্যই: অধ্যাপক শিগেতো সুরুর এই অভিমত। কিন্তু ইতিহাসের বস্তুবাদী ব্যাখ্যার জটিল প্রশ্নের বিশদ আলোচনা না করেও একথা বলা যায় যে ইতিহাসে সমাজব্যবস্থার পরিবর্তন কেবল উদ্বৃত্তমূল্যের স্বত্ব হস্তান্তরের উপর নির্ভর করে না। মালিকানা বদল নিঃসন্দেহে ইতিহাসের

অনেক নাটকীয় ঘটনার সূত্রপাত করেছে, কিন্তু মানবসভ্যতার বিকাশের দিক থেকে সমাজ-ব্যবস্থার সত্যিকারের মৌলিক পরিবর্তন তখনই হয় যখন সামাজিক কাঠামোয় ব্যক্তিগত মানুষের স্থান সম্পর্কে নতুন কোন মূল্যবোধ গড়ে ওঠে। এই দিক দিয়ে সাম্প্রতিক ধনতন্ত্র থেকে আদি ধনতন্ত্রের পার্থক্য সুস্পষ্ট এবং গভীর। ক্রমবর্ধিষ্ণু শিল্পোৎপাদনের সাংগঠনিক প্রয়োজনে উৎপাদনব্যবস্থায় এবং পরিশেষে সমাজব্যবস্থায় ব্যক্তির যে নবমূল্যায়ন ক্রমশ সমাজে ব্যাপ্ত হচ্ছে তারই পরিপ্রেক্ষিতে ভবিষ্যৎ সমাজগঠনের সমস্যাকে বিচার করতে হবে।

প্রণবকুমার বর্ধন

Wonderful Clouds. *By* Francoise Sagan. Translated by Anne Green. John Murray. London. 10*s.* 6*d.*

প্রথম উপন্যাসের সঙ্গে সঙ্গেই সৌভাগ্যের স্বর্গে উত্তরণ যাদের সম্ভব হয়েছে, শ্রীমতী ফ্রাঁসোয়াজ সাগাঁ তাদের অন্যতম। প্রায় আট বছর আগে, তাঁর প্রথম গ্রন্থ *Bonjour Tristesse* প্রকাশিত হয়েছিল। তাঁর তদানীন্তন বিষাদ প্রার্থনা, যন্ত্রণাকাতর কৈশোরের উদ্ভাস এক অপূর্ব ব্যতিক্রম। স্মর্তব্য, তখনও তিনি কুড়ির কোঠা অনুত্তীর্ণ। এই উপন্যাস প্রকাশে সকলেই আশা করেছিলেন, তিনি রাজনৈতিক আলোড়ন অথবা কফিখানার দার্শনিকতার ঝড় এড়িয়ে সাধারণ জীবনের হাসি বেদনার একটি সুন্দর অধ্যায় ফরাসী সাহিত্যে যোগ করবেন।

কারও সে প্রত্যাশা পরিপূরণ হয়নি। তাঁর পরবর্তী সংযোজনা *A Certain Smile* অথবা *Those Without Shadows* পূর্ব সম্ভাবনার অক্ষম পরিপূরক। তাঁর সাম্প্রতিক লেখায় বিষণ্নতার সেই ধূসর ছায়া আর কোথাও পড়েনি। কান্নার সেই সম্মোহন অপসৃত।

আলোচ্য উপন্যাস *Wonderful Clouds*-ও তাঁর প্রচিন্তার এক দীন স্বাক্ষর। তাঁর মানসিকতা অপরিণত অঙ্কুরেই বিনষ্ট হয়েছে। জীবনের বিস্তৃত দিগন্ত, যা' মেঘে, রঙে অপূর্ব, তাঁকে আকর্ষণ করেনি। গ্লানির প্রচ্ছন্ন অন্ধকারে তিনি আলোর রহস্য অনুসন্ধানে প্রয়াসী।

উপন্যাসটির দৃশ্যপট ফ্লোরিডা, ন্যু-ইয়র্ক এবং পরিশেষে প্যারী। ঘটনার প্রধান নায়ক ও নায়িকা চিত্রকর অ্যালান অ্যাস ও তার স্ত্রী জোসে।

এমন বৃহৎ পটভূমি সত্ত্বেও ঘটনার সংস্থাপনা, চরিত্র সন্নিবেশ অথবা মানব-সম্পর্কের আন্তরাশ্রয়ী অন্বিষ্টা—উপন্যাসের এ-জাতীয় মৌল সব লক্ষণই এই গ্রন্থে অনুপস্থিত।

অ্যালান মার্কিন এবং তার স্ত্রী ফরাসী। ফ্লোরিডায় জোসে প্রথম অনুভব করল, সে তার স্বামীকে ভালবাসে না। সে সমুদ্রের মুক্ত হাওয়া চায়। উদ্দাম জীবন চায়। তাই তার মন অ্যালানের অস্থির বৃত্তের আকর্ষণ উপেক্ষা করে। সমুদ্রে রিকার্ডোর সঙ্গ লিপ্সা তার কাছে দুর্বার।

সম্ভবত সে কারণেই সে বার্নার্ডের কাঁধে মাথা রেখে মুক্তি প্রার্থনা করে।

অ্যালানও অবশ্য স্বামীত্বের আদর্শে অবিশ্বাসী। ইভ-কে তখন সে তার অস্তিত্বে

জড়িয়েছে।

তাই তার পক্ষে ঘোষণা করা সহজ—

I've called up my lawyer ... I told him divorce on ground of mutual misconduct, or just mine.

অথচ আশ্চর্যের বিষয়, উভয়পক্ষের সম্মতি সত্ত্বেও তাদের বিবাহ বিচ্ছেদ সম্পূর্ণ হয়নি। তারা দু'জনই এসে তখন ন্যু-ইয়র্কে আশ্রয় গ্রহণ করল। তারপর একদিন, জোসে একা পারীর পথে পা বাড়াল।

এখানে শ্রীমতী সাগাঁর বক্তব্য অস্পষ্ট। বিবাহ কি সম্মোহন, না এক প্রয়োজনীয় অভ্যাস। যাকে আঁকড়ে ধরে থাকতে হয়?

উপন্যাসের অবশিষ্ট ঘটনাপ্রবাহ পারী, তার গ্রামাঞ্চলের বাড়ি ঘিরে। পারীতেই জোসে এক পানসভায় সিভেরিনের সাক্ষাৎ লাভ করে। এমনকি অ্যালানেরও। কয়েকদিনের অনুপস্থিতির পর সে তখন সেখানে উপনীত। এই পানসভায় লরার সঙ্গে তার পরিচয় হল। লরা তখন বিগত যৌবনা, কিন্তু যৌবনের প্রতি তার আকর্ষণ এক অতৃপ্ত অনুষঙ্গ।

প্রথম দর্শনের পরই লরার অ্যালানকে মনে হল, সে তার এক নূতন পুতুল। তাকে ইচ্ছেমত ব্যবহার করতে পারবে, খেলতে পারবে যেমন ইচ্ছে তেমন করে। তাই 'ভো'-এ সে সকলকে নিমন্ত্রণ জানাল।

লরা ও অ্যালানের প্রথম পরিচয়ের চিত্রটি শ্রীমতী সাগাঁ সুন্দর এঁকেছেন। বার্নার্ড বলছে—

'It seems to be going off very well.'

'What?'

'Laura and Alan. Look.'

Did you see her expression?'

বার্নাডের ভাষ্য : That's called passion. Passion as expresed by Laura Dort. Love at first sight, darling.'

এখানে জোসের সংক্ষিপ্ত বক্তব্য উল্লেখ্য : 'Poor thing'.

'ভো'-এর গৃহে, নূতন দৃশ্যপটে জোসে পুরনো স্মৃতির রেখা দেখতে পায়। এক নয়, একাধিক বন্ধুর সঙ্গে সে এখানে যাপন করেছে। এখানেই মার্ক প্রথম জোসের সঙ্গে অন্তরঙ্গতার সুযোগ পায়।

সর্বশেষ দৃশ্য হল লরার ফ্ল্যাট। অ্যালান অ্যাসের চিত্র-প্রদর্শনীর উদ্বোধন রজনী। অনেক অতিথি সেদিন সন্ধ্যায় সেখানে। এমন কি মার্কও।

জোসের রক্তে আবার সেই পুরনো প্রবাহ : 'They looked at one another in the mirror. He seemed delighted with herself. She gave a little laugh, kissed his cheek and went out first. She knew that behind her he would be lighting a cigerette, giving his hair a final pat and would walk out at last looking so thoroughly unconcerned that the least attentive observer have become suspicious. But who would imagine that on the very day of her young and handsome husband's exhibition, Josée Ash would make love.... with an old friend that

she was not in love with? That she had never loved? Even Alan would not think of it.'

অবশ্য ব্যঙ্গোক্তি সত্ত্বেও অ্যালানের কাছে প্রশ্নের উত্তরে সবই বলেছে জোসে। কিছুই বাকী রাখেনি।

কিন্তু আশ্চর্য, অ্যালন ঈর্ষা বোধ করেনি। সহসা হাঁটুমুড়ে বসে। তারপর তার কাতরোক্তি, what I have done—what I have done to you? I wanted all of you . . . I wanted the worst.

জোসের উত্তর : 'I could not keep it up'.

অথচ শেষবারের মত অভ্যস্ত আশ্রয়ে অ্যালানের ফিরে যাবার চেষ্টা লক্ষ্যণীয়। 'It was a mistake'.

হয়ত শ্রীমতী সাগাঁ-ই ঠিক। আমরা বারেবারে অভ্যাসের বিন্দুতে ফিরে যাই। আবার নূতন বৃত্ত রচনা করি সেই একই বিন্দুকে কেন্দ্র করে।

কিন্তু অ্যালানের কথার উত্তরে জোসে যখন বলে, It would always be like that, the game is over. তখন সংশয়ের প্রশ্ন স্বাভাবিক—সত্যি কি তাই? অবশ্য এর উত্তর অন্বেষণের মত মানসিক শক্তি লেখিকার নেই।

উপন্যাসটি আদ্যন্ত পাঠের পর হতাশা বোধ করা ছাড়া আর কিছুই করণীয় থাকে না। কোনো গভীর বোধ, জীবনের কোনো বেদনাবোধ—যা একদা সাগাঁর অনন্য আশ্রয় ছিল, তার অভাব মর্মান্তিক।

যতদূর মনে পড়ে, দেশের ঝড় লেখিকার গায়েও একবার লেগেছিল। আলজেরিয়ার স্বাধীনতাকামী বন্দীদের তিনি মুক্তি দাবী করেছিলেন। বন্দীনিগ্রহের অবসান এবং কুৎসিত ফাসিস্তদের তিনি বিচার দাবী করেছিলেন। পারিপার্শ্বিকের এই ছোঁওয়া যখন তাঁকে বিভ্রান্ত করে, তখন কি করে সম্ভব তাঁর পক্ষে রিরংসায় অবগাহন?

এতদসত্ত্বেও শ্রীমতী সাগাঁর লেখা স্থানে স্থানে আশ্চর্য নৈপুণ্যের পরিচায়ক। বিশেষ করে গ্রন্থের শেষ পৃষ্ঠার শেষ পংক্তির সংযোজনা।

নৃপেন্দ্র সান্যাল